গান হতে গানে

গান হতে গানে

সুধীর চক্রবর্তী

পুস্তক বিপণি
১০/বি, কলেজ রো কলকাতা-৭০০ ০০৯

GAAN HOTE GAANE
(A collection of articles on Bengali Song)
by Sudhir Chakraborty

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০
প্রকাশক : গুণেন শীল, পত্রলেখা ১০/বি, কলেজ রো কলকাতা ৯
বর্ণসংস্থাপন : ভাষাশিল্প, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা ৯
মুদ্রক : মিনতি প্রিন্টার্স ১২ টেমার লেন কলকাতা ৯

শ্রীকুন্তল মিত্র
স্নেহভাজনেষু

আত্মপক্ষ

বাংলা গান, তার নানা দিক এবং তাদের স্রষ্টাদের নিয়ে লিখে চলেছি বহুদিন ধরে। তার অনেকাংশই নানা বইয়ে রয়েছে। অগ্রন্থিত রচনাও কিছু আছে। শুধু গান নিয়ে লেখা নিবন্ধের সংকলন আমার আছে সাতটি— তার অধিকাংশই এখন প্রাপ্তব্য নয়—অথচ সে সব বইয়ের নূতন সংস্করণ মুদ্রণের উৎসাহ আমার নেই। অথচ সেগুলির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা পুনর্মুদ্রণ দাবি করে। সব দিক ভেবে তাই পঞ্চাশ-ষাটটি নিবন্ধ থেকে ছাব্বিশটি লেখা জড়ো করে সাতটি অধ্যায়ের পরিকল্পিত বিন্যাসে এখানে সাজানো হল। রচনা নির্বাচন ও অধ্যায় বিন্যাস আমার বিবেচনাপ্রসূত। বিন্যাসে রচনার প্রকাশগত কালক্রম নেই, বিষয়গত একটা ছক আছে। লেখাগুলি কোন্ বইতে আছে এবং সেই বইয়ের প্রকাশকাল কী সে-তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে অনুক্ত রইল।

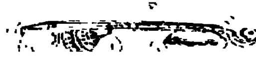
বরং এমন বলা শোভন ও সংগত হবে যে, গত পঁচিশ বছরে নানা গ্রন্থভুক্ত বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ ও আমার পছন্দের লেখা এখানে সন্নিবেশিত। নানারকম বাংলা 'গান হতে গানে' আমার সানন্দ পরিক্রমা ও রস আহরণের বৃত্তান্ত এ-বইতে পাঠকরা পাবেন। ইংরাজি লব্জে যাকে বলে 'কলেকটেড ওয়ার্কস', অনেকটা সেইরকম। প্রকৃতঅর্থে আমাকে গায়ক বলা যাবে না, বলা উচিত গানের সন্ধানী ও রসিক, যদিও গায়নের অভিজ্ঞতা কিছুটা আছে। গানবিদ্যা আয়ত্ত না করলে গানের অন্তর্নিহিত রহস্য ধরা পড়ে না,তবে তার সঙ্গে লাগে তথ্য ও তত্ত্বের সহযোগ। প্রস্তুত রচনাগুলি সেই অর্থে গ্রহণীয়।

বইয়ের অন্তর্গত ছাব্বিশটি রচনা মূলে বইতে যেমন আছে অবিকল সেভাবে রাখাই উচিত ছিল কিন্তু কোথাও কোথাও তথ্যঘটিত কিছু পরিমার্জনা ও সংযোজন ঘটেছে—পরিবর্তন হয়নি। শেষ রচনাটি আমার কোনো বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সংকলনটি প্রকাশের ব্যাপারে প্রকাশক প্রীতিভাজন গুণেন শীলের উদ্যম ও উৎসাহ প্রশংসনীয়। রচনা বিষয়ে কিছু পরামর্শ পেয়েছি প্রীতিভাজন অপূর্ব বিশ্বাস, সৌগত বসু ও রাজশ্রী ভট্টাচার্যের কাছে।

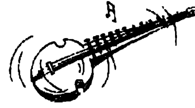
'গান হতে গানে' বইয়ের এই নামকরণের উৎস যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি পংক্তি সে কথা তো রসিকদের জানা।

৮ রামচন্দ্র মুখার্জি লেন
কৃষ্ণনগর ৭৪১১০১

সুধীর চক্রবর্তী



সূচি



জাগো জাগো রে জাগো সংগীত

বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে একটা ব্যাপারে ঘোরতর বিতর্ক এই যে, এদেশে সত্যিকারের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ হয়েছিল কিনা। সংখ্যাগরিষ্ঠরা দীর্ঘকাল ধরে বলে এবং লিখে প্রায় প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন নবজাগরণের তত্ত্ব। তাঁরা বলতে চান ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে এমন কতকগুলি স্পষ্ট লক্ষণ ও যুগস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় ফুটে উঠেছিল যা যুগান্তরের সূচক এবং গত শতাব্দীর থেকে স্বভাবত ভিন্নধর্মী। এ সব লক্ষণের মধ্যে তাঁরা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন মানবতাবোধের প্রসার, যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চা, জাতিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা ও স্বাদেশিকতা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসনিষ্ঠা, নীতিধর্মের বদলে জীবনধর্মী মূল্যবোধের প্রসার, শাস্ত্র ও আচারের অতিরেকের বদলে হৃদয়বত্তার ভূমিকা, নারীজাতির সম্পর্কে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত। বলাবাহুল্য এইসব নবীন ভাবনার মূলে অনেকটাই ছিল বিদেশি চিন্তানায়কদের রচনা পাঠের সদ্যতন সংক্রাম। আবার সেই সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থার সমুন্নত আদর্শ এবং সেই ধারায় নিষ্ণাত রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ- মাইকেল-ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো যুগন্ধর মনীষার অভ্যুদয় এই সব নবভাবনাকে ধারণ ও প্রচারে সহায়তা করেছিল সে কথাটাও অবিস্মৃত থাকা চাই।

অন্যদিকে যে সব পণ্ডিত মনে করেন বাংলায় প্রকৃত অর্থে নবজাগরণ হয়নি তাঁরা এই ভাবান্দোলন অনেক বড় পরিপ্রেক্ষিকায় দেখতে চান। সত্যিই তো সেই ইউরোপীয় অর্থে ও তাৎপর্যে এ দেশে নবজাগৃতি ঘটেনি। তা ছাড়া বিরোধীরা একথাও বলেন, আমাদের নবজাগরণ আসলে সীমায়িত সংখ্যক ভদ্রলোকদের বৃত্তেই আবদ্ধ ছিল, ব্যাপারটা অনেকাংশে যাকে বলে 'এলিটিস্ট'। এ কথাটাও সারবান। কেন না নবজাগরণ তো দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেনি কিংবা অগণিত পল্লিবাসীর জীবনে একটুও সদর্থক পরিবর্তন আনে নি। সবচেয়ে বড় কথা, উপনিবেশবাদী ইংরেজের শাসনে ও শোষণে দেশ যখন অন্নরিক্ত, পরাধীন ও হতমান, তখন সেখানে নবজাগরণের অবকাশ কোথায় এবং কীসেরই বা নবজাগরণ?

আমরা এই ঘোরতর বিতর্কে কোনো মতামত না দিয়েও নির্ভয়ে বলতে পারি, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সংগীতের ক্ষেত্রে অন্তত অনেকরকম নবীন ভাবনা ও উদ্যম দেখা দিয়েছিল। যাকে বলে সংগীতের

সংরক্ষণ, নবরূপ প্রণয়ন ও প্রচার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিক উদ্যোগ তা এই শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে ও সম্মেলক উৎসাহে জেগে উঠেছিল। তার ফলাফলও বাংলা, গানের পক্ষে সৃষ্টিশীল ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে গানের এই সঙ্গত্ নতুন কিছু নয়। সবদেশেই নতুন গান ও সংগীতের তত্ত্ব জেগে ওঠে দেশকালের নবীন আকাঙক্ষা থেকে অর্থাৎ শিল্পী ও শ্রোতার যৌথ চাহিদায়। সেই কারণেই একদা ইউরোপীয় নবজাগরণের সূত্রে সংগীত মুক্তি পেয়েছিল রাজতন্ত্র ও চার্চের আওতা থেকে ব্যক্তিতন্ত্রে। যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ্ থেকে শুরু করে হ্বগনার, বেতোফেন পর্যন্ত পাশ্চাত্য সংগীতে সেই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলেছে। তার মাঝখানে লেগেছে জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনের অন্তর্মনা গভীরতা ও সৌন্দর্যরহস্য। সমাজবিজ্ঞানীদের চোখে না পড়ে পারে না যে, যে সময়ে ডারউইনের বিবর্তনবাদ আর ফ্রয়েডের মনোবিকলন-তত্ত্ব মানবস্বভাব ও মানবদেহের অন্তঃশীল গূঢ় গোপনতাকে ধরতে চাইছে সেই সময়েই পিয়ানো যন্ত্র শ্রেষ্ঠতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আত্মস্থ দৃষ্টিতে বোঝা যায়, একই সময়ের উন্নত বিশ্বমন চাইছে ডারুইনের তত্ত্বে মানুষের ক্রমবিকাশের সূক্ষ্ম সূত্র বুঝতে, ফ্রয়েডের ভাবনায় অন্তর্মনের তরঙ্গসংকুল জট খুলতে এবং পিয়ানোর অনুপুঙ্খ সুরের চাবি দিয়ে মানবহৃদয়ের না-বলা বাণীকে ব্যক্ত করতে। এ সবের একটাই লক্ষ্য—আত্মআবিষ্কার ও আত্মপ্রকাশ।

বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে এই আত্মআবিষ্কার ও প্রকাশের আততি বিশেষভাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই জেগে উঠেছিল সে তো ঐতিহাসিকভাবে সত্য। তার মূলে নবজাগরণ না ইংরেজ সংসর্গ, হিন্দুমেলার প্রেরণা না নাট্যমঞ্চের চাহিদা, ব্রাহ্মধর্মের উপাসনার ধরন না নিছক নান্দনিক সৃজন তা নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই। কিন্তু একথা সত্য যে, সহসাই সে সময়ে বাঙালির চিত্ত গীতসুধার জন্য পিপাসিত হয়েছিল। সংগীতস্রষ্টারা তৈরি করতে চেয়েছিলেন নতুন বাঙালির জন্য গান, সেই গান রূপায়ণের জন্য যন্ত্রানুষঙ্গ এবং তার প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য স্বরলিপি ও পত্র-পত্রিকার আশ্রয়। এই সময়েই বাঙালি সংগীতকাররা প্রাদেশিক ও মার্গ গীতধারা সমীকরণ করে তৈরি করতে চেয়েছেন বাংলা গানের বিশিষ্ট রূপবন্ধ ও গায়ন, মেলাতে চেয়েছেন দেশি বিদেশি যন্ত্রের স্বভাবকে, সৃষ্টি করেছেন নতুন তাল। গানের ভাবকেও নানা বৈচিত্র্যে ও নিরীক্ষায় স্বতোশ্চল রেখেছেন গীতকাররা।

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হাত মিলিয়েছেন বাঙালির গানের স্বরূপ সন্ধানে। আজকে সময় এসেছে বাংলা গানের সেই প্রস্তাবনা যুগের প্রয়াসকে ইতিহাসের ক্রমে ফেলে বুঝে নেবার। কেন-না বাংলা গান বাঙালির সবচেয়ে স্বাভাবিক উত্তরাধিকার ও অর্জন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত, মূলত রাজনৈতিক অ-স্থিরতায়, বাংলাদেশে অবক্ষয়েব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। মানবতার শোচনীয় ও অপমানিত অস্তিত্ব, নারীজাতির অশ্রু-সবর্স্ব বন্দিত্ব, স্থূল অশ্লীলতার প্রতি পক্ষপাত, দেশীয় ঐতিহ্যবিহীন ভাবনা ও অপরিকল্পিত সাহিত্যসৃষ্টি প্রভৃতি অবক্ষয়ের মধ্যে বাংলার দেশগত ও জাতিগত কোনো বিশেষত্ব ছিল না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েক দশক ব্যাপী জীবনসাধনার মূলমন্ত্র দেশের এই আত্মদৈন্য মোচন করে নবভাবের প্রবর্তন। সেই প্রবর্তনা কখনো বুদ্ধি ও যুক্তির পথে প্রাগ্রসর হয়েছে, কখনও স্বদেশিয় মহৎ ধর্মাদর্শের মার্গে, আবার কখনো বিদেশি চিন্তানায়কদের নির্দেশিত পথে সঞ্চারিত হয়েছে। তারই পরিণামে নারীত্বের তথা মানবতার স্বীকৃতি, ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধি, দেশিয় ঐতিহ্যভাবনা ও বিদেশি নবভাবনার সমীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিশিষ্টভাবে বাংলা ও বাঙালিব প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য ও সমগ্রভাবে চিন্তাধারায় সেই নবভাববন্যার সংরাগ যদি প্রকৃতই নবীনতার জনয়িতা হয়ে থাকে, তবে বাংলা সংগীতধারায় সেই নবজন্ম কতখানি ব্যাপ্ত ও কী পরিমাণ সৃজনধর্মী তার বিশ্লেষণ অবশ্যকর্তব্য।

ঐতিহাসিক বিচারে বলা হয়, রামপ্রসাদী গানের পরই বাংলাগানের সৃজনপর্ব অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। কেন না উত্তর-রামপ্রসাদ বাংলা গানে ব্যক্তির মহৎ ভাবাদর্শের পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছিল একধরনের ঐহিক তারল্য ও স্থূল ইন্দ্রিয়তন্ত্র। গানের বাণীতেও অশালীনতার সংক্রাম ঘটেছিল। অর্থাৎ লৌকিকতার প্রতি অতি-আনুগত্য অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের গীতিকারদের আবহমান সংগীতিক ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট করে জনমনোরঞ্জনের তরল প্রচেষ্টার অভিমুখী করেছিল। সেই কারণেই কবিগান, হাফ-আখড়াই, তরজা, খেউড়, পক্ষীদলের গান প্রভৃতি গীতরীতিতে সৃজনের মত্ততা আছে কিন্তু সৃষ্টির শুদ্ধতা নেই। সে সময়ের গান ভাবের বিচারে নিরাবেগ ও অশালীন, বাণীর বিচারে আনুপ্রাসিক ক্লান্তিময়। গীতিরূপায়ণেও প্রাধান্য ছিল তালোন্মত্ত চিৎকৃত উৎসাহের। অতঃপর, নীলকণ্ঠের মতো সমকালীনতার তীব্র গরলটুকু আত্মসাৎ করে যিনি সৃষ্টির অমৃত পদ্ম প্রস্ফুটিত করলেন তিনি রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু।

অবক্ষয়ের কালে বাস করেও নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) যে সার্থক সৃষ্টিধর্মী ছিলেন তার কারণ মুখ্যত তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, কিন্তু গৌণত তাঁর দীর্ঘ জীবন। প্রায়-শতায়ু জীবনক্রমায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন: ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনা, রামপ্রসাদের সাধনসংগীতের স্বর্গ, পলাশির যুদ্ধ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত জমিদারি বিপর্যয়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন, ছাপাখানা ও বাংলা গদ্যের সূচনা, রামমোহনের বেদান্তচর্চা, ইয়ংবেঙ্গলের উন্মাদনা প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার সারদর্শী নিধুবাবু হয়ে উঠেছিলেন একজন ব্যক্তিমানুষ। সেইজন্য বাংলা সংগীতকে অবক্ষয়ের বৈচিত্র্যহীনতা থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি ভাবের দিক থেকে গ্রহণ করলেন লিরিকের মন্ময় আবেগ এবং রূপায়ণের অভিনবত্ব ফোটালেন পশ্চিম ভারতীয় টপ্পা-রীতির অন্তর্মর্ম লাবণ্যস্পর্শে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, লিরিকের মন্ময় সৌন্দর্য বাংলা সংগীত ও সাহিত্যে নিধুবাবুর আগে প্রকৃষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি এবং পাঞ্জাবি টপ্পার রূপকল্প নিধুবাবুর আগে বাংলা গানে অজ্ঞাত ছিল। এই বিশেষ সংগীতের স্বরূপ অনুশীলন ও স্বীকরণের জন্য তিনি দীর্ঘকাল প্রবাসে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালের সার্থক গীতিকারদের (যেমন : রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ) রচনায় লিরিকের মন্ময় সৌন্দর্য ও টপ্পার দানা—এই দুইটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এইজন্য নিধুবাবু বাংলা সংগীতে ক্রান্তিকালের যুগন্ধর শিল্পী। সংগীতের ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে তাঁর নবীন চিন্তা পরবর্তীকালে পথিকৃৎ হয়েছে।

অবশ্য কোনো দেশের সাংগীতিক পশ্চাদ্‌গামিতা কোনো-একজন ব্যক্তি-শিল্পীর একক সাধনায় মোচন হয় না; সেজন্য প্রয়োজন হয় দেশব্যাপী সচেতন জাগৃতি ও সামগ্রিক সক্রিয়তা। সাংগীতিক নবজন্ম সামগ্রিকতাব বোধ থেকে উৎসারিত হয়। বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সেই সম্মিলিত উদ্যমে ব্যাপক সংগীত-আন্দোলনের সূচনা ঘটে। সেই আন্দোলন কখনো নিতান্ত ব্যক্তিগত উদ্যম, কখনো প্রাতিষ্ঠানিক, কোথাও সংগীত বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্বগ্রহণ, কোথাও সার্বজনিক স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কারের সাহায্যে গীতপ্রচারের কর্তব্যপ্রণোদিত শুভবুদ্ধি। তৎকালীন সংগীত-আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যকলাপের অন্তরালে বাংলাদেশে আধুনিক নানা গীতরীতি এবং স্বরূপত সত্যিকারের বাংলা গান উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি স্মরণীয় যে, এই আন্দোলনের পরিণতি ও প্রভাব হয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃত। তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায়, এই সংগীত-আন্দোলনের নেপথ্যভূমি থেকেও প্রত্যক্ষভাবে উপাদান সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-দিলীপকুমার রায় ও নজরুলের রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি বাংলার সারস্বত সাধনায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়েছে।

সংগীত-চিন্তায় নবভাবনা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সংগীতক্ষেত্রে যে সব নবভাবনা ও নবপ্রয়াস ঘটেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখপঞ্জি সামনে রেখে, সে ব্যাপারে তৎকালীন বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই পর্বের সাংগীতিক প্রয়াসগুলি ছিল প্রধানত :

এক . নতুন যুগের ভাবানুযায়ী গান রচনা (ভাব ও ভাষা উভয়তই) এবং সেই গানের ভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ-গীতরীতির-অনুসরণ। এই প্রচেষ্টা থেকেই মূলত খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্-খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির প্রবর্তন ও ক্রমোৎকর্ষ ঘটে। নতুন তালেরও (যেমন মধ্যমান, বাংলা একতাল ও বাংলা আড়া বা পোস্তা) উদ্ভব ঘটে।

দুই . অর্কেস্ট্রা, হার্মনি, অপেরা প্রভৃতি বিদেশাগত সুরবৈশিষ্ট্য বা গীতরীতি সুসমঞ্জসরূপে বাংলাগানে গ্রহণ ও ভাবপ্রকাশের নতুন উপাদানরূপে ব্যবহার।

তিন . দেশে-বিদেশে প্রচলিত নানাপ্রকার স্বরলিপি-পদ্ধতির সারাৎসাব করে সর্বজনবোধ্য, সরল ও স্বল্পব্যয়ে মুদ্রণোপযোগী একটি স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রণয়ন এবং তার সাহায্যে বাংলা ও ভারতীয় গানের প্রচার ও সংরক্ষণ।

চার . সংগীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে সংগীত সম্পর্কে অনুরাগ ও কৌতূহল সৃষ্টি এবং সংগীত সংক্রান্ত প্রচার।

পাঁচ . সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংগীতবিষয়ক প্রামাণিক কোশগ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ, সংগীত সংক্রান্ত নতুন গ্রন্থ রচনা, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগীতের ইতিহাস প্রণয়ন।

ছয় . প্রাক্তন গীতিকারদের জীবনী রচনা ও গীতসংকলন সম্পাদনার সাহায্যে দেশের প্রবহমান গানের সঙ্গে নবীন সংগীতোৎসাহীদের মেলবন্ধন।

সাত . সংগীত উন্নয়নী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, সংগীত প্রচার ও স্বদেশে সংগীতের মানোন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

আট . ভারতীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রবাদ্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস ও বিবরণ ইংরেজি ভাষায় রচনা করে, জগৎসভায় ভারতীয় সংগীতের বহু শতাব্দী বাহিত ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদান।

নবভাবনার রূপায়ণ : ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এমন অনেক মহৎ কর্মীপুরুষ জন্মেছেন এবং স্বদেশ ও স্বসমাজের উন্নতি বিধানে আজীবন সাধনা করেছেন যে, সেই সময়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শব্দদুটি প্রায় সমার্থক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, সে- যুগের ব্যক্তিরাই যেন ছিলেন এক একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলা সংগীতের নবজন্মের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈত-ভূমিকা লক্ষণীয়।

কালক্রমের দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত আন্দোলন প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম : রাধামোহন সেন। আনুমানিক ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে লিখিত মির্জা খানের *তুহ্ফাৎ-উল্-হিন্দ্* নামে পারশিভাষায় লেখা সংগীতকোশ অবলম্বনে তিনি বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম সংগীতের কোশগ্রন্থ ভাষান্তরণ করেন, এই গ্রন্থের নাম *সংগীত তরঙ্গ* । ১২২৫ বঙ্গাব্দে ২৫ আষাঢ় (ইং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ) তারিখে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় রাধামোহন লিখেছেন :

সংগীত বিদ্যার বহুতর গ্রন্থ হয়।
তাবতের ভাষা করা যুক্তিযুক্ত নয়।।

অতএব কতকগুলি গ্রন্থকে ভাঙিয়া।
প্রকাশ করিব আমি নানা ভাষা দিয়া।।

লেখকের সংকল্প অনুধাবন করলে বোঝা যায়, *সংগীত তরঙ্গ* আসলে ভারতের সংগীত-আকর-গ্রন্থের সারানুবাদ প্রয়াস। তার সমর্থন মেলে রাধামোহনের আরেকটি মন্তব্য :

সংগীত দর্পণ আর দেখ দামোদর।
রত্নাকর মকরন্দ রূপ রত্নাকর।।
মান কুতূহল সভা বিনোদ সঙ্গীত।
পারিজাতক প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত।।

গত শতাব্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংগীতের কোশগ্রন্থ কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-কৃত *সংগীতরাগকল্পদ্রুম* (১৮৪৩) বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

রাধামোহনের পরে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-৯৩) ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (১৮৪০-১৯১৪) নাম। সংগীতের পরম ভক্ত, পণ্ডিত ও প্রচারক হিসাবে তাঁদের সমপর্যায়ের ব্যক্তি যে-কোনো দেশেই বিরল। এই দুই অসামান্য সংগীতবেত্তা প্রাচীন হিন্দু সংগীত ও ভারতীয় যন্ত্র সংগীতের স্বাতন্ত্র্য প্রচারে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বিবরণে পাওয়া যায়, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন একটি 'মিউজিক অ্যাকাডেমি'র সূচনা করেন। সেখানে ভারতীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের কয়েকজন সার্থক শিল্পী ছাড়াও কয়েকজন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতকেও গ্রহণ করা হয়েছিল। শেষোক্তদের কাজ ছিল সংস্কৃত সাহিত্যধারা থেকে ভাবগ্রহণ করে উচ্চ ভাবধারায় গান রচনা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মীদের মধ্যে ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ং, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, লছমীপ্রসাদ মিশ্র ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। দশ বছরের পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সংগীত-সার* (১৮৬৯), *যন্ত্র-ক্ষেত্র-দীপিকা* (১৮৭২), *কণ্ঠ-কৌমুদী* (১৮৭৫) গ্রন্থ তিনটি এবং জয়দেবের *গীতগোবিন্দের* অন্তর্গত কয়েকটি গানের স্বরলিপি (১৮৭১)। শৌরীন্দ্রমোহন নিজে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। তিনি বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন হিন্দুসংগীতে পাশ্চাত্য হার্মনির সংযোগ প্রতিষ্ঠায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত *The musical scales of the Hindus with remarks on the applicability of harmony to Hindu music* গ্রন্থটির চিন্তাধারার নবভাবনা স্মরণীয় হয়ে আছে। হিন্দু সংগীত সম্পর্কে পাশ্চাত্য সংগীতবেত্তাদের মতামত তিনি সযত্নে সংগ্রহ করে সংকলন করেন *Hindu music from various authors* গ্রন্থে। হিন্দু সংগীতের মহিমা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা তাঁর দেশানুরাগ ও দেশীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধার অবিস্মরণীয় স্মারক। কিন্তু সংগীত সম্পর্কে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি *Universal history of music* গ্রন্থ রচনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যখন বিশ্বের ইতিহাস রচনার উপাদান ছিল অপ্রতুল সেইসময় তিনি যে অমানুষিক শ্রমে এ-গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে মূর্ত হয়েছে তাঁর ইতিহাসবোধ তথা বিশ্ববোধ। সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে সংগীতের ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের আগ্রহ ও চিত্তের ঔদার্য। সৌভাগ্যত, শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর দায়িত্বের গভীরতা সম্পর্কে সচেতন মন্তব্য করেছেন গ্রন্থটির ভূমিকায়:

The study of music of various nations is advantageous to the musicians for a number of reasons. The study is important from an ethnological point of view, as it affords

him an insight into the inward man, and displays the character and temperament of different races, and the relation they bear to one another. It is also important from a historical standpoint, for it shows the different stages of progress which music has made in different countries.

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের রচনাবলি সম্পূর্ণত ইংরেজি ভাষায় লিখিত; তার কারণ, এই সব রচনার মূল উদ্দেশ্য বিশ্বের সংগীতসভায় ভারতীয় সংগীতের পরিচয় প্রদান এবং ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সশ্রদ্ধ মন্তব্য উন্নাসিক ও ঐতিহ্যভ্রষ্ট ভারতীয়দের সম্মুখে উপস্থাপন।[১]

শৌরীন্দ্রমোহনের পর বাংলার সংগীতক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪), স্বদেশে সংগীত প্রচারের জন্য তিনি আত্মদান করেছেন বললে ভুল হয় না। জীবনের অপরাহ্নে লেখা তাঁর একটি পত্রাংশে তাঁর গীতাত্মপ্রাণ আত্মজীবনীর প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন :

আমি একসময়ে সংগীতে পাগল হইয়াছিলাম। সংগীতচর্চার জন্য উপযুক্ত সাবকাশ পাইতাম না বলিয়া, আমি বেঙ্গল গবর্নমেন্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, যে-পদ এখন লোকে মাথা খুঁড়িয়াও পায় না।[২]

কৃষ্ণধনের ইচ্ছা ছিল ইউরোপীয় সাংকেতিক স্বরলিপি এদেশে প্রচার করা। সেজন্য তিনি বহু চেষ্টা করেন এবং বহু অর্থব্যয়ও করেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কেন-না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত আকারমাত্রিক স্বরলিপি শেষপর্যন্ত সকলে গ্রহণ করেন। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র ব্যাপকভাবে আলোচিত হবে। আপাতত স্মরণীয় যে, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে অনেকগুলি সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৬৭ সালে প্রথম প্রকাশ পায় *বঙ্গৈকতান*। এই গ্রন্থে ছিল ঐকতান বাদ্যের গৎ। ১৮৬৮ সালে প্রকাশ পায় *Hindusthani Airs arranged for the Pianoforte* ও *সংগীতশিক্ষা* নামে দুটি বই। ১৮৭৩ সালে প্রকাশ পায় *সেতারশিক্ষা*। এইসব গ্রন্থ রচনার পশ্চাদপটে পাশ্চাত্য সুরকে এদেশি গানে গ্রহণ করবার এবং দেশি-বিদেশি যন্ত্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের প্রমাণ মেলে। কিন্তু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি *গীতসূত্রসার* (১৮৮৫)। নানা অসুবিধার মধ্যে দীর্ঘ দশ বছরের শ্রমে আরব্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহৎ গ্রন্থ ভারতীয় সংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক উভয়তই আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ। ভূমিকার সূচনায় লেখক উল্লেখ করেছেন : 'কণ্ঠে গীতচর্চার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ বিধানার্থ এই পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হইল।' ভূমিকার শেষে লেখক জানিয়েছেন : 'এই পুস্তকদ্বারা স্বদেশীয় একটি লোকেরও বিশুদ্ধ সংগীতজ্ঞানের, ও গান শক্তির উন্নতি সাধিত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব'। কৃষ্ণধনের এই আবেগ ও আকুতি মর্মস্পর্শী। তাঁর অসামান্য স্বাদেশিকতা ও গীতপ্রীতির অভিজ্ঞান *গীতসূত্রসার*-এর পাঁচশত পৃষ্ঠা।

বাংলা সংগীতের নবরূপায়ণ ও প্রচার ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)। নিজে অপেরা ঢঙে নাটক রচনা করে এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশি-বিদেশি সংগীতের

---

[১] প্রসঙ্গত শৌরীন্দ্রমোহন রচিত ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় সংগীতগ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল :

1. *Hindu music from various authors 1875* 2. *Short notice of Hindu musical isntruments 1877* 3. *Six principal ragas, with a brief view of Hindu music 1877* 4. *A few specimens of Indian songs 1879* 5. *Eight tunes 1880* 6 *The musical scales of th Hindus 1884* 7. *The twenty-two musical Srutis of the Hindus 1886* 8. *Six rages and thirty-six raginis of the Hindus 1887* 9. *Universal history of music 1896*

১। *জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব* ১৮৭০ ২। *যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা* ১৮৭২ ৩। *মৃদঙ্গমঞ্জরী* ১৮৭৩ ৪। *হারমোনিয়াম সূত্র* ১৮৭৪ ৫। *যন্ত্রকোষ* ১৮৭৫ ৬। *ভিক্টোরিয়া গীতিমালা* ১৮৭৭ ৭। *গীতপ্রবেশ* ১৮৮৩ ৮। *সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রকাশিকা* ১৮৮৪ ৯। *নৃত্যাঙ্কুর* ১৮৮৫

---

[২] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত। গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০। পৃ. ২৫

দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি বাংলার সংগীত-ক্ষেত্রে প্রবক্তার গৌরব অর্জন করেছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগীত উন্নয়নী সভার কাজে ব্যাপ্ত হয়েছিল। অর্কেস্ট্রা প্রবর্তন, সংগীত পত্রিকা সম্পাদনা, সংগীত সমাজ স্থাপন, স্বরলিপির সরলীকরণ প্রভৃতি নানা কাজে তাঁর যুগান্তকারী শিল্পবুদ্ধি সার্থকতা দেখিয়াছে। নিজের জীবনস্মৃতিতে নবীন সংগীত সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এই বলে :

> কী শৌখিন কী পেশাদার কোনো গায়কের কোনো গান ভালো লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসংগীতে অনেক বড়ো বড়ো ওস্তাদি সুর ও তাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

লক্ষণীয় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে-যুগের অন্যান্য সংগীতবেত্তাদের মতো সংগীতের ইতিহাস বা কোশগ্রন্থ রচনা করেননি, কেন না তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলত প্র্যাকটিকাল। সেইজন্য সংগীতকে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ্যে প্রচার করাই ছিল তাঁর ধ্যান ও ব্রত। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে তিনি ১৬৮ টি গানের স্বরলিপি সংকলন করে যে, *স্বরলিপি গীতি-মালা* প্রকাশ করেন, প্রসঙ্গত সেই গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি লক্ষ করা যেতে পারে :

> যদি কোনো শিক্ষার্থী স্বরলিপির কোনো অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে পত্রের দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অথবা গ্রন্থস্থিত কোনো গান যদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিতে যে সদিচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে তাতে সংগ্রীতপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের সংগীত উন্নয়নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগ্রহ ও আবেগ আরও সার্থকভাবে ব্যক্ত হয়েছিল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগীত বিদ্যালয়' এবং 'ভারত সংগীত সমাজ' নামে দুটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন ও পরিচালনার মধ্যে।[৩]

'আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতিসাধনের জন্য' ১৮৭৫ সালের ৪ জুন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগীত বিদ্যালয়'স্থাপিত হয়। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি একা পরিচালনা করতেন সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেখানে ছাত্রদের বিনা বেতনে উচ্চাঙ্গ, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষক ছিলেন যদুভট্ট। দুভার্গ্যত, ক্ষণজীবী এই প্রতিষ্ঠানটির সমগ্র কার্যবিবরণ পাওয়া যায়নি। সেই বিবরণ সংগৃহীত হলে বাংলা ধ্রুপদচর্চার প্রকৃত ইতিহাস সকলে জানতে পারবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় সংগীত প্রতিষ্ঠান 'ভারত সংগীত সমাজ' কিন্তু দীর্ঘজীবী হয়েছিল।[৪] পুনায় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অবস্থান কালে সেখানকার 'গায়ন সমাজ' দেখে কলকাতায় অনুরূপ এক সভা স্থাপনের ইচ্ছা জাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে। 'ভারত সংগীত সমাজ' সেই ইচ্ছারই ফলিত রূপ। সমাজের উদ্দেশ্য ছিল, 'বাংলাদেশে সংগীতশিক্ষা, সংগীত অধ্যাপনা, প্রচার এবং বাংলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন।' সংগীত সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক হাজার টাকা দান করেন এবং ঠাকুর পরিবার থেকে আরও সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হয়। [৫]জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সংগীত সমাজের প্রথম সম্পাদক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ডোয়ার্কিন কোম্পানির স্বত্বাধিকারী দ্বারকানাথ ঘোষের নামও উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ইনি *স্বরলিপি গীতি-মালা* নিজ ব্যয়ে প্রকাশ

[৩] ছাত্রদের সংগঠিত শিক্ষাদান ও সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব রামনিধি গুপ্তের প্রাপ্য। জানা যাচ্ছে, 'His fame as singer spread far and wide. Young men having a penchant for music clustered around him. Unlike professional songsters, he unreservedly gave them lessons in vocal music...Ramnidhi established a society composed mostly of youngmen, for cultivation of music, chiefly vocal music'.
দ্রষ্টব্য: *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী*, ভবতোষ দত্ত, পৃ. ৪০৫

[৪] দ্রষ্টব্য : ভারত সংগীত সমাজ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৬০

[৫] *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি*, পৃ.২১৭-২১৮

করেন। বাংলাদেশে হারমোনিয়ম বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা ও প্রবর্তক হিসাবেও দ্বারকানাথ প্রসিদ্ধ। উৎকৃষ্ট হার্মোনিয়াম বাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুনাম অর্জন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজে বাংলা গানে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে তিনি বাংলা সংগীতক্ষেত্রে পালাবদলের সূচনা করেন।

বাংলা নাটকে অর্কেস্ট্রার সার্থক প্রয়োগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি। তাঁর পূর্বে ১৮৫৮ সালে ৩১ জুলাই বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বাংলা অর্কেস্ট্রা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল।[৬] কিন্তু তাঁদের উদ্যমে ঐক্যতানসৃষ্টির চাহিদা ছিল গৌণ আর তাঁদের রচিত সুর ছিল ভারতীয় রাগরাগিণীর আশ্রয়ে পুষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রয়াসে বাংলা অর্কেস্ট্রা দেশি-বিদেশি সুরের সমন্বয়ে রচিত এবং ঐক্যতানে রূপায়িত হয়। এই অর্কেস্ট্রা প্রথম রূপায়িত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই পরিচালনায় ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, 'নবনাটক'-এর প্রথম অভিনয় রজনীতে। কনসার্টে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছিল তা হল : হার্মোনিয়াম, দুই তিনখানি বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, পিক্‌লো, বড় বাসবেহালা, করতাল, ঢোল, বাঁয়াতবলা ও মন্দিরা।[৭] দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের এই মিশ্র সমারোহে সেই সময়কার সংগীতজগতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-নবযুগের আভাস এনেছিলেন তার গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিমাপ আজও হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো বাংলা সংগীতের উন্নতিকল্পে সকর্মক উদ্যোগী পুরুষ মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯৯২)। বাংলা অপেরার জনয়িতা মনোমোহন বাংলা গানের সমুন্নতিকল্পে প্রধানত প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সে কালের বিভিন্ন সভাসমিতিতে তিনি বাংলা সংগীতের পক্ষে বক্তৃতা করতেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে (এপ্রিল ১৮৬৭) কলিকাতায় যে, হিন্দুমেলার সূচনা হয়, তার অর্ন্তভুক্ত জাতীয় মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন ছয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তার মধ্যে পঞ্চম প্রস্তাবটি ছিল সংগীত-প্রাসঙ্গিক। তিনি সেই প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করেছিলেন : 'যাহাতে মেলাস্থলে বিবিধপ্রকার সঙ্গীতজ্ঞ গুণিমণ্ডলীর গুণপ্রকাশ, যন্ত্রাদির প্রদর্শন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে দেশে সুধারার প্রবর্তন হয়'।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা রঙ্গমঞ্চে পরিবর্তনের স্পর্শ লাগে। বিদেশি নাটকের রূপরীতি এদেশের নাটকে অঙ্গীকৃত করা এবং দেশীয় যাত্রাগানের ধারার সঙ্গে বিদেশি অপেরার সাযুজ্যসাধন এই সময়ের নাট্যনির্মাতা ও প্রয়োগকর্তাদের অন্যতম উদ্‌যোগ ছিল। তারই ফলে, বাংলা নাটকে গান ও আবহসংগীতের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে যুগোপযোগী চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। এই চিন্তাভাবনা ও প্রয়োগকর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিণামে গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের যথাযথ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পরবর্তীকালে লক্ষিত হয়।

নাটকে গানের এই সঙ্গতিপূর্ণ সন্নিবেশ প্রসঙ্গের প্রথম প্রস্তাবক সম্ভবত মনোমোহন বসু। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় নাট্য-শালার উদ্বোধন হয়। নাট্যশালার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব

[৬] 'An individual orchestra was composed of genuine ragas and raginis by Kshetramohon Gossain and Jadunath Paul.' (First performance of Ratnavali)
The Theatre . Ahindra Choudhury, pp 293
Studies in the Bengal Resaissance
The National Council of Education, Bengal, Jadavpur, 1958

[৭] "নবনাটক" নাটক হল; জ্যোতিকা' মশায় অর্গ্যান বাজালেন। সেইবারেই প্রথম অর্গ্যান বাজলো।'
আমাদের পারিবারিক সংগীত চর্চা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০, পৃ. ১৯

সভায় মনোমোহন যে ভাষণ দেন তাতে সারা বাংলার গীতিময়তার চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে: [৮]

দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটি গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যা-ভিনয়ে গানের বড়ো আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকা-ভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন! কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্যেই গান নহিলে চলে না...সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে?

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শনসময়ে শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন। আমি এমন বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হইক। আমার অভিপ্রায় এই, যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে,তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না ফলতঃ যে কয়টি গান হইবে, সে কয়টি যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সর্বপ্রকার নবভাবনার মূলমন্ত্র ছিল, পূর্বাগত ধারাকে বিলোপ না করে নতুন যুগের উপযোগী পরিমার্জিত রূপান্তর সাধন। এই পরিমার্জনের জন্য আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে কখনও ভারতের অন্য প্রদেশের পূর্বাগত ধারা ও সংস্কৃত মহৎ ঐতিহ্য, কখনও বৈদেশিক ধারা। বাংলা সংগীতের নবভাবনাতেও এই পরিমার্জন-সংস্কার ব্যাপারে ভাবের দিক থেকে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল ঔপনিষদিক মহৎ গাম্ভীর্য; রূপের দিক থেকে গৃহীত হয়েছিল উদাত্ত ধ্রুপদ, উচ্ছল খেয়াল ও অন্তর্মময় টপ্পা। বিদেশি সংগীতের রূপরীতি, বিশেষত অপেরার ভঙ্গীও বাংলা গানে বিশেষ আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল।

অবশ্য অন্য প্রদেশের গীতধারা বাংলা গানে গ্রহণ করবার জন্য গত শতাব্দীর যেসব বাঙালি সংগীতব্রতী সক্রিয় অনুশীলন করেছিলেন তাঁদের সকলের নাম জানা যায় না। ব্যক্তিগত সাধনার নীরব প্রাঙ্গণ থেকে তাঁরা কদাচিৎ সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করতেন। কিন্তু তাঁদের কর্মসাধনার পরোক্ষ প্রভাব এখনকার বাংলা গানেও পাওয়া যায়। পাঞ্জাবী টপ্পাকে বাংলা গানে প্রয়োগ করে কীর্তিমান হয়েছেন নিধুবাবু এবং বাংলা গানের সঙ্গে ইউরোপীয় সুরের পরিণয়সাধনে আচার্যের ভূমিকা নিয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পজাত যে-দুজন উদ্যমী সংগীতশিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন কালী মির্জা ও মহেশ মুখুজ্যে।

কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২০) (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর একজন গায়ক ও গীতরচয়িতা। সংস্কৃত ও পার্শি ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে কাশী গিয়ে তিনি বেদান্ত ও সংগীতচর্চা করেন। উত্তরভারতীয় গীতরীতির ব্যাপকতর চর্চার জন্য পরে তিনি লক্ষ্ণৌ ও দিল্লি

[৮] *সাহিত্য সাধক চরিতমালা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫১ খণ্ড*

যান। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে বাংলাদেশে ফিরে সংগীত রচনা ও শিক্ষা দান করে বাকি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কালী মির্জার কাছে রামমোহন রায় সংগীত-শিক্ষা করেন বলে শোনা যায় এবং 'মির্জা মহাশয়ের সমীপে সঙ্গীত-শিক্ষা সময়ে মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদিতার বীজ প্রথম রোপিত হয়'—এই তথ্য স্মরণীয়।[৯]

মহেশ মুখুজ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল সংগীতে তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ গুণী। পাঞ্জাবী টপ্পা ও গোয়ালিয়র ঘরানার ধ্রুপদ-খেয়াল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করতে তিনি গোয়ালিয়র যান এবং পশ্চিমী টপ্পার একজন পারদর্শীরূপে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাদানে বাংলা সংগীতে পশ্চিমী টপ্পার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি (অর্থাৎ, শোরী হামেদুন ও মস্ত্ বুলবুল-এর বিখ্যাত গান) সমীকৃত হয়।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এবং বহু প্রতিষ্ঠান (যেমন তত্ত্ববোধিনী সভা, স্কুল বুক সোসাইটি, হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভা প্রভৃতি) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঠিক তেমনিই বাংলা সংগীতের নবজাগরণে বহু প্রখ্যাত গীতিকার, গায়ক ও নাট্যকার ছাড়াও বহু সংগীত উৎসাহী কর্মী ও প্রতিষ্ঠান দেশের সংগীত উন্নয়নে আত্মদান করেছেন। তাঁদের সাধনা ও সঙ্কল্পের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হলে আমাদের স্বদেশসাধনার এক নব ইতিহাস জানা যাবে।[১১]

সংগ্রহ ও সংকলন : সংরক্ষণ

রেনেশাঁসের অন্যতম লক্ষণ ইতিহাসচেতনা এবং সেই চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠে দেশের অতীতের প্রতি নব দৃষ্টিপাতে, প্রাক্তন ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ প্রবণতায়। এই অর্থেই রেনেশাঁসের নামান্তর পুনর্জন্ম। কোনো জাতি যখন ভাবতে পারে : তাদের কী ছিল, কী হয়েছে এবং কী তাদের হওয়া দরকার, তখন সেই জাতির ঘটে নবজাগরণ তথা নবজন্ম।

এই নবজন্মের ভিত্তি আসলে এক অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যের বোধ, যে-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নবচেতনার সৃষ্টিসত্তার আত্মপ্রকাশ করে।

সুখের বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই অতীত-প্রীতি এবং দিগদর্শী ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনের প্রারম্ভ পর্যায়ে তিনি কবিওয়ালাদের দলে গান বাঁধতেন এবং তাঁর চেতনা দেশের অতীত কবি-গীতিকারদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিল। প্রাক্তনের প্রতি তাঁর এই সশ্রদ্ধ অনুরাগ মূলত ব্যক্তিগত কিন্তু অংশত তৎকালীন নবজাগরণের উত্তেজনাজাত। বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব থেকে তিনি তাঁর কয়েকজন যোগ্য সাহিত্যশিষ্যকে জাতীয়তাবাদের অম্লান আদর্শে

[৯] দ্রষ্টব্য. *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী* : ভবতোষ দত্ত, পৃ. ৪৩৯

[১০] 'About early seventies, Mahes Mukherji, the most talented specialist of Tappa and Tap-khayal of those times, had gone to Gwalior to learn at first hand the techniques of Panjabi Tappa and Gwalior patterns of Dhrubapada and Khayal, and came back as a full-fledged artist of Western Tappa consisting principally of songs of Shori, Hamedun and Mast-Bulbul, three greatest composers of Tappa. This Mahes Ostad turned out as a regular professional artist, and he was practically the originator of the finished style of Bengali Tappa and Tap-Khyal.'

Music and Song : Amiyanath Sanyal. *Studies in the Bengali Renaissance* 1958. pp 311

[১১] এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক কর্মহিসাবে দ্রষ্টব্য.

শতবর্ষের বাংলা গানের দিগদর্শনী : অমিয়নাথ সান্যাল। 'দেশ' বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১

দীক্ষিত করেন। বাংলার প্রাক্তন কবি ও গীতিকারদের জীবনচরিত ও রচনাসংগ্রহ ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্ত আকুল আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন করেছিলেন:

> এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীতসকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমাবদ্দিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকারপূর্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষী-দলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব। এই মহা মঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রমস্বীকার জন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তৎপ্রদানেও বিরত হইব না। ...যদবিধ এই দেহের সৎকার্য না হয় তদবিধ এই সৎকার্য সাধনে যদ্যপি সর্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় তথাচ আমরা এই কর্তব্যকল্পে কখনই ক্ষান্ত হইব না।

ঈশ্বর গুপ্তের এই অঙ্গীকার ব্যর্থ হয়নি। ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে তিনি বাংলার প্রাচীন কবি-গীতিকারদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করে সংকলিত করেন। ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের সমুদয় রচনা ও বিবরণ সংগ্রহ করে বাংলা সংগীতের অতীত সূত্রটি নির্দেশ করেছেন। অতীতের সংগীতনায়কদের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন এবং প্রাক্তন গীতসংগ্রহের প্রয়াস বাংলাদেশে ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম সম্পন্ন করেন।

ঈশ্বর গুপ্তের এই অঙ্গীকার ব্যর্থ হয়নি। ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে তিনি বাংলার প্রাচীন কবি-গীতিকারদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করে সংকলিত করেন। ভরতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের সমুদয় রচনা ও বিবরণ সংগ্রহ করে তিনি যেমন বাংলাসাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তেমনই রামপ্রসাদ ও রামনিধি গুপ্ত-সংক্রান্ত সমুদয় জীবনী-তথ্য গীতসংগ্রহ করে বাংলা সংগীতের অতীত সূত্রটি নির্দেশ করেছেন। অতীতের সংগীতনায়কদের জীবনবৃতান্ত সংকলন এবং প্রাক্তন গীতসংগ্রহের প্রয়াস বাংলাদেশে ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম সম্পন্ন করেন।

ঈশ্বর গুপ্তের আবেদন অনুসারে আর কজন বাঙালি গীতসংগ্রহ ও জীবনী-রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন তার সামগ্রিক বিবৃতিদান সম্ভব নয়। তবে ঈশ্বরগুপ্তের প্রবর্তিত ও নির্দেশিত জীবনীরচনা ও গীতসংগ্রহের রীতি দীর্ঘকাল চলেছিল। তার প্রমাণ মেলে ১৩১০বঙ্গাব্দে মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা 'সংগীত প্রকাশিকা' মাসিক পত্রিকার দুটি সংখ্যায়। মাঘ সংখ্যায় ও ফাল্গুন সংখ্যায় বলীন্দ্র সিংহদেব যথাক্রমে সংগীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের ও সংগীতাচার্য অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী রচনা করেন।

প্রাচীন গীতসংকলন প্রণয়নের ব্যাপারেও এই শতাব্দীতে বিশেষ উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। তার কারণ, বাংলা গানের বহুশতাব্দীবাহিত ঐতিহ্যের দিকে এই সময়ে বহুজনের আগ্রহদৃষ্টি প্রসারিত হয়। বিশেষভাবে সংগ্রহ ও সংকলিত হয় বৈষ্ণব পদগীতি। সংকলনগুলির নামে যে, 'রত্ন' শব্দটির প্রয়োগ আছে তার থেকেই গানগুলির প্রতি সংগ্রাহক ও সম্পাদকগণের সশ্রদ্ধ অনুরক্তির পরিচয় আছে। এ-জাতীয় সংকলনগুলি আত্মপ্রকাশ করে প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে। প্রধান গীতসংকলন-গুলির এক কালানুক্রমিক তালিকা এখানে সংযোজিত করা হল।

গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক বা সংকলয়িতার নাম
গীতরত্ন	১২৪৪	রামনিধি গুপ্ত
কমলাকান্ত পদাবলী	১২৯২	শ্রীকান্ত মল্লিক

প্রেমসংগীত	১২৯৪	
গুপ্তরত্নোদ্ধার	১৩০১	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতরত্নমালা	১৩০৩	অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
গীতাবলী	১৩০৩	বৈষ্ণবচরণ বসাক
প্রীতিগীতি	১৩০৫	অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
সাধক সংগীত	১৩০৬	কৈলাসচন্দ্র সিংহ

তালিকাটি নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ, কিন্তু গীতসংকলন প্রণয়ন করবার এই প্রবণতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। তার থেকে বোঝা যায়, এ-জাতীয় সংকলন প্রণয়নের পশ্চাদপটে বাঙালির তাৎক্ষণিক ভাববিলাস ছিল না, এই প্রবণতা বস্তুত এক বৃহৎ ভাবান্দোলনের প্রতীকস্বরূপ।

সংগীত-বিষয়ক পত্রিকা

বাংলাগদ্যে লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। প্রথম বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। 'দিগদর্শন' বা 'সমাচারদর্পণ' প্রভৃতি প্রথমদিকের কয়েকটি শিশু পত্রিকাকে সূত্র করে অচিরে বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব ও আদর্শগত সংঘাত-সংগ্রাম শুরু হল। তারফলে একাদিক্রমে আরো অনেকগুলি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম যুগসমস্যা ছিল বিভিন্ন ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্ব। একদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে নবাগত ইংরাজদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা, আরেক দিকে নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্রহ্মসমাজের প্রচার এবং সনাতন হিন্দুধর্মের সমর্থকগণের ভাবান্দোলন। ত্রিধাবিভক্ত এই ধর্মাদর্শগত সংগ্রাম রূপায়িত হতে লাগল প্রত্যেক দলের নিজ নিজ পত্রিকার মাধ্যমে। সেইজন্য প্রাথমিক বাংলা সাময়িক পত্রগুলি ধীরে ধীরে বিতণ্ডার অস্ত্র হয়ে উঠল। অবশ্য সেই প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের নেপথ্যে দেশ ও জাতির কল্যাণচিন্তার একটি অলক্ষ সদিচ্ছা অন্তর্লীন ছিল, ধর্ম ও দল নির্বিশেষে। ক্রমশ বাংলার শিক্ষিত সমাজে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্যাদর্শ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে দল ও মতের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেল পত্রিকার সংখ্যাধিক্য সেই পরিমাণে হল। কালক্রমে অবশ্য বাংলা সাময়িকপত্রের এই যুযুধান অস্থিরতা কেটে গিয়ে সুস্থ ও গভীর গঠনমূলক কর্মে নিয়োজিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সূত্রে শিক্ষিত বাঙালির মননচিন্তা, মহৎ ভাবাদর্শ, মানবিকতার উন্নত সাধনা, সাহিত্যের নবরূপ প্রভৃতি বিকশিত হয়। বাংলাগদ্যের বিকাশেও সাময়িকপত্রের ভূমিকা নিগূঢ়।

বাংলা সাময়িকপত্রের এই গুরুতর কর্মপ্রয়াসের পাশাপাশি আরেক ধরনের লঘুস্বভাবের সাময়িকপত্র বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। মূলত উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত নানা বিচিত্র ধরনের পত্র-পত্রিকা, অনেকটা ফ্যাসানের মতো, সচল ছিল। রঙ্গতামাশার পত্রিকা, নাটক ও নাট্যমঞ্চ-সংক্রান্ত পত্রিকা, এমনকি পশুদের সম্পর্কে একটি পত্রিকা, 'পশ্বাবলী'র খবর পাওয়া যায়। এই জাতীয় বিচিত্র ভাবধারার তবঙ্গেই সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অচিরে আরো অনেক সংগীত-পত্রিকা বেরোতে থাকে, তার সবটাই কিছু ফ্যাশনের টানে আসেনি। বরং সংগীত সম্পর্কে গভীর মনস্কতা ও অন্যান্য নানা যুগোপযোগী চিন্তাধারা যেসব পত্র-পত্রিকায় লক্ষ করা যায়। সেইজন্য এ-সিদ্ধান্ত অসংগত নয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতক্ষেত্রে নব-ভাবনার টানে সংগীত-পত্রিকাগুলি অন্তর্ভুক্ত তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ করে। প্রথমত, নিছক রঙ্গতামাশা বা জন-মনোরঞ্জন সম্পর্কে পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ; দ্বিতীয়ত, পত্রিকাগুলি অবলম্বন করে সংগীত-ক্ষেত্রে বিতণ্ডা সৃষ্টির অনিচ্ছা। তৃতীয়ত, গানের স্বরলিপি প্রকাশ, নানা জাতীয় গান সংগ্রহ, সংস্কৃত ভাষায় লেখা সংগীতের

কোশগ্রন্থগুলির অনুবাদ, সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধরচনা প্রভৃতি সংপ্রয়াসের সাহায্যে দেশীয় সংগীতের উন্নয়ন ও প্রচারব্রত। সংগীত সম্পর্কে উৎসাহী নানা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ ও পোষকতায় এই জাতীয় সংগীত- পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রমশ এই জাতীয় পত্রিকার উদ্যমে সংগীত-আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে এবং সমকালীন অন্যান্য বিষয়ক পত্রিকাতেও সংগীতপ্রসঙ্গ সংযুক্ত হতে থাকে কিংবা ক্রোড়পত্ররূপে স্বীকৃত হতে থাকে। 'তত্ত্ববোধিনী', 'সাধনা', 'ভারতী' প্রভৃতির মতো সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে সংগীত প্রসঙ্গের অর্ন্তভুক্তি নিঃসন্দেহে বাংলা সংগীতের নবভাবনার পরম স্বীকৃতি।

বস্তুত, যে,-কোনো দেশের সংগীতকলার মানোন্নয়ন. প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যাপারে সংগীত-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়। যে-জার্মান সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব আজ বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েছে তার মূল্যায়ন ও প্রচারে সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিল ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ম্যাথেসন-এর 'Musica Critica 'এবং ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে টেলম্যান্ -এর 'Der Getreve Musik-Meister' নামে দুইটি জার্মান পত্রিকা। ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত 'Quarterly Musical Magazine' (প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) এবং নিউ-ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ 'The Musical Quarterly'(১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রুডলফ্ স্কিরমার প্রতিষ্ঠিত) অথবা সম্প্রতিলুপ্ত 'Penguin Music Magazine' আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে সংগীত সম্পর্কে নিত্যনতুন চিন্তাধারা ও সম্ভাবনাকে বারবার লোক-সমক্ষে হাজির করেছে। কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সংগীত-নায়ক কোনো সংগীত-পত্রিকাকে আশ্রয় করে তাঁর মতবাদ ও সৃজনকর্মবিষয়ে মনের ভাবকে অর্নগলিত করেছেন, তার ফলে পরবর্তীকালে সংগীত পিপাসুরা অনেক মূল্যবান সূত্র পেয়েছেন। উদাহরণত উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত জার্মান সংগীতজ্ঞ হুগো উল্‌ফ-এর নাম, যিনি জার্মানীর 'Wiener Salonblath' নামে সংগীত-পত্রিকায় রোমাণ্টিক সংগীতের বিরুদ্ধে আরোচনার ঝড় তুলেছেন। সংগীত-পত্রিকা কেমনভাবে একজন মহান শিল্পীকে সকলের সামনে পরিচিত করে দেয় তার অবিস্মরণীয় বিবরণ বহন করেছে জার্মানীর 'Wiener Salonblath' পত্রিকা। পত্রিকা-সম্পাদক বিশ্ববিশ্রুত সুরকার রবার্ট শ্যুম্যান এই পত্রিকাতেই New Path প্রবন্ধের মাধ্যমে জোহানেস ব্রাহমসের সংগীত প্রতিভাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লিখেছেন :

> I thought that sooner or later someone would and must appear, destined to give ideal expression to the spirit of the times ; one who could not gradually show the development of his genius, but who , like Minerva, would spring fully armed from the head of Jove. And he has come, a young blood at whose cradle Graces and Haroûs kept watch. His name is Johannes Brahms. He bears all the inner characteristics and outword signs that Proclaim that he is one of the elect.[১২]

শ্যুম্যানের এই স্বাগত-প্রবন্ধ কীভাবে জোহানেস্ ব্রাহম্‌সের শিক্ষাজীবনকে নতুন পথে পরিচালিত করেছিল তার বিবরণ[১৩] যেমন আকর্ষণীয় তেমনিই অভিনব।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত-পত্রিকাগুলি আর্ন্তজার্তিক সংগীতক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয় না হলেও (বাংলা ভাষায় সীমাবদ্ধতায় যা অসম্ভব) এই দেশের সংগীত-ভাবনা ও কর্মরূপায়ণের প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। অবশ্য এখনকার শিক্ষিত মানুষ যেইসব পত্রিকার সক্রিয় কর্মসাধনের সংবাদ সম্পূর্ণত অবগত নন এবং পত্রিকাগুলির নামও সম্ভবত অনেকে জানেন না। এর কারণ হয়তো, সংগীত

[১২] *Brahms*. by Ralph Hill. Duckworth. London. pp 35-36

[১৩] দ্রষ্টব্য : *Schumann*. by André Boucoure chliev. Evergreen Profile Book 2. New York

সম্পর্কে বর্তমান কালের বাঙালির অসামান্য নিরুৎসুক স্বভাব কিংবা অন্যান্য প্রসঙ্গে অতি উৎসাহ। যাই হোক, বাংলা সংগীতের নবরূপায়ণের বাতাবরণে বাংলার সংগীত-পত্রিকাগুলি যে সকল ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় ছিল : ১) বাংলা সংগীতের প্রচার;২) স্বরলিপি-পদ্ধতির স্বপক্ষে যুক্তি ও জনমত সৃষ্টি;৩) সংগীত-সংক্রান্ত প্রামাণিক কোশগ্রন্থ-গুলির অনুবাদ;৪) ইউরোপীয় ও বিশেষত বিলাতি সংগীতের সুর ও ঢং বাংলা সংগীতে গ্রহণ করার অনুকূলে সংগ্রাম; ৫) লুপ্তমান ও বিস্মৃতপ্রায় গানের সংগ্রহ; ৬) বাংলা ও ভারতের বিশিষ্ট সুরশিল্পীদের জীবনীরচনা এবং ৭) সংগীত-সমালোচনার প্রবর্তন।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংগীত-পত্রিকার নাম 'সংগীত চিত্তসন্তোষ'। পত্রিকার পরিচালক ছিলেন উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৭০খৃষ্টাব্দ) মাসিক পত্রিকারূপে এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু অল্পদিন চলে বন্ধ হয়ে যায়।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের উদ্‌যোগে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে (ইং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ) 'সংগীত-সমালোচনী' প্রকাশ পায়। সম্ভবত এটি শৌরীন্দ্রমোহনের 'মিউজিক অ্যাকাডেমি'র মুখপত্র ছিল। সম্পাদক প্রখ্যাত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। পত্রিকার আয়ুষ্কাল ছয়মাস।[১৪]

ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় অন্যান্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকাগুলিতে কিন্তু সংগীত-সম্পর্কিত প্রসঙ্গোক্তি ও আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। সেই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার শেষে অতিরিক্ত ছয় পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্রে সংযোজিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) লিখিত : 'সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী' এবং তার অনুষঙ্গে পাঁচটি ব্রহ্ম-সংগীতের স্বরলিপি।*

এর বেশ কয়েক বছর পরে ১৯৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'বালক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঠাকুর পরিবারের প্রতিভা দেবী 'সহজ গান শিক্ষা' এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় 'গান অভ্যাস' শিরোনামে স্বরলিপি প্রচারে সক্রিয় হয়েছিলেন। ঐ পত্রিকায় তৃতীয় সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩) লেখা 'বোম্বায়ের গানবাজনা' প্রবন্ধে ভিন্ন প্রাদেশিক সংগীত-ধারা সম্পর্কে বাঙালির নবজাগ্রত কৌতূহলের চিহ্ন রয়েছে। একাদশ সংখ্যায় মুদ্রিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙ্গালির গান' প্রবন্ধে নতুন যুগচিন্তা ও সংগীতের নবভাবনার চমৎকার পরিচয় আছে: 'ইংরাজি সংবাদপত্রই বল আর বাঙ্গালা মাসিক পত্রই বল, বাঙ্গালির সংবাদ, বাঙ্গালির গান কোথাও পাইবে না।...বাঙ্গালি একা থাকিয়া কিছু করিতে পারিত না, ইংরাজ আসিয়া তাহার দশা ফিরিয়াছে, তাহার মুখের ভাব আর একরকম হইয়াছে। এখন আবার ভারতবর্ষের অন্য জায়গা হইতে স্রোত বাহিয়া বঙ্গদেশে যাইতেছে। বাঙ্গালির গান ভারতবর্ষের গান হওয়া চাই, তবেই সে গান টিকিবে।' প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর্তব্য যে, 'বালক' পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত, হার্বার্ট স্পেনসর-প্রভাবিত 'সুরে নাটক' *বাল্মীকিপ্রতিভা* ও *কালমৃগয়ার* স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল।

---

* 'সংগীত-চিত্তসন্তোষ' পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায়নি। এটি সর্বাঙ্গীণভাবে সংগীত পত্রিকা কিনা তাতে সংশয় আছে।

১৪ 'এ-পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংগীত পত্রিকা।' বাংলা সংগীত পত্রিকা পরিচয় : বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সংগীতচর্চা' জানুয়ারী ১৯৮৮

* পরিকল্পিতভাবে স্বরলিপির ব্যবহার অবশ্য শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রথম নাটক 'রত্নাবলী'র সংগীত পবিচালক হিসেবে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষেত্রমোহন এই স্বরলিপি তৈবি করেন। তবে এই স্বরলিপি ছাপা হয়নি। বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা স্বরলিপির বই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধায়ের 'বঙ্গৈকতান' ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিতহয়।

তথ্যসূত্র : 'সংগীত চর্চা' এপ্রিল-জুন ১৯৮৫

'বালক' পত্রিকার মতো সংগীত-সচেতনতা, সম্ভবত যুগবৈশিষ্ট্যবশত, সমকালের অন্যান্য সাময়িক পত্রেও লক্ষ করা যায়। এই সূত্রে স্মরণীয় যে, 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় 'সহজে গানশিক্ষা' এবং 'সংগীতশিক্ষা' নামে ধারাবদ্ধ স্বরলিপি প্রচার নিয়মিত চলেছে। এই বিভাগটি পরিচালনা করতেন ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী। স্বরলিপি প্রকাশ ব্যাপারে এই পত্রিকার সক্রিয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় বর্ষার গানের স্বরলিপি, মাঘ সংখ্যায় বেদগানের, আষাঢ় সংখ্যায় মহীসূরী গানের স্বরলিপি প্রভৃতির মধ্যে। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে নতুন অংশত একটি সংগীত পত্রিকা 'গান ও গল্প' প্রকাশ পায়। পত্রিকাটিতে কিছু গান ও গল্প মুদিত হয়েছিল। গানগুলিতে রাগ ও তালের নির্দেশ থাকত কিন্তু স্বরলিপি থাকত না। এরপর ১২৯৭ বঙ্গাব্দে দুর্গাদাস দে-র প্রকাশনায় 'মজলিস' নামে যে-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তার নামপত্রেও যদিও উল্লেখ ছিল 'বৈঠকী আলাপ, সঙ্গীত, কবিতা, খোসগল্প, চরিত্র সমালোচন, চুটকী, রঙতামাসাপূর্ণ মাসিক পত্রিকা', তবু শেষপর্যন্ত সংগীতই এ-পত্রিকায় প্রধান স্থান পায়। তার কারণ, প্রকাশক সর্বপ্রকার সংগীত-সংগ্রহে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। পত্রিকার 'গোড়ার কথা'য় তিনি নিবেদন জানান:

> সরস সঙ্গীতের মধ্যে প্রেমসঙ্গীতই, বোধহয়, বিশেষ চিত্তরঞ্জক; সুতরাং, নির্বাচনকালে তৎপ্রতিই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। অন্যান্য সঙ্গীত যে আদৌ থাকিবে না, এমন কথা বলিতেছি না। প্রথমে আমরা ভালো ভালো পুরাতন সঙ্গীত সকল গ্রহণ করিব।

বাংলা-সংগীত পত্রিকার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)। ডোয়ার্কিন কোম্পানির অর্থানুকূল্যে তিনি ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) 'বীণাবাদিনী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে সংগীত প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যাপারে এই পত্রিকার একটি স্থায়ী অবদান রয়েছে। মাত্র দুই বৎসরে 'বীণাবাদিনী' বাংলার সংগীতসমাজে বিশেষ উন্মাদনার সঞ্চার করে। পত্রিকাটির ঐতিহাসিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, কেননা স্বরলিপি পদ্ধতির সরলীকরণের যুক্তিসমূহ এই পত্রিকার পাতাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং সেইসূত্রে বাংলাদেশের সংগীতামোদী জনসাধারণকে আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির অনুরাগী করে তোলেন। তাঁর প্রবর্তিত এই আকারমাত্রিক পদ্ধতিই বাংলা সংগীতে গৃহীত হয়েছে এবং সর্বাধুনিক কালেও প্রচলিত রয়েছে। সম্পাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সব রকমের গানের স্বরলিপি সংগ্রহের ব্রত নিয়েছিলেন। 'বীণাবাদিনী'-র আশ্বিন, ১৩০৪ সংখ্যায় 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশে দেশ ও জাতির সংগীত সংরক্ষণের আকাঙক্ষা তাঁর ভাষায় গভীর আন্তরিকতায় স্পন্দমান। তিনি লিখেছেন :

> স্বরলিপি লেখক মহাশয়দিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই, শ্যামাবিষয়ক গান, কৃষ্ণ বিষয়ক গান, বাউলের গান, কীর্তনের গান, যাত্রার গান, থিয়েটারের গান, হাসির গান, হিন্দুস্থানী গান প্রভৃতি বিবিধ প্রকার গানের মধ্যে, যিনি যাহা জানেন, তাহার স্বরলিপি করিয়া যদি তাঁহার অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেন তবে বড়োই ভালো হয়। হিন্দুসংগীত লিপিবদ্ধ করিয়া উহার স্থায়িত্ববিধান করাই বীণাবাদিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

অন্যান্য সংগীত পত্রিকার মতো 'বীণাবাদিনী'তেও নিয়মিত স্বরলিপি ছাপা হত; অধিকন্তু সংগীত সম্পর্কে গভীরতর চিন্তাভাবনাবাহী রচনাও লক্ষ করা যায়। বস্তুত, সংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক এই উভয়বিধ

বিষয়ে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয় 'বীণাবাদিনী'-তে।[১৫] ১৩০৪ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যায় 'রাগের মূর্চ্ছনা, স্বর-মিল রহস্য' প্রবন্ধ এবং আশ্বিন সংখ্যায় 'তাল কাহাকে বলে' প্রবন্ধ গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় বহন করেছে।

তৎকালীন বাংলা সংগীতে বিদেশাগত অর্কেস্ট্রা রীতি সম্পর্কে নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনার আভাস 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমবেত-বাদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য' প্রবন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে,

> বহুমিলের অভাবে, আমাদের সমবেত বাদ্য, অনেক সময়ে একঘেয়ে হইয়া পড়ে। উহাতে আর একটু বিচিত্রতা সঞ্চার করা অবশ্যক। বহুমিলের অভাবে, বিচিত্রতা সম্পাদনের একটি উপায় আছে। কোনো একটি বিশেষ রাগরাগিণী বাজাইবার সময়, ঝাঁপতাল, সুর-ফাঁকতাল, একতালা, কাওয়ালি প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের তালের ফেরতায় যদি সেই সুরটি সমবেত বাদ্যে বাজান যায়, তাহা হইলে উহার একঘেয়ে ভাব অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে।

'বীণাবাদিনী' পত্রিকা দুই বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়; তার কারণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে 'ভারত সংগীত সমাজ' স্থাপন করেন এবং ত্রিপুরার রাধাকিশোর মাণিক্য দেববর্মনের অনুরোধে সংগীত সমাজের মুখপত্ররূপে 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। সুতরাং 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' যদিও ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আত্মপ্রকাশ করে, তবু তা 'বীণাবাদিনী'র অনুপূরক তথা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতের নবভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পত্রিকাটি দশ বছর চলেছিল। 'সঙ্গীত প্রকাশিকা'র সম্পাদক রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা সংগীতের কোশগ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য' শিরোনামে স্পষ্টত সে কথা বলা হয়েছিল:

> আজকাল, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ-সকল অনুবাদিত হইয়া জন-সাধারণের মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত সঙ্গীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সংগীত-নির্ণয়; সঙ্গীত-দর্পণ, সঙ্গীত-দামোদর, রাগ-বিরোধ, রাগ-সর্বস্ব-সার, রাগার্ণব, নারদ সংহিতা, ধ্বনিমঞ্জরী, প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত-গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে—দুই একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র।...এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মূল ও অনুবাদ আমরা ক্রমশঃ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি।
>
> আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য—তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদদিগের পুরাতন গান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা এখনও প্রচলিত আছে তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা উচিত নয়; যাহাতে পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপি বদ্ধ হয়, সঙ্গীত-বেত্তা মাত্রেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সঙ্কল্প অংশত সার্থক হয়েছিল। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'র প্রথম সংখ্যা থেকেই সোমেশ্বর-কৃত 'রাগবিরোধ' গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদক ছিলেন পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

---

[১৫] অবশ্য গ্রন্থাকারে এই দুই বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল এর আগে। শৌরীন্দ্রমোহন ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত গ্রন্থাবলী প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য। তবে, ঐ বিষয়ে পত্রিকাকেন্দ্রিক discourse 'বীণাবাদিনী'তেই প্রথম শুরু হয়।

এছাড়া সারদাপ্রসাদ ঘোষ ধারাবাহিক ভাবে লিখতেন 'রাগ-রাগিণীর পরিচয়'। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' পুরনো সংখ্যাগুলিতে ইতস্তত নানা বিচিত্র ও মূল্যবান সংগীত সংক্রান্ত রচনা ছড়িয়ে আছে। সেগুলির বিষয় কখনও 'প্রথম শতাব্দীতে ভারতে সংগীত' অথবা 'সংস্কৃত ছন্দ ও সঙ্গীতের তাল' প্রভৃতি জটিল অথচ উপভোগ্য চিন্তায় সমৃদ্ধ। এগুলি একত্রে সংকলিত হলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত-সমালোচনার বিষয়বৈচিত্র্য ও আদর্শ দুই-ই পাওয়া যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সর্বশেষ যে-সংগীত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'আলাপিনী'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১ লা কার্তিক। এতে প্রধানত স্বরলিপি-প্রচার চলত। প্রথম সংখ্যার 'অবতরণিকা'য় বলা হয়েছিল :

> স্বরলিপি চর্চা ও অভ্যাস যতই বৃদ্ধি পাইবে সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে ততই মঙ্গল ও উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে। স্বরলিপির আলোচনা যাহাতে আরও বৃদ্ধি হয় এবং উহা দেখিয়া সহজে সকলে করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশ করা হইল।...প্রতি খণ্ডে দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া কেবল গানের স্বরলিপি থাকিবে। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদিও ইহাতে বর্ণিত হইবে।...স্বরলিপির অভাবে কোনো একটি গীতের সুর চিরকাল সমান সুরে স্থায়ী থাকে না, এইজন্য একই গান বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন সুরে গাহিতে শুনা যায়। অতএব যাহাতে স্বরলিপি চর্চা খুব বৃদ্ধি হয় সঙ্গীতপ্রিয় সকল ব্যক্তিই সেজন্য বিশেষ চেষ্টা ও সহায়তা করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

'আলাপিনী' পত্রিকার এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা ছিল ইংরাজি গান, আইরিশ পোল্‌কা প্রভৃতি জনপ্রিয় সুরের স্বরলিপি মুদ্রণ।

আগে উল্লেখিত হয়েছে যে, বিশিষ্টভাবে সংগীত-পত্রিকা না হয়েও যুগবৈশিষ্ট্যের কারণে উনবিংশ শতাব্দীর অনেক রকমের সাময়িক পত্রিকা সংগীত সম্পর্কে নানা আলোচনা ও মন্তব্যাদি প্রকাশ করে সমকালীন সংগীতের নবভাবনায় অংশ নিয়েছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রাচীন বাংলা গানের সংগ্রহগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। সেইসূত্রে কবিওয়ালাদের জীবনী ও রচনা এবং বিশেষত রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর সম্পর্কে সর্বপ্রথম তথ্যাদি পাওয়া গেছে। 'তত্ত্ববোধিনী'র সাংগীতিক প্রয়াসের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। আপাতত, এইপ্রসঙ্গে বাংলার সংগীতে নবভাবনার পরিপ্রেক্ষিত 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকা দুটির ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'ভারতী' ও 'সাধনা' এই দুটি পত্রিকাই ছিল প্রধানত সাহিত্যসম্বন্ধীয় উচ্চমানের সাময়িকপত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের সংগীত-সমালোচনা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পত্রিকা দুটি তৎকালীন সংগীত-আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। সত্যিকারের সংগীত সমালোচনা যাকে বলে, অর্থাৎ—সংগীতের উৎপত্তি, উপযোগিতা, স্বরূপসন্ধান ও অন্যতর শিল্পরূপের সঙ্গে সংগীতকলার সম্পর্ক নির্ণয় প্রভৃতি গূঢ় নানা বিষয়ে গভীর অর্ন্তদৃষ্টিময় প্রবন্ধ এখানেই সর্বপ্রথম এখানেই প্রকাশ হয়। আর সেই বিশেষ ধরনের আলোচনার অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রসঙ্গত মনে রাখা কর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবিরূপে বিশ্বস্বীকৃতি পেলেও গানের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশের সাধনা ও নিরীক্ষা তিনি বিশেষভাবে করে গেছেন। এই উপলক্ষে সংগীত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ও আদর্শ প্রবন্ধাকারে বারবার লিখে বোঝাতে হয়েছে।

দশম্ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল লেখক কাব্যের মাধ্যমে আত্মবিকাশের সাধনা করেছিলেন। অবশ্য সেই কাব্যের রূপায়ণ হত আবৃত্তিতে নয়, সুরে। কদাচিৎ সেই সুর আবৃত্তির

গদ্যধর্মকে মেনে নিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা সাহিত্যে এখানকার মতো সুরবিযুক্ত পাঠ্যকবিতা ও গানের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তই সম্ভবত প্রথম সুরবিযুক্ত পাঠ্যকবিতা লেখেন। অবশ্য তাঁর কবিদৃষ্টি বস্তুময় ছিল বলেই লিরিকের লাবণ্য সন্ধান তিনি আদৌ করেননি। তাঁর পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্র বাংলা কাব্যের দ্বিচারিতায় অস্থির ছিলেন ; সেইজন্য তাঁদের রচিত কাব্যের ইতস্তত গানের উপস্থিতি অথবা কবি-ধর্মে সংগীত-সংক্রাম লক্ষ করা যায়। কিন্তু যেহেতু তাঁরা কেউই একসঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ গীতিকার ছিলেন না তাই এ-জাতীয় সমস্যা তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে ব্যাহত করেনি, শুধু দ্বিধাগ্রস্ত করেছে এই মাত্র। অথচ, রবীন্দ্রনাথ একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ গীতিকার ছিলেন বলেই বাংলা কবিতার দ্বিচারী সমস্যাটিকে এড়াতে পারেন নি। তার ফলে, কবিতা ও গানের পারস্পরিক স্বরূপ, ঐক্য এবং বিরোধ প্রসঙ্গ তাঁর সৃষ্টি ভাবনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনায় কবিতা ও গান একই সঙ্গে উচ্ছ্রিত ও স্বীকৃত। কখনও তিনি কবিতার অনুক্ত কথাটুকু সুরের আভায় ব্যক্ত করেছেন, কখনও সুরের সীমাহীন ভাবের মধ্যে কবিতার সুনির্দিষ্ট রূপটি প্রক্ষেপ করে দেখতে চেয়েছেন। সংগীত সম্পর্কে তাঁর এই বিশেষ ধরনের নিরীক্ষা ও প্রয়োগসিদ্ধি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। বর্তমানে শুধু প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণীয় যে, তাঁর গান ও কবিতা বিষয়ে নানা পরীক্ষার ফলিত উদাহরণ *গীতবিতান*-এর অসংখ্য গানে ধরা পড়েছে কিন্তু সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাত্ত্বিক ঔপপত্তিক নানা সমস্যা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন 'ভারতী' ও 'সাধনা'র পৃষ্ঠায়। সেগুলি সংকলন করে বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। প্রথমত, একজন সার্থক লিরিক কবি কেন গান লিখতে বাধ্য হলেন; দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতে নবভারনার সাধনা কেমন ভাবে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন ব্যক্তি-শিল্পীর সৃষ্টি পথকে সব রকম আকীর্ণ ধূসরতা থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আর, শিল্পীর ক্ষেত্রে মুক্তি মানেই আত্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নবচেতনার উদ্বোধনে একজন পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের স্পর্শ ছিল। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পর আকস্মিক ভাবে হার্বার্ট স্পেনসরের এক প্রবন্ধ 'The origin and function of Music' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে সংগীত সম্পর্কে নবভাবনা জেগে ওঠে।[১৬] তার ফলে, একদিকে তাঁর সংগীত সৃষ্টি উৎসের নতুন দ্বার খুলে যায় 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কাল-মৃগয়া' প্রভৃতি রচনার সূত্রে; আরেকদিকে তাত্ত্বিক চিন্তা জেগে ওঠে। সেই তাত্ত্বিক চিন্তার প্রথম লিখিতরূপ 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধ। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সেটি পত্রস্থ হয়। সংগীত সম্পর্কে সেই প্রবন্ধে যে, নবভাবনা ব্যক্ত হয়েছিল তা বাংলা গানে যুগান্তরের বার্তাবাহী। তিনি লিখেছেন:

> সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গ হীনতা থাকিয়া যায়, সঙ্গীত আর কিছু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।...আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই।...আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সমর্থনে পরের সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় (আষাঢ় ১২৮৮) রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' নামে প্রবন্ধ লেখেন। 'আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতমরূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সঙ্গীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি'—এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

[১৬] এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ড পৃ. ৯৭ এবং *জীবনস্মৃতি* : রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৩৮২

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'সংগীত ও কবিতা', প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধে তাঁর সংগীত বিষয়ক নবভাবনা সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন:

আমরা কবিতাকে যে চক্ষে দেখি, সঙ্গীতকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখিব। বলাবাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে আমরা শুধুমাত্র কথার সমষ্টিস্বরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্পর্ক বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সঙ্গীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সঙ্গীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগরাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সঙ্গীতও তেমনি ভাবের ভাষা।

'ভারতী'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের লেখা সংগীতসক্রান্ত অজস্র রচনা পড়লে, সংগীতের ক্ষেত্রে একটি সমগ্র যুগ এবং সেই যুগের এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশের অদম্য অস্থিরতা অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্যে সমকালীন সাংগীতিক-সংস্যার ইঙ্গিত ও সমাধানের চেষ্টা আছে। অবশ্য সে-সমাধান নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ্যনির্ভর। তাতে পরিতাপের কারণ নেই, কেননা সমগ্রের অভিপ্রায় প্রায়শই একজনের মধ্যে রূপায়িত হতে থাকে।

'ভারতী'র মতো 'সাধনা' ও 'সবুজপত্র' পত্রিকাতেও[১] রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সংগীতবিষয়ক রচনা বা সংগীত-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক মন্তব্য আছে। সেগুলির মধ্যে থেকে একটি প্রবন্ধের একাংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

উচ্চারণ হিসাবে বাংলা ভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তরভূমির মতো সর্বত্র সমান।...শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাংলা ভাষায় অসম্ভব। বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়।...এই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া আর কবিতা নাই বলিলেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যে রয়েছে বাংলা কবিতা সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকার সূত্র। এই ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের প্রকৃষ্ট মূল্য নির্ধারণ সম্ভব বলে মনে হয়।

সৌভাগ্যক্রমে, সংগীত সম্পর্কে এমনই মুক্ত চেতনা ও চিন্তার নবভাবনা এই সময়ে অন্যান্যদের লেখাতেও লক্ষ করা যায়। ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির (১৮৬৩-১৯১৫) প্রবন্ধ 'সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা' এই প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় উদাহারণ। * ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদশকেই উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ভাবত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝতে পেরেছিলেন :

সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা দুই বিষয়ের দুইটি মূল—শব্দ ও বর্ণ (আলোক)। তরঙ্গের রাজ্যে ইহার প্রতিবেশী।

---

[১] আরও অনেক পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সংক্রান্ত রচনাবলী এখন একত্রিত হয়ে বেরিয়েছে বিশ্বভারতী থেকে **সংগীতচিন্তা** বইতে।

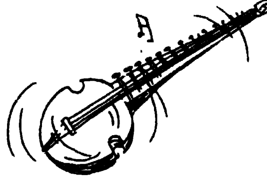
* উপেন্দ্রকিশোরের সংগীতবিষয়ক বহু রচনা ছড়ানো আছে পত্রপত্রিকায়। তার এক অসম্পূর্ণ তালিকা পেশ করেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ তাঁর 'উপেন্দ্রকিশোর : শিল্পী ও কারিগর' নিবন্ধে ('এক্ষণ', শারদ ১৩৯১)। যেমন, স্বরলিপি ও এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ভারতীয় সঙ্গীত ('দাসী' ১৮৯৫), বেহালা ('প্রদীপ' জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন ১৩০৭), ভারতীয় সঙ্গীত ('প্রবাসী' মাঘ ১৩১৯, ভাদ্র ১৩২০, বৈশাখ ১৩২৩)।

এই তরঙ্গমূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়, ...সাত সুর;সাত রঙ। লোহিতাদি সাতটি রঙ, ইহারা ক্রমন্বয়ে চিত্রাবিদ্যার 'সা রি গা মা'’র স্থানীয়।...চিত্রের পক্ষে যেমন স্থান, সঙ্গীতের পক্ষে তেমনই সময়।...সীমারেখা চিত্রের পক্ষে যাহা করে, তাল সঙ্গীতের পক্ষে তাহা করে। ...কবিতা উভয়েরই সঙ্গিনী।

উদ্ধৃত রচনাংশটুকু পড়লে বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতের নবভাবনা ক্রিয়াত্মক ও ঔপপত্তিক শাস্ত্রজ্ঞানে পরিসমাপ্ত না হয়ে সম্পূর্ণ ভাবাত্মক দৃষ্টিপ্রক্ষেপে সংগীতের প্রতিসন্ধানে প্রযুক্ত হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রজ্ঞার এই সমন্বয়ই রেনেশাঁসের মূলকথা।

সেইজন্যই মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতের নবআদর্শ সন্ধান, বিদেশী সংগীতের সংস্পর্শ, গীতরীতির রূপান্তর, অর্থাৎ সংক্ষেপে নবযুগের সংগীতরূপের উৎস-অগ্রগতি-পরিণতির সামগ্রিকতাটুকু তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে সার্থকভাবে মুকুরিত। সংগীত পত্রিকাগুলি সেইসূত্রে আরও স্পন্দমান এবং নিহিত সৃষ্টিশীলতায় মহৎ।

২



ভক্তি আন্দোলন : শাস্ত্রের চেয়ে গানটাই বড়

ভারতীয় ভক্তি আন্দোলন এবং সংগীত, বিষয়টি কঠিন। কঠিন এই অর্থে যে এখনো পর্যন্ত ভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাস সম্যকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি; তার কারণ ভক্তি আন্দোলনের যে বৃত্ত সেটা অনেক প্রসারিত বৃত্ত। দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু হয়ে মহারাষ্ট্র হয়ে গুজরাট হয়ে, রাজস্থান হয়ে পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ হয়ে, এদিকে অসম এবং বাংলা—এই এতবড় একটা জায়গা ধরে যে ভক্তি আন্দোলন হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত, তার নানা ভাষা নানা মত এবং ভাষাগত বিভাজনের কারণে ভক্তি আন্দোলনের মূল যে আকর গ্রন্থগুলি, সেগুলি সব আমাদের আয়ত্তাধীন হয়নি। ভক্তি আন্দোলন প্রথম যাঁরা শুরু করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়। 'আর' মানে নিমগ্ন। বিশেষ ব্যক্তিকেই বলা যায় আলোয়ার। অর্থাৎ ঈশ্বরে নিমগ্ন। ধ্যানে নিমগ্ন। সেই আলোয়ার সম্প্রদায় থেকে যে ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাদের ভাষা মালয়ালম, তেলেগু, তামিল, কন্নড়—সেই ভাষার মধ্যে তাদের ভাবনাটা আটকে ছিল বলে বহুদিন পর্যন্ত তা বাইরে প্রসারিত বা প্রচারিত হয়নি। পরে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে অনেকটা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আমাদের একজন পণ্ডিত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, যিনি বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত তিনি নন, আর একজন বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলি শিখে সেখানকার মূল টেক্সটগুলো সেই ভাষায় পড়ে বাংলায় একটি বই লিখেছেন। সেটিই একমাত্র বই। কিন্তু মারাঠি ভাষা, গুজরাটি ভাষা, রাজস্থানি তাছাড়া যে কবির-বাণী সন্ত, কবিরের যে ভাষা তার ভেতরকার বীজক, ভাষার ভেতরকার যে গূঢ় অর্থ এবং মন্ত্র সেই সব ভেদ করা খুব কঠিন। সেখান থেকে আন্দোলনটা চলে গেছে অসমে শঙ্করদেবের যে-রচনা তার মধ্যে, তার ভাবনার মধ্যে। তার পরে আমাদের শ্রীচৈতন্যদেব। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের ভক্তি আন্দোলনের যে মস্ত বড় একটা দিক ছিল গান, এদের সমস্ত অনুভব, এদের সমস্ত ভাবনা, জীবনের সবকিছু স্তরে স্তরে এদের যে-অভিজ্ঞতার উত্তরণ, সেগুলো সবই তাঁরা গান দিয়ে বুঝিয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই এঁদের কাছে শাস্ত্রের চেয়ে গানটাই বড়।

শাস্ত্রের চেয়ে কেন গান বড় সেটা বলতে গেলে আমাকে রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী শোনাতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শাস্ত্রের যে ভগবান ধর্মে কর্মে ব্যবহারে লাগে, যিনি সনাতনপন্থী ধার্মিক লোকের ভগবান, তাকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে। তার জন্য অনেক মন্ত্রতন্ত্র। আর যে ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য করে দেখেছে যিনি অহৈতুক আনন্দের ভগবান তাকে নিয়েই গান গাওয়া যায়।' এই যে লেনদেন ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে, যেখানে সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সেখানে স্তোত্রের আড়াল না রেখে গানের আত্মার মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করা যায়। এখন এই গানের সংজ্ঞা নানারকম হতে পারে। আমরা যে-গান গাই, তা খুবই ব্যক্তিত্বপূর্ণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে পারে, আবার সামূহিক গান হতে পারে, সবাই মিলে আমরা গাইলাম। লক্ষ করে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের একটা মন্তব্য। উনি আমাদের ভারতীয় গানকে বলেছেন 'আমাদের নির্জন এককের গান' আর ইউরোপের 'স্বজন লোকালয়ের গান।' ইউরোপের সমস্ত গানই হচ্ছে সামূহিক, সম্মেলক। চার্চে গিয়ে আমরা দেখি চার্চে গান হচ্ছে চার্চ মিউজিক এবং সেটা হচ্ছে মাস, মোটেট ও ক্যানট্যাটা। প্রধানত এইগুলো হচ্ছে ইউরোপীয় চার্চ সংগীত। সেগুলো সবাই মিলে গাইতে হয় এবং সেটা প্রার্থনার একটা অঙ্গ। বাংলায় যখন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছে তখন ব্রহ্মমন্দিরে যে সমবেত গানের একটা রেওয়াজ তৈরি হয়েছিল, সেখানে চার্চ মিউজিকের একটা প্রভাব আছে। কিন্তু আমাদের গান হচ্ছে নির্জন এককের গান। সে গান আমাদের নিজেদের জন্যেই গাওয়া। আমাদের নিজের অন্তরাত্মার জন্য গাওয়া। আমরা যাকে চাইছি সেই প্রার্থিতের জন্যে গাওয়া, তাঁকেই নিবেদন করা। সেই জন্য সেই গানের গভীরতা অনেক বেশি। তাতে অলংকৃতি বা তাতে দেখনদারি কম। এখন আমাকে যদি অনেক মানুষকে গান শোনাতে হয় তখন আমাকে দেখাতে হয় আমার নিজস্ব ক্রিয়া-কৌশল কতটা, আমি কতটা গান জানি, আমি তার মধ্যে একটু তান দিলাম, একটু আখর দিলাম। কিন্তু আমি যখন আমার নিজের প্রেয়কে গান শোনাব, আমি যখন আমার ঈশ্বরকে শোনাব, আমার ব্যক্তিগত পার্সোনাল গড তাঁকে যখন আমি শোনাব তখন আমি আমার সবচেয়ে আন্তরিক ভাষাতেই শোনাব, সেইজন্য কবির একটা কথায় বলেছেন, 'সংস্কৃত কূপজল ভাষা বহতা নীর' অর্থাৎ সংস্কৃত হচ্ছে কূপজলের মধ্যে বদ্ধ, ভাষায় বদ্ধ। আর 'ভাষা বহতা নীর' মানে মাতৃভাষা। যার যেটা নিজস্ব মাতৃভাষা সেটা হচ্ছে বহতা জলের মতো। তার মধ্যে কোনো মালিন্য নেই। সেইজন্য সংস্কৃত ভাষা যদিও আমাদের শাস্ত্রের ভাষা, সংস্কৃত ভাষায় আমাদের প্রচুর স্তোত্র লেখা হয়েছে, সংস্কৃত ভাষা আমাদের সাধনারও ভাষা। কিন্তু যে-সমস্ত ভক্তিপন্থী মানুষের কথা আমি বলব তাঁরা তাঁদের নিজস্ব রাজ্যভাষাতেই লিখেছেন।

যিনি গুজরাটি, তিনি গুজরাটি ভাষাতেই লিখেছেন। যিনি মালয়ালম, তিনি মালয়ালম ভাষায়, তামিল, তেলেগু প্রত্যেকে নিজের ভাষাতেই লিখেছেন। মীরাবাঈ যে গান লিখেছেন, আমরা ভাবি যে তিনি হিন্দিতেই লিখেছেন, আসলে তা নয়। মীরাবাঈ-এর যে ভাষা, সেটা হচ্ছে রাজস্থানি লৌকিক ভাষা, তার সঙ্গে আছে কিছুটা ব্রজভাষা, মিশ্রব্রজভাষা। অসমের যে শঙ্করদেবের গান, তা প্রধানত অসমিয়া ভাষায়। পাঞ্জাবের যে ভাষা, তাতে নানকের গান আছে। কবিরপন্থার গান আছে উত্তর ভারতীয় ভাষায়। এই ভাষার কাজ হল সংস্কৃতের আবরণকে ভেদ করে, নিজের আত্মকণ্ঠকে উপাস্যের সামনে হাজির করা। এটা ভক্তি আন্দোলনের মস্ত বড় একটা দিক।

এবার খুব পরিষ্কার করে বলা যাক, আমরা যাঁকে প্রার্থনা করব, তাঁকে যখন ডাকব, তার যে মগ্নতা তাতে যদি সম্মেলক কণ্ঠধ্বনি না আসে, আমি যদি এককভাবে আমার গানকে শোনাতে চাই, তা আমার মতো করেই গাইব। ধরা যাক একটা কৃষ্ণ উপাসনার গান। কিছুই না, কতগুলো শব্দ। এর মধ্যে আর কোনো শব্দ নেই। শুধু ঈশ্বরের নাম গাঁথা আছে। 'অচ্যুতম্ কেশবম্ রামনারায়ণম। কৃষ্ণদামোদরম্ বাসুদেবম্

হরি/শ্রীধরম্ মাধবম্ গোপিকাবল্লভম্ জানকীনায়কম্ রামচন্দ্রম্ ভজে।'এই গানটা যখন আবেগঘন হচ্ছে তখন লয়টা বাড়িয়ে গাওয়া হচ্ছে। এই যে আমি আমার নিজের উপাস্যকে আমি আমার মতো করে গাইছি, এ তো কোনো মানুষের বিনোদনের জন্য নয়। কোনো মানুষকে খুশি করবার জন্য নয় এবং আমার এই একান্ত আহ্বানে আমার যদি মনের মধ্যে এরকম পরিপূর্তি আসে, যেন আমি তাঁকে পেলাম, সেটাই হচ্ছে ভক্তি আন্দোলনের মূল কথা। প্রপত্তি বা শরণাগতি এবং 'ভজ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন এই ভক্তি শব্দ, যার মানে হচ্ছে ভজনা। আমাদের শাস্ত্রে বলছে 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনং/অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্।'

বৈষ্ণবীর ভক্তি সাধনার যে-কটি পন্থা আছে তার মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে শ্রবণং—ঈশ্বরের কথা শুনতে হবে। তার পরেই কীর্ত্তনং—তাঁর কথা আমাদের কীর্তন করতে হবে। তাঁর কীর্তির কথা জানতে হবে। তারপর স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য। তাঁকে পেতে গেলে সবশেষের দিকে দাস্যভাব আনতে হবে। নিজেকে অবনত করতে হবে। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।' এই দাস্যভাবটা খুব দরকার। তারপর হচ্ছে সখ্যং। যার সঙ্গে দাস্যভাব করলাম, তার সঙ্গে আবার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে হবে। সবশেষে হচ্ছে আত্মনিবেদন। ভক্তির এই বিভিন্ন পন্থা। তার মধ্যে একটা বড় পন্থা হচ্ছে কীর্তন। সেইজন্য ভারতবর্ষের কীর্তন ভক্তি আন্দোলনের একটা বড় শস্ত্র। শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে এবং ওড়িশায় কীর্তন গাইতেন এবং শঙ্করদেব আসামে যে কীর্তন গাইতেন তার নাম হচ্ছে নামঘোষাকীর্তন। এরকম তেলেগু কীর্তন বলে দক্ষিণ ভারতে এক রকম কীর্তন আছে। যে-তেলেগু কীর্তনের ধারায় সবশেষ বিখ্যাত যিনি গীতিকার-সুরকার তিনি ত্যাগরাজ। সেই ত্যাগরাজের গান দক্ষিণ ভারতে খুব জনাদৃত। আমরা রবীন্দ্রনাথের গানকে যেরকম মনে করি, ওঁরা ত্যাগরাজকে সেরকম মনে করেন। তাই কীর্তন—এই গান সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা আধ্যাত্মিকতার গান, আবার আত্মশক্তি অর্জনেরও গান। কীর্তন গাইলে যেমন হবে ঈশ্বরের উপলব্ধি, তেমনি কীর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা সাময়িক শক্তি ও ভেতরে অন্তঃশক্তি তৈরি করতে পারে। চৈতন্য যখন নবদ্বীপে তাঁর সাধনা শুরু করেছিলেন, তখন কাজি এবং ব্রাহ্মণরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি কীর্তনকে একক কণ্ঠে না-রেখে সমস্ত নবদ্বীপবাসীকে রাস্তার মধ্যে টেনে এনে, খোল বাজিয়ে, খঞ্জনি সহযোগে, মন্দিরা সহযোগে সামূহিক গান গাইতে গাইতে যখন যেতেন, তখন সেটা ব্যক্তিগত গান না থেকে হয়ে যেত এক সংগঠন। সেই সংগঠনের মূল কথা হচ্ছে ভক্তির তেজে, ভক্তির তাপে একটা দেশকে বিগলিত করতে হবে এবং রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে জনশক্তিকে। কীর্তনের মধ্যে সেই অসম্ভব ভালো দিকটা আছে। আর সেই জনশক্তির মূল সুরটা রয়েছে কীর্তনের সুরের মধ্যে।

সেইজন্য দেখছি যে, আমাদের যাঁরা ভক্তি আন্দোলন করেছিলেন, তাদের দু'রকম পথ ছিল—ঈশ্বরকে কেউ নির্গুণভাবে উপাসনা করেছেন কেউ আবার সগুণভাবে উপাসনা করেছেন। যেমন—তুলসীদাস। তুলসীদাসের রচনা হচ্ছে সগুণ ভক্তির একটা নমুনা। কিন্তু কবিরের রচনার মধ্যে আমরা যা পাই তা নির্গুণ ভক্তির একটা উৎসার। আবার বেশিরভাগ জায়গাতেই এই সমস্ত ভক্তিসাধক যা রচনা করেছেন, তার মধ্যে নিরাকার ভাবটাই প্রাধান্য পেয়েছে। দেবতার কোনো আকার, গঠন, মূর্তিকে তাঁরা মূর্ত করেন নি। তবে পন্ধারপুর বলে মারাঠা গুজরাটের মাঝখানে যে জায়গাটা, সেখানে 'বিঠ্ঠল' বলে এক দেবতা আছে 'বিঠ্ঠল' কৃষ্ণের আর একটা নাম। সেই 'বিঠ্ঠল'-এর ভক্ত যাঁরা, তাঁরা সাকার উপাসনা করতেন। কিন্তু তাঁরাও ভক্তিবাদী। এইখানে গুজরাটে ভারল বলে একজন গীতিকার ছিলেন, যিনি ভক্তি আন্দোলনের একজন মস্ত বড় সাধক। সেই ভারল এক ধরনের গান লিখেছিলেন, সেই গানকে বলা হয় 'গরবি'। এই

'গরবি' গানের সঙ্গে মেয়েরা নাচত কাঠি নিয়ে। সেই নাচের নাম গরবা নাচ। এই গরবা নাচের উৎস কিন্তু গরবি গান। তাই বলা যায় যে, ভক্তি আন্দোলন যে শুধু ভক্তি আন্দোলনকে উৎসারিত করেছে আর সমস্ত দেশের মধ্যে জ্ঞানবাদ ও কর্মবাদের মধ্যে ভক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা নয়, তার পাশাপাশি কতকগুলো মিউজিক্যাল ফর্ম তৈরি করেছে যা আমরা আগে কখনো পাইনি। যেমন দোঁহা। এটি ভক্তি আন্দোলনের মস্ত বড় অংশ, আর একটা হচ্ছে বীজক। আর একটা ভজন। আর একটা কীর্তন। এরকম বিভিন্ন ফর্ম। এই ফর্মগুলোকে খানিকটা শাস্ত্রীয় বলা যায়, আবার খানিকটা লৌকিকও বলা যায় এবং সেই গানের যে চেহারা, তাকে যদি আমরা সাংগীতিকভাবে বিশ্লেষণ করি, তার স্বরক্ষেপের কৌশল বা স্বরবিন্যাসের কৃতি যদি আলাদা করে দেখি, তাহলে বোঝা যায় শাস্ত্রীয় গানকে ভেঙে কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা লোকায়তকে প্রাধান্য দিয়ে একধরনের গান তৈরি করেছেন, যা সব মানুষ গাইতে পারে। আমাদের বাংলা কীর্তনের মধ্যে যে লোকায়ত অংশ আছে, যেমন 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' গানটার সুর ভোরের সুর। রাস্তা দিয়ে যদি একজন গাইতে গাইতে চলে যায়, তার সাংগীতিক কৌশল কতটা, তার গলা কতটা ভালো, এটার চেয়ে প্রথমেই আমাদের মনে, বুকে এসে আঘাত লাগে ভক্তিভাব। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটা কথা মনে পড়ছে—'মননের চেয়েও হৃদয় আগে সাড়া দেয়।' ভক্তি আন্দোলনের যাঁরা সাধক, তাঁরা ভ্রাম্যমাণ। কেউ বাড়িতে বসে থাকার লোক নন। তাঁরা পথের মানুষ। তাঁরা গাইতে গাইতে ভ্রমণ করতেন এবং সমস্ত মানুষকে আকর্ষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, ভক্তির গান মন্দিরে বসে গাইবার গান নয়। ভক্তির গানের আসল জায়গা হচ্ছে ভক্তচিত্ত। যে গান গাইছে, আর যে শুনছে সংযোগটা তাদের মধ্যে হচ্ছে। তার জন্য যে মন্দির বা মসজিদে যেতে হবে বা চার্চে যেতে হবে, তেমনটা নাও হতে পারে। আমি সরাসরি গাইছি ভক্তচিত্ত তাতে সাড়া দিচ্ছে। মনন দিয়ে সাড়া দেওয়া যায় না। মনন আমাদের বিচ্ছেদ আনে। আমাদের ইনটেলেক্ট-এর যেটা অসুবিধে, সেটা হচ্ছে আমি বড়, আমি ওর চাইতে বেশি জানি—এই ভাবটা এসে যায়। কিন্তু ভক্তি বা হৃদয় আমাদের অনেক কাছাকাছি এনে দেয়। কাজেই 'হরে কৃষ্ণ' গানটা প্রথমে শুনলেই মনে হয় এটা তো নামকীর্তন। আবার আর একটা গান 'প্রভাত সময়ে শচীর আঙিনা মাঝে গৌরচাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে'—এই গানটাও একই সুর। কিন্তু তার মধ্যে সুরের ওঠাপড়া রয়েছে। এই গানে সুরকে যেভাবে ইম্প্রোভাইজ করা হচ্ছে, ভক্তচিত্ত সেভাবে সাড়া দিচ্ছে। এর কোনো স্থিরিকৃত রূপ নেই বা কাঠামো নেই। গানটা গাইতে গাইতে এর রূপ নির্ধারিত হয়ে যায়। সেইজন্য যখন আমরা মীরাবাঈ-এর গান গাইছি, তার যে উচ্চারণ, মীরাবাঈ-এর গানে যেমন করে তিনি গোপালকে ডেকেছেন তার যে ভাব ব্যঞ্জনা, সেটাই যেন শুনছি।

আমাদের ঈশ্বর সাধনার একটা পথ হচ্ছে নারীভাবে সাধনা। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে যে সখীরও সখী মঞ্জরীভাবে সাধনা করতে হয় তাঁকে পেতে হলে। পুরুষরূপে তাঁকে সাধনা করা যায় না। ভক্তচিত্তকে নারীসত্তায় পরিণত করতে হয়। সুফিদের মধ্যে দেখেছি তাঁরা যখন কাউকে পূজা করেন, তখন মাথায় একটা ঘোমটা দিয়ে নেন। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছি, আপনারা ঘোমটা দেন কেন? তখন তাঁরা বলেছেন, আমার মধ্যে যে নারীত্ব, তাকেই আমি টেনে আনছি। ঈশ্বর তো একমাত্র পুরুষ। যেমন বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলা হয় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। তিনি একাই ভগবান। সেরকম আমি নারীরূপে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার সেবা দিয়ে তাঁর জন্য আমি প্রতীক্ষা করছি। তিনি নিশ্চয় আমাকে ধরা দেবেন। এই যে নারীরূপে ভক্তি সাধনা তাতে পুরুষেরই একটা স্বর বেরিয়ে আসছে। মেয়েদের স্বর নয় কিন্তু। পুরুষ যেখানে নারীরূপে সাধনা করছে, সেটাই এই সমস্ত ভজনের মধ্যে আমরা পাই। কিন্তু মীরার গানের চরিত্র অন্যরকম। এখনকার সমাজ-ইতিহাসের যাঁরা গবেষক, বিশেষ করে দিল্লিতে এই সমস্ত ভক্তির গান নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন,

ইতিহাসতত্ত্বের নতুন আলোয় তাঁরা বলছেন যে, মীরার কণ্ঠে নারীবাদের ধ্বনি প্রথম শোনা গেছে ভারতে। তিনি প্রথম স্বামীতন্ত্র ও সেই সময়কার সামন্ততন্ত্রকে ভেদ করে তাঁর গিরিধারী গোপালকে সাধনা করেছিলেন। তাঁর জন্য সারাজীবন ধরে তাঁকে প্রচুর প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়তে হয়েছে। অনেক বিরোধিতা ঘটেছে। অনেক নিন্দা হয়েছে। কিন্তু 'মেরে গিরিধর গোপাল' এই কথা থেকে তিনি ভ্রষ্ট হননি কোনোদিন। গিরিধারী গোপাল এবং তিনি—এই উপাস্য এবং উপাসকের মধ্যে যে সম্পর্ক তিনি গড়ে তুলেছেন, নারীবাদের সেই কণ্ঠ সেই অস্ফুট মধ্যযুগে আমাদের অভিভূত করে। সারা ভারতবর্ষে যত ভক্তি আন্দোলন হয়েছে, যত ভক্তি আন্দোলনের মানুষ এসেছে, কারও কণ্ঠে এরকম সবলতা আমরা লক্ষ করিনি। সেইজন্যই এখনকার আধুনিক ঐতিহাসিকরা মীরার মধ্যে প্রথম নারীবাদের উদ্ভাস লক্ষ করেছেন, যিনি রানাকে অস্বীকার করেছিলেন, সামন্ততন্ত্রকে অস্বীকার করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্রকে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব রাজস্থানি বুলিতে তিনি তাঁর গান গেয়েছিলেন এবং তিনি আত্মনিবেদন করেছিলেন। যেমন মীরার একটা গান আছে—

ম্যায়নে চাকর রাখো জি...
চাকর রাখো চাকর রাখো
চাকর রাখো জি
চাকর রঁহসু বাগ লাগাসু
নিতি উঠি দরশন পাসু...
প্রভুজি...
বৃন্দাবনকি কুঞ্জগলিন মে
তেরে লীলা গাসু
চাকর রাখো জি...

ভক্তিগানের সবচেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে এই ব্যক্তিগত স্বর। একেবারে নিজেকে নিজে বলছেন আমি কোনো মাধ্যম চাই না। পুরোহিত নয়, শাস্ত্র নয়, মন্ত্র নয়, কোনো মন্দির নয়. সরাসরি আমাকে তুমি চাকর রাখো, আমি তোমার সেবা করব। এই যে নিবেদন, হঠাৎ শুনলে মনে হয়, এই দাস্যভাব বা সমর্পণ যেন ভক্তিবাদের শেষ কথা। তা কিন্তু নয়! আমরা হঠাৎ খেয়াল করি না হয়তো, আমরা যাঁকে আহ্বান করছি, যাঁকে কামনা করছি আমার অন্তরে, যাঁকে আমি চাইছি, যিনি আমার প্রার্থিত সে-মানুষটি কি চিরকাল উপরেই থাকবেন নাকি? আমি কি চিরকাল নিচেই থাকব? তাহলে আমার প্রেমের শক্তি কোথায়? আমার এই যে আহ্বান তার আন্তরিকতা কোথায়? 'তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হব' সেটা তো সত্যি এবং 'প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে' সেটা যেমন সত্যি, তেমনি তার পরের সত্যিটাও রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—'তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছ নীচে / আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।' তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে দাস্যভাব নয়। আমি যাঁকে আহ্বান করছি তিনি নিচে নেমে আসছেন। আমার আহ্বানে তাঁর এই অবতরণ। এই যে অবতরণ করানোর শক্তি, সেই শক্তির মূলে যা আছে, সেটাই ভক্তি এবং ভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ভক্তি-ভক্ত-ভগবান সব এক করে দেয়।

এই গানগুলো যাঁরা রচনা করেছিলেন, সেই মানুষগুলো কারা? তাঁদের কথা তো এতক্ষণ আলোচিত হল না। শুধু কতকগুলো নাম বলা হয়েছে। কয়েকটা লোকের নাম, যা আমরা বহুবার শুনেছি। যেমন সুরদাস অন্ধ সাধক ছিলেন। সারা হিন্দি বলয়ের মধ্যে ঘুরলে দেখা যায় যদি কোনো অন্ধ ভিক্ষুক গান

করেন. তাকে লোকে সুরদাস বলে ডাকে। এটা একটা প্রথা হয়ে গেছে। 'এই সুরদাস এদিকে এসো'—তার মানে সে অন্ধ ভিক্ষুক। সুরদাসের সঙ্গে সেটা এক হয়ে গেছে। এইভাবে কবির বলে যে ব্যক্তিটি ছিলেন, যেই কবির সম্পর্কে সম্প্রতি আমরা যে-পড়াশুনা করছি, বছর দু'য়েক আগে ছ'শ বছর পালন করা হল কবিরের, সেই কবিরের জীবনবৃত্তান্ত বেশি জানা যায় না। কিন্তু এটা জানা যায় তাঁর হিন্দু-মুসলমান দু'রকম শিষ্যই ছিল এবং তিনি নিজে কোনোদিন লেখাপড়া করেননি। তিনি নিজের একটা রচনায় বলেছেন, 'আমি নিজে কোনোদিন কাগজ ছুঁইনি। আমি কখনো কালি দিয়ে কাগজে কোনো কিছু লিখিনি। আমার এই হাত কখনো কলম ধরেনি। আমি যা কিছু বলার আমার মুখ দিয়েই বলেছি।' এই যে আমরা যাকে নিরক্ষর বলি, সেই নিরক্ষরতার নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে একটা। বলা হয়, একদল নিরক্ষর, একদল সাক্ষর। এখন হয়েছে কমপিউটার ইললিটারেট এবং কমপিউটার লিটারেট। যেমন আমি একজন কমপিউটার ইললিটারেট। কাজেই ভাবীকালে আমি ইললিটারেট হিসাবে পরিগণিত হতে পারি। কারণ, ভাবীকালের ভাষাটা আমি জানি না। সেরকম মানুষের শিক্ষার কি কোনো শেষ আছে? কিন্তু দেখছি যে প্রথাগত অর্থে কবিরকে আমরা শিক্ষিত বলতে পারি না।

একজন ব্যক্তি, সর্বাজিৎ বলে একজন ব্যক্তি, তিনি একটা ষাঁড়ের পিঠে অনেকগুলো শাস্ত্র পুথি নিয়ে কবিরের বাড়ির খোঁজে এসেছিলেন। এসে সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা কবির কোথায় থাকেন?' তখন একজন মহিলা, 'কমালী' তার নাম, সে কবিরের মেয়ে (সবাই বলে, কবিরের নাকি কমাল আর কমালী নামে দুই ছেলেমেয়ে ছিল), সেই কমালী বললেন 'কবির কা বাস শিখর পর', কবির থাকেন একদম উঁচুতে। এই 'উঁচু' কথার মানে হচ্ছে সাধনার সর্বোচ্চ স্তর। কবিরের কাছে যেতে হলে শিখরে যেতে হবে। তা তুমি তো বাপু ষাঁড় নিয়ে সেখানে যেতে পারবে না। কারণ সেখানে একটা পিপীলিকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, সেখানে তুমি তোমার ওই জ্ঞানের বোঝা নিয়ে কী করে যাবে? এখানে ষাঁড় হচ্ছে ধর্মের প্রতীক আর তার উপরে বইগুলো হচ্ছে অপরের অনুশীলিত শাস্ত্রের প্রতীক। 'অপরের অনুশীলিত' শব্দটা কবির ব্যবহার করেছেন। শাস্ত্র কী?—যা অন্যের অনুশীলিত। কবির বলেছেন, 'তুমি নিজেরটা নিজে বোঝবার চেষ্টা কর।' আমরা-যে-সমস্ত মিস্টিক বা মরমিয়াবাদের সাধনা করেছি, সেখানে এইকথা বলা হয় যে একটা হচ্ছে স্বরবর্ণ আর একটা হচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণ। আত্মতত্ত্ব হচ্ছে স্বরবর্ণ। আর ব্যঞ্জনবর্ণ হচ্ছে পরতত্ত্ব। আত্মতত্ত্বটা আগে জানতে হয়। যেমন—আমি কে? আমার সঙ্গে জগতের সম্পর্ক কী? আমি কোথা থেকে এলাম? আমি কোথায় যাব? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?—এটা হচ্ছে স্বরবর্ণের পাঠ। যার স্বরবর্ণ শেষ হয়েছে, এবার ব্যঞ্জনবর্ণে যাবে। তুমি কে? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? এই যে জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, তার সঙ্গেই বা আমার কী সম্পর্ক? এই বস্তুপৃথিবীর সঙ্গে আমার এই অধ্যাত্মজগতের সম্পর্ক কী?—এটা হচ্ছে পরতত্ত্ব। হঠাৎ মনে হতে পারে যে, আত্মতত্ত্ব সাঙ্গ হলে পরে পরতত্ত্ব ধরা যায়। বাউল গানে বলে, প্রথমে স্বরবর্ণ, তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ, তারপর যুক্তাক্ষর বলতে গুরু। প্রথমে আত্মতত্ত্বকে সারো, পরে পরতত্ত্বকে সারো, তারপর গুরুতত্ত্বকে ধরবে।

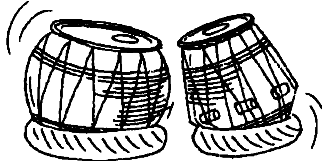
আমি একবার অগ্রদ্বীপের মেলায় সারারাত ছিলাম ফকিরদের মধ্যে। ফকিররা নিজেদের মধ্যে নানারকম তর্কবিতর্ক করে। তাকে পারশি ভাষায় বলে 'বাহাস্'। 'বাহাস্' মানে বিতর্ক। একটা কল্পিত বিতর্ক। যে-কোনো একটা বিষয় নিয়ে তারা বিতর্ক করে। রাত্রিবেলা একজায়গায় এরকম বাহাস্ হচ্ছিল। দু'জন ফকির নিজেদের মধ্যে খুব কথাবার্তা বলছিল। আমি সেখানে, তারা যেখানে বসে কথা বলছে, শতরঞ্জির উপরে, তার এক কোণে বসে আছি। একাদশীর তিথি; আকাশে ক্ষীণ চাঁদ। আমি মানুষগুলোর সিল্যুট দেখতে পাচ্ছি, তাদের চেহারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। কেমন দেখতে, কেমন গায়ের রং কিছুই বুঝতে পারছি

না। শুধু বুঝতে পারছি দু'জন ফকির কথা বলছে। তারা একটা কথা বলছিল, সেই কথাটা তারা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিল যে, আচ্ছা আগে তো স্বরবর্ণ তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ। আমি তাঁদের বললাম, বলছেন, আগে হচ্ছে 'শরিয়ত' অর্থাৎ ইসলামি শাস্ত্র, তারপর 'মারিফত' মানে হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। তা আগে শরিয়ত জানতে হবে। তারপর মারিফতে আসতে হবে। শরিয়ত হচ্ছে বৃক্ষ আর মারিফত হচ্ছে তার ফল। কেউ যদি ফলটা আহরণ করতে চায় বৃক্ষ দিয়ে উপরে উঠে যাবে। ফল আহরণ করাই তার কাজ। আমি তাকে মূর্খের মতো জিজ্ঞাসা করে ফেললাম তাহলে মারিফত পেতে গেলে শরীয়তকে ত্যাগ করতে হবে তো? ফকির আমাকে বললেন, 'তুমি তো ছোটবেলা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ পড়েছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ তা পড়েছি।' তা 'স্বরবর্ণ পড়ার পর তুমি যখন ব্যঞ্জনবর্ণ পড়লে তখন তুমি কি স্বরবর্ণ ভুলে গেলে?' এই কথা শোনার পর আমি বুঝলাম যে, ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে আছে স্বরবর্ণ। স্বরবিহীন ব্যঞ্জন দাঁড়াতে পারে না। সেই রকম শরীয়তবিহীন মারিফত হয় না। এই কথা যদি আমরা ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে দেখব যে জ্ঞান কর্মবিহীন ভক্তিও দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং এই যে সমীকরণ বা ভক্তি, তা আমাদের মধ্যে সবসময় ঘুরছে। সেইজন্য মানুষে মানুষে এই যে ভেদাভেদহীন ভক্তি তার চেতনাটা এভাবে আসছে।

তাই কবির রয়েছেন শিখরের উপর। সেখানে জ্ঞান পৌঁছায় না। শাস্ত্র পৌঁছায় না, ধর্মও পৌঁছায় না। সে আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব সাঙ্গ করেছে। 'কবির কা বাস শিখর পর' ওইখানে যদি যেতে চাও, তাহলে তুমি ওই সমস্ত ত্যাগ কর। আমরা দেখতে পাই যে, পরবর্তীকালে সর্বাজিৎ সবকিছু ত্যাগ করে কবিরের শিষ্য হয়ে যান। ভক্তিবাদের এই সাধকরা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোনো ভেদ করেননি। আমরা যদি কবিরের বীজক আলাদা করে পড়ি, তাহলে দেখব, হিন্দু এবং মুসলমান দুই ধর্মকেই তিনি ভীষণভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন তোমরা দু'দলই ভ্রান্ত। সাম্প্রদায়িক চেতনা, জাতি শ্রেণিবিভেদকে তিনি একদম মানতেন না। যা নিয়ে এখন আমরা খুবই বিব্রত। জাতি বলে তিনি কিছুই মানেননি। সবাইকে তিনি বলেছেন রামের সন্তান। কবির যে রামের কথা বলেছেন সেই রাম হচ্ছে তার কাছে সত্য : ট্রুথ। তাঁর মনের ভেতরের সত্যটাকে তিনি রাম বলেছেন। তিনি বলেছেন, রামকে যদি তুমি ভজনা কর তাহলে দেখবে যে, জাতি বলে কিছু নেই, ধর্ম বলে কিছু নেই, হিন্দু বলে কিছু নেই, মুসলিম বলেও কিছু নেই।

আমি যখন বাউলদের মধ্যে কাজ করতাম, যাঁরা ভক্তিবাদের একটা লোকায়ত সংস্করণ, তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে আল্লার তৈরি দুটো জাতি আছে। একটা পুরুষ জাতি আর একটা স্ত্রী জাতি এবং তার পরেই বলেছিলেন এই দুটোই শেষ পর্যন্ত থাকবে। কারণ ওগুলো আল্লার তৈরি, অন্য জাতের কোনোটাই থাকবে না। কারণ সেগুলো আমাদের তৈরি। আমরা সেই অপূর্ব দিনটার কথা ভাবি যেদিন পুরুষ আর নারী ব্যতীত কোনো জাতি থাকবে না জগতে। যেখানে এই ধর্মের বাধা, প্রাদেশিকতার বাধা, ভাষায় বাধা এবং জ্ঞানের বাধা ভুলে আমরা সত্যি সত্যি মানুষ হিসাবে এক হতে পারব। এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় জায়গা। ভক্তিবাদের মূল স্বরূপ হচ্ছে আত্মশক্তির উদ্‌বোধন এবং সেটা যদি ভেতরে আসে তাহলে বৈরাগ্য আপনিই আসে।

ভক্তিবাদের এই হচ্ছে মূল সুর। জীবনের সবকিছু ভোগের জিনিস ত্যাগ করেছি। আত্মোন্নতি, আত্মশক্তির পথে অধ্যাত্ম সাধনার ভেতর দিয়ে আমি যে-সত্যকে নিষ্কাশন করে জীবনে পেয়েছি তার থেকে বুঝতে পারি কোনো উপাসনাগৃহ, কোনো মন্দির-মসজিদ নয়, মানুষের সমস্ত বাধাবন্ধনহীন যে সত্তা, যে ভ্রামণিক সত্তা, ভক্তি আন্দোলনের মানুষরা পায়ে পায়ে পথে পথে তাঁদের কথা বলেছেন, ভক্তির চেতনা জাগিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, সব মানুষই এক। বলেছেন শাস্ত্রবাণীর চেয়ে গানই বড়।



বাংলা দেহতত্ত্বের গান

বাংলা গানের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং তার নানা ওঠাপড়া লক্ষ করলে তার নিজস্বতা ধরা পড়ে। আমরা জেনেছি যে নানারকম শিল্পকলার ও সাহিত্য-মাধ্যমের চর্চা বাঙালি করে চলেছে কয়েক শতাব্দী, কিন্তু গান রচনাতেই সম্ভবত বাঙালির প্রতিভা সবচেয়ে সহজভাবে এবং শিল্পগত সিদ্ধতায় প্রকাশিত হয়েছে। দশম শতাব্দী নাগাদ বাংলা ভাষার সূচনা হয়েছে, এই কথা তথ্যগতভাবে যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে একথাও মানতে হবে যে দশম থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত আটশো বছর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আসলে গানেরই ইতিহাস। চর্যাগান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গান, জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলি, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির ভাবময় গীতি, চৈতন্যোত্তর মহাজন পদাবলি, নাথযোগীদের গান, রামপ্রসাদ প্রভৃতির শ্যামাবিষয়ক গান ও কালীকীর্তন এবং বাউল-ভাটিয়ালি-মুরশিদা ইত্যাদি লোকায়তবর্গের গান— এইসবই বাংলা গানের আদি বৃত্তান্তের অংশ। আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিকালে অর্থাৎ অনাধুনিক ও আধুনিক সময়ের মোহানায় ভেসে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্য—কবিগান, আখড়াই, হাফআখড়াই, পাঁচালি ইত্যাদি তৎকালীন লোকচিত্তজয়ী নানা গানের ধরন। আধুনিক ব্যক্তিভাবনার সূচিমুখে নিধুবাবু ও তাঁর অনুগামীদের প্রীতি-গীতি বাংলা প্রেমের গানের সূচনা করেছিল। এর পরে উনিশ শতকের ভদ্রলোক-শ্রেণির প্রয়োজনে ও উন্মাদনায় দু-রকম বাংলা গানের রূপ আমরা দেখতে পাই। উচ্চমার্গের ধর্মচেতনা এবং উচ্চবর্গের সংগীতের সন্ধানে গড়ে উঠেছিল ব্রহ্মসংগীত। এর পাশে ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া স্বাদেশিকতার তত্ত্বকে বোঝাতে এবং স্বদেশের গৌরবগাথা শিক্ষিত দেশবাসীর সামনে গর্বের সঙ্গে তুলে ধরার জন্য সূচনা ঘটেছিল স্বদেশি গানের। মনে রাখতে হবে, এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নামক এক অসামান্য গীতিকারের আবির্ভাব সম্ভাবিত হয়েছিল। তিনি বাংলা গানের ধারাবাহিক স্বকীয়তার সঙ্গে মার্গসংগীতের গাম্ভীর্য ও কলাকুশলতা এবং লোকায়ত গানের সরল সহজগ্রাহ্য ভাব ও সুরের মর্মস্পর্শিতাকে মিশিয়ে আধুনিক মানুষের জন্য এক নতুন গানের ধরন সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে বলা হয় রবীন্দ্রসংগীত। এই গান আমাদের জীবনের সর্বস্তরের আধুনিকতাকে স্পর্শ করে আছে অথচ ঐতিহ্যের সঙ্গেও রেখেছে এক অনতিলক্ষ সংযোগ। তাঁর গানের আগুন থেকে

পরবর্তী বাংলা গানের তেজ সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর রচিত কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক এবং সাহিত্যের অন্যান্য রূপবন্ধকে পরবর্তী রচয়িতারা অতিক্রম করতে চেয়েছেন, অনেকাংশে পেরেওছেন কিন্তু তাঁর গানকে অতিক্রম করা যায়নি। তার কারণ স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে স্বতন্ত্র, শক্তিশালী এবং রহস্যময় উচ্চারণ শুধু রবীন্দ্রসংগীতেই ধরা আছে। তাঁর কবিতার ছন্দ ও বাণী, তাঁর উপন্যাসের অন্তর্জগৎ, তাঁর ছোটগল্পের দ্যুতিবর্ণময়তা এবং তাঁর নাটকের নিঃসঙ্গ নিরীক্ষা আমরা অনেকটাই ধরতে পেরেছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বীকারও করতে পেরেছি নতুন সৃষ্টির অভিমানে। কিন্তু তাঁর গানের ভুবনকে আমরা এখনো তার সামূহিক বিস্তারে, তার অজস্র বিচ্ছুরণে পুরোপুরি ধরতে পারিনি। এখানেও লক্ষ করা যায়, সবরকম সাহিত্যধারার চর্চা করেও রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষভাবে গানেই লাভ করলেন সিদ্ধি, তার কারণ বাংলা প্রধানত গানের দেশ। শত শত গীতমুখরিত এই দেশে রবীন্দ্রনাথ যেন ভগীরথের মতো সব রকম গানের অনেকান্ত ধারাকে সংহত করে আমাদের জন্য রেখে গেছেন। একদিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রসংগীত যেমন কয়েক শতাব্দীর বাংলা গানের নির্যাস, তেমনই বাঙালির সর্বাধুনিক জীবনযাপনের আশ্রয়। এই গান এমনকি দ্বন্দ্বদীর্ণ, নিঃসঙ্গ, স্ববিরোধী একক শ্রোতাকেও একধরনের উৎস ও আশ্রয় এনে দেয়। সন্ধান দেয় যুগপৎ শিকড় ও আকাশের।

বাংলা গানের ঐতিহ্যে কিন্তু আর একরকম গানের নিভৃত অবস্থানকে আমরা তেমন করে শনাক্ত করতে পারিনি। চর্যাগান থেকে রবীন্দ্রগান পর্যন্ত উৎসারে এই নিভৃত গানের একটি ধারা-রেখা খুব গোপন শীর্ণতায় নিজেকে ব্যক্ত করে চলেছে, কিন্তু তার অন্তর্গূঢ় ঝলক সংগীতরসিকরা তেমন গুরুত্ব দিয়ে বোঝেননি। এককালে এদেশে লোকায়ত গুহ্য ধর্মসাধনার প্রয়োজনে অভিসন্ধিত শব্দের আড়ালে তত্ত্বকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল। কিন্তু অন্তর্লীন বিবেচনা থেকে বোঝা যায় চর্যাগান থেকে নাথপন্থীদের গান, বৈষ্ণব সহজিয়াদের গান, শাক্তগান ও বাউলগানকে ছুঁয়ে সেই গোপন গানের ধারা রবীন্দ্রনাথের গানকেও স্পর্শ করেছে। একে চলতি কথায় বলা হয় রূপক গান—যার বাইরে একটা মানে, ভেতরে আর একটা মানে। এ-গানের অন্তর্বাণীর প্রাধান্যে, রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে যে-অরূপ বীণা, তা শোনার জন্য একটা আলাদা শ্রবণ লাগে। সম্ভবত লাগে খানিকটা অন্তর্দৃষ্টিও। এই দৃষ্টি ও শ্রুতির অন্তঃশীল স্বভাবে ধরা পড়ে অনেক না-বলা বাণীর অন্ধকার, অনেক গভীর চলার পদধ্বনি, অনেক অধরা মাধুরীর সৌন্দর্য। এই মানসতা থেকে হিয়ার মাঝে লুকিয়ে থাকা অলক্ষ রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর এই যে দ্বিচারী স্বভাব তা হঠাৎ গড়ে ওঠেনি। হাজার বছরের বাংলা গানের স্রোতোধারার অলক্ষে রয়ে গেছে এক গভীর গোপন ব্যক্ততা। রূপকের আবরণে ঢাকা চর্যাগান থেকে বাউল গান পর্যন্ত বাংলা গানের সেই ধারা ও তার শরীর ব্যবচ্ছেদ করলে একটা অন্তঃস্রোতের সন্ধান পাওয়া যাবে। আমাদের শিষ্ট সমাজ কিছুটা ঘৃণা আর বেশ কিছুটা অজ্ঞতা দিয়ে তাকে চিহ্নিত করেছেন 'দেহতত্ত্বের গান' বলে। কিন্তু প্রকৃত পর্যবেক্ষণে ও মরমি দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝা যায় যে দেহতত্ত্বের গান আসলে এক বলিষ্ঠ জীবনবাদী বাস্তবতার স্মারক।

অবশ্য দেহতত্ত্বের গান বলে একরকম লোকায়তবর্গের গান যে বাংলাদেশে বহুকাল ধরে চলে আসছে একথা সত্য। বহুদিনের বহুরকমের বাংলা গানের প্রবাহে মিলেমিশে থাকা দেহতত্ত্বের গানগুলিকে আলাদাভাবে শনাক্ত করে তার স্বরূপলক্ষণ ও বৈচিত্র্য নির্ণয় বা থিমেটিক বিশ্লেষণ হয়নি। তার ফলে এই বর্গের গানগুলি সম্পর্কে আমরা দুরকম ভুল করে চলেছি। কেবল দেহসংক্রান্ত শব্দাবলি যেসব গানে আছে সেগুলিকেই একমাত্র দেহতত্ত্বের গান বলে চিহ্নিত করেছি এবং তার ফলে ভাববাদী শিক্ষিত সমাজে এসব গান সম্পর্কে খানিকটা হীন ধারণা জন্মে গেছে। অথচ ভেবে দেখা হয়নি যে, দেহতত্ত্বের গান কেবল বাউলরাই লেখেননি, বস্তুত বাংলা গানের একেবারে আদি উৎস সিদ্ধদের রচিত চর্যাগীতি থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সহজিয়া

বৈষ্ণবদের গান,' যোগীসম্প্রদায়ের গান, কবিগান, মাইজ-ভাণ্ডারী, ঝুমুর এমনকি রামপ্রসাদের শাক্তগানে দেহসাধনার কথা স্পষ্ট রয়েছে। তবে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে দেহসংকেত পাওয়া যায় বাউল, মুরশিদা ও মারফতি গানে, কর্তাভজাদের গানে, সাহেবধনী, বলরামী এবং আরও নানাবর্গের লৌকিক বাংলা গানে। তার কারণ, এইসব গৌণধর্ম সম্প্রদায় কেবল যে দেহাত্মবাদী তাই নয়, তারা গুরুনির্দেশিত কায়াসাধনাতেও বিশ্বাসী। কায়াসাধনার নানা স্তর বুঝতে কিংবা সেই সাধনার সঠিক পথনির্দেশের জন্যই মূলত এসব গানের জন্ম। মানবদেহ, মানবজন্ম ও মানবের যৌনাত্মক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত বহুরকমের তত্ত্ব, বিশ্বাস ও মিথ এ ধরনের গানে ব্যক্ত হয়েছে। লক্ষণীয় যে উচ্চবর্গের ধর্মসম্প্রদায়ের মতো এই সব দেহবাদীরা শাস্ত্র বা মন্ত্র না লিখে গান লিখেছেন। গান কেন? রবীন্দ্রবাণী আশ্রয় করে বলা যায় :

> শাস্ত্রের যে-ভগবান ধর্মকর্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধার্মিক লোকের ভগবান, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে ;তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্র; আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য করে দেখেছেন, যিনি অহৈতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এখানে আত্মা বলতে যে-ভাবাত্মক অনুষঙ্গ গড়ে তোলেন, লোকধর্মে অবশ্য তার অবস্থান অনেকটা বস্তুগত, তার অস্তিত্ব দেহকেই ঘিরে। বাঙালি লোকগীতিকার সেইজন্যই বোধহয় আত্মার নিরঞ্জন মূর্তি ভেঙে দিয়ে ঘোষণা করেন :

বস্তুকেই আত্মা বলা যায়
আত্মা কোনো অলৌকিক কিছু নয়।
বিভিন্ন বস্তু সমন্বয়ে আত্মার বিকাশ হয়ে
জীবনরূপ সে পেয়ে জীবেতে রয়।

এখানে গীতিকার দুদ্দু শাহ 'বস্তু' কথাটিকে স্পষ্ট করেননি, কেবল বলেছেন 'বিভিন্ন বস্তু সমন্বয়ে আত্মার বিকাশ'। তাঁর আরেকটি গানে এই বস্তু কথাটা স্পষ্ট হয়, যখন গানে বলা হয় :

যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন।

এখানে 'জীবনের কারণ' বলে যে-বস্তুকে সংকেত করা হচ্ছে তা হল শুক্ররস। সেই শুক্ররসের জন্ম বিভিন্ন বস্তু সমন্বয়ে। এই বস্তু-সমন্বয় ব্যাপারটি তাদের ভাবনাক্রম দিয়ে বুঝে নেওয়া দরকার।

এইসব লৌকিক দেহাত্মবাদীরা অনেকে বিশ্বাস করেন এমনতর ভাবনার ক্রমে যে,— দেহের সবচেয়ে উপরিভাগে আছে চামড়া, চামড়ার মধ্যে রক্ত, রক্তের মধ্যে মাংস, মাংসের মধ্যে মেদ, মেদের মধ্যে অস্থি, অস্থির মধ্যে মজ্জা, মজ্জার মধ্যে আছে শুক্র। আর এই শুক্রের মধ্যেই আছে প্রাণের বীজ। এই পর্যন্ত দেহের যে বস্তুগত ক্রম দেখা গেল তার পরের ক্রমপর্ব কিছুটা ভাবাত্মক। সেই ক্রমটা এইরকম যে,— শুক্রের মধ্যে আছে প্রাণবীজ, সেই প্রাণের মধ্যে আত্মারাম, আত্মারামের মধ্যে পুষ্প, পুষ্পের মধ্যে কলি, কলির মধ্যে চিৎশক্তি, চিৎশক্তির মধ্যে মন, মনের মধ্যে ভাব, ভাবের মধ্যে রস, রসের মধ্যে প্রেম, প্রেমের মধ্যে আছে সহজ বা আলেক সাঁই। তারই আরেক নাম 'মনুরায়' বা 'মনের মানুষ'। সেইজন্যই প্রেম এইসব সাধক ও কবিদের প্রধান অন্বিষ্ট। কিন্তু সেই অন্বেষণের গোপ্য পথ জটিল ও কঠিন। কেন-না প্রেমের পথ পদে পদে দেহগত কামে আচ্ছন্ন। কাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রেমের অনুভবের পথে সবচেয়ে বড় বাধা দেহের সম্মোহ ;অথচ দেহকে এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে, অন্বিষ্টকে পেতে হবে। তার জন্য চাই গুরুর উপদেশ-নির্দেশ, সেই নির্দেশিকায় করতে হয় দম বা শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, দেহকে ঘিরে দেহকেই অতিক্রম করার অর্জিত সূক্ষ্মকৌশল। এসব করণ-কৌশলে দক্ষতা অর্জনের জন্য চাই স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি— জীবন ও জগৎ সম্পর্কে, দেহবিজ্ঞান সম্পর্কে, প্রজনন-তত্ত্ব সম্পর্কে, পিতা-মাতার ভূমিকা বিষয়েও। কারণ,

পিতা শুধু বীর্যদাতা
পালন ধারণ কর্ত্রী মাতা।

এখানে গুরুত্ব এসে গেছে মাতৃকাশক্তির উপর। লক্ষ করলে দেখা যাবে, মাতৃকাশক্তির বা নারীর প্রতি মনোযোগ দেহাত্মবাদীদের একটা সাধারণ লক্ষণ। কেন-না সঠিক সাধনা ও কায়াযোগে নারী যেমন সাধককে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে তেমনই তার সম্মোহে এসে যেতে পারে ক্রমপতনের রৌরব। দেহবাদীদের কাছে নারী তাই এক সমাধানহীন দ্বৈতের মতো। তা একই সঙ্গে ধারক ও বৈনাশিক। যেহেতু তা স্বভাবত উর্বর অথচ সাধনযোগে অনুর্বর।

এই সূত্রেই বাংলা দেহতত্ত্বের গানে অতি সহজে এসে যায় ক্ষেত্র আর বীজের রূপক। সমাজবিজ্ঞানী ব্রিফল্ট্-এর মন্তব্য প্রসঙ্গত এসে পড়ে। *The Mothers* বইতে তিনি বলেছেন : The assimilation of the fruit-bearing soil to the child-bearing women is universal....the fecundity of the earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same quality.

বাংলার আদিগান চর্যাপদে কায়ারূপ-গাছে পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ-ডালের কথা আছে, রামপ্রসাদ লিখেছেন মানব-জমিনের অনাবাদী পরিণামের ইঙ্গিত। এসবই ঠারে ঠোরে ক্ষেত্র ও বীজের ইঙ্গিত আনে। যোগীদের গানে হয়তো সেই ইঙ্গিতধর্মিতা খানিকটা স্পষ্টতা পায় যখন শুনি :

মায়ের চারচিজের কথা শুন মন দিয়া।
গোস পোস লোহ খোস চারচিজে দুনিয়া।।
বাপের চারচিজের কথা শুন মন দিয়া।
হাড় রগ মণি মগজ চারচিজে পত্তন।।

এখানে স্পষ্টই বলা হচ্ছে, মানবশরীরে আছে মায়ের চারটি উপাদান (মাংস, ত্বক, রক্ত, কেশ) আর বাবার চারটি উপাদান (হাড়, শিরা, শুক্র, মগজ)। কিন্তু এরপরেও যোগীর গান ইঙ্গিত করে অন্য আর এক দিকে। বলা হয় :

আর এক চিজের কথা কইতে বাসি লাজ।
ভাঙ্গিলে মধুব ভাণ্ড পানি রবে কাত।।

লজ্জাবশত অনুক্ত সেই চিজটি হল নারীর রজ, যা সব কিছুর ধারক ও সম্মোহক। পুরুষের বীজকে প্রকৃতির রজের সান্নিধ্যে আনাই সবচেয়ে নিগূঢ় জৈবনিক লক্ষ্য। কেন-না তার ফলেই জীবনের উদ্ভব— মানবজীবন— যা সকল জীবনের সেরা। সেই মানবজীবনকে স্বীকার করা; সেই মানবজীবনের সাধনা, মানুষের করণ, দেহাত্মবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য ও ক্রিয়াপরতার লক্ষণ। দেহাত্মবাদী গীতিকারের দৃপ্ত ঘোষণা হল :

কাশী কিংবা মক্কায় যাও রে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন—
ধ্যানধারণা ভজনপূজন মানুষ সর্ব ঠাঁই।

এর পরবর্তী সম্প্রসারণে অনায়াসে উচ্চারিত হবে এতবড় কথা যে :

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খোঁজে পায় তার উল্ (সন্ধান)।

কিংবা—

মানুষের আকার ধরে
খোদ খোদা যে ঘোরে ফেরে।

তাই যদি সত্য— তবে শাস্ত্র, মন্ত্র, দেবতামূর্তি-গঠন, পূজাবিধি, ধর্মাচার, মন্দির-মসজিদ, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা মসজিদের মোল্লা, দীপ-ধূপ-ধুনা-শঙ্খ ঘণ্টা সবই অসত্য এবং অপ্রয়োজনীয় বলে পরিত্যাজ্য। তার অনেকটাই ফাঁকিজুকি, লোকদেখানো বা ধর্মান্ধতা। পূজার ছলে উপাস্যকেই ভুলে থাকা।

এই জায়গাতেই সনাতন উচ্চবর্গের ধর্মমতের সঙ্গে নিম্নবর্গের ধর্মধারণার বিরোধ আর সংগ্রাম। সে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অবশ্য অভিমানে নিরুচ্চার নয় বরং গানে গানে তীব্রতায় গাঁথা। লালনের লেখা এমন কয়েকটি প্রতিবাদী গানের অংশ লক্ষ করা যাক।

১. ম'লে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হবে কেন বলে।
ম'লে হয় ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেন জপতপ এত করে জলে স্থলে?

২. যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয়
ম'লে তা যদি তাতেই মিশায়
তবে ঈশ্বর অংশ ঈশ্বরে যায়
স্বর্গ-নরক কার মেলে?

প্রথম উদাহরণে ব্যবহারিক জপতপের বিরোধিতা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বর্গ-নরক ধারণার ভ্রান্তি ও স্ববিরোধ ঘোষণা। শুধু উচ্চবর্গের সঙ্গে লড়াই নয়, দেহাত্মবাদীরা আসলে গান লেখেন নিম্নবর্গের ভ্রান্তমতি সেইসব মানুষদেরও সঠিক পথনির্দেশের জন্য যারা ধর্মের নামে নানা ভণ্ডামি আর অপদেবতা পূজায় জড়িয়ে পড়ে। নানা প্ররোচনায় মানুষের করণ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে জড়ো হয় কুহক বা ধর্মমোহে। তাদের ভ্রান্ত আচরণকে ধিক্কার দিয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলা হয়েছে :

১. হরিষষ্ঠী মনসা মাখাল
মিছে মাটির ঢিবি কাঠের ছবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মর?

২. জিন-ফেরেস্তার খেলা পেঁচোপেঁচি আলাভোলা—
ফেঁও-ফেঁপি ফ্যাকস্া যারা
ভাকা-ভুকোয় ভোলে তারা।

এসব পদে 'হরিষষ্ঠী', 'মনসা' ও 'পেঁচোপেঁচি' লৌকিক কুসংস্কারজাত নানা অপদেবতার নাম। যারা নিম্নস্তরের চেতনাসম্পন্ন (ফেঁও-ফেঁপি) সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এবং অন্তঃসারহীন (ফ্যাক্সা) তারাই জিন-ফেরেস্তা বা আলেয়ার আলো (আলাভোলা) বা মিথ্যা কথার প্রতারণায় (ভাকা-ভুকো) ভোলে, সেই ফাঁদে পা দেয়। বিশেষ করে তাদেরই উদ্ধার করে মানুষতত্ত্বে পুনর্বাসন করা দরকার। কাজেই দেখা যাচ্ছে, উচ্চবর্গের মানুষের ধর্মসাধনের যা মূল লক্ষ্য অর্থাৎ আত্মমুক্তি আর স্বর্গপ্রাপ্তি, দেহবাদী লোকায়ত সাধক কবিরা তার চেয়েও বড় লক্ষ্যের দিকে সমুদ্যত ও সক্রিয়। তাঁরা চান ধর্মের নামে অসত্যের উৎসাদন, গণ-চেতনার জাগরণ এবং মানব-সত্যের চিরন্তন দেহবাদী পথে সকলকে টেনে আনতে। তাঁদের পরিণত সমাজচেতনায় জায়মান জীবনের প্রতি আসক্তি বিশেষ ঈর্ষণীয়। বৈরাগ্যের পথ, তীর্থ-উপবাস-ব্রতপালনের কৃত্য, তাঁদের জন্য নয়। তাঁরা মুক্ত, মন্ত্রবর্জিত, স্বয়ম্ভর।

এই যে এক ব্যাপক সামাজিক বোধ, তার শিকড় খুঁজে পেতে গেলে আমাদের লৌকিক গানের একেবারে অতলে ডুব দিতে হবে। বুঝতে হবে কোনো বিচ্ছিন্ন সমাজব্যবস্থায় এমনতর গান রচনা হতে পারে না। দেহতত্ত্বের গানে বহুদিনের কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজের এমন সব রূপক আর প্রতীক গাঁথা আছে যে তার

দ্যোতনা বুঝতে এবং তাকে যথাযথ প্রয়োগ করতে এক সংহত গ্রাম্যসমাজ দরকার। পশ্চিমি সমাজবিজ্ঞানীরা এ-জাতীয় গ্রাম-সমাজ সংহতিকে কেউ বলেছেন 'জৈবিক সমাজ', কেউ বলেছেন 'কমিউনিটি'। সেই সমাজে নানা বৃত্তির মানুষ পরস্পর লেনদেন করে বেঁচেবর্তে থাকে। যে-কামার লাঙলের ফাল আর কাস্তে বানায় তার সঙ্গে গোরুর গাড়ি-বানানোর কর্মীর যোগ থাকে। নৌকো গড়ে যে-ছুতোর আর সেই নৌকো চড়ে মাছ ধরে যে-জেলে তাদের মধ্যে অন্যোন্য সম্পর্ক থাকতেই হয়। আবার এদের সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাষিকে জমি হাসিল করে বীজ বুনে শস্য তৈরি করতে হয়। গ্রাম্য জোলা তাঁত চালিয়ে বস্ত্র আর গামছা বোনে, তবে হয় গ্রামীণ নরনারীর লজ্জা নিবারণ। তেমনই মোদক সম্প্রদায় বানায় চিনি, শিউলিরা গাছ কেটে রস বার করে তার থেকে গুড় করে। জৈবিক সমাজে এইসব বিচিত্র বৃত্তিজীবী মানুষ গায়ে গায়ে লেগে থাকে। শ্রমজীবী মানুষের সমন্বিত এই জীবনের লেনদেনের শরিক হয়ে থাকে বাউল ফকির বা দেহাত্মবাদী সাধকেরা। কেন-না সেই মানুষরাই তো তাদের গানের মরমি শ্রোতা। তাঁদের গানের ভুবনে অতি সহজে তাই প্রবাহিত বস্তুজীবনের ছবি রূপকে-প্রতীকে উঠে আসে। তা শহরবাসী শ্রোতার কাছে অজ্ঞাত বা দুর্বোধ্য হলেও গ্রামবাসীর কাছে খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ লাগে। গীতিকারদের লক্ষ্যও কিন্তু তাঁরা এবং তাঁদের উজ্জীবন। যেমন—জীবনের অনিত্যতা, দেহের নশ্বরতা আর প্রাণের আসা-যাওয়া বোঝাতে গ্রাম্য গীতিকার লেখেন, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়।' রূপকপ্রিয় গ্রামিক শ্রোতাকে দেহ-খাঁচার বিষয়ে আসক্তি ত্যাগের উপদেশ দেবার জন্য সেই গানে বলা হয় :

মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে।

এই গানের সার কথা বুঝতে গেলে কাঁচা বাঁশ আর পাকা বাঁশের তফাতটা বুঝতে হবে। গ্রামের মানুষ সেটা সহজেই বোঝেন। বোঝেন যে, এ দেহ ভারী নশ্বর, কাঁচা বাঁশের পলকা খাঁচার মতো। এই রকম ভাবেই গানে আসে নদী, নৌকা, জমিচাষ, বন্যা, খরার মতো প্রসঙ্গ। ব্যঞ্জনাময় নানা উপমা বা উৎপ্রেক্ষা দিয়ে লোকায়ত জীবনের মধ্যে থেকে উঠে আসা গীতিকার তাঁর শ্রোতাদের অনেক গভীর তত্ত্ব কত সহজে বুঝিয়ে দিতে পারেন। যেমন ধরা যাক লালনের একটা গানে সাধন বিষয়ে মানুষ কেমন অসহায় ও পরনির্ভর (গুরু বা শাস্ত্র বা মন্ত্র) তা বোঝানো হয় এক পঙ্‌ক্তির বিন্যাসে :

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।

ব্যঞ্জনাগর্ভ কবিত্ব এরপর আঁকে এক মেটাফিজিক্যাল চিত্রকল্প, ভাবাত্মক দ্যোতনায় :

শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুঁড়ে।

গ্রাম্য মানুষই কেবল বুঝবেন এই পার্থক্য— ঘর আর কুঁড়েঘরের। প্রথমটি বহু মানুষের কোলাহলে মুখরিত ভজন-কীর্তন, দ্বিতীয়টি নিঃসঙ্গ নির্জন সাধকের প্রতীকরূপে এসেছে। এইভাবে বাংলা দেহতত্ত্বের গানে এক অতীত গ্রামসমাজের সমৃদ্ধ পরম্পরার স্মৃতি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই সূত্রে মনে হয়, নশ্বর জীবন আর মানুষের দেহগত মোহ—এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিকতা বাংলার গ্রামীণ গানে নানা মাত্রায় ফুটে উঠেছে। একটি পথচলতি গানে রয়েছে নিতান্ত সরল অভিব্যক্তি, যে—

পরের জায়গা পরের জমি
ঘর বানাইয়া আমি রই
আমি তো সেই ঘরের মালিক নই।

কী বেদনাময় উপলব্ধি! আমার এত সাধের দেহ-ঘরখানার মালিক তো খোদ স্রষ্টা— তাঁর মর্জিতেই আমার বাঁচা-মরা, সাধ-আহ্লাদ। এই কথাটাই কবিত্বে মুড়ে হাসন রাজা বলেছেন এইভাবে যে,

লোকে বলে বলে রে
ঘর বাড়ি ভালা না আমার।
কী ঘর বানাইলাম আমি
শূন্যের মাঝার।

ভাবলে অবাক লাগে যে, নানাভাবে দেখা, বহুভাবে জানা, ব্যবহারিক গ্রামিক জীবনে কতরকম চিত্র ও পরিবেশ দেহতত্ত্বের গানে রূপক বা উৎপ্রেক্ষার ভঙ্গিতে রয়ে গেছে। সতর্ক পর্যবেক্ষণে তা ধরা পড়ে। একটি গানে নিজের ভজনসাধনহীন ব্যর্থ জীবনের উপমা গীতিকার দিয়েছেন 'জন্ম-ছাঁদা নৌকা'-র সঙ্গে। নৌকায় দক্ষ মাঝি বলতে বোঝানো হয়েছে গুরুকে। নিজের দেহকে বলা হয়েছে কুঁড়েঘর, যাতে হাড়ের গাঁথুনি আর চামের ছাউনি , তার 'গড়নদার' বা 'ঘরামি' বলা হয়েছে ঈশ্বরকে। সাধক নিজের দেহকে বলেছেন দেহ-তরী আর নির্মাতা 'সুত্তুরধর' হলেন স্বয়ং বিধাতা পুরুষ। অন্য এক গানে রূপক পালটে দেহ-তরী হয়েছে দেহ-নদী। তখন খেদোক্তি :

যখন নদী বোঝাই ছিল
ঝড় তুফানের ভয় ছিল না গো—
নদীর জল শুকাইল চর পড়িল
তবু নদীর বেগ গেল না।
আমার এই দেহনদী।

এক্ষেত্রে নদীর বেগ বলতে কামনা বোঝানো হচ্ছে। অন্য আরেক গানে নদীর প্রসঙ্গ ভিন্ন অনুষঙ্গ বয়ে আনে। সেখানে স্ত্রী জননাঙ্গের উপমা হয় বাঁকা নদী। সেই নদী-বিষয় সম্পর্কে গুরু শিষ্যকে সাবধান করে বলেছেন :

নাইতে গেলে বাঁকার ঘাটে
বিদ্যে বুদ্ধি রয় না ঘটে—
কাম নামে কুমির জুটে
চিবিয়ে চুষে খায় তাকে।

ভেবে দেখলে— গাছ, নদী আর কুমির— বিন্যাসের এই ছকে গাঁথা যায় মানবজীবন। নদী হল চিরপ্রবাহী জীবন, গাছ হল মানবদেহ, আর কুমির হল কাম। 'চর্যাপদ'-এ হাজার বছর আগে লেখা হয়েছে :

রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খায়।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এখানে রুখ (বৃক্ষ> রুখ) মানে বোধিচিত্ত, বোধিচিত্ত মানে শুক্ররস (তাকেই বলা হয়েছে গাছের তেঁতুল), সেই তেঁতুল খাচ্ছে কাম নামে কুমির। নারীদেহের বাঁকানদীর ঘাটে কামনা-কুমির হঠাৎ এসে কতদিন ধরে যে পুরুষের সারবস্তু হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে! সেই চর্যার কাল থেকে অধুনাতন বাউল গান পর্যন্ত। এইভাবেই দেহতত্ত্বের গান গড়ে ওঠে যুগে যুগে। স্বাভাবিক গ্রামিক কল্পনা খেত-ফসল বীজ-সারের উপমায় দেহতত্ত্বের মূল কথা বোঝাতে চায়। একই টানে নদীর জোয়ার-ভাঁটা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, নদীর স্রোতে ভেসে-আসা মীন, স্রোতে ভেসে-আসা দীপ এইসব রূপক আর বর্ণনা এসে যায়।

কৃষিভিত্তিক সমাজে জমিতে শস্য উৎপাদন আর নারীর গর্ভে সন্তান আগমন একই যাদুবিশ্বাসে গৃহীত হয়। দুটিতেই খেত আর বীজের সমভূমিকা। মাতৃবস্তু আর পিতৃবস্তুর সমন্বয়। তবু বিশেষভাবে মাতৃকাশক্তির প্রাধান্য দেহতত্ত্বের গানে আলাদাভাবে বোঝা যায়। এই প্রাধান্যের কারণ সম্ভবত এটাই যে কৃষিকাজের

আবিষ্কার আদিম সমাজে বিশেষত নারীরই কৃতিত্ব। সন্তানধারণ, সন্তানজন্ম, আর সন্তান পালনের ক্ষেত্রেও নারীর অগ্রাধিকার। তা ছাড়া কোনো কোনো গ্রামসমাজে পতিত জমিকে উর্বরা করবার জন্য নারী-রজ ব্যবহারের কথা শোনা যায়। কোনো কোনো কায়াবাদী সাধক তাঁদের গুহ্য সাধনায় কুমারী নারীর প্রথম রজ পানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন। লালনের গানে এই সাধনার ইঙ্গিত আছে, 'কোটি জন্মের যায় পিপাসা বিন্দুমাত্র জলপানে'-র উচ্চারণে। সুস্থ স্বাভাবিক যৌন-জীবনের সঙ্গে জমির ফলনের একটা যোগ সেই সমাজের বিশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত।

বাংলা দেহতত্ত্বের গানগুলিকে তাই বিচ্ছিন্ন কোনো গীতিকারের ব্যক্তিগত ভাবের স্ফুরণ বা নান্দনিক উৎসার হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এগুলিতে স্তরান্বিত হয়ে আছে আমাদের আদি থেকে বহমান লৌকিক ও গ্রামিক সমাজের বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সত্য। যে গ্রাম্য নারী সমাজ আমাদের ব্রতকথাগুলির সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে দেহতত্ত্বের গানের একটা যোগ থাকা সম্ভব। দুয়েরই কাজ উর্বরতা-চেতনাকে জাগানো। কেউ কেউ মনে করেন প্রজনন-রহস্য আদিম মানুষের চেতনায় যেভাবে ধরা পড়েছে তার একটি নজির নারীর উর্বরাশক্তির সঙ্গে প্রকৃতির উর্বরাশক্তির নিবিড় ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করা। হয়তো তাঁদের ভাবনায় সন্তান উৎপাদন আর ফসল উৎপাদন একই ক্রিয়ার দুটি আলাদা পর্যায়। রবার্ট ব্রিফল্ট্ বলেছেন :

> The belief that the sexual act assists the promotion of an abundant harvest of the earth's fruits, and is indeed indispensible to secure it, is universal in the lower phases of culture.

কিন্তু কেবল প্রজনন নয়, প্রজনন নিরোধও দেহাত্মবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য। কায়াসাধনার মধ্যে দিয়ে পুরুষের ক্ষেত্রে যৌনতার নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাধনার লক্ষ্যে নারীই প্রকৃত সঙ্গী। নরনারীর সংগম আদি বিশ্বাসে একই সঙ্গে ফসল উৎপাদন এবং রতি নিরোধ সাধনাকে মেলাতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে জেমস ফ্রেজারের মন্তব্য :

> Either he may infer that by yielding to his appetites he will thereby assist in the multiplication of plants and animals : or he may imagine that the vigour that he refuses to extend in reproducing his own kind, will form as it were a store of energy whereby other creatures, whether vegitable or animal, will somehow benefit in propagating their species. This form the crude philosophy, the same primitive notions of nature and life, the savage may derive by different channels a rule either of profligacy or of asceticism.

কিন্তু এই লক্ষ্যে সফল হতে গেলে গুরুর উপদেশে ধাপে ধাপে সাধনার তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয় তবে সাধকের দেহ পক্কতা লাভ করে। এ সাধনার প্রথম ধাপ 'প্রবর্ত' অবস্থা অর্থাৎ তখন শুধু নামাশ্রয়। এ অবস্থা অতিক্রম করে প্রার্থী পৌঁছোন 'সাধক' স্তরে, তখন ঘটে মন্ত্রাশ্রয়। এর পরের ধাপের নাম 'সিদ্ধ' অবস্থা। এটাই সাধনার শেষ ধাপ, এ-সময় ঘটে রূপাশ্রয়, অর্থাৎ নারীসঙ্গিনীর সঙ্গে কায়াসাধনের শরীরী অভিজ্ঞতা। অনেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন না। প্রবর্তক বা সাধকরূপেই হয়তো তাঁদের অবস্থান থেকে যায়। লালন ফকির, কুবির গোঁসাই, লালশশী, হাউড়ে গোঁসাই, পাঞ্জু শাহ, যাদুবিন্দু (যাদু এবং তাঁর সাধনসঙ্গিনী 'বিন্দু'-র নাম মিশিয়ে), দুদ্দু শাহ, আর্জান শাহ, জালালুদ্দিন প্রভৃতি অনেক গীতিকার সিদ্ধ-স্তর পর্যন্ত পৌঁছে তবে গান লিখেছেন। তাঁদের গানে তাই উচ্চভাবমূলকতা ছাড়াও কায়াসাধনার অনেক সংকেত আছে। কুবিরের একটি গানে কৃষিকর্মের উপমায় ও অনুষঙ্গে বলা হয়েছে :

আবাদ কর চৌদ্দপোয়া জমি লয়ে।
মন রে জোড়ো 'ধর্ম'-হাল 'প্রবর্তক'-ফাল
'সাধক'-মুড়ায় 'সিদ্ধ'-ঈষ লাগাইয়ে।

এখানে লাঙলের অনুপুঙ্খ প্রতীকে দেহ-জমি কর্ষণের ইঙ্গিত রয়েছে। তবে গ্রামীণ কৃষিজীবী জীবনের অভিজ্ঞ শ্রোতা ছাড়া এ গানের 'হাল' 'ফাল', 'মুড়া' ও 'ঈষ'-এর ব্যঞ্জনা বুঝবেন না।

এই বোধগম্যতার প্রশ্নে আমরা একটা বৃহত্তর প্রসঙ্গে পৌঁছে যাই। প্রসঙ্গটি এই যে, চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে শাক্ত গান পর্যন্ত বাংলা গানের যে আটশো বছরের ধারাবাহিকতা তাতে রূপকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য রকম বেশি। রূপককে যদি একধরনের metaphor বলা যায় তবে গানে তার কার্যকারিতা কী, এ প্রশ্ন ওঠে। গানকে কি সর্বসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য এবং বিশেষ সাধকের কাছে দ্যোতনাবহুল করবার জন্য এই রূপক প্রয়োগ? সিদ্ধদের জন্য রচিত চর্যাগানের ক্ষেত্রে যদি বা একথা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু সামগ্রিক বাংলা গানের প্রবাহে কথাটি টেকে না। কারণ প্রত্যেক জাতির আত্মপ্রকাশের তো এক-একটা ধরন থাকে, বাঙালির গানে রূপক ব্যবহারের কৌশল, এমনকি অতিরেক, তেমনই এক বিশেষ ধরন। রামপ্রসাদ যে অত সহজে মানব-জমিন বা কালীপদ-নীলাকাশ ভাবতে পেরেছিলেন কিংবা ভাটিয়ালি গানে 'মন-মাঝি তুই বৈঠা নে রে', ফিকিরচাঁদি গানে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' এই পারাপারের রূপকল্প অনায়াসে গড়ে তুলেছে তার কারণ বাঙালি শ্রোতা সহজেই রূপক বোঝেন। অর্থাৎ রূপকের মধ্যেকার অন্তঃসার সহজে ধরতে পারেন। এর কারণ বস্তুজগৎ আর ভাবজগৎকে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা বাঙালির নিজস্ব স্বভাব। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে বাঙালি গীতিকার বরাবরই প্রাকৃত জীবনের রূপক টেনে আনতে অভ্যস্ত। 'হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি'-র মতো উৎকৃষ্ট গানের কথা বাদ দিলেও বস্তু থেকে ভাবে অনায়াস পরিক্রমার বহু উদাহরণ বাংলা গানে আছে। তার সবই কিন্তু গ্রাম্য গান নয়। বৈষ্ণব পদে যখন রাধার জবানিতে বলা হয়, 'আমার বুকের কাঁচুলি কৃষ্ণ করাঙ্গুলি করের ভূষণ সেবা' তখন ভাবনায় যে-চমৎকারিত্ব ফোটে রূপকতার আশ্রয়ে, তেমনই অদ্বয়বোধের চমকপ্রদ নমুনা ফোটে। দেহতত্ত্বের একটা গানে পাই :

চেয়ে দেখতে পাই গৌরময় সকলি।
গৌর আমায় শঙ্খ শাড়ি
গৌর মালা পুঁইচে পলা চুল-বাঁধা দড়ি
দুই হাতের চুড়ি গৌর কাঁচুলি।

নারী তার নিজের দেহের অনুষঙ্গী অতিপ্রিয় বসনভূষণ, প্রসাধন অলংকারের সঙ্গে গৌরচন্দ্রকে যখন একত্রীভূত করে ফেলছেন তখন ভাবনার অভিনবত্ব সর্বাধুনিক মনকেও চমকে দেয়।

দেহতত্ত্বের বাইরেও বাংলা গানের রূপক প্রবণতা কত অমোঘ তা বোঝাতে অন্য বর্গের উনিশ শতকীয় একটি বাংলা গান দেখা যেতে পারে:

পূজিব পিরিতি প্রেম-প্রতিমা করি নির্মাণ-
অলংকার দিব তাহে আমার যত আছে অভিমান।
যৌবনে সাজায়ে ডালি কলঙ্কে পূরি অঞ্জলি
বিচ্ছেদ তাহে দিব বলি দক্ষিণা করিব এ প্রাণ।

এ ধরনের রূপক ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে একধরনের দোলাচল লক্ষ করা যায়। মিডলটন মারে হয়তো এমন দোলাচল সম্পর্কেও বলতে পারতেন : the spiritual has been brought down to the

physical— কিংবা উলটোভাবে the physical has been taken up to the spiritual। অবশ্য দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ থেকে যে বাংলা আধুনিক গানের নবধারা সৃষ্ট হয়েছে তার বাণীতে চিত্রকল্প থাকলেও রূপক খুবই কমে গেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম অতুলপ্রসাদের গান। জীবনের রূপকে গাঁথা তার শব্দাবলি বিশেষ লক্ষণীয়। যেমন— জীবন-মূলে, জীবন-তরী, জীবন-পথে, জীবন-জমিন, জীবন-পাষাণ, জীবন-রবি, জীবন-হাটে, জীবন-জলধি, জীবন-কালা, জীবন-বন্দর, জীবন-বাসর, জীবন-নদী।

রূপকের এত বিপুলতা বোঝায় যে অতুলপ্রসাদ আমাদের দেশীয় গানের ধারায় স্পষ্ট পরম্পরা রেখে গেছেন। আসলে আধুনিক মনন তেমনভাবে রূপক নির্মিতিতে সাড়া দেয় না। তবে আধুনিক-পূর্ব বাংলা গানে রূপক ব্যবহার অবিরল। দেহতত্ত্বের গানে রূপকের আবরণে তত্ত্ব বা ভাবকে অর্ধস্ফুট রাখা একটা সচেতন কৌশল। যা আধোপ্রকাশ্য তার আকর্ষণ অমোঘ। কিন্তু সেইসঙ্গে দেহতত্ত্বের গানের যাঁরা রচয়িতা তাঁদের দেখা ও দেখানোর সামর্থ্যের কথাও বলা দরকার। নিরঞ্জন চোখে সুন্দর-অসুন্দরে মেশা এই জীবন তার সহস্রবিধ বিস্তারে ধরা পড়েছিল তাঁদের চেতনায়। সেখানে নীতি বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো আবিলতা জাগেনি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ যেমন ভেবেছেন :

> গাছের পাতার সূর্যের আলোয় ছোঁওয়া লাগে, অমনি এক জাগ্রত শক্তির জোরে বাতাস থেকে কার্বন ছেঁকে নেয়, তেমনি মানবসমাজের সর্বত্রই এই মরমিয়াদের একটি সহজ শক্তি দেখা যায়, উপর থেকে তাঁদের মনে আলো পড়ে আর তাঁরা চারিদিকের বাতাস থেকে আপনিই সত্যের তেজোরূপটিকে নিজের ভিতরে ধরে নিতে পারেন, পুথির ভাণ্ডারে শাস্ত্রবচনের সনাতন সঞ্চয়ের থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাঁদের সংগ্রহ নয়।

এইসঙ্গে আরেকটা ভাববার দিকও আছে। তাঁদের সামনে ছড়িয়ে থাকা জীবনকে স্বচ্ছ সহজ চোখে দেখবার সত্যসুন্দর দৃষ্টিও ছিল। তাই লৌকিক ভাবনার স্বাভাবিকতা থেকে তাঁরা কায়া-বাদী সাধনাকে বলেন 'লতা-সাধনা'। বস্তুত পুরুষ ও নারীর শরীরের মধ্যে অজস্র শিরা-উপশিরা ও স্নায়ুকেন্দ্র (গানের ভাষায়, 'ঢাকার বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি') যেন লতার মতো সঞ্চারিত এবং নানাসূত্রে মূলের সঙ্গে গূঢ়ভাবে সংযুক্ত। বিশেষত নারীর জননাঙ্গের সঙ্গে লতার উপমা খুবই দ্যোতক। নারীগর্ভে তার সন্তানের বন্ধন যেন লতাপাতারই অমোঘ বন্ধন। সেই বন্ধন ছিন্ন করে তবে পৃথিবীতে আসা। তবু লতার সঙ্গে যেমন ফুলফলের একটা অলক্ষ সংযোগ থেকে যায় তেমনই মানবজীবনের সঙ্গে থাকে লতাসাধনার অচ্ছেদ্য স্মৃতি। নারী তাই সঙ্গিনী অথচ পূজ্য। তার রজঃস্রাব যেন ত্রিবেণীর ধারার মতো। সেই ধারাতেই শুভযোগে ভেসে আসে মহামীন অর্থাৎ অধর মানুষ।

অধর মানুষকে যে মৎস্যরূপে কল্পনা করা হয়েছে তার একটা কারণ সম্ভবত মৎস্যও উর্বরতার প্রতীক। আরেকটা কারণ মীন স্বভাবত নিরাশ্রয়। বন্যাবেগে সে খালবিল থেকে নদী হয়ে সমুদ্রসন্ধানী হতে পারে। লক্ষণীয়, নারীর রজঃস্রাবকে দেহতত্ত্বের গানে বলা হয়েছে বন্যা। যেন কল্পনা করা হয়েছে নিরাশ্রয় প্রাণের ঈপ্সা মানুষের দেহরূপকে আশ্রয় করে পৃথিবীতে থাকতে চায়। তাই নারীর রজঃস্রোতে অসহায়ভাবে ভাসমান মীন, পুরুষ-শুক্রের স্পর্শে জীবন-লক্ষণ পেয়ে নারীর জননকেন্দ্রের ষড়দলপদ্মে (পদ্মও উর্বরতার প্রতীক) আশ্রয় নেয়। জড়িয়ে যায় জীবন লতায়। এই শুক্র ও রজের স্বরূপকে একটি গানে বলা হয়েছে কালা আর বোবা :

> পিরিতে পিরিতে সুরিতি ফিরিতে
> দেখা হল পথে কালা বোবার সাথে।
> বসত তাদের শুনি ভাণ্ডের মাঝারে—

দুই দেশেতে তারা দুইজন বসত করে
কী প্রকারে দেখা রাস্তার মাঝারে।

স্বতন্ত্র নর ও নারী দুজনের দেহভাণ্ডের অন্তর্গত শুক্র ও রজের অভূতপূর্ব সাক্ষাৎ সম্ভাবিত করে নতুন এক জীবনপিণ্ডকে। এ নিয়ে লোকায়ত ভাবনায় নানা মিথ গড়ে উঠেছে, দানা বেঁধেছে বহুতর দেশজ লোকলৌকিক আখ্যান। নারীগর্ভে সন্তান কেমন করে মাসে মাসে বেড়ে ওঠে তার কাল্পনিক বা অনুমিত ধারণা বেশ চমকপ্রদ। তার ক্রমবিকাশের বস্তুগত বিবরণ লৌকিক কল্পনায় জারিত হয়ে গানে বর্ণিত হয় এইভাবে :

প্রথম মাসে মাংসশোণিতময়
দুই মাসে নর নাভি কড়া অস্থি-র উদয়।
তিন মাসে তিনগুণে জীবের মস্তক জন্মায়।
চতুর্থেতে নেত্র কর্ণ ওষ্ঠ চর্ম লোম আনে।
পঞ্চমেতে হস্ত পদাকার--
পঞ্চতত্ত্ব এসে তবে করলেন সঞ্চার।
সেইদিন হল জীবের আকার ও প্রকার—
ছয় মাসেতে ষড়রিপু বসিল স্থানে স্থানে।
সপ্তমেতে সপ্তধাতু যে—
এরা আপন শক্তি লয়ে বসিল এসে
অষ্টমেতে অষ্টসিদ্ধি এল ভোগের কারণে।
নয় মাসে দশ ইন্দ্রিয় না রহে গর্ভধামে।

গর্ভসঞ্চারের পর পরবর্তী দশ মাসে সন্তানের দেহ গঠন বিষয়ে কৌতূহলপ্রদ এই দেহবাদী গানে লৌকিক কল্পনার এক চমৎকার বিচ্ছুরণ আছে সেকথা আগে বলেছি, কিন্তু সেইসঙ্গে গায়ক কথকদের ব্যাখ্যানের কথা বলা হয়নি। খুব বড়ো ধরনের ফকিরি গানের আসলে দক্ষ ও মননশীল গায়ক এ-জাতীয় গান করেন এবং কথকতার ঢঙে গানের সারার্থ বুঝিয়ে দেন। সেই সুবাদে আমি একবার সনাতন দাস বাউলের কাছে এই পদের যেরকম ব্যাখ্যা শুনেছি তা লিপিবদ্ধ করছি। এর অন্য ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি একই দেহতত্ত্বের পদের বাউল-ব্যাখ্যা একরকম, মারফতি ব্যাখ্যা আর একরকম, আবার সহজিয়া বৈষ্ণব ব্যাখ্যা অন্য একরকম। এই ভিন্নতার কারণ হল, উপধর্মগুলির মধ্যে তত্ত্ব ও করণের পার্থক্য। আসলে এসবই গুরুবাদী ধর্ম। একেক মতে একেক গুরু তাঁর মতো করে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আবার সেই ভাষ্য পেয়েছেন তাঁর গুরু বা মুরশিদেব বাচনে। যাই হোক, আলোচ্য গানে নারী-গর্ভে পাঁচমাস পর্যন্ত শিশুর সানুপুঙ্খ দেহ উপাদানের গঠন-বিবরণ বেশ সহজ ও সর্বজনবোধ্য। এরপরে শরীরে যে-পঞ্চতত্ত্ব আবির্ভাবের কথা বলা হচ্ছে তার অর্থ পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) গুণসঞ্চার, তার থেকেই জীবের আকৃতি আর স্বভাব নিরূপিত হয়। ছয়মাসে ষড়রিপু বলতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। সপ্তধাতু মানে শরীরের রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র। অষ্টসিদ্ধি অর্থ অণিমা, মহিমা, গরিমা প্রভৃতি ভাব। নবদ্বার বলতে দুই কান দুই নাক দুই চোখ এবং মুখবিবর, পায়ু ও উপস্থ (এখানে উল্লেখ করা যাক স্ত্রী জননাঙ্গকে দেহতত্ত্বের গানে 'দশমী দ্বার' বলা হয়)। দশ মাসে যে দশ-ইন্দ্রিয়ের প্রসঙ্গ আছে তার দুটি ভাগ। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় : চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক এবং পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় : বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। দশমাস পূর্ণ হলে এই দশ ইন্দ্রিয় গর্ভবাসে অস্বস্তি বোধ করে, তখনই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তান-গর্ভের অন্ধকার-পর্ব এবং ভূমিষ্ঠ হবার পর পৃথিবীর তীব্র আলোক পর্ব নিয়ে অনেক

মননশীল মানুষ চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন কার্ল সাগান তাঁর *The Amoniotic Universe*-বইতে লিখেছেন : গর্ভচ্যুত হয়ে মানবসন্তান দেখে বহু বিচ্ছুরিত তীব্র আলোকচ্ছটা আর জননী, ধাইমা বা চিকিৎসকের সিল্যুয়েট মূর্তি। কালো অস্পষ্ট মূর্তির পেছনে আলোর বৃত্ত থেকেই তার সংস্কারে ও চৈতন্যে লেগে থাকে এক অনুভব। দেবতা বা মহাপুরুষের মূর্তির পেছনে আমরা যে আলোকবৃত্ত (Halo) আঁকি তার কারণ ওই জন্মকালীন অভিজ্ঞতা।

এখানে স্বভাবত আমাদের কৌতূহল হতে পারে বাংলার লৌকিক গীতিকারের কল্পিত গর্ভের ভেতর সন্তানের স্তরে স্তরে বৃদ্ধির এই বস্তুগত বিবরণ বৈজ্ঞানিকভাবে অর্থাৎ শারীরবিদ্যার বিচারে কতখানি সঠিক। সে বিষয়ে অবিতর্কিত কোনো মন্তব্য না করে এই জিজ্ঞাসার অন্য একটা দিক বিচার্য। বাংলা দেহতত্ত্বের গানের পেছনে যে বহুবর্গের ধর্মসাধনার সমন্বিত সংগঠন বহুদিন ধরে ক্রিয়াপর তাতে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি, সুফিমত, তান্ত্রিক যোগক্রিয়া এবং সহজিয়া বৈষ্ণবদের ভাবনা নানাভাবে এসব গানে ছায়াসঞ্চার করেছে। জানা যায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের একটি শাখা শবব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে কৌতূহলী ছিল। মানবদেহের অভ্যন্তরীণ সংস্থান এবং যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল। তাঁদের কাছ থেকে এ-জাতীয় জ্ঞান লৌকিক বস্তুবাদী সাধকদের সমৃদ্ধ করেছিল এমন অনুমান স্বাভাবিক। বাংলা দেহতত্ত্বের কিছু গানে তাই শারীরবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিবেচনার নানারকম নমুনা পাওয়া যায়।

দেখা যায় দেহাত্মবাদী কায়াসাধনার একটি বড় ক্রিয়া হল দমের কাজ, শ্বাসের ক্রিয়া। এই শ্বাসপ্রশ্বাস কেবল যে জীবনধারণের একমাত্র উপায় তাই নয়, এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণে যৌন জীবনযাপনে সাধকরা বিশেষ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে থাকেন এবং এই পদ্ধতিতে জন্মনিরোধ করেন। দেহবাদী গানে বায়ু বলতে শ্বাসক্রিয়াকে বোঝায়। মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে সন্তান কেঁদে ওঠে এবং তার ফলে মুখবিবর দিয়ে শ্বাসবায়ু বা অক্সিজেন টেনে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বেলুনের মতো চুপ্‌সে থাকা ফুসফুস পূর্ণ হয়ে আবর্তিত হতে থাকে। বায়ু সেইজন্যই দেহতাত্ত্বিকদের গানে এক বড় ভূমিকা নিয়েছে। এমনকি এতদূর বলা হয়েছে :

মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে
দ্যাখোনারে সব হাওয়ার খেলা
বদ্ধ হতে দেরি কি হবে?
বদ্ধ হলে এ হাওয়াটি মাটির দেহ হবে মাটি।

আরেকটি গানে দম বা শ্বাসক্রিয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে খুবই অভিনব বিশেষণে :

তুমি ঘুমালে যিনি জেগে থাকেন
সেই তো তোমার গুরু বটে
সে যে আছে দেহের মাঝে
তারে ভালোবাসো অকপটে।

শ্বাসকে কেন 'গুরু' বলা হয়েছে তা বোধগম্য হয় গানের অন্তরায় পৌঁছালে— সেখানে বলা হয় :

করিলে তাঁর সাধনা সকলই যাইবে জানা
হবে না আর আনাগোনা এ ভব-সংসার সংকটে।

এইটাই সার কথা। শরীরে শ্বাসের কাজ কী তা বুঝতে হবে এবং এই শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দশমী-দ্বারে আর পতন ঘটবে না। অর্থাৎ যাকে বলা হচ্ছে গুরু, সেই শ্বাস বা দমের কাজকে নিজ দেহে যথার্থভাবে কায়েম করতে পারলে বিন্দুপতনের অনিবার্যতা নিবারিত হয়ে সাধক মুক্ত হয়ে যাবেন। তাঁর আর সন্তানসন্ততি হবে না। জড়িয়ে পড়বেন না সংসার সংকটে। ফকিরি মতে সন্তান নিরোধ অবশ্যকৃত্য।

লৌকিক বড় বড় যাঁরা সাধক ও গীতিকার তাঁদের নিজস্ব সন্তান নেই। শিষ্যদেরই তাঁরা বলেন 'শিষ্যশাবক'। সন্তানজন্ম বিষয়ে নিষেধাত্মক দুদ্দু-র একটি গানে বলা হয়েছে :

শরিক কোরো না রে মন করি বারণ
শরিকে বড় জ্বালা বারে বারে হবে জনম।
নিজবীর্যে পুত্রকন্যা জন্ম দিয়ে শেষে কান্না
কন্যাপুত্রের দিয়ে ধন্না বেড়াবে রে মন।
তাহারেই পুনর্জন্ম লালন সাঁই ফুকারিলে
শরিকের উল্টোকলে পড়ো না কখনও।

এখানে লা-সরিক সাধনার এই সতর্কবার্তা বোঝাতে দুদ্দু তাঁর গুরু লালনের বরাত দিয়েছেন। সন্তানজন্ম তথা অকারণ বীর্যক্ষয় বিষয়ে দেহাত্মবাদীরা অত্যন্ত সতর্ক। তাঁদের একটি গোপ্য সাধনার নাম বিন্দুসাধন। যাঁরা বিন্দুসাধনে ব্রতী নন, অথচ সন্তানজন্মের অতি প্রজতার পরিণামে দারিদ্র্যদুঃখ আর স্বাস্থ্যহীনতায় বিড়ম্বিত হয়ে ঈশ্বরের দোহাই পাড়েন, তাঁদের উদ্দেশে দুদ্দুর আরেক গানে বলা হয়েছে :

আপন হাতে জন্ম মৃত্যু হয়
খোদার হাতে হায়াৎ মউৎ কে কয়?
বীর্যরস ধারণে জীবন
অন্যথায় প্রাপ্তি মরণ
আয়ুর্বেদ করে নিরূপণ করি নির্ণয়।
নিজে বীর্যক্ষয় করে
পশুর মত পথে পড়ে
কতজন যায় মরে খোদার দোষ দেয়।।

এই গানে শিশ্নপরায়ণ ভণ্ড মানুষ সম্পর্কে যে তীব্র বিদ্রূপ তা দেহতত্ত্ববাদের গানে একধরনের দায়িত্বশীল সমাজবোধের পরিচয় বহন করেছে। অন্য কোনো কোনো গানেও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে উন্নত জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় রয়েছে। যেমন দীন শরতের গান থেকে একটি নমুনা :

এমন উল্‌টো দেশ গুরু কোন জায়গায় আছে
ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে সেই দেশে
লোক বাস করতেছে।
সেই দেশের যত নদনদী
ঊর্ধ্বদিকে জলস্রোতে বয় নিরবধি
আবার নদীর নীচে আকাশ বায়ু
তাতে মানুষ বাস করতেছে।
সেই দেশে যত লোকের বাস
মুখে আহার করে না কেউ নাকের নাই নিঃশ্বাস
তারা মলমূত্র ত্যাগ করে না
আবার আহার করে বাঁচতেছে।

ব্যাখ্যায় বোঝা যাবে গানে উল্লিখিত এই দেশটি মাতৃজঠর। সেখানে চন্দ্রসূর্য নেই। গভীর অন্ধকারে ঊর্ধ্বপদ হেঁটমুণ্ডে মানবসন্তান অবস্থান করে। উলটো অবস্থানের জন্য দেহের রক্তসঞ্চালন ঘটে উলটোভাবে।

গর্ভস্থ শিশু নিঃশ্বাস নেয় না বা মলমূত্র ত্যাগ করে না। জননীর মাতৃনাড়ির সাহায্যে শিশু তার আহার করে। কাজেই প্রহেলিকার মতো করে লেখা এই গান আসলে বস্তুগত অদৃশ্য সূক্ষ্ম দেহসত্যকেই প্রমাণ করছে।

দেহতত্ত্বের অন্যবিধ কোনো কোনো গানে নানা শহর গ্রামগঞ্জ জনপদের নাম রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোনো গানে ঢাকা শহর শব্দটি থাকলে বুঝতে হবে নারীর গোপনাঙ্গের ইঙ্গিত। যেমন যাদুবিন্দুর গানে :

ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষণ।
ঢাকা খুলে দেখলে পরে থাকবে না তোর
সাবেক মন।

তেমনই শান্তিপুর মানে সাধকের মনের শমতা, নবদ্বীপ মানে নবদ্বার, স্বরূপগঞ্জ মানে স্বস্থিত অবস্থা, দেবগ্রাম বলতে যেখানে দেহক্ষয় ঘটে, গুপ্তিপাড়া গুহ্যদেহের প্রতীক, আখেরিগঞ্জ অর্থে মৃত্যু। কলকাতাকে নিয়ে একটি সাংকেতিক গান আছে যার সারার্থ ভাঙলে মানবদেহের নানা ইঙ্গিত পাই। গানটি এইরকম :

তার বাইরে আলো ভিত্রে আঁধার
মানবদেহ কলিকাতা অতি চমৎকার,
চৌষট্টি গলির মাঝে ষোলোজন প্রহরী আছে
তিনশত ষাট নম্বরে হয় রাস্তা বাহাত্তর হাজার।

এর দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হল, মানবদেহের ভিতর গভীর অন্ধকার কিন্তু দেহের বাইরের জগৎ আলোকময়। চৌষট্টি গলির তাৎপর্য হল রক্তবাহী প্রধান ধমনি, যার সংখ্যা চৌষট্টি। ষোলোজন প্রহরী বস্তুত শরীরের ষোলোটি ভাল্ব। তার মধ্যে হৃৎপিণ্ড চারটি এবং দেহের অন্যপ্রান্তে বারোটি ভাল্ব শিরার মধ্যে রক্তের একমুখী প্রবাহে তাদের কাজ সম্পাদন করে। এই রক্তপ্রবাহ হৃৎপিণ্ড থেকে নির্গত হয়ে চৌষট্টি ধমনি পার হয়ে ক্রমে তিনশত ষাট শিরার মধ্য দিয়ে ধাবিত হয়ে বাহাত্তর হাজার উপশিরা ও স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। (এই ব্যাখ্যার জন্য আমি ঋণী লোকসংগীত গায়ক দিনেন্দ্র চৌধুরীর কাছে।)

গানের পরের অংশ :

মেজাজ খারাপ মির্জাপুরে লালবাজারে নিশান উড়ে
বউবাজারে গেলে পরে প্রাণে বাঁচা বিষম ভার।
চিড়িয়াখানা যাদুঘর মণি মঠ মহলের ঘর
বেলুড়মঠে কালীঘাটে আছে তিনজন অবতার।
চিন্তাগারদ আলিপুরে হাটখোলা হুগলী ধারে
খিদিরপুরে থরে থরে ঘাটে বাঁধা ইস্টিমার।

গূঢ়ার্থ ভেদ করলে বোঝা যাবে মির্জাপুর অর্থে দেহের স্পর্শকাতর অঙ্গ যা মির্জা বাদশার মেজাজের মতো। লালবাজার হল রক্ত আদান-প্রদানের কেন্দ্র অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড। বউবাজারের অনুষঙ্গ গণিকালয়ের সূত্রে অর্থাৎ শরীরের গোপ্য স্থান। চিড়িয়াখানা হল কুপ্রবৃত্তির আশ্রয়স্থল। জাদুঘর বলতে পুরাতত্ত্বের সংগ্রহশালা, মানব শরীরে যেমন মস্তিষ্ক, অজস্র স্মৃতির সঞ্চয় সেখানে। বেলুড়মঠ আর কালীঘাটের তিন অবতার আসলে শরীরের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। আলিপুরের জেলখানায় যেমন কয়েদিরা বন্দি থাকে, মানুষের দেহাভ্যন্তরে বা মনে থাকে চিন্তারা বন্দি হয়ে। হুগলি নদীর তীরে হাটখোলার মতো খোলামেলা এই দেহঘর। খিদিরপুরের ডকে যেমন স্টিমার বাঁধা থাকে তেমনই মানবদেহে কামনা-বাসনার অজস্র তরী সংযমের রজ্জু দিয়ে বাঁধা। এমন অনায়াসে দেহতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া গেল তার কারণ গুরু

সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ পরিচয়। কথায় কথায় তাঁরা এসব বলেন, বোঝান শ্রোতাদের। এমন ব্যাখ্যাই নিশ্চয় একতম বা চরম নয়। অন্যতর ভাষ্যও থাকতে পারে।

দেহতত্ত্বের গানে প্রহেলিকার চাতুর্য আর সন্ধা ভাষার ব্যবহার কিংবা অর্ধ-আবৃত যে সংকেত তার মূলে রচয়িতার সৃজন দক্ষতা নিশ্চয়ই রয়েছে কিন্তু গানগুলিকে আলো আঁধারি করে রাখার পিছনে সামাজিক কারণও ছিল। রবীন্দ্রনাথ লোকায়ত গায়ক ও সাধকদের সম্পর্কে বলেছেন, 'ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত', কিন্তু বলেননি ওরা যুগে যুগে উচ্চবর্ণের দ্বারা ঘৃণিত ও দলিত। আলেম মুসলমান আর নৈষ্ঠিক হিন্দু বারে বারে দেহাত্মবাদীদের নিপীড়ন করেছে, ভেঙে দিয়েছে তাদের একতারা, পুড়িয়ে দিয়েছে আখড়া। মানুষগুলি তাই গভীর অভিমানেই কি তাঁদের গানে আনলেন রহস্যের ধূসরতা আর শব্দের আবরণ? তা কেবল অবারিত রইল মুষ্টিমেয় মরমিদের হৃদয়ে? এটা যদি একটা সম্ভাব্য কারণ হয়, তবে আরেকটি কারণ গুরুবাদ। অর্থাৎ গানগুলির তত্ত্বব্যাখ্যার দায়িত্ব যাতে শুধু গুরু সম্প্রদায়ের হাতেই থাকে তার জন্যই গানের শরীরে একধরনের সচেষ্ট দুরূহতা আরোপ করা হয়েছে হয়তো। তবে সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত এই যে, যৌন যৌগিক গুহ্য গোপন তত্ত্ব সরাসরি বলা যায় না। গানের দরজা খোলার চাবি যদি গুরুর হাতে না থাকে তবে গুরুর গুরুত্ব কমে যেতে পারে। গুরুর ভূমিকা যেমন শিষ্যকে সব কিছু বোঝানো তেমনই শিষ্যের কাছ থেকে সেই সুবাদে অর্থ আদায়। সেই আদায়ের নাম কোথাও 'খাজনা', কোথাও 'জরিমানা'। গানের ব্যাখ্যা শিষ্যের মনপ্রকর্ষ বা আগ্রহের তীব্রতা বুঝে গুরু নানারকম করে থাকেন। শব্দগত দুরূহতার এও এক সুবিধা, যে যার নিজের মতো ভাষ্য করতে পারে। সেইজন্য সারা বাংলায় দেহতত্ত্বের গানে একই শব্দ সম্প্রদায়ভেদে স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। গানভেদে একই শব্দ আবার ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনা আনে। তাতে একটা মস্ত বড় ক্ষতি এই হয়েছে যে, সাধারণ শ্রোতারা দেহতত্ত্বের গানকে বহু সময় কৌতুকের বা রঙ্গের গান বলে গ্রহণ করেছে। 'দিনদুপুরে চাঁদ উঠেছে' বা 'ডাঙায় ডিঙে চলে' বা 'ঝিয়ের পেটে মায়ের জনম'-জাতীয় কূট প্রকাশভঙ্গি সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছে গ্রাম্য গানের একধরনের তামাসা বলে। সেই মনোভাব থেকে গানগুলিকে উদ্ধার করা শক্ত। কারণ দেহতত্ত্বের গান আজকাল হয়ে উঠেছে শহুরে যুবাদের বিনোদনের বিষয়। ক্যাসেট, রেকর্ড, দূরদর্শন ও কেঁদুলি মেলায় দেহতত্ত্বের গান না-বুঝে শোনা ও মুগ্ধ হয়ে মাথা নাড়া এখন নাগরিক ফ্যাশন। সাধনহীন বাউল গায়কও এখন অনেক পাওয়া যায়, গান গাওয়া যাদের জীবিকা শুধু।

এই কারণেই নতুনভাবে দেহতত্ত্বের গান রচনার ধারা কমে আসতে বাধ্য। জীবনযাপনের সৎ আর স্বতঃস্ফূর্ত উৎস থেকেই তো চিরকাল এসব গান বারে বারে উৎসারিত হয়েছে। আজকের বাংলায় সম্ভবত বড় মাপের কায়াসাধক যেমন নেই, তেমন প্রতিভাবান গীতিকারও নেই। তাই বলে গান রচনা থেমে থাকেনি। বহুরকমের সখের বাউল, বাউলপ্রেমী ব্যক্তি এমনকি গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষকও দেহতত্ত্বের গান লিখছেন। তাঁদের গানে ইংরিজি শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো আগেকার দেহতত্ত্বের গানের মতো প্রাণস্পর্শিতার গভীরতা আজকের গানে নেই, রূপক-প্রতীকগুলিও বহু ব্যবহারে ঘষা পয়সার মতো ম্লান এবং অচিহ্নিত, তবু গানের বেদনা ও আবেদন শ্রোতাদের কাছে সমান আকর্ষণীয়। এখনকার এক বাউল গায়ক (ধর্মে খ্রিস্টান, দীক্ষায় মারফতিপন্থার সাধক) স্যামুয়েল মণ্ডল তাঁর সত্তর পেরোনো বয়সের চেতনা থেকে যে-গান লিখেছেন তা মুদ্রিত হয়নি। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এখানে তার কিছুটা উদ্ধার করছি :

আপন ঘরের কোণে আছে মালিক
তারে চেনো না

ঘর ছাড়া বাহিরে খুঁজলে এ জনমে পাবে না।
আন্দাজেতে হাতড়ে মরো
না দেখে তার পূজা করো
জিজ্ঞাস করলে কি বলতে পারো
কেমন তাহার রূপখানা?
তোমার কাছে থাকে তোমায় দ্যাখে
তোমার নাম ধরিয়া সদাই ডাকে
তুমি তাকে দ্যাখো না।
লক্ষ টাকা খরচ করে
মন্দির আর মসজিদ গড়ে
তাতে পড়ে নামাজ শরার (শরীয়তি) সমাজ
করে পূজা উপাসনা।
ছেড়ে এই মানুষতত্ত্ব
বিপথে হলে মত্ত
স্যামুয়েল কয় মানুষ বর্ত
আমার ভাগ্যে হল না।

এই গানে ঘর বলতে দেহ বোঝানো হয়েছে, প্রসারণে বুঝতে হবে মানবদেহ, দেহমন্দির— বা বর্ত, অর্থাৎ বর্তমান, যা অনুমানের নয়। যেখানে মন্দির মসজিদের মতো মানুষের বদলে পাথুরে মূর্তিকে বা শূন্য নিরাকারকে আন্দাজে খুঁজতে হয় না। এইসব কথা দেহতত্ত্বের গানে বারবার বলা হয়, সেটাই ধরতাই। 'যাহা দেখিনি নয়নে/তাহা ভজিব কেমনে'— এই তর্কপ্রখর জিজ্ঞাসা দেহতত্ত্ববাদীদের গানে সদা উদ্যত। অনুমানের স্থান দেহতত্ত্বে নেই, তাই পূর্বজন্ম ও জন্মান্তরে তাঁদের ঘোর অবিশ্বাস। এই বাস্তব ইহলোক আর প্রত্যক্ষ স্পর্শযোগ্য দেহ নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকা, সেই দেহকে তার স্বরূপে জানা বোঝা, দেহকে সাধনা ক্রিয়াকরণ করে পক্বতা দান— এটাই তাঁদের লক্ষ্য। অন্যতর ভাবালুতা, আচার-আচরণ, সংযম, ব্রত পারণ, রোজা উপবাস, মন্দির-মসজিদের আড়ম্বর— ভণ্ডামি ও ভুলপথ বলেই বর্জিত ও ধিকৃত। আন্দাজে অস্পষ্ট প্রার্থিতকে হাতড়ে বেড়ানো, উপাস্যকে না দেখে না বুঝে পূজা করা দেহতত্ত্বের গানে উপহসিত হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ লোকায়ত জীবনের সন্ধানী মরমি মানুষ পথে প্রান্তরে ছড়ানো। বটের মূলে নদীর কূলে গড়ে ওঠা কত বাউল ফকির দরবেশদের আস্তানা, কত সহজিয়া আখড়া বা পির মুরশিদের মাজারে এখনো খুঁজে পান অন্তর্গূঢ় ভাবসাধনার গভীর শতাব্দীক্রান্ত চলাচলের রূপাঢ্য বর্ণমালা। শিষ্য-খাদেম-মুরিদদের গানে, জিকিরে, আয়ত চোখের চাহনিতে ধরা থাকে আদি উৎসের গভীর সন্নিপাত। 'বাতুন' বা অপ্রকাশ্য সেই লৌকিক চর্যার বাণী ধরা আছে দেহতত্ত্বের গানে। তাই অবাক লাগে না, যখন সামনাসামনি শুনতে পাই, পুথিগতভাবে অশিক্ষিত গ্রাম্য গুরু বা মুরশিদ হাজার বছর আগেকার অস্ফুট 'সন্ধা' (অভিসন্ধিত) ভাষায় লেখা চর্যাপদের পঙ্‌ক্তি শুনে স্পষ্ট বুঝে যাচ্ছেন তার নিহিত মর্ম। যেন তারহীন কোন্ ঐতিহ্যবহুল বৈদ্যুতিন সংযোগে কায়াবাদী সিদ্ধদের গানের অন্তর্বাণী আছড়ে পড়ে দেহতত্ত্ববাদী সাম্প্রতিক গ্রামীণ সাধকের চিত্ততটে। মাঝে মাঝে তাই শুনে মনে হয়, বাংলা গানের এই অনতি-আলোচিত ধারা সম্পর্কে আমরা বড় অচেতন, তার গভীর চলার গোপন চিহ্ন বিষয়ে খুব উদাসীন।

আরেকটা বিষয় যা বাংলা দেহতত্ত্বের গানে খুব আকর্ষণীয় তা হল ভজন-পূজন-ব্রত-উপবাসের বিপরীতে যৌনতা এবং সুস্থ শৃঙ্গারকামনাকে স্বীকার করার সবলতা অথচ তাতে গ্রস্ত না হওয়ার সাহসী সংযম। একজন গীতিকার বলছেন :

ব্রহ্মচর্য করেন যিনি
তিনি চিনে নেবেন চিন্তামণি—
হেরিবে তারে দিনরজনী
যদি না হয় শুক্রর ক্ষয়।

জলে নেমেও জল না-ছোঁয়ার এই রহস্যময় ক্রিয়াপরতা, সম্ভোগ অথচ উদাসীনচিত্ততা, দেহসাধকের খুব কঠিন অর্জন। সেই অর্জন থেকে যে-অনুভবের উত্তরণ তা ধরা পড়ে গানের অন্তরা অংশে :

কেউ বা ভজে দেবীদেবা
কেউ বা ভজে আল্লাখোদা—
ঘরের ভিতর আছেন বাবা
তার সঙ্গে নেই পরিচয়।

এখানে 'বাবা' বলতে পিতৃবস্তু, শুক্র। তাকে জানা, তার অমোঘ জননশক্তিকে জানা, আবার সেই শক্তিকে জয় করা আত্মনিয়ন্ত্রণে অর্থাৎ দেহকর্তৃত্বে, উৎপ্রেক্ষায় বলা হয়েছে যেন 'সাপের মুখে ব্যাঙের নাচ'— এতটাই রহস্যময়, অলীক। কিন্তু সত্যিই কি অলীক, অসম্ভব? এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খাঁটি ফকিরি মতে সন্তানজন্ম নিষিদ্ধ। শোনা যায়, লালনশাহি মতের উত্তরসাধক পাঞ্জু শাহের সন্তান হয়েছিল বলে মূল স্রোত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাঁকে।

দেহতত্ত্বের গানে 'বাবা' আর 'মা' শব্দদুটি যেমন তাৎপর্যবাহী, 'বাবা-ছেলে' আর 'মা-মেয়ে' শব্দ-যুগল তেমনই দ্ব্যণুক (Binary opposite) সম্পর্কে চমকপ্রদ। বাবা থেকে ছেলে, আবার সেই ছেলেই হবে বাবা, কাজেই যে বাবা সেই ছেলে, দুজনের কাজ শুক্র বা মূলবস্তুকে রক্ষা করা। তেমনই যে-মার গর্ভ থেকে কন্যা (ঝি) জন্মাচ্ছে, ভবিষ্যতে সেই কন্যার গর্ভ থেকে জন্মাবে আরেক মা—সেই অর্থে বলা হয়েছে 'ঝিয়ের পেটে মায়ের জনম'। এইসব আপাতরহস্য মীমাংসা হলে ক্রমে বোধগম্য হবে নিচে উদ্ধৃত গানের মর্ম :

যারে বল মেয়ে মেয়ে
এ কোন্ মেয়ের খাইলে দুগ্ধ
কারে করলে বিয়ে?
তারে কোন্ চেনাতে চিনে নিলে
তা আমারে বল না।

নারীকে প্রকৃতপক্ষে কোন্ চোখে দেখতে হবে, কৌশলে সেকথাই ফুটল গানে। সাধিকার মধ্যে জননীকে অনুভব করা, মাতৃকাশক্তির প্রাধান্য, দেহতত্ত্বের গানের ভুবনে নারীকে এক সম্ভ্রমের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। তার সঙ্গে কাম সম্পর্কের স্পর্শকাতরতা পরিহার করতে হবে। এইবারে বলা হচ্ছে :

যারে বল জগৎ জননী
মায়ের ঝিয়ের এক দরজা
শুনে নাও ধনী।
তারে কোন্ আসনে আসন দিলে
তা আমারে বল না।

'মায়ের ঝিয়ের এক দরজা' মানে স্ত্রী-যোনি। সেইপথে সন্তানজন্মের সূচনা, সেই পথেই নিষ্ক্রমণ। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, নিম্নবর্গের লোকায়ত সমাজে মাতৃজাতির মান্যতা অসামান্য। কৃষিভিত্তিক গ্রামিক

জীবনে বীজের চেয়ে জমির মান্যতা বেশি, কেন-না তা বীজকে ধারণ করে ও শস্য সম্ভাবনাকে বাস্তবতা দেয়।

বীজ, জমি, বাবা, মা, মেয়ে এইসব অতিপরিচিত শব্দগুলি যথেচ্ছভাবে কেমন আমরা বলে যাচ্ছি অথচ ভেতরে ভেতরে এসব শব্দের আড়ালে ঝলসে উঠছে এক অন্য সংকেত। যেমন চকমকি আর পাথরের সংঘর্ষে জেগে ওঠে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ভাষাতত্ত্ব-শাস্ত্রে একেই সরলভাবে বলে সেমান্টিকস্। কিন্তু সেখানে সেইসব শব্দই কেবল উদাহরণীয় হয়ে ওঠে যার প্রচলিত অর্থ পালটে গিয়ে লোকনিরুক্তির স্বভাবে একটি অন্য অর্থ (এমনকি বিপরীত বা হীনার্থ) দাঁড়িয়ে গেছে। দেহতত্ত্বের গানের যে অর্থান্তর তার ধরন আলাদা রকমের। সেখানে বিশেষ দীক্ষিত শ্রোতাকে শব্দের নিগূঢ় বা গুহ্য অর্থ গুরু জানিয়ে দেন। অন্যের কাছে তা অপ্রকাশ্য তো বটেই, অগ্রহণীয়ও। 'ঝিয়ের পেটে মায়ের জনম', 'মৃত্তিকাহীন সরোবর', 'বারোমাসে বারোটা ফুল' এসব অনুষঙ্গের ইঙ্গিত না বুঝে দেহতত্ত্বের গানের শহুরে শ্রোতা ভাবেন এ বুঝি ননসেন্স রাইম বা প্রহেলিকা। আসলে গুরু- শিষ্য ও গায়ক-শ্রোতার সংবৃত সমাজে দেহতত্ত্বের গানের গোপন উন্মোচন ঘটে। যেমন ধরা যাক একটা গানের নমুনা :

বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে তিন রঙের
নীল জরদ সাদা—
কোন্ ফুলে শ্রীকৃষ্ণ থাকে
কোন্ ফুলে শ্রীরাধা

এখানে শিষ্ট মানুষ কি বুঝবেন জানি না, তবে দীক্ষিত শ্রোতা বুঝে নেবেন বৃন্দাবন অর্থে গুপ্ত বৃন্দাবন, অর্থাৎ স্ত্রী জননাঙ্গের সেই অংশ যেখান থেকে উৎসারিত হয় রজঃস্রোত। রজোপ্রবৃত্তি থেকে রজোনিবৃত্তি পর্যন্ত সেই স্রোতোধারার তিনদিনে তিন রং। অন্য মতে চার রং— নীল-লাল-সিয়া-সফেদ। তার মধ্যেই 'বর্তমান'-পন্থী দেহসাধক উপলব্ধি করেন রাধাকৃষ্ণের যুগলতত্ত্ব বা যৌগ। এখানে ফুল মানে তাহলে রজ। এবারে গানের পরবর্তী উন্মোচন :

ফুল ফোটে বারো বৎসর পরে
মাসে মাসে সে ফুল ধরে—
ফলেতে এ জীব ভুলেছে
ফুলেতে রসিক মেতেছে।

পাঠক, এবারে দীক্ষিত লৌকিক শিষ্যের মতো বেশ বুঝতে পারছেন— গানে বলা হচ্ছে, বারো বছর বয়স হলে নারীদেহ ঋতুমতী হয়, তারপরে মাসে মাসে সেই ফুল দেখা দেয় দেহপ্রকৃতির নিয়মে। এই ফুলের যে ফল অর্থাৎ সন্তান, তার মায়ায় জীবজগৎ পাগল কিন্তু রসিক সাধকের অন্বিষ্ট ওই রজোস্রোতের অন্তর্গত সত্তাটিকে বশে এনে জ্যান্তে মরা। এবারে বোঝা গেল, এ তো প্রহেলিকা নয়, নিতান্ত বস্তুগত স্পষ্ট কথা।

ঠারেঠোরে শব্দের কৌশলে গানের আবরণের মধ্যে তত্ত্বের ভাবরস লুকিয়ে রাখা হয় এমনতর মরমিগানে। যাঁরা সে-আবরণ ভেদ করে ভাবগ্রাহী হতে পারেন তাঁদের চলতি কথায় বলে 'মর্মিক মানুষ'। মর্মিকজনের জন্য এমন একটা পদ হল :

পাও পাগল হাঁটবার চাইলে
হস্ত পাগল ধরব বইলে
চক্ষু পাগল দেখব বইলে
জিহ্বা পাগল মিঠার লোভে।

মন পাগল তন পাগল
দেহের মধ্যে ছয়টা পাগল
পাঁচ পাগল বুঝাইতে পারি
এক পাগল ডুবায় সকল।

কী সুন্দর বাসনাময় গান, স্পষ্টোচ্চারিত, জীবনগন্ধী। দেহের ছটা পাগল কে আর না বুঝবে? কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য। যে-পাগল সব কিছু ডোবায় তার নাম সর্বাগ্রে, অর্থাৎ কাম। এখানে মনে পড়ল দেহতত্ত্বের গান কখনো-কখনো ধাঁধার মতো বেশ বিন্যস্ত লাগে। আদিবাসী সমাজই হোক আর গ্রামিক সংহত সমাজই হোক, ধাঁধা যারা বানায় তাদের উন্নত মনন আর সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি থাকে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা বা পুথিগত বিদ্যা না থাকলেও চলে। উদাহরণত সাঁওতাল সমাজ থেকে পাওয়া একটা ধাঁধায় পাই :

ব্যাঙাচি খায় দুই পুকুরের জল

বর্ণনার আভাসে আসল কথাটি এক অপরূপ দৃশ্য : স্তন্যপানরত শিশু। কল্পনার চমৎকারিত্বে খুব উন্নাসিক শহুরে রুচিও চমকে যায়। এইরকম আরেকটা উজ্জ্বল দ্যোতনাময় উচ্চারণ পাই বিষ্ণু দে-র অনুবাদে ছত্তিশগড়ী গানে :

কী করে ভাঙলে
সোনার কলসীখানি
বলো তো কোথায়
হারালে তোমার জ্বলজ্বলে যৌবন?

সোনার কলসি আর জ্বলজ্বলে যৌবন কত অনায়াসে ঠাঁই বদল করে নেয় আদিবাসীদের ভাবনার রঙে। হয়তো এ পথেই দেহতত্ত্বের গান বোঝা সবচেয়ে সহজ ও ইঙ্গিতবাহী।

কিন্তু তাতে একটা বড়ো বাধা শব্দার্থের। দেহতত্ত্বের গানে নানা প্রতীক-প্রতিমা-রূপক শব্দকে জড়িয়ে ধরে লতিয়ে আছে। সমস্যা এই যে, অঞ্চলভেদে, গৌণধর্ম-সম্প্রদায়ভেদের গুরুর ভাষ্যভেদে একই শব্দ একাধিক ব্যঞ্জনা আনে, আনতে পারে। নানা গান ঘেঁটে কয়েকটি বহু ব্যবহৃত শব্দ আর তার অর্থ এখানে পেশ করছি সকলের অবধানের জন্য।

অজর = মল, রামরস = মূত্র, চন্দ্র = বাঁ নাক, সূর্য = ডান নাক, ঊর্ধ্ব = বাঁ চোখ, লঙ্কা = মুখ, দশানন = দাঁত, বাণ = লিঙ্গ, অমাবস্যা = রজঃস্রাবের সময়, জাহাজ = দেহ, ভেদ = তত্ত্ব, মদনগঞ্জ = কামকেন্দ্র, মেঘনা নদী = প্রেমসাধনার রূপক, চোর = মনের মানুষ, মাটি = মল, কিস্তি= দেহ, গৌর = সাধকসাধিকার মিলিতরূপ, বাঁশি = গাঁজার কলকে।

বাংলা দেহতত্ত্বের গানে ভাষা-ব্যবহারের এই বিশেষ পরিকল্পিত ছক লক্ষ করলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটা উদাহরণক্ষেত্র মেলে। সমাজভাষাতত্ত্ব (Sociolinguistics) এবং ভাষা-পরিকল্পনা (Language Planning) বলে দুটি সংজ্ঞা এ সূত্রে গ্রহণযোগ্য। ভাষাবিদ্ অধ্যাপক মনসুর মুসা তাঁর *ভাষা-পরিকল্পনায় সমাজতত্ত্ব* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫) বইতে লিখেছেন সমাজ ও ভাষা এই দুই সংশ্রয় (System) নিয়ে গড়ে উঠেছে সমাজভাষাতত্ত্ব। সমাজ ও ভাষা দুটোই পরিবর্তনশীল। তবে সেই পরিবর্তন চক্রাকার নয়, কেন-না ভাষার ক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জন-জীর্ণতা যেমন আছে তেমনই নতুন উদ্ভাবনেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। ফলে সমাজের গতিধর্ম আর ভাষার পরিবর্তন-ধর্ম পরস্পরকে প্রভাবিত করে। মনসুর মুসার মতে:

সমাজ-পরিবর্তন গতানুগতিক কিংবা অসচেতন হতে পারে। আবার হতে পারে পরিকল্পিত ও সচেতন। ভাষার পরিবর্তনও তদ্রূপ। ভাষা তার অভ্যন্তরীণ গতিশীলতার ফলে পরিবর্তিত হতে

পারে ;অথবা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবেও ভাষার সংশ্রয়ে পরিবর্তন আনতে পারে। প্রথমোক্ত পরিবর্তন সাধারণ সমাজ ভাষাতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে কিন্তু সচেতন পরিবর্তনের তত্ত্ব আলোচিত হয় ভাষা-পরিকল্পনায়। 'ভাষা প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তিত হয় ;এ পরিবর্তনে মানুষের কিছুই করণীয় নেই'— উনবিংশ শতাব্দীর এ ধারণা এখন ভাষাতত্ত্বে অচল।

ভাষাবিদের এই শেষ মন্তব্যের ইঙ্গিত নিয়ে আমরা তাহলে বলতে পারি বাংলা দেহতত্ত্ব গানের ভাষা এক বিশেষ গুহ্য লোকধর্ম সম্প্রদায়ের আচরিত ও পরিকল্পিত ভাষা-পরিকল্পনা। এই আলোকে দেহতত্ত্ব গানের ভাষাবিচার ও শ্রেণিকরণ এক নতুন ভাবনাকে সম্ভাবিত করে এবং লক্ষ করা যায় প্রাগাধুনিক যুগেরও পূর্ব পর্যায় (আদি-মধ্য যুগ)ভুক্ত চর্যাগান থেকে সর্বাধুনিক বাউল গানটির শব্দার্থবিন্যাসে ভাষা-পরিকল্পনার এক উদাহরণীয় বিন্যাস লুকিয়ে আছে। তাদের পরম্পরা কেবল গুহ্য সাধনার সমতাজাত নয়, তাতে সূক্ষ্ম ভাষা-পরিকল্পনাগত মিলটুকুও চমকপ্রদ। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, তান্ত্রিক পুথিগুলি সম্পর্কে Mercia Eliade বলেছিলেন, যে সেই পুথি 'Frequently couched in intentional language—a secret,obscure language with a double meaning'। এখন দেখা গেল, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকেও, নিজেদের সংবৃত নির্জন জগতে, সহজিয়া-ফকির-বাউল-মুরশিদা-সাহেবধনী-কর্তাভজা-বলরামী এবং জানা-অজানা বহুতর গৌণ সম্প্রদায় আভিপ্রায়িক ভাষা-ব্যবহারের গহন গভীর প্রকর্ষে এক আশ্চর্য অন্তর্বাণীর আকৃতি রেখে গেছেন। যেন অনাবিষ্কৃত শিলালিপির অজানা হরফ এইসব গান।

দুই

দেহতত্ত্বের গান আমাদের দেশে দুই ধরনের সাধক লিখেছেন। যাঁরা কায়াসাধক আর যাঁরা মরমিয়া। এই দুইবর্গের সাধকই নিজেদের সহজপথের পথিক বলে আখ্যাত করেছেন। বৌদ্ধ সহজযানের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব বা মধ্যযুগের সন্ত সাধকদের সহজমার্গের ধারার পার্থক্য কী এবং মিলই বা কতটুকু সে বিচারে যাওয়া জরুরি হয়তো নয়। কিন্তু এই কথাটা বুঝে নেওয়া খুব দরকার যে, সমাজে উচ্চবর্ণের দেবদেবীর পূজার সমান্তরালে দেহচেতনাসম্পন্ন এই গুহ্য সাধনার বিশিষ্টতা গড়ে উঠল কী করে। কিছু পণ্ডিত মানুষ মনে করেন মূর্তিপূজা হিন্দুধর্মের প্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র বা সাধকদের জীবনধারা থেকে তা প্রমাণিত হয় না। বেদ-উপনিষদে মূর্তিপূজা নেই, সাংখ্যবেদান্তেও দেবতার পরিকল্পনা নেই। পুরাণেই প্রথম দেবদেবী পরিকল্পনার আভাস জাগে। অদ্বৈতবাদের ঝোঁক ছিল দেবতাকে জানা নয়, নিজেকে জানা। আমাদের মরমিয়া সহজ সাধকরা তাঁদের স্বাভাবিক ভারতীয় ঐতিহ্য থেকেই আত্মোপলব্ধির পথকে প্রাধান্য দেন। বাঙালি সহজিয়ারা বহুদিন আগেই বলে গেছেন :

আপন শরীরতত্ত্ব জানে যেই জন।
সেই তো পরমযোগী শাস্ত্রের বচন।

এর পরের কথাটি হল :

নিজ দেহ জানিলে আপনি হবে স্থির।

অর্থাৎ অন্তরের শমতা তথা আত্মোপলব্ধির পথ হল নিজের শরীর-তত্ত্বকে জেনে সাধনায় সিদ্ধিলাভ। এ থেকে বোঝা গেল, এখানে আত্মোপলব্ধির অর্থ নিজের শরীর আর তার অভ্যন্তরের শিরা, নাড়ি, শ্বাস ও চক্রের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং প্রাণ ও আত্মাকে বুঝে নেওয়া। এ ব্যাপারে সাধনার দুটি পথ হল স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া মানে স্বকাম এবং পরকীয়া মানে নিষ্কামসাধনা। অর্থাৎ স্বকীয়াকে আশ্রয় করে পরকীয়ায় পৌঁছানোই সহজ সাধনার লক্ষ্য।

কায়াবাদীরা সত্যিই বিশ্বাস করেন যে 'লজ্জা ঘৃণা ভয়/তিন থাকতে নয়', তাই শরীরের বর্জ্য পদার্থ মল মূত্র রজ বীর্য তাঁরা বিনা সংকোচে পান করেন— কেউ কেউ সরাসরি, কেউ কেউ অন্য অনুপানে মিশিয়ে। তাকে বলে 'চারিচন্দ্র' সাধন। চারিচন্দ্রের আরেক অর্থ আব আতস খাক বাদ, অর্থাৎ জল আগুন মাটি বাতাস। সেক্ষেত্রে চারচন্দ্রের সাধনা বলতে বুঝতে হবে জল, মাটি, আগুন ও বাতাসের সংরাগে জীবনযাপন। চন্দ্র শব্দটি দেহবাদীদের পক্ষে খুব দ্যোতক। স্বর্গচন্দ্র আর দেহচন্দ্রকে এক করাই তাঁদের কাজ। তাঁদের বিশ্বাস, মানবশরীরে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র আছে। বিশেষ চন্দ্রসাধনে নাকি জন্মমরণ রোধ করা যায়। গানে বলা হয়েছে :

দেহের তত্ত্ব জানবি তবে আগে গুরুর চরণ ধর
পাবি রে তুই নিত্যদেহ চারিচন্দ্র সাধন কর।

নিত্যদেহ লাভ করার অর্থ 'জ্যান্তে মরা'। সাধক সেই অবস্থায় পৌঁছতে চান। 'জ্যান্তে মরা' শব্দবন্ধটি লৌকিক গানে খুব ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়। এ শব্দের নানারকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন মনে করেন, 'জ্যান্তে মরা' মানে নিজের খুদি বা সত্তাকে খোদার সত্তায় 'ফানা' করে তাঁর অদ্বিতীয় ঐশ্বরিক সত্তায় অবস্থান করা। খোদার ধ্যানে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থা। এ অবস্থা স্বকীয় সত্তার মৃত্যু, কিন্তু দৈহিক মৃত্যু নয়। জীবন্ত অবস্থায় মানবীয় সত্তার এ বিলোপসাধনকে বাউলরা জ্যান্তে মরা, মরা ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে। বাউলদের এ সাধনার সঙ্গে সুফিদের সাধনার মিল আছে। সুফিরা এ অবস্থাকে 'ফানা' বলেন। এ ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিরোধী মতও আছে। সেখানে বলা হয় কায়াবাদী নরনারীর দৈহিক সম্ভোগে যখন আত্মবিস্মৃত মগ্নতা আসে, দেহবোধের সেই গভীর স্তরকে বলা হয় 'জ্যান্তে মরা'। সাধক সেই অবস্থায় পৌঁছতে চান। জ্যান্তে মরার ভাবগত তত্ত্বটি পারস্য থেকে সুফিসাধকদের সূত্রে বোধহয় এদেশে এসেছে, অবশ্য ভারতীয় সাধনাতেও অচঞ্চল মনের আকাঙ্ক্ষা আছে, সেখানে বলা হয় :

যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে।

অর্থাৎ মন যখন চঞ্চলতাহীন তখন তাকেই মৃত বলা যায়। একেই বলে জ্যান্তে মরা। বলাবাহুল্য শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে স্ববশে আনলে মনকে অচঞ্চল করা সম্ভব। কেউ কেউ করেন। আরেক উপায় হল প্রকৃতি থেকে পাঠগ্রহণ। যেমন পৃথিবী থেকে শিখতে হবে সহিষ্ণুতা, আকাশ থেকে অসীমতা ও নির্লিপ্ততা, চন্দ্র থেকে শান্তি, সূর্য থেকে তেজ ও প্রকাশধর্মিতা, জল থেকে মালিন্যহরণ ও তাপহরণশক্তি, পবন থেকে সদামুক্ত গতি। অর্থাৎ মূলীভূত উপাদানকে শরীরে স্বীকরণ।

যাই হোক চন্দ্রতত্ত্বের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের কথা। কায়াবাদীদের বিশ্বাস মানবশরীরে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র আছে, যথা :

সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব ওই
হাতে দশ পায়ে দশ গণ্ডস্থলে দুই।
অধরে ললাটে দুই অর্ধচন্দ্র তার উপর।

এই চন্দ্রবহুল মানবশরীর নিয়ে যখন পুরুষ-নারী সংগমরত হয় তখনই তাকে বলা যায় 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে'।—একথা আমাকে বুঝিয়েছিলেন এক ফকির।

অবশ্য এ ছাড়া চারিচন্দ্রের অন্য ধরনের ব্যাখ্যাও আছে। একটি গানে রয়েছে :

চারিচন্দ্রের জান রে সন্ধান
একটি গরল একটি উন্মাদ রোহিণী আর বাণ।
গরলেতে আছে সুধা জেনে লওরে তার খবর।

এখানকার ভাষ্য বেশ গুহ্য। নারীর রজঃস্নানের চারটি দিনে রজের নামান্তর দেহবাদী সাধকদের কাছে যথাক্রমে গরল, উন্মাদ, রোহিণী ও বাণ। 'গরলেতে আছে সুধা'— এই বাণীর পেছনে রয়েছে এমনতর বিশ্বাস যে রজোপ্রবৃত্তির প্রথম দিনের শেষে এবং দ্বিতীয় দিনের শুরুতে জোয়ার আসে। সেই জোয়ারের নাম অমাবস্যা। আর সেই ঘোর অমাবস্যার যোগে মহামীনরূপে অধর বা অটল মানুষের আবির্ভাব ঘটে।

সে মীন রয় চিরদিন
দুরন্ত মীন
মৃত্তিকাহীন সরোবরে।

তাকেই বলে 'অমাবস্যার চাঁদের উদয়'। এটাই সাধক-সাধিকার দেহসংযোগের শ্রেষ্ঠ লগ্ন। একজন গীতিকার এই গুহ্য মন্ত্রসাধনের তত্ত্ব গানের বাণীতে সাবলীলভাবে বলেছেন :

তিনটি রসের সাধন যে জানে
সেই পাবে নিরঞ্জনে—
গরল সুধা মিলন করে সুধার মিলনে।
পদের (প্রতিপদের) শেষে দ্বিতীয়ার প্রথমে
রত্ন মেলে তিনরস মিলনে।

নারীশরীরের এই রজঃস্রাবের চারদিনকে লোকায়ত গানে নানা প্রতীকে ব্যঞ্জিত করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত প্রতীক হল ফুল, যা উর্বরতার প্রতীক— বহু গানে আছে আবের (জলের) গাছে ফুল ফোটার তত্ত্ব :

দ্যাখো আবের গাছে ফুল ধরেছে
মীন রয়েছে তার ভিতরে।
সেই ফুলের চারদিনের চার রং —
পাগলা কানাই বলছে দেহ মাঝে মালিক সাঁই
ও নদীব চার রঙের আসে পানি।

সিয়া (কালো), সফেদ (সাদা),লাল ও জরদ (নীল)। বাউল ও সহজিয়াদের মতো বাঙালি ফকিরদের সব সাধনতত্ত্ব ও বিশ্বাস, দেহ ঘিরে গোপন সাধনার মধ্যে ব্যক্ত হয়। তাই তাঁরা এই চার ফুলের, তাঁদের মতো করে একটি অন্তর্গূঢ় ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। সেই মারফতি ব্যাখ্যায় সিয়া মানে 'আলেফ', সফেদ মানে 'হে', লাল মানে 'দাল' এবং জরদ মানে 'মিম'। এই চার হরফ একত্র করলে তার অর্থ দাঁড়ায় আহম্মদ। আহম্মদ অর্থে দেহ। আহাদ মানে প্রাণ, তারই সাকার রূপ আহম্মদ। অর্থাৎ এই সাকার মানবদেহেই রূপ নিয়েছেন আল্লা।

মারফত কথার অর্থ বিশেষ জ্ঞান। তা শরিয়তের (অর্থাৎ কলমা, নামাজ, রোজা, যাকাতও হজ) প্রকাশ্য সাধনার বিরোধী। মারফতিরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লার সঙ্গে যখন নবির মিলন হয়েছিল তখন নব্বই হাজার কথা জারি হয়েছিল। তার মধ্যে তিরিশ হাজার কথা প্রকাশ্য ('জাহির') এবং ষাট হাজার কথা গোপন ('বাতুন')।

তাই গানে বলা হয়েছে :

মারিফত বিচার কর বসিয়ে শরিয়তের কোলে
ষাইট হাজার গোপনের কথা নিষেধ করেছেন রসুলে।

এই গোপন কথার অনেকগুলি ঠারে ঠারে প্রতীক ও উপমায় দেহতত্ত্বের গানে ভরা আছে। একমাত্র

মারফতি মুরশিদ (গুরু) তার একনিষ্ঠ মুরিদকে (শিষ্য) এসব শব্দের ব্যাখ্যান করেন পরিবেশ ও অধিকারীভেদে। সম্ভবত এই কারণেও এ-জাতীয় গানে একটা আবরণের দরকার হয়েছে। তবু তাঁদের বিশ্বাসের সার কথা হল আগে 'খদ্' (দেহ) জানলে তবে খোদাকে জানা যাবে। নামাজি, হাজি ও কলেমায় বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান শরিয়তপন্থী মুসলমানদের (তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) পক্ষে মারফতিদের এই 'বাতুন' তত্ত্ব খুব রোচক নয়। তাই যুগে যুগে শাস্ত্রবাদী শরিয়তিদের সঙ্গে দেহবাদী গুহ্য সাধক মারফতিদের অন্তহীন সংগ্রাম চলছে। মতভেদ ও মনান্তর আছে সহজিয়া বৈষ্ণবদের সঙ্গে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদেরও। কারণ সহজিয়া ধারা দেহসাধনার গুহ্য বিশ্বাসে আস্থাশীল। তাঁরাও মনে করেন সাধনার দুটি পথ 'অনুমান' ও 'বর্তমান'। গানে বলা হয়েছে তাই :

চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে।

নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ-রাধা-বৃন্দাবন-দ্বাদশ গোপাল, ষড় গোস্বামী এসবকে সহজিয়ারা 'অনুমান' বলে উড়িয়ে দেন। যা চোখে দেখা যায় না, যা আন্দাজি, যা পুথির পাতায় শুধু আছে, তাতে বিশ্বাস কি? তার চেয়ে নিজেদের 'বর্তমান'-সাধনায় সহজিয়ারা সাধক-সাধিকার নিজ দেহেই কৃষ্ণ-রাধা-বৃন্দাবন ইত্যাদিকে বুঝে নিতে চান। তাঁদের কথাটা অনেকটা এইরকম যে :

কানে কানের কথা শুনে সন্দেহ জেগেছে প্রাণে
লেখা কথায় পাই কেমনে কোন্ কথা রয়েছে মূলে।
লেখা ছেড়ে দেখা বিচার করলেই বুঝবে সারাৎসার।

লেখা ছেড়ে দেখাকে বড় করার অর্থই হল শাস্ত্রের চেয়ে দেহকে, কল্পনার চেয়ে বাস্তবকে, পরলোকের চেয়ে ইহলোককে প্রাধান্য দান। ফকিররাও ছাপা কেতাবের চেয়ে 'দেল-কেতাব' পড়ার নির্দেশ দেন। সহজিয়া বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা 'ভ্রষ্ট', 'বিকৃত', 'কামাচারী', 'সহুজে', 'নেড়ানেড়ি' এসব অপবিশেষণ দিয়েও শোধন করতে পারেননি। দেহকেই তাঁরা গুপ্ত-বৃন্দাবন বলে মনে করেন। নিজ দেহের মধ্যেই কৃষ্ণ-রাধাকে আরোপ করেন। শরীরের সর্বকেন্দ্রে সহজিয়ারা প্রতীকীভাবে খুঁজে পান দেবদেবী ও অবতার :

চূড়াতে চূড়ামণি ব্রহ্মা করে স্থিতি
কপাল মাঝে মহাবিষ্ণু করেন বসতি।
চক্ষেতে কালাচাঁদ বসে করে ধ্যান
নাসিকায় নিত্যানন্দ মধু করে পান।
কর্ণেতে চৈতন্য সদা করিছে সাবধান
আলজিহ্বে আহ্লাদিনী গায়ে গঙ্গাধাম।
জিহ্বা নিচে সরস্বতী বাক্যাদি যোগান
ডান হস্তে কানাই আর বামে বলরাম।
হস্তপদ বক্ষমাঝে জগন্নাথের বসতি
নাভিমূলে গৌরব্রহ্ম প্রেমের শকতি।
লিঙ্গে মহাদেব আর গুহ্যে ভগবতী।

এ জাতীয় রচনা সহজিয়া পদে অনেক রকম আছে। সব কিছুর লক্ষ্য একটি—সাধককে অনুমান থেকে বর্তমানের দিকে আকর্ষণ করা। শাস্ত্র মূর্তি শঙ্খ ঘণ্টা মন্দির ধূপ দীপ আর নানারকম ভাবাত্মক সাধনার বদলে বস্তুবাদী সাধনার পথে গোপন ভুবনে প্রবেশ করানো। সেখানে 'হাবার কথা কালা বোঝে' (রজ-বীর্যের

ইঙ্গিত), সেখানেও প্রতিপদের চন্দ্র আর দ্বিতীয়ার চন্দ্রোদয় ঘটে। সেখানেও নামান্তরে রয়েছে 'নীলচন্দ্র লালচন্দ্র শ্বেতচন্দ্র ঘটা / হিঙ্গুলবরণ চন্দ্র তার শশী গোটা গোটা।' ধর্মধারণা আর তার রূপায়ণে দেহকে অগ্রাধিকার দানের অন্তঃশীল রহস্যময়তার সূত্রে বৈষ্ণব সহজিয়া, মারফতি, কর্তাভজা, সাহেবধনী, ও বাউলদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

ঘনিষ্ঠতার এই সূত্র জেগে উঠেছে উপধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এক সাধারণ বিশ্বাসের জোরে। এঁরা সবাই দুটি কথার উপর খুব জোর দেন। প্রথমত, এঁরা মানেন যে দেহের কোনো জাত নেই এবং দ্বিতীয়ত, এঁরা মানুষকে সবচেয়ে বড় স্থান দেন। স্থান দেন এমনকি শাস্ত্র মন্ত্র ধর্ম আচরণ ও শ্রেণির উপরেও। সেইজন্য হিন্দু-মুসলমান খ্রিষ্টান বৈষ্ণব কারোর মধ্যে এঁরা ভেদবুদ্ধি আনেননি। অসাম্প্রদায়িকতার এমন ব্যাপ্তবোধ ও মানবিকতার ধারণা আমাদের সগর্ব সম্পদ। আমাদের উচ্চবর্গের ধর্ম যখন পরস্পর বিবদমান এবং শ্রেণি ও পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত তখন এই দেহাত্মবাদী পল্লিবাসী অর্ধশিক্ষিত বা পুথিগত অর্থে অশিক্ষিত এমন কিছু মানুষের রচিত গানের পঙ্‌ক্তি আপাতত উদ্ধার করা যায় :

১. রাম কি রহিম করিম কালুল্যা কালা
হরি হর এক আত্মা জীবনদত্তা
এক চাঁদ জগৎ উজ্জ্বলা

২. একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে
আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আপন সুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।

৩. করিম-রহিম রাধা-কালী এ-বুল সে-বুল যতই বলি
শব্দভেদে ঠেলাঠেলি হইতেছে সংসারে—
মানবদেহে থাকে স্বয়ং একই শক্তি ধরে।

৪. হিন্দু কিংবা মুসলমান শাক্ত বৌদ্ধ খ্রিশ্চিয়ান
বিধির কাছে সবাই সমান পাপপুণ্যের বিচারে।

৫. অজ্ঞ মানুষ জাতি বানিয়ে
আজন্ম ঘুরিয়া মরে স্বজাতি খুঁজিয়ে।
শিয়াল কুকুর পশু যারা এক জাতি এক গোত্র তারা
মানুষ শুধু জাতির ভারা মরে বইয়ে।

৬. কহিছে বিন্দুযাদু তুমি চোর তুমিই সাধু
তুমি এই মুসলমান তুমি এই হিন্দু।

অজস্র বিচিত্র গানের এইসব সদুক্তি-যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা কায়াবাদী বলেই কি এমন সুস্থ প্রত্যয়ভূমিতে দাঁড়ান নি? ফকিররা যেমন তাঁর সত্য জেনেছেন 'দেল-কেতাব' থেকে, তেমনই মধ্যযুগের সন্ত সাধক দাদূ জেনেছেন :

কায়া কতেব বোলিয়ে লিখী রাখুঁ রহিমান।
মনবা মুল্লা বোলিয়ে সুরতা হ্যায় সুবহান।।

অর্থাৎ কায়াকেই বলো কোরান, পরম দয়াল তাতে লেখেন, মনকেই বলো মোল্লা, সেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরই তা শোনেন।

শরীর থেকে জীবনসত্যের আহরণ ও স্বচ্ছ দৃষ্টি অর্জন এদেশে বারে বারে ঘটেছে। একেই বলে আত্মতত্ত্ব।

লক্ষ করা যায় উচ্চস্তরের ধর্ম ও উচ্চবর্ণের মানুষ বড় একটা এমনতর মরমিয়া শরীরী সাধনার সত্যে পৌঁছতে চান নি। কিংবা উচ্চতর শ্রেণিবর্ণই হয়তো প্রতিবন্ধক হয়েছে মাটি-ঘেঁষা জীবনের রূপ দেখার ব্যাপারে। তাঁরা অধিকতর আস্থা রেখেছেন পুরোহিত বা মোল্লাতন্ত্রে, পুরাণ বা কোরানে, মন্দির বা মসজিদে। আর সেই অলস আস্থার প্রত্যয় ভেঙে দিয়েই দেহাত্মবাদীদের সংগ্রামের সূচনা ঘটেছে অনুমান থেকে বর্তমানের যাচাই করবার কঠিন সরণিতে। 'ভুলো না বৈদিকের গাঁজার ধোঁয়ায়' বলেছেন একজন প্রতিবাদী গীতিকার বেদের অপৌরুষেয়তার বিরুদ্ধতা করে। উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও শোষণের চাপে অবমানিত সামাজিক অবস্থানই কি তাঁদের সত্যদৃষ্টি ও স্বচ্ছ মানবিক বোধে উত্তরিত করেছিল? একথাই সত্য বলে মনে হয়, যখন দেখি আমাদের লালন-দুদ্দু-জালাল-যাদুবিন্দু-কুবিরের জন্ম খুব নীচু বর্গের খেটে-খাওয়া মানুষের ঘরে। একথার বৃহত্তর সমর্থন পাই মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত সাধকদের জীবন ও রচনা পর্যালোচনা করলে। কবির ছিলেন জাতে জোলা, রুইদাস চামার, শুক্লহংস জাতে ধোপা। দাদূ ছিলেন ধুনকর, রজ্জব ছিলেন কলাল (মদ্য বিক্রেতা), নামদেব ছিলেন জাতে ছিপী (বস্ত্ররঞ্জক)। হীনজাতি বা বংশধারা এইসব ভাবসাধকের জীবনে কোনো বাধা আনেনি বরং জীবন ও জগৎ অনেক সমতলে দাঁড়িয়ে তাঁরা দেখেছিলেন। কবির-দাদূ-রজ্জব সাধক পরম্পরা আমাদের জন্য রেখে গেছে যে অজস্রবিধ গানের উত্তরাধিকার তার সঙ্গে বাউল বা সহজিয়াদের গানের সত্যে বা তত্ত্বে খুব ফারাক নেই। শ্রেণিগত অবস্থানের সাম্যই বোধহয় তার কারণ। আরেক কারণ এঁরা সবাই কায়াবাদী। রূপক অলংকারে রাঙানো দেহতত্ত্বের গান কবির বা দাদূর কিছু কম নেই। হিন্দু-মুসলমান মিলনমন্ত্রের গানও তাঁদের প্রচুর। দেহ ও জীবনের অনিত্যবোধ, গুরুকরণের অবশ্যম্ভাবিতা, শাস্ত্রবিরোধিতা এবং জাতিবর্ণনির্বিশেষে মানবপ্রেম এঁদের সকলের জীবন ও গানের মূলকথা। সেই জন্যই মনে হয়, সারা ভারতের দেহতত্ত্বের গান একসঙ্গে সংকলিত হলে ভারতীয় নিম্নবর্গের এক সমৃদ্ধ জন-ইতিহাস পাওয়া যাবে।

তিন

বাংলা দেহতত্ত্বের গানগুলিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে নিলে তার থেকে একটা অনতিলক্ষ্য কাহিনিবৃত্ত আর দর্শন খুঁজে নেওয়া যায়। গানের ভিতরে ব্যক্ত বিশ্বাস জানায় মনুষ্যত্বের চৌরাশী লক্ষ যোনিভ্রমণের পর শেষপর্যন্ত মনুষ্যজন্মের দুর্লভ সৌভাগ্য আসে। পিতার মস্তকে শুক্ররূপে থাকে মানব বীজ। তারপর শুভযোগে মাতৃগর্ভে শুক্রশোণিতে মিশে সন্তানজন্মের সূচনা ঘটে। তার পূর্ণ গঠন আর ইন্দ্রিয়বোধ জাগতে পুরো দশমাস লেগে যায়। তখন পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় শিশুকে চেতনশীল করে। সে তখন সৃষ্টিকর্তাকে বলে, 'মুক্তি দাও এই অন্ধকার থেকে। বাঁচাও এই রুদ্ধতা থেকে। এ যে শোণিতময় পিচ্ছিল।' স্রষ্টা তখন বলেন, 'জন্ম হলে পৃথিবীতে গিয়ে কি করবে মনে থাকবে তো?' গর্ভস্থ শিশু বলে, 'মনে থাকবে। করব মানুষ-ভজন। সংযত নির্বিকার থাকব। কামনা-বাসনার দাস হব না।' কিন্তু জন্মের পর সে সংকল্প থাকে না। প্রসবের সময় আগে বেরোয় মুণ্ড, তাই চোখ খুলতে তাতে মায়ার ঝাপট লাগে। সাধক দীন শরতের ধারণা সে কেঁদে ওঠে :

এইবার জীব মূলে ভুলে কাঁদছে পড়ে ভূতলে
সে কাঁহা কাঁহা কাঁহা বলে
জীবের সম্বন্ধ তাই ঠিক থাকে না।

অর্থাৎ তার মূলে ভুল ঘটে যায়, অন্ধকার আর আলোর জগৎকে মেলাতে না পেরে সে উচ্চৈঃস্বরে

কেঁদে ওঠে। বলে কাঁহা কাঁহা, অর্থাৎ কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম ; কোথায় গেল আমার স্রষ্টা? তখন জননী তার মুখে দেয় স্তন। অসহায় শিশু সেই স্তন আঁকড়ে ধরে দেয় টান। দুধের ক্ষরণে পঞ্চভূত শরীরে কায়েম হয়। জাগে জাগতিক কামনা, মায়া আর আসক্তি। ভেসে যায় গর্ভবাসকালীন তার প্রতিজ্ঞা। গীতিকার তাই সচেতন করে বলেছেন :

মন রে সেই দেশের কথা এখন ভুইলা গিয়াছ।
মিছে মায়ায় ভুইলে রইলে
যাবার উপায় কি করেছ?

বস্তুত মানুষের জীবন একরকম ধারাবাহিক মায়াবদ্ধতার ইতিহাস। সংসার, নারীদেহ, সন্তান, প্রতিষ্ঠা, উচ্চাশা, মায়া-মোহ আর আত্মপ্রেমে তার জীবনে বদ্ধতা এসে যায়। সবচেয়ে বড় জড়ত্ব আসে আত্মতত্ত্বকে ভুলে। অর্থাৎ কে আমি, কেন আমার জন্ম, কী আমার করণ তা বিস্মৃত হয় মানুষ। দেহের উপর মায়া আসে, সন্তানের জন্য মায়া জাগে, শিশ্নোদর-পরায়ণতা আসে। জীবন যে কত অনিত্য, মৃত্যুর পর যে দেহের গর্ব-গুমোর কিছুই থাকে না সেই বোধও থাকে না। তখন তার আখেরি চেতন ঘটাতে হয়, মনঃশিক্ষা দিতে হয়। তবে যদি মুক্তি ঘটে। দীক্ষাগুরু দেন ইষ্টমন্ত্র। শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে শিখতে হয় দেহবাদী সাধন-ভজন, দমের কাজ, সন্তান নিরোধের শরীরী কৌশল। আত্মতত্ত্ব না জাগলে অর্থাৎ কথান্তরে জীবন-পরিণামের অসহায়তা না জানলে মানুষ গুরুকরণের প্রয়োজন বোঝে না। রামকৃষ্ণ দাসের একটি গানে বলা হয়েছে :

আত্মতত্ত্ব বিচার কর দেখি ওরে মন-পাখি
তুমি কি পড়ে পণ্ডিত হয়েছ
তোমার স্বরবর্ণ আছে বাকি।
আত্মতত্ত্ব স্বরবর্ণ সে তো নয় সামান্য
পরতত্ত্ব ব্যঞ্জনবর্ণ ফলাতে গণ্য
সে যে স্বর ভিন্ন নয়—
স্বর হতে হয় দুয়েতে মাখামাখি।
যারে গুরুতত্ত্ব কয় সে যে যুক্তাক্ষর হয়—
স্বরবর্ণ জ্ঞান বিনে যুক্ত কেহ না বুঝায়।
ও যার স্বরেতে ভুল লেগেছে গোল
কি হবে যুক্ত শিখি।

গানটি দেহতত্ত্বের মূল ইঙ্গিতগুলিকে চমৎকারভাবে নির্দেশ করেছে। বর্ণবোধের সূচনায় যেমন স্ববর্ণ তেমনই দেহযোগের সাধনার প্রথমেই আত্মতত্ত্ব (অর্থাৎ আমি কোথায় ছিলাম, আমি কে, আমার কী কাজ, আমার পরিণাম কী) তারপরে পরতত্ত্ব (অর্থাৎ আমার সঙ্গে জগৎ জীবনের সম্পর্ক কী, শরীরে আমার কোন্ কোন্ বস্তু, মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী)। স্বর ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ হয় না। তেমনই আত্মতত্ত্ব না হলে পরতত্ত্ব হয় না। স্বর আর ব্যঞ্জনের মতো তারা ঘনিষ্ঠ। এর পরের পর্যায় গুরুতত্ত্ব বা যুক্তাক্ষর। সবের মূলে কিন্তু স্বরবর্ণ বা আত্মতত্ত্ব। তাই বলা হয়েছে যার মূল স্বরেতেই ভুল তার যুক্তাক্ষর শিখে লাভ কি?

খোঁজ করলে জানা যাবে কোনো কোনো গৌণধর্মী সম্প্রদায় স্বরবর্ণ বলতে বোঝেন একক পুরুষ। ব্যঞ্জনবর্ণ মানে নারী। যুক্তাক্ষর মানে নরনারীর দেহমিলন। সেই মিলন আসলে কাম থেকে প্রেমের আকাশে মুক্তি।

এ থেকে বোঝা গেল দেহতত্ত্বের সাধনা এক ক্রমিক উত্তরণের পর্যায়ে বাঁধা, তাতে উল্লম্ফন চলে না। গুরুই, সাধনপথের সেই দিশারী। তাই 'গুরু ত্যেজে গৌর-ভজা' চলে না। গুরুসঙ্গ সৎসঙ্গ ('সতের সঙ্গে মলেও হয় গঙ্গাপ্রাপ্তি')। এঁদের বিশ্বাসের বিচিত্র জগতে গুরু অগণন। দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু ছাড়াও নিজের শ্বাসও গুরু এবং ভজনসঙ্গিনী নারীকেও (তাকে বলা হয় 'শ্রীরূপ' বা 'রূপ' এবং রূপকে ধরেই স্বরূপের বোধ জাগে) গুরু বলা হয়। তাই গানে আছে :

ভজন সাধন করবি রে মন কোন্ রাগে
আগে মেয়ের অনুগত হও গে।

এবং

আল্লা হরি ছেড়ে ভবে ভজ শ্রীগুরুর চরণ
গুরু ধর খোদকে চেনো।

সাধারণভাবে মানুষ কিন্তু মায়ার বশীভূত। সে 'ভুলে আত্মতত্ত্ব সংসার লয়ে। কেবল আমার আমার করিছে।' তাকে আত্মস্থ করাই দেহবাদীদের কাজ। তাঁরা পূর্বজন্ম বা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নন। তাই বলেছেন:

পাবে সব বর্তমানে প্রাপ্তি যাহা এ জীবনে
বিফল সব মরণে।

সেই কারণেই এঁরা কল্পনাবাদী নন, ভাববাদী নন, কেননা বুঝেছেন যে :

যদি কল্পনা করে অরূপীর সে রূপ দেখা যেত
তবে সাধন ভজন ছেড়ে লোকে কল্পনা করিত—
কত জল্পনা করিত।
মাতৃহীন শিশুর কাছে ছবি গড়ে দিত
'যাদু তোর মা' বলিয়ে ছবির কোলেতে উঠিত।

বরং উলটে এঁদের বক্তব্য :

এই দেহ মিথ্যে নয় মন
এই দেহেই আছে রতন।
যে খোঁজে পায় অন্বেষণ
জীয়ন্তে মরে আপন ইচ্ছায়।

অথচ সেই অন্বেষণ না করে, নিজের দেহভাণ্ডকে না দেখে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যেন :

আপন ঘরের খবর হয় না
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা।

লালনের এই পরিহাস যেন হাজার বছর আগেকার চর্যাগীতির প্রতিধ্বনি : 'ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই'। এই কারণেই দেহতত্ত্বের গানের একটা পর্যায়কে বলে 'মনঃশিক্ষা', আর এক পর্যায়কে বলে 'আখেরি চেতন'। স্পষ্ট দেহকেন্দ্রিক শব্দ ছাড়াও এমন অনেক গান পাঠকরা পাবেন যা মনঃশিক্ষা, গুরু-তত্ত্ব ও আখেরি চেতন পর্যায়ের। সব পর্যায় কটিই দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে একটা সুপরিকল্পিত ছকে বাঁধা বলে পাঠককে বুঝে নিতে হবে। গৌরাঙ্গবিষয়ক স্বল্প কয়েকটি পদকে কেউ যেন দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ মনে না করেন। দেহাত্মবাদীদের বিশ্বাসে গৌরাঙ্গ কোনো অনুমানের দেবতা নন। শরীরের মধ্যেই তাঁকে উপলব্ধি করবার একটা গূঢ় গোপন সাধনতত্ত্ব আছে। তাতে অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ শব্দেরও

গোপন ভাষ্য পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষত দেহবাদী নন এমন কোনো কোনো গীতিকারের পদে মানবদেহ বিষয়ে এমন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বর্ণনার কুশলতা আছে যা বিস্ময়কর। বলরামী সম্প্রদায়ের একজন লিখেছেন 'জলের সুই আর পবনের সুতো' দিয়ে নাকি মানবদেহ বানানো হয়েছে। কল্পনার এতখানি সূক্ষ্মতা চমকপ্রদ। হয়তো প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে কবিরের একটি দোঁহা যার সারার্থ হল— গৃহস্থের জীবনে থাকে মাটির ভিত আর পবনের থাম, তাতে পাঁচতন্ত্রের বন্ধন আর গুণ-অবগুণের ছাউনি। গৃহস্থের আছে চিন্তারূপ পিতা, আশারূপ জননী, দুখ-সুখ দুই ভাই। আশা আর তৃষ্ণা তার সম্পদ। মোহরূপ তার জীবনে কুবুদ্ধি ঘরণি। প্রকৃতি তার কুটুম্ব। পাপপুণ্য তার পড়শি।

বলরামীদের গানেও মানবদেহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তা নাকি মায়ার ঘর আর তাতে দেওয়া আছে প্রবোধের বেড়া। তাঁরা মানবদেহকে বলেছেন কল। সেই দেহের স্রষ্টা তাঁদের উপাস্য বলরামকে বলা হয়েছে হাড়িরাম কলমিস্তিরি। তাঁর হেকমতেই (কৌশলে) দেহ-কল চালু থাকে। এবারে কলের বর্ণনা :

এ কলের দুখান চাক বাঁকা
উপরে খেলছে দুই পাখা—
দুজন কলে চৌকি আছে
দুজন তাই দিচ্ছে পাহারা।

এখানে 'দুখান চাক বাঁকা' বলতে বুঝতে হবে দুই কণ্ঠাস্থি। দুই পাখা হল হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস। কলের চৌকি দিচ্ছে দুই চোখ, আর তাকে পাহারা দিচ্ছে নাক আর কান। গানে এরপর বলা হচ্ছে :

যেমন জলের ভিতর আগুন
আগুনের ভিতর সে জল
কারিগরের গড়া এ কল
কখনও তা হয়নাক অচল।

আগুন আর জল হল দেহের উষ্ণতা আর শীতলতার পর্যায়ক্রমের রূপক। তার স্বাভাবিক যুগল সঞ্চারে দেহ-কল সচল থাকে। আর :

এই কলের পাশে চারখানা থাম আছে গো তার
দেখ দেখতে কি বাহার
থামের ভিতর তিন তার আছে
কারিগর খবর নিচ্ছে তার।

চারখানা থাম মানে দুই হাত আর দুই পা। তিন তার : ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ি।

এরপর বুঝতে হবে এমন কলও কিন্তু স্বয়ংক্রিয় নয়। কেন-না তাকে চালাচ্ছেন হাড়িরাম কলমিস্ত্রি নানা প্যাঁচে। তাই,

কোন্ প্যাঁচে ওঠায় বসায়
কোন্ প্যাঁচে চলায় বলায়
কোন্ প্যাঁচ কারিগরের হাতে
কখন টিপ দিয়ে বন্ধ করবে কল।

দেহ-কলের চাবি নিজের হাতে নেই। তা যে-কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এইখানেই দেহ নিয়ে ইহজাগতিক যত আশঙ্কা আর কান্না।

তলিয়ে ভেবে দেখতে গেলে দেহতত্ত্বের গান যাঁরা লিখেছেন তাঁদের প্রধান অংশ অর্থাৎ গ্রামে বসবাস করা অত্যন্ত দরিদ্র শোষিত মানুষের (শোষণ দ্বিস্তরের— উচ্চবর্ণের ও সামাজিক অর্থনীতির) দেহ ছাড়া আর কীই বা নিজের ছিল? তাঁদের জীবন ছিল অনিশ্চিত, শস্য সম্ভাবনাও অনিশ্চিত, জমি ও বাস্তুও অনিশ্চিত। দেহই ছিল তাঁদের ইহজীবনের একতম সম্পদ, তাই দেহের উপমাতেই তাঁরা জীবনকে বুঝেছেন এবং অন্যকে বুঝিয়েছেন। সমাজবিজ্ঞানী অশোক সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> লোকধর্মে দেহতত্ত্বের প্রাধান্য নিয়ে অনেক আলোচনা একটি বিশিষ্ট লক্ষণকে সচরাচর গুরুত্ব দেয় না। লোকজীবনের যে অবস্থায় নিঃস্ব দরিদ্রজনের পক্ষে বাইরের কোনো উপকরণের অধিকাব নিতান্তই সাধ্যাতীত, সেখানে নিছক দৈহিক সত্তাকে মানুষ বড়ো করে আঁকড়ে ধরে, তার মধ্যেই জীবনের সব সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে চায়। সে রকম মানুষই তো বার বার লোকধর্মের আশ্রয়ে ইহকাল পরকালের অবলম্বন খুঁজেছে।

এ ধরনের মন্তব্য সম্পর্কে ভিন্ন মত স্বাভাবিক, কারণ বাংলা দেহতত্ত্বের গান সর্বদা কেবল নিম্নবর্গ ও নিম্নবিত্তদের রচনা নয়। সম্পন্ন ও সচ্ছল এমনকি শিক্ষিত মানুষও এ জাতীয় গান লিখেছেন। গান রচনার ধারা সব সময়ে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ভেদ করে না, যেমন মানে না সাম্প্রদায়িকতার বিভাজন। এ ব্যাপারে একসঙ্গে নমুনা দেওয়া যায় মরা গরিব পাগলা কানাই আর ধনী ভূস্বামী হাসন রাজার। উল্লেখ করা উচিত লালন শাহ ও হাউড়ে গোঁসাইয়ের নাম, কেন না প্রথমজন পুথিপড়া মানুষ ছিলেন না অথচ অনুভবের অতলতায় স্নাত ছিলেন, দ্বিতীয়জন কায়াবাদী গীতিকার অথচ শাস্ত্রে ও সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন। তবু বলতে হয়, দেহতত্ত্বের গান যুগে যুগে যাঁরাই লিখুন তার ভোক্তা প্রধানত গ্রামীণ জনসমাজ। এ জাতীয় গানের প্রত্যক্ষ লক্ষ্যও তাঁরাই। দারিদ্র্যসীমার নীচে বেঁচে থাকা অসহায় অস্তিত্ব নিয়ে বুভুক্ষু, বেহিসেবি সন্তানজন্মের বাহুল্যে অনুতপ্ত অথচ অসহায় গ্রামবাসীদের একধরনের সান্ত্বনা ও পরামর্শ দেয় এই গান। নিরুপায় জীবন ও করুণ মৃত্যুর মাঝখানে দোলায়িত বহু মানুষ দেহতত্ত্বের গান শোনেন আত্মক্ষরণের তাপ বুকে নিয়ে। অন্যদিকে এসব গান আরেক শুশ্রূষা ও স্বচ্ছবোধে লোকমানসকে উজ্জীবিত করে। পুরাণ-কোরানের নানা উল্লেখ, নানা প্রতীক-প্রতিমার সুন্দর ব্যবহার, জীবন ও সমাজের ব্যবহারিক ছবি, দেহতত্ত্বের গানের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। সাধারণ অশিক্ষিত শ্রোতার মনে ও মুক্তবুদ্ধিতে এ গান নানা চিন্তা ও তর্কের আলোড়ন তুলে দেয়, ভাববাদ থেকে তাদের টেনে আনে বস্তুচেতনায়। জাতিবর্ণহীন উদার সমাজের সুস্থ স্বপ্ন দেখায় নানা প্রসঙ্গ ও যুক্তি দিয়ে। যেমন প্রারম্ভ বিশ শতকের এক কায়াবাদী গীতিকার লিখেছেন :

জাতি ধর্মের বড়াই করো না ভাই
কত শত মহাপুরুষ তাদের
        কুলের ঠিকানা তো নাই।
ধলা কালার একই বীজ ভাই—
সর্বজাতি যাতে হয় উদয়
কর্মগুণে এই সমাজে
        ভিন্ন গোত্রে আখ্যা পাই।

এবং প্রান্ত বিশ শতকে আরেকজন লিখেছেন :

একই মায়ের দুইটি সন্তান
        হিন্দু আর মুসলমান—

একটি কুলে জন্ম মোদের
একই বুকে দুগ্ধপান।
দেখে আয় ভাই হিন্দু-মুসলিম
মদিনা আর মথুরায়—
দুই রাখালে যুক্তি করে
গরু আর বকরি চরায়।

অসাম্প্রদায়িকতার এমন একটা মুক্ত ময়দান, স্বচ্ছ মনের এই সম্পদ আমাদের দেশকে বহুদিন হানাহানি ও ভুল বোঝাবুঝি থেকে দূরে রেখেছে। দেহতত্ত্ববাদীরা বৈরাগ্যপন্থা ও আত্মমুক্তির চেয়ে লোকশিক্ষা আর বস্তুদীক্ষার দিকে নজর রেখে গেছেন বেশি। সে কথাটাও মনে রাখা জরুরি।

তবু শেষপর্যন্ত, বেশ কিছু উচ্চভাবনার দেহতত্ত্বের গানে আমরা খুঁজে পাই একধরনের অন্তঃরুদ্ধ আর্তি ও ব্যক্তির নির্জনতার সন্তাপ। কোথায় পাব আমার মনের মানুষ, এই প্রশ্নে বস্তুবাদ ভেদ করে এক ভাবময় আতর্তি, কোনো ছিন্নতার বোধ আমাদের ছুঁয়ে যায়। প্রার্থী ও প্রার্থনীয়ের মধ্যে লক্ষ যোজন ব্যবধানের যে-অনুভব লালন শাহ করেছিলেন তার আধুনিকতা ও স্ববিরোধ মনে হয় একালের আমাদেরও। অলব্ধ ও অপ্রাপণীয়ের জন্য একটা অন্য বেদনার গাঢ় আকৃতি দেহতত্ত্বের গানে সুদূরতা এনেছে। মরমি শ্রোতার কানের ভিতর দিয়ে মর্মে এক গভীর হৃদয়-ক্ষত এঁকে দেয় এই গান। রহস্য-সুন্দর, উদ্‌বেল বাংলা দেহতত্ত্বের গানের একটা বড়ো অংশ তাই সব সময়ে অদৃশ্য থেকে যায়। শুধু তার ক্ষণিক ঝলক যেন আরশি নগরের পড়শির মতো 'নড়ে চড়ে হাতের কাছে' অথচ ধরা দেয় না। তবে কি এই গান বিশেষ আভিপ্রায়িক ভাষায় এক বিশেষ বর্গের মানুষের জন্য নয়? এ কি তবে আমাদেরও আত্মভাষারই উদ্‌ভাষণ?



জন পদাবলি চাই

গান জিনিসটাকে সাধারণত সবাই ভাবেন বিনোদনের অঙ্গ রূপে। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে অনেক গানের অন্তরালে দেখতে পাই প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের উদ্ভাস। কিংবা সমাজের অন্তঃশীল সত্য। আমাদের এই বঙ্গ ভূমি গানের লীলায় সদা পরিপূরিত। এখানে ভিখারিও ভিক্ষা করে গান গেয়ে। গ্রামিক সমাজে, এমনকি মুসলিম অন্তঃপুরে বিয়ের গান চালু আছে। মাঝি মাল্লাদের গান তো এদেশে নদীর স্রোতের মতোই চিরপ্রবাহী। বাউল বৈরাগী বৈষ্ণব দরবেশ ফকিররা তাদের অধ্যাত্মতত্ত্ব সরল সহজ করে ব্যক্ত করেন গানে গানে। আবার ভিতরে ভিতরে সর্বস্তরের বাংলা গানে একটু রূপকের ঝোঁক বা দেহতত্ত্বের ইঙ্গিত থাকেই। এ সব থেকে বোঝা যায় বাংলা গানের সুর শুধু নয়, তার ভাবের একটা আলাদা মূল্য আছে। সেইজন্যই বাংলা যাত্রাপালায় থাকে বিবেকের গান—যার ন্যায়নীতিকথা, দর্শকদের আলাদা করে ভাবায়। বাংলার ব্যক্তিমানস আর সমাজ-চৈতন্যে গানের ভূমিকা এতটাই সক্রিয় যে এখানে শাক্তপদাবলিও রচিত হয়েছে, যা বাস্তবে তত্ত্বগতভাবে অসম্ভব। কেন-না শাক্তসাধনা তো মাধুর্যের নয়—তা কঠোরভাবে শাস্ত্রশাসিত—দেহধর্ম ও শারীরিক অভিচারে আচরণবাদী। সেখানে গানের কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না। শাক্তের আরাধ্য দেবতাও বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণের মতো ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলনে বিরহমিলনের ছন্দে গাঁথা নয়। তাদের আবাধ্য ভয়ংকরী রক্তলোলুপা, কৃপাণ-খর্পর হাতে দনুজদলনী। তবু বাঙালির ভক্তিরস ও রামপ্রসাদের মতো সাধক সেই পাষাণতটে ফুটিয়ে তোলেন গানের পুষ্পল আততি। ভীষণা চণ্ডমূর্তিতে আরোপ করেন বৎসলা মাতৃপ্রতিমা কিংবা জায়াজননীর মমতাময় প্রতিচ্ছবি। শাক্তগানে বেজে ওঠে আগমনী-বিজয়ার ভাবনাট্য, যা বাঙালি পারিবারিকতার শ্রী ও সৌন্দর্যকে প্রতিভাসিত করে। এখানে কত সহজেই ব্যক্ত হয় এমনতর উদাসী সংকল্প যে :

সাধো ছিল মা মনে—
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী-জীবনে।

গানের ব্যাপক সামাজিক পরিব্যাপ্তি ও জৈবনিক সংসর্গ এদেশে যুগে যুগে নতুন নতুন গানের রূপবন্ধ আর ভাবের বিচিত্রতা ফুটিয়ে তুলেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বঙ্গবাসীকে ধর্মচেতনার সমন্বয়বাদে দীক্ষিত করতে, সেই মধ্যযুগেও, শাস্ত্রমন্ত্রকে উপেক্ষা করে, আশ্রয় নিয়েছিলেন কীর্তনে। সমবেত কীর্তন-মুখরতায় ভেঙে দিয়েছিলেন শাসকের রুদ্ররূপ—জাগিয়ে তুলেছিলেন সাধারণ গণমানসের আত্মশক্তির সম্মেলক মুখশ্রী। এসব দেখে, বুঝে, প্রতীত হয় যে, বাংলা গান লঘু বিনোদনের চপলতা ছাপিয়ে, কানে শোনার নান্দনিক মাধুর্যকে লঙঘন করে, ঘা দেয় মরমের দ্বারে। তাই নানা উপলক্ষে বাঙালিকে গান লিখতে হয়, নানা রূপে ও বিভঙ্গে। তাতে ব্যক্তি অংশ নেয়, সমাজও। তাই 'বন্দেমাতরম্' গান কেবল আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায়ের বলয়ে আবদ্ধ না থেকে পরিকীর্ণ হয়ে পড়ে সারাদেশের পরাধীন সত্তার আত্মজাগরণে—দেশপ্রেমীদের উদ্দীপন জোগাতে। স্বদেশি আন্দোলনে সহিংসরাও সামিল হয় কণ্ঠভরা গান নিয়ে। শ্রমজীবী ও কৃষকের শোষণে প্রতিবাদ করে বাংলা গান। ছায়াছবির কুশীলবের ঠোঁটে গানের সুরে ব্যক্ত হয় বাঙালি মনের রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা। গান ক্রমে ক্রমে ঝরে পড়ে সবরকম বাঙালি শ্রোতার মনের অঙ্গনে। সেই কারণে মনে হয়, এদেশে গানই সবচেয়ে সহজপ্রাপ্য আর সমাদৃত পরিবহন। মেলা মহোৎসব দিবসি পার্বণ ব্রতপারণে গানই আমাদের সহজাত সম্বল। এত বড় দেশ ও এত মধুর ভাষা, এপার বাংলা ওপার বাংলার বিভাজন পেরিয়ে উচ্ছ্রিত হয়ে আমাদের জনপদাবলি। 'জনপদাবলি' কথাটি বোধহয় এই প্রথম উচ্চারিত হল। আগে কখনো কেউ, কোনো উপলক্ষে, এই শব্দবন্ধ সম্ভবত ব্যবহার করেননি। আমাদের চর্যাগীতিপদাবলি আছে, বৈষ্ণবগীতি, শাক্তগীতি, নাথগীতি, বাউল-ফকির মুরশিদা-মারফত গীতি আছে। আছে টুসু-ভাদু-বোলান-ঝুমুর-খন গান। এমনকি আছে ইসলামি আর দরবেশি গীতি, ভাওয়াইয়া, ধামাইল, ও কতরকম ভাবগান। সেসব গান ও তার গীতিলক্ষণ আলাদাভাবে শনাক্ত করা হয়েছে এবং সেই বিপুল স্বর্ণশস্য আঁটি বেঁধে সংকলিতও হয়েছে গ্রন্থাকারে। কিন্তু এসবের ফাঁকে ফোঁকরে রয়ে গেছে অশনাক্ত জনপদাবলি, যা মানবমুখী, ইহবাদী ও ধর্মনির্লিপ্ত। সেগুলির জাতগোত্র একটু আলাদা। অখণ্ড ও বিস্তৃত এই বঙ্গভাষাভাষী জনপদে কতদিন ধরে কতজন কত কারণে কত কত ভাবনায় বা স্বপ্রেরণায় গান বানিয়েছেন। তার কাব্যমূল্য, রচনা সৌকর্য বা সুরের বিন্যাস সর্বদা হয়তো তেমন উচ্চস্তরের নয় কিন্তু উচ্চারণ খুব আন্তরিক ও অকপট। হয়তো দেশজ কোনো বহুশ্রুত সুরের ছাঁচে গানের ভাবটা ঢালাই করা, তবু তার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে বক্তব্যের ধারালো সংকেত—জীবনের গাঢ় অভিজ্ঞতার তাপ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য,' 'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি' কিংবা 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'—জাতীয় গানে লোকায়ত জনপদজীবনের গাথা চিরচিহ্নিত হয়ে আছে যেন। অথচ এসব গানকে আলাদা 'টেক্সট'রূপে আমরা আজও বিবেচনা করিনি। শিক্ষাসত্রে পাঠ্য ভাবা তো দূরকল্পনা।

এবারে তাই স্পষ্ট করে বলা যাক, 'জনপদাবলি' নামের একটা ইতিহাস আছে এবং একধরনের উদ্দেশ্যও আছে। লক্ষ করলে দেখা যায়, বাংলা গান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ক্রিয়াত্মক নানা চর্চার পাশাপাশি তথ্য অনুসন্ধান, গবেষণা আর লেখালেখি চলছে। প্রথমদিকে তার লক্ষ ছিল আমাদের উনবিংশশতকীয় বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-দেশকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলাগানের ধারাবাহিক উন্মোচন—যা শিক্ষিত, রুচিমান ও ঐতিহ্যপ্রিয় বাঙলির এক প্রিয় প্রসঙ্গ। রামনিধি গুপ্তের টপ্পা ও কালীমির্জার গান থেকে শুরু করে, হিন্দু-মেলা ঔপলক্ষিক স্বদেশি গান ও নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীত স্পর্শ করে বাংলা গানের আধুনিকতা খুঁজছিল আত্মবিকাশের দিশা। সন্ধিৎসু আত্মবিকাশের এই ভরকেন্দ্র শেষপর্যন্ত গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের আসন পেতে। সেই পথে রবীন্দ্রনাথের অনুযাত্র হয়ে আসেন দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-দিলীপকুমার রায়-নজরুল ইসলাম বর্গের সংগীতকাররা। এঁদের যৌথ সাধনায় বাংলা গান

নানা বাঁকে ছড়িয়ে পড়ে। নিছক আমোদ প্রমোদ ও হালকা বিনোদনের বৃত্ত থেকে মুক্তি পেয়ে গান হয়ে ওঠে বৃহত্তর জীবনযাপনের অংশ। আধুনিক জীবনের নানান উপলক্ষকে ঘিরে উৎসবে-আনন্দে-শোকে-বেদনায়-শুশ্রূষায় এবং মঞ্চে-বেতারে-রেকর্ডে ও চলচ্চিত্রে বাংলা গান বিকীর্ণ হয়ে ওঠে। যন্ত্রপ্রযুক্তির ক্রমোন্নতি, জনমাধ্যমের বৈচিত্র্য ও সম্প্রচারের কৃৎকৌশলগত ব্যাপকতা বাংলা গানকে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত রুচির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ও জনপ্রিয় করে দেয়। সুখী গৃহকোণের অত্যাজ্য অংশ হয়ে পড়ে বাংলা গান। ধীরে ধীরে গান এক বিপণনযোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়, তার বিনিময়মূল্য নির্ধারিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সেই সামগ্রীর উপর পড়তে থাকে জনরুচির চাপ ও চাহিদা, ফলে গানের অনুষঙ্গে পরিকল্পিত হতে থাকে নিত্যনতুন বৈচিত্র্য , সুরের নিরীক্ষা, যন্ত্রানুষঙ্গের বিপুল আয়োজন। গীতশিল্পীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক সচ্ছলতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। গানের জগতে পেশাদারি ইঙ্গিত গোপন থাকে না। এই পথেই আসে বিকৃতি ও হালকা রুচির দাসত্ব। গানকে ছাপিয়ে বেড়ে ওঠে যন্ত্রের পরাক্রম। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সমাজের অস্থির মানস গানে ফুটে ওঠে। আরও পরে বিদেশি গানের 'চিৎকৃত সংগীতহীনতা', তালের উৎকট স্পন্দ আর বিষয়গত লঘুতা বাংলা ও বাঙালির গানকে স্পৃষ্ট করে সকলের ক্রয়যোগ্য পণ্য করে তোলে।

তবু, বাংলা গানকে আমরা কখনো ত্যাগ করতে পারি না। সে-গান বারে বারে নানারূপে ও বন্দিশে আমাদের কণ্ঠাশ্রয়ী হয়ে জেগে থাকে। কারণ, এর দীর্ঘ ঐতিহ্যের পরম্পরা ও বিস্তার, এর নান্দনিক আবেদন ও রসসৃষ্টির কৌশল, গায়ন থেকে অন্যতর গায়নে এর নবনির্মাণ। শিল্পীব্যক্তিত্বের নবনবীন স্পর্শ। লক্ষ করলে দেখা যায় সাহিত্য ও শিল্পকলায় নতুন আঙ্গিক এসে প্রায়ই পুরোনো আঙ্গিককে সরিয়ে দেয়। যে কারণে শরৎচন্দ্রের মতো করে উপন্যাস এখন আর কেউ লেখেন না। কাব্যে এমনকি রবীন্দ্র আঙ্গিকও বহুশ পরিত্যক্ত। আমাদের প্রসেনিয়াম মঞ্চে সেই পাঁচ অঙ্কের বিস্তারিত সারারাতব্যাপী নাটক অভিনয় ও তাঁর বিমুগ্ধ অতন্দ্র দর্শকশ্রেণি—দুই-ই অন্তর্হিত। চিত্রকলা ও চলচ্চিত্রে পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়া তো সবচেয়ে ব্যাপক। কিন্তু গানে এ ধরনের যুগোচিত রূপান্তর চিহ্ন ও কালের ছাপ থাকলেও সত্যিকারের ভালো গান যুগোত্তীর্ণ। তার সুর ও বিন্যাসের পুনর্বিন্যাস, গায়কের ব্যক্তি প্রতিভার স্পর্শ গানকে নতুন করে জাগিয়ে দিতে পারে—যে প্রক্রিয়াকে আমরা লঘু ভাষায় বলি 'রিমেক'। সব রিমেকই নিন্দনীয় নয়, তার বাণিজ্যিক দৃষ্টিটুকু শুধু শোচনীয়। ধরা যাক, আঙুরবালার গান ইফ্‌ফাত আরার কণ্ঠে কতটাই দীপ্র, কিংবা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র রেকর্ডে বহুশ্রুত কোনো গান যখন মান্না দে আবার নব সৃষ্টি করেন তখন এক নতুন সূর্যোদয় হয় যেন। কতবার শোনা 'একবার বিদায় দাও মা' লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে কতই না মর্মস্পর্শী। এ যেমন গায়কব্যক্তিত্বের প্রতিভাস্পর্শ, তেমনই গানের সঞ্জীবনী জেগে ওঠে দেশকালের বিশেষ সংঘটনে, যে-জাগৃতি ঘটেছিল একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানের দীপ্ত পয়োগে।

আসলে সমাজের নানা সংকটে ও সমন্বয়বোধে গান আমাদের জীবনে অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে, দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে, শহিদদের আত্মোৎসর্গের প্রেরণায়, ফ্যাসিবিরোধী বিক্ষোভে, নানাবর্গের গণ-আন্দোলনে, প্রতিরোধে-প্রতিবাদে, মিছিলে, সভাসমাবেশে, নাটমঞ্চে ও জনতার মুখরিত সখ্যে বাংলা গান বারে বারে আমাদের সামনে মুক্ত করেছে অন্ধকারের রুদ্ধদ্বার—এনেছে অন্যগানের ভোর। বাংলা গানের এই জ্যোতির্ময় সাধনা, এই অবিনাশী পরম্পরা বাঙালির গর্বিত সানন্দ স্মৃতি। অনেক বড় মাপের গীতিকার সুরকার ও গীতশিল্পী বাংলা গানের আধুনিকতার সপক্ষে কাজ করে গেছেন। তাঁদের নাম ও কৃতি বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। আর, সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়ে, স্বয়ম্ভর গীতিপুরুষের সমুচ্চ প্রতিভা হয়ে শোভাময় রবীন্দ্রসংগীত ও তার স্রষ্টা। উনিশশো পাঁচ সালে তাঁর গান গেয়ে বাঙালি একবার জেনেছিল সার্থক জনম তার এই দেশে জন্মভাগ্যের সূত্রে—

জেনেছিল বাঙালির নিজস্ব মাটি-জল-বায়ু-শস্য-ফলের পুণ্যতা। আরেকবার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গান গেয়েই জেগে উঠেছে সোনার বাংলাকে ভালোবাসার নবীন শপথ ও স্বীকৃতি।

কিন্তু এসব বাংলা গান, এমনকি দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-দিলীপকুমার-নজরুলের গান এবং তার ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা আধুনিক গান ও চলচ্চিত্রের গান—প্রকৃত বিবেচনায় মধ্যবিত্তের জন্য আয়োজিত গান। এ-বর্গের যত গান, তার শিল্পী-সুরকার-গীতিকার এবং তার ক্রেতা ও ভোক্তা প্রধানত শহর ও মফস্‌সলবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। তাঁরাই গানের আসরের টিকিট সংগ্রহ করেন, নিয়মিত ক্যাসেট কেনেন (যার একটা বড় অংশ ছাত্রছাত্রীরা), গান মেলার হুজুগে সামিল হন। তাঁদের সংবেদনশীল মনের চাহিদায় ও রুচির টানে বাংলা গানের মুখশ্রী ও মুখোশ কেবলই বদলে যায়। তাঁদের করতালিতে সংবর্ধিত হন হালফিলের গিটার হাতে নতুন গায়ক-গায়িকারা। উৎসাহ ও প্রেরণা পান নতুন প্রজন্মের সদ্যতন গানের কারিগররা।

কিন্তু সবসময়ে মনে থাকে না যে এইসব আলোচিত আর উচ্চকিত গানের পরিপার্শ্বে আমাদের একটা বিশাল বঙ্গভূমি আছে। আছে অসংখ্য উৎসুক উৎকর্ণ শ্রোতা—তাঁরা কত জানা-অজানা গ্রামিক জনপদে বিন্যস্ত। বাইরের সমুজ্জ্বল আলোর বৃত্তের বাহিরে বাংলার সেই লক্ষ গ্রাম বেঁচে আছে লোকায়ত গানের সমৃদ্ধ সঞ্চয় ও সৃষ্টি নিয়ে। তাদের গানে হয়তো ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাগরিক সংকট-সংশয়, অপ্রেম-প্রেম-বিরহ-খেদ-অপ্রাপ্তি কিংবা স্ববিরোধ নেই—বরং দীপ্যমান হয়ে আছে সমন্বিত সমাজের একধরনের সামূহিক বিশ্বাস ও জীবনস্পৃহা। তাতে আছে দুঃখদারিদ্র্যের কথা, অসহায়তা ও দৈন্যবোধও। আছে ঐহিক জীবনের খুঁটিনাটি ও পরজীবনের জন্য আকুতি। পাশাপাশি আছে মানবপ্রেম, মানবমহিমা ও মানবিক ঐক্যের উদ্‌গীথ বাণী। বিশেষ দেশকালের চিহ্নহীন সময়হারা সেইসব গান পল্লির ম্লান আলোর আসরে, আকাশের চাঁদোয়া খাটিয়ে, মাটির সমতলে দাঁড়িয়ে কতশত বছর ধরে একতারা-দোতারা-সারিন্দা বাজিয়ে গেয়ে চলেছেন গাহকের দল। তাঁরা বাউল-ফকির-গাজি-দরবেশ-ভাট কিংবা আরও কতরকম লোকসমাজের শিল্পী—নারী ও পুরুষ। তাঁরা ভ্রাম্যমাণও বটে, তাই পরিযায়ী পাখির মতো এক জনপদের গানের বীজ তাঁরা ছিটিয়ে দিচ্ছেন আরেক গ্রামীণ মাটিতে। গায়ক থেকে গায়ক পরম্পরায় ছড়িয়ে যাচ্ছে লোকায়ত গান, হয়তো বদলে যাচ্ছে সুরের চলন আর স্বরের লঘুগুরু বিন্যাস। এভাবেই উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়ার ধাঁচ রাঢ়বঙ্গে এসে পরে নিচ্ছে ঝুমুরের সাজ। ভাটিয়ালির অঙ্গে লেগে যাচ্ছে অনিবার্য ভাঙা-কীর্তনের ছোঁয়াচ। যন্ত্র পরিবহনে নয়, নিছক গায়নের সূত্রে নদিয়ার লালনের গান সুরের পাখায় ভর করে শ্রুতি ও স্মৃতির পথ বেয়ে চলে গেছে সুদূর উত্তরবঙ্গে বা বীরভূমের কেঁদুলিমেলায়। আবার এমনও দেখি যে, বর্ধমানের অগ্রদ্বীপের মেলায় কেউ গাইছেন সুদূর শ্রীহট্টের হাসন রাজার গান।

প্রকৃতপক্ষে দেশ ভাগ হলেও বাংলা গান তো ভাগ হয়নি। কেন-না জল-মাটি-আকাশ-বাতাসের মতোই লোকায়ত জীবনে বিভাজন করা যায় না—অনবরত দুপক্ষের দেওয়া নেওয়া চলে। ওপার বাংলার জালাল, রসিদ, বিজয় সরকার, দীন শরৎ বা মনমোহনের গান এপারের গায়করা গেয়ে থাকেন ভালোবেসে। ওপারের গায়ক গলায় তুলে নিয়েছেন যাদুবিন্দু, কুবির গোঁসাই, পূর্ণ দাস বা গোষ্ঠগোপালের গান। আরেক আশ্চর্য যে, দশকের পর দশক, দুই বাংলার শ্রোতাদের উদ্‌বেল করে দেয় সেই আর্তি আর বিনতি 'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি'। তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, লোকলৌকিকের গ্রামীণ পরিমণ্ডলেই একদা উৎসারিত হয়েছে এমন কত বাংলা গান—গ্রাম্য জনখণ্ডের উৎসুক শ্রোতারাই ছিলেন সেইসব গানের প্রথম সমজদার। তারপর ক্রমে ক্রমে এমন বহু গান এসে গেছে নাগরিক শ্রোতাদের পরিসরে। তার সুর ও গানের ছক প্রভাব ফেলেছে নাগরিক গানে। আব্বাসউদ্দিন আর হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে এমন মেলবন্ধনের অনেক নমুনা

মেলে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল এ পথের প্রথম পদাতিক। কিন্তু এমন যে শক্তিধর লোকায়ত বর্গের কত বিচিত্র গান, তাকে আমরা সতর্কতার সঙ্গে সচেতনভাবে আলাদা করে নথিভুক্ত বা সংকলিত করিনি। আজও করে তুলিনি আমাদের উচ্চতর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কেন?

এই প্রসঙ্গে ধরা পড়ে আমাদের ঔপনিবেশিক মানস-পরাধীনতার স্ববিরোধ। বিদেশি শিক্ষাধারায় পুষ্ট হয়ে এক ধরনের ভ্রান্ত অভিমানে বাঙালি বুদ্ধিজীবিগণ ভেবে এসেছেন শিক্ষিতজনের রচনাই একমাত্র আলোচ্য ও প্রণিধানযোগ্য। আমাদের উচ্চশিক্ষার বহুদিনের পাঠক্রমে এহেন প্রবণতার ঝোঁক প্রত্যক্ষ। এমনতর প্রবণতার সংকীর্ণ বীক্ষণে বাঙালি মধ্যবিত্তমানস রাজা রামমোহন রায়কে যতখানি মূল্য ও উচ্চস্থান দিয়েছে তাঁর সমকালীন লালন শাহ্ ফকিরকে তার সামান্য অংশ দেয়নি। এমনকি লালনের কথা কেউ জানতই না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনী ও ভাষণে লালন-প্রসঙ্গ উত্থাপন না-করা পর্যন্ত। তাঁর গানের নমুনাও আবদ্ধ ছিল কেবল কুষ্টিয়া-কুমারখালি অঞ্চলে আর কিছুটা মধ্যবঙ্গে। অথচ লালনের দশ হাজার অনুগামী ছিল। তাঁর তুল্য মুক্তমনের সমন্বয়বাদী সাধক ও ধর্মনির্লিপ্ত চেতনাসম্পন্ন গ্রামীণ নাগরিক সে-সময় গ্রাম বাংলায় খুব কম ছিল। উন্নত নীতিবোধ, সুস্থ মানবিক ভাবাদর্শ ও জাতি পঙ্ক্তির ক্ষুদ্র ভাবনার প্রতিবাদী এই গীতিকারের অতুলনীয় লোকায়ত গানকে আমরা জানতে চাইনি। তাঁকে ও তাঁর রচনাগুলিকে আমরা ব্রাত্য করে রেখেছি এতদূর যে, কোনো পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে লালনগীতি অন্তর্ভুক্ত হয়নি আজও। আসলে নিম্নবর্গের মানুষের সমন্বয়বোধের সাধনা ও মানবধর্মের নির্ধারিত লক্ষণকে এতদিন আমরা যথাযথভাবে অবলোকন করতে পারিনি।

কিন্তু এবারে এসেছে দিনবদলের পালা। অবতলের মানুষদের আজকাল প্রত্যাশিত সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছি—পাশাপাশি স্বদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সত্য ইতিহাসকে তল-থেকে -দেখে ('History from below') উন্মোচন করতে অনেকে প্রয়াসী হয়েছেন। এই কাজে তৈরি করার প্রয়োজন ঘটছে সমাজের ঊর্ধ্বাধঃ দুই স্তরের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন আর সংলাপের সূচনা। 'জনপদাবলি' নামে নানারকমের ইহবাদী মানবমুখী লোকায়তগানের সংকলন প্রণয়ন এবং সটীক ভাষ্যরচনার সহযোগে সেগুলিকে শিক্ষিত জনমানসের সামনে উপস্থাপিত করা তারই প্রয়োজনে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। অর্ধ শতাব্দীরও আগে থেকে বাংলার উচ্চতর পঠন-পাঠনে , বিশেষত স্নাতকস্তরে (ঐচ্ছিক ও সাম্মানিক বিভাগে) বৈষ্ণব পদাবলি ও শাক্ত পদাবলি পাঠের যৌক্তিকতা সবাই মানেন। মধ্যযুগের বাংলা গীতিকাব্যের ধরন আস্বাদন করার পক্ষেও ওই সব পদাবলির সংযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এগুলি যে নিছক ধর্মকেন্দ্রিক নয় তা-ও সত্য। কিন্তু বৈষ্ণব ও শাক্তপদ যাঁরা শ্রেণিকক্ষে দীর্ঘদিন পড়াচ্ছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে ওই বর্গের পদের যথার্থ রসগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পাঠার্থীর বেশ অসুবিধা হয়। কারণ সাধারণভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত বা তন্ত্র বা সাংখ্য শাস্ত্রে অহিন্দু পাঠার্থীদের অধিকার থাকার কথা নয়। কাজ চলার জন্য শিক্ষকেরা সেব পদরচনার অন্তর্লীন তাত্ত্বিক গূঢ়ার্থ ও শাস্ত্রীয় পটভূমি বিষয়ে পাঠার্থীদের গিলিয়ে দেন কিংবা নোট দিয়ে দেন। পরীক্ষার্থীরা সেটাই উত্তরপত্রে উগ্‌লে দেয়। ফলে পাঠ্য ও পাঠার্থীর মধ্যে থেকে যায় বেশ কিছুটা ব্যবধান। অথচ অনেকেই লক্ষ করেছেন যে, চৈতন্যপরবর্তী সময় থেকে বাংলা ভাষায় নানা পর্যায়ের লৌকিক গান লেখা হয়েছে যা মানবতাধর্মে নিষিক্ত, জীবনস্পন্দী ও ইহবাদী বিশ্বাসে সম্পৃক্ত। ধর্মনির্লিপ্ত ও সমন্বয়কামী এ ধরনের গানগুলি এখনকার উত্তর-আধুনিক কালের পঠন-পাঠনেও খুব প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলি পাঠক্রমে যেমন আছে থাক, কিন্তু তার পাশাপাশি বা বিকল্প পাঠরূপে গড়ে উঠুক জনপদাবলি—গানগুলি সংগ্রহ ও সম্পাদনার পিছনে এমন একটা ইচ্ছে কাজ করুক।

দেশকালসমাজে পরিবর্তনের নানান চিহ্ন গত এক দশক ধরে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— যার সঙ্গে সংগতি রেখে যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন বা শিক্ষাভাবনার আধুনিকীকরণ বিষয়ে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সকলেই সচেষ্ট নানাভাবে। অন্যদিকে সারাদেশে বহুতর সংকট ও অসহিষ্ণুতা দেখা দিচ্ছে। মাথা তুলেছে আঞ্চলিকতাবাদ, মৌলবাদী ঝোঁক ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। সে সবের প্রতিরোধ এবং নতুন দিশাসন্ধানে আমরা নির্ভর করতে পারি লোকায়ত ভাবনার দিকে, কারণ একমাত্র লোকায়ত সমাজ আজও মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। সেইজন্য তাঁদের চিন্তায় ও গানে জাতিভেদ আর দ্বিজাতিতত্ত্ব সর্বদা ধিকৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে কবির-দাদূ-রজ্জব পরম্পরা থেকে শঙ্করদেব-চৈতন্যদেব এবং লালন শাহ- পাঞ্জুশাহ্-হাসনরাজা পর্যন্ত সকলেই সবাক। জনপদাবলির অন্তর্গত আরও অনেকের পদে এমন মুক্ত মনের সম্পদ থাকতে পারে।

একাত্তর সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর আরেকটি ঝোঁক চোখে পড়েছে। ১৯৪৬-৪৭সালের বাংলার বুকে রক্তক্ষয়ী জাতিদাঙ্গার অবসানকল্পে এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে শর্ত হিসাবে আমাদের মেনে নিতে হয়েছিল দেশভাগের অভিশাপ। তার ফলে দ্বিখণ্ডিত পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে যে অবাঞ্ছিত মানস বিভাজন ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠিত হবার পর তার অনেকটাই কেটে গেছে। বাঙালি এখন দুই আলাদা রাষ্ট্রে বাস করেও বুঝতে পারছে উভয়ের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, সমতার নানা সূত্র ও মিলনপথ। একটি সেতু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান, আরেকটি সেতু হল বাঙালির রচিত আবহমান জনপদাবলি—যার প্রাণপুরুষ নিঃসন্দেহে লালন শাহ্। দুই বাংলার মিলনবীথি আজ রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও লালনের গানে এক উচ্চারণে মুখরিত। এর মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি সুরে-বিন্যাসে ভাববৈচিত্র্যে অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন,একক এবং প্রধানত শিক্ষিত মানুষের সঙ্গী, অথচ লালনের গান এক সমৃদ্ধ পরম্পরার অংশ এবং সেই গানের শ্রোতা ও ভোক্তা রয়ে গেছে অখণ্ড বাংলার লক্ষ গ্রামে গাঁথা ব্যাপক অঞ্চলে। তাই লালন কোনো একক ব্যক্তিরূপে আমাদের বিবেচনায় আসেন না, বরং তাঁর গানের পথ বেয়ে এসে পড়ে নানাস্তরের গান ও অনেক জানা-অজানা লৌকিক গীতিকার। 'জনপদাবলি' আসলে তাঁদেরই রচিত গানের সম্পূট হতে পারে। দুই বাংলার অনেক জনপদ থেকে সযত্নে আহরিত মানবিকতামণ্ডিত রচনা এই সংকলনকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

'জনপদাবলি'র অন্তর্গত গানগুলির পরিচয় দেওয়া যায় 'ইহবাদী লোকায়ত মানবমুখী' বলে। কথাকটির দ্যোতনা স্পষ্ট তবু আলাদা করে 'ইহবাদী' শব্দবন্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। গানগুলি মন দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে এর বেশিরভাগ রচনাই পারমার্থিকতা বা পারত্রিক বিষয়ে অনীহ—অর্থাৎ গীতিকাররা জীবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার আকাঙ্ক্ষা, বৈরাগ্যপন্থী হওয়া কিংবা 'হরি পার কর আমারে' জাতীয় মিনতি এ-বর্গের গানে দেননি—বরং পুনর্জন্ম ও পৃথিবীতে ফিরে আসার আকুতি ভরে দিয়েছেন তাঁদের উচ্চারণে। প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত গীতিকার তথা সাধকরা মানুষের মধ্যে খোঁজেন তাঁদের উপাস্যকে এবং মানবধর্ম নামান্তরে মানুষভজনকে শ্রেয় বলে মনে করেন। সেই কারণে ধর্ম সাধনার নামে অন্ধবিশ্বাস, বিগ্রহ পূজা ও যুক্তিহীন লোকাচার পালনকে তাঁরা ভ্রান্ত বলে জানিয়েছেন। কবচ, তাবিজ, দৈব, মন্ত্রশক্তি, কোনো কিছুকেই তাঁরা মানেন না। শাস্ত্র মন্দির মসজিদ রোজা উপবাস তীর্থভ্রমণ আর জাতিভেদ-বর্ণভেদকে তাঁরা ধিক্কার দেন। বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয়, ইহলোকের প্রতি বাসনাময় দৃষ্টি, শরীরতত্ত্ব বিষয়ে সচেতনতা ও মানবপ্রেমকে এঁরা প্রাধান্য দিতে চান। এঁদের কয়েকজনের স্পষ্ট দৃঢ় বক্তব্য উদাহরণরূপে দেখানো যায়। যেমন:

১. মন্ত্রেতে মথুরা আছে

মক্কা কাবার ঘর—
তারই মাঝে বিরাজিছে
মানুষ সুন্দর। (একলিমুর রাজা চৌধুরী)

২. হরিষষ্ঠী মনসা মাখাল
মিছে মাটির ঢিবি কাঠের ছবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা ঠুকে মর। (কুবির গোঁসাই।)

৩. ফকির সেজে ফিকির কর গাছ তলায় বসে
কবচ তাবিজ পাথর দিয়ে হাট কর কষে।
ভূত ছাড়িয়ে জিন তাড়িয়ে করছ বাজিমাত
তোর আপন ঘরে ভূতের বাসা।
তুই আপনি কুপোকাত। (গোবিন্দ দাস)

৪. আমি না থাকিলে খোদা তোমার জায়গা ভবে নাই
স্থান না পেয়ে অন্য কোথাও আমাতে লয়েছে ঠাঁই। (জামালউদ্দিন)

৫. কাশি কিংবা মক্কায় যাও রে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন। (দুদ্দু শাহ্)

৬. মানুষেতে মানুষ আছে মানুষ নাচায় মানুষই নাচে
মানুষ যায় মানুষের কাছে মানুষ হইতে। (নিত্য খ্যাপা)

৭. যদি মক্কায় গিয়ে খোদা মিলত
শিব মিলত কাশীতে
যদি বৃন্দাবনে কৃষ্ণ মিলত
কেউ ফিরত না দেশেতে।
যদি ভোগ দিয়ে ভগবান মিলত
খোদা মিলত সিন্নিতে
তবে বড় করে ভোগ লাগায়ে
বাদশায় পারত কিনিতে। (বল্লভ)

৮. জন্ম সবার পৃথিবীতে
কী বাকি আর আছে জানতে
অজান্তে মৃত্যু সবার সব একাকার আদি অন্তে। (ভবা পাগলা)

৯. একই কুলে জন্ম মোদের
হিন্দু আর মুসলমান—
একই বীজে জন্ম সবার
একই স্তনে স্তন্যপান। (মণি)

১০. এমন মানব জনম আর কি হবে—
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই

শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই
দেব দেবতাগণ করে আরাধন জন্মে নিতে মানবে। (লালন শাহ্)

দশজনের রচিত দশটি উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে আলাদা করে বোঝানোর কিছু নেই। এমন উক্তি গুলিতে যেন সন্তবাণীর মতো দ্বিধাহীন, প্রত্যক্ষ ও লক্ষ্যভেদী। সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার, এ ধরনের সদুক্তির সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার বা জানাবাব জন্য, যাঁরা শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী— ধর্মব্যবসায়ীরা যুগে যুগে যাঁদের শোষণ করে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। প্রত্যক্ষ ইহলৌকিক জীবনকে মায়া বলে রটিয়ে তাঁদের করেছে বিভ্রান্ত ও পরলোক বিশ্বাসী। অলীক স্বর্গ-নরক কামনা, পাপপুণ্যের চেতনা বুনে যাঁদের অন্তরকে বিকশিত না করে কলুষিত করেছে। জনপদাবলির গান যাঁরা যুগে যুগে রচনা করেছেন তাঁদের প্রধান অংশই শিক্ষার ডিগ্রিধারী বা পণ্ডিত নন কিন্তু জীবনের পাঠগ্রহণে তাঁরা স্নাত। পুথি বা শাস্ত্র-র চেয়ে 'দেল কেতাব' পড়তেই উৎসাহী তাঁরা। আন্তরিক অনুভূতি থেকে উপলব্ধ সত্যকে তাঁরা ব্যক্ত করেছেন সরল বাচনে ও সহজ উপায়ে সাজিয়ে। সেই কারণে এ গানের লক্ষ্য যাঁরা অর্থাৎ পল্লিজীবনের মুমুক্ষু মানুষ, তাঁদের পরিতৃপ্ত করেও এর মর্মবাণী ধাবিত হয়েছে শিক্ষিত শহরবাসীর দ্বান্দ্বিক জীবনে। এসব গান আজ আমাদের ভ্রান্তি, ভ্রষ্টতা ও স্ববিরোধে নিশ্চিত শুশ্রূষা দিতে পারে।

জনপদাবলির অন্তর্গত পদবিন্যাসে একটি নির্দিষ্ট ভাবনা কাজ করবে। কথাটি বোঝানো সহজ হবে বৈষ্ণব বা শাক্ত পদের সঙ্গে তুলনা করলে। বৈষ্ণব পদ রচনার প্রেরণা থাকে গৌরচন্দ্র সংক্রান্ত ঐশভাব এবং রাধাকৃষ্ণ প্রণয় মহিমার নানা স্তরের উন্মোচন। তাই বৈষ্ণবপদ সংকলনের সূচিমুখে থাকে গৌরপদ-- রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের প্রবেশকরূপে। তারপরে পূর্বরাগ-রূপানুরাগ অভিসার-মিলন-মান-বিরহ-মাথুর-প্রার্থনা ইত্যাদি ক্রমে হয় কৃষ্ণলীলার অন্তঃশীল বিন্যাস। শাক্ত পদাবলির মধ্যেও থাকে শাস্ত্র ও তত্ত্ব এবং তার ক্রমোন্মোচনে 'জগজ্জননীর রূপ', 'মা কি ও কেমন', 'ভক্তের আকুতি' শিরোনামে পদবিন্যাসের শেষে থাকে 'আগমনী ও বিজয়া'। লক্ষ করলে আরও দেখা যায়, জনপদাবলি রচনার পিছনে কোনো শাস্ত্র বা তত্ত্ব নেই, তাই তার বিষয়-নির্দিষ্টতাও নেই। লক্ষ করলে আরও দেখা যায়, জনপদাবলি বহুসময়ে গড়ে ওঠে নানা প্রসঙ্গে যা নিতান্ত তৎসাময়িক— যেমন খরা, বন্যা, ঝড় বা ক্ষুদিরামের ফাঁসি। এসব গানে অনেক সময় ফল, ফুল, ধান, পাট,বাঁশ; পাখি, লোহা এমনতর প্রসঙ্গও থাকে। থাকতে পাবে দেহতত্ত্ব, প্রতিবাদী স্বর, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধতা,মানব মহিমা, দুঃখবেদনা, ক্ষুৎকাতরতা ও অসহায় দারিদ্র্যের মর্মন্তুদ জবানি। কোনো কোনো পদে থাকে সমদর্শী ও দয়াল বলে কথিত ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে কটাক্ষ, জাত-অজাত নিয়ে তর্কাতর্কির বিরুদ্ধে বিদ্রূপ, ব্রাহ্মণ বা সৈয়দের কৌলীন্যের গর্ব গৌরব প্রচার প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ, ভাববাদ ও পরলোক জল্পনা নিয়ে সংশয়, আত্মার বিষয়ে অবিশ্বাস ও বস্তুবিষয়ে আস্থা। জনপদাবলির পাঠককে আরেকটি বিষয়ে বুঝে নিতে হবে: আমাদের দেশের লৌকিক সাধক, প্রচারক আর গীতিকাররা জীবনপ্রেমী ও ইহবাদী। কল্পিত কোনো অলীক ও অবাস্তব বিষয়ে বা ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাস নেই—তা সে ঈশ্বরই হোক বা স্বর্গ-নরক ধারণাই হোক বা বৃন্দাবন-মথুরা-মক্কাই হোক। এ-জাতীয় ধারণায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের লোকায়ত বর্গের সাধকরা বলেন 'অনুমান'-পন্থী,আর নিজেদের তাঁরা অভিহিত করেন 'বর্তমান'-পন্থী।

অনুমানপন্থীদের ঈশ্বর ধারণার বিরুদ্ধে 'বর্তমান' পন্থীদের জিজ্ঞাসা :

জন্মাবধি দেখি নাই যারে—
বল দেখ তার অস্তি নাস্তি জানব কেমন করে?

এর পিঠোপিঠি তাঁদের আরেকটি প্রশ্ন: 'যারে দেখিনি নয়নে তারে ভজিব কেমনে'। তারচেয়েও বড় যুক্তি দিয়ে তাঁদের ঘোষিত সংশয় হল:

তুমি দেখ নাই যার মুরতি
তার সঙ্গে কি হয় পিরিতি?

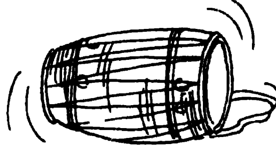
আসলে অনুমানবাদীরা সবচেয়ে বড়ো যুক্তি দেন শ্রুতি এবং শাস্ত্রগ্রন্থ বা লিখিত পুথির কথা বলে। কেতাবে ছাপা অক্ষরে লেখা আছে তাই সেটাই অকাট্য। এর প্রতিবাদে বর্তমানবাদীর ভাষ্য হল:

কানে কানে কথা শুনে সন্দেহ জেগেছে প্রাণে—
লেখা কথায় পাই কেমন কোন কথা রয়েছে মূলে
লেখা ছেড়ে দেখা বিচার করলেই বুঝবে সারাৎসার।

এ কথাই চরম। বস্তুগ্রাহ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ আর বাস্তব এই দেহ—এই হল সব কিছুর নির্ণায়ক।

জনপদাবলির বিষয় ও রূপ বস্তুনিষ্ঠ এবং তাতে বৈচিত্র্যের শেষ নেই, জনপদাবলির রচয়িতারা মোটামুটি আঠারো শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের মানুষ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো জীবিত ও ক্রিয়াপর। তাই বলা যেতে পারে, বাংলার জনপদাবলি প্রকৃতপক্ষে এক সুদীর্ঘ চলমান ঐতিহ্যের ফসল, যা আজও প্রাসঙ্গিক ও ফলদ। মানবমুখী এই বিশিষ্ট রচনাধারার সূচনাবিন্দু আমরা পেতে পারি মহাজন চণ্ডীদাসের উচ্চারণে।

৩



বাংলা গানের গল্প

বাংলা গান নিয়ে অনেক গল্প চালু আছে। তার কিছু গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে, কিছু গান রচনার ঘটনা নিয়ে। বলাবাহুল্য এর অনেকগুলোই লিপিবদ্ধ হয়নি---মুখে মুখে চলেছে। লেখা গল্প বা ঘটনা পাই কারোর স্মৃতিচারণে, কারোর আত্মজীবনী বর্গের বইতে। এর মধ্যে কোনো ঘটনাই উপেক্ষণীয় নয়, কারণ ওই সব আখ্যানে সবসময়ের সম্পদ, তার খুশবু, তার মেজাজ মর্জি বেশ ধরা থাকে। বিশ শতকের প্রথম পর্বে কলকাতার খেয়াল-ঠুংরির ঘরোয়া মাইফেলে মৌজুদ্দিন আর গহরজানের ভেতরে যে প্রচ্ছন্ন প্রণয়ের ইঙ্গিত নানা কিস্‌সায় জড়িয়ে আছে তা যেমন কবোষ্ণ তেমনিই রঙিন। গান সম্পর্কে সমজদারি সেকালেও ছিল একালেও আছে—কিন্তু এখন গানের প্রচারে বা সম্প্রচারে মিডিয়া যতটা বড়ো ভূমিকা নেয় সেকালে তার অস্তিত্বই ছিল না। উনিশ শতকের গায়ক গোবিন্দ অধিকারী (জন্ম ১৭৯৮) প্রসঙ্গে অমিয়নাথ সান্যালের ছোট একটা টিপ্পনী এ ব্যাপারে দেখা যেতে পারে · তিনি লিখেছেন---

> 'সেকালে ও একালের শিল্পীর তুলনা করা উচিত বা সম্ভব কিনা এ-সকল কথা বাদ দিয়েও একটা কথা মনে থাকে। সেকালের বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর বা বাহাদুরি ছিল না---উপায়ও ছিল না। সোনার জলে রং করা রাজ সংস্করণের প্রকাশ মাহাত্ম্য ছিল না। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের কারিগরিও ছিল না। এরূপ অবস্থায় যখন ভাবি গোবিন্দ অধিকারীর নিজ মুখের গান শুনবার বা দূতীর ভূমিকা উপভোগ করবার জন্য বিশ-ত্রিশ মাইল দূর থেকে জনসাধারণ পায়ে হেঁটে এসেছে এবং গান শুনে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়ে কৃতার্থ মনে করে নিজের গায়ের ওড়না বা অলংকার শিল্পীকে দান করে গিয়েছে—তখন মনে মনে চমৎকৃত না হয়ে থাকা যায় না।'

একই কথা বলা যায় মুকুন্দদাস সম্পর্কে। দেশপ্রেমের মহিমা বোঝাতে, বিদেশি দ্রব্য বর্জন করতে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে তিনি সারা বাংলায় কোথায় না গেছেন এবং সেই উদাত্ত কণ্ঠের গান শুনে কে-না উত্তেজিত হয়েছে! তাঁর ছবিতে দেখি চওড়া বুকে ঝোলানো আছে কত-কত পদক—এ সবই তাঁর গানের সমজদারির প্রতীক।

সাধারণ মানুষের গানের প্রতি ভালোবাসা এখনকার গানকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাকে বিচিত্রমুখী করেছে। আগে গায়ক সমাজকে উৎসাহিত করত বা পরিপোষণ করত সামন্তসমাজ। রাজারাজড়া বা জমিদারদের সংগীতপ্রিয়তা ছিল বংশানুক্রমিক। বাড়িতে দু-পাঁচজন গাইয়ে বাজিয়ে রেখে তাঁদের ভরণপোষণ আর কদরদানিতে তাঁরা ছিলেন তৎপর। গায়ক-গায়িকাদের অনেক সময় খুঁজে বারও করতেন এইসব বাবুসম্প্রদায়। যেমন সারা বাংলায় বিদ্যাসুন্দরের গান গেয়ে যিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন সেই গোপাল উড়ের আকস্মিক আবিষ্কার কাহিনি বেশ মজাদার।

আনুমানিক ১৮১৯ সালে গোপালের জন্ম ওড়িশার যাজপুরে। ১৮৪০ নাগাদ গোপাল জীবিকার খোঁজে আসেন কলকাতা—কারণ তখনকার কলকাতায় কিছু না কিছু কাজ জুটে যেত। প্রথমে তাঁকে হতে হল ফেরিওয়ালা। মধ্য কলকাতার অলিগলিতে তিনি চাঁপা কলা বেচতেন হেঁকে হেঁকে। বউবাজারে রাধামোহন সরকার মশাইয়ের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি নিয়ে মহড়া চলছিল। পাড়ার ইয়ারবকসি দু-চারজন এই আসরে ছিলেন—যেমন বিশ্বনাথ মতিলাল, হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। হঠাৎ বাড়ির নিচের গলিতে সুরেলা গলায় বেজে উঠল ফেরিওয়ালার হাঁক 'চা-ই চাঁ-পা-ক-লা'। এমন সুরেলা কণ্ঠের আমেজ পেয়ে বিশ্বনাথ মতিলাল হেঁকে বললেন, 'ওরে কে আছিস্, গান্ধার বলেছে রে, চাঁপাকলাকে ধরে আন্, এক্ষুনি।' এ ঘটনার ভাষ্য দিয়ে সুরজ্ঞ অমিয়নাথ সান্যাল বুঝিয়ে দিয়েছেন—'মজলিশে স্বরযন্ত্রে যে সুরটি বাঁধা হয়ে সরগরম হয়েছিল, সেই স্বরের অনুবাদী গান্ধার স্বরে "চাই চাঁপাকলা" ডাক প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ষড়জ সুরের পরে, অথবা সঙ্গে, শুদ্ধ গান্ধারের আবির্ভাব হলে কানে কী রকম ভালো লাগে এবং আসরের আবহাওয়াতে কী রকম জমিয়ে তোলে—স্বরবিলাসী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন।'

ভাষ্য যাই হোক, ঘটনাটাই তো চমৎকার এবং ওই এক শুদ্ধ গান্ধারের সুবাদে গোপাল উড়ে পেয়ে গেলেন বাবুসমাজের আশ্রয়। গান শিখে, স্বভাবজ মধুর কণ্ঠে বিদ্যাসুন্দরের গান গেয়ে মাত করতে লাগলেন সারা বাংলায় সংগীত-রসিক মানুষের মনের অন্দর। সেই বিশেষ গীতরীতির নাম হয় 'গোপাল উড়ের টপ্পা'। সেই গায়নে গোপালের জনাদর এতটাই তুঙ্গে ওঠে যে পৃষ্ঠপোষক রাধামোহন তাঁর মাসিক মাহিনা এক লপ্তে দশ টাকা থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা করে দেন।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বাস্তব নিয়ে এই যে ওড়িশাবাসী যুবার কলকাতায় আসা এবং নিতান্ত ঘটনাচক্রে তাঁর অত্যাশ্চর্য ভাগ্যবদল তার আখ্যান যেমন উপভোগ্য, তেমনই চমকপ্রদ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮৪২) বৃত্তান্ত। উনিশ শতকের কলকাতা আর আশপাশের গাঙ্গেয় বৃত্তে কৃষ্ণযাত্রার গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন তিনজন। গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী (জন্ম ১৮১০) ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। এই নীলকণ্ঠ মাত্র তেরো বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে কলকাতায় এসে বড়বাজারে এক মাড়োয়ারির বাসনের দোকানে কাজ নিতে বাধ্য হন। নীলকণ্ঠের গান শুনে এবং তাঁর বিনয়ী ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মাড়োয়ারির রক্ষিতা স্নেহবশে তাকে গান শেখান। এইভাবে গানের বিদ্যা আয়ত্ত করে নীলকণ্ঠ প্রথমে গোবিন্দ অধিকারীর দলে শিক্ষানবিশি করেন, তারপরে নিজের গ্রামে ফিরে গড়ে তোলেন কৃষ্ণযাত্রার দল। সেকালকার কলকাতার গান-পাগল শ্রোতারা নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রার ব্যাপক পোষকতা করেন।

গানের মানুষদের কাহিনি এ রকম কতই আছে। আমাদের কালেও এমন ঘটে। তবে তফাত হল, সেকালে কোনো ঘটনাচক্রে বা কোনো ব্যক্তির নেকনজরে পড়ে ঘুরে যেত ভাগ্যের চাকা আর এখনকার সময়ে লাগে রেকর্ড বা চলচ্চিত্রের দাক্ষিণ্য। কলকাতায় ১৯৩০ সালের সবাক চলচ্চিত্রের সুবাদে পাঞ্জাবি যুবক কুন্দনলাল সায়গল বাংলা গান (এমনকি রবীন্দ্রসংগীত) গেয়ে অর্থ ও খ্যাতি পেয়ে যান। প্রথাবদ্ধ গান তেমনভাবে না শিখে মুম্বইয়ের বাঙালি কিশোরকুমার অভিনয়ে ব্যর্থ হয়েও প্লেব্যাক গানে অত্যাশ্চর্য খ্যাতি পেয়েছেন। একইরকম ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছেন বরানগরের কেদার ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন নিতান্ত

অকিঞ্চিৎকর এক কপি সিঙ্গার, বলিউড তাঁকে করে দিয়েছে কুমার শানু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র। গানের টানে ঝুঁকি নিয়ে ছেড়েছিলেন নিশ্চিত ভবিষ্যৎ—হয়ে গেলেন ভারতবিখ্যাত গায়ক ও সুরকার। এ ব্যাপারে সর্বাধুনিক নমুনা সুমন চট্টোপাধ্যায়। আমেরিকা ও জার্মানিতে তিনি ছিলেন সংবাদ বিভাগের কর্মী। বাংলা গানের বন্ধ্যা জমিতে নতুন ফসলের স্বপ্ন নিয়ে কর্ষণ করতে এসে হয়ে গেলেন নতুন গানের দিশারি। এ জাতীয় গানের মানুষের আখ্যানের পাশাপাশি কেউ কেউ জানতে চান বিখ্যাত সব গানরচনারও গল্প।

গান সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষের ধারণা যে—এ কেবল বিনোদনের বিষয়। কানে শুনে বেশ লাগল, মন ভরে গেল। তার সুর বা তাল নিয়ে ক'জনই বা ভাবে! গানের কথা বা বাণী অবশ্য বেশ নতুন রকমের হলে আরও ভালো—মনে গেঁথে যায় সেটাই সবচেয়ে আগে। গানটা যদি আরেকবার শুনতে ইচ্ছে করে তখন তো সেই গানের কথাটার কথাই আমরা বলি, সুরের স্মৃতি থাকলেও কি মুখে বলা যায়? কিন্তু গান ব্যাপারটার মূল রসায়ন কিন্তু অন্যরকম। সেই যে কবেকার চণ্ডীদাস বলে গেছেন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো/আকুল করিল মোর প্রাণ' সেটাই গানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজে বলা আসল কথা। অর্থাৎ গান শুধু কানে শোনার বিষয় নয়—মর্মে দাগ দেবার মন্ত্র। তার মানে, গানের ক্রিয়া আমাদের মগজের বিষয়, তবে তার সূচনা হল শ্রুতি। কিন্তু এর পরেও গান নিয়ে অনেক মজা আছে। যেমন একটা হল গ্যানের গল্প—মানে, কীভাবে একটা বিশেষ গান রচিত হয়েছিল তার বৃত্তান্ত। খুব পুরোনো একটা বৃত্তান্তের কথা মনে এল—সেই কবেকার দ্বাদশ শতকের কথা। আমাদের প্রথম নাটগীত *শ্রীগীতগোবিন্দম্* লিখছিলেন জয়দেব। 'স্মরগরল খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্' পর্যন্ত লিখে আর পাদপূরণ করতে পারছিলেন না—শেষে বেশ খানিকক্ষণ পরে চলে গেলেন নদীতে স্নান করতে। স্নান করে এসে পুথির সামনে বসে দেখেন এ কী কাণ্ড! লেখা রয়েছে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'। কে করল এমন চমকপ্রদ পাদপূরণ? স্বয়ং গোবিন্দই নাকি এসে ভক্ত গীতিকারের সংকট মোচন করলেন। ভক্তবৎসল তো! এ ঘটনা বাস্তব না কল্পনা তাই নিয়ে না ভেবে আমরা বরং বলতে পারি, সৃষ্টি কর্মের ব্যাপারটাই খুব রহস্যজনক—স্রষ্টার মনোভূমির অতল ভুবন যেন এক মায়ালোক।

এই সূত্রে মনে হল কবি কিট্স-এর কথা। সারাদিন ধরে একবার একটা কবিতা মক্সো করছিলেন। লিখতে লিখতে একটা পঙ্ক্তিতে এসে আটকে গেলেন—A thing of Beauty is a Constant joy। এই Constant joy শব্দবন্ধটি কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না। কেমন যেন খটমট গদ্যধর্মী। কিন্তু সারাদিন ধরে কাগজ কলম আর মগজ লড়াই করে ওর বদলে লাগসই মনের মতো শব্দটা কিছুতেই এল না। কবিচিত্ত হয়ে উঠল ব্যথিত বিহ্বল। তখন সন্ধে নেমে আসছে ধীরে ধীরে। শ্রান্ত কবি বসেছেন বাড়ির উদ্যানে। সহসা বহুদূরের চার্চ থেকে ভেসে এল ঘণ্টাধ্বনি। আর অমনি কিট্সের মনে অনুরণিত হল বাইবেলের প্রার্থনার বাণী *for ever for ever and for ever. amen.* ব্যাস, বিদ্যুৎঝলকের মতো এসে গেল প্রত্যাশিত শব্দবন্ধ। পরম প্রশান্তিতে লিখলেন—A thing of Beauty is a joy for ever। ফুটে উঠল যেন পরিপূর্ণ সুষমার এক পদ্ম—সৃষ্টির সৌরভে আকীর্ণ।

এমনতর কত আখ্যান কত অনুষঙ্গ ঘিরে থাকে এক-একটা কালজয়ী রচনার পেছনে। খুব অতীত কালের স্রষ্টাদের এ ধরনের ঘটনা, কিংবা তার থেকে আকস্মিক পরিত্রাণের কাহিনি আজ আর জানার উপায় নেই। কিন্তু যাঁরা আমাদের নিকটকালের? যেমন, রবীন্দ্রনাথ। কেমন করে লিখতেন তিনি? বিশেষ করে তার গানের নেপথ্যে নাকি অনেক গল্প আছে। নিকটজনেরা বলেছেন তাঁদের আত্মকথায়, কোনো কোনো প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন মজা করে। যেমন একজন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালে সুন্দরী

ভাইঝি ইন্দিরার সঙ্গে খুব ঠাট্টা ইয়ার্কি করতেন। ইন্দিরা ছিলেন জাত রূপসী। তাঁদের বাড়ির সামনে ছিল মস্ত বাগান তারপর গেট। সেই গেটের বাইরে একজন যুবক রোজই এসে দাঁড়িয়ে থাকত, আবার চলেও যেত। রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে ভাইঝিকে বলতেন, ও নিশ্চয় রোজ তোকে দেখতেই আসে, আহা বেচারা। এরপর তিনি নাকি লিখে ফেললেন সেই গানখানা—

সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে
তারে আমার মালার একটি কুসুম দে।

ঘটনা সত্যি না মিথ্যে কে বলবে, কিন্তু প্রসঙ্গটি বেশ উপভোগ্য আর সবচেয়ে বড় কথা এভাবেই তো সৃষ্টি হয়েছিল এমন চমৎকার একখানা গান? এই রকমই আরেকটা গানের গল্প শোনা যায় যে তাঁর নাতনি পুপে শিশুকালে খল্‌বল্‌ করে কত কী বলত, যেমন সব শিশুর কাকলি শুনি আমরা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই অবোধ ভাষণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লিখলেন—

অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি
তোমার ভাষা বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি।

এখানে বলবার কথা এটাও যে, এ রকম গানের সূচনা হয়তো ঘটেছে ছোটোখাটো কোনো ঘটনার বা পরিহাসে, কিন্তু গানের অন্তরা থেকে তার ভাবনা গেছে ঘুরে এবং পরিণামে গড়ে উঠেছে একটা সুন্দর গান—একেবারে যাকে বলে বাণী ও সুরের যুগল সম্মিলনে সুষমাময় রবীন্দ্রসংগীত।

এইখানে এসে গানের নির্মাণের কথা বা রবীন্দ্রনাথের গান সৃষ্টির ধরন সম্পর্কে দু-চার কথা জেনে নিতে হবে আমাদের। সাধারণভাবে বলা যায়, গানের প্রধান দুটো অঙ্গ হল কথা ও সুর। এই দুইয়ের সুসমন্বয়ে গানের গড়ন। তার মধ্যে থাকে তাল আর লয়। সেটা ধরা পড়ে গাওয়ার সময়। তারও পরে থাকে গায়কি। এই গায়কির ভেদ থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলগীতির বৈশিষ্ট্য কত অন্যরকম। কিন্তু প্রথমেই যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল গানের কথা আর সুর। প্রশ্ন হল, কথা আগে না সুর আগে, কোনো কোনো সংগীতকার প্রথমে গানের বাণী লিখে তারপরে তাকে নির্দিষ্ট কোনো সুরের ছাঁচে ঢেলে দেন। আবার কেউ কেউ আগে গুনগুন করে সুরের গড়ন ও চলনটি ঠিক করে তার ওপর বুনে দেন কথার আভা। রবীন্দ্রনাথ যখন গানের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ ছিলেন তখন তাঁর জ্যোতিদাদার পিয়ানোর পাশে টুলে বসে দাদার তৈরি পিয়ানোর গতে বাণী বসাতেন আস্তে আস্তে। এ ছাড়া ঠাকুরবাড়িতে আর ব্রহ্মসমাজে চর্চা হত নানা রকমের মার্গসংগীত। গাইতেন বিষ্ণু বা যদুভট্টের মতো ওস্তাদরা, পাখোয়াজের সংগতে। সেসব ছিল নানা বর্গের রাগদারি গান, গভীর গম্ভীর ধ্রুপদ হয়তো বা। হিন্দি ভাষায় লেখা, কখনো-বা সংস্কৃত ঘেঁষা বাণীতে। কিন্তু সুরের বনিয়াদ ছিল পাকা—রীতিমতো সাধনা করে সেসব আয়ত্ত করতে হত। এ সব গানের বাণীর চেয়ে সুর ছিল প্রধান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাথমিক সংগীত জীবনে এ জাতীয় রাগদারি গানের সুর ও চাল বজায় রেখে বসাতেন। পরে শিক্ষানবিশির স্তর পেরিয়ে তিনি আয়ত্ত করেন বিলিতি সুরে বাণী রচনা, বিলেত থেকে ফিরে। নানা প্রদেশীয় গানের সুরে তিনি ভাবের সাজবদল ঘটিয়েছেন নিজের কথা বসিয়ে। বাংলার কয়েকরকম লোকসংগীতের সুরের ধাঁচে তাঁর বাণীর নিরীক্ষা রয়ে গেছে। কিন্তু সৃজন কর্মে তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল বাংলা কীর্তন। তাঁর নিজস্ব বিবেচনায় মনে হয়েছিল, বাংলার কীর্তনের কথা ও সুরের খুব সুসমঞ্জস চেহারা আছে। কীর্তনই তার কাছে হয়ে উঠল গানে গ্রহণীয় আদর্শ ছাঁচ।

কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, তাঁর সমসময়ের নামি গীতিকারদেরও কোনো কোনো বিখ্যাত গান রচনার নেপথ্যে আছে এক একটা ঘটনা বা প্রেরণা। কারও-কারও রচনায় বা স্মৃতিচারণে এ ধরনের কিছু গানের হদিশ মেলে। যেমন ধরা যাক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের খুব জনপ্রিয় গান: 'আমি সারা সকালটি বসে বসে'।

১৮৮৬ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। বয়স তেইশ। সে সময়ে তিনি মেদিনীপুরের সুজামুঠা পরগনার সেটেলমেন্ট অফিসার। হ্যাটকোট পরে অফিসে যান সকাল সকাল, বেচারি কিশোরী বধূ সুরবালা একা একা থাকেন মস্ত বাংলো বাড়িতে। কাজলা দিঘির ধারে তাঁদের বাড়ির প্রাঙ্গণে ছিল একটা বকুল গাছ। সুরবালা কি আর করেন সারাদিন? একটা একটা করে বকুল ফুল কুড়োন। একদিন অনেক বকুল ফুল সংগ্রহ করে খুব ধৈর্যে আর প্রেমে গাঁথলেন মালা—তারপরে সারা দুপুর অপেক্ষা, কখন আসবেন তাঁর কর্মান্তের দোসর। শেষ বিকেলের মুখে এলেন তিনি—আড়াল থেকে এসে কিশোরী বধূ তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন সারাদিনের প্রযত্নে গাঁথা সেই মালা। প্রাপ্তির এমন অপ্রত্যাশিত মাধুর্য আর আকস্মিকতা ভরিয়ে দিল নবীন স্বামীর বুক। তৎক্ষণাৎ তিনি গানে লিখলেন—

আমি সারা সকালটি বসে বসে
এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।

এ তো শুধু মালা গাঁথা নয়, মাধুর্যের সেই ক্ষণকে দ্বিজেন্দ্রলাল গেঁথে নিলেন চিরকালের সুতোয়। দীপ্ত আবেগের ফুলে অবিনশ্বর মালা।

একেবারে স্বতঃপ্রেরণাতেও যে তিনি গান লিখতেন তা-ও জানা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমী অন্তর সবসময়ে মগ্ন থাকত পরাধীনতার জ্বালায় আর দেশের স্বপ্নস্মৃতি ঘেরা অতীত কাহিনিতে। তাঁর জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরি লিখছেন,

> একদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল কীরকম চঞ্চল হয়ে উঠে বললেন, দেখো, আমার মাথার মধ্যে একটা গানের কয়েকটা লাইন আসিয়া ভারী জ্বালাতন করিতেছে। তুমি একটু বসো ভাই,—আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি। আধঘণ্টার মধ্যে রচিত হল বিখ্যাত গান 'বঙ্গ আমার জননী আমার'। গান তাঁহাকে এতটাই উজ্জীবিত করিতে পারিত যে ওই তীব্র হতাশার জীবনেও তিনি আর কিছু না বলিয়া, হাততালি দিতে দিতে, সারাটা ঘরময় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন—
>
> কীসের দুঃখ কীসের দৈন্য কীসের লজ্জা কীসের ক্লেশ?
> সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ?

বিবরণটি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারি আমরা—স্বদেশি গান রচনা কতটাই তাঁর জীবনসম্পৃক্ত ছিল। কেবল গান রচনাই শুধু নয়, সেই গানে তৎক্ষণাৎ সুরসংযোজন করে গাইতে গাইতে তাঁর মধ্যে নাচের আবেগও এসে যেত। তখন তিনি আর কোনো একক গীতিকার নন, পরাধীন দেশের চারণ গায়ক, যাঁর কাজ সকলকে জাগানো।

রজনীকান্ত সেনের গান রচনার ক্ষমতা ছিল একেবারে রক্তগত। যখন তখন তিনি মুখে মুখে গান রচনা করে গাইতেন। তাঁর জীবনীকার নলিনীকান্ত পণ্ডিত লিখছেন, 'তিনি কিশোর বয়স হইতে নিজে গান বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাববিভোর বালক স্বরচিত ভক্তিরসাত্মক গান গাহিতেছেন—সে এক অপূর্ব দৃশ্য'। এই রকম তাৎক্ষণিকই হোক বা কোনো উপলক্ষেই হোক তাঁর গীত রচনার প্রতিভা নিয়ে অনেক বর্ণনা আছে। তার দুটি উদাহরণ এখানে দেখা যাক। জলধর সেনের জবানিতে পাই—

> এক রবিবার রাজশাহির লাইব্রেরিতে কীসের জন্য একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়) বাসায় আসিল। অক্ষয়, বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে? একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'একঘণ্টা পরে সভা হইবে, তখন কি গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে

পারে।' ...সে তখন টেবিলের নিকট চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক। গানটি এখন সর্বজন পরিচিত—

তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো নীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর -দিব্যাঙ্গনা শান্ত-কুশল-দরশা।

এমন এক তৎসমবাণীবহুল গান নিমেষে লিখে ফেলা এবং কিছু পরেই অনুষ্ঠানে সেটি গাওয়া রজনীকান্তের গীতিরচনা কুশলতার সুন্দর উদাহরণ।

এর চেয়েও চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর কান্তগীতি রচনার বৃত্তান্ত জলধর সেনই প্রত্যক্ষ করে লিখে গেছেন। ১৯০৫ সালে সারা বাংলা বিশেষত কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নেমে এসেছিলেন রাজপথে তাঁর 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান গাইতে গাইতে সম্মেলক কণ্ঠে। এই সময়েই জলধর সেন দেখেন—

একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি 'বসুমতী' আপিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে রজনী এবং শ্রীমান অক্ষয়কুমার সরকার...আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেইদিনই দার্জিলিং মেলে বেলা এগারোটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া অক্ষয়কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসের ছেলেরা তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইবে।...তখনই গান লিখিতে বসিয়াছে। গানের মুখ ও একটা অন্তরা লিখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বলিল,—'এই তো গান হইয়াছে, চল জলদার ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা হইক।'...রজনী গানটি বাহির করিল।...সে বলিল, 'এইটুকু কম্পোজ করিতে দাও, ইহারই মধ্যে বাকিটুকু হইয়া যাইবে।' সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভকরিতে করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুজনে তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল।

রজনী ও অক্ষয় ৩০/৪০ খানা গানের কাগজ লইয়া চলিয়া গেল।

গান রচনার কাহিনি শোনা গেল কিন্তু তার পরিণতিও চমৎকৃতিতে ভরা। সে বিবরণও জলধর সেন লিপিবদ্ধ করে বলেছেন—

সন্ধ্যার সময়...বসিয়া আছি, এমন সময় দূরে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। গানের দল ক্রমে নিকটবর্তী হইল। তখন আমরা শুনিলাম, ছেলেরা গাহিতেছে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।' গান শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছিল;তাহার পর ঘাটে মাঠে পথে নৌকায় দেশ-বিদেশে কতজনের মুখে শুনিয়াছি।

জলধর সেনের মন্তব্য একেবারে খাঁটি। এমন কালজয়ী গানের প্রচার সে কালে যে কত ব্যাপক হয়েছিল. স্রেফ মুখে মুখে, তা এখন ভাবা কঠিন, বিশেষত এই বৈদ্যুতিন সম্প্রচারের অতি দাক্ষিণ্যের যুগে। সে সময়ের যুব-সম্প্রদায় 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি যে এত উষ্ণতার সঙ্গে অন্তরে নিয়েছিল তার কারণ গানের ভিতরকার অকপট আন্তরিক ভাবসম্পদ এবং সুরের সরল মর্মস্পর্শী ধরন। সবাই এ গানে কণ্ঠ দিতে পেরেছিল—অথচ কত আকস্মিক ভাবেই এ গানের সূচনা!

কান্তগীতির মধ্যে আর একটি অবিস্মরণীয় গান হল 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে'। এ গান রচনার বৃত্তান্ত কী উপলক্ষে তা জানা যায় না, কিন্তু রজনীকান্ত নিজেই অন্তরঙ্গ আলাপনে জানিয়েছেন—

জানিস এটা একটা বাজে কাগজের পাতায় লিখে টেবিলের ওপরেই ফেলে রেখেছিলাম, কখন এসে তোর বৌঠান লেখা দেখেছেন—আমি চেম্বারের কাজ সেরে এসেছি—নাইতে যাব—ভাদুড়ি তামাক নিয়ে এল— কোথায় ছিল তোর বৌঠান—সেই লেখাটুকু নিয়ে এসে আমাকে বললেন,'একি লিখেছ তুমি—আমার যে পড়েই কান্না আসছে। কেন এমন করে লিখলে?' আমি বলিলাম,—'আবে কেন লিখেছি তার কি জবাব আছে? যা কলমে আসে তাই লিখি।' 'আচ্ছা বল যে এ গান তুমি গাইবে না।' আমি বললাম 'না গাইব না।'

এই পর্যন্ত বলে রজনীকান্ত মিনতি করে জানালেন—তবে তোকে বলে রাখি—যখন আমি চলে যাব তখন সবাই মিলে এই গানটি গাইতে গাইতে আমাকে মহাযাত্রা করিয়ে দিবি—ভুলিসনে।

রজনীকান্তের এই আবেদন পালিত হয়েছিল। কর্কট রোগে দীর্ণ, শেষ একবছর বাক্যহীন গানহারা তাঁর ঐহিক দেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন অনুরাগীরা এমন নন্দনাভিলাষী সত্তার আকুতিময় এই গানটাই গেয়েছিলেন। তাঁর মরণোত্তর কালে এই গানটি অনেকটাই খ্যাতি ও প্রসার লাভ করেছে আন্তরিক উচ্চারণ ও সুরের একমুখী অনায়াস চলনে। কান্তগীতির মধ্যে এটি সম্ভবত আজও সবচেয়ে সমাদৃত। শুনতে শুনতে অভিভূত লাগে—মনে হয় এ তো যাত্রাপথের আনন্দগান নয়—যেন সজল অরুন্তুদ এপিটাফ।

রজনীকান্ত সেনের গানের সূত্রে দাম্পত্য বন্ধনের যে সুন্দর আলেখ্যটিফুটে ওঠে, অতুলপ্রাসাদের গানে সেই দাম্পত্য জীবনের ধ্বস্ত স্বরলিপি পরতে-পরতে আঁকা। সারা জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত পাঁচশোর বেশি গান লিখেছেন কিন্তু অতুলপ্রসাদের জীবনটি ছিল বড়ো বেদনাখিন্ন। গান রচনার আখ্যানের চেয়ে তাই বড়ো হয়ে ওঠে এই সত্য যে গানই যেন তাঁর আত্মজীবনী। নিদ্রাহারা বর্ষার রাতে মিলনপিয়াসী প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের মধ্যে তুমিও একাকী আমিও একাকী এমন অনুভব এত কারুণ্যে ভরা ও জীবনস্পর্শী যে তার জন্যে কোনো উৎস সন্ধান করতে হয় না। তবে অতুলপ্রসাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন হেমকুসুম। 'আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর/ওগো অনেকদিনের পর'এইরকম প্রচ্ছন্ন আনন্দও ফুটে উঠত তাঁর গানে। হেমকুসুম আর অতুলপ্রসাদ একই লখনউ শহরে দুটি আলাদা বাড়িতে থাকতেন। কোনো কোনো উপলক্ষ তাঁদের মেলাত—সে কটা দিনরাত তাঁদের ভাঙা ঘরে চাঁদিনীর মায়া জাগত।

১৯২৩ সালে আসে এইরকম এক উপলক্ষ—রবীন্দ্রনাথ আসেন অতুলপ্রসাদের বাড়ি। খবর পেয়ে হেমকুসুম আসেন অতিথির পরিচর্যার কাজে। গৃহ স্বামিনীর স্বাভাবিক ভূমিকায়—সঙ্গে তাঁর পুত্র দিলীপ। ভরে ওঠে অতুলপ্রসাদের কটা দিন। কিন্তু সে আর কতটুকু আশ্রয়? রবীন্দ্রনাথ যেদিন চলে গেলেন সেইদিনই হেমকুসুম সপুত্র বিদায় নিলেন। সৃষ্টি হল এক অভিমানের গান।

ওগো নিঠুর দরদী এ কি খেলছ অনুক্ষণ—
তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন।

জীবনের বিপ্রতীপ আয়োজনে জেগে ওঠে গানের উৎস। ফুলের সান্নিধ্য পেতে চেয়ে তার কাঁটায় বিক্ষত হৃদয় শোচনাই করে কেবল, সমাধানের পথ পায় না।

স্বভাবলাজুক অন্তর্মুখী অতুলপ্রসাদ ব্যক্তিজীবনের নানা আঘাত সন্তাপের মর্মজ্বালা নিজেই বহন করতেন—বলতে পারতেন না কাউকেই। বলবেনই বা কখন? একদিকে তো তিনি লখনউয়ের সফল ব্যারিস্টার এ.পি.সেন, আরেকদিকে নিঃসঙ্গ স্বামী। সারাদিনের প্রচণ্ড ব্যস্ততার পর এক-একটা সান্ধ্য গানের মজলিশ বা পানভোজনের আসর কতটা আর শমতা পাবে? দিলীপকুমার রায়কে একবার তিনি ধীরে ধীরে শুনিয়ে ছিলেন 'কি আর চাহিব বলো হে মোর প্রিয়,' তারপরে বলেছিলেন, 'জানো দিলীপ, এ গানটি আমি

বেঁধেছিলাম আমার জীবনের এক দারুণ দুঃখের সময়...যখন মনে হয়েছিল...যাক সে কথা।' এভাবেই অকথিত থেকে গেছে তাঁর অনেক গানের আখ্যান। আরেক দিন 'বিধি আর তো তোমারে নাহি ডরি' গানটি মগ্ন হয়ে গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে দিলীপকুমারকে বললেন, 'দিলীপ, এ গানটি কিন্তু যার তার কাছে গেয়ো না। এ গানটি আমার বড়ো ব্যথার দিনে লেখা'।

১৯০২ থেকে ১৯৩৪ (তাঁর মৃত্যুর বছর) অতুলপ্রসাদ ছিলেন লখনউতে। মাঝখানে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ দুই বছর ছিলেন কলকাতায়, লখনউ ত্যাগের কারণ সেই দাম্পত্যবিবাদ। কলকাতায় এসে ওকালতির সঙ্গে 'মনডে' ক্লাবে গানবাজনা আড্ডা ও পানভোজনের বিনোদনে দিন কাটত। রবীন্দ্রনাথের ডাকে যেতেন শান্তিনিকেতনে। একবার জ্যেঠতুতো দাদা সত্যপ্রকাশের সঙ্গে গেলেন দার্জিলিং। উঠলেন হোটেলে। অন্য এক হোটেলে সেই সময়ে উঠেছিলেন হেমকুসুম, ছেলেকে নিয়ে। কে ছেলেকে কাছে রাখবে তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানের মধ্যে একদিন শিশিরকুমার দত্ত নামে একজন পারিবারিক বন্ধু দেখলেন ম্রিয়মাণ অতুলপ্রসাদ আপন বেদনায় চোখে হাত চেপে শুয়ে গাইছেন--

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দুজন যদি হত আপন
হত না মোর আপন সবাই।

কিন্তু কোন্‌টা বেশি আকর্ষণীয়, কোন্‌টাই বা প্রার্থিত? আপনঘরই তো এবং সেখানে দোসরজনের মিলন। তাঁর জীবনে তা হয়নি—গানে গাঁথা তারই বেদনা।

কিন্তু তাঁর একটি গান রচনার ইতিহাস ধরা আছে দিলীপকুমার রায়ের *স্মৃতিচারণ* বইতে। লিখছেন তিনি।

লখনউয়ে সেবার অচ্ছনবাইয়ের গান শোনার সুযোগ এল এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে। বাইজির দক্ষিণা অতুলদাই দিয়েছিলেন।...সেদিন সন্ধ্যায় এ-মহিয়সী গায়িকা কী গানই যে গাইলেন সমজদার শ্রোতা পেয়ে। কোনোদিন কি ভুলব তাঁর 'মুকুটধারী কানহ্ বাজায়ে বাঁশিয়া রে'। সে কত তান, কত মিড়, সুরকে নিয়ে কত আদর, কখনো অশ্রু কখনো আনন্দ। অতুলদার চোখ আবেশে সজল হয়ে এল সাবাশ দিতে দিতে।

পরদিন সন্ধ্যায় অতুলদা আমাকে তাঁর সুরম্য ছাদে ডাকলেন। নিজের গান শোনাতে তিনি সত্যিই লজ্জা পেতেন। বললেন লাজুক সুরে—'দিলীপ কাল রাতে একটা গান বেঁধেছি। কেমন হয়েছে কে জানে?'...পরে তাঁর সুকুমার লাজুক ভঙ্গিতে সুমিষ্ট সুবেলা কণ্ঠে গাইলেন—

চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে

অচ্ছনবাইয়ে নানা মর্মস্পর্শী মীড়, কম্পন ও সূক্ষ্ম কারুকাজ এ-গানটির মধ্যে সহজেই অনুপ্রবেশ করেছিল অতুলদার শিল্পীহৃদয়ের আনন্দের সহজ তাগিদে।

প্রবাসী জীবন আমাদের প্রত্যক্ষ জানাচেনার দৈনন্দিনের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের গান রচনার মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি করেছে। সেই কারণে তাঁর গানে লখনউ অঞ্চলের লচা ঠুংরির যেসব প্রচ্ছন্ন প্রভাব কাজ করেছে তার উৎস সন্ধানের কোনো উপায় আজ আর নেই। তাঁর ব্যথিত জীবন আর লাজুক স্বভাব খুব একটা বন্ধু-বান্ধবদের সান্নিধ্য কামনা করেনি। গানই ছিল তাঁর চিত্তমোক্ষণের একমাত্র ক্ষেত্র। তাই গানের আসর ডেকে সবাইকে নিয়ে বসতেন অনেক রাত পর্যন্ত। 'ওগো দুঃখসুখের সাথী—সঙ্গী দিনরাতি—সংগীত মোর' গানের কথাগুলি তাঁর সত্যিকারের কনফেশন। দাদা সত্যপ্রসাদ ডায়েরিতে লিখেছেন—

'অতুল আমার বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত।...এরূপ সমবেদনায় আমরা কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি।' এই রকমই একটা অবকাশে ঘর ছেড়ে দাদার কাছে এসে অতুলপ্রসাদ লিখেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গান—'যাব না যাব না যাব না ঘরে।'

গানের গল্প শেষ করা কঠিন— সেই গল্পের ঝাঁপিতে রসদও কম নেই কিন্তু এবারে ক্ষান্তি দেব নজরুলের একটি গানের বৃত্তান্ত বলে। নজরুলের অনেক গানের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অনেকে। তার মধ্যে সত্য মিথ্যের মিশেলও আছে। তবে একটা কাহিনি খুব মনে রাখার মতো। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর জীবনকালেই কেউ কেউ গাইতে চাইতেন তানকর্তবে মুড়ে, অলংকৃত করে। রবীন্দ্রনাথ তাতে রাজি হননি। বলেছিলেন, আমার গানে আমি তো কোনো ফাঁক রাখিনি। খোদ দিলীপকুমার রায়, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ খুব স্নেহ করতেন, একবার রবীন্দ্রনাথের 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি তাঁকে শুনিয়েছিলেন তানে বাটে মিড়ে গেঁথে। রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন দেননি সেই গায়নে। অভিমানে বাকি জীবন তিনি আর কোনোদিন গাননি রবীন্দ্রসংগীত।

এই রকমই একটা ঘটনা আছে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর (যাঁকে সবাই বলেন জ্ঞান গোঁসাই) রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়' তিনি অলংকৃত করে গেয়ে কবির কাছে অনুমতি চান রেকর্ড করতে। সম্মতি মেলে না, কিন্তু জ্ঞান গোঁসাইয়ের রোখ চেপে যায়, তাই দ্বারস্থ হন নজরুলের। একেবারে ওই সুরের ছকে তিনি গান বেঁধে দেন, 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়'। এই গানটা রেকর্ড করেন জ্ঞান গোঁসাই এবং তা সাড়া তোলে। কিন্তু ইত্যবসরে বাঙালি শ্রোতাদের মুখে রটে যায় 'শূন্য এ বুকে' আসলে নজরুলের অকালমৃত সন্তান বুলবুলের স্মৃতিতে। শঙ্খ ঘোষ এ প্রসঙ্গে রসান দিয়ে লিখেছেন—আশ্চর্য এই যে, 'অল্প লইয়া থাকি' গানটি বিষয়েও কোনো কোনো মহলে শুনেছি একই ধরনের ভুল জল্পনা যে শমীন্দ্রের মৃত্যুকে নিয়ে বাঁধা ওই গান। অথচ ও-গান লেখা হয়েছিল সে-মৃত্যুর সাত বছর আগে।

রবীন্দ্রনাথের গান রচনায় বৃত্তান্ত অনেক বিচিত্র ও বহুমুখী।

রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন যে তাঁর গান রচনার সময়ে কথা ও সুর আসত গলাগলি করে। পুরো গানের কথা ও সুরের অভিঘাতে তিনি আমর্ম নাড়া খেতেন। তারপরে নামত গানের বর্ষণ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই গানের সুর স্বরলিপিবদ্ধ না করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি স্বস্তি আসত না, অথচ নিজে হাতে স্বরলিপি করার ধাত তাঁর একেবারে ছিল না। ফলে গান বানিয়েই তিনি আকুল হয়ে পড়তেন সেটি কাছাকাছি কারও কণ্ঠে তুলে দেবার জন্য। এই রকম একটা গান রচনার গল্প শুনিয়েছেন প্রমথনাথ বিশী। লিখেছেন—

> তখন আশ্রমের গ্রীষ্মবকাশ প্রায় শেষের দিকে: আকাশ নতুন বর্ষার মেঘে ঘন নীল, কিছু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তখনও গাছের পাতা হইতে জল ঝরিতেছে। রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন আশ্রমের পশ্চিমপ্রান্তের একটি বাংলোতে। আমি আমবাগানের মধ্যে দিয়া কোথাও যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সবেগে আসিতেছেন; এতই ত্বরা যে পথ দিয়া চলিবার সময় নাই বলিয়াই মাঠ ভাঙিয়া চলিয়াছেন; সম্মুখে পড়িল মেহেদি গাছের বেড়া, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন; অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম গুনগুন করিয়া গানের দুটি পদ আবৃত্তি করিতেছেন: ভ্রমর যেথায় হয় বিবাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি। ব্যাপার কী বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এই গানটা তখন-ই রচনা করিয়া সুর দিয়াছেন; ভুলিয়া যাইবার আগেই গানটি দিনেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছেন।

'আমি কান পেতে রই' হচ্ছে সেই গান। যা শুনতে শুনতে আমরা মিলিয়ে নিতে পারি স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের চলচ্ছবি। ভেতরে তাঁর গানের বেদনা আর বাহিরে তার প্রকাশের তীব্র চঞ্চলতা।

কিন্তু এমনতর গানের নাটক সর্বদা তাঁর জীবনে হত না। একেবারে খুব কম বয়সের রবীন্দ্রনাথের একটা গান রচনার গল্প এবারে শোনা যেতে পারে। সময় ১৮৭৮, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সতেরো। তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁকে বিলাতে বসবাস করতে হবে, তাই বিলিতি কেতাকানুন সহবৎ শেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছিল বোম্বাইয়ের একটি রুচিমান কেতাদুরস্ত পরিবারে। তাঁকে সেসব কেতাকানুন শিক্ষা দিতেন যিনি সেই মারাঠি কন্যার নাম আনা তরখড়। রবীন্দ্রনাথ আনার সম্পর্কে লিখেছেন, 'এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে' বলে। আনা ছিলেন কবির চেয়ে সামান্য বড়, কিন্তু তরুণ রূপবান সেই কিন্নরকণ্ঠ যুবাকে দেখে বেশ ভাবাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। তার দুয়েকটি বর্ণনা বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দিলীপকুমার রায়কে। সে গল্প এখন থাক। উপস্থিত যে গল্পটি বলবার তা হল আনা বলেছিলেন কবিকে তাঁর একটা নাম দিতে। কবি নাম দিয়েছিলেন নলিনী। তারপরে ওই নামটি চিরকালের জন্য গেঁথে দিয়েছিলেন তখন তখনই যে গানে, তার মুখটা হল 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি।' মজা করে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেম সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুর।' এ গানটা এখন যদি আমরা শুনি, অনুষঙ্গে মনে পড়ে যাবে আনা বা নলিনীর অবিস্মরণীয় বাচন। বলেছিলেন—'কবি তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।'

রবীন্দ্রনাথের গান রচনার জীবনে অনেক নারীর প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ ছিল। জীবনের নানা বয়সে আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেক নারী তাঁর গানের ভুবনে জল সেচন করেছেন। ভাইঝি অভিজ্ঞা প্রতিভা ইন্দিরা ছাড়া ভাগ্নী সরলার কথা আসবেই। পরবর্তী জীবনে সাহানা দেবী কিংবা সাবিত্রী কৃষ্ণাণ তাঁকে অনেক গান জুগিয়েছেন। এই রকম একটা গানের গল্প পাই সাহানা দেবীর কলমে। সময় ১৯২৩, রবীন্দ্রনাথের বয়স বাষট্টি। সাহানার মুখেই শোনা যাক—

> আমার মুখে নানা কাজওয়ালা হিন্দি গান শুনতে কবি খুব ভালোবাসতেন। আমি প্রায় ওঁর কাছে গেলে এটা-ওটা যা জানতাম গাইতাম। অমনিতর দুটি হিন্দী গান সে সময় একদিন আমি গাই কবির কাছে বসে। শুনেই কবি বললেন, 'রোসো রোসো, আমি কথা বসিয়ে দিচ্ছি।' আমি গাইতে লাগলাম আর উনি তখনই-তখনই কথা বসাতে লাগলেন। কি তাড়াতাড়ি যে শেষ করলেন কথা বসানো!

সাহানা দেবীর গাওয়া সেই গান দুটির মধ্যে একটি হল—'মহারাজা কেওয়ারিয়া খোলো'। সেই গান শুনে ঝটিতি যে গান বাঁধলেন রবীন্দ্রনাথ তা হল—'খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলো।'

এ তো গেল তাঁর বাষট্টি বছর বয়সের গান রচনার গল্প। এবারে শোনা যাক তাঁর কুড়ি বছর বয়সের গল্প-কল্প। সময় ১৮৮১। রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন ততদিনে। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ তখন বোম্বাইয়ের কাছে কারওয়ার নামের বন্দর শহরে থাকতেন। সঙ্গে তাঁর ছেলে সুরেন, মেয়ে ইন্দিরা—কবির অতিপ্রিয় ভাইপো আর ভাইঝি। ওই বন্দর শহরে একদল নর্তকী গান শোনাতে আসত। ইন্দিরা তাদের কাছে গোটা কয় কানাড়ি ভাষায় গান শোনেন ও শেখেন। পরে তাঁর রবিকাকা কারওয়ারে বেড়াতে এলে তাঁকে সেই সব গান শোনান ইন্দিরা। তার মধ্যেও একটা গান হল 'সখি বা বা মারণ ফিড়িবেড়িয়ে।' শুনেই রবীন্দ্রনাথ সেই কানাড়ি গানের সুরের বিভঙ্গ অটুট রেখে বাঁধলেন: 'বড়ো আশা করে এসেছি গো'। এ গান এখন শুনলে টের পাওয়া যায় না গানের অন্তর্গত সাজবদলের আখ্যান। সুর আর চলন অক্ষুণ্ণ রেখে এমন দেশাত্মবোধের গান রচনা সে কি সহজ গান?

পিঠোপিঠি এবার উঠে আসবে আরেকটা গানের কাহিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা ছিলেন ওস্তাদ গায়িকা। পিয়ানো বাজাতেন চমৎকার। স্বরলিপি রচনাতেও হাত ছিল পাকা। তাঁর নেশা ছিল নানা রকম

গান শোনা আর সংগ্রহ করা। তিনি লিখেছেন—

আমি গানের বাতিকগ্রস্ত ছিলুম।...কর্তা দাদামশায় চুঁচুড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত। তাঁর মতো সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম—অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙে, কখনো-কখনো তার কথাগুলির কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক-একখানি নিজের গান রচনা করতেন।

সরলার সংগ্রহে এমনই একটা গান ছিল গগন হরকরার : 'আমি কোথায় পাব তারে'। এ গানটির স্বরলিপি পাওয়া যায় সরলার করা *শতগান* বইতে। রবীন্দ্রনাথ এমন একখানি একক বাউল গানের সুরে বাঁধলেন সম্মেলক স্বদেশি গান;'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। বাউলের আর্তি বেজে উঠল পরাধীন দেশের চিত্তবীণায়।

গগন হরকরার গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ যে চিরজীবী ভাব ও বাণী সংযোগ করে সোনার বাংলার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ব্যক্ত করলেন তা আজকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হয়েছে। কিন্তু এই গান রচনাকালেই কতখানি জনাদর পেয়েছিল তার খবর পাওয়া যায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জবানিতে। তাঁর কথায়—-'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এই মন মাতানো গানটি সর্বত্র গীত হইত। এই গানটি সর্বপ্রথমে কলিকাতার টাউন হলে গীত হয়। ঐ সভায় তাঁহার দ্বিতীয়বার 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর তিনি এই গান গাহিতে থাকিলে সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দ কবির সঙ্গে সুর দিয়া গানটি গাহিতে ও নাচিতে লাগিলেন।'

যৌবন পরবর্তী দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়ে উঠল বিশ্বকবি। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি তাঁকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার এমন এক উচ্চাসনে বসিয়ে দিল, তিনি যেন রাতারাতি হয়ে উঠলেন আন্তর্জাতিক মানুষ। সেইসঙ্গে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক অধিনেতা ও বিশ্বভারতী কল্পনার প্রবক্তারূপে তাঁর এমন এক মহিমময় মূর্তি গড়ে উঠল জনমানসে যে, সভাসমিতিতে শ্রোতাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন এমন দৃশ্য হয়ে উঠল দুর্লভ। অথচ একটা সময়ে কলকাতার সভানুষ্ঠানে ভাষণ দেবার পর সকলে রব তুলতেন 'একটা গান—-রবিবাবুর একটা গান শুনতে চাই আমরা' রবিবাবু সে আবদারও স্মিত মুখে পূরণ করতেন। তখন তাঁর গানের গলা ছিল তেজী ও অপরূপ মধুর। এই রকম একটা গানের কাহিনি শোনানো যেতে পারে এবারে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বছর পঁচিশেক বড়জোর। তাঁর গান গাওয়া নিয়ে কত যে, বিড়ম্বনা ঘটেছিল সেবার, তার বর্ণনা আছে পুত্র রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছিলেন—

কলিকাতায় সেবার কংগ্রেস হচ্ছে। নানা প্রদেশ থেকে বড়ো বড়ো নেতারা এসেছেন। দেশোদ্ধার কী করে করা যায় তাই নিয়ে ক'দিন ধরে ওজস্বী বক্তৃতা অনেক হয়ে গেছে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে। হাট ভাঙার আগে তারকনাথ পালিত ঠিক করলেন তাঁর বাড়িতে নেতাদের ডিনার পার্টি দেবেন। উদ্দেশ্য, পরস্পরকে সাধুবাদ দেওয়া। আমার পিতাকে পালিত সাহেব কেবল সাদর নিমন্ত্রিণ জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, বিশেষ করে অনুরোধ করলেন নেতাদের বিনোদনের জন্য গান গাইতে হবে।...বিদেশী আবহাওয়ার মধ্যে স্বদেশী গান গাইতে তাঁর একটুও ইচ্ছা করছিল না। উতলা মন নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আহারান্তে বক্তৃতা যখন চলেছে, তার মধ্যে একসময় বাবাকে গান গাইতে বলা হল। বাবা গাইলেন—'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।'

এরপর যে সে রাতের ডিনার মাটি হয়ে গিয়েছিল তা বলা বাহুল্য। কিন্তু ওই যে গানটি রবীন্দ্রনাথ সে পার্টিতে গেয়েছিলেন তা কবে লেখা? কোন্ উপলক্ষে?

সেই কাহিনি রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবুল করেছেন ১৯৩৭ সালে লেখা এক চিঠিতে। তাতে স্পষ্ট ভাষায় কবি লিখেছেন—প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তাঁকে যেতে হল। 'ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি গানটি রচনা করেছিলাম—আমায় বোলো না গাহিতে।...এই গান গাইবার পরে আর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হননি।'

গানটি শুনতে শুনতে এখনো একটা বেদনা ও নির্বেদের স্বরলিপি মনে বাজে। গান যে কেবল বিনোদন নয়, তা যে প্রতিবাদও , তার আভাস যেন গানের পরতে-পরতে। তবে বলার কথা এটাও যে, এমন এক গান রচনার উপলক্ষ যতই বেদনাবিধুর ও আত্মিক অসম্মতির হোক—গানটি কিন্তু খুব আন্তরিক ও হৃদয়স্পর্শী। সেইজন্য সৃষ্টি হিসাবে এটি অমরতার দাবি রাখে এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই গানটি পরবর্তীকালে অন্যত্র বহুবার গেয়েছেন।

অনেক সময়ে দেখা গেছে নিজেকে গান রচনায় একেবারে নিমজ্জিত করে ফেলতেন বলে অনেক সময় তার বাহ্যজ্ঞান থাকত না। বয়স যখন তাঁর তেত্রিশ, তখন এইরকম একটা বিশেষ গান রচনার বিবরণ দিয়ে চিঠিতে লিখছেন—

> আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম...গাইতে গাইতে কাজকর্মের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, প্রুফগুলো পড়ে রইল, দুপুর বেজে গেল, রৌদ্রের আলোক এবং তাপ ক্রমেই তীব্র হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। আজ আর কিছু হল না।

সকাল থেকে দুপুর গড়ানো সময় ধরে এত নিবিষ্ট হয়ে যে গানটি তিনি বানালেন সে গান হল কীর্তনের সুরে 'এসো এসো ফিরে এসো।' এ যেমন সারাদিন ধরে গান রচনার কাহিনি তেমনই আরেক রোমাঞ্চকর বর্ণনা আছে অমল হোমের লেখায়, কেমন করে ফুল্ল জ্যোৎস্না পুলকিত রাতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আদি ভবনের ছাদে একটু একটু গড়ে তুলেছিলেন সেই বিখ্যাত গান—'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' অমল হোম সেবার অগ্রজপ্রতিম চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। দু'জনেই রবীন্দ্রনাথের খুবই স্নেহভাজন তাই ঠাঁই হয়েছে আদি ভবনে। তাঁরা দুজন আছেন দোতলার বড় ঘরে আর পাশের ছোটো ঘরে রবীন্দ্রনাথ। বেশ অনেকটা রাত পর্যন্ত গুরুদেবের সঙ্গে গল্প-গাছা করে দুজনে শুতে গেছেন, ঘুমিয়েও পড়েছেন। এবারে শোনা যাক অমল হোমের বয়ান—

> কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, হঠাৎ চারুদা আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন—'অমল শুনছ?' শুনলাম কবির কণ্ঠ—সুরালাপ করছেন। উঠে দেখি, বসন্তের আলোয় শান্তিনিকেতনের দিগন্তবিস্তারী প্রান্তর প্লাবিত; গাড়ি-বারান্দার ছাদে একটা সাদা পাথরের বড়ো জলচৌকির উপর বসে রবীন্দ্রনাথ গান করছেন। চারুদা আর আমি পা টিপে-টিপে এসে চুপি চুপি বসে পড়লাম কবির পেছনে। একটু পরেই বুঝতে পারলাম সুরের আলাপের সঙ্গে-সঙ্গে কথা বসিয়ে হচ্ছে নতুন গানের সৃষ্টি—আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে...।

কালজয়ী এই পরাক্রান্ত রবীন্দ্র-গানটি কেন যে আজও আমাদের উদ্‌বেল করে তা অনুভব করা যায় এর সৃষ্টি কাহিনি শুনলে।

শান্তিনিকেতনের জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সময়েই গান রচনার আনন্দে মশগুল থাকতেন। তাঁর গান শোনার এবং তা গাইবার মতো অনুরাগীজনের তো অভাব ঘটেনি সেখানে। তখনকার আশ্রমবাসীদের

দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা ভাবলে আমাদের খানিকটা ঈর্ষা হয়। ভাবলে রোমাঞ্চ হয় যে, সেই অসামান্য গীতপুরুষ শান্তিনিকেতনের নিবিড় প্রকৃতিময়তার মধ্যে এসে নানা উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে কখনো নিজের ইচ্ছায় কখনো বা গানের মানুষদের আবদারে উপরোধে লিখে যাচ্ছেন গানের পর গান। এ কাজ ছিল তাঁর উপচিত আনন্দের ছন্দে গাঁথা জীবনলীলার অংশ—তাই তাতে কখনো ক্লান্তির ছাপ পড়েনি। তেষট্টি বছর বয়সে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'আজনাগাদ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধরে খুব কষে গানই লিখছি।...গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়। কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।'

শান্তিনিকেতনে দিনানুদৈনিকতার মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল, নিত্য নতুন উদ্ভাবনার চমকও কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জোগাতেন কতরকম রসদ। তাঁকে বলা যেতে পারে উৎসবপতি। তাঁর একষট্টি বছর বয়সের এমন একটা কাণ্ড এবারে বলি। ওই সময়ে তিনি গিয়েছিলেন সিন্ধু কাথিয়াবাড়। ভ্রমণ শেষে শান্তিনিকেতনে ফেরার সময় সঙ্গে করে আনলেন কাথিয়াবাড়ের এক চাষি পরিবারকে। তাদের একটি বারো-তেরো বয়সের ফুটফুটে মেয়ে দুই হাতে খঞ্জনি বাজিয়ে সারা আশ্রমে চমৎকার ছন্দে নেচে বেড়াত আপন মনে। রবীন্দ্রনাথের অমনি ইচ্ছে হল ওই নাচের ঢং আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চার করার। প্রথমে তাই আশ্রমিকদের সকলকে নাচের আসরে টেনে এনে চৈত্রমাসের শেষে আম্রকুঞ্জে গুরুদেব মেয়েটির নাচ দেখালেন আলাদা করে। এমনই রসগ্রাহী ছিল তাঁর মন যে সামান্যের মধ্যে খুঁজে নিতেন বৃহৎ সম্ভাবনাকে। নাচের ওই দৃশ্য দেখার পর লিখে ফেললেন সেই আশ্চর্য গান—'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে/সদাই বাজে'। ভাবলে অবাক লাগে ক্ষুদ্রের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন কত প্রসারিত স্বপ্ন—তাই বালিকার একান্ত খুশখেয়ালের খঞ্জনি তাঁর সৃজন সম্পদে রূপ নিল কালের মন্দিরায়। যা নাকি সর্বদা বাজছে ফুলে পাতায় আলোছায়া জোয়ার-ভাঁটায়। সকলকে আহ্বান করলেন ওই ছন্দের তালে জীবনের লয় বেঁধে নিতে।

শান্তিনিকেতনের গানের জীবন সর্বদা সুচারু ছিল না তাই বলে। মাঝে মাঝেই আসত ব্যাঘাত, প্রকৃতির রোষ। তার ফলে উৎসব পরিকল্পনা কখনো কখনো বানচালও হয়ে যেত। ১৩৩১ সালের দোল পূর্ণিমার ঘটনাটা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। শান্তিনিকেতনে তখন এবং এখনো দোলেব সময় খুব সাড়া পড়ে যায়, যার নাম বসন্তোৎসব। সেবার অর্থাৎ ওই ১৩৩১-এর বসন্তোৎসবে গাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দশ-এগারোটি নতুন গান বেঁধে ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে তৈরি করে রেখেছিলেন,যার সঙ্গে কল্পিত হয়েছিল 'সুন্দর' নাম দিয়ে এক নৃত্যাভিনয়ের। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। নন্দলাল বসু আর সুরেন কর আম্রকুঞ্জ সাজালেন চিরসুন্দরের অভিবন্দনার সংকল্পে। বিকেলে যখন মঞ্চসজ্জা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, হঠাৎ পশ্চিমি ঝড় এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। সজ্জিত আম্রকুঞ্জ ঝড়ের তীব্র ঝাপটে এলোমেলো হয়ে গেল। উৎসবপতিকে আর খবর দিতে হল না। ঘরে বসেই তিনি উপলব্ধি করলেন বিপর্যয়ের ভয়ংকরতা। কিন্তু তাঁর শমিতচিত্ত এও তো জানত যে রুদ্রের যেমন একটা দক্ষিণ মুখ আছে তেমনি আছে ভয়ংকর মূর্তি। অবিচলিত সেই স্রষ্টা তাই বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশে তখনই ঘরে বসে লিখে ফেললেন সেই বিখ্যাত গান—'রুদ্রবেশে কেমন খেলা কালো মেঘের ভ্রূকুটি।' তারপরে ঝড় শান্ত হল। সন্ধ্যা পেরোলে পুস্তকাগারের লম্বা ঘরে বসল আবার আসর। তাতে নতুন যে সৌন্দর্য যোগ হল তা কবিকণ্ঠে ওই নতুন বাঁধা গান—নিজেই গাইলেন কারণ তখনো আর কাউকে যে শেখানো হয়নি।

এমনতর ঘটনা বা দুর্ঘটনার পরে এত সুন্দর গান লেখা যেন কেবল রবীন্দ্রনাথকেই মানায়, তার কারণ তাঁর মনের গহনে রহস্যময় যে সৃষ্টিলোক তা চিরশান্ত। বাইরের ব্যাঘাত বাস্তব তাঁর শমিত-সত্তাকে বোধহয়

একটুও টলাতে পারত না। তাঁর আপন মনে গান রচনার যে সব কাহিনি পাই তাতে স্পষ্ট হয় এই ধারণা যে মানুষটি একেবারে তলিয়ে যেতেন গানের নির্মাণে। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় একবার জোড়াসাঁকের ঠাকুরবাড়ির গগনেন্দ্রনাথের স্টুডিয়োয় এমন এক দৃশ্যের সাক্ষী। ১৩২৬ সম্ভবত সেটা শুক্লপক্ষ। স্টুডিয়ো বা লাইব্রেরি ঘরে একটা ঘরোয়া সভা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই, তা ছাড়া ছিলেন সভাশোভন নানা বিশিষ্ট ব্যক্তি, তার মধ্যে চিরচঞ্চল নজরুল। কিছু আলাপ-আলোচনা, গান আবৃত্তি হয়ে গেছে। সভাস্থল নিস্তব্ধ। এবারে শোনা যাক শোভনলালের ভাষায়—

> স্টুডিও ঘরের গোল জাপানী জানলার বাইরে শিশুগাছের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে এসেছে। সেই জানলার ধারে একটা নিচু সোফাতে বসে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোটো খাতা আর পেনসিল নিয়ে মাথা হেঁট করে মাঝে মাঝে কী লিখছেন আর অস্ফুট স্বরে গুনগুন করে নিজের মনে সুর ভাঁজছেন। বেশ অনেকটা সময় কেটে গেল—ক্রমে সভার লোকেরা কেউ কেউ পিছিয়ে সরে এসে নিজেদের মধ্যে একটু নিচু গলায় কথাবার্তা শুরু কবলেন। কেউ কেউ আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।
>
> রবীন্দ্রনাথ তখনও নিজের মনে গুনগুন করে চলেছে। অনেকক্ষণ বাদে সমস্ত গানটার সুর যখন মনে মনে বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছেন, তখন সবাই আবার সভাস্থ হয়ে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় শান্ত হলেন। রবীন্দ্রনাথ গলা ছেড়ে গান শুরু করলেন—
>
> মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল
ফাগুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে—যাই-যাই-যাই

গান রচনার এমন মর্মস্পর্শী কাহিনি শুনলে এই বিশেষ গানটি যেন নতুন কোনো মাত্রা পেয়ে আমাদের বেশ আচ্ছন্ন করে ফেলে। জোড়াসাঁকোর জানলার ফাঁক দিয়ে এই চকিত মাধবীর আবির্ভাব যেন প্রমাণ করে দেয় কবির চিত্ততলে চির ফাগুনের ধ্যানাসন ছিল কত প্রগাঢ়।

গানের জন্য রবীন্দ্রনাথের তেমন পূর্বপ্রস্তুতি সম্ভবত লাগল না। শৈলজারঞ্জনের স্মৃতিকথা পড়লে জানা যায় কত অছিলায় বা উপরোধে তাঁকে দিয়ে শেষ জীবনেও গান তৈরি করে নিয়েছেন তিনি। মাঝে মাঝে বিরক্ত হতেন, অজুহাত তুলতেন বার্ধক্য আর সময়াভাবের, কিন্তু পরে তিনি গান লিখেও দিতেন। সকালবেলার দেওয়া গানের সুর বা তাল তালিমের সময়ে গানের দলের ছেলে-মেয়েদের ভালো লাগেনি শুনে অভিমান করেছেন, তারপরে নিজেই বদলে দিয়েছেন গানের চাল বা সুর। প্রতিভা সম্পর্কে বলা হয় বিচিত্র সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা। সেই প্রতিভা তাঁর মধ্যে কত যে নিত্যনতুন বাঁক খুঁজে নিত তার সব বিবরণ আশ্রমের সকলের স্মৃতিকথায় ধরা পড়েনি। অনেকে তাঁর গানের ভুবনে বাস করে, গানের ঝরনাধারায় নিত্য স্নান করেও বুঝিতে পারেননি রবীন্দ্রসংগীতের অমল মহিমা। আসলে যা যত সহজপ্রাপ্য তা ততই অনুল্লেখ্য থেকে যায়। নইলে এখন ভাবলে অবাক মানতে হয় যে, চাঁদনি রাতে ছাত্রেরা দল বেঁধে গুরুদেবের নতুন রচনা 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গাইতে গাইতে চলেছে আর তাই শুনে স্বয়ং গুরুদেব দেহলিবাড়ির উপর থেকে মুক্তকণ্ঠে নিজর গলা যোগ করে গেয়ে উঠলেন। 'সমস্ত আশ্রমে সে-সুর ছড়িয়ে পড়ল গম গম করে' মনে করতে পারেন নন্দলাল পত্নী সুধীরা বসু। মনে করতে পারতেন এবং বলেওছিলেন সুশীলভঞ্জ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের একটা-দুটো গান রচনার ইতিহাস। বিশ্বভারতীর গানের দলে সেতার বাজাতেন সুশীল ভঞ্জচৌধুরী। মৃত্যুর দু'বছর আগে সুশীলের সেতারে বাঁধা 'দা, দারা'র গৎ শুনে সেই ছন্দে বেঁধে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ দুটি গান—'এসো শ্যামল সুন্দর' আর 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো' ভাবা

যায়? আটাত্তর বছর বয়সী প্রবৃদ্ধ সংগীতকারের সৃষ্টি প্রতিভার বিস্ময়কর অভিজ্ঞান এই ভাবনাকে মাতাল করা হাওয়ার স্পর্শ।

রবীন্দ্রনাথের গানের গল্প যে কত রকমের তা জানলে তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার অন্দরের কিছু কিছু জানালা খুলে যায়! অনুকূল পরিবেশ থেকে যেমন তিনি গান বানিয়েছেন, বিপর্যয়ের মধ্যেও গান লিখেছেন। একবার প্রবল গ্রীষ্মে রামগড় থেকে যাচ্ছিলেন পালকি চেপে। অতবড়ো দীর্ঘ শরীরখানা পাল্কির মধ্যে ন্যুব্জ করে বসতে হয়েছে—বাইরে তীব্র লু বইছে। শরীরের অত কষ্ট অথচ পথও সুদীর্ঘ। কী যে, করেন। পকেট থেকে ছোটো একখানা নোটবই বার করে একের পর এক গান লিখে গেলেন। অথচ একেক সময় নিজের কণ্ঠ নিয়ে খুবই বিড়ম্বনায় পড়তেন। প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে গান গাওয়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—তবে মাঝে মাঝে ভাষণ দিতেন বা আবৃত্তি করতেন। শান্তিনিকেতনে অবশ্য নতুন গান বানিয়ে মাঝে মাঝে গেয়ে শোনাতেন ঘনিষ্ঠ আশ্রমিকদের। তবে নিজের গান যাতে সঠিক দরদ দিয়ে রস দিয়ে সবাই গায় সে ব্যাপারে উৎকণ্ঠা ছিল। গান রচনার সঙ্গে সঙ্গে কাউকে দিয়ে তা তৎক্ষণাৎ আয়ত্ত করিয়ে দিয়ে পরে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তার স্বরলিপি করিয়ে নিতে তাঁর ভুল হত না। যতদিন দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে থাকতেন ততদিন গুরুদেব ছিলেন স্বরলিপি ও তার সংরক্ষণ বিষয়ে নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে তাঁকে যখন গানে পেত—তখন আর রক্ষা নেই—দিনুকে তা অর্পণ না করা পর্যন্ত তাঁর সে কী উৎকণ্ঠা! অমল হোমের স্মৃতিচর্চা থেকে খবর পাচ্ছি এমন এক টাটকা গান রচনার। লিখেছেন—

> গ্রীষ্মের শান্তিনিকেতনে সারাটা দিন দিনেন্দ্রনাথের 'বেণুকুঞ্জে' গানে-গল্পে আড্ডা জমিয়েছি কালিদাস নাগ আর আমি। বৈকালিক চা-পর্ব সবে শেষ হয়েছে, এমন সময়ে ঘোর কাল বৈশাখী মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ।...দিকদিগন্ত ধুলোয় ঢেকে ছুটে এল ঝড়। আমরা দেখছি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দিন্‌দা চেঁচিয়ে উঠলেন—'ঐ দ্যাখো রবিদা আসছেন'। দেখি, সেই ঝড়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছুটে আসছেন—তাঁর বেশবাস, তাঁর শ্মশ্রুকেশ উড়ছে, জোব্বাটাকে চেপে ধরেছেন বাঁ হাতে, আর ডান হাতে চেপে ধরেছেন চোখের চশমাটা।... আরেকটু এগিয়ে আসতেই শুনতে পেলাম গলা ছেড়ে গাইছেন—মেঘমন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ উঠছে গর্জে—
>
> যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি
>
> বারান্দাতে উঠেই বললেন—'দিনু এই নে'...ঘরে এসে বসে পড়লেন দিনেন্দ্রনাথের ফরাসে।

বলাবাহুল্য যে এরপরে দিনুর কণ্ঠে সদ্য তৈরি গানটি চিরকালের জন্য জমা করে রবীন্দ্রনাথ স্বস্তি পান এবং অচিরে দুজনে মিলে গানে গানে ভরিয়ে তোলেন বর্ষণমুখর সেই সন্ধ্যা।

তবে তালাশ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে অমন যে গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠ, তাতেও মাঝে মাঝে ঘটে যেত অন্তর্ঘাত। তাঁর একষট্টি বছর বয়সে সেবার কলকাতায় আয়োজন হয়েছিল বিশ্বভারতীর প্রযোজনায় 'বর্ষামঙ্গল'। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন অনেক নতুন গান। তখন বয়সের ভারে আর প্রকাশ্যে মঞ্চে গান করতে পারেন না, কিন্তু আবৃত্তি বা বাচনের সরসতায় অনুষ্ঠানে নতুন প্রাণ আনতেন। আগে থেকেই শিল্পীদল পৌঁছে গেছেন কলকাতায়—জোরকদমে মহড়া চলছে—জোড়াসাঁকোর বাড়ি বহুদিন পরে খুব সরগরম। কিন্তু হঠাৎ ঠান্ডা লেগে খোদ উৎসবপতির গলা গেল বসে। এদিকে অনুষ্ঠানে তাঁর সদল উপস্থিতি আর আবৃত্তি শুনবেন বলে সারা কলকাতা উদ্‌গ্রীব—ততদিনে তিনি তো জীবন্ত কিংবদন্তি। নিজে নিজেই তাই উৎকণ্ঠায় নিত্য-নিরন্তর কত কী ওষুধ-বিষুধ পাঁচন খাচ্ছেন, উদ্‌বেগে তা

খাওয়াচ্ছেন গানের দলকেও যাতে তাদের কণ্ঠ অক্ষত থাকে। কিছুতেই কিছু তবু হল না। কিন্তু ঘটে গেল একটা আশ্চর্য কাণ্ড। নিজের দশা নিয়ে হঠাৎ বানিয়ে ফেললেন চকমপ্রদ সেই গান 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে'।

গানটি এখন শুনলে ভেবে পাওয়া অসম্ভব যে কী একটা আশ্চর্য গল্প এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নিজের কণ্ঠ বিশ্বাসঘাতকতা করল অথচ তার জন্য কোনো খেদ বা ক্ষোভ না জানিয়ে বেঁধে ফেললেন এক নতুন গান এবং তা সহশিল্পীদের শিখিয়েও দিলেন। স্রষ্টার মনের প্রশান্তি এতটাই। রবীন্দ্রনাথের গান রচনার সরেজমিন দ্রষ্টাদের সাক্ষ্য থেকে আরও অনেক বিচিত্র তথ্য পাওয়া গেছে। স্রষ্টার নিজের কথা যদি মানি তবে বলতে হয় নিরালায় এমনকি স্নানের ঘরে তাঁর গান তৈরির আলাদা মেজাজ ও সাবলীলতা আসত। নিজেই লিখেছেন কোনো একটি গানের প্রসঙ্গে—

> এ গানটা আমি নাবার ঘরে অনেকদিন ধরে একটু একটু করে সুরের সঙ্গে তৈরী করেছিলুম। নাবার ঘরে গান তৈরি করার ভারি কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো দাবি থাকে না; মাথায় একটিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুনগুন করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না—সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শক সম্ভাবনা মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়—নিছক ক্ষিপ্তভাব।

আপাতশালীন সকলের আরাধ্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এমন আত্মকথন যেমন অকপট তেমনিই সরস। এর মধ্যে তাঁর মানবমূর্তি বড়ো হয়ে ওঠে। নাবার ঘরে গান বানাবার এই স্বীকারোক্তি আছে ছিন্নপত্রের চিঠিতে। কিন্তু বেশ পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসিক পর্বেও তাঁর স্নানঘরে গান রচনার বৃত্তান্ত পাওয়া গেছে লিওনার্ড এলমহার্স্টের জবানিতে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন—'আমি তাঁর কণ্ঠে স্নান ঘরে গুনগুনানি শুনছিলাম, হঠাৎ হেঁকে বনমালিকে বললেন—যাও শিগ্গিরি দিনুবাবুকে এখানে ডাকো আর তাকে বল স্নানঘরের জানালার নিচে দাঁড়িয়ে নতুন গানটা কথা ও সুর সমেত টাটকা-টাটকা শিখে নিতে।'

কিন্তু জাগতিক নিয়মেই বয়সের ভারে ক্রমশ রবিকর ম্লান হয়ে আসতে থাকে। কথায় কথায় যে-কোনো উপলক্ষে সুন্দর ও সুষমাময় বাণীমণ্ডিত গান রচনার তৎপরতা রবীন্দ্রনাথের কমে আসে। যৌবনের দিনে এমনকি সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কথা ও সুর গলাগলি করে সাবলীলভাবে যেমন বেরিয়ে আসত গানের পর গান, তা ক্লান্ত অবসিত হয়ে গেল। যেন তাঁর গানের ভাষাতেই বলা চলে—'ঘাটে বসে আছি আছি আন্‌মনা যেতেছে বহিয়া সুসময়'। একমাত্র শান্তিনিকেতনের ঋতুর সঙ্গে মিলিয়ে নানা উৎসব তাঁকে মাঝে মাঝে রাঙিয়ে দিয়ে যেত। দত্তাপহারক দেবতা তাঁর কণ্ঠ থেকে সত্যিই গান ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যে গান গেয়েছিলেম এই অমল স্মৃতির মহিমা ও গর্বটুকু মনে রাখতে বলেছিলেন আগে। তোমায় গান শোনাব বলে কেউ আর তাঁকে জাগিয়ে রাখতে পারছিল না। শুধু তাঁর অন্ত্যবয়সের সন্দীপনী ছিল শান্তিনিকেতনের নাচগানের দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ওই একটা ব্যাপারে উৎসবরাজ ছিলেন ক্লান্তিহীন। শান্তিদেব ঘোষের সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে নাচের তালে গান যথার্থভাবে বাঁধবার জন্য তাঁর লিখিত নির্দেশ যেত, কী উৎকণ্ঠায় কাঁটা হয়ে থাকতেন নাচ-গানের ছেলেমেয়েদের মহড়ার শৈথিল্য ঘটলে। লিখেছেন শান্তিদেব—'এমনও দেখেছি, যখন তাঁর শরীর সুস্থ নেই, রাতে যখন শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরা নিদ্রায় মগ্ন, তখন আমার ডাক পড়েছে। তার কারণ হল, তাঁর চোখে ঘুম নেই পরের দিনের নৃত্যাভিনয়ের নতুন অংশটা তৈরী না হলে অভিনয়ের কাজে বাধা পড়বে, সেই কথা ভেবে।'

এ তো রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আরেকরকম গল্প। শরীর ক্লান্ত, রজনী নিদ্রাহারা কিন্তু মন সজীব, উৎকণ্ঠ। ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি ঘটেছে এসব ঘটনা, তাঁর বয়স তখন সাতাত্তর। তখন আর একটা দুটো গান লেখা বা কোনো উপলক্ষে একটানা দশ বারোখানা গান রচনা সম্ভব নয়—এ সময়ে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টি নাচ-গান অভিনয়-মঞ্চসাজসজ্জা ঘিরে। নাচের প্রয়োজনে তাল বদলে দেবার সুপারিশ করছেন—'প্রথম নাচটা তেওরা তালে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার জন্যে তৈরি হতে পারবে কি?' স্রষ্টা তখন অসহায়, পরমুখাপেক্ষী—বারেবারে পরামর্শ করছেন, নির্দেশ পাঠাচ্ছেন প্রতিমা দেবীকে। শান্তিদেবকে শঙ্কিত হয়ে হাত-চিঠি পাঠাচ্ছেন—'এখনো রিহার্সাল আরম্ভ হল না। সময় সংকীর্ণ। প্রথম থেকেই কি আমার সুমুখে তালিম দেওয়া দরকার। বোধহয় তাহলে বিলম্বের আশঙ্কা দূর হবে'।

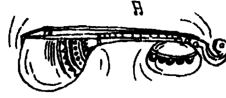
রবীন্দ্রনাথের গানের গল্পের শেষ হয়ে আসছে এবার। ভাঙা গলায় শ্রান্ত সুরে মাঝে মাঝেই যে গানটা গাইতে ভালোবাসতেন সেটা—'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ আরও কী তোমার চাই?' তাঁর মধ্যে গানের মানুষটাকেও চাঙ্গা করবার জন্য জাগাবার জন্য কেবলই প্রিয়জনরা শোনাতেন গ্রামোফোন রেকর্ড। একদিন গান শুনতে শুনতে কবি হতাশ হয়ে বললেন, 'অর্জুন আর তার গাণ্ডিব তুলতে পারছে না।'

সেই অর্জুন তবু অব্যর্থ ধানুকীর মতো শেষকালে জেগে উঠলেন তাঁর জীবনের শেষ নববর্ষের আগে। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, বয়স আশি। আসন্ন নববর্ষের উৎসবের প্রস্তুতি চলছে সারা আশ্রমের নাচগানের মহড়া, সেই সঙ্গেই হবে আশ্রমনায়কের জন্মদিন পালন। গুরুদেবের মন চিন্তাক্লিষ্ট, দেহ বয়সের ভারে শ্রান্ত। সেই সময় অমিয় চক্রবর্তী এলেন। তাঁর কাছে মুখে মুখে রবীন্দ্রনাথ বলে গেলেন নববর্ষের সম্ভাব্য অভিভাষণের রূপরেখা—পরে যা আমরা পাব 'সভ্যতার সংকট' নামে অসামান্য গদ্যে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানালেন, আর সময় বাকি নেই, তাই তাঁর অন্তিম বক্তব্য এবারে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবেন তাঁর শেষ ভাষণে। পরের দিন শান্তিদেব তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'নববর্ষের প্রভাতে বৈতালিকের জন্য একটি নতুন গান রচনা করতে কি আপনার কষ্ট হবে?' শুনেই আপত্তি করলেন। তারপরে বললেন, 'সৌম্য আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটি কবিতা লিখতে। সে বলে আমি যন্ত্রের জয়গান গেয়েছি, মানবের জয়গান করিনি। তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।' এখানে সৌম্য বলতে কবি বলেছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা।

কবিতাটির ছিল দুটি বয়ান এবং কিছুটা দীর্ঘ। শান্তিদেব জানিয়েছেন কবিতা দুটি পেয়ে তাঁর মনে হল এত দীর্ঘ রচনার সুর সংযোগ করে গানের রূপ দিতে কবির কষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত তাই ঘষে-মেজে 'ওই মহামানব আসে' গানটি এখন যে রূপে আমরা পাই তা দাঁড়াল। তাঁর ভাষায়—'সুর দেবার একটু চেষ্টা করে সেদিন আর পারলেন না, বললেন, 'কালকে হবে।' পরের দিন সেই কবিতাটি সংক্ষেপে করতে করতে শেষ পর্যন্ত বর্তমানে 'ওই মহামানব আসে' গানটি যে আকারে আছে, সেই আকারে তাকে পেলাম।'

'ওই মহামানব আসে' বলতে গেলে তাঁর শেষ আশাবাদী রচনা যার বিষয়গত মানবসম্পৃক্তি মর্ত্যপ্রেমী গীতিকারের শেষ ঘোষণা। 'সভ্যতার সংকট', ভাষণে তাঁর শেষ উচ্চারণ ছিল—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। এই বাচনের সঙ্গে 'ওই মহামানব আসে' গানটি মিলিয়ে শুনলে রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের গান রচনার সুদীর্ঘ কাহিনি শেষ হবে।

এর পরেও তিনমাস বেঁচে ছিলেন তিনি—আর্ত, ব্যাধিপীড়িত হয়ে। তারপরে বাইশে শ্রাবণের এক মেঘচাপা দিনে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল করুণ রঙিন পথে অপরাজেয় মৃত্যুরথ। আমাদের সবচেয়ে সক্ষম গীতপুরুষ চলে গেলেন কিন্নরলোকে।



বাংলা গানের ভাষা

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালের *পূরবী* কাব্যে একটি কবিতা সংযোগ করেছেন, তার নাম 'পঁচিশে বৈশাখ', পঙ্‌ক্তি সংখ্যা আশি। ১৯৪১ সালে তাঁর শেষ জন্মদিনে ওই কবিতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দশটি পঙ্‌ক্তি বেছে নিয়ে একটি গান তৈরি করেন : 'হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'। তাঁর চৌষট্টি বছর বয়সে লেখা কবিতার চেয়ে আশি বছর বয়সের নির্মাণ করা গানটি অনেক জনপ্রিয় হয়েছে। তার কারণ কী সে প্রসঙ্গ এখনকার আলোচ্য নয়। আমরা শুধু নিরিখ করে দেখতে পাই কবিতা থেকে গানে রচনাটিকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাল্‌টে নিয়েছেন কিছু শব্দ। যেমন—

কবিতা

তোমার প্রকাশ হোক
কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন।

গান

তোমার প্রকাশ হোক
কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন।

এবং

কবিতা

ব্যক্ত হোক
তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।

গান

ব্যক্ত হোক
তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।

দেখা যাচ্ছে কবিতার অন্তর্গত 'কুজ্ঝটিকা' আর 'অনন্তের অক্লান্ত' শব্দদুটি বদলে গেছে। তার জায়গায় এসেছে 'কুহেলিকা' আর 'অসীমের চিরবিস্ময়'। এর কারণ কী? কবিতার ওই ভারী শব্দগুচ্ছ বর্জিত হল কি গদ্যাত্মক বলে? 'অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়' সুরপ্রয়োগের দিক থেকে অস্বস্তিকর? এ ধরনের প্রশ্নের কোনো চট্‌জলদি জবাব নেই। স্রষ্টার জীবিতকালে এমনতর প্রশ্ন করলে হয়তো জবাব মিলত। কিন্তু লক্ষ করেছি রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর সুরপ্রয়োগের কৌশল বা গীতবাণীর নিজস্বতা বিষয়ে তাঁর চারপাশের সংগীতজ্ঞ মানুষরা কখনো কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেননি। কিন্তু এখন, আমরা যখন কবিতার ভাষা আর গানের ভাষা নিয়ে ভাবতে চাই, তখন রবীন্দ্রসংগীত হয়ে ওঠে নানা অর্থে আকরের মতো। এসব প্রসঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে একটা দুটো ভাষ্য লিখে গেছেন খুব সাঁটে— তাকে বিস্তারিত করেননি ব্যাপক বিশ্লেষণে। কিন্তু তাঁর গান রচনার পাঠান্তর অনুধাবন করলে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধরা যাক, *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি* বিখ্যাত এক গানের আস্থায়ী ছিল 'আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা চমকত দামিনী রে' প্রথম পাঠে। দ্বিতীয় সংশোধিত পাঠে পঙ্‌ক্তিটি হয়েছে : 'শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা নিশীথ যামিনী রে'। সুর কাঠামোয় কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু 'আঁধার রজনী' যখন 'শাঙনগগনে' হয়ে যায় তখন অনুষঙ্গই বদলে যায়, বেজে ওঠে অনেক গীতল ধ্বনির দ্যোতনা। 'চমকত দামিনী' আর 'নিশীথ যামিনী'-র অদলবদল তো চমকপ্রদ।

কবিতায় শব্দের অদলবদল কবিরা করেই থাকেন। কিন্তু গানের 'বাণী' যাকে বলে, তার রচনারীতির কোনো নির্দিষ্টতা আছে এমন শোনা যায় না। এর দুটো তিনটে পদ্ধতি সাধারণভাবে লক্ষ করা যায়। কেউ গানের বাণী আগে লিখে পরে তাতে সুর বসান, কেউ সুরের গড়নটা আগে বানিয়ে পরে তাতে বাণী বয়ন করেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুইধরনেরই পদ্ধতি দেখা গেছে, কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ গানে যেটা হয়েছে তা স্রষ্টার ভাষায় বলা যায় 'কথা ও সুর গলাগলি করে এসেছে'। তবে তিনি একাধারে কবি ও গীতিকার বলে তাঁর গান রচনার ক্ষেত্রে পাঠান্তরে বহু রকমের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ মেলে। একটি বিখ্যাত গানের পাণ্ডুলিপিতে দেখছি গানটি আগাগোড়া একটানা লিখে গেছেন, কোনো কাটাকুটি নেই, সংযোজন নেই। গানটি : 'সুরের মধ্যে দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি'। সমগ্র পাণ্ডুলিপিতে কেবল একবারই সংশোধন ঘটেছে — 'সুরের মধ্যে' পাল্‌টে লিখেছেন 'গানের ভিতর' শব্দ দুটি। কী অত্যাশ্চর্য সংশোধন! গানের ভিতর দিয়ে এই ভুবনখানি দেখার যে-পূর্ণতা ও অভিনবত্ব তা কতটাই খেলো আর সাধারণ লাগে 'সুরের মধ্যে' শব্দ প্রয়োগে। সুর প্রয়োগের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নেও 'সুরের মধ্যে' শব্দবিন্যাস বড়ো অস্বস্তিকর, বিশেষ করে ভাবা দরকার যে ওইখান থেকে গানের সূচনা। এখন বোঝা মুশকিল যে কবি সংশোধনটি কখন করলেন। সুর বসাতে গিয়েই কি শব্দগুচ্ছ খটমট লেগেছিল? তবে কি সুরের চলনের নিজস্ব ধর্মে শব্দের উপলখণ্ড বাধা সৃষ্টি করে? গানের সুরের কারণে কি গানের নিজস্ব ভাষা বিন্যাস বলে কিছু আছে? এবারও রবীন্দ্রসংগীত থেকে ইঙ্গিত পেতে পারি।

কবিতা	গান
উদাস হাওয়া পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে, কুড়িয়ে নিয়ে এনেছি তাই লহো করুণ করে। যখন যাব চলে ফুটবে তোমার কোলে, আমায় স্মরণ করে।	এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে ; আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি— লহো করুণ করে। যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে যেন আমায় স্মরণ করে।

সানাই কাব্যের অন্তর্গত এই কবিতা কবির উপান্ত বয়সের রচনা। এখানে অবশ্য গানটি আগে লেখা এবং কবিতাটি পরে। কিন্তু একটু লক্ষ করলে বোঝা যায় অনেকগুলি স্বাতন্ত্র্য। গানটি ছন্দের দিক দিয়ে ঢিলেঢালা, বাড়তি শব্দের সংযোগে এলানো, সেটি সুরের বিন্যাসের কারণে। উদাস শব্দটি উদাসী হয়ে আছে গানে, কারণ উদাস্ শব্দের হসন্ত উচ্চারণে টান দেওয়া অসম্ভব। গানকে কবিতার সাজ পরাতে গিয়ে ছন্দকে করতে হয়েছে, কবির ভাষায় 'অতি নিরূপিত', অনেক আঁটোসাঁটো। গানের বাড়তি আবেগের বাণী (যেমন 'লহো লহো' কিংবা 'মধুর বেদন ভরে') কবিতায় বর্জিত হয়, না হয় সংক্ষেপিত।

পরের উদাহরণের আগে এখানে আমরা শুনে নিতে পারি রোনাল্ড পিককের ধারণার কথা। তাঁর মতে, *'Some of means of poetry are very similar to those of music. They both use rhythm and acoustic features, which include the sounds produced by the inflexions of voice and the various vocal devices of verse such as assonance, rhythm, and the play of vowels. This gives a simple elementary overlap with music. The border line of poetry and music is seen where reading a lyric seems to be on the point of becoming a song ; or in recitative, where the word-meaning predominates over the melody. Thus though normally a poem read and song sung are two different phenomena, between them they have a common element.'*

রোনাল্ড পিককের এই মন্তব্য অনুধাবন করলে বোঝা যায়, যে, কবিতা গানের কাছাকাছি তাতে থাকে স্বরের (এমনকি স্বরবর্ণের) বিশেষ ধ্বনিময় চেহারা, ছন্দের স্বতঃসিদ্ধ দোলা ও অন্তর্মিলের লাবণ্য— গানের বাণীতে এগুলি থাকলে ভালো হয়। দুটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া।

এবং,

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর
হে গম্ভীর হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিতকায় চঞ্চল অন্তর
ঝংকৃত তব ঝিল্লির মঞ্জীর।

প্রথমটি কবিতা দ্বিতীয়টি গান। শব্দবিন্যাসে যুক্তব্যঞ্জনের খেলা দেখবার মতো। দুটি রচনাই আবৃত্তিযোগ্য। কিন্তু দ্বিতীয়টি বিশেষভাবে সুর সংযোজনের জন্য তৈরি কিংবা হয়তো সুর তাল-লয়ের হাত ধরে বাণীর এমন লাবণ্য। এ-ধরনের গানের ব্যাপারে স্রষ্টার বক্তব্য থাকলে ভালো হয়। একটি ভাষ্য এইরকম :

আমি এক কৌশল করেছি— কবিতার কাছ-ঘেঁষা সুর লাগিয়ে দিয়েছি। লোকের মনে ধাঁধা লাগে ; কেউ বলে সুর ভালো, কেউ বলে কথা ভালো। সুরের সঙ্গে কথা, কবি কিনা!

সমস্যা এই যে, সৃষ্টি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষ্য সবসময় নির্ভরযোগ্য নয়— একরকমও নয়। নানা সময় তাঁর মত বদলে গেছে। তাঁর রচনাই অনেক সময় তাঁর বক্তব্যের বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। সেই রকম এক উদাহরণ এবারে আনা যেতে পারে সামনে। *মানসী* কাব্যের একটি মিতায়তন গাঢ়বদ্ধ সনেট হল—

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে

হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি—
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি—
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদ ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্ত রাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১৫ অগ্রহায়ণ কবিতাটি রচিত, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৬। কবে এই রচনা গানের আকারে সুর দিলেন তিনি সে প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে আমাদের বরং বিস্ময় জাগে এমন একটি সনেটের মধ্যে তিনি গানের সম্ভাবনা দেখলেন কীভাবে? 'তবু মনে রেখো' কথা কটির বারে বারে ফিরে আসা কি তাঁকে গানের ধুয়োর প্রসঙ্গ ইঙ্গিত করেছিল? সে যাই হোক, সনেট ভেঙে গানের চেহারা কেমন দাঁড়িয়েছে দেখা যাক।

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো।।
যদি জল আসে আঁখিপাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদপ্রাতে—
তবু মনে রেখো।।
যদি পড়িয়া মনে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে
তবু মনে রেখো।।

গানটি শুনলে বোঝা যায় সনেট তার ঘন বুনুনি ছেড়ে পরে নিয়েছে মুক্তছন্দের ছাঁদ, গানের মধ্যে নেই তালের শাসন অথচ এসে গেছে টপ্পার অন্তর্মর্য় দ্যোতনা। শব্দের কয়েকটি অনবদ্য নতুন মিড় মোচড়ও কি চোখে পড়ছে না? 'ছায়ার মতন আছি না আছি' এই চিত্রকল্প এসেছে। 'বসন্ত-রাতে থেমে যায় খেলা' রূপান্তরিত হয়েছে 'একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে'র নব অনুষঙ্গে। মধু মানেও তো বসন্ত কিন্তু মধুরাতের ইঙ্গিত যে অনেক প্রগাঢ়। 'আঁখিপ্রান্ত'-র 'অশ্রুধার' পাল্‌টে হয়েছে 'ছলোছলো জল'— সুরের অনুরোধেই নিশ্চয়। 'দূরস্মৃত', 'শ্রান্তআঁখি' বর্গের যুক্তাক্ষরশাসিত শব্দগুলি ভেঙে কোমল স্বরের অযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আনা হয়েছে টপ্পার দানা ভরে দিতে।

এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি জেমস মেইনওয়েরিং-এর মন্তব্য। তাঁর সুন্দর বিশ্লেষণে বলার কথা হল,

Song would seem to be a natural form of self-expression, for it is universal, existing amongst even the most primitive people.Children untrained in musicianship, often improvise quite spontaneously their own tune to known fragments of verse and to non-rhythmic phrases.The significance of this is that the knowledge and skills implied in musical craftsmanship are not necessary for the creation of song ; but they are necessary for the writing of the song and for its polished perfection as a 'work of art'. It is only after the implied knowledge, skills, and judgement have become 'second nature' through long experience that inspired improvisation approches the finished perfection of a composition.

এর সারকথা, কবিতায় যাহোক-তাহোক সুর দেওয়া আর তাকে গানের আঙ্গিকে শিল্পসম্মতরূপে (work of art) সৃষ্টি করার কাজটা কঠিন। এমন সিদ্ধিতে লাগে স্রষ্টার বহুদিনের সাধনা, দক্ষতা, শিল্পবুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা। এতসব ব্যাপারের সুষ্ঠু সমন্বয় হলে তবে শেষ পর্যন্ত গানকে বলা চলে 'কম্পোজিশন'। পরবর্তী বিশ্লেষণে মেনইওয়েরিং বলেন,

Song-writing, therefore, is not a mechanical process. In common with all forms of art it combines imagination and craftsmanship, it involves something that is spontaneous and something that is deliberate and intellectual.

প্রকৃত শিল্পোত্তীর্ণ গানে থাকে কল্পনা আর কারুকৃতির অন্তর্বয়ন। তার অন্তস্তলে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা আর মননের দীপ্তি। রবীন্দ্রনাথের গান এইরকম শিল্পরূপের সর্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক নিদর্শন। সেইজন্যই সব স্তরের গীতরসিক ওই গানের স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন হিসাবে লক্ষ করেছেন বাণী ও সুরের সফল সমন্বয় এবং সুষমা। তার মানে গানের অন্তঃশরীরে শব্দ ও সুরের মাত্রা একেবারে সঠিক— কেউ কাউকে ছাপিয়ে যায় না। সাধারণভাবে গানে এ ধরনের বিপাক আসতে পারে— হয় শব্দের অতিকৃতি অথবা সুরের কারদানি।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে যাঁরা গান লিখতেন তাঁদের গানে শব্দঘটিত নানা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা যায়। এ সম্পর্কে খুব বেশি বিচার-বিশ্লেষণ করবার দরকার নেই, কেবল দুয়েকটি নমুনা উদ্ধার করব। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের গানে আছে :

আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্যগগনে
ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি নিভৃতে নয়ন-নীরে
অভিসিক্ত করি নৈশ উপাধান।।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে সূক্ষ্ম কল্পনার চেয়ে স্বভাব বর্ণনার ঝোঁক বেশি থাকে। এখানেও তাই আছে। বিরহিনীর নিঃসঙ্গ দিনাবসানের বেদনা খুব স্বাভাবিক এবং রাতে একান্ত নিভৃতে অশ্রুপাতও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার ভাবুকতাহীন বস্তুগত বর্ণনার টানে উপাধান সিক্ত (এমনকি অভিসিক্ত) করার প্রসঙ্গ গানের রসাবেদনের পক্ষে মর্মান্তিক। গানের বাণী রচনার সতর্কতা একটু আলাদা সচেতনতা দাবি করে। সুরের চলমান নিজস্ব গতি এমনতর বাণীতে স্ফূর্তি পেতে পারে না।

রজনীকান্তের একটি 'গীতাংশ' এবারে দেখা যাক। যে-গীতিকার সহজ সরল মর্মস্পর্শী ভাষায় নিতান্ত আটপৌরে শব্দে কত বিখ্যাত জনচিত্তজয়ী গান (যেমন 'তুমি অরূপ স্বরূপ সগুণ নির্গুণ', বা ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়') লিখেছেন, তাঁর লেখনী এমনও লিখতে পারে যে,

এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই ;
এতে, ভালো জিনিস একটি নাই !
(এটা তো) অস্থি, চর্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,
মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধময় ক্লেদ।

মানুষ দেহে যে-বস্তু বা বর্জ্য পদার্থ থাকে সে তো সবাই জানে। কিন্তু তার সানুপুঙ্খ উল্লেখ কি গানের সিদ্ধির পথে সহায়ক? কান্তকবির আরেকটি গানের ভাষা ও শব্দ এবারে দেখা যাক।

জ্ঞান-মুকুট পরি', ন্যায়-দণ্ড করে ধরি'
বিচার-আসনে যবে বসিবে, হে বিশ্বপিত ;
আজনম পাপলিপ্ত, লয়ে এ তাপিত চিত,
দূরে রব দাঁড়াইয়া লজ্জিত কম্পিত ভীত।

এমন ঠাসবুনোট কাঠামো, এত ভারী সমাসবদ্ধ শব্দের গাম্ভীর্য, এত যতিচিহ্নবাহুল্য—একে কি গান বলব আমরা? এ তো বিশুদ্ধ গদ্যের মতো শ্লথগতি ও বক্তব্যবহুল। এতে স্বতোচ্ছল গতিময় সুরারোপ অসম্ভব।

গানের ভাষা আলোচনা করতে গিয়ে উপরের নমুনাগুলি উদ্ধার করলাম এই কথা বোঝাতে যে, বহুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত সংগীতকারের রচনাতেও অনেক সময় শব্দ রচনার শিশুতোষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সম্ভবত ভাবের টানে বা বক্তব্য প্রবণতার চাপে গানের শব্দ এভাবে গানের বিরোধী হয়ে ওঠে। তাঁরা হয়তো সেটি বুঝতে পারেন না।

গানের শব্দগত বিচার করতে গেলে সুরের আলোচনা বাদ দেওয়া চলে না। কেন-না সুরের অলক্ষ শরীরে শব্দের সজ্জা পরানো গানের একটা প্রক্রিয়া। অন্যভাবে বলতে গেলে, শব্দকে অভিপ্রেত পথে চলিষ্ণু করে সুর। তাই বহু সময় গানের শব্দকে কবিতার মতো অর্থবোধকতা বা ভাবসংগতির নিরিখে বিচার করলে শুধু যে ভুল হবে তাই নয়, কারোর কারোর কাছে গীতিকারের দুর্বলতা বলে মনে হবে। যেমন ধরা যাক দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি গানে দেখছি খুব ছেলেমানুষির মতো বাণীরচনা :

<u>যখন</u> <u>সঘন</u> <u>গগন</u> গরজে বরিষে করকাধারা
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন লুপ্ত চন্দ্রতারা।

এবং

<u>সধবা</u> <u>অথবা</u> <u>বিধবা</u> তোমার রহিবে উচ্চশির।

আসলে এমন আনুপ্রাসিক শব্দ বয়ন করা হয়েছে বিলিতি সুরের ওঠানামার চলনকে বজায় রাখতে। 'যখন সঘন গগন' আর 'সধবা অথবা বিধবা' আসলে তিনটি স্বরের পাশাপাশি ক্রমিক আরোহণের খেলা। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'ইংরাজি ও হিন্দুসংগীত' রচনায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন :

> ইংরাজি গানের স্বরগুলি সব সোজা সোজা। একটা স্বরের উপর একটার নির্ভর নাই। প্রতি স্বর স্পষ্ট, স্বতন্ত্র, স্বাধীন। বারোটি স্বরের যেন বিভিন্ন রাজ্য। সকলেই রাজা।...স্বরগুলি যেন হেলানো যষ্ঠির মতো। যেন মিলিত হইবে বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় শুদ্ধ একাগ্রভাগ দ্বারা সামান্যরূপে মিলিত হইয়াছে মাত্র।...ইংরাজিতে স্বরগুলি যেন 'সেকহ্যান্ড' করে মাত্র ;হিন্দু সংগীতে স্বরগুলি কোলাকুলি করে।

স্বরের স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে বাংলা গানে ব্যবহার দ্বিজেন্দ্রলালের বেশ কটি গানে (বিশেষত নাটকের গানে) দেখতে পাই। এটা ছিল তাঁর বিশেষ পরীক্ষা, যার জন্য তিনি সমকালে নিন্দিত হয়েছিলেন। স্বর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে গানের সুরের মুভ্‌মেন্ট এবং স্বর টপকানো তাঁর গানকে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ সুরের

মুভ্‌মেন্ট চলতে চলতে স্বর হঠাৎ অনেকটা টপকে খুব উঁচু পর্দা বা নিচু পর্দায় ওঠানামা করে। ব্যাপারটা বাংলা গানে বেশ নতুন। 'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির' এই উচ্চারণে 'শির' শব্দটি হঠাৎ একলাফে চলে যায় মুদারার গা থেকে তারার গা-তে। আসলে গানের ধরন বুঝতে যে সাংগীতিক দীক্ষা বা অভিজ্ঞতা লাগে তার উপর নির্ভর করে গীতিকারের বাণীরচনার মননশীলতা। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে এ-দুয়ের অভাব ঘটেনি। রজনীকান্ত-র ক্ষেত্রে এ-দুইয়ের সমূহ অভাব ঘটেছিল বলেই তাঁর গানের ধাঁচ অনেকটাই চল্‌তি রাগরাগিণীতে বাঁধা। তাঁর গানে বিশ্বাসের তীব্র আন্তরিকতা আমাদের যেমন স্পর্শ করে, সুরের একমুখী চলন তেমনই একঘেয়েমি আনে। গানে তাঁর সুরের নিরীক্ষা কম ছিল বলে (নাট্যসংগীতও লেখেননি কখনো) বাণীর চকিত ব্যঞ্জনা প্রায় নেই। তিনি অনায়াসে লেখেন :

১. অসীম রহস্যময়! হে অগম্য! হে নির্বেদ!
বিজ্ঞান পারেনি, প্রভু, করিতে সংশয়োচ্ছেদ।

২. অতল-উচ্চ-চল ঊর্মি মালশত-শুভ্র ফেনযুত রঙ্গ অধীর ;
ভীতি বিবর্ধন তাণ্ডব নর্তন ভীমরোলে করি শ্রবণ বধির।

এক সুনির্দিষ্ট সহজ তালে কোনো এক রাগকে আশ্রয় করে রজনীকান্ত গান তৈরি করতেন। রাগমিশ্রণ কিংবা তালফেরের সাহস বা নিরীক্ষা তাঁর গানে কোথাও নেই, সেইজন্য যথেচ্ছ বাণী রচনা আর সংস্কৃত তৎসম শব্দের অসম ব্যবহার তাঁর গানকে ভারাক্রান্ত করেছে। কান্তকবির গান স্পষ্ট ও কবিতাধর্মী, যাকে বলে articulate এবং বহু সময়ে গদ্যাত্মক। তবে কি গদ্যে সুরারোপ করা যায় না? রবীন্দ্রনাথ তো 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের এক গদ্যাংশে চমৎকার সুরযোজনা করেছিলেন। একবার লিখেছিলেন তিনি : 'কখনো-কখনো গদ্য রচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়।' ইচ্ছার রূপায়ণ ততটা ঘটেনি কিন্তু গানের ভাষাকে মুখের ভাষার গদ্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে দেখি :

১. কাজ নেই কাজ নেই মা
কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়
যাক্ ভেসে সব বন্যায়।

২. রৌদ্র হয়েছে অতি তীক্ষ্ণ
তোর আঙিনা হয়নি যে নিকানো।
তোলা হল না জল পাড়া হল না ফল
কখন ছাগল তুই চরাবি?
কখন উনুন তুই ধরাবি?

এমন চলিত ভাষার সহজ সংলাপের মতো গানের ভাষা তাঁর আগে কেউ লেখেননি, সেই সঙ্গে এমন ভাষার সঙ্গে সুরের সহজ চলনটুকু না মেশালে এমন ভাষাও নিষ্প্রাণ লাগতে পারে। স্রষ্টা তা জানতেন।

গানের ভাষা তথা শব্দ বুননে ঐতিহ্যের একটা দায় অনেকে ভুলতে পারেন না। বাংলা গানের ক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনার প্রাথমিক পর্বের পর ঐতিহ্যাগত বাণী রচনার আবশ্যিকতা মেনে নেননি। তিনি নিজের এক স্বতন্ত্র গীতভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন *গীতাঞ্জলি*-পর্বেরও আগে। কিন্তু সেই কাজটাই তেমন করে পারেননি দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুলপ্রসাদ। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানের সুরস্বাতন্ত্র্য সহজেই শনাক্ত করা যায় কিন্তু বিশেষভাবে দ্বিজেন্দ্রীয় কোনো বাণী বা শব্দবৈশিষ্ট্য আমরা পাই না, অতুলপ্রসাদের গানেও শ্রোতার একই অভিজ্ঞতা হয়। তার কারণ এই দুজনের কাছে সুরের ছকটা আগে

আসত, গানের বাণী তাকে অনুসরণ করত। এই কথা মনে রেখে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বিখ্যাত নিসর্গ সংগীতের শব্দসমাবেশ লক্ষ করা যাক :

আইল ঋতুরাজ সজনী জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী
বিপিনে কলতান মুরলী উঠিল মধুর বাজি।

বসন্ত নিসর্গের প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা একেবারে যথাযথ কৃত্রিম শব্দগুচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গানের 'বসন্তের মাতাল সমীরণ' কিংবা 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল/বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল'-র মতো মৌলিক গীতভাষা এখানে অকল্পনীয়। বর্ষা বর্ণনার আরেক দ্বিজেন্দ্রগীতি :

ঘন ঘোর মেঘ আই' ঘেরি গগন—
বহে শীকরোচ্ছ্বসিত সিক্ত পবন।

শুনেই বোঝা যায় এটা হিন্দি খেয়ালভাঙা গান। তার খাপে খাপে বাণীর বয়ন। অতুলপ্রসাদের 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে' গানে শব্দ বা বাণী প্রায় মূল্যহীন। এতটাই যে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছিলেন :

তাঁর কোনো কবিতাই স্বাবলম্বী নয়, মনে হয়। চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে এর মধ্যে তত্ত্ব নেই। কেবল তাই নয়। প্রশ্নটির সমাধানের ওপর — কিংবা তিনি এলে তাঁকে অভিনন্দন ও সমুচিত অভ্যর্থনার ওপর গানটির সার্থকতা নির্ভর করছে কি? সুরের জন্যই ওই গীতি কবিতাটি যে প্রতীক্ষা করছে, কোনো মহিলার জন্য নয়।

সুরের প্রাধান্যে গানের বিষয়, বাণী ও শব্দ যে এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল তার কারণ অতুলপ্রসাদ (এবং এমনকি দিলীপকুমার রায়ও) প্রধানত গীতিকার নন, সুরকার। তাঁর গানের মধ্যে সুরের একমুখিতা আর লচাও ঠুংরির লঘুচাল বেশি মন টানে। কথাটা বোঝার জন্য ধূর্জটিপ্রসাদের আরেক বিশ্লেষণ শোনা যাক।

ধীরাজের একখানি বিখ্যাত বসন্তের ধামার বাংলায় খুব প্রচলিত—ভ্রমরা ফুলি বনোয়ারি ইত্যাদি। এই গানের 'ফুল' কথাটি চামেলি বেলী চম্পা নয়। এর নাম নেই, গন্ধ নেই, এর রূপ নি সা ঋ সা নি ধা স্মা— কি ওই ধরনের একটা স্বরবিন্যাস। কিন্তু উচ্চারণের বেলা সেটা ফুলি— অন্য কিছু নয়, এবং হিন্দুস্থানি কিংবা বাংলা যেভাবেই উচ্চারণ করাই যাক না কেন শব্দটি শুনে ফুল ভিন্ন ফলের কথা মনেই হবে না। যে শব্দ যত পরিমাণে অর্থ কিংবা বস্তুকে অতিক্রম করবার শক্তি ধারণ করে সে শব্দ তত পরিমাণে গীতে সহায়ক, এবং সেই প্রকার শব্দবাহী, শব্দবিন্যস্ত কবিতাই ততটা পরিমাণে সুর রচনার উপযুক্ত বাহন।

কবিতার ক্ষেত্রে শব্দ সম্পর্কে যতটা যত্ন ও সচেতনতা লাগে গানের ক্ষেত্রে ততটা লাগে কিনা সেটা বিতর্কযোগ্য প্রসঙ্গ। তবে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর অভিজ্ঞ সংগীতবোধ থেকে একটি মূল্যবান উক্তি করেছেন। 'যে শব্দ যত পরিমাণে অর্থ কিংবা বস্তুকে অতিক্রম করবার শক্তি ধারণ করে সেই শব্দ তত পরিমাণে গীতে সহায়ক'— দ্যোতনাবহুল এমন মন্তব্য উদাহরণ সহযোগে আমরা বোঝাতে পারি রবীন্দ্রনাথের গানের সাহায্যে :

১. চিরসখা ছেড়ো না।
২. ঘাটে বসে আছি আনমনা
যেতেছে বহিয়া সুসময়।

প্রথম উদাহরণ সার্থক গানের সুষমাভরা। তেমন কোনো স্পষ্ট অর্থ নেই, বস্তুভার তো একেবারে নেই। চমৎকার বৈপরীত্যে ভরা এক অনবদ্য অনুভব এবং একটি মাত্র পঙ্ক্তিতে নিটোল, সম্পূর্ণ। এর পরেও যে গানটি এগিয়ে গেছে অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ মেনে তার কারণ স্রষ্টাকে গানের আঙ্গিক ধর্ম রক্ষা করতে হয়েছে। সেখানে একটি ভাবকে নানা অনুষঙ্গে বিস্তার করে মূল ভাবকেই সম্পূর্ণতা দিতে হয়। 'ঘাটে বসে

আছি' উচ্চারণও খুব গাঢ় ও সংহত। সুসময় বহে যাচ্ছে অথচ উদ্যোগ না নিয়ে এই যে আনমনে বসে থাকা— গানের স্বধর্মের পক্ষে এত বস্তুভারহীন অথচ ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি আর কী হতে পারে? গানের ভাষার এমন নিগূঢ় ব্যবহার, এতটা পূর্ণকান্তি, খুব একটা সহজপ্রাপ্য নয়। রবীন্দ্রনাথকে যে বিশ্বের একজন সিদ্ধ সংগীতকার বলা হয় তার মূলে তাঁর প্রগাঢ় চিন্তা ক্রিয়াশীল, যা মননময় এবং বিনোদনবিরোধী।

বিনোদনের প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ যেই উঠল অমনি মনে পড়ে গেল কাজী নজরুলের কথা। তাঁর আগে আধুনিক কালের গীতিকার যাঁরা, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ থেকে দিলীপকুমার রায় পর্যন্ত, তাঁদের কাউকেই রুটি বা রুজির জন্য গান লিখতে হয়নি। লিখেছেন আপন মর্জিতে, আপন আনন্দে, কোনো কোনো উপলক্ষে, অন্যের অনুরোধে, এমনকি নাটকের প্রয়োজনে। কিন্তু কখনই সেই গান রচনার পিছনে কোনো অর্থ উপার্জনের চিন্তা ছিল না। নিজের গানের প্রচার কে না চায়? তাঁরাও চাইতেন একটু দরদ দিয়ে, ভাব দিয়ে তাঁদের গান গাওয়া হোক রুচিমান বাঙালির ঘরে ঘরে। কিন্তু গাইবে কে? রেকর্ড সবে বেরোচ্ছে তখন, রেডিয়ো আর সবাক ছবি আসেনি। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত গড়পড়তা ভদ্র শিক্ষিত সমাজে গান জিনিসটা ছিল নিচুস্তরের বিনোদন সামগ্রী। স্বদেশি গান আর ব্রাহ্মসমাজে কিছু কিছু গানের চলন ছিল আর জমিদার বা সামন্ত সমাজে গান গাওয়ার জন্য রাখা হত খানদানি পশ্চিমি বা উত্তর ভারতীয় কালোয়াত, গানের চেয়ে তানের দিকে ছিল তাঁদের ঝোঁক। হিন্দুস্থানি গানের বাইরে কোনো গান থাকতে পারে এ তাঁরা মানতেন না। ভদ্রলোক শ্রেণি বাংলা গান গাইবেন সেকালে এমন ভাবনাটাই ছিল অকল্পনীয়। গান গাইতেন নট-নটী আর বাইজিরা। তাঁদের অনুষঙ্গে বাজনদাররাও ছিলেন সমাজে অচ্ছুৎ আর উপেক্ষিত। নাটকে গান গাইতেন অভিনেত্রীরা, যাঁদের প্রধানত আনা হত নিষিদ্ধপল্লি থেকে। নামকরা গায়িকা ছিলেন গহরজান। নাটকে আর রেকর্ডে প্রথমযুগে গাইতেন বিনোদিনী, কুমুদিনী, ভুবনেশ্বরী। এঁদের নামের আগে বসত 'মিস'। তারপরে এল 'দাসী'রা। যেমন বেদানা দাসী, পূর্ণকুমারী, জ্ঞানদাসুন্দরী, নরীসুন্দরীরা। তারপরে এলেন ইন্দুবালা, আঙুরবালা, নীহারবালা। চলচ্চিত্রে এলেন কাননবালা। এঁদের গানের বিষয় প্রধানত প্রণয় বা ছলনা—বড়জোর বিরহ। সেসব গান লিখতেন পেশাদার গীতিকার। রেকর্ডে গাওয়া গান নানা বর্গের শ্রোতাদের বিনোদনের জন্য বাজারে বিক্রি হত। তার মানে, বাংলা গান এবারে হল পণ্য। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগেই বিদেশি ও স্বদেশি নানা রেকর্ড কোম্পানি উন্নতমানে রেকর্ড প্রযুক্তি আয়ত্ত করে ফেলল এবং ক্রমেই তাদের বাজার বিস্তৃত হতে লাগল বঙ্গ ভাষাভাষীদের মধ্যে—ফলে বাংলা গানের চাহিদা খুব বেড়ে গেল। কিন্তু সংখ্যাগত বিপণনের উন্নতি মানে তো সাংগীতিক মানের উন্নতি নয়, কাজেই বাংলা গানের গভীরে এসে গেল বহুরকমের বিষয় বৈচিত্র্য এবং ব্যবসায়িক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গানের বাণীতে তথা শব্দ প্রয়োগে সেই কারণে এসে গেল নানা হাল্কা চাল, চটকদারি ভাব এবং ইঙ্গিতপূর্ণ চটুল অনুষঙ্গ। নজরুল তাঁর গানে নিয়ে এলেন গজল গানের দোলা এবং তার সঙ্গে মানানসই শব্দ এমনকি নতুন ঢংয়ের উচ্চারণ। যেমন :

এত জল্ ও কাজল্ চোখে
সহেলি আন্‌লো বলো কে?
ছলছল্ জ্বল্‌মোতির মালা

এমন হসন্তবহুল উচ্চারণ বাংলা গানে ছিল অজ্ঞাত। গজল ও ইসলামি গানের সুবাদে নজরুল বাংলা গানের বাণীতে নিয়ে এলেন আরবি পারসি শব্দের অজানা হাওয়া। সুরা, সাকি, পেয়ালা, গুল আর খুশবুর প্রসঙ্গে গানের গুলবাগিচা চঞ্চল হয়ে উঠল নতুন শব্দবন্ধের খেলায়। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখলেন একেবারে

নতুন ধারার গান নতুন ভাষায় :

বঁধু, চরণ ধরে বারণ করি টেনোনা আর চোখের টানে।
তোমার পিচকারিতে রং ঝারিতে কি গুণ আছে ননদ জানে।।

২

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমার রায় তাঁদের গানে যতরকম ভাব ও বিষয় এনেছিলেন তাকে ভাগ করা যায় প্রেম, প্রকৃতি, পূজা, স্বদেশ, রঙ্গব্যঙ্গ আর নাট্যগীতি পর্যায়ে। তাই বলে এঁদের সকলেই এতগুলো পর্যায়ের গান লেখেননি তবে সার্বিকভাবে সে কালের বাংলা গানের এ কটিই ছিল বিষয়বিভাজন। এর পরে যখন রেকর্ড, রেডিয়ো আর সবাক ছায়াছবির যুগ এসে গেল তখন গানের সংখ্যাগত চাহিদার বাড়বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে গেল নানারুচির শ্রোতা—শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম্য-শহুরে, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত। বেড়ে গেল গীতিকার, সুরকার, ও সহশিল্পীদের (যন্ত্রানুষঙ্গের সূত্রে) প্রয়োজন ও জোগান। দীক্ষিত ও অদীক্ষিত নানাবর্গের সংগীতশিল্পী এসে পড়লেন গানের জগতে, রুজি রোজগারের সন্ধানে। গানের বিষয়গত বৈচিত্র্য বেড়ে গেল নানা ধরনের শ্রোতার চাহিদায়। শ্যামাসংগীত, পল্লিগীতি, রাগপ্রধান গান, ভাবগীতি, ইসলামি গান, লোকসংগীত, ঝুমুর-ভাওয়াইয়া, কীর্তন ভাঙা গান এবং যাকে বলে বাগানবাড়ির প্রণয় সংগীত তাও। এত রকমের গানে যাঁরা সুর করতেন, যাঁরা লিখতেন এবং যাঁরা গাইতেন তাঁরা সবাই যে শুদ্ধসত্ত্ব স্বভাবের বা উচ্চ আদর্শের মানুষ ছিলেন তা মনে করবার কারণ নেই। অনেক প্রমোদপরায়ণ হালকা রুচির লোকজন, অনেক নারীবিলাসী, অনেক গণিকা নতুন ব্যবসা ও রোজগারের টানে এসেছিলেন গানের জগতে। তাঁদের নিয়েই দক্ষ কলাবিদ্ আর গানপাগল শিল্পীরা গড়ে তুলেছিলেন নতুন গানের ইমারত। নজরুলের গানের বিষয়ে, চালে, সুরে ও শব্দে এই সময়ের শিল্পী ও শ্রোতাদের রুচির ধরন গাঁথা আছে। যেমন :

হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে মাঠ থেকে এনে দে হাট থেকে
নইলে বাঁধব না বাঁধব না চুল।

এ কোন্ নতুন নারী আর কেনই বা তার এমন চাহিদা? বাদল দিনের প্রথম কদমফুল আর শ্রাবণের গান বিনিময়ের দিন এবারে তবে ফুরিয়ে এল। ঝুমুরের তালে বাঁধা এই গানে বাংলা গানের নতুন এক ভাষা উঁকি দিচ্ছে। কিংবা যখন সবাক ছবিতে শোনা গেল নজরুলের রচনায় :

'চোখ গেল' 'চোখ গেল' কেন ডাকিস্ রে
চোখ গেল পাখিরে—
তোর চোখে কারও চোখ পড়েছে নাকি রে?

শিষ্টতার সীমা ছাড়ায়নি কিন্তু বাচনের আড়ালে অন্য এক ভাষার ইশারা— অন্য এক শ্রোতাদের শ্রেণি গড়ে উঠছে বাংলা গানে। প্রেমিকের চোখের বর্ণনা দিতে গিয়ে নজরুল লিখলেন :

তুমি দুধারী তলোয়ার রেখেছ
জহর মাখি'।

এমন নারী আর তার বর্ণনার এমন ভাষা বাংলা গানে আগে শোনা যায়নি। এপারের মুখর কেকা আর ওপারের নীরব কুহুর ভাবময় কল্পনার শ্রোতার মনে নজরুল হিন্দোল আনলেন এই বলে,

সহসা কি গোল বাধালো পাপিয়া আর পিকে
গোলাপ ফুলের টুকটুকে রং চোখে লাগে ফিকে।
নাই বৃষ্টি বাদল ওলো দৃষ্টি কেন ঝাপসা হল?
অশ্রু-জলের ঝালর দোলে চোখের পাতার চিকে।

বাংলা গানে এমন বর্ণনার ভাষা একেবারে নতুন। নাই বৃষ্টি বাদল উচ্চারণের পর 'ওলো' শব্দটি কখনো কি শিষ্ট বাংলা গানে শুনেছি আমরা? আবার অন্য এক প্রসিদ্ধ নজরুল গীতির ভাষা হল :

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল্‌শাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল।
আজও তার ফুল্‌কলিদের ঘুম্‌ টুটেনি
তন্দ্রাতে বিভোল্‌।

হসন্ত চিহ্ন অনুযায়ী উচ্চারণ নির্দেশ করলাম্‌ এটা বোঝাতে যে, নজরুল বাংলা গানের গায়কিতে এমন এক চাল আনলেন যা গায়ক গায়িকাদের পক্ষে অভিনব এবং উত্তেজক। গানের বিষয় কতটাই অকিঞ্চিৎকর অথচ গজলের খুশ্‌খেয়াল এই লঘু চালের গানে খুব জমাটি। তাই শব্দচয়নের ছেলেমানুষি বা গীতভাষার সামান্যতা শ্রোতাদের কানে লাগে না। তাঁরা মস্ত্‌ হয়ে যান গানের সুরে ও রসে।

তাই বলে এমন কথা বলতে চাই না যে, সার্থক বাণীবয়নে রসসিদ্ধ গান নজরুল লেখেননি। লিখেছেন অবশ্যই এবং তেমন গানই তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। রাগরাগিণী সম্পর্কেও তাঁর ছিল গভীর দক্ষতা ও অধিকার। কিন্তু তাঁর পরবর্তী গীতিকাররা অনুকরণ করেছেন নজরুলের হাল্‌কা রুচির গান আর লঘু সুরের ধরনকে। সেটি বাংলা গানের পুষ্টি ও বিকাশে সহায়ক হয়নি। রেকর্ডে রেডিয়ো-য় সিনেমায় দু'তিন দশক ধরে নজরুল আর তাঁর অনুবর্তীদের দাপটে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বিচিত্র রুচির শ্রোতাদের বিচার ও বিবেচনাবোধ। গানের বিষয়ে তীব্র ভাবালুতা, বিরহ, ভ্রষ্ট প্রেম, ফুল-মালা-বাসর-প্রদীপ-কাজলচোখ, ভ্রমরা-কুহু, মদিরা-সাকি-নেশা, ঝরাফুল-বাসররাতি, স্মৃতি, সমাধি আর সাগরের ঢেউ, প্রতীক্ষমাণা নারী আর ছলনাপ্রবণ পুরুষ বাংলা গানের ভাষায় এই ধরনের শব্দানুষঙ্গ বহুদিন প্রবল ছিল।

আশ্চর্য যে এমন শ্লথ ভাষায় ও মেদুর ভাবনায় বাংলা গান যখন গণমাধ্যমের সবকটি সরণি জুড়ে দীপ্যমান ও জনাদরে পুলকিত, তখনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবিত ও বহুতর গান রচনায় নিত্য ক্রিয়াপর। তবু হীরেন বসু, শৈলেন রায়, অজয় ভট্টাচার্য, বাণীকুমার, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য ও প্রণব রায়রা রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও ভাষা খুব বেশি না নিয়ে নিয়েছিলেন নজরুলের ধারা। কেন? তার সবচেয়ে বড় কারণ সেসময় ব্যক্তি নজরুলের জনাদর এবং তাঁর গানের পণ্যমূল্য ছিল আকাশস্পর্শী। তাঁর মতো গান ওই সব লঘু বিষয় আর পল্‌কা প্রণয় প্রসঙ্গ অনেক সহজে লেখা যেত। সুরকাররাও তাতে অনায়াসে সুর দিতে পারতেন। শিল্পীরা তো কাজীদার সব নির্দেশেই এক পায়ে খাঁড়া। তা ছাড়া কাজী প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সকল কাজের কাজী। রেকর্ড কোম্পানির ট্রেনার, রেডিয়োর একচেটিয়া অধিনায়ক, সবাক ছায়াছবির সংগীত পরিচালক, অগ্নিবীণার বিদ্রোহী বাদক, এমনকি কারাবাসকারী প্রথম বাঙালি গানের মানুষ। ফলে তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা দুইই গৃহীত হল বিনা বিচারে। গানে তাঁর চট্‌জলদি জনপ্রিয় বিগ্রহ আর দিলদরিয়া দরদি ব্যক্তিত্বভাব সকলকে বেশ মোহিত করে দিল। তাঁর সমকালে গানে সুর দিতেন যাঁরা অর্থাৎ রাইচাঁদ বড়াল, হীরেন বসু, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত, শচীন দেববর্মন প্রভৃতি প্রধানত নিলেন নজরুলগীতির জনাদৃত ধরন। ত্রিশ ও চল্লিশ দশক পর্যন্ত নজরুলগীতির একচ্ছত্র চাহিদা ও জনপ্রিয়তার নানা কারণ আগেই বলেছি, তার সঙ্গে যোগ করতে হবে এই তথ্য যে, অনেক বড় মাপের গায়ক গায়িকা ও

'পারফরমার' যাকে বলে তাঁরা নজরুলগীতির প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করে গেছেন—যেমন : দিলীপকুমার রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, শচীন দেববর্মন, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও আব্বাসউদ্দিন। দিলীপকুমার রায়ের নাম এঁদের মধ্যে আলাদা করে বলতে হবে এইজন্য যে ভদ্রসমাজের বৈঠকি গানের অভিজাত পরিবেশে তিনিই প্রথম নজরুলের গান গেয়ে তাকে জাতে তোলেন। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ও ভীষ্মদেবের মতো রাগরাগিণীসিদ্ধ শিল্পীর কণ্ঠলাবণ্য নজরুলের গানের অন্তঃপুরকে অনেকটা উদ্ভাসিত করেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কম্বুকণ্ঠ, শচীন দেববর্মনের অত্যাশ্চর্য গায়নবীতি, আব্বাসউদ্দিনের মরমি ভাওয়াইয়ার মোচড় আর ইসলামি গানের নিজস্বতা এবং আঙুরবালা-ইন্দুবালার টিপিকাল পুরুষ কণ্ঠের নিবেদন সৃষ্টির রচনাকে যেন আলাদা মহত্ত্ব এনে দিয়েছিল।

এতসব ব্যক্তি ও সময়, গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির নতুন শ্রোতা ও নতুন পরিবেশ, 'আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় এক নতুন বর্গের গানকে নজরুল পরবর্তী বাংলা গানের প্রতিনিধি করে রেখেছে। রবীন্দ্রসংগীত সেখানে প্রবেশাধিকার পায়নি। যদি পেত তবে বাংলা গানের ভাষা ও শব্দচয়ন অন্য পথে চলে যেত। এত এলানো, আবেগসর্বস্ব, নিরর্থক, ব্যঞ্জনাহীন প্রেমের গান পঞ্চাশের দশক অবধি চলেছে ভাবলে অবাক লাগে—খানিকটা বিরক্তিও জাগে। বিশেষত এইজন্য, যে-দেশের গানে সমকালে ছিল রবীন্দ্রবাণীর অসামান্য উদাহরণ ও সম্ভার, তার দ্যোতনার চমক এবং প্রকাশের সংহত রূপ সেখানে কেমন করে এমন তরল ভাবনার অলস ভাষা এসে গেল গানের শরীরে? দুয়েকটি নমুনা দেখা যাক :

১. আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাইবা জ্বলে
কণ্ঠ-মালার বকুল যদি যায় গো দ'লে—
ওগো প্রিয়! জাগব বাসর শূন্য শয্যা পাতি— আমার বিফল রাতি। (হীরেন বসু)

২. তারার আঁখির কোলে স্বপনে শিশির দোলে,
চামেলি যে হায় চাঁদের পরশ চায়।
তুমি কোথায় তুমি কোথায়।। (শৈলেন রায়)

৩. আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে
হৃদয়ের ব্যথা ছিল মিশে।
প্রদীপে শুধানু, 'কিছু জান কি গো?'
শুধু সে কহিল, 'সে যে মায়ামৃগ,
কিছু তার আলো কিছু ঢাকা ছায়ে' (অজয় ভট্টাচার্য)

৪. গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোলখানি
ভোমরা-সম গুনগুনিয়ে শুনিয়ে যাব তোমার বাণী।
একটু তোমার পরশ লাগি'
পরান আমার হয় বিবাগী
পিয়াস জাগায় অধর তব দেয় কামনার খবর আনি।। (বাণীকুমার)

৫. তোমার সুরভি-জাগা কুঞ্জ-ছায়ে,
পান্থ আমি যে এসেছিনু,
ভুলে যে-রাগিণী ভাসানু বায়ে
ভুলে যেও ভালোবেসেছিনু। (সুবোধ পুরকায়স্থ)

৬. তুমি চেয়েছিলে শুধু মোর কাননের ফুল ;

আমি তার সাথে মন দিয়েছিনু
বল প্রিয় একি ভুল। (অনিল ভট্টাচার্য)

৭. নাই বা ঘুমালে প্রিয়, রজনী এখনো বাকি,
প্রদীপ নিভিয়া যায়,
শুধু জেগে থাক তব আঁখি।
এখনো দুয়ার পাশে হেনার সুরভি আসে,
পিয়াঁ পিয়া বলে ডাকে সাথীহারা কোন্ পাখি—
রজনী এখনো বাকি।। (প্রণব রায়)

নজরুলের পরবর্তীকালের কিংবা কিছুটা সমকালীন প্রধান সাতজন গীতিকারের রচনাংশ উদ্ধৃত করে আমার বলার কথাটা হল, গানের বিষয় থেকেই তৈরি হয় গানের ভাষা। পার্শ্বিক অবলোকনেও দেখা যাবে ওই সময়ে গানের মূল প্রসঙ্গ আর অনুষঙ্গ হল : প্রেম, বিরহ, শূন্য বাসর, বিনিদ্র প্রেমিকা, নিদ্রাতুর প্রেমিক, সাথিহারা পাখির ডাক, আঁধার ঘরের প্রদীপ, চাঁদ চামেলির অলক্ষ সম্পর্ক, গোলাপ ও ভ্রমরের মিতালি, ঝরা বকুল, হেনার সুরভি, ফুলের সঙ্গে মন সমর্পণ। এমন অপুষ্ট বিষয়, তরল ভাবালুতা, তুচ্ছ ভাবনা, স্বরচিত দুঃখ, সাজানো অভিমান, অস্ফুট কামনা আর আলোছায়ার দোলা কী এমন গভীর বাণী আনতে পারে? সেই সঙ্গে বহু ব্যবহারে জীর্ণ 'বিফল রাতি', 'আঁখি', 'চাঁদের পরশ', 'ছিনু', 'রাঙা কপোল', 'পিয়াস', 'ভাসানু', 'ভালবেসেছিনু', 'দিয়েছিনু', বাংলা গানের ভাষাকে পশ্চাদ্‌পদ করে দিয়েছে।

বিশ থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত বাংলা গানের নির্মাণে নজরুলের সংক্রাম প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ছিল সে তো বোঝা গেল কিন্তু রবীন্দ্র প্রভাব সে গানে ততটা লাগল না কেন? একটা বড় কারণ, গণমাধ্যমে স্বয়ং নজরুলের সাহচর্য গীতিকারের কাছে যত সহজপ্রাপ্য ছিল, শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ততটাই সুদূর ও অপ্রাপণীয়। ১৯১৩ সালের দুর্লভ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি গুরুদেবকে উন্নত পূজাবেদির মহান আসনে বসিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর নামের আগে বসে গিয়েছিল বিশ্বকবির শিরোপা। ঋষিকল্প চেহারার ওই সুদীর্ঘ উচ্চতার কবি, প্রাচ্যের পূর্ণতার প্রতীক যেন, তাঁর কবিতা এত সর্বত্রগামী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, তুলনায় তাঁর রচিত গান সেই পরিমাণে অনুকরণ বা ব্যবহারযোগ্য হয়নি সমকালীন শিল্পী, সুরকার, গীতিকারদের। তা ছাড়া রেকর্ড বা রেডিয়োতে প্রথম পর্বে রবীন্দ্রগীতি তেমন প্রচার আর প্রতিষ্ঠা পায়নি। কেন-না তখন তা গাইবে কে? ১৯৩৭ সালে, 'মুক্তি' ছায়াছবিতে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেন পঙ্কজ মল্লিক। সে গান গেয়েছিলেন পঙ্কজ নিজে এবং গাইয়েছিলেন কাননবালাকে দিয়ে। তারপরে রাইচাঁদ বড়াল ফিল্মে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ালেন সায়গলকে দিয়ে। সেই প্রথম মধ্যবিত্ত জনচিত্তে রবীন্দ্রনাথের গানের মহিমা বিস্ফোরণের মতো উত্তেজনা জাগিয়ে তুলল। বাঙালি শ্রোতাদের রুচিবোধে ওই গান যে অতখানি ইতিবাচক অভিঘাত হানল তার কারণ রবীন্দ্রগানের নিজস্বতা আর পঙ্কজ, সায়গল ও কাননের মতো পারফরমারদের কণ্ঠসংযোগ। বৃহত্তম বঙ্গ সমাজে এতদিন রবীন্দ্রসংগীত ছিল এক সম্বৃত বিষয়, অনেকটাই অবগুণ্ঠিত ছিল তার গভীর বাণীর গূঢ়তা—এবারে তা অনর্গলিত হল। এর আগে কোনো একজন দিনেন্দ্রনাথ, সাহানা দেবী বা অমলা দাশ, কনক দাস হয়তো গাইতেন রবীন্দ্রনাথের গান যথাযথ গায়কিতে—গাইতেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সমাবেশে বা উচ্চবিত্তদের ঘরোয়া সভায় বা ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায়। সাধারণ মানুষ বহুদিন তাঁর গানের নাগাল পায়নি। অথচ সে গান হাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াত, ফুলের মতো ফুটে উঠত, শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রকৃতিময়তায়, ছাত্রছাত্রীদের নাট্যরঙ্গে উৎসবে আনন্দে শোকে সমন্বয়ে সখ্যে। শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব, অমিতা সেন, কণিকা, নীলিমাদের পরিচর্যায়, ভালোবাসায়

ও সাধনায় আশ্রমে সেই গান গড়ে তুলেছিল এক ভাবময় শুদ্ধ পরিমণ্ডল। সে সম্পর্কে কলকাতার গানের মানুষদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু দূরত্বও ছিল দুস্তর।

সত্যিকথা বলতে কি, রবীন্দ্রসংগীতের গভীরতা, বৈচিত্র্য, অতলতা ও শব্দসম্পদ বুঝতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত। সুবিনয় রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা-কণিকা-রাজেশ্বরী, অর্ঘ্য সেন, ঋতু গুহ, সুমিত্রা সেন, সাগর সেনরা তাঁদের আন্তরিক পরিবেশনায় ও কণ্ঠমাধুর্যে রবীন্দ্রগীতির বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলী গড়ে তুললেন। তার ফলে ষাটের দশক থেকে আধুনিক গানের একচ্ছত্র দাপট কমে এল। হেমন্ত, ধনঞ্জয়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি, শ্যামল, মানবেন্দ্র, সতীনাথদের কণ্ঠাশ্রয়ী হয়ে আধুনিক গানের ধারা যদিও অব্যাহত থাকল কিন্তু গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত-দের রচিত গানের ভাব ও বাণী রয়ে গেল সেই তরল গীতল তুচ্ছতার একঘেয়ে গতানুগতিকতায়।

অথচ ভেতরে ভেতরে চল্লিশের দশক থেকেই বাংলায় চেপে বসেছে আসন্ন গুমোট— সমাজে সংস্কৃতিতে বিপ্লবে। একদিকে আগস্ট আন্দোলন, প্রগতি শিবিরের পত্তন, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা, দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-মন্বন্তর, অভূতপূর্ব জনজাগরণ আর অন্যদিকে আধুনিক গানের বিষয় ও বাণী রয়ে গেল বিপরীত পথে। সত্যের দিকে, সমাজ-বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে বাংলা নাটক 'নবান্ন' থেকে বাঁক নিল নতুন পথে, জয়নুল আবেদিন-সোমনাথ হোর-চিত্তপ্রসাদের ছবি ও উডকাট সাদা কালোয় আঁকতে চাইল কঠিন বাস্তবতাকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র-সমর সেন-সুকান্ত-সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতায় আনলেন নতুন ভাষা। অথচ আধুনিক গান শুধু রয়ে গেল রোমান্টিক স্বপ্নে বিলগ্ন হয়ে। কিন্তু অন্য একটা ঢেউ উঠল গণসংগীতের দৃপ্ত শপথে। এবারে নতুন বাংলা গান জাগল নতুন ভাষায়। অন্ধকারের দ্বার মুক্ত করার আহ্বান এল। এই বর্গের গানই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করল নিদারুণ সত্য যে, 'আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার'। বলা হল : 'শহীদ স্মরণে আপন মরণে রক্তঋণ শোধ করো'। এবারে বাংলা গানে এল নানা অমার্জিত শব্দ আর কঠিন বাস্তবের চিত্র। যেমন :

১. মায়ের কোলে শিশুসন্তান মরে অনাহারে
মৃত সন্তান বুকে নিয়ে কাঁদে রে বাপ মায়।
শুনে রে ভাই পরান বিদরে
মরা মানুষ টানিয়া লয় শৃগাল কুকুরে।
নরকঙ্কাল খাদ্য খোঁজে ময়লা নর্দমায়।। (হেমাঙ্গ বিশ্বাস)

২. মোদের গানে অঙ্গনে যদি মানুষ না পায় ঠাঁই
গানের আসর ভেঙে দাও তবে আমরা সেথায় নাই (পরেশ ধর)

৩. শোনো বন্ধু শোনো, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা,
ইঁটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা।
এখানে আকাশ নেই
এখানে বাতাস নেই
এখানে অন্ধ-গলির নরকে মুক্তির আকুলতা। (বিমলচন্দ্র ঘোষ)

৪. কাঠফাটা রোদে পিচঢালা পথে
ঝড় বাদলেতে আঁধার রাতে
রিক্সা চালাই মোরা রিক্সাঅলা।
ঠুং ঠুং ঠুং ঘণ্টা বাজে সোয়ারি হাঁকে, 'জলদি চালাও'
ওরা বোঝে না যে পেটের টানে মোরা পিঠে মানুষ বই
তবু জোটে কই দুটি বেলা ? (দিলীপ সরকার)

৫. চরকা নয় খদ্দর নয় আর—নয় অহিংসার বুলি
বুকে বেঁধে গরম সীসার গুলি—এ আর সহে না (বিনয় রায়)

৬. জেগে আছি একা জেগে আছি কারাগারে।
পরাধীন দেশে প্রেম চির অভিশপ্ত,
মুক্তির পথে কত বাধা, কত রক্ত!
মহামিলনের স্বপ্ন আমার ভেঙে যায় বারেবারে। (মোহিনী চৌধুরি)

৭. বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা—
তোমার গুলির তোমার ফাঁসির
তোমার কারাগারের পেষণ শুধবে তারা ওজনে তা
এ জনতা। (সলিল চৌধুরি)

চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের সাতজন প্রধান গীতিকারের সাতটি গীতাংশ উদ্ধৃত করে এবারে আমাদের বক্তব্য দাঁড়াল : জীবন বাস্তবতা আর কঠিন সংগ্রামের দিকে পিছন ফিরে নজরুল-পরবর্তী গীতিকাররা যে পেলব স্বপ্নময় বকুল বিছানো পথের ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন, সমাজচেতন শ্রেণিচেতন একদল গীতিকার সেই কুহক ছিন্ন করে নতুন ভাষায় নতুন গান লিখলেন। তার সুরবয়নেও মেলডি আর মিড় মূর্চ্ছনার বদলে প্রাধান্য পেল তালের তীব্র স্পন্দ, উচ্চারণের উদাত্ত ধ্বনি, এবং ক্বচিৎ শ্লোগানের স্বর। বলা বাহুল্য গানের বিষয়গত পরিবর্তনই টেনে আনল শব্দের নতুন ব্যবহার। এমন সব শব্দ বা ভাষার ব্যবহার এবারে শুরু হল, এত সরাসরি অন্তর্ভেদী বাক্‌রীতি, যা বাংলার গানে কোনোদিন শুনিনি আমরা। মুক্তি ও স্বাধীনতার শপথ শুধু নয়, সংগ্রাম, শ্রেণিসংগ্রাম এবং নয়াবিচারের নির্ঘোষ শোনা গেল বাংলা গানে। তার ভাষা কোমল মধুর নয়, কঠোর তীব্র স্পষ্ট। শত্রুর জান নেবার জন্য কৃষকের কাস্তেটায় শান দেবার প্ররোচনা দেওয়া হল গানে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত কঙ্কালসার চেহারার মানুষের চিত্র আঁকা হল মৃত সন্তান যার বুকে আঁকড়ানো। তেভাগা আন্দোলনের শ্লোগান নিয়ে লেখা হল : 'মোরা তুলব না ধান পরের গোলায়/তার জমি যে লাঙ্গল চালায়'। কিন্তু তাই বলে এই নতুন গানে কেবলই রক্তপ্রার্থনা আর সংগ্রামের শপথ নেই, আছে উজ্জীবনেরও স্বপ্ন। আছে কোনো এক গাঁয়ের বধূর স্বপ্নরঙিন জীবনের আদরসোহাগের বৃত্তান্ত এবং শোষণের যন্ত্রে কুটিলের মন্ত্রে তার করুণ পরিণতির কথাও। এ সবের পাশে খুব মেকি বড়ই ফাঁকা শোনায় সমকালের রচনা নিশিকান্ত-র লেখনীতে—

এ কোন্ কর্মনাশা গানের ভ্রমর
মর্মেতে মোর বাঁধল বাসা।
শুনিনা কারও কথা
শুধু শুনি
অন্তরে গুনগুন করে গো
কোন্ উদাসী কোন্ সে গুণী।

একদিকে আত্মমগ্ন আনন্দ, কর্মনাশা গানের গুঞ্জন আরেকদিকে কঠোর বাস্তব জীবনযাপন ও তার ঘনিষ্ঠ চিত্রণ—বাংলা গান কোন্ পথে পাবে তার সিদ্ধি? একজন লিখলেন : 'পরাধীন দেশে প্রেম চির অভিশপ্ত'।

এখানে একটি তথ্য জানা জরুরি। গণসংগীত যাকে বলছি আমরা, তা কখনই সম্প্রচার পায়নি সবাসরি রেডিয়োর প্রচার তরঙ্গে, কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায়। চলচ্চিত্রেও এসেছে অনেক পরে, ঋত্বিক ও মৃণাল সেন

বাংলার গণ-আন্দোলন ইতিহাসের অংশরূপে ওই সব গানের কিছু কিছু টুকরো ব্যবহার করেছেন তাঁদের ছায়াছবিতে। সলিল চৌধুরির কিছু গান রেকর্ডে প্রচারিত হয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় কণ্ঠলাবণ্যে এবং পেয়েছে অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক সফলতা। তবু প্রচুর সার্থক ও জনপ্রিয় গণসংগীত আজও রেকর্ড কোম্পানিগুলি প্রচার করতে চায় না, তখনও চায়নি। অথচ সে সময়ের সভাসমিতিতে, জনসমাবেশে এবং ঘরোয়াভাবেও গণসংগীতের ব্যাপক চর্চা হয়েছে। বস্তুত আমাদের সফল গণ-আন্দোলনে (এমনকি নকশালদের মধ্যেও) গানের ভূমিকা বরাবর ছিল। লেখা হয়েছে নতুন ভাবের ও ভাষার নতুন গান (দ্র. নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা গান : দিলীপ বাগচী। ধ্রুবপদ বার্ষিক সংকলন ১৯৯৯)। কোনো অজ্ঞাত কারণে সেসব রচনাকে অনেকে বাংলা গানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচনা করেন না। যদি করতেন তবে সুমন-নচিকেতার গানকে হঠাৎ নতুন লাগত না—তার গায়ে মারতে হত না 'জীবনমুখী' লেবেল। প্রতুল মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ, অনুশ্রী-বিপুল, গৌতম চট্টোপাধ্যায়রা বেশ কিছুকাল ধরেই নতুন বর্গের গান নতুন ভাষায় গাইছিলেন ছোটোখাটো সভা সমাবেশে কিন্তু বৃহত্তর শ্রোতাদের কাছে তার বেশ তেমন করে পৌঁছয়নি— তাঁদের ক্যাসেট কোনো উল্লেখযোগ্য বিপণনের বাজার তৈরি করতে পারেননি। এর কারণ কী? আপাতত প্রশ্নটুকু শুধু তুলে আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাব এইকথা বোঝাতে যে পঞ্চাশ দশক থেকে বাংলা গান তার কল্পিত স্বপ্নের উচ্চমার্গ থেকে নেমে এসেছিল পথে। সেই কারণে গানে যেমন ভাবান্তর ঘটে গিয়েছিল তেমনই এসেছিল ভাষান্তর। উদ্ধৃত সাতটি গানের নমুনায় আমরা যেসব শব্দ বা অনুষঙ্গ পাচ্ছি তার পঞ্জি বানালে দেখা যাবে বহু অপূর্বকল্পিত বিষয়, অন্তত গানের ক্ষেত্রে। যেমন :

> অনাহার, মৃতসন্তান, শৃগাল কুকুর, নরকঙ্কাল, প্রাণহীন শহর, ইটের পাঁজর, লোহার খাঁচা, অন্ধগলি, রিকশাঅলা, সোয়ারি, ক্ষুধা, চরকা, খদ্দর, গরম সিসার গুলি, হিংসা-অহিংসা, কারাগার, পরাধীন দেশ, মুক্তি, বিচারপতি, ফাঁসি, পেষণ, বিচার, জনতা।

এরসঙ্গে প্রতিতুলনার জন্য আধুনিক বাংলা গানে শ্যামল গুপ্ত প্রণীত গানের আর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানের শব্দাবলি উদ্ধৃত করছি পরপর : (কৃতজ্ঞতা পবিত্র সরকারের কাছে। দ্র. তাঁর লেখা 'বাংলা গানের ভাষা'। ধ্রুবপদ বার্ষিক সংকলন ১৯৯৯। পৃষ্ঠা ৯৮)

> পান্থপাখি, কূজন-কাকলি, রাখালি বাঁশি, পরাগ-ঝরানো, স্বপ্ন-ভরানো, ভ্রমর, বকুল, লগন, মুকুল, মৌমাছি, আঁখি, নিষেধ-হারা, দুয়ার-প্রান্তে, আঁধার, আলেয়া, মরীচিকা, অশ্রুসাগর, পথ-চাওয়া আঁখি, প্রণয়ের মধু, মৃণাল-বাঁধন, চিরবেদন।

গণসংগীত আর আধুনিক বাংলা গানের শব্দ ও অনুষঙ্গের প্রতিতুলনা করলে বৈপরীত্যের যে চিত্র ফোটে তা যেমন চমকপ্রদ তেমনই ভাবনার বিষয়। একই দেশে একই ভাষায় এমন দু'ধরনের গান একই সময়ে রচিত হয়েছে কিন্তু তার শ্রোতারাও কি ছিলেন দু'রকম? আমরা যারা এই দু'ধরনের গানই শুনেছি, মনে আছে শ্যামল গুপ্ত বা গৌরীপ্রসন্নদের গান অনেক বেশি শুনতে পেয়েছি কারণ তার প্রচার হত অবিরলভাবে রেডিয়ো-রেকর্ড-ফিল্‌মের ত্রিধারায়, অর্থাৎ গণমাধ্যমের সমাদরে এই বর্গের গান পেয়েছে প্রচার প্রসার ও বাণিজ্য, পেয়েছে শ্রোতার আনুকূল্য। ফলে বাংলা গান বলতে আমজনতার ধারণা তৈরি হয়েছে এই ধরনের এলানো ভাষার প্রেমের গানই সারাৎসার। বাস্তবতার দুঃখগ্লানিভরা গান, সংগ্রাম

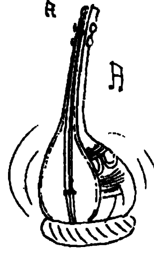
বা প্রতিবাদের ভাষাকে আমরা অবিশ্বাস করেছি। কিন্তু সময়ের চেয়ে বড়ো শিক্ষক তো নেই— তাই নব্বইয়ের দশকে হলভরা শ্রোতার সামনে নিজের লেখা কথা ও সুরে গায়ক সুমন যখন গিটার হাতে দীপ্তি কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন :

ভগবান কত ফরসা
কালো মানুষকে মারবেন বলে সাদাকে দিলেন বর্শা ;

কিংবা প্রশ্ন তুললেন :

গাছের শরীরে কুঠার চালাও
আদিবাসীদের কতটা কাঁদাও
ভেবেও দেখ না দিনভর তাঁরা কতটুকু খেতে পান।

আদিবাসীদের সর্বনামে 'তাঁরা' উচ্চারণ আর 'খেতে পান' এই ক্রিয়াপদের সম্ভ্রমবাচক ব্যবহারও কি এক নতুন ভাষার সূচনা করেনি? এর পাশে 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে/পান্থপাখির কূজন কাকলি ঘিরে'-ভাষা কত ম্লান, কত বানানো, কত বিবর্ণ।



বাংলা গানের বিশ্বায়ন

গান আর ছবির ভাষা সবচেয়ে আন্তর্জাতিক। তার মধ্যে গানের সর্বত্রচারিতা বেশি, তার কারণ গানের বাহন সুর। সুরের অনুভূতি আর শ্রোতার মর্মলোকে তার আবেদন দেশকাল নিরপেক্ষ। তাই দেখা যায়, ভিন্ন ভাষায় রচিত বাণী হলেও এক দেশের গান অন্য দেশের মনকে টানে। সুরের অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকে তাল। তার দোলা বা বিট্ সকলের মনকে নাড়া দেয়। করুণ সুরের মর্মস্পর্শিতা আর উদ্দীপক সুরের চাঞ্চল্য সকলকেই স্পর্শ করে—বাণী তাতে বাধা হয় না। অসমের গোয়ালপাড়ার মইষাল বন্ধুর গানের ভাব ও সুরের কারুণ্য কাকে না ছুঁয়ে যায়? তেমনই বিদেশি সংগীতে সি-মাইনরে বাঁধা সুরের পুঞ্জ স্বভাবত সৃষ্টি করে করুণ রসের অভিভব। এর অতিরিক্ত এক প্রাপ্তি শ্রোতাদের তরফে ঘটে যদি গানের বাণীতেও থাকে বিশ্বচেতনার অনুভূতি। সকলের নয়, কিন্তু কারোর কারোর গানে সেই উদার ভাবনা আমাদের সমৃদ্ধ করে।

আমাদের আধুনিক শিল্প-সংস্কৃতির সবদিকে যিনি অগ্রপথিক সেই রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম একটি গানে ভাবতে পেরেছিলেন :

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।—

এই ভাবনার মধ্যে একটা ব্যাপ্তির বোধ আছে এবং রবীন্দ্রমানস যাঁরা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারেন তাঁরা নানাভাবে তাঁর রচনায় এমনতর বিশ্বগণচেতনার স্পর্শ পান। সবাই পান না, তার কারণ বেশিরভাগ পাঠক দেশকালে আবদ্ধ। সময়ের তাৎক্ষণিকতায় ও স্থানিকতায় তাঁরা থাকেন সংকীর্ণ হয়ে। শুধু তো গানে নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনাতেও একটা ব্যাপ্তির বোধ লক্ষ করা যায়। সেই বোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথ কখনো বলেছেন এই বিশ্বের মধ্যে একজন পাগল আছে— যা কিছু খামোখা সে-ই টেনে আনে।

কখনো ভাবছেন এই পৃথিবী যেন নটরাজের ঋতুরঙ্গশালা। তাঁর বিশ্বনৃত্যের এক চরণক্ষেপে রূপলোক উন্মোচিত হয়, আরেক চরণক্ষেপে রসলোক উন্মথিত হয়ে ওঠে। এখানেই শেষ নয় বিশ্বভারতীর রূপকারের অনুভবের অত্যাশ্চর্য ব্যঞ্জনা। অন্য একটি গানে স্পষ্টতর করে বলেছেন :

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

কারোর-কারোর অবশ্য এখন মনে হতে পারে যে, এর একেবারে বিপ্রতীপ ভাবনায় তিনি লিখেছেন, 'আমার আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা'—কিন্তু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে আত্মলোক আর বিশ্বলোকের চেতনায় রবীন্দ্রনাথের সত্যিই তেমন কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, নিজেকে ছাড়িয়ে এই বাইরে দাঁড়াবার আহ্বান আর কজনের জীবনে আসে? অন্তত রবীন্দ্রনাথের জীবনে এসেছিল, বিশেষত তাঁর পরিবারের সূত্রে এবং সমকালীন ইংল্যান্ড তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্বপ্নিল স্পর্শে। তাই কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকালে স্বল্পকালের প্রবাসজীবনে এবং জ্যোতিদাদার চর্চিত পিয়ানোর টুং টাং শব্দ তাঁর গানের কৈশোর পর্বেই এনেছিল বিশ্বায়নের ঝংকার। পশ্চিমি সংগীতকারদের বিশিষ্ট কম্পোজিশনগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কুড়ি বছর বয়সে রচিত তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য আসলে 'সুরে নাটিকা', যা এদেশে ছিল অপূর্বকল্পিত। ভারতীয় রাগরাগিণীর সঙ্গে বিলিতি সুরের চলন আর ঝোঁককে একসঙ্গে বেঁধে ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর থেকে বোঝা যায় সংগীত সম্পর্কে তাঁর কোনো ছুৎমার্গ ছিল না এবং কোনো দেশের গান যে চিরকাল অনড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না, তার যে চাই মুক্তি, একথা বিশ্বাস করতেন তিনি। বিশ্বাস করতেন তার কারণ বিশ্ব-সংগীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কৈশোরেই ঘটেছিল এবং কুড়ি বছর বয়সের আগেই খাঁটি বিলিতি গান, স্কচ ও আইরিশ গান শুনতে এবং শিখতে পেরেছিলেন খোদ ইংল্যান্ডে বসে। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহসী ও নিরীক্ষাপ্রবণ করেছে। গান সম্পর্কে কোনো বদ্ধ ধারণা তাঁর ছিল না। সংগীতের মুক্তি ছিল প্রধান লক্ষ্য। তাই গানে সুর রচনার সময় তিনি অবাধে রাগমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, এমনকি সিদ্ধ রাগের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। তাই তাঁর বর্ষার গানে এসে গেছে বাহারের সুর। এই ভাঙাগড়ার রঙ্গ খেলায় দেশি-বিদেশি সুরের মিলন মিশ্রণ ঘটাতে তাঁর দ্বিধা ছিল না, কারণ বিশ্বসংগীতের উদার ধারণা তাঁর সৃজনশীল মনে ছোটবেলা থেকেই গেঁথে গিয়েছিল। বিদেশি যন্ত্রবাদ্য সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ গোপন থাকেনি, যখন ১৯৩০ সালে আইনস্টাইনকে জানিয়েছিলেন : 'Somehow the piano confounds me. The violin pleases me much more.' বিদেশে গিয়ে সেখানকার গানের জগৎ এক উদার সুরের ও আনন্দগানের দ্যোতনা তাঁর অন্তরে নবসৃষ্টির স্বপ্ন জাগিয়েছিল। 'প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার' বলে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, তাই সেখানে জাগাতে চেয়েছিলেন নবসুর। উচ্ছ্বসিত উন্মুখ হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন :

জাগো জাগো রে জাগো সংগীত—চিত্ত অম্বর
করো তরঙ্গিত,
নিবিড় নন্দিত প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে।
মুক্তবন্ধন সপ্তসুর তব করুক বিশ্ববিহার

বিশ্বায়নের তুমুল হুজুগের মধ্যে আজ মনে হয় না কি, যে রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে প্রথম গান-জাগানিয়া? কেবল গান-জাগানিয়াই বা কেন? বিশ্বভারতীর ভাবনার মধ্যেই তো ছিল বিশ্ববোধের প্রক্রিয়া। যেখানে বিশ্ব বাঁধা পড়বে একই নীড়বর্তী হয়ে। সেখানে অবশ্য শুধু নেওয়া নয়, দেওয়াও ছিল। *পথের সঞ্চয়* বইয়ের একটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আশ্রমের বাতাবরণের সঙ্গে তিনি প্রতীচীর ভাবাদর্শকেও

মেলাতে চান। দুইয়ে মিলে বাজবে এক পূর্ণতার সুর— যেন বিশ্বসংগীতের সমগ্র আভাস। ১৯২০ সালেই তিনি একটি প্রবন্ধে একথা বলেছিলেন যে, 'আমাদের সংগীত একের গান—একলার গান : কিন্তু তা কোণের এক নয় তা বিশ্বব্যাপী এক।' বাংলা গানে বিশ্বায়নের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা খুব ছোটবেলাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছিল হাবার্ট স্পেনসরের মতামত নিয়ে। 'The origin and function of Music' নিবন্ধে স্পেনসর বলেছিলেন মানুষের মনের বিচিত্র সব অনুভব, কল্পনা ও ভাবনাকে রূপ দিতে হবে সংগীতে। হর্ষ, বিষাদ, শোক, দুঃখ, মর্মযাতনা কিংবা হাসি-কান্নার আভাস ফুটে উঠবে গানে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে বাঙালিকে দিয়েছিলেন সেটাই। তার ফলে বহুদিনের বাংলা গানের বদ্ধ সোঁতায় এসেছিল সুরের আর ভাবের চলৎশক্তির জোয়ার।

শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, দ্বিজেন্দ্রলালও। তিনি তো পুরোদস্তুর পেশাদারি দক্ষতায় বিলিতি গান আর তার স্বকীয় কণ্ঠবাদনের কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন রীতিমতো অর্থব্যয় করে। সেই চেষ্টাকৃত ও সশ্রদ্ধ অনুশীলনের নমুনা ছড়িয়ে আছে তাঁর নানাবিধ গানের চলনে, সুরে, তালে। বিলিতি গানের সুরে যে লঘুচপল লীলা, যে ওঠানামা, যে ওজঃভাব ও পৌরুষ তার পরাকাষ্ঠা দ্বিজেন্দ্রগীতি। স্কচ গানের নানা মজা ও দ্রুত উচ্চারণের কৌশল তিনি হাসির গানে ভরে দিয়েছিলেন। যেমন, Some folks অনুসরণে 'কেউ কেউ করে হায়', Rule Britannia থেকে 'যখন নীলিমা জলধি হৃদয়ে', Won't you buy my pretty flowers নিয়ে 'কেউ কিনবি না মোর ফুলগুলিরে'। ছুৎমার্গী বাঙালি শ্রোতাদের তরফে কেউ কেউ, যেমন অক্ষয়কুমার সরকার, তাঁর টাউন হলের ভাষণে বলেছিলেন : 'আমার বর্তমান দুঃখ নব যুবকদলের মধ্যে ইংরাজি সুরে সংগীতচর্চা দেখিয়া। যে সুরের কথা আমি বলিতেছিলাম, সেটি প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্তৃকই নব্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।' তখনকার পত্রপত্রিকায় কেউ কেউ প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানের জাত মারছেন। তখন প্রমথ চৌধুরি আগ বাড়িয়ে লেখেন যে,

> আর্টের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে organic। দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দুসংগীতের ন্যায় ইউরোপীয় সংগীতেও পরিচয় ছিল। তাঁর অন্তরে এই দুয়ের অলক্ষিত মিলনের ফলে তাঁর সুরের সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলাল যে নতুন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্ন-চৈতন্যে, দেশি ও বিলাতি সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্ট হয়েছে।....যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সংগীতে বিদেশি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।....হিন্দু সংগীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে।

একথা তখন না বুঝলেও এখন তো কারোর বুঝতে অসুবিধা নেই যে সুরের আকাশে কোনো ভেদ-রেখা টানা যায় না। মাঠপ্রান্তর জনপদ সাগর ডিঙিয়ে এবং রাষ্ট্রসীমা পেরিয়ে সংগীত চলে আসে স্রষ্টার গ্রহিষ্ণু মনে আর শ্রোতাদের আনন্দ যজ্ঞে। তাই তো দেখি ভেনিসের গন্ডোলা চালকদের কাছ থেকে শোনা গানের সুরে অতুলপ্রসাদ বাণী বসিয়ে বানিয়ে তোলেন 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'র মতো গান। দিলীপকুমার রায় ফ্রান্সে গিয়ে বিশের দশকে রোমা রলাঁ-কে বাংলা গান গেয়ে শোনালে তিনি তার সুরের গভীরতায় নিমজ্জিত হয়ে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেন :

> এককথায় মনোমুগ্ধকর—একটি আবেগের স্রোত,যার মধ্যে আছে অনুনয়, বিলাপ, উচ্ছ্বাস যা উচ্চতম স্বর ছুঁয়ে আবার খাদে নেমে আসে এবং আবার শুরু হয় দ্বিগুণ উল্লাসে।

সেই দিলীপকুমারই পঞ্চাশের দশকে ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে ঘুরে বাংলা গানের বহুতর নমুনা গেয়ে শোনান জার্মান বা ফরাসি অনুবাদে। তাতে বিদেশি শ্রোতাদের তারিফ জুটেছিল। হাল আমলে সলিল চৌধুরি যখন রাশিয়ান পোলকার ছকে 'শ্যামলবরণী ওগো কন্যা' কিংবা 'হ্যাপি বার্থ ডে'-র সুরের ছাঁদে

'ক্লান্তি নামে গো' রচনা করেন তখন তার রসগ্রহণে আমাদের কোনো বাধা ঘটেনি। নব্বইয়ের দশকে সুমন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গানে ও গায়নে ভরে দেন ইউরোপীয় গানের সুষমা। তাঁর যন্ত্রানুষঙ্গ ও গানের বিটও তো বিদেশি ধাঁচের। আমাদের গণসংগীতের নবীনতা ও সুরের ঝোঁকে যে বিদেশি ছোঁয়া ছিল সে তো এখন সবাই জানেন। বিট্‌লস্‌দের গানে আমরা কি আলাদাভাবে মোহিত হইনি? জন লেননের হত্যায় কে না কষ্ট পেয়েছে? তেমনই পপ, রক, ব্রেথলেস গানের ধরন যুবসমাজকে বরাবর আকৃষ্ট করেছে। মুম্বইয়ের ফিল্‌ম ইন্ডাস্ট্রিতে সুরের বিদেশিয়ানা কতকাল ধরে তার পক্ষবিস্তার করেছে। ও.পি.নায়ার, রাহুল দেববর্মণ আর বাপ্পী লাহিড়ী সেখানে সারা বিশ্বকে এনে হাজির করেছেন।

তাই বলে উনিশ শতকে বিলিতিয়ানার লোভে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যে একটু বাড়াবাড়ি করে বসেছিলেন তা যেন ভুলে না যাই। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের *ভিক্টোরিয়া গীতিমালা,* কিংবা কারোর কারোর গানে 'ইটালিয়ান ঝিঁঝিট'-এর উল্লেখ বেশ হাস্যকর। তবে এসব হল খণ্ডিত নমুনা এবং এ প্রয়াসের মধ্যে বিশ্ববোধের কোনো লক্ষণ নেই। বরং অনেক বেশি বিশ্বায়নের প্রচ্ছন্ন আভাস পাই 'শাখাপ্রশাখা' ছায়াছবিতে যখন প্রশান্ত-র ঘর থেকে তপতী ও প্রবীরের ঘরে ভেসে আসে যোহান সেবাস্টিয়ান বাখের একটি কম্পোজিশনের সুরধারা এবং তপতী সেই সুরকে বাখের রচনা বলে শনাক্ত করতে পারেন। তার মানে 'শাখাপ্রশাখা'-য় সত্যজিৎ রায় যে বিশ শতকের কাহিনি বলেন তার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারীপুরুষ এতটাই সফিসটিকেটেড যে যন্ত্রে বাখ্ বাজান এবং তার রসগ্রহণ করতে পারেন। অদীক্ষিত শ্রোতাদের পক্ষে তার রসগ্রহণে কোনো বাধা আসে না, কারণ তাঁরাই তো এ ছবির গরিষ্ঠ সংখ্যক দর্শক। সত্যজিৎ রায়ের বিশ্বায়িত সংগীতবোধের সাবালক নমুনা ফুটে উঠেছে 'শাখাপ্রশাখা'-য় গ্রেগোরিয়ান চ্যান্টের নিগূঢ় ব্যবহারে। দুর্নীতিগ্রস্ত তামসিক এক যৌথ পরিবারে স্নিগ্ধ ধূপের গন্ধের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে সকল কলুষতামসহর গ্রেগোরিয়ান চ্যান্টের সুরধ্বনি— তা যেন অলক্ষে একরকম প্রতিরোধ ও শমতা প্রার্থনা করছে। চাইছে ঐশ দয়া আর ত্রাণ। কিন্তু এবারে অন্য আর একদিকে তাকাতে হবে।

২

সত্তরের দশকে আমি পায়ে হেঁটে সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিলাম 'বোলান' নামে একরকম গ্রামীণ নাট্যগান। বোলান কথাটা এসেছে সম্ভবত 'বুলানো' বা পরিক্রমার অর্থে। এর স্থানিক রূপায়ণের অঞ্চল হল প্রধানত মুরশিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান আর বীরভূমের খানিকটা লাগোয়া জনপদ। গাঁয়ে গাঁয়ে চৈতালি ফসল যখন ওঠে, কৃষকের ঘরে লাগে সামান্য সচ্ছলতার ছোঁয়া, আসে কদিনের অবসর, তখন বোলানের দল গড়ে লোকনাট্যের ছাঁদে অভিনয় আর গান গেয়ে বোলানের পার্টি ঘুরতে থাকে এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম। ঘুরতে ঘুরতে এমনকি পার হয়ে যায় তারা একের পর এক জেলার সীমানা। বোলান হল খাঁটি গ্রামীণ গান আর তার শ্রোতারাও গ্রামীণ। চৈত্র সংক্রান্তির কদিন আগে থেকে বোলানের দল বেরোয় এবং তাদের বুলানো শেষ হয় সংক্রান্তির রাতে। এর প্রস্তুতি চলে মাসখানেক আগে থেকে। প্রথমে গান বাঁধা হয়, তা লেখা হয় একটা খাতায়। তারপরে গাঁয়ের কারোর বাড়িতে চলে মহড়া, কয়েক সন্ধ্যা ধরে। তারপর বাজনাবাদ্যি নিয়ে, মেকআপ নিয়ে শুরু হয় পরিক্রমা। ছেলেরাই মেয়ে সাজে। মাঝে মাঝে চলে গাঁজা কিংবা মদ্যের চর্চা, নইলে দিনরাত ধরে অত শারীরিক ধকল সইবে কেন?

বোলানের তিনটি অঙ্গ— নৃত্য, গীত ও অভিনয়। গ্রামে গ্রামে থাকে অপেক্ষাতুর শ্রোতা বা দর্শক। 'ওই আসছে বোলান পার্টি' শিশুদের কণ্ঠে এমনতর কলভাষ শুনলেই বোঝা যায় বোলানের দলকে দেখা গিয়েছে দূর থেকে কিংবা শোনা গিয়েছে তাদের সম্মেলক গানের সুর। এবারে তারা এসে পড়বে কোনো সম্পন্ন

চাষার অঙ্গনে বা ধনী গেরস্থের উঠোনে। সারা পাড়া ভেঙে পড়বে গান শুনতে—নারীপুরুষ। সবচেয়ে উৎসাহ কিশোর-কিশোরীদের। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পালাগান শেষ করে একটু বিশ্রাম নেবে দল। গেরস্থ দেবেন কিছু খেতে, সঙ্গে কিছু টাকার দক্ষিণা। ব্যস। এবারে চলো আর এক পাড়ায়। বাচ্চারাও পায়ে পায়ে চলল। শুনতে শুনতে ক্রমে সব পালাটাই তাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। তারপরে কদিন ধরে গাঁয়ের কিশোর-কিশোরীরা সেই বোলানের গান গেয়ে চলে। কিন্তু সমস্যা হল কটা গান তারা মনে রাখবে? বোলান পার্টি তো একটা নয়, অন্তত বিশ-পঁচিশটা। এই আসছে তরণিপুরের দল, ওই আসছে খামার পাড়া, এবারে এখনো তো দেবীপুরের দেখা নেই! সবচেয়ে বড়ো আর জাঁকালো দল অবশ্য সর্বাঙ্গপুরের। তাদের আসতে দেরি আছে। শব্দনগরের দলে এবার গিটার, বঙ্গো আর ক্যাসিও বাজছে। সেগুলোর আকর্ষণ তুমুল।

সাহেবনগরের ফণী দরবেশ গানের মানুষ। পঁচাত্তর বছরের পেটানো শরীর। সত্তরের দশকে তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে বলেছিলেন, বয়সকালে বোলান পার্টি আমাদেরও ছিল।

—তার কথা কিংবা সুর মনে আছে?

—আছে। তবে এখনকার সঙ্গে মিলবে না। তখন রীতিমতো রাগরাগিণীর চর্চা ছিল। চৈত্রমাস ধরে আমাদের বিড়ি তামাক খাওয়া ছিল নিষেধ। ওস্তাদের কাছে গান তুলতে হত একমাস ধরে। আদ্ধা, আড়খেমটা, মধ্যমান এসব কঠিন তাল ছিল। এখনকার ছোঁড়ারা সেসব জানবে কোথা থেকে? গাঁয়ে তেমন ওস্তাদই বা কই? সবই ফোক্‌তারা। এখন ক্যাসেট বাজিয়ে হিন্দি গানের সুর তুলে তারই ছাঁচে গান বাঁধে, সবই হল নকলদানা। হুস্‌।

—আপনাদের সময় বাজনা কী কী থাকত?

—ঢোল, সানাই আর কাঁসি। ব্যস। আর এখন? সব ইংরিজি বাদ্য। হারমোনিয়ামের কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু এই গিটার আর ব্যাঞ্জো— কানে ঝ্যাটা মারে। আর ওই ক্যাসিও নাকি এক যন্তর উঠেছে—যন্তর নয় যন্ত্রণা। ঢোল কই? এখন বলে বঙ্গো।

তার মানে সেই সত্তর দশকেই সায়েবনগরের মতো গাঁয়ে এসে গিয়েছে বিশ্বায়নের ছাপ, অন্তত যন্ত্র-বাদ্যে। আর যে হিন্দি গানের সুরটা নকল করা হল তাতেও তো বিদেশি চলন।

তো সে বারে শোনা গেল পলাশির কাছে বড়চাঁদঘর গাঁয়ে অর্জুন দাসের বাড়িতে নাকি অনেক বোলান গানের খাতা আছে। আমার সংগ্রহের নেশা,তাই জ্যৈষ্ঠমাসের রোদ মাথায় নিয়ে তিন মাইল হেঁটে পৌঁছেছিলাম ভরদুপুরে বিশ্বাস বাড়ি। তখনও ওসব রুটে অটো বা রিকশা চালু হয়নি। সারা রাস্তা হেঁটেই যেতে হল তাই। বিশ্বাসমশাই আমার বৃত্তান্ত শুনে তো অবাক। বাড়ির সবাইকে ডেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন, শরবত দাও, বাতাস করো। শোনো এনার কাণ্ড।

আমি লজ্জিত হই। বিশ্বাসমশাই হেঁকে বলেন, শোনো বৃত্তান্ত—এই ভদ্রলোক শহর থেকে এসেছেন আমাদের গ্রাম্য গানের খোঁজে। কী না আমাদের ছোটলোকদের বোলান গান। যাদের বলে চাষা বুদ্ধিনাশা তাদেরও গান এবারে জাতে উঠল।

আমার অধোবদন হবারই কথা। এমন কীই বা করছি। মনে পড়ে গেল মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন বা চন্দ্রকুমার দে-র মতো সংগ্রাহকদের কথা। কী সব গহিন গ্রামে ঘুরেছেন—না খাওয়া না দাওয়া। আর আমি তো দিব্যি ট্রেনে চড়ে এসে পলাশি স্টেশনে নেমে তিন মাইল মাত্র হেঁটেছি। তাতেই এত শোরগোল? কিন্তু সে কথা থাক, আসল বিষয় ছিল বিশ্বাসমশাইয়ের ব্যাপার-স্যাপার।

তিনি তো আমাকে পাত্তাই দিচ্ছিলেন না—বোলান গান? ওসব হবেখন। এসেছেন যখন বসুন দুদণ্ড।

টিউকলের ঠান্ডা জলে ছ্যান করুন। আহারাদি হোক। রাতটা থাকুন। এ তো আপনাদের শহুরে ব্যাপার নয়। সময় দিতে হবে। খোঁজপাতি করব। হুট বললে কী হয়?

থাকতেই হল রাতটা। আদর আপ্যায়ন ভোজন হল সবিস্তারে। সকালে বিশ্বাস হেসে বললেন, বোলানের গানের খাতা নিয়ে আর কী হবে? নিয়ে যান এই টেপ কটা। এতে দশটা পালা আছে। এটা আধুনিক যুগ বুঝলেন? রেকর্ডার যন্ত্রটা আমার ছেলে উপহার দিয়ে গিয়েছে—লন্ডনে থাকে, বুঝলেন?

লন্ডনে চাকরি করে বড়চাঁদঘরের দাস বাড়ির সন্তান। তার পাঠানো যন্ত্রে ধরা আছে গ্রাম্য বোলান গান, যা নাকি নিতান্ত ছোটলোকদের হালকা বিনোদনের চৈতি ফসল। তার অন্তর্গত রংপাঁচালি অংশে যে সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ থাকে তা নিয়ে হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের সরেজমিন গবেষণা, যার পোশাকি নাম participatory research। এবারে দৃষ্টি ফেরাই অন্যদিকে।

৩

১৯৯৯ সালে জুন মাসে আমাকে যেতে হয়েছিল আমেরিকা। প্রথমে নিউইয়র্ক, সেখান থেকে ডালাসের আর্ভিং শহরে। সেখানকার প্রবাসী বঙ্গসন্তানরা একটা সম্মেলন করেছিলেন তাঁদের শিকড়ের খোঁজে। আমন্ত্রণ করে আমাদের ক-জনকে নিয়ে গিয়েছিলেন খুব সমাদর করে এবং বলাবাহুল্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে। সংস্থাটির নাম 'The Academy of Bangla Arts & Culture', সংক্ষেপে 'ABAC' বা বাংলা উচ্চারণে 'অবাক'। দেখে অবাক হলাম যে সদস্যদের মধ্যে পনেরো আনাই বাংলাদেশের মানুষ। বাকিরা পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি। দূর প্রবাসে নিতান্ত ভাষার টানে আর নাড়ির যোগে তাঁদের মর্মমিলন ঘটেছে। বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা কিন্তু তাদের নতুন প্রজন্ম তেমন করে বাংলা জানে না। তারা দ্রুত ভুলে যাচ্ছেন বঙ্গ সংস্কৃতি আর বাঙালি জীবনের ঐতিহ্য, অথচ চারপাশে বিশ্বায়নের জোয়ার আর কম্পিউটারের প্রতাপ। শুধু বাংলা ভাষা নয়, তাঁরা চর্চা করতে চান বাংলা গান, কবিতা, নাটক। আঁকতে চান আলপনা। স্মরণে রাখতে চান বাংলা ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচন। তাই প্রতি শনি আর রবিবার গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে তাঁরা একটা ভাড়া করা পাবলিক হলে জড়ো হয়ে নিজেদের ছোটো ছেলেমেয়েদের এসব কলাবিদ্যা চর্চা করাচ্ছেন। দুয়েক বছর অন্তর টাকা জমিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ থেকে শিল্পী সাহিত্যিক গায়ক বাদকদের সেখানে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠান করছেন, সেমিনার করছেন, আকুল আগ্রহে শুনতে চাইছেন তাঁদের কথা। এ ব্যাপারে তাঁরা রাষ্ট্রীয় বিভাজন ভুলে গিয়েছেন। রাশেদ হোসেন, সৌম্য দাশগুপ্ত, আশরফ জাহাঙ্গীর সেখানে একই সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগঠন করছেন। শিমুল কিংবা মিঠুর মতো তরুণী গৃহবধূ (যারা কিন্তু গাড়ি চালিয়ে গিয়ে চাকরিও করে) বাচ্চাদের নাচ-গান আলপনা শেখাচ্ছে। সত্যিই খুব অবাক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বায়নের দাপটে তাঁরা কাবু। ইয়াঙ্কি কালচারের তীব্র ঝাপট থেকে জাতিসত্তাকে বাঁচাতে কী তাঁদের করুণ আকুলতা! উত্তর আমেরিকার নানা জায়গা থেকে কতরকম বাঙালি নারীপুরুষ এসেছিলেন সেই তিনদিনের সম্মেলনে—কত কথাবার্তা, খানাপিনা, ভাববিনিময়। আর্ভিং আর্ট সেন্টারের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের তিনটি বিশাল মঞ্চেতিনদিন ধরে একটানা অনুষ্ঠান সকাল দশটা থেকে রাত একটা-দুটো পর্যন্ত উপচে পড়া ভিড়। তার মধ্যে একটা জায়গায় বিক্রি হচ্ছে বাংলার তাঁতের শাড়ি, ধুতি—ঢাকাই জামদানি, টাঙ্গাইল, বালুচরী আর মুরশিদাবাদি সিল্ক। লন্ডন আর জার্মানি থেকে উড়ে এসেছেন ক-জন বাঙালি প্রাণের টানে। নিউইয়র্ক থেকে এসেছেন অধ্যাপক সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় আর তাজুল ইমাম। বাংলা গান গাইবেন।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানটির স্মৃতি এখনো মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আর্ভিং আর্ট সেন্টারের মূল মঞ্চ বিশাল আর চওড়া। সামনে একটা সুদৃশ্য পোডিয়াম। মঞ্চে পরপর পঞ্চাশটা চেয়ার পাতা। আমরা আমন্ত্রিত

গুণীজনরা পরে সেখানে বসব, পরিচয় ঘটবে দর্শকদের সঙ্গে, তাঁদের সংখ্যা হাজার দুয়েক। প্রথমে আমরা বসেছিলাম দর্শকাসনের প্রথম সারিতে। অনুষ্ঠান শুরুর আভাস মিলল পর্দা সরে যেতে। অনতি উদ্ভাসিত মঞ্চপট, তাতে আয়তাকারে আঁকা তিরিশ ফুট একটা ছবি—বাংলার গ্রাম। এবারে আস্তে আস্তে উইংসের দুপাশ দিয়ে হাতে প্রদীপ নিয়ে ঢুকল পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশোজন তরুণ-তরুণী, সাদা পোশাক পরা। প্রদীপগুলি ফ্রন্ট স্টেজে পরপর সাজিয়ে দিয়ে তারা গেয়ে উঠল : 'আমরা বাংলার গান গাই'।

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের এই গান কতবার শুনেছি, এমনকি তাঁর নিজের গলাতেই এবং তাঁর সেই বিখ্যাত স্বরক্ষেপণে তবু একেবারে বিদেশে, পরবাসী বাঙালির সম্মেলক কণ্ঠে সেই গানের আন্তরিক আকুতি ভরা আবেগ ও রোমাঞ্চের তুলনা হয় না। কত শত মাইল দূরে এসে গিয়েছে এখনকার একটা মরমি বাংলা গান। বাংলা গানের বিশ্বায়নের এতবড় দ্যোতনা আমরা ভাবতেই পারি না। দুই স্বাধীন দেশের এক ভাষাভাষী ছেলেমেয়ে একত্রে গাইছে এমন এক গান যাতে ফুটে উঠেছে গানের দীপ্ত উদার আকাশ। রাষ্ট্রনৈতিক কারণে বিভাজিত, ছাড়পত্র ছাড়া দুদেশে যাওয়ার স্বাভাবিক পথ নেই, কিন্তু সমভাষার গান মুহূর্তে সকলকে এক করে দিল। আমরা আবেগে সবাই উঠে দাঁড়ালাম। একটা সামান্য ক্যাসেট বাহিত হয়ে প্রতুলের গান চলে এসেছে এতদূরে? আর আজ ঘটল তার এমন আন্তর্জাতিক ব্যবহার?

বিস্ময়ের তখনও অনেক বাকি ছিল। অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি ঘোষিত হল : এবারে গাইবেন নিউইয়র্ক থেকে আগত তাজুল ইমাম। মুক্তিযোদ্ধা যুবক। হয়তো সারাজীবনের জন্য স্বভূমি থেকে স্বনির্বাসিত। তাজুল ইমাম একতারা বাজিয়ে গান ধরলেন, সঙ্গে দুলাল নন্দীর দোতারা আর সুদীপ্ত-র গিটার। গানের বেদনা আমাদের নিমেষের মধ্যে ছুঁয়ে গেল। বাংলাদেশের এখনকার বাউল গীতিকার আবদুল করিমের গান :

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান।
মিলিয়া বাউলা গান ঘাঁটু গান গাইতাম।
বর্ষা যখন হইত গাজির গান আইত
রঙ্গে ঢঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম।
বাউলা গান ঘাঁটু গান আনন্দেরই তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম—
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।
হিন্দু বাড়িন্‌ত যাত্রাগান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম।
মনে ভাবনা সেদিন কি পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম...

দুলাল আর তাজুলের গান হয়েই চলেছে। সকলের চোখে জল। যেদিন চলে যায় তা কি আর ফেরে? শান্তি সৌভ্রাত্রের সেইসব স্মৃতিকাতর সানন্দ যাপন... হিন্দু-মুসলমানের দেশজ লোকচর্চা.... বাউল্যা ঘেঁটু সারি গ্রামীণ যাত্রা... সেসব আজ আর কই? এখন ঝকঝকে দামি দেশে বিদেশি পোশাক ভাষা উচ্চারণ পারফিউম আর ইন্টারনেটে চোস্ত বঙ্গসন্তানগুলির অন্তর বিষাদে বেদনায় নড়েচড়ে ওঠে। গানের বিশ্ব তাদের নিমজ্জিত করে হারানো শৈশবে। উৎসন্ন প্রবাসী জীবন, নির্বাসিত সত্তা, কেঁদে ওঠে গানের ভাষায়। যখন যন্ত্রের দাপট ছিল না, এখনকার মতো মুখের ও প্রাণের ভাষা হারিয়ে যায়নি, বিদেশি জ্যাজ বা রক ঢেউ তোলেনি নদীমাতৃক ভাটির দেশে। বিশ্বায়ন এসে অলক্ষে কবে যেন কণ্ঠের গান কেড়ে নিল।

অভিজ্ঞতা আরও মর্মান্তিক হল পরের দিন সেমিনারে। এখানে ভিড় কম। আগ্রহী মরমি শতখানেক নরনারী বসে আছেন বিদ্বজ্জনদের কাছে দু-কথা শুনবেন বলে। ছোট কনসার্ট হল কিন্তু কবোষ্ণ পরিবেশ। মাঝে মাঝে আসছে সুপেয় কফি। ওই তো বসে আছেন, এখন লন্ডনের সাংবাদিক, সেই বিখ্যাত আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরি। ওঁর লেখা সেই গান মনে পড়ে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি?'

ভাবতে গেলে এও তো কম বিস্ময়কর নয় যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আর তার আগের পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন আমাদের বলে মনে করেছি পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন। সেই ভাষা আন্দোলন আর মুক্তিযুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীদের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। বিশ্বায়ন তো সেটাও—গানের বিশ্বায়ন। কিন্তু ভাবনা পূর্ণতা পায় আর্ভিংয়ের সেই ছোটো ঘরের সেমিনারে যখন গাফ্‌ফার চৌধুরি আর আমি বসি পাশাপাশি। লন্ডনপ্রবাসী গাফ্‌ফার তাঁর বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছেন গানের অভিমান। সুদূর ডালাসে দুজনের এই প্রথম দেখা হল।

একসময় আমার ডাক পড়ল ভাষণ দেওয়ার জন্য। বিষয় : একশো বছরের বাংলা গান। ঠিক করেই গিয়েছিলাম বক্তৃতার কথাগুলি প্রাঞ্জলভাবে বোঝাবার জন্য মাঝে মাঝে গাইব বেশ কটা বাংলা গান। বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে সামনের বেশিরভাগ শ্রোতাই নতুন প্রজন্মের। কিছুক্ষণ আগে লন্ডনের চিরপ্রবাসী কেতকী কুশারী ডাইসন তাঁর ভাষণে ডায়াস্পোরার সমস্যা বোঝাচ্ছিলেন। নতুন প্রজন্ম তাঁর কথায় নড়েচড়ে বসল— তর্ক করল অনেক। কিন্তু আমি ভাষণের প্রাক্ মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম এদের বেশিরভাগ জন্মেছে দেশবিভাগের পরে। অখণ্ড বাংলার স্মৃতি এদের নেই, হয়তো শোনেইনি আগেকার বাংলা গান। তবে প্রবীণ মানুষ দু-চারজন ছিলেন এই যা ভরসা। কিন্তু ধারণা আর আশঙ্কা পালটে গেল যেই ধরলাম 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি। সে কী ছলছলে চোখ! স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা তো তাদেরও বাংলাদেশ! যে দেশ তারা ছেড়ে এসেছে পেটের টানে। অতুলনীয় জন্মভূমির জন্য আর্তি আর স্বপ্ন কার নেই? বিশেষ করে ব্যথাতুর লাগছিল শ্রোতাদের মধ্যে সেই বিপন্ন মুখগুলি যারা মুক্তিযুদ্ধের সেনানী— বরাবরের জন্য বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছে বিদেশে। দেশে ফিরলে নাকি তাদের নিশ্চিত মৃত্যু।

'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি' গানটিতেও সবাই সাড়া দিল। শহিদের আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ আর তার মৃত্যু-পরবর্তী পুনরাগমনের বাসনা বড়ো মর্মন্তুদ। তাতে দেশকালের বেড়া নেই। ক্ষুদিরাম যেন সব শহিদের প্রতীক। তার মরণ নেই। দেশের জন্য আত্মদান করেছেন একাত্তরের যেসব মুক্তিযোদ্ধা, এই গানে যেন তাঁদেরও মনে করা। এসব গান তো আগেও কত গেয়েছি কিন্তু তার এমন নতুন ব্যঞ্জনা ও প্রতিক্রিয়া আগে বুঝিনি। বিশ্বের নানাবর্গের বাঙালি শ্রোতার সঙ্গে কোনো অলক্ষ অন্তর্যোগে তা বেঁচে আছে।

বিদেশের আসরে স্বদেশের গান গাওয়া, তাকে নতুন করে পাওয়া যেন এক নিগূঢ় অনুভব। শ্রোতাদের কোনো দেশকাল জাতধর্ম থাকে না। শ্রেষ্ঠ রচনা সকলের জন্য—এ আমি নতুন করে বুঝলাম। অভিজ্ঞতা নতুন মাত্রা পেল যখন গাইলাম গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' এবং তার থেকে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রগান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে লেখা এই গান ১৯৭১-এ হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। গানের কী প্রসারণ! আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলেন। সে অনুভবের কোনো তুলনা নেই। আমার একঘণ্টাব্যাপী ভাষণের একেবারে শেষে গাইলাম : 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার দেশ'। সকলে অভিভূত, বাক্যহারা। সত্যিই তো কীসের দুঃখ কীসের দৈন্য কীসের লজ্জা কীসের ক্লেশ? যদি সব বাংলাভাষী মিলিত কণ্ঠে বলতে পারে সাহস করে আমার দেশ। গান থেমে গেল। আসর স্তব্ধ। হঠাৎ সবাই তাকালেন একইদিকে। বস্টন থেকে আসা একজন বৃদ্ধ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এবার সকলেরই কান্নার পালা।

৪

রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি একটু অন্যরকম। আদিম কৌম সমাজের ধরনধারণ সেইসব জনপদে অনেকটাই এখনও অবিকৃত আছে। প্রকৃতি সেখানে রুক্ষ পাথুরে। গ্রীষ্মকালে জল পাওয়া কঠিন। সামান্য যে-কটা নালা, পুকুর বা সোঁতা আছে তাও যায় শুকিয়ে। অগত্যা বেশিরভাগ মানুষ ভাগ্যবাদী। সবাই চেয়ে আছে আকাশের বদান্যতার দিকে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা কথাগুলি রাঢ় বাংলায় বেমানান। মানুষের বড় কষ্ট। টাঁড় জমিতে হাঁটাও কঠিন। কিন্তু এখানকার জনপদ লোকসংস্কৃতিতে খুব সমৃদ্ধ। ঝুমুর, টুসু, ভাদু সেখানে অবিরল বয়ে চলেছে। বাঁকুড়ার কাঁকুরে মাটি দিয়ে পাঁচমুড়ার কুম্ভকাররা আশ্চর্য বিন্যাসের ঘোড়া তৈরি করেন চাক ঘুরিয়ে। সেসব টেরাকোটা ঘোড়া এখন ভদ্রলোকদের গৃহসজ্জার উপকরণ হলেও মূলে তার উৎপাদনের কারণ একেবারে অন্যতর গ্রামীণ তাৎপর্যে জড়ানো। বাঁকুড়ার গ্রাম-গ্রামান্তে দ্রুতগামী বাসে যেতে যেতেও চোখে পড়বেই বট কিংবা অশ্বত্থ গাছের গুঁড়ির কাছটা সাজানো-গোছানো— সেখানে রয়েছে মাটির ঘোড়া আর হাতি, নানা আকারের। আধহাত একহাত থেকে পাঁচহাত পর্যন্ত লম্বা। এগুলি আসলে মানুষের মানত-করা। কেউ মনে মনে সংকল্প করেছে তার সন্তানের রোগমুক্তি হলে 'থানে' দেবে একটা দুহাত মাপের ঘোড়া। কারোর মানসিক সন্তান কামনা, কারোর চাকুরি প্রাপ্তি। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য মানত করে ঘোড়া বা হাতি রেখেছে। ভারী নয়নমনোহর দৃশ্য। বরাবর দেখেছি বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম-মুরশিদাবাদ লৌকিক জীবনের ছন্দে সুঠাম। গানে শিল্পকাজে কবিত্বে ভরপুর দেশ। প্রকৃতির কাঠিন্য সম্ভবত তাঁরা জয় করেছেন মনের সৌন্দর্য দিয়ে। বাইরের অন্যান্য জেলা বা সারা পশ্চিমবঙ্গের অন্য সব জায়গার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ কম, ঔৎসুক্যও কম। নিজেরাই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্তত সৃজন সামর্থ্যে।

একসময় চালচিত্রের শিল্পীদের সন্ধানে যখন টুঁড়ে বেড়াচ্ছি সারা বাংলা, কে যেন বললেন, রাঢ়ে গেলে ভিন্নবর্গের চিত্রকর পাবেন, পটুয়ার দেশ তো! ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেলাম পোটো বা পটুয়াদের। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুরশিদাবাদ আর মেদিনীপুরে এখনও আছেন অনেক পটুয়া। তাঁদের কাছে গিয়ে নানা খবর মিলল। তেমন ধরা যাক, পটের ছবি আঁকতে তাঁদের কেউ কেউ বাইরের রং কেনেন না। কেমন করে কোথা থেকে তৈরি হয় রং?

শ্যামী চিত্রকর আমাকে বুঝিয়ে বললেন, ধরুন হলুদ রং দরকার, আমরা কী করি জানেন? উনুনের ঝিঁক বোঝেন তো? রান্না করতে করতে উনুনের তাতে হলদে হয়ে গিয়েছে, তাই একটু জলে গুলে নিলেই হয়ে যাবে খাসা হলদে রং। পুঁই মিচুড়ির দানা থেকে আমরা পাই বেগুনি রং। সাদা রং তো চুনেই মিটে গেল। অনেকদিনের মেটে হাঁড়িতে ভুসো পড়ে যায়, তাই দিয়ে হয় মিশকালো রং। আর ওই যে দূরের পাহাড় দেখছেন—ওর অনেকটা ভেতরে গেলে পাওয়া যায় গিরিমাটি আর দু-একরকম পাথর। তার কোনোটা ঘষে পাই লাল রং, কোনোটায় নীল। হলদের সঙ্গে নীল মেশালেই আসবে সবুজ রং। লাল হলুদে মেশালেই খয়েরি।

চমৎকার বোঝা গেল দেশজ রং-এর বৃত্তান্ত। পরে অবশ্য এটাও জানা গেল যে শ্যামী চিত্রকরের আর একটা নাম শামিম। সে আধা হিন্দু আধা মুসলিম। সব পোটোরাই নাকি তাই। একদিকে পুজোআচ্চা করে আবার নামাজও পরে। পটে হিন্দু পুরাণের কাহিনি এঁকে গান গেয়ে শোনায় হাটেবাজারে, অথচ মৃত্যুর পরে তাদের কবর হয়। এদের জীবনধারা বয়ে চলেছে দুই খাতে। দেবীমূর্তি গড়ে, পট আঁকে হিন্দু দেবতাদের কাহিনি নিয়ে, সেই পট দেখিয়ে গান গেয়ে তবে তাদের সম্বৎসরের উদরান্ন জোটে। তাই হিন্দু সমাজেই তাদের দোলাচল, বসবাস। অথচ রমজান মাসে রোজা রাখে, বিয়েসাদি হয় নিজেদের ঘরে ঘরে। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয় না। এমন শান্ত সম্প্রীতিকামী পোটোদের উপরেও আজকাল এসে গিয়েছে মৌলবাদী

ঝাপট। ১৯০০ সালেই পত্রপত্রিকায় ছাপা চিঠি জানাচ্ছে : 'মৌলবাদী মুনশি ও মুসলমান পুরুষরা পট গায়কদের হিন্দুর দেবদেবী বা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর লেখা কোনো বিষয়ের উপর পট না দেখাবার জন্য কড়া নিষেধ জারি করেছেন। শুনেছি, নিষেধ অমান্য করার জন্য এঁদের সামাজিক বয়কটও করা হয়েছে। সন্ত্রস্ত দরিদ্র মুসলমান পটুয়ারা পট-চিত্রগুলি লুকিয়ে ফেলছেন। সাহস করে বার করতে পারছেন না ; আবার প্রাণের জিনিসগুলি নষ্টও করতে পারছেন না।...এক শিল্পী প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন : মুনশিরা আমার রুজিরোজগার বন্ধ করে দিলেও আমাদের বাঁচার উপায় বলে দেননি।'

ঘরেও নেই, ঘাটেও নেই এমন একটা মাঝামাঝি জীবন নিয়ে ভারী বিপন্ন এই পোটোরা। পটে ছবি আঁকার করণকৌশল ভেদে ঘরানাও আছে। কোনোটার নাম 'গণকর' ঘরানা, কোনো ঘরানাকে বলে 'মাঝিয়ারা'। সেই মাঝিয়ারা ঘরানার পটুয়া একজনের সঙ্গে আলাপ হল বীরভূমের ষাটপল্সা গ্রামে। তাঁর নাম বাঁকু। বাঁকু পটুয়া।

একেবারে ক্ষয়া চেহারা, একমাথা ঝাঁকড়া চুল, তবে চোখে-মুখে বেশ একটা প্রত্যয়ের ভাব। দীনবেশের দরিদ্র মানুষ। হাটে মাঠে জড়ানো পট দেখিয়ে আর পটের গান গেয়ে কটা পয়সাই বা জোটে? কিন্তু চমক লাগল যখন জানলাম বাংলার পটের গান গাইতে বাঁকু গিয়েছেন বিদেশে, অবশ্যই ভারত উৎসবের সূত্রে। ১৯৮২ সালে লন্ডন, ১৯৮৫ সালে ওয়াশিংটন। কী আশ্চর্য এই পটের গানের বিশ্বজয়ের বার্তা। অথচ মানুষটির কথাবার্তায় কোনো দম্ভ বা চালাকি নেই। খুব নিস্পৃহভাবে বললেন, ধরুন, বিদেশ তো রোজ রোজ যাচ্ছি না। দুবার যাওয়ার সুযোগ এসেছে, গেছি। তারপর আমাদের চিরকালের যে দারিদ্র্য সেই দারিদ্র্যই।

— বিদেশিরা পটের গান শুনল?

— হ্যাঁ শুনল, আদর করে টেপ করল। কিনেও নিল সবকটা পট, মোটা দামে। তো ধরুন সেই টাকায় বড় মেয়েটার বিয়ে দিলাম, ঘরদোর একটু সারালাম, ব্যস টাকা ফৌৎ! কী বুঝলেন? তবে হ্যাঁ ওরা কটা জিনিস উপহার দিয়েছে। টেপ রেকর্ডার, গেঞ্জি, ঘড়ি আর বিস্কুটের প্যাকেট। বিস্কুট তো এখানে আনতে আনতেই শেষ, ঘড়ি ওই বড়খোকার হাতে দেখছেন। টেপরেকর্ডার? বেচে দিয়েছি— টেপ কেনার পয়সা কই? ব্যাটারি কে দেবে? আর গেঞ্জি? এই দেখুন পরে আছি কীসব আগডম বাগডম চিত্তির করা।

— এসব দিল কে?

—কেন? পাবলিক দিয়েছে ভালোবেসে, গালে চুমো দিয়েছে গান শুনে। ওটাই ওদের রেওয়াজ।

আমি অবাক হয়ে বাঁকুর দিকে তাকিয়ে থাকি। বাংলা গানের বিশ্বায়নে ভারতের প্রতিনিধি। কী করুণ, কত অসহায় তাঁর দৈনন্দিন। বাঁকুর ভেতরে কিন্তু একজন প্রত্যয়ী শিল্পীর বসবাস রয়েছে। তাই বলে ওঠেন, তা ধরুন যতগুলো পট নিয়ে গিয়েছিলাম সব বিকে গিয়েছে, আবার সব আঁকতে হল এখানে ফিরে।

— কেন?

—বাঃ, ছবি নেই কিন্তু গান তো আছে, সুর আছে। সবই মনের মধ্যে ধরেন জড়ানো। যেমন আমাদের এই জড়ানো পট, টান দিলেই খুলে যাবে। তো সেই গানের বর্ণনা দিয়েই ছবি আঁকা। জানেন, আপনাকে একটা গোপ্ত কথা বলি। আমি একটা আমেরিকা পট এঁকেছি। বাড়ি রাস্তা আলো গাড়ি সব মিলিয়ে। একটা গানও বেঁধেছি, 'আজব শহর আমেরিকা' তার ধুয়ো। পাবলিক সেটা এখন খুব শুনতে চায়।

ভেতরে ভেতরে এখন বিচিত্র সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ঘটে গিয়েছে কে জানত? বাঁকু খুব যত্ন করে তাঁর কাঁধে ঝোলানো পটের ঝোলা থেকে সম্ভ্রম সহকারে একটা জড়ানো পট খুলে দেখালেন আমেরিকা পট। উত্তরা-অভিমুন্য, কর্ণ-কুন্তী, নরকের বিচার, সীতার পাতাল প্রবেশ, ভীষ্মের শরশয্যা, জয় বাবা তারকনাথ পটের পাশে আমেরিকা পট। গুনগুন করে গান ধরে দেন :

ওয়াশিংটনে যে দেখি ডাইনে গাড়ি চলে।
ওপরে ওঠালে সুইচ ভাই রে আলো জ্বলে।।
কত আলো কত গাড়ি কীবা তাহার গতি।
বাঁকু এসে আমেরিকায় ভাবে মন্দমতি।।

জড়ানো পটের আস্তরণ খোলে আর সামনে ভেসে ওঠে ধনী দেশের নানা বিচিত্র দৃশ্য— পার্ক, হাইরাইজ, পানশালা, নরনারী, সূর্যাস্ত, রাস্তায় গাড়ির জ্যাম, এমনকি প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বন। আর এইসব নিয়ে পোটোর অনবদ্য গানের বাণী শোনার মতো। আমি বললাম, ও দেশের লোক এ দেশের পুরাণের কথাকাহিনি শুনে খুশি হল?

— ভাষা বোঝে নাই, তবে গানের সুর আর ছবি কেন বুঝবে নাই গ? সারা বিশ্বে ওসব বুঝতে কোনো বাধা নেই— শিশুও ছবি গান বোঝে। বোঝে না?

৫

জয়দেব কেঁদুলির পৌষ সংক্রান্তির মেলায় সেবার এক নতুন প্রাপ্তিযোগ হল। বেণীমাধবের নামি আখড়ায় সারাদিন সারারাত গান হয়। বেণী একটা বড়ো কাঠের গুঁড়ির ধুনি জ্বালিয়ে গাঁজা খেয়ে উর্ধ্বনেত্র হয়ে বসে আছে আর একের পর এক বাউল এসে দলবল নিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে— শ্রোতাদেরও হেলদোল নেই। তাদের বারো আনাই গাঁজায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে শুধু জিকির দিচ্ছে 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' কিংবা 'বলিহারি' 'বলিহারি'। একজন কমবয়সি চটকদার বাউল, আলখাল্লার উপর র-সিল্কের জ্যাকেট পরে গান গাইছিল :

কৃষ্ণনামের মিষ্টি চুরুট মুখে রাখো সর্বক্ষণ।

গলার তেজ আছে। দমও যে আছে সেটা বোঝা গেল 'ভোলামন' বলে যখন লম্বা টান ছাড়ল। সকলে তাই শুনে একেবারে মোহিত। গানের শেষে দৃপ্তভাবে যেন বিশ্বজয় করেছে এমন ভঙ্গিতে এসে বসল আমারই পাশে। নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে ঝোলা থেকে একখানা সাদা কার্ড বের করে হেসে আমাকে দিল। আমাকে দেখেই ঠাউরেছে একজন শহুরে মানুষ বলে। দেখলাম লেখা রয়েছে ইংরিজি হরফে :

Baul Bishwa
The Bauls of Bengal
SUBHADAS BAUL
119, Rue du Temple -75003 Paris - France
Tel + Fax 331 42 78 51 83
e.mail : baulbishwa@aol.com
web : wwwbaulbishwa.com

খানিক পরে বাইরে এসে কথায় কথায় জানা গেল বীরভূমের গদাধরপুরের হাটইকরা গাঁয়ের এই কৃষ্ণকায় বঙ্গসন্তান এখন প্যারিসবাসী। বাউল বিশ্বে সে অবশ্য নিতান্ত একা নয়, সঙ্গে এক শুভ্রকায় সঙ্গিনী আছে। মাখনের মতো যার গাত্রবর্ণে এখন বাংলার গেরুয়া নামাবলি বেশ সেঁটে বসেছে। বাউল বিশ্বের এই সরণি খুলে গিয়েছে ষাটের দশক থেকে। তার প্রথম পদাতিক নিশ্চয়ই পূর্ণদাস বাউল। তারপরে পবনদাস থেকে বহু মহাজনের সান্নিধ্যধন্য এই পথ। ভারত তথা বঙ্গ সংস্কৃতির বেশ লাভজনক পণ্য এই বাংলার বাউল। চলনে-বলনে নাচে ঠমকে আর পোশাকে-পরিচ্ছদে এক সচল আইকন। সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় মজা করে লিখেছেন : 'The Baul. of course, having been granted cultural ben-

ediction in the twentieth by its elevation to the status of an export item in the festival of India circuit।' শুধু ভারত উৎসবে নয় বাউলের স্ট্যাটাস নানাভাবেই বেড়ে চলেছে সারা বিশ্বে। তাঁদের রপ্তানিযোগ্যতার কারণ বাউলদের বিচিত্র পোশাক, একতারা, মাথায় ধম্মিল্ল কিংবা সাঁইবাবার মতো চূর্ণকুন্তল আর বৃত্তাকার নাচ— যাকে বলে চমৎকার এক শো-পিস। গাঁজার মাদকে তুরীয়, তাঁদের সবকিছুই ইয়োরোপ আর আমেরিকার মুক্ত সমাজে ও যৌনস্বাধীনতায় প্রশ্রয় পায়। তাই দেখে এদেশে নতুন গান লেখা হচ্ছে 'বাউল গানের হতেছে প্রচার'। কালাচাঁদ দরবেশ লিখেছেন তাঁর গানে :

বিশ্ববাসী হইল ধনী
তারা বাউলের পরশ পেয়েছে।

কে যে প্রকৃতপক্ষে ধনী হল বলা অবশ্য কঠিন। আজকের বিশ্বায়িত বাউলের ভিজিটিং কার্ডে রয়েছে ই. মেল আর ওয়েবসাইটের নিশানা অথচ দেড়শো বছর আগে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই বাউলদের সম্পর্কে লিখেছিলেন ব্যঙ্গ করে : 'a mad man. A class of beggars who pretend to be mad on account of religious fervour, and try to uphold their pretention by their fantastic dress, dirty habits and queer philosophy of their songs.'

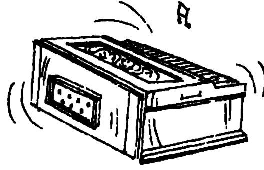
আজকের পট পরিবর্তনে অবশ্য বিশ্ব পরিক্রমার বহর বেড়েই চলেছে। সেখানে 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' বেশ দেখা যায়। বাউলদের বিদেশি মঞ্চেগান পরিবেশনে যাওয়া-আসা নিয়মিত। একেই কি বলব বাউল গানের বিশ্বায়ন? উলটোটাও সত্যি— যেমন দেখি বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে সাধন দাসের আখড়ায় এসে ডেরা কেটেছেন জাপানি মেয়ে মাকি কাজুমি। বিশুদ্ধ তান মান লয়ে গাইছেন তত্ত্ববহুল লালন-গীতি একতারা আর ডুবকি বাজিয়ে স্বচ্ছন্দ দক্ষতায়। এদিকে কলকাতার শহরে মঞ্চে নাগরিক সান্নিধ্যে গ্রাম-বাউল কার্তিক দাস গানের মুখপাতে সদম্ভে বলে : 'এখন যে গানটা গাইব এটা গেয়েছিলাম ফ্রাঙ্কফুর্টে—ওরা খুব সমাদর করেছিল।' মুশকিল যে, ওরা তো সবই সমাদর করে। রবিশঙ্কর আলি আকবরের বাজনা, আমজাদের নিমীলনেত্র পরিবেশন, অমিতা দত্ত-র নাচ, জগজিতের গজল, অনুপ জালোটার ভজন, সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসংগীত, ভূপেন হাজারিকার বিহুগান, স্বপন বসুর লোকগীতি এমনকি নচিকেতার জীবনমুখী। ওরা একইভাবে মেতে ওঠে লতা-আশার গানে, সলমন-জুহির নাচে, রেমোর বিভঙ্গে কিংবা বাবুল সুপ্রিয় বা শানুর কণ্ঠধ্বনিতে। আসলে এসব তো সংস্কৃতির জনতায়ন, তাতে উৎকর্ষের প্রশ্ন পরে। সবচেয়ে আগে দরকার প্রাপ্তিযোগ্যতা ও অধিকার। প্রেমের চেয়ে প্রতাপ বড়। বিশ্বায়নের চাহিদায় আমাদের ফুটতে হবে। তাদের তালে গাঁথো তোমার লয়।

এতক্ষণ বিশ্ব বাউল বা বাউল বিশ্বের কথা শোনা গেল। দেয়া নেয়া ফিরিয়ে দেয়া-র তত্ত্বও বেশ বোঝা গেল। সবকিছুর মূলে অবশ্য পণ্যায়ন। বাংলার গান এখন আন্তর্জাতিক বাজারে এক বিক্রয়যোগ্য বস্তু। যেমন প্রতীচীর গানের তীব্র ঝোঁক, রুচিহীনতা ও ভিডিয়ো-র বিশেষ নর্তন এদেশে আমদানিযোগ্য পণ্য। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বাঁকুড়ার নবাসন গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ বাউল হরিপদ গোঁসাইয়ের একটা মজার গান। প্যারিস শহরে সরেজমিন দেখেশুনে রঙিন বাউল লিখেছেন :

এসে দেখি আমি এই পেরিস শহরে
দেখছি রঙ্গ বিরঙ্গে অনেক মানুষ
সকলকে নেয় আপন করে।
দেখি তাদের এমনই ব্যবহার
নাহি তাদের কেহ আপনপর

হিংসা নিন্দা নাই অন্তরে
চুম্বন খায় সবাই সবাইকে ধরে।
পুরুষ নারীর নাই কোনো বাধা
এদের অন্তরগুলি বড়ই সাদা
এরা প্রেমে মত্ত সকল সময়
কী ঘরে কী বাহিরে।
তাদের লীলা খেলা বলব কী
যেমন বস্ত্রহারা ব্রজবালা হয় উলঙ্গী
উত্তম প্রেমে মত্ত তারা
রয়েছে নেশার ঘোরে।
হরিপদ কয় সত্যকথা
তোমরা মা জননী স্বর্গের দেবতা।
তোমরা ইন্দ্রপুরী ত্যাজ্য করি
এসেছ এই পেরিস শহরে।।

এই হল অকপট বাউলের বিশ্বদর্শন। বস্ত্রহারা উলঙ্গিনীদের মধ্যে স্বর্গভ্রষ্টা মা-জননীদের খুঁজে পাওয়া—সে কি সহজ গান?



বাংলা গণসংগীতের ধারা

ক্ষুদিরামের ফাঁসি যখন সারাদেশকে উত্তাল করে তুলেছিল ১৯০৮ সালে তখন কি কেউ ভেবেছিল যে এই আত্মদান অমরতা পাবে একটা সহজ বাণী আর সুরে বোনা বাংলা গানে? কিন্তু ঘটেছে ঠিক তাই। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'-র মতো অমোঘ লক্ষ্যসন্ধানী বাংলা গান আর কটা আছে আমাদের? অথচ গানের বক্তব্য কত সরাসরি বুকে ধাক্কা দেয়, সুর ও বন্দিশের সারল্য এত স্বতঃস্ফূর্ত যে সকলেই গাইতে চায়, গাইতে পারে। এ-গান তাই কয়েক প্রজন্মের পরম্পরা পেরিয়ে শতবর্ষের আয়ু পেয়ে যায়। কীসের এই সফলতা? কেমন করে এমন গান তৈরি হয়েছিল? তথ্য অনুযায়ী আজ আমরা জেনেছি বাঁকুড়ার পীতাম্বর দাস এ গানের বাণীকার। সুরটা নেওয়া হয়েছিল পরিচিত এক লোকায়ত গৌরপদাবলি থেকে, যার ধরতাই : 'একবার এস গৌর দিনমণি'।[১] এতেই কী গানটা চিরঞ্জীব হয়ে গেল? মনে হয়, সর্বাংশে তা নয়। গানের ভাববিন্যাসে একটা মর্মস্পর্শী অঙ্গীকার ছিল— দশমাস দশদিন পরে মাসির ঘরে পুনর্জন্মের আকুতি মেশানো। সেই নবজাতকের গলাতে নাকি থাকবে আত্মদানের চিরচিহ্ন, সেই চিহ্নই সনাক্ত করবে মরণহীন চিরবিপ্লবীকে। এমন বিশ্বাসী ঘোষণার সঙ্গে হয়তো আলগাভাবে পুনর্জন্মবাদের দর্শন মেশানো আছে। কিন্তু আমরা, আধুনিকরা, এর থেকে আরেকটা দর্শন নিষ্কাশিত করে নিয়েছি। জেনেছি বিপ্লবী কখনও মরে না, বিপ্লবের জন্মদাগ কখনও মোছে না। একে সব অর্থেই বলব গণসংগীত। কিন্তু এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের কথা নেই বলে কেউ যদি গণসংগীতের কোটা থেকে এমন জনসমাদরের, সর্বগ্রহিষ্ণুতার গানকে, খারিজ করে দেন তবে আমরা নিরুপায়। সমস্যাটা এখান থেকে সুরু করা চলে।

বাংলা গণসংগীত নিয়ে কোনো সদর্থক ভাবনার গোড়াতে আসলে বুঝে নিতে হবে যে, এই বর্গের গান কি আমাদের ঐতিহ্যসংলগ্ন, না ঐতিহ্যছুট? এ-বস্তু কি বিদেশি ছাঁচে দেশি উপাদান, না বিশেষ দেশকাল সমাজ থেকে স্বতঃনিঃসৃত ভাবাবেগের নির্মাণ? কথাটা উঠল, কারণ উনিশ শতকে যখন স্বদেশি গান বাঙালি রচনা করেছিল তখন একটা সংকট ঘনীভূত হয়েছিল, কেননা স্বাদেশিকতা বা স্বদেশ-চেতনা

নাকি বিদেশ থেকে আমদানী করা একটা তত্ত্ব। এদেশে আত্মতত্ত্ব বা পরতত্ত্ব ছিল, অধ্যাত্মচিন্তা ও গুরুবাদও অজানা ছিল না, এমনকি একজাতীয় নাস্তিক্য ও বস্তুবাদ সবলভাবে ছিল ; কিন্তু স্বদেশতত্ত্ব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই ঘোষণা করতে হয়েছিল, 'আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম'। বিশেষভাবে ইংরেজি-শিক্ষিত এলিটিস্টদের চেতনা ও সক্রিয়তা থেকে বাংলা স্বদেশি গানের জন্ম হয়েছে। তার মূলে এমনকি হিন্দুমেলার মতো প্রান্তীয় ধর্মবুদ্ধি কাজ করেছে, তাই বহুক্ষেত্রে মুসলমানরা সেকালের স্বদেশি গানে গলা যোগ করেননি। তবু একধরনের সিদ্ধি ও সচলতা স্বদেশি গান পেয়ে গেছে এবং উচ্চ-শিক্ষিত শহরবাসীদের কাছ থেকে প্রসারণ পেয়ে মুকুন্দদাসের মতো ভ্রাম্যমাণ গণসংযোগের গায়কের সৃজনে উত্তরণ পেয়েছে। স্বদেশি গানের সূচনা ও বিকাশের একটা স্পষ্ট স্তরান্তর এবং শিল্পগত ক্রমোর্ধ্ব চিহ্নও এমনকি লক্ষ করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র রায়, -মনোমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির স্বদেশি গানে ভাববস্তু আর আঙ্গিকের দ্বিধা ও সংকট স্পষ্ট। তার সহজ প্রমাণ রয়েছে এই প্রশ্নে যে স্বদেশি গানের উদ্দীপনা ও মর্ম কীসে সঠিকভাবে ফুটবে— রাগসংগীতের বন্দিশে, না ইয়োরোপীয় স্বরক্ষেপণের উচ্চাবচ ধরনে? এই দ্বিধা বা দ্বিচারিতা একেবারে কেটে যায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের আশ্চর্য সাংগীতিক প্রতিভার স্পর্শে। খাঁটি দেশজ লোকায়ত সুরের ছাঁচে বাণী বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি গান সৃষ্টি করলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তৎসম শব্দবহুল ধ্বনিময় গানে বিলিতি সুরের ওজঃ আর পৌরুষ মিশিয়ে একটা নির্মাণের অভিনবত্ব আনলেন, সঙ্গে বাংলা গানে এই প্রথম সংযোজন হল সম্মেলক ধরন বা কোরাস। এটাই স্বদেশি গানের উত্তরণ বা ক্রমোর্ধ্ব শিল্পিতার চিহ্ন। এই চিহ্ন ফুটে ওঠার কারণ হল সত্যিকারের আর্টিস্টের সৃজনসামর্থ্য যুক্ত হয়েছিল স্বাদেশিক আবেগের সঙ্গে। এ জাতীয় গান সকলের আবেগকে নাড়া দিয়েছে, সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়েছে। সেইজন্যই বঙ্গ-ভঙ্গের তাৎক্ষণিক আবেদন পেরিয়ে আজও রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশি গান আমরা গাই। গণসংগীতে সেই কালোত্তীর্ণ স্বভাবের লক্ষণ বা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্যতার সিদ্ধি ঘটেছে কিনা সে-প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে ওঠে। এখনই তার উত্তর দেবার আবশ্যিকতা নেই, কথাটা বিশ্লেষণের টানে ক্রমে স্পষ্ট হবে। কিন্তু আদপে সৃষ্টিগতভাবে বা গ্রহণীয়তায় স্বদেশি গানের মতো গণসংগীত কি কালজয়ী হতে পারে— এমনতর প্রশ্ন কিছুটা দ্বান্দ্বিক। কেননা গণসংগীতের প্রসঙ্গ কেবলই পাল্টে যেতে পারে, যেহেতু যে-রাজনৈতিক মতাদর্শের লাইনে গণসংগীত বাঁধা হয়, দলের লাইন পাল্টালে তার তাৎপর্য ও প্রচারমূল্য কমে যায়। এইভাবে যে-গান মূল্য হারায় তাঁতো সমকালেই প্রচার পায় না, গান হিসাবে নির্মাণের সফলতা পেলেও, ভবিষ্যতে আর কি তার পুনরুত্থান সম্ভব? অথচ তুলনামুলকভাবে স্বদেশি গান বিশ্বাসের প্রশ্নে এবং প্রসঙ্গের অপরিবর্তনীয়তায় চিরন্তন। 'ধনধান্য পুষ্পভরা' এক আবেগময় স্বদেশি গান, যার বক্তব্য, অতিকথন সত্ত্বেও, সকল স্তরের স্বদেশপ্রেমিকের পক্ষে চিরকাল আদরণীয় ও কণ্ঠধার্য হতে বাধা নেই। গণসংগীতের জোরটা যেহেতু বক্তব্যে, বিশ্বাসে বা থিমে তাই মজ্জাগতভাবে তাতে ক্ষণিকতার বীজ থেকে যায়। কেননা রাজনীতির প্রশ্ন আজ আন্তর্জাতিকতা এবং স্ট্র্যাটেজি-ঘটিত, কাজেই অবস্থা বা অবস্থান অনুযায়ী সেখানে কৌশল পাল্টাতে হয়, তাতে সুন্দর বা রসোত্তীর্ণ গানও প্রত্যাহার করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হেমাঙ্গ বিশ্বাস যেসব জনযুদ্ধের গান লিখেছিলেন, পরে নিজেই সেজন্য অনুশোচনা ও লজ্জা প্রকাশ করেছেন। তিনি এমনকি এটাও লক্ষ করেছেন যে, দুর্ভিক্ষ নিয়ে বাঁধা গণসংগীতে অভিযোগের তীর উদ্যত ছিল মজুতদারদের দিকে, অথচ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শোষণের দিকে অভিযোগ জাগেনি।

স্বদেশি গানের ক্ষেত্রে এমন কৌশলগত গান রচনা বা পরে তার জন্য ভুল স্বীকারের প্রয়োজন ঘটে

না। কারণ বাংলা স্বদেশি গান রচনার উৎস রাজনৈতিক দলের নিজস্ব বিশ্বাস নয়, তাতে একটা পরাধীন দেশের পক্ষে সার্বিক সর্বজনগ্রহণীয় বক্তব্য থাকে। স্বদেশের কিছু অতীত গৌরববাহিনী বর্ণনা, বর্তমানের শোচনীয়তার জন্য খেদ এবং নবচেতনার জাগরণের আশা, এই হল স্বদেশি গানের থিম। ত্যাগ, বীর্য, আত্মদান, বিদেশি দ্রব্য বর্জন, স্বদেশি শিল্পের সমাদর, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, এসব কথাই গানে বোনা থাকে। তবু দৃষ্টি-ভঙ্গীর ভুল কোথাও কোথাও ঘটে যায়। স্বদেশি গানের সফল রচয়িতা ও পুরোধাপুরুষ দ্বিজেন্দ্রলালও লিখে বসেন :

তুমি তো সেই তুমি তো মা সেই
চির-গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা।
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব, গরিমা;

তুমি তো মা আছ তেমনই উচ্চ, আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ,
তোমারি অঙ্গে লভিয়া জনম, জানি না কি পাপে এ তাপ সহি মা।

এখানে গীতিকার স্বদেশজননীকে চির-গরীয়সী মূর্তিতে স্থিত রেখে নিজেদের বর্তমান হীনতাবোধকে বড় করে ধরেছেন এবং 'কি পাপে এ তাপ' তার সংগত মীমাংসা করতে পারেননি। তার কারণ যে ব্রিটিশের শোষণ সে কথাটা উহ্য থাকার ফলে গানের বেদনা শুধু কারুণ্যেই শেষ হয়, আত্মউজ্জীবনে গভীর হয় না। তাই গানের অসহায় শেষ উচ্চারণ :

তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব, আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব,
তুমি কি করিবে তুমি তো মা সেই মহিমা-গরিমা-পুণ্যময়ী মা!

প্রশ্ন উঠবে না কি যে, এ কেমন মা? নিষ্ক্রিয় অথচ চিরপুণ্যময়ী এমন নির্বিকার দেশজননী কোন্ সংগ্রামে তাঁর ভক্তসন্তানকে প্রেরিত করতে পারেন?

অবশ্য সব স্বদেশি গান তো এমন নয় আমাদের। ব্রিটিশের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক শোষণ সম্পর্কে সচেতনতা উনিশ শতকের স্বদেশি গানে অনেক আছে। তার কারণ তখনকার ইংরাজি-শিক্ষিত গীতিকাররা ১৮৬৭ সালে দাদাভাই নৌরজীর লন্ডন-বক্তৃতার মর্ম জানতে পেরেছিলেন, ১৮৭২ সালে কৃষ্ণমোহন মল্লিকের *A Brief Survey of Bengal Commerce* বই পড়েছিলেন (যার বক্তব্য 'ভারতবর্ষের বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ভারতবর্ষ পূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইতেছে') এবং তার তথ্যগত প্রতিবাদ পড়েছিলেন ভোলানাথ চন্দ্রের 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'-এ।*

এখানে বলে নেওয়া দরকার যে স্বদেশি সংগীত বা গণসংগীত যাঁরা লেখেন তাঁরা সবসময়ে প্রথম শ্রেণির গীতিকার না-ও হতে পারেন, কিন্তু বিশেষ সময়ের বা সংকটের স্বরূপ যদি রূপ পায় সে-গানে তবে তা জনপ্রিয় হয়। পরে নান্দনিক বিচারে বা সংগীতের মূল সূত্র বিশ্লেষণ করলে এমন সব জনচিত্তজয়ী গানে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়তে পারে কিন্তু তাতে সে গানের অন্তর্নিহিত শক্তি বা উজ্জীবনের গর্বগৌরব কমে না। এমনই এক গান লিখেছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দাস :

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হ'ত যদি

---

* ভোলানাথ চন্দ্র মনে করতেন, 'ইংরাজ বণিকগণই অধিকাংশ ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহারাই অর্থ উপার্জন করিতেছেন, স্বদেশীরা কিছুই পাইতেছেন না। অনেক স্বদেশীয় শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখিলে দেশ যে দিন দিন দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে সন্দেহ থাকে না।'

পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
এই যে ক্ষেতে শস্যভরা, তোমার তো নয় একটি ছড়া,
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয়?

তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গুষ্টি,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি— জগৎভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়।

এই হল সঠিক সময়ের দলিল, শোষিত ভারতীয়ের আন্তরিক খেদ এবং আত্মচেতনার চাবুক। এরসঙ্গে মিলিয়ে পড়ে নেওয়া যায় দাদাভাই নৌরজীর লণ্ডন বক্তৃতা, যাতে বলা হয়েছিল :[২]

The drain of India's wealth on the one hand, and the exegencies of the State expenditure increasing daily on the other, set all the ordinary laws of political economy and justice at naught, and lead the rulers to all sorts of ingenious and oppessive devices to make the two ends meet....

The chief cause of India's poverty, misery and all material evils, in the exhaustion of its previous wealth, the continuously increasing exhausting and weakening drain, from its annual production... and the burden of a large amount year to be paid to foreign countries for interest on the public debt, which is chiefly caused by the British rule.

তবু ঘটনা এটাই যে বাংলা স্বদেশি গানে ব্রিটিশ শোষণের প্রসঙ্গ এসেছে নিতান্ত শীর্ণ খাতে বয়ে। তার প্রধান উচ্ছ্রিত ঢল ছিল দেশপ্রেমের তীব্র আবেগ আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা। তাতে সংগ্রামের শপথ কিংবা রক্তঋণ শোধের অঙ্গীকার ততটা নেই, যতটা আছে পরাধীনতার জ্বালা।

বাংলা গণসংগীত সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে স্বদেশি সংগীতের ভূমিকা বা সৃজনগত তত্ত্ব নিয়ে এতক্ষণকার বিশ্লেষণের বিস্তারে একটা সাধারণ সূত্র আছে। কেউ কেউ এমন ভেবেছেন যে স্বদেশি গানই যেন গণসংগীতের আগের ধাপ। কথাটা কোনো অর্থেই ঠিক নয়। অবশ্য এটা ঠিক যে চল্লিশের দশকের আগেপিছে যাঁরা এদেশে মার্ক্সবাদী আন্দোলনে বা ব্যাপকঅর্থে কমিউনিস্ট ভাবনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকে অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লববাদী দল-উপদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গণসংগীত রচনা বা গাইবার অব্যবহিত আগে চল্লিশের অনেক গণশিল্পী গাইতেন স্বদেশী সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত। তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে এই তথ্য পাই। কিন্তু বিশ আর তিরিশের দশকে রচিত নজরুলের কিছু গানকে ব্যতিক্রমী ধরেই বলা যায়, বাংলা স্বদেশি সংগীতে শ্রেণিসংগ্রাম বা রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা তেমন করে আসেনি, মজুতদার বা মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাও আসেনি, আসেনি আন্তর্জাতিক বিশ্বের উকিঝুঁকি। ঐতিহাসিক কালগত কারণেই আসেনি। কিন্তু গণসংগীত যেভাবে হঠাৎ এলো, সবরকম সম্ভ্রম আর ভাবাবরণ ভেঙে, তার দুর্বার বক্তব্য চমকে দিল অনেককে। আমি এখানে সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভিন্ন সময়ে লেখা দুটি গান থেকে গণসংগীতের প্রসারণ রেখা বোঝাব। তেভাগা আন্দোলন নিয়ে সলিল লিখলেন :

হেই সামালো ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো

জান কবুল আর মান কবুল
আর দেব না আর দেব না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।

যারা কেড়ে খায় মুখের গ্রাস তাদের বিরুদ্ধে শোষিত কৃষকের অন্তর্বেদনার গান এবং প্রতিরোধের সঙ্কল্প-দৃঢ়তা এই গানের সহজ লক্ষ্যভেদী বাণী আর তেজি সুরের ঝাঁঝে সার্থক গীতিরূপ পেয়েছে। গানের পরের অংশে সাদা হাতির কালো মাহুতের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় শ্বেতাঙ্গ বিদেশি প্রভুদের মদতে স্বদেশি শাসক, জমিদার-জোতদারবর্গের কথাই এসেছে। তবু কাস্তেটা শান দেবার মূল উদ্দেশ্য যেন কিছুটা প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। কিন্তু ফ্যাসিবাদী দস্যুদের বিরুদ্ধে সেই প্রচ্ছন্নতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট করেই হেমাঙ্গ লেখেন :

তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান
কিষাণ ভাই রে।
ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান— রে।।

কাস্তের এই দুরকম ব্যবহারের ইঙ্গিতে গণসংগীত একটা অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। তা যেন স্পর্শ করে সংগ্রামের জন্য ব্রতবদ্ধ এক অঙ্গীকারকে।

এমন চমৎকার গানটা (মূল গানের সুর [সারিগান] 'সাবধানে গুরুজীর নাম লইও রে সাধু') প্রসঙ্গ ভ্রষ্ট হয়ে যায় শেষ অন্তরা-য়, যখন গীতিকার লেখেন—

এক হয়ে আজ দাঁড়াও দেখি মজুর কিষাণ
এক নিমেষে আসবে স্বরাজ, ঘুচবে অপমান রে।

গানের আগাগোড়া কোথাও মজুরের কথা ছিল না, হঠাৎ শেষ অংশে মজুর-কৃষাণ ঐক্যের বাঁধা বুলি এবং স্বরাজ-প্রসঙ্গ সব বিন্যাস ভেঙে দেয়। হেমাঙ্গ নিজে অবশ্য গানটি সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা রাখতেন। কিন্তু সে-সময় গণসংগীত রচনার সীমাবদ্ধতা বা স্ববিরোধ সম্পর্কে তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন যে তখনকার গানে—[৩]

> প্রধানত যা থাকতো তা হচ্ছে একদিকে জাপবিরোধিতা, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ নিয়ে আমরা প্রচুর কান্নাকাটি করেছিলাম। কোনো সংগ্রামের কথা থাকতো না সেই গানে, আর সমাধানের পথ হিসাবে থাকতো ধর্মগোলা তৈরির আর মজুতদার বয়কটের কথা। ঐটাইতো পার্টির লাইন তখন। ময়মনসিংহের শরৎনাথের অতি চমৎকার গান 'আইলরে চৈতন্যের গাড়ি সোনার নদীয়ায়'-এর সুরে আমি লিখেছিলাম :
>
> ঘোর কলিকাল আইল আকাল সোনার বাংলায় হায় হায়,
> ক্ষুধার অনল ধিকিধিকি দিকে দিকে ধায়।
> ক্ষুধায় পাগল মানুষ ঘুরে ফিরে
> মায়ের বুকে দুধের ছাওয়াল মরে অনাহারে
> মৃত সন্তান বুকে লইয়া কন্দে বাপ মায়। হায় হায়।
>
> 'ঘোর কলিকাল'— এ কথা কোনো কমিউনিস্ট বলতে পারে? দুর্ভিক্ষটা কি দৈবের ব্যাপার নাকি?

কমিউনিস্ট বলে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এমন আত্মধিক্কার আজকে আমাদের আশ্চর্য করে, কেননা গানের

গোড়ায় 'ঘোর কলিকাল' শব্দটি শ্রোতাদের কেউ কি মনে রাখেন গানটি শোনার সময়? তবু গীতিকারের পরবর্তী সময়ের আত্মশোচনার কারণ তাঁর কমিটমেন্ট এবং অন্যতর রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার ফল বলেই মনে হয়। আর, 'কলিকাল' তো একটি নির্দিষ্ট কালের পৌরাণিক প্রতীকী ব্যঞ্জনা মাত্র। যে-কালপর্ব ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম, সত্যাসত্য, মানবিক মূল্যবোধ লুপ্ত হয়ে যায়, সেই কালপর্বকেই তো 'কলিকাল' বলে। সুতরাং কমিউনিস্টরা যুদ্ধ-মন্বন্তরের অভিঘাতে সৃষ্ট নৈরাজ্যময় সময়.ও পরিবেশকে 'কলিকাল' রূপে অভিহিত করতে পারবেন না কেন? হেমাঙ্গবাবুর এই আত্মসমালোচনা তাই খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

যাহোক, গণসংগীত একটা পর্বে, তার সূচনার সময়ে, কতকগুলি সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ছড়ানো আছে বহু রচনায় যা থেকে বোঝা যায়— প্রথম পর্বে এবং পরেও, সংশয় ও বিতর্ক ছিল গণসংগীতের বক্তব্য, বিশেষত পরিণতির ভাষ্য নিয়ে। তা নিয়ে অনেক কৌতুককর উদাহরণও আছে। তবু শেষপর্যন্ত গণসংগীত একটা স্পষ্ট ইতিবাচক সত্যে ও শপথে দাঁড়াতে চেয়েছে। তার লক্ষ্যে কোনো দ্বিধা ছিল না। যা ছিল, তাকে বলা যায় একই সঙ্গে গানকে গণমুখী ও সাংগীতিক ধর্মে স্থিত করার আকুলতা।

২

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় তার প্রধান দুটি ধারা রাগসংগীত ও লোকসংগীত। অনেকে বিশ্বাস করেন যে আমাদের মৌল রাগ-রাগিণীর গঠনে লোকসংগীতের সুর-কাঠামোর বেশ কিছু উপাদান আছে। সে যাই হোক, মোগল আমল থেকে প্রধানত ভারতীয় নানা প্রাদেশিক গান জেগে ওঠে। একদিকে যেমন ইসলামি সংক্রামে এলো টপ্পা, ঠুংরি, খেয়াল, গজল বর্গের সংগীতরূপ, তেমনই পরে জেগে উঠল ভজন ও কীর্তন। এই সব গীতাঙ্গিকের একটা প্রধান লক্ষণ হলো ব্যক্তির মনোভাবকে গানে ব্যক্ত করা। আমাদের দেশে তেমন কোনো সম্মেলক সুর-কাঠামো নেই। যেন একক শিল্পীর আনন্দ-বেদনা, তার অন্তর্নিহিত আবেগকে প্রকাশ করাই ভারতীয় গানের নিজস্ব ধরন। সেই জন্যই আমাদের গানে Improvisation বা সুরবিহারের অবাধ স্বাধীনতা, যা শিল্পীর ব্যক্তিগত মর্জি বা একক গুরুর ঘরানা-কেন্দ্রিক। এই বিশিষ্ট অর্থেই আমাদের গান নির্জনের গান। সকলের কণ্ঠের উপযোগী গান রচনার প্রবণতা বা ঐতিহ্য আমাদের বহুদিন নেই। গানে মেলোডির ব্যবহার ব্যক্তি-শিল্পীর সাধনাসাপেক্ষ অর্জন। তা সকলের পক্ষে সমান পর্যায়ের হতে পারে না, কারণ মেলোডি ব্যক্তিভেদে আলাদা রূপ নেয়। হারমনির ব্যবহার আমরা জানি না। ইয়োরোপ এদিক থেকে অনেকটা অগ্রণী ও বাস্তবোচিত ভাবনার পরিচয় রেখেছে সুর-কাঠামোয় মেলোডির চেয়ে হারমনির প্রাধান্য দিয়ে। আমাদের লোকসংগীতে তবু কিছুটা সম্মেলক গানের চল ছিল। কিন্তু উচ্চবর্গের গানে ব্যক্তিতন্ত্রতার ঝোঁক বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সেই জন্যই ভারতীয় গানের মূল প্রসঙ্গ হল ভগবৎপ্রণয় ও ব্যক্তিপ্রণয়। সুরের সূক্ষ্মতম বিন্যাসে, রাগরূপের গুরুমুখী সাধনায় ব্যক্তির গান আমরা ভালোবাসি। সেই গানের যে অন্তর্লীন বাণী তা আসলে কবিতার বিষয়। সবাই জানেন, আমাদের বিভিন্ন প্রাদেশিক গীতিধারার জলাভূমি থেকে জেগে উঠেছে নানা ভাষার কবিতা, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। কবিতা ও গানের এমন যমজ সম্পর্কের জন্যই আমরা গানের ভেতরকার কবিতা সহজে আস্বাদন করতে পারি (বৈষ্ণব গান, শাক্ত গান, বাউল গান তো আমরা কবিতা হিসেবে পড়ি এবং উচ্চতর শ্রেণিতে পড়াই) এবং কবিতা লিখে তাতে সুর দিয়ে গানে পরিণত করি। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ রেখে যেতে চাই, বাংলা গণসংগীতের একটা বড় অংশ কবিতায় সুরারোপ করে গড়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য,

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস থেকে হাল আমলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তারও অনুজ অনেকের কবিতা থেকে গণসংগীতের সম্ভার তৈরী হয়েছে।*

কিন্তু সমস্যা এটাই যে, ইংরেজ আসবার আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে গণগানের কোনো ভিত্তি বা প্রস্তুতি ছিল না এবং প্রণয় বা অধ্যাত্মবিষয় ছাড়া উন্নত ভাবনার গানও ছিল না। উনিশ শতকে প্রথম তৈরি হল ধ্রুপদ কাঠামো সামনে রেখে ব্রহ্মসংগীত রচনা। ধ্বনিবহুল তৎসম শব্দসম্ভারে গম্ভীর ব্রহ্মসংগীতের সুরবিন্যাসের মূলে ধ্রুপদ অনুসৃত হবার ফলে এ-গানের চাল হল ধীরগতির, লম্বা লম্বা তালে গেঁথে। এমন ধরনের গানে সিদ্ধি পেতে যেমন দীক্ষিত স্বরক্ষেপণ ও নিয়ন্ত্রণ লাগে তেমনই শব্দ উচ্চারণের জন্য লাগে শিক্ষিত মনের মার্জনা। তাই কোনোভাবে ব্রহ্মসংগীত সকলের গান হতে পারেনি। তাছাড়া ব্রহ্মসংগীতের থিমে ব্রাহ্মদের নবলব্ধ ব্রহ্মধারণা রূপ পেয়েছিল, তা একমাত্র ব্রহ্মবাদে বিশ্বাসীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল। এসব কারণে, বহুসময় সম্মেলক কণ্ঠে গীত হলেও, ব্রহ্মসংগীত আমাদের সম্মেলক মনের ভাবনাকে ধরেনি। তা রয়ে গেছে সমুচ্চ উপাসনা গানের শুভ্রতা নিয়ে একক ও মর্যাদাবান।

এরপরে আমাদের উচ্চবর্গের সমাজে যে নতুন ভাবধারা এলো তাকে দেশাত্মবোধ (Patriotism-এর বাংলা) বলা হয়েছে। এই ভাবধারা নাকি বিদেশ থেকে আমদানী করা, অনেকের মতে। স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বজাতির প্রতি মর্যাদাখ্যাপন এর মূল কথা। তার সঙ্গে জড়িয়ে গেল ঔপনিবেশিক শোষণ-চক্রান্ত এবং আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্ন। নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি, স্বদেশিয়ানার চর্চা শুরু করলেন, যার ফলে আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে স্বদেশি ভাবনার একটা নতুন তার জোড়া হল। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল স্বদেশি গান। এই গানের মূল ঝোঁক ছিল আত্মউদ্দীপনা থেকে সামূহিক জাগরণের দিকে।[8] বাংলা গানে সেটা একটা নতুন ব্যাপার। সামূহিক জাগরণের প্রশ্নে জড়িত বলে স্বদেশি গানের বাণী ও সুরে একটা সারল্যের প্রয়াস ছিল। সব স্বদেশি গানে হয়তো তা হয়নি কিন্তু ঝোঁকটা ছিল সেইদিকে। অচিরে এসব গান পরাধীন বাঙালির মর্মবেদনার মধ্যে নিজের আসন পাতলো। ব্রহ্মসংগীতের মতো উপাসনাকক্ষ ও উপাসকদের মধ্যে বৃত্তবন্দী না থেকে স্বদেশি গান সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। উচ্চবর্গ থেকে মধ্যশ্রেণিকে ছুঁয়ে স্বদেশি গানের ধারা পূর্ববঙ্গের গ্রামগ্রামান্ত পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কণ্ঠে পৌঁছে গেল। মুকুন্দদাস, মনোমোহন চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও অশ্বিনীকুমার দত্তের ভূমিকা এক্ষেত্রে অবিস্মরণীয়। কিন্তু স্বদেশি গানের প্লাবন এলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সুবাদে ১৯০৫ সাল বরাবর। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তের মতো সিদ্ধ গীতিকার নেমে এলেন পথে, তাঁদের নতুন লেখা স্বদেশি গানের অর্ঘ্য সাজিয়ে। এই প্রথম বাংলা গানের সঙ্গে পথের যোগ ঘটল। বাংলা দেশের হৃদয় হতে আপনাআপনি জেগে ওঠা গানের নতুন ধারা সকলের মনের কথাকে মেলে ধরল। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' কিংবা 'বঙ্গ আমার জননী আমার' কিংবা 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' হয়ে উঠল সকলের গান। পাশাপাশি কিছু পরে দ্বিজেন্দ্রলালের নানা নাটকের বহুল জনপ্রিয় মঞ্চায়নে স্বদেশি গানের রূপায়ণ ও অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল।

স্বদেশি গানের ধারাপ্রবাহ বঙ্গভঙ্গের উত্তেজনাকে আশ্রয় করে জেগে উঠে অনেক বছর চলল, কিন্তু ক্রমে পরাধীন ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন নানা আকারে ঘনিয়ে উঠতে লাগল। ইংরেজের দমননীতি এবং ভারতীয়দের পাল্টা অহিংস ও সহিংস আন্দোলন উত্তাল করে তুলল সারাদেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের ক্রমে আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক

' অজস্র ও বিচিত্র ধরনের নমুনার জন্য দ্রষ্টব্য : 'গণসংগীত সংগ্রহ', সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত। ১৯৯০

হতে বাধ্য করল। কিন্তু একমাত্র নজরুল ছাড়া আর কোনো গীতিকারের কণ্ঠে ও কলমে তখনও আমাদের নতুন ভাবনার গান তেমন করে জাগেনি। ১৯৪০ সালের আগে-পিছে বলতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছুঁয়েই উঠে এসেছে বাঙলার গণসংগীত। তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস হয়তো লেখা হবে একদিন। আপাতত আমরা সেই ইতিহাসের পটভূমিতে কিছু সংঘ, সংগঠন, ব্যক্তি ও তথ্যকে সামনে রাখব।

১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ গঠন প্রকৃতপক্ষে এদেশে গণসংগীতের সূতিকাগার। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় 'অগ্রণী' পত্রিকা আশ্রয় করে কামিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রকাশের প্রকাশ্য সূচনা। তার আগে 'পরিচয়' পত্রিকা থেকেই অবশ্য মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনার সূচনা ঘটে গেছে। তবে বাংলা গণসংগীতের ক্ষীণ অরুণাভাস জেগে ওঠে ১৯৪০ সালে Youth Cultural Institution (সংক্ষেপে Y. C. I.) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। প্রধানত উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা এতে জড়িত ছিলেন। এঁরা নিয়মিত করতেন আলাপ-আলোচনা, অভিনয়, পোস্টার প্রদর্শনী, বিতর্কের আসর এবং গান। এঁদের মধ্যে অনেক উজ্জ্বল মেধাবী ইংরেজীশিক্ষিত প্রতিভা ছিল কিন্তু গ্রামজীবন বা নিম্নবর্গের জীবনের সঙ্গে তাঁদের ততটা সংযোগ ছিল না। এঁরাই কিন্তু বাঙলার প্রথম বামপন্থী সংগঠন, যাঁরা নানা জায়গায় সম্মেলক গান করার রেওয়াজ চালু করেন। রবীন্দ্রনাথের ও নজরুলের স্বদেশী গান ও বিদেশী বিপ্লবাত্মক গান গাইতে গাইতে ক্রমে নিজেরাও গান লিখে ফেলেন।

'বাংলা প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য আন্দোলন কেন ব্যর্থ হলো?' শিরোনামে সৌরি ঘটক এক ধারাবাহিক রচনায় এক জায়গায় ওয়াই. সি. আই-এর গীতিআন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন :[৫]

> এই সব গান গাওয়া হতো বালিগঞ্জের তেতালার ছাদ থেকে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে, বাসে সর্বত্র। দেবব্রত বিশ্বাস, নিখিল সেন, দ্বিজেন চৌধুরী প্রভৃতির নেতৃত্বে এইসব গান গাওয়ার ফলশ্রুতি কী হতো তার একটি নমুনা— জলি কাউলের লেখা 'মজদুর, মজদুর, মজদুর হ্যায় হাম' শুনে একজন প্রশ্ন করেন 'মজদুর কী?'
>
> এই গানের আন্দোলনই পরে নতুন বাস্তবতা নিয়ে বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতিদের গান রচনায় প্রেরণা জোগায়। [চিন্মোহন সেহানবীশের স্মৃতিচারণা] কিন্তু এত সত্ত্বেও এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠত তা বলা শক্ত, যদি না ১৯৪৩-এ শুরু হতো মন্বন্তর।

অবশ্য ১৯৪৩ সালের আগে ১৯৪২-এর জুলাই মাসে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'জনযুদ্ধের গান'। আজ সেসব রচনা সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও সেসময়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা পায়।

ইত্যবসরে সারা দেশের গভীর স্তরে নতুন গানের জন্য চিত্ত পিপাসিত হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশকের সূচনাকালে বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস বিপুল প্রভাব জাগেনি। অথচ ইতিমধ্যে রজনীকান্ত (প্রয়াণ ১৯১০), দ্বিজেন্দ্রলাল (প্রয়াণ ১৯১৩) ও অতুলপ্রসাদ (প্রয়াণ ১৯৩৪) বিদায় নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ (প্রয়াণ ১৯৪১) নজরুল (১৯৪২ সালে বাক্ ও চলচ্ছক্তিহীন), অজয় ভট্টাচার্য (প্রয়াণ ১৯৪৩) ও অনিল ভট্টাচার্যের (প্রয়াণ ১৯৪৩) সৃজনপর্ব সমাপ্ত হয়েছে। ১৯২৮ সালে দিলীপকুমার রায় এবং ১৯৩৪ সালে নিশিকান্ত পাকাপাকিভাবে চলে গেছেন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। ফলে বাংলা গানের চলমান ধারায় এক প্রচণ্ড শূন্যতা এসে গেছে সে সময়ে। তার মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার সংকট দেশের স্থিতাবস্থা টলিয়ে দিয়েছে, ঘটে গেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম পর্যায়। সেই সংকট ও অস্থিতাবস্থাকে ধরতে পারেনি আমাদের আধুনিক বাংলা গান। বরং গীতিকাররা তাঁদের গানে নিয়ে এসেছিলেন একধরনের

কাল্পনিক বেদনাবিলাস। স্বরচিত দুঃখের মায়াজগতে তাঁদের গান ঘুরতে লাগল। রুগ্ন রোমান্টিক কোনো বিষাদবোধ, ভ্রষ্টলগ্ন প্রেমের জন্য সন্তাপ এই সময়কার বাঙালি কেন এত ভালোবেসেছিল তার কি কোনো কারণ অনুমান করা যায়? বকুল বিছানো পথে কেন পলায়নী মনোভাব নিয়ে চলে গেল আধুনিক গান তা আজ কে বলে দেবে?

ঠিক এই শূন্যতার মঞ্চে যেন রাজার মতো গণসংগীতের অভিষেক হল। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এই এক দশক তার নিঃসপত্ন রাজত্ব। তারপরেই ক্রমপতনের রেখা স্পষ্ট হতে থাকে। সে কথা পরে উঠবে, গোড়ার কথা আগে। চিন্মোহন সেহানবীশের স্মৃতি অনুসারে, আগের ঘটনা এই যে,

> বাঙলা দেশে গানের আন্দোলনের... সূত্রপাত... ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউটের আমল থেকে। সে আন্দোলন ছিল একান্তভাবে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ — মজুর, কিষাণের সংগ্রামের সঙ্গে সে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এই সময়কার কিছু গান নিয়ে কমরেড বিনয় রায় শুরু করলেন তাঁর আন্দোলন। গোড়া থেকে তাঁর লক্ষ্য ছিল কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করা। বিটা কিষাণ সম্মেলন থেকে তিনি কিছু হিন্দী গান আনেন। ভারতভূষণ অগ্রবালের 'বড়ো চলো' গানও ওই সময় পাওয়া গেল। এরই সাহায্যে 'সোভিয়েত সুহৃদ সঙ্ঘ'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধারম্ভের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তিনি মাতিয়ে তুললেন সমস্ত জনসভাকে। এরপরে ডোমার কিষাণ সম্মেলনে তাঁর উত্তরবঙ্গের ভাষায় লেখা গেরিলা গান 'হই হই হই' চাষীদের মাঝে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করল। মফস্বল থেকেও গান আসতে থাকল কিছু কিছু। বোম্বাই থেকে লেখা হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি হিন্দী গানও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গানের আন্দোলন যে মধ্যবিত্তের আওতা থেকে ক্রমে জনসাধারণের দিকে এগোচ্ছে তার আর এক প্রমাণ বিভিন্ন জেলার চলিত ভাষায় গান রচনা। মৈমনসিংহের হাজং নামক আদিম জাতির মধ্যে জনযুদ্ধের গান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ...মিশনারীদের প্রভাবাধীন গারোদের মধ্যেও এই সুরের ছোঁয়াচ লেগেছে।[৬]

নানা কারণে গণসংগীতের পুরোধা-পুরুষ রূপে বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৫)-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, রংপুরে। আদি বাড়ি পাবনায়। দেশ বিভাগের পরে তাঁর পিতা ছাড়া পরিবারের সবাই পাকাপাকিভাবে চলে আসেন কলকাতা। শিশুকাল থেকে সুকণ্ঠ গায়ক, যদিও গানে সেভাবে দীক্ষিত নন। কৈশোরে ছিলেন 'যুগান্তর' দলে। কলকাতায় এসে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে জড়িয়ে পড়েন, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৩৬ সালে আমেদাবাদ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করেন। ১৯৩৯ সালে বেলেঘাটায় চটকল কর্মীদের মধ্যে কাজ করেন। ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক ও সংগীত শাখার কাজে যুক্ত হন। সেই সময় গণসংগীত রচনার জোয়ার আসে। সভা-সমিতি-সমাবেশে বিনয় রায়ের মন্দ্রকণ্ঠের গণসংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মালাবারের কায়ুর কমরেডদের হত্যার স্মৃতিতে লেখা বেদনাবিধুর তাঁর গান 'ফিরাইয়া দে কায়ুব বন্ধুরে'* মুখে মুখে জনপ্রিয় হয়। কে. এল. আব্বাসের 'ধরতি কে লাল' এবং ঋত্বিক ঘটকের 'লেনিন' চলচ্চিত্রের জন্যেও তিনি গান লেখেন।

বাংলা গণসংগীতের এমন এক অগ্রণী কর্মীকে হঠাৎ ১৯৫০ সালে পার্টির নির্দেশে আত্মগোপন করে সোভিয়েত দেশে চলে যেতে হয়। তিনি ছিলেন মস্কো-বেতারকেন্দ্রে বাংলা বিভাগের সংবাদ-পাঠক। ১৯৫৯ সালে তিনি ভারতে ফেরেন এবং ১৯৬০ সালে দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ-ভাষার আংশিক সময়ের শিক্ষকরূপে এবং ১৯৬৫ সালে 'Institute of Russian Studies'-এর

* এই গানটাই একটু বদলে শম্ভু মিত্র পরে ব্যবহার করেছেন 'চাঁদ বণিকের পালা'-য়।

অধিকর্তা রূপে কর্মে ব্রতী হন। ১৯৭৫ সালের ৩রা জুলাই মস্কো শহর এক পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারান বিনয়। আশ্চর্য যে অমন সুকণ্ঠ গায়কের কোনো গ্রামোফোন রেকর্ড নেই।

বিনয় রায়ের জীবন-বিবরণ কিছুটা বিস্তারে জানাবার কারণ, তাঁর জীবন-কথা সাধারণ্যে ততটা প্রচারিত নেই। তাঁর স্ত্রী জয়া রায়-এর লেখা একটি রচনা থেকে উপরের তথ্যগুলি সংকলিত হয়েছে। গণসংগীত সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি কতটা সঠিক ছিল তার প্রমাণ মেলে বিনয় রায়ের একটি গদ্যরচনায়। সেখানে এক জায়গায় বলেছেন তিনি :

এ শুধু 'স্বদেশী' আমলের স্বাদেশিকতার পুনরুজ্জীবন নয়। বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের সঙ্গে এই গানের মধ্যে এসে মিলেছে ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে রুখবার দুর্জয় সংকল্প, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আর মজুর-কিষাণের জীবন ও সংগ্রামের কথা। ফলে আরও সমৃদ্ধ ও সুসঙ্গত হয়ে উঠেছে সেদিনকার স্বাদেশিকতা। তাই এই গানের সহজ ও জোরালো কথার মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে ভারী সংস্কৃতির ইঙ্গিত।

মনে রাখতে হবে, বিনয় রায় একজন বিচ্ছিন্ন একক-ব্যক্তি ছিলেন না। ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি সাংস্কৃতিক কাজকর্ম দেখার জন্য চিন্মোহন সেহানবীশ, বিনয় রায় ও সুধী প্রধানকে নিয়ে একটি সেল করে।** ১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সময়কালে প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য সংঘ ঘিরে গণসংগীতের জোয়ার আসে। ১৯৪৮ থেকে ৫১-র মধ্যে এই আন্দোলনে প্রথম বিপর্যয় আসে, তারজন্য দায়ী পার্টির রাজনৈতিক লাইন ও সাংগঠনিক পরিস্থিতি—এমন মতামত কারোর কারোর স্মৃতিকথায় আছে। চিন্মোহন সেহানবীশ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যেমন : [৭]

> আই. পি. টি. এ-তে তখন dominantly দুটো মতের সংঘাত ছিল। একটার প্রবক্তা ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় রায় প্রমুখ। এঁদের মত ছিল গণনাট্যের গান, নাটক নিয়ে যেতে হবে গ্রামে, হাটে, মাঠে, মানুষের কাছে। এতে শিল্পোৎকর্ষগত পূর্ণতা যদি না আসে তো ক্ষতি নেই। অন্য মতের প্রতিনিধিত্ব করতেন শম্ভু মিত্র। তাঁর বক্তব্য ছিল Finished Product নিয়ে, নিউ এম্পায়ারের মতো হলে যা দর্শকদের দেখাতে হবে।
>
> তখন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের উপর পার্টির নেতৃত্ব ছিল, দৈনন্দিন কাজ করার জন্য অফিস ছিল, সমস্যা উঠত, সমাধান করার জন্য চেষ্টা করা হতো দুটো মতের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে। এরপরে ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ পার্টি বে-আইনী হলো। আমাকে পার্টি কালচারাল ফ্রন্ট থেকে সরিয়ে নিল। আমার উপর নির্দেশ এল ৪৬ নং ধর্মতলায় না যাওয়ার। সে সময় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের

** সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রয়াত চিন্মোহন সেহানবীশের অপ্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৯৪১ সালেই কমিউনিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম গঠন করে একটি প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক ইউনিট। প্রবন্ধে উল্লিখিত ঐ তিনজন ছাড়াও ইউনিটের সদস্য ছিলেন কবি-সাহিত্যিক অনিল কাঞ্জিলাল এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

* চিন্মোহন সেহানবীশ ১৯৪৮ সালের মধ্যে ধরা পড়েননি। সন-তারিখের এই ভ্রান্তি ঘটেছে সম্ভবত তাঁর স্মৃতি-বিভ্রমের ফলে অথবা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী লেখক-বন্ধু সৌরি ঘটক-এর অসতর্কতার জন্য। কারণ আমরা জানি, ১৩৫৫ সালের শ্রাবণ মাসে (জুলাই-আগস্ট, ১৯৪৮) বিষ্ণু দে-র উদ্যোগে 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশিত হলে ঐ পত্রিকার সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রশ্নে পার্টিলেখকদের মধ্যে যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় সেই বিতর্কে চিন্মোহন অংশগ্রহণ করেছেন, 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৫৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (নভেম্বর, ১৯৪৮) তিনি লিখেছেন ঐ বছর পোল্যাণ্ডের ব্রাসলাভে অনুষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে ভিত্তি করে 'সংস্কৃতির আহ্বান' শীর্ষক একটি নিবন্ধ। আর, ১৯৪৯ সালের ২২-২৪ এপ্রিল কলকাতায় প্রগতি লেখক সংঘের যে চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি সক্রিয় ভূমিকায় থেকে আলোচনার জন্য পেশ করেছিলেন অতি-বামপন্থী হঠকারী রাজনৈতিক লাইনকে ভিত্তি করে রচিত তাঁর সেই বহুবিতর্কিত 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' নামক নিবন্ধটি। এর পরেই, সম্ভবত ১৯৪৯ সালের জুন মাসে তাঁকে নিরাপত্তামূলক আইনে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়।

ভার কিন্তু বিনয় রায় বা সুধী প্রধানকে দেওয়া হলো না। বিনয় রায়কে বলা হলো তিনি যেন রটিয়ে দেন যে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন এবং নিজেকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। বিনয় রায় তাই করলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি পূর্ব পাকিস্তান দিয়ে মস্কো চলে গেলেন। আর সুধীবাবুর সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমি ধরা পড়লাম ১৯৪৮ সালের জুন মাসে।* এইভাবে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতৃত্ব ধ্বসে পড়ল।

এদিকে জ্যোতিরিন্দ্র, বিজন ও শম্ভুর সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মেজাজ ছিল না। কারণ ওঁরা ছিলেন শিল্পী। শিল্পী আর সংগঠকদের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে।

যাইহোক এইভাবেই ফ্রন্টটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমি ও বিনয় এই দুজন কর্মীকে একসঙ্গে সরিয়ে নেওয়ায় সবাইকে তা demoralise করল। বলা যায় তখনই ফ্রন্ট physically ভেঙ্গে গেল।

বিনয় রায় কেন সরে গেলেন বা কেন তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হল, দেখা যাচ্ছে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো মানুষও তার দিশা পাননি। হেমাঙ্গ লিখেছেন :[৮]

তবে আমার কাছে সবচেয়ে বেদনাদায়ক মনে হয়েছিলো বিনয় রায়ের ভূমিকা। সংস্কৃতি-আন্দোলনের বিপ্লবী লাইন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। কথায় কথায় তিনি তখন জানিয়েছিলেন যে আসন্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাহাবাদ অধিবেশনে তিনি যেতে পারবেন না, তাঁকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে, সেটা তিনি বলেননি, এবং বলেছিলেন ব্যাপারটা গোপন। স্বভাবতই আমি আর জিজ্ঞাসা করিনি। পরে জেনেছিলাম তিনি গিয়েছিলেন মস্কোতে— মস্কো রেডিওর ঘোষক হয়ে। আমার আজও জানতে ইচ্ছা করে, বিনয়ের মতো গণনাট্যের প্রথম সারির একজন নেতাকে ঐ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে সুদূর মস্কোয় পাঠানোর সিদ্ধান্তটি পার্টির কোন নেতা নিয়েছিলেন।

বিনয় রায়কে নিয়ে এত যে খেদ তার মূলে রয়ে গেছে সহযোদ্ধাদের তাঁর সম্পর্কে হার্দ্য স্মৃতি। বাংলা গান তাঁর সাংগঠনিক বুদ্ধিতে একটা নতুন রূপ নিয়েছিল। গ্রাম-গ্রামান্ত থেকে শিল্পী সংগ্রহ, মজুর-কৃষককে গানের মধ্যে এনে ফেলা তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। লোকসংগীতের নানা ধরন (কবিগান, কীর্তন, তরজা, পাঁচালি, ভাটিয়ালি, সারি) গণসংগীতে প্রয়োগ পরিকল্পনাও খুব ফলবান হয়েছিল। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য গণশিল্পীদের নাম এখানে উল্লিখিত থাক। যাঁরা এসেছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চল থেকে তাঁদের মধ্যে নিবারণ পণ্ডিত, রমেশ শীল, টগর অধিকারী (দোতারা বাদক), শেখ গোমানি দেওয়ান, লম্বোদর চক্রবর্তী, রাইমোহন, ফণী বড়ুয়া, উদাসী ফকির, সাহেব আলি, সতীশ মণ্ডল, জিতেন সেন, অখিল চক্রবর্তী, দশরথ লাল (ট্রাম শ্রমিক) এবং মেটেবুরুজের শ্রমিক গুরুদাস পাল প্রমুখই অগ্রগণ্য। সংগীত শিক্ষাপ্রাপ্ত হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরি আসেন সরাসরি পার্টি কর্মী হিসাবে সিলেট থেকে। সলিল চৌধুরি আসেন ছাত্র আন্দোলন থেকে। উচাঙ্গ ও রবীন্দ্রসংগীতের অভিজাত জগৎ থেকে আসেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। আসেন উদাত্তকণ্ঠের দেবব্রত বিশ্বাস। পূর্ববঙ্গ থেকে আরও আসেন সাধন দাশগুপ্ত ও খালেদ চৌধুরি। এত সব গ্রহ-তারকা সন্নিবেশের অনুঘটক যে বিনয় রায়ের সাংগঠনিক বিবেচনা তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বাংলা গানের শূন্যতার জায়গাটা চিনতে পেরেছিলেন এবং নতুন বর্গের গানে বাঙালি শ্রোতার মনে বেশ বড় ধরনের ধাক্কাও দিয়েছিলেন।

বিনয় রায়ের কণ্ঠ ছিল ভরাট এবং গায়নে একটা আলাদা ক্ষমতা ছিল। একটি স্মৃতিচারণে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র জানিয়েছেন, তাঁদের পাশের বাড়িতে বিনয় রায়ের কণ্ঠে গণসংগীত শুনে তিনি আকৃষ্ট হন। আলাপ হয়। বিনয় রায় তাঁকে একটা খুব নতুন পরিকল্পনা দিয়ে বলেন:

—আপনি তো প্রসিদ্ধ কবি-সুরকার রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের নামে এই যে একটা এলানো, আমায় ধরো ধরো গোছের ব্যাপার চলছে— মানে রবীন্দ্রনাথকে বিকৃত করা অংশকেই সমগ্র বলে দেখানো— একে ঠেকানো যায় না? আসুন, কিছু শক্ত শক্ত জোরদার রবীন্দ্রসংগীত বাছি এবং তাকে পপুলার করি। গীতবিতান দেখে অর্গান বাজিয়ে শুরু হলো সেই চেষ্টা। কয়েকটা গানের কথা বড্ড মনে পড়ে : "বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে", "আমি ভয় করব না ভয় করব না", "বাঁধ ভেঙে দাও", "একসূত্রে বাঁধিয়াছি"। ...তখন এইসব গান আমরা খুব গাইতাম। পার্টি-মিটিঙেও গাইতাম। একদা, বঙ্গভঙ্গের সময়, বাঙলাদেশের মাঠে-ঘাটে রবীন্দ্রনাথের গান ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের মাটিতে যখন জাপানী বোমা পড়ছে, কোহিমায় আসামে যখন জাপানী উড়োজাহাজের হামলা শুরু হয়েছে— সেই অসম্ভব দিনগুলোয় রবীন্দ্রনাথের গান আবার এদেশের মাঠে-ঘাটে গাওয়া হয়েছিল।

এই তথ্য থেকে গোড়ার কথাটা ধরে নিতে হবে যে, বাংলা গণসংগীতের প্রধান প্রেরণা-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর স্বদেশী গান গেয়ে যেমন গণসংগীতের শিল্পীরা প্রথম পর্বে (যখন যথার্থ গণসংগীত রচনা শুরু হয়নি) তাঁদের সংগ্রামী মনোভাবের পরিপূরণ করেছেন, তেমনই রবীন্দ্রসংগীতের অন্তর্গত পৌরুষকে তাঁরা দৃপ্ত গায়নের সাহায্যে মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আজও গণসংগীতের শিল্পীরা সভা-সমিতি-জমায়েতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান গেয়ে থাকেন। কিন্তু বিনয় রায়ের প্রচেষ্টা ছিল অন্য মাত্রায়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র অংশকে ফোটানোর জন্য সঠিকভাবে তার গায়নের ওপর জোর দিয়েছিলেন (এই কাজই পরে আরও সুষ্ঠুভাবে করেন আরেক গণশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস), কাজটা চল্লিশের দশকের সূচনায় কঠিন ছিল।

কঠিন ছিল, কেননা তখন কমিউনিস্ট পার্টির বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন বিনয় ঘোষ ১৯৩৯-৪০ সালে বই লিখে বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া ভাববাদী মতের সূচক এবং কল্পনাবহুল সৌখীন সাহিত্যধারার স্রষ্টা। পরে 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে ভবানী সেন যখন রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে রবীন্দ্র সাহিত্যকে আক্রমণ করেন তখন তারও বহু সমর্থক জোটে। গোপাল হালদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন,[৯]

> মার্কসবাদী-তে রবীন্দ্র গুপ্তের (ভবানী সেন) প্রবন্ধ বের হওয়ার পরে একদিন অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র এসে বললেন 'রবীন্দ্রনাথ' পড়ে দেখলাম। ঠিকই লেখা হয়েছে। আমি তার জবাবে তখন বললাম— তা না হয় মানলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সুবিপুল সাহিত্য রচিত হয়েছে তা না হয়ে বাংলা সাহিত্য যদি ভারতচন্দ্রের স্তরে পড়ে থাকত, সেটা কি ঠিক হ'ত?
>
> অমরদা এ প্রশ্ন মেনে নিয়ে বললেন, না। তা হতো না।

সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্নে সেকালের মার্কসবাদীদের বিতর্ক গণসংগীতকে স্পর্শ করেনি। শিল্পীরা তাঁর গান গেয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বীকার্য যে সলিল চৌধুরীর একটি গানে ('সেই মেয়ে', সুচিত্রা মিত্রর রেকর্ডে ধৃত) রবীন্দ্রভাবনার এক চিত্তাকর্ষক সম্পূরণ পেয়ে যাই আমরা। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' উচ্চারণ করে তার কালো হরিণ চোখের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সলিল তাকেই অন্য আদর্শে আধুনিক কালের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন এই বর্ণনায়, যেন ছিন্নশত আঁচল ঢেকে জীর্ণ দেহখানি ক্লান্ত পায়ে—

দুটি শীর্ণ বাহু তুলে
ও সে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে—

অন্ন মেগে মেগে ফেরে প্রাসাদ পানে চেয়ে।
কে জানে হায় কোথায় বা ঘর কী নাম কালোমেয়ের।

হয়তো ময়নাপাড়ার মাঠে মেঘলা দিনে কবির স্বপ্ন হয়ে যে-কালো মেয়ে দেখা দিয়েছিল, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত পরিবর্তিত বর্তমানে—

তার দুটি কালো হরিণ চোখে চোখে,
শুধু বেদনার দহন ঝলকে
বাঁকা দুটি ভুরু-ধনুর টঙ্কারে
আমি যে দেখেছি মরণ শঙ্কারে
ঘিরেছে নিঃসহায়ে।

এই অসামান্য গান শুনতে শুনতে বোঝা যায়, বাংলার গণসংগীত কতখানি সৃজনের ইঙ্গিত পেতে পারত রবীন্দ্রসংগীত থেকে, কিন্তু কতটাই কম নিয়েছে। 'সেই মেয়ে' গানে সুরের অভিনব নির্মিতি ও চলন বাংলা গানে নিঃসন্দেহে এক নতুন মোড় এনেছিল। কিন্তু কজনই বা স্থিরবুদ্ধিতে অনুধাবন করতে পেরেছেন সলিল চৌধুরীর এমন আধুনিক প্রয়াসের স্পর্ধিত দুঃসাহস?

কিন্তু আমরা বিনয় রায়ের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসছি। ১৯৪১-৪২ সালে ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের আস্তানা ছিল। গানের দল গড়ে উঠেছিল বিনয় রায়ের উৎসাহে। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা মিত্র-র (তখন মুখোপাধ্যায়) দুই দিদি সুজাতা ও সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়। এই দলে মাঝে মাঝে তৃপ্তি মিত্র ও সাধনা রায়চৌধুরীও গাইতেন। শচীনকর্তা ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও বুদ্ধি পরামর্শ দিতেন। বিনয় রায়, হেমাঙ্গ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গান গাওয়া হত। বোম্বাই থেকে আসতেন হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত ও সুরারোপিত হিন্দি গানের সম্ভার নিয়ে। নবসৃষ্টির উন্মাদনায় প্রত্যক্ষভাবে গানের মানুষ নন এমন যে মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় (সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির), তিনিও অনুবাদ করেছিলেন কিছু বিখ্যাত গান। সব মিলিয়ে কর্মের এক কারুশালা।

১৩৫০ বঙ্গাব্দে অস্বাভাবিক দুর্ভিক্ষে সব হিসাব পাল্টে গেল। গানের মানুষগুলি পথে পথে নেমে এলেন। তৈরি হল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অবিনশ্বর সৃষ্টি 'নবজীবনের গান'। কীভাবে এমনতর রচনা সম্ভাবিত হলো তার বিবরণ দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র :

> জমাট সাহিত্যিক আড্ডা ও রিহার্সাল ছেড়ে আমরা সবাই রাস্তায় নেমে পড়লাম। ...রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। চৌরঙ্গী, কালীঘাট, লেক মার্কেটের মোড়, বালিগঞ্জ... ওদিকে শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়। সর্বত্র এক দৃশ্য— শত সহস্র কঙ্কাল 'ফ্যান দাও ফ্যান দাও' বলে চিৎকার করছে। ...ডাস্টবিনের পচা এঁটোকাটা নিয়ে কুকুরে-মানুষে মারামারি।
>
> একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে।
>
> এর প্রচণ্ড অভিঘাত আমার গোটা অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম— না না না। ... সুর আর কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎসমুখ থেকে ঝর্ণার মতো বেরিয়ে এল। শুরু হলো 'নবজীবনের গান' :
>
> না না না।
> মানবো না মানবো না।

কোটি মৃত্যুরে কিনে নেবো প্রাণপণে
ভয়ের রাজ্যে থাকবো না।

সত্য অনুভূতি আর আন্তরিক আবেগ থেকে এমনভাবেই চল্লিশের দশকে গণসংগীতের উদ্বোধন ঘটেছে। শুধু গান রচনা নয়, ঘুরে ঘুরে তার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টাও ছিল। জ্যোতিরিন্দ্র জানাচ্ছেন :

আজকে শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু ওরই মধ্যে আমরা— বিনয়, জর্জ, আমিই বেশি, ভূপতি-সুরপতিও— পার্টির নির্দেশে ট্রামওয়ে ওয়াকার্স, ইউনিয়নের আহ্বানে জায়গায় জায়গায় গিয়ে ট্রাম শ্রমিকদের গান শেখাতুম। ...এই গান শেখাতেই হাওড়া ময়দানে রেল শ্রমিক এবং চাঁপদানিতে চটকল মজুরদের কাছে কতবার গিয়েছি।

আশ্চর্য কি যে অনেক পরে, একদিন মস্কো রেডিও খুলে বিনয়ের গলায় তাঁদের গানগুলি শুনে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র চোখ জলে ভরে যায়।

দুর্ভিক্ষ আর মহামারী যেমন করে উচ্চবর্গের সমাজভুক্ত কলকাতার প্রগতিবাদীদের চোখ খুলে দেয় ও পথে নামায়, বাধ্য করে তাঁদের প্রকৃত গানের সৃজনে ও প্রচারে— তেমনই পূর্ববঙ্গের প্রগতিবাদীরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন পরিবর্তিত দেশীয় পরিস্থিতি থেকে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। সুরমা উপত্যকায় পার্টির নেতৃত্বে এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিচালনায় খালেদ চৌধুরি, নির্মলেন্দু চৌধুরি, গোপাল নন্দী, হেমন্ত দাস প্রভৃতিতে নিয়ে যে-সাংস্কৃতিক স্কোয়াড খোলা হয়েছিল তাঁরা রাজনৈতিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে লোকসংগীত সংগ্রহ করতেন গ্রাম ঢুঁড়ে। কিন্তু তখনও তাঁরা জানতেন না যে, আউল বাউল পীর মুর্শিদা মাইজ ভাণ্ডারীর সাধকদের মানবতার সাধনার (এঁরা জাতি-বর্ণ-শ্রেণিতে বিশ্বাসী নন) মধ্যে গণ-চেতনার বীজ থাকতে পারে। বিস্ফোরণ হঠাৎ টের পাওয়া গেল, যখন ১৯৪৫ সালে নেত্রকোণায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে লক্ষ কৃষকের সমাবেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবাহুত রসিদউদ্দিন, জামসেদউদ্দিন নামের আউলিয়ারা গীতিকা-র ধরনে গেয়ে ওঠেন :

আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কার কাছে জানাই
সুখের স্বপন ভাঙলো রে চুরাই বাজারে।

ভাইরে ভাই— তেরশো পঞ্চাশের কথা মনে কেউর পড়ে গো?
ক্ষুধার জ্বালায় বুকের ছাওয়াল
মায়ে বিক্রি করে রে...

দেখা যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক প্রহার ভদ্রশ্রেণির জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং গ্রাম্য আউলিয়াদের একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। তবে তফাৎ এইখানে যে, গ্রাম্য গীতিকার তার প্রহারের ব্যথাটুকুই বলতে পারেন গানে, জ্যোতিরিন্দ্র প্রগতি চেতনায় আরেক ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিবাদে বলেন— 'না না না মানবো না'....।

বাংলা গণসংগীতে পূর্ববঙ্গের ভূমিকা বিষয়ে চমৎকার তথ্যবহুল একটি রচনা সাধন দাশগুপ্ত লিখেছেন। ('পূর্ব বাঙলার গণশিল্পী')। তথ্য বিস্তারের আশংকায় বর্তমান রচনায় সেখান থেকে উদ্ধৃতি দেব না, উৎসাহীজন মূল রচনাটি থেকে পড়ে নেবেন কেমন করে কবিয়ালদের মধ্যমণি রমেশ শীল চলে এলেন গণসংগীতের স্বারোপিত ক্ষেত্রে। চট্টগ্রামের কৃষক নেতা বঙ্কিম সেন, ময়মনসিংহের নিবারণ পণ্ডিত ও বাউল গায়ক অখিল চক্রবর্তী, রংপুরের কৃষক কর্মী জামসেদ আলি চাটি, ঢাকার রণেশ দাশগুপ্ত,

সত্যেন সেন, সাধন দাশগুপ্ত, রাজশাহীর প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলপনা গুপ্ত নানাভাবে গণসংগীতের রচনা ও প্রচারে অসামান্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রমেশ শীল ও নিবারণ পণ্ডিতের গান এখনও পর্যন্ত গাওয়া হচ্ছে। তবে রমেশ শীল এবং তাঁর শিষ্য বলে নিজেকে যিনি পরিচয় দিতেন সেই গুরুদাস পাল গণসংগীতে একটি স্থায়ী আসন পাবেন তাঁর রচনার বক্তব্যের তীব্রতা ও বক্রতার জন্য। রমেশ শীল মূলে ছিলেন মাইজভাণ্ডার ধারার সুফিবাদী কবি।* আশুক, মাশুক, লাহুত, মালকুতের গুহ্য দেহতত্ত্ব আর ঐশী ভাবনার নির্জন সাধনার মানুষ ছিলেন তিনি। হঠাৎই লিখে বসলেন গণচেতনার শিক্ষায়—

আমি কৃষক তুমি মজুর দিনে রাতে খাটি
দুই শক্তি এক হইলে তারা পিছু যাবে হটি।

কিংবা লিখতে পারলেন—

বাংলার কৃষক ভাইগণ হওরে চেতন।
লাঙল যার জমি তার কৃষকের এই পণ।।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভারি আবেগমথিত ভাষায় লিখেছেন রমেশ শীল সম্পর্কে :[১০]

সুফীদর্শনে প্রথম জীবনে অনুপ্রাণিত কবি রমেশ শীল মাইজভাণ্ডারের কল্পলোকের সুরে দুনিয়া ফুলবাগের আশিক হয়ে সুবাসের সন্ধানী হয়ে গেয়েছিলেন—

দেখে যারে মাইজভাণ্ডারের আজব রঙের ফুল
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকুল।
সে ফুলের সুবাতাসে দিল খোলে আর আঁধার নাশে
নিত্য রসে চিত্ত ভাসে প্রেমবাগে বুলবুল।

সেই কবি সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার আলোতে দেখলেন এক লাল দুনিয়া— যার জন্য তিনি মুর্শিদের মোকাম ছেড়ে নেমে এলেন লড়াই-এর ময়দানে। তাই এই লোককবি বৃদ্ধবয়সে নিগৃহীত, কারারুদ্ধ হলেও, তাঁর গানের ধারাকে কেউ রুদ্ধ করতে পারিনি। শেষ বয়সেও তাঁর গানে সেই কামনাই অনির্বাণ—

অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হয়
আমার পরে আসবে যারা বোধ করি তারাই নেবে।
হিংস্র জন্তুর ডাক থামিবে পথের বাধা হবে শেষ
বুক ফুলিয়ে বলে উঠব অই ত আমার দেশ।

রমেশ শীলের ধারায় আরেকজন এসেছিলেন গণসংগীতে, গুরুদাস পাল। বাবা মনোহর পাল ছিলেন কুমোর। জাত-ব্যবসায়ে ভরসা হারিয়ে গুরুদাস মেটেবুরুজের চটকলে শ্রমিক হন। স্বল্প-শিক্ষিত গুরুদাস স্বভাবকবি ছিলেন। পরে চটকলের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গান রচনায় হাত দেন। ১৯৩৯-৪০ সাল নাগাদ শ্রমিক কর্মীরূপে তিনি গণসংগীত লিখতে শুরু করেন। তারপরে ১৯৪৫ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ আয়োজিত সম্মেলনে রমেশ শীলের গান শুনে উদ্বুদ্ধ হলেন। তাঁর গানে এবারে একটা কড়া বক্তব্য ও শ্রেণিচেতনা এসে গেল। শ্রমিক-মালিকের লড়াইতে যারা মালিকপক্ষের দালালি করে তাদের ব্যঙ্গ করে গুরুদাস পালের একটা গান এখানে তুলছি :

* মাইজভাণ্ডার ধারা ও গান সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণার জন্য দ্রষ্টব্য : 'মুর্শিদা গান', জসীমউদ্দীন। ঢাকা। ১৯৭০।

যেমন জলের স্বভাব নিম্নগতি
আগুনের স্বভাব পোড়া
বিড়ালের স্বভাব হাঁড়ি খাওয়া
পাখির স্বভাব ওড়া।
বেশ্যার স্বভাব যেমনধারা চার আনাতে স্বামী
এদের স্বভাব তেমনিধারা ধনিকের গোলামী।

এসব গানের বক্তব্যে ও বিন্যাসে একটা আলাদা ঝাঁঝ আছে। হেমাঙ্গ, জ্যোতিরিন্দ্র, সলিল, বিনয় রায় বা পরেশ ধরের গানে সেটা নেই, তার কারণ এঁদের সঙ্গে গুরুদাসের শ্রেণিভিত্তি আলাদা, গড়ে-ওঠার অভিজ্ঞতা আলাদা। সত্যিকারের গণসংগীতের বিষয় কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে একসময় সংকট ও সংশয় ছিল। সেই সংকট আসলে বৃহত্তর গণনাট্য আন্দোলনেরই একটা সার্বিক সংকট। গণ আন্দোলনের মত ও পথের প্রশ্ন যখন দ্বিধান্বিত ছিল তখন বিষয়বস্তুও ফর্মুলামাফিক হওয়া বিচিত্র নয়। সেই সময়কার প্রগতি আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে সোমনাথ লাহিড়ীর মতামত এখানে তুলে ধরছি[১১]:

আমাদের সব সাহিত্য রচনারই একটা বাঁধা ফর্মুলা ছিল, সেটা হলো দুঃখ, কষ্ট, অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ। কিন্তু ঐ আসছে লাল ঝাণ্ডা, অগ্নিকোণে ঐ লাল নিশান। সে যুগে আমাদের সব ঐ এক ছাঁচে ঢালা।

এ সব লেখা পার্টির ভেতরকার লেখকদের মনস্তুষ্টি করতে পারে। কিন্তু তার বাইরের মানুষ? যেমন বলা যায় পার্টিতে দু ধরনের বক্তা আছে। একদল পার্টি কর্মী ও পার্টি জনতাকে খুব ভালো বোঝাতে পারেন। আবার কিছু বক্তার আবেদন পার্টির বাইরে মানুষকেও প্রভাবিত করে।... পার্টির ভেতরের লোকজনের কাছে প্রচার এক জিনিস, আর পার্টির বাইরে ব্যাপক জনগণের কাছে পৌঁছনো আরো ব্যাপার।

তবে এই আন্দোলনের সবটাই নেগেটিভ নয়। সে-সময় আমাদের শিল্পকর্ম অনেক মানুষকে কাছে টানতে পারলো না ঠিকই; তবু তখনকার লেখা একটা Pro-peasant, Pro-worker ধারা সৃষ্টি করল।

গণনাট্যের কর্মীরা নাচে গানে দুর্ভিক্ষের emotion ব্যবহার করেছিল।... প্রচারধর্মিতার চেয়ে emotion-কেই ধরতে পেরেছিল বলে তুলনামূলকভাবে সমকালীন যুগের মানুষকে টানতে পেরেছিল। কিন্তু সে সময় চলে গেলে মানুষের মনকে আর বাজাতে পারল না।

সোমনাথ লাহিড়ীর মতামতে কিছু উগ্র সত্য আছে এবং খুব মোলায়েম ভাষাভঙ্গির চটকে সেটা তিনি ঢেকে রাখেননি। পার্টি লাইনের অনুজ্ঞা এবং অনুশাসন বিষয়ে অসহায় সলিল চৌধুরির ক্ষোভ এই প্রসঙ্গে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। তিনি বলেছেন :[১২]

'পাল্কি চলে' বা 'গাঁয়ের বধূ'কে গণনাট্য সংঘ ban করে দিল। বললো, আজ যেখানে কৃষক বধূরা লঙ্কার গুঁড়ো হাতে নিয়ে লড়ছে, তুমি সেখানে 'ভাঙা কুটিরের সারি'-র কথা বলছো। আমার বক্তব্য ছিল, আমি শিল্পী হিসাবে total ছবিটা তুলে ধরেছি— একদিন যাদের সুখের জীবন ছিল, আজ ডাকিনী যোগিনীরা এসে তছনছ করে দিল তাকে। এই অব্দি বলে আমি থেমেছি এই জন্যেই যে তোমরা লড়াই করবে। এরপর যদি আমি বলি জোট বাঁধো তৈরী হও, তাহলে সেটা নেহাৎ স্লোগান হয়ে যাবে, শিল্প হবে না।

অন্যত্র আরেক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন :[১৩]

> গণনাট্য আমাকে কলকে দেয়নি অনেকদিন। ...পার্টির সেল সিদ্ধান্ত করল, আমার গান শুনে পাশ করিয়ে তবে গাইতে হবে। এই পার্টি সেলে শ্রমিক, ছাত্র, কলেজ প্রতিনিধিরা ছিলেন। আমি তাঁদের বললাম, 'আপনারা গানের কথা বা ভাবমর্ম বুঝতে পারেন কিন্তু সুরের কতটা কী জানেন?' এর জবাবে কেউ বলল আমি নাকি শৃঙ্খলা মানি না; কেউ বলল, 'পার্টিবিরোধী'; এমনকি পরে কেউ কেউ মার্কিন স্পাইও বলল। এ সবের ফলে আই. পি. টি. এ ছেড়ে চলে এলাম।

পুরোনো একটি ঘটনার স্মৃতিতে সলিল বলেছেন,

> গণনাট্যের দল আসাম সফর করতে গেছে। আমাকে গান গাইতে দেওয়া হলো না। অথচ তখন আমার 'হেই সামালো' গানটি তৈরী হয়েছে। আমাকে দিয়ে বাঁশি বাজান হলো। পরে ওরা আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয় মানুষের চাপে।

গণসংগীতের বিষয় কি হওয়া উচিত তা নিয়ে শিক্ষিত রাজনীতি-চেতন মানুষের ভাবনা আর পল্লিবাসী সাধারণ মানুষের (তিনিও পার্টি কর্মী) ভাবনা একেবারে বিপ্রতীপ হতে পারে। যুদ্ধের সময় বাংলার গ্রামে নুনের অভাব ঘটে। গ্রাম্যগীতিকার নিবারণ পণ্ডিত, রাজনীতি-চেতন মানুষ হিসাবে, লবণ-সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে গান লিখেছিলেন তাঁর নিজের আঞ্চলিক ভাষায়—

আমার মাঞ্জুর মায়ে তো কনট্রোল বুঝে না
রান্‌তে গেলে কান্‌তে বসে লবণ ছাড়া রান্‌ধে না।
ও আহা রে, কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম
কত বাবুর পায়ে ধরলাম—
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে

নুনের অভাব, কনট্রোল ব্যবস্থা, রেশন কার্ড নিয়ে ব্যর্থ ঘোরাঘুরি থেকে গানটা হঠাৎ মূল সমস্যায় চলে গিয়ে চমকে দেয় এই কথায়—

ও আহা রে, আমার ভাঙা ঘরে নেড়ার ছানি
মেঘ না হইতে পড়ে পানি
টেপটেপানি গেল না রে
টেপটেপানি গেল না।

গণসংগীতের রচনায় বিষয়গত অগ্রাধিকার নিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা হয়েছিল বিচিত্র ধরনের। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস সাহেব তাঁর মিশনে দিল্লি এলে বড় বড় নেতারা সেখানে উপস্থিত হন। এদিকে সে সময়ে শ্রীহট্টে সরষের তেল অমিল হয়ে পড়ে। সেই সময় এক কৃষক কমরেড এসে হেমাঙ্গকে অনুরোধ করেন 'হৈরর' (সরষের) তেল নিয়ে একটা গান লিখতে। হেমাঙ্গ সেকথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হৈরর তেল নিয়ে আবার গান হয় নাকি?' কিন্তু কমরেডটি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কার জন্য তোমার গান? সাধারণ লোকের একটা এত বড়ো সমস্যা নিয়ে তুমি গান লিখবে না?' বলে তিনি চলে গেলেন কিন্তু গণগীতিকারের মাথায় কথাটা ঘুরতে লাগল। তার পরিণতিতে বেরিয়ে এলো আশ্চর্য ব্যঙ্গের গান যাতে ক্রীপস্ মিশন, ক্যাবিনেট মিশন, আর তৈল সংকট মিশিয়ে একটা বক্তব্য দাঁড়ালো—

আজব দেশের আজব কথা কোনো যুগে শুনছনি (সজনী)
হৈরের তেল কোন্ দেশে গেল খবর জাননি।
দিল্লীসরের ধলা বাদশা ফরমান করিলা
দরবেশী নাচ নাচবা তাইন্ হক্কল্রে জানাইলা
কত দাওয়াৎ ভেজিলা... মরি হায়
হাজার মণ তেল পুড়িব দেখতে রাধার নাচুনি।

৩

বাংলা গণসংগীতের ইতিহাস লেখার মতো পর্যাপ্ত তথ্যে অপ্রতুলতা আছে। কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা যাঁরা করেন তাঁদের মতে ১৯৪০-৪১ সাল থেকে প্রগতি আন্দোলনের শরিক হয়ে গণসংগীত নিজের ভূমিকা খুঁজে নেয়। ১৯৪৩ সালের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরে এই গান নেয় গৌরবময় অংশ। তারপরে কলকাতা-ঢাকা কেন্দ্রিক হলেও সারা বাঙলায় গণসংগীত তার আসন পাতে, বোম্বাই থেকেও আসে কিছু ঝলক। কিন্তু ১৯৪৮ সালের পর গণসংগীতে ভাঁটার টান ধরে, কেননা '৪৮ থেকে '৫১ সালের মধ্যে নানা ভাবনাঘটিত বিপর্যয় ঘটে পার্টিলাইনে। ১৯৫২-র পর সবদিক টালমাটাল হয়। তারপর সবদিকে যতটুকু মিলেজুলে সমঝোতা হয়, চীন-সোভিয়েত বিতর্কে ১৯৬২ সাল থেকে তা সম্পূর্ণ ভেঙে যায়।

সেই জন্যই প্রশ্ন উঠেছে, বাংলায় গণসংগীত কি এক আকস্মিক উদ্ভাসন? জনসাধারণ কি এই গানের ভাবধারা চাইল না অথবা আদি স্রষ্টারা পরবর্তী স্রষ্টাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন না? অথবা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি এতটাই পাল্টে গেল যে গণসংগীতের সৃষ্টির তাপ নিভে গেল? সব কটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তবে সাংগীতিক একটা সদুত্তর দেওয়া সম্ভব, যেটা কেউ করেন নি আজ পর্যন্ত, কিন্তু আমরা তার প্রয়াস নিতে পারি। তার আগে দুয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। সে ব্যাপারে কিছু মন্তব্য ও তথ্য ব্যবহার করব।

১) আমি মনে করি প্রগতি লেখক সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলনের পিছনে কমিউনিস্ট পার্টি থাকলেও এর মূল প্রেরণা [দাতা] ছিলেন পি. সি. যোশী। উনি ব্যক্তিগত আগ্রহ না নিলে এ-আন্দোলন হতো কিনা সন্দেহ। আর এটি ব্যর্থ হবার অন্যতম কারণ তাঁকে পার্টির নেতৃত্ব থেকে অপসারণ। এছাড়া আর একটা কারণ হলো পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাঙন। [সলিল চৌধুরি]

২) পি. সি. যোশী তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই নিজের রাজনৈতিক ঝোঁকের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু পার্টির সেই গৌরবের দিনে, বিশেষত কালচারাল ফ্রন্টের সেই যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের দিনগুলিতে, যোশীর সৃজনশীল ও মানবিক নেতৃত্বের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা না করাটা খুবই অন্যায় হবে। গোটা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের তিনিই ছিলেন প্রধান Formulator. যোশী না হলে এসব কে অনায়াসে হতো কিনা সন্দেহ। [জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র]

৩) প্রগতি লেখক ও গণনাট্য আন্দোলন গড়ার পিছনে পি. সি যোশীর অবদান অসামান্য। পার্টির সম্পাদক হয়ে তিনি সাংস্কৃতিক সমাবেশ গড়ার দিকে নজর দেন। পার্টিতে এরকম সেক্রেটারী আর হয়নি। তিনিই যোগাযোগ করেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পীদের সঙ্গে, জড়ো করেছিলেন তাঁদের। আমি সে-সময় সিলেটে গান করতাম। সেটারও খবর রাখতেন যোশী।

...আবার যোশীর ভুলও ছিল। যেমন তিনি রবিশঙ্করদের ডেকে এনে পুরনো দরবারী যুগকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি এঁদের remoulding. এর ব্যবস্থা করলেন না।পার্টি সার্কুলার দিয়ে আর্টিস্ট যোগাড় করলেন। আঁধেরি হয়ে উঠল একটা আশ্রম। তারপর রবিশঙ্করেরা চলে গেলেন। শুধু তানপুরাটা পড়ে রইল। ...যোশী শুরুতে জোর ধাক্কা দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক লাইনে দৈন্য তাঁর চেষ্টা ভেঙে দিল। [হেমাঙ্গ বিশ্বাস]

তিনটি মন্তব্য থেকে গণনাট্যের ও গণসংগীতের উদ্ভব, বিকাশ ও অবনমনের সূত্র পাওয়া সম্ভব কিন্তু প্রকৃত সমস্যা সম্ভবত ছিল অনেকটা গভীরে। শুধু পি. সি. যোশী বা পার্টি লাইনের ওপর বরাত দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা যায় না। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লক্ষ করেছিলেন, 'কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা বড়ো উন্নাসিক। এরা একবার নিবারণ পণ্ডিতকে গান গাইতে দিতে চাননি। তাছাড়া কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে বড্ড দলাদলি।' দেবব্রত বিশ্বাস গণসংগীত গাওয়া ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের জগতে চলে যান। সলিল চৌধুরি চলে যান বোম্বাই চলচ্চিত্রের পথে। বিনয় রায় মস্কোয় চলে যান। সুধী প্রধান ১৯৫২ সালে পার্টির সভ্যপদ ত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালে আই. পি. টি. এ সংগঠন থেকে পদত্যাগ করেন, কেননা তাঁর মনে হয়েছিল 'এ ফ্রন্ট আর বাঁচবে না'।

এসব কিছুর এক একটা ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ আমরা পাই। যেমন, দেবব্রত বিশ্বাসের মনে হয়েছিল— (কিশোরগঞ্জী ডায়ালেক্টে লেখা চিঠি হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে, ৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে)[১৪]

গণনাট্য আন্দোলনে ভিড়্যা পর্চিলাম উগ্‌লা ব্যাপার বিশ্বাস কইরা— হেইডা অইল— গণচেতনা উদ্বুদ্ধ কইরা দ্যেশে বিপ্লব আনন্। কিন্তু বহু বৎসর পরে দ্যেখলাম্ আম্রায় subject matters made in Calcutta and Bombay লইয়া গ্রামে-গঞ্জে হাড়ে মাড়ে গান গাইয়া 'শহীদের ডাক' দেখাইয়া জনগণের মধ্যে আধ ইঞ্চিও Penetrate কর্তাম পারি নাই।

সুধী প্রধানের আত্মবিশ্লেষণ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ আরও অনেক পরিপক্ক রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয়বাহী। পি. সি. যোশীর পরবর্তী পর্যায়ের দলের নেতৃত্বের প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন :[১৫]

১৯৫০-এর পর পার্টি আবার লাইন পরিবর্তন করল। তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' পেকে উঠেছে। বিশ্বশান্তি আন্দোলন তখন জোরদার। এদেশেও তখন শান্তি ও জাতীয় সংস্কৃতি আন্দেলন গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হলো।

রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার পর কংগ্রেস বুদ্ধিজীবীদের টানার জন্য নানা ধরনের একাডেমি ইত্যাদি সংস্থা গঠন করল। তারা যখন এই কাজ করছে তখনই বোম্বেতে সি. আই. এর উদ্যোগে বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ হলো। এর নাম দেওয়া হলো 'এশিয়ার স্বাধীনতা-রক্ষায় কংগ্রেস'। অর্থাৎ কমিউনিস্টদের হাত থেকে এশিয়াকে বাঁচাও। ... সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু 'একাডেমি' ইত্যাদি গঠন করে মুলকরাজ আনন্দ ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের টেনে নিলেন।

এইভাবে দেশীয় বুর্জোয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করার ও কিনে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা শুরু করল তার প্রথম বলি হলো প্রগতি লেখক সংঘ, দ্বিতীয় বলি গণনাট্য সংঘ।

সংস্কৃতিক ফ্রন্ট সম্পর্কে পার্টির দ্বিধা ও দোলাচল বিষয়েও স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন সুধী প্রধান :

পার্টি এই ফ্রন্টের উপর প্রথম দিকে যথোচিত গুরুত্ব দেয়নি। দিলে কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিট ব্যুরোতে এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা হতো এবং একে পরিচালনা করার জন্য সংগঠিত চেষ্টা হতো। ৫২ সালের পর পার্টি এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে। আবার ১৯৫২-৫৩ সালেই পার্টির ভিতর কথা ওঠে যে, এ-ধরনের ফ্রন্টের আর দরকার নেই।

তবে গণনাট্য টিমটিম করে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। তারপরেও এর অস্তিত্ব এটুকুই যে, নির্বাচনের সময় প্রচারের জন্যে গানের স্কোয়াডের দরকার হয়। .. আমি এখনও মনে করি, পার্টি ভাগ হলেও ফ্রন্টগুলি ভাঙা ভুল হয়েছে।

গণসংগীতের স্বর্ণোজ্জ্বল-পর্বের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্লেষণে একটা সূক্ষ্ম চাপা ক্ষোভ লক্ষ করা যায়। তবে সুধী প্রধান যখন বলেন, 'নির্বাচনের সময় প্রচারের জন্য গানের স্কোয়াডের দরকার হয়', তখন গণসংগীতের আজকের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে বোঝা যায়, চল্লিশের এক উত্তাল সময়ে গণনাট্যের পাশে পাশে কিছু সাংগীতিক-ব্যক্তিত্বের নিরীক্ষা প্রবণতার আবেগে ও উৎসাহে গণসংগীত জেগে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন রাগসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীতের চর্চাকারী একজন ইনটেলেকচুয়াল, হেমাঙ্গ ছিলেন পূর্ববঙ্গের নানা লোকসংগীতের ঐতিহ্য ও ধারাস্নাত এক তদ্‌গত গায়ক, সলিল চৌধুরি পাশ্চাত্যসংগীত ও যন্ত্রসংগীতে সিদ্ধ সংগীত-পুরুষ। তিনজনেরই সৃজনবুদ্ধি ও সাংগীতিক অনুশীলন ছিল প্রথম শ্রেণির, গানও লিখতে পারতেন। এঁদের বাইরে অশিক্ষিত-পটু কিন্তু স্বভাব গায়ক ছিলেন বিনয় রায়। তিনি গান লিখেছেন অনেক কিন্তু তাতে বাণীর দুর্বলতা স্পষ্ট। দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন প্রধানত গায়ক, কিছু গানে সুরও দিয়েছেন সে সময়ে। নিবারণ পণ্ডিত, রমেশ শীল বা গুরুদাস পালের পরিশীলিত সংগীতজ্ঞান ছিল না।

লক্ষণীয় যে, জ্যোতিরিন্দ্র 'নবজীবনের গান' পর্যায়ের পর আর বিশেষ গণসংগীত লেখেননি। গান রচনার মূলস্রোতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। বিনয় রায় এদেশেই ছিলেন না। কেবল হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলিল চৌধুরি (কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে দুজনের রাজনৈতিক অবস্থান বদলে গেছে) বহুদিন গণসংগীত নিয়ে সক্রিয় ছিলেন। এই দুজন প্রধান স্রষ্টার মধ্যে সলিল বোম্বাই চলচ্চিত্রের সঙ্গে কয়েক দশক জড়িয়ে ছিলেন, ফলে অন্যান্য বর্গের গান নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং তার পরিণামে পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা গান যতটা সমৃদ্ধ ও উপকৃত হয়েছে, গণসংগীত তা হয়নি। পার্টির সঙ্গে তাঁর একধরনের বিচ্ছিন্নতা এসে গিয়েছিল। তাঁর এককালে রচিত গণসংগীত কিন্তু অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা পেয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ক্যালকাটা ইয়ুথ ক্যয়ারের গায়নে। এখনও সেগুলি খুব জনপ্রিয় এবং বামপন্থী সমাবেশে বাজানো হয়, বাণিজ্যিক সাফল্যও স্পষ্ট। তবে এখনকার প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে 'গাঁয়ের বধূ', 'রানার' বা 'পাল্কী চলে' ঠিক গণসংগীত বলে বোধহয় আকর্ষণীয় নয় ততটা, যতটা বেশ ভালো অন্যধরনের ব্যালাডধর্মী গান বলে। এটা ঠিকই যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে সলিলের গণসংগীত, তার নির্মিতির উজ্জ্বলতায় ও নতুনত্বে সেকালের বাংলা গানে খুব চমক এনেছিল। সেসব গান একসময়ে শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ কমরেডদের কতখানি উদ্দীপিত করেছিল জানিনা তবে মধ্যবিত্ত সংগীত রসিকদের ('ভদ্রলোক' শ্রেণি?) খুবই টেনেছিল। পরে, বোম্বাই চলচ্চিত্রে এবং বাংলা গানের বেসিক ডিস্‌কে সুর ও বাণীর নানা চমকদারি ও বন্দেশ্‌ এনেছেন সলিল যা সংগীত-রসজ্ঞদের মুগ্ধ সাধুবাদ পেয়েছে। গণসংগীতেও তা আসতে পারত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁকে নিয়ে, তাঁর গানের নির্মিতি নিয়ে প্রচুর বক্তব্য ও বিতর্ক প্রথম থেকে তৈরি হয়েছিল পার্টিতে। বিতর্ক তুলেছেন প্রধানত হেমাঙ্গ বিশ্বাস, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, গণসংগীতে হেমাঙ্গ-র নিরীক্ষা ছিল অন্যবর্গের। তাঁর আস্থা ছিল স্ট্যালিন-কথিত তত্ত্বে, যার সার কথা 'International in content, national in form'। এই বিশ্বাসে তিনি নিজের গানে লোকসংগীতের ব্যবহার করেছেন সারাজীবন এবং সলিল চৌধুরির সঙ্গে তার প্রকাশ্য বিতর্ক হয় বোম্বাই অধিবেশনে।

তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'স্বদেশচেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিললো সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম'। এর সঙ্গে যে বাড়তি বিশ্বাস তাঁর ছিল তা হল, গণসংগীত সংগ্রামী মানুষদের কাছে পৌঁছোতে হলে তাতে folk timbre যোগ করতে হবে। ধারাবাহিক অসুস্থতা, কারাবাস, সক্রিয় সংগঠনজনিত ব্যস্ততা ও নানা কারণে তাঁর গান সংগত প্রচার পায়নি। তাঁর গানের নিরীক্ষা অনেকের মনোযোগ পায়নি। সুদক্ষ কণ্ঠের গায়নে ও গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রার্থিত জনপ্রিয়তা পায়নি তাঁর গান। শেষ বয়সের হতাশাভরা ভগ্নকণ্ঠে গাওয়া হেমাঙ্গ বিশ্বাসের দুয়েকটি ক্যাসেট শুধু আজ আমাদের সম্বল।

এইসব তথ্য মনে রেখে এবারে আমরা গণসংগীতের একটা মূল বিতর্কের ইতিহাসে প্রবেশ করব। সে বিতর্ক সাংগীতিক।

চল্লিশের দশকের গণসংগীত প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাস নানা মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি তার বাণী ও সুর বিষয়ে। যেমন : [১৬]

> একথা ঠিক যে আমাদের তখনকার গানগুলিতে কাব্যগুণের যথেষ্টই অভাব ছিল। তখনকার পার্টি সেক্রেটারি পূরণচাঁদ যোশী আবার এই ব্যাপারগুলোতে খুব সংবেদনশীল ছিলেন। তিনি বললেন, এ যা হচ্ছে এ তো সব ছন্দে-বাঁধা শ্লোগান— versification of Party slogans! কথাটার মধ্যে সত্যি ছিল বৈকি! এই ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা সভা ডাকা হয়েছিল, তাতে প্রধান আলোচক ছিলেন ভবানী সেন। আমার মনে আছে রংপুর স্কোয়াড থেকে কমরেডরা সে অঞ্চলের সুবিখ্যাত লোকসংগীত 'ডাঙ্গর বধুয়ারে'-র অনুসরণে রচিত একটা গান নিয়ে এসেছিলেন : 'গরীব দেশবাসী গরীব কিষানভাই/তুই খেতৎ করলিরে ফসল/সেই ফসল কাড়িয়া নিল মজুতদার শয়তানে'। এ গান শুনে ভবানী সেন 'অত্যন্ত স্থূল' বলে মন্তব্য করেছিলেন। গানের রচনাসৌকর্য সম্বন্ধে পার্টি সচেতন হওয়ায় একটা উপকার হয়েছিল... কিন্তু আরেক সর্বনাশ ঘটলো। 'স্থূল' রচনার সমালোচনা করতে গিয়ে formalism-কে আশকারা দেওয়া হলো। কেবল form-কে উন্নত করলেই যে চলবে না, মূল প্রশ্নটা যে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু সংক্রান্ত, রাজনৈতিক বিষয়বস্তুই যে form-কে নিয়ন্ত্রিত করবে, এ কথাটা ভবানী সেন বললেন না। ...অর্থাৎ এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটা ছিল আঙ্গিক-সর্বস্ব।

এই আঙ্গিক-সর্বস্বতা বা formalism-প্রশ্ন হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে এতটাই মথিত করে যে, বোম্বাই অধিবেশনে মিউজিক কমিশনে তিনি গণসংগীতের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে একটি পেপার পড়েন। তা নিয়ে হয় জোর বিতর্ক। সেই বিতর্কে হেমাঙ্গ বলতে চেয়েছিলেন :[১৭]

> তেভাগা, নৌবিদ্রোহ, ২৯শে জুলাইয়ের ধর্মঘট থেকে এলাহাবাদ সম্মেলনের* অব্যবহিত পরে অবধি সলিলের গানের বিষয়বস্তু ও সুরারোপের মধ্যে যে vigour ছিল, তেলেঙ্গানার পরাজয় এবং পার্টির অতিবাম-শোধনবাদের** প্রভাবে তা স্তিমিত হয়ে আসে। সলিল সংগীতে formalism-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। পাশ্চাত্য orchestration-এর জ্ঞান ছিল তার, প্রথম থেকেই তার গানে এই ঝোঁক ছিল। কিন্তু সলিলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পশ্চিম বাংলার নতুন গীতিকাররা তারই ব্যর্থ অনুকরণ করতে শুরু করে দিলেন। এই formalism-কে তীব্র আক্রমণ করে

* সম্মেলন হয় ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯।

** হেমাঙ্গ বিশ্বাস 'অতিবাম-শোধনবাদ' বলতে সম্ভবত ১৯৪৮-৫০ সালে পার্টি-কর্তৃক অনুসৃত এবং পরবর্তীকালে সংজ্ঞায়িত 'ultra-left deviation', অর্থাৎ 'অতিবাম বিচ্যুতি'-কেই বুঝাতে চেয়েছেন।

আমি বলেছিলাম যে সলিল গণসংগীতে জাতীয় ঐতিহ্য হারিয়ে cosmopolitanism-এর পানে ধাওয়া করেছে।

এর অনেক পরে, ১৯৭৬ সালে, নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকে অবশ্য হেমাঙ্গ-র মনে হয়েছিল :

কিন্তু বিষয়বস্তুর আলোচনাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে এভাবে শুধু লোকআঙ্গিক নিয়ে বিতর্ক চালানো, ওটাও তো এক ধরনের formalism। সলিলের formalism-এর সমালোচনা করতে গিয়ে আমি নিজেও এক ধরনের formalism-এর শিকার হয়েছিলাম।

এই বিতর্কে সলিল চৌধুরীর কি ছিল বক্তব্য, তা 'প্রস্তুতিপর্ব' পত্রিকার ১৩৮৬ শারদ সংখ্যার এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্নোত্তরের টানাপোড়েনে বোনা আছে। আমরা এখানে সেই ধরণেই প্রাসঙ্গিক অংশ তুলছি।

প্রস্তুতিপর্ব ।। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার একটা বিতর্ক হয়েছিল বলে শুনেছি।

সলিল চৌধুরী ।। একটা কথা বলি। আমি পার্টিতে এসেছিলাম একজন accomplished musician হিসেবে। একেবারে অল্প বয়েস থেকে আমি পিয়ানো বাজিয়েছি, ক্লাসিকালের চর্চা করেছি, ওয়েস্টার্ন মিউজিকের চর্চা করেছি। আসামের চা বাগানে থাকতে থাকতে লোকসংগীত সম্পর্কেও জেনেছি। কাজেই আমার সাংগীতিক মানস অনেক বিস্তৃত ছিল। সুতরাং যখন কোনো content নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, সেই content-কে যখন সুরে ফেলে প্রকাশ করতে লাগলাম, an accomplished musician was doing it. স্বীকৃত যে form তাকে ভাঙা দরকার— কারণ নতুন content আসছে। 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে' আমাদের আগের কোনো ভারতীয় গানের ফর্মের মধ্যে পড়ে না। অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ— এই বাঁধাধরা চারতুকে বিভক্ত গানের ফর্মকে আমায় ভাঙতে হয়েছে 'রানার'-এ, 'পাল্কি চলে'-তে।*

প্রস্তুতিপর্ব ।। কিন্তু 'শ্রোতা কে'?— এই মানদণ্ডে আপনার আঙ্গিককে কি বিচার করেছেন? 'ঢেউ উঠছে'-র সুর আমাদের মতো মধ্যবিত্তের কানে অপূর্ব লাগে, কিন্তু শ্রমিক কৃষক কি এই সুর গ্রহণ করেছেন?

সলিল চৌধুরী।। সেটা যাচাইয়ের ক্ষেত্র ছিল পার্টি মিটিং। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কাছে গাইতে হয়েছে এ গান— তিনবার-চারবার করে। কৃষকদের মধ্যে অবশ্য বেশি জনপ্রিয় হয় 'ও মোদের দেশবাসীরে', 'হেই সামালো' 'বিচারপতি' প্রভৃতি।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, সব গান, সব কবিতাই সর্বদা শ্লোগান দিয়ে শেষ করতে হবে এটা ঠিক নয়। কোথাও কোথাও শ্লোগান নিশ্চয়ই আসবে, বিষয়ের প্রয়োজনেই। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসা, ব্যক্তিগত দুঃখবেদনারও তো স্থান থাকা চাই গানে? আমি তো মনে করি মানুষের এই ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলো আছে বলেই মানুষ সংগ্রাম করে। জীবন একটা total ব্যাপার, তার নানা দিক আছে, তার সবটাকেই ধরতে হবে গানে। কাজেই, পার্টি যখন অতিবাম রণদিভে-লাইন নিল, তার সঙ্গে আমার তীব্র বিরোধ হয়। শ্লোগানকে গান করতে হবে? আমি বলেছিলাম একটা গান দশটা বুলেটের সমান। হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ কবতে পারে তা। গীতিকার সুরকারকে অবশ্যই ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে হবে রাজনীতির সঙ্গে, কিন্তু তার অর্থ কি এই যে কারখানার গেটে গিয়ে গান তৈরি করতে হবে? সৃষ্টির উৎসকেই যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে গান তৈরি হবে কী করে? আসলে পুরো ব্যাপারটা এত যান্ত্রিক! ...হেমাঙ্গদারা বললেন, যা আছে তাই থাকবে, চাষীরা যা বোঝে শুধু সেই সুরই ব্যবহার করতে হবে, অন্য কিছু চলবে না।... জীবন এগিয়ে চলেছে, আর

* সলিল চৌধুরীর অনেক আগেই অবশ্য এই ফর্ম ভেঙেছেন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল।— লেখক

আমরা সেই পুরোনো জিনিষকেই আঁকড়ে ধরে থাকবো?

সংস্কৃতি আগে বাড়বে না? বুর্জোয়া সংগীত ফর্মের দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আর আমরা যদি সেই চাষীর গানকেই আঁকড়ে ধরে থাকি, তাহলে কোনোদিনও আমরা তাকে fight করতে পারবো না।

সলিল চৌধুরির এসব বিশ্লেষণে অনেক সারসত্য আছে। তাঁর মধ্যে একটা পরিণত সংগীতবুদ্ধি এবং সৃষ্টিধর্মিতার আকুলতা ছিল। গানকে, এমনকি গণসংগীতকে তিনি total দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে চেয়েছিলেন, সেটা পঞ্চাশের দশকে পার্টি মেনে নেয়নি। ফলে, আই. পি. টি. এ ছেড়ে তিনি চলে যান। তাঁর খেদোক্তি :[১৮]

আমার অপরাধ আমিই প্রথম গণনাট্যে পাশ্চাত্য মিউজিকের আধুনিক টেকনিক এনেছি। আমার যুক্তি হলো : জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, সাহিত্যে, শিল্পে, নাটকে, চিত্রকলায়, যদি বিদেশি ফর্ম নেওয়া যায়, তবে গানে নয় কেন? এ-কাজ তো প্রথম শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তাহলে সব মিলিয়ে আমরা কোন্ সিদ্ধান্ত আসব? গণসংগীত যে পঞ্চাশের দশক থেকে ক্রমপতনের পথে চলে গেল সেকি দলের সাংস্কৃতিক পন্থা পরিবর্তনের কারণে, না অন্য কোনো ব্যক্তি-বিসম্বাদে? সমস্ত ব্যাপারটা কি হঠাৎ শুরু হয়েছিল এবং সেই রকম হঠাৎ শেষ? সমস্যা কি content, না form-এর? গণসংগীত কি ঐতিহ্যছুট হলে বেঁচে থাকত? স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বামপন্থী রাজনীতি দল ভাঙ্গাভাঙ্গি করে ক্রমশ সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে ফেলে পরিষদীয় রাজনীতির দিকে ঝুঁকে গেল বলে কি দেশব্যাপী গানের আয়োজন পালটে গেল নির্বাচনিক আগ্রহে?

বাংলার গণসংগীতের গৌরবময় ইতিহাস আজ অনেক রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মানুষের কাছে অপরিম্লান শ্রদ্ধেয় স্মৃতি। বাংলা গানের চলমান সুদীর্ঘ ধারায় গণসংগীত একটা বড় দিক পরিবর্তনের আভাস ও প্রত্যাশা জাগিয়ে ক্ষীয়মাণ হয়ে গেছে। কিন্তু গণসংগীত পরবর্তী রাজনৈতিক ও গীতিকার-সুরকারদের সামনে তেমন কোনো স্থির আদর্শ রাখতে পারেনি। তবে কি আমাদের গণসংগীত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল? সুরের দিকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলিল চৌধুরি যে পৃথক অবস্থান ও পদ্ধতি নিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত তার কোনো সিনথিসিস্ হয়নি। বিনয় রায় মস্কো, জ্যোতিরিন্দ্র দিল্লী, সলিল বোম্বাই চলে যান। দেবব্রত চলে যান রবীন্দ্রগানের জগতে। হেমাঙ্গ তাঁর বামপন্থী বিশ্বাসের লড়াইয়ে ও অসুস্থতায় গানের ক্ষেত্রে ততটা সক্রিয় থাকতে পারেননি। শেষ জীবনে আরেকবার গানের দল গড়ে চেষ্টা নিয়েছিলেন। ভূপেন হাজারিকা সবরকম গানে বিচরণ করেছেন। নির্মলেন্দু চলে যান 'ফোকো-মডার্ন' পথে। হীরালাল সরখেল হয়ে যান শ্যামাসংগীতের শিল্পী।

অন্যদিকে নিবারণ পণ্ডিত শেষজীবনে বিভ্রান্ত ও প্রশ্নাকুল হয়ে চিঠিতে লেখেন : 'জীবনের শেষ পর্যায়ে আসিয়াও আত্মবিক্রয় করিতে পারিতেছি না। যতটুকু বুঝি, যেটুকু কাজ করিতে পারি কাজই করিতে চাই। কিন্তু বুঝি না সঠিক কি বেঠিক, তাই ধাঁধায় পড়িয়াছি। সঠিক পথটি কি? আমাদের শিল্পীদের কোন্ পথ ধরিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত? ভ্রান্তনীতি বহন করে না কোন্ পার্টি? কোন্ পার্টি বা পার্টিনীতি দেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইতে সক্ষম?' গুরুদাস পাল চিঠিতে লেখেন : 'রাজনীতির মঞ্চে আমি নীরব দর্শক, পারিবারিক জীবনে ব্যর্থ, ব্যক্তিগত জড়জীবনে রুগ্ন আর মানসজীবনে অশান্তির আঁধার। কাজেই এই পৃথিবীর মাটিতে আমার অস্তিত্ব শূন্যমাত্র। সাংস্কৃতিক জীবনে যেটুকু টিমটিম করছিলাম তাও নানান্ প্রতিকূলতার ঘাতসংঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। বলা যায় সাংস্কৃতিক জীবনে আমি অপাংক্তেয়।' আর সবচেয়ে মর্মন্তুদ খবরটি জানা যায় বাউল-গায়ক একদা গণশিল্পী অখিল চক্রবর্তী সম্পর্কে। মৃত্যুর আগে

তিনি থাকতেন আগরতলায়। তাঁর ছিল ধর্মব্যবসায়— যাকে বলে বড়ো গোঁসাই। শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি ভক্তিমূলক গান গেয়ে 'বার্ষিক' আদায় ছিল তাঁর জীবিকা।

৪

বাংলা গণসংগীতের পর্ব কি তবে পঞ্চাশের দশকেই শেষ হয়ে গেছে? কয়েকজনের ব্যক্তিগত স্ববিরোধ বা অবসৃতি কি একটা দেশের বিপুল ধারাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে? পারে না, তবে ধরন বদলে যায়, বদলে যায় বিষয়। আন্তর্জাতিক ভাবনার জায়গায় দেশের স্পন্দমান সংকট বা হঠাৎ-ঘনিয়ে-ওঠা ঘটনা তৈরি করতে পারে গণসংগীত, যেমন চাসনালার খনি দুর্ঘটনা বা ভোপালের ঘটনা নিয়ে গান জেগে উঠেছে। প্রতিবেশী পূর্ববঙ্গে ভাষা-আন্দোলন নিয়ে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র মতো বহু জনপ্রিয় গান গণ-আন্দোলন থেকে গড়ে উঠেছে। দুই বাংলার মিলন-স্বপ্নকে নিয়ে এ বাংলায় 'গঙ্গা আমার মা/পদ্মা আমার মা'-র মতো আর্দ্র হৃদয়াবেগের লোকচিত্তজয়ী গান হয়েছে। এককালে আর. এস. পি-র সংগঠন 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ' অনেক গণসংগীত উপহার দিয়েছে। প্রথমপর্বের গণনাট্য আন্দোলন পঞ্চাশের দশকে ম্লান হয়ে এলেও পরবর্তীকালে ভূপেন হাজারিকা, অজিত পাণ্ডে প্রমুখ গণসংগীতের ধারাকে স্রোতবতী রেখেছেন। সেই সঙ্গে পরেশ ধর, সাধন দাশগুপ্ত, শ্যামল গুহ, অনল চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, দিলীপ সেনগুপ্ত প্রমুখেরা নানাভাবে গণসংগীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত ছিলেন। তবে এঁদের গান আগেকার মতো সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েনি, তার একটা বড় কারণ দেশব্যাপী সুবিস্তৃত গণসংগীতের স্কোয়াডের অভাব; কিছুটা বা গণসংগঠনগুলির ঢিলেমি ও আত্মতুষ্টির আলস্য। খুব বড় মাপের সৃষ্টিও যে হয়নি এ-পর্বে তাও মনে রাখতে হবে।

গণসংগীতের পক্ষে তার চেয়েও যেটা বড় অন্তর্ঘাত, অর্থাৎ দল বিভাজন, ষাটের দশককে গণসংগীতের সৃজনকর্ম থেকে দূরে রেখেছিল। তারপরে নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং তার মূল্যায়নে বহুদিন গেল। কিন্তু সেই সত্তর আর আশির দশকে গণসংগীতের ধারাস্রোত বহতাধর্ম ত্যাগ করেনি। নকশালপন্থীদের রাজনৈতিক আন্দোলনে গানের উজ্জীবনের ভূমিকার কথা আমরা জানি। এ পর্যায়ে বহু গান লেখা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি সেভাবে সংরক্ষিত বা সংকলিত হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে গণসংগীতের প্রবল শত্রু হিসাবে এসে গেছে আধুনিক মিডিয়া— দূরদর্শন, ভিডিও, ক্যাসেট ও পপ গান। অপসংস্কৃতির সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতির দেশব্যাপী সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সুস্থ স্বাভাবিক সৃজনশীল মানুষ প্রতিদিনের জীবনে প্রতি পদে নীতি ও আদর্শ রক্ষা করতে এখন বেসামাল। গণসংগীতের সেই কারণে এখন খুব সংকটকাল। অন্তত চল্লিশের দশকের সেই উত্তাল সময়ের ব্যাপক জনসংযোগ আজকে অনেক প্রগতিবদ্ধ দলের নেই। পপ-কালচারের রুচি-বিকৃতির এমন দাপট কয়েক দশক আগেও এদেশে অজ্ঞাত ছিল। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নে বামপন্থীদের ছোট ছোট শিবির এত ছিন্ন যে গণসংগীতের ভাবনাগত সম্মেলক কোনো উপাদান বা সংগঠন গড়ে উঠছে না। সত্যিকারের গণচেতনার উষ্ণতায় নির্মিত গান যদি পরিবেশনের প্রয়োগগত চাতুর্যে তাৎপর্য হারায় তবে তার শোচনীয়তা ভাবা যায় না। গুরুদাস পালের লেখা বিখ্যাত গণসংগীত 'থাকিলে ডোবা খানা' এখন শিল্পী মঞ্চে গাইছেন এবং তরুণ শ্রোতারা কোমর দোলাচ্ছেন— এ দৃশ্য এখন দৈনন্দিনের। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, নির্মলেন্দু চৌধুরি লোকসংগীতকে বিকৃত করেছেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এমন অভিযোগের সূত্রে দেবব্রত বিশ্বাস চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন (তাঁর অনুপম কিশোরগঞ্জী উপভাষায়);'তার ত গান হুনাইয়া প্যেট চালানি লাগব—হেই লাইগ্যা তারে ফোকো-জাজ, ফোকো ফক্‌স্‌ট্রট, ফোকো-পপ্ বানাইয়া শ্রুতারারে খুশী কইরা প্যেট চালানি লাগব'। কথাটা আজ

অন্যের ক্ষেত্রেও নির্মম সত্য হয়ে উঠেছে।

সংকট অন্যধরনের রয়ে গেছে। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পর এদেশে দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা এবং বহুতর গণসংগ্রামে ও উজ্জীবনের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু গীতিকাররা সবসময়ে সেই প্রসঙ্গের গুরুত্ব বুঝে সময়োপযোগী গান রচনা করতে পারেননি। তবু সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত *গণসংগীত* সংকলনে ও অন্যত্র নানা ধরনের সাম্প্রতিক গান রচনার প্রণিধানযোগ্য নমুনা পাওয়া যাবে। তাতে এই বর্গের গানের বিষয়গত বৈচিত্র্য লক্ষ করবার বিষয়। এখানে খুব অনায়াসে কয়েকটা গানের অংশ তুলছি ব্যাপারটা বোঝাতে।

১. দিবসগুলি পালিত হয়
　　শপথগুলি নয়
নকল বুঁদির কেল্লা গড়ে
　　নকল শত্রু জয়।
　　　　(রঞ্জিত গুপ্ত)

২. ও শহিদের মা
তুমি আর কাইন্দো না
মাগো, চাইয়া দ্যাখো সমস্ত দ্যাশটাই আজ জেলখানা (সাগর চক্রবর্তী)

৩. শুইনলাম চাঁদে মানুষ জমি লিছে
বাঘের মাস মানুষ খাইছে
পাতালেতে রেল চলিছে
তবু পেটের ভুখ তো মিটছে নাই। (অরুণ চট্টোপাধ্যায়)

৪. গণসংগীত শুধু গান না
এ যে ন্যায়ের বিরহে সপ্তসুরের
　　বাণীকে জড়িয়ে ধরে কান্না। (অনুপ মুখোপাধ্যায়)

৫. কইলকাতায় বইস্যা কমরেড
সারাজনম খোয়ালে
শুধু কথার জাবনা কেটে
কফি হাউস গোয়ালে
একবার মোদের গেরামে আইস্য কমরেড
ফুরসৎ যদি পাও
দেইখ্‌বে ক'মণ ধানে ওঠে কত চাল
কতোয় মেলে তাও। (স্বরূপ মুখোপাধ্যায়)

৬. ধেত্‌তেরিকি বইলে হামার মন চায় উইট্যে যাইত্যে
যখন বাবুরা দেশের কথা বলে
যখন বাবুরা দশের কথা বলে।

বাবুদের খানাপিনা হবেক্ নাই মাছ বিনা
বাবুদের খানাপিনা হবেক্ নাই মানস্ বিনা

হামাদের ভুখা পেটে হিলি হিলি আগুন জ্বলে
ধেত্‌তেরিকি— (বিপুল চক্রবর্তী)

৭. আকাশ আঁকলে উড়ে আসে
পিকাসোর পায়রা (শ্যামলবরণ সাহা)

জানি, সাতটি গণসংগীতের খণ্ডাংশ মাত্র নমুনার মধ্যে সাম্প্রতিক প্রবণতার সামান্যই মাত্র ধরা পড়বে। তবু আমার বোঝাবার কথা এই যে, গণসংগীত থেমে যায়নি বা পথভ্রষ্ট হয়নি। আন্তরিক সততার সঙ্গে নতুন গীতিকাররা তাঁদের ব্রতী জীবনের সত্যকে বোঝাতে চাইছেন। অনেক ক্ষেত্রে গীতিকার সুরকার ও রূপকার একই ব্যক্তি। সুরের ক্ষেত্রে অনেক লোকায়ত গীতিধারার পরীক্ষা দেখা যাচ্ছে, যেমন বাণীতে আসছে পূর্ববঙ্গের ভাষা ছাড়াও বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বর্ধমানের গ্রাম্য উচ্চারণ ও ডায়ালেক্ট। এখনকার প্রধান রচয়িতাদের মধ্যে প্রতুল মুখোপাধ্যায় বিপুল চক্রবর্তী, সাগর চক্রবর্তী, মেঘনাদ, সরিৎ চক্রবর্তী, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ মুখোপাধ্যায়েরা যথেষ্ট নিষ্ঠাবান ও সক্রিয়। তবে তাঁদের মধ্যে ভাবনা আর বিশ্বাসের বিচ্ছিন্নতা আছে। কিন্তু উদ্যমের ঘাটতি নেই। অবশ্য একথাও সত্য যে এইসব তরুণ ও তরুণতর শিল্পীদের প্রয়াস ব্যাপক প্রচার ও প্রসার পায়নি। গ্রমোফোন কোম্পানিগুলি, দূরদর্শন এবং আকাশবাণী গণসংগীতের সদ্যতন রচনাগুলি সম্প্রচার করলে বাংলা গানের বন্ধ্যদশায় কিছু জীবনস্পন্দী উচ্চারণের জ্যোতিসম্পাত ঘটতে পারে। এদেশে সে আশা অবশ্য অলীক।

যাহোক, অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির মুখে শুনতে পাই বাংলা গণসংগীতের স্বর্ণযুগ ছিল পঞ্চাশের দশক। তারপরে যা এখন আছে তাকে গান না বলে শ্লোগান বলা উচিত। এ-মন্তব্যে দুটি ভ্রান্তি রয়েছে। প্রথমত ইতিহাসকে সঠিক চোখে দেখাবার বা বোঝবার ভ্রান্তি, দ্বিতীয়ত আমাদের তরুণ ও তরুণতর গণগায়কদের প্রতি অন্যায়রকম অনাস্থার ভ্রান্তদৃষ্টি। দুটোই মারাত্মক। ঠিকই যে, পঞ্চাশের দশকে বাংলা গণসংগীত তার ভাব ও সুরের অভিনবত্বে চমকে দিয়েছিল সকলকে। একটা জাগরণ ও উজ্জীবনের লক্ষণ আধুনিক বাংলা গানের ধারায় সঞ্চার করেছিল গণসংগীত। হয়তো সেই ধারা ততটা জায়মানতায় রক্ষিত হয়নি, কিন্তু সেই ধারা খাত বদল করেছে। তার কারণ ষাটের দশক থেকে বাংলার রাজনীতির প্রগতিপন্থীদের নানা সংকট, সংশয় আর বিভাজন আসে। সংঘবদ্ধ সমন্বিত গণ-আন্দোলনের চারিত্র্যে কিছুটা চিড় ধরে। নানা সূক্ষ্ম মতাদর্শের ঘূর্ণিপাকে সব কটি মার্কসবাদী দল আলোড়িত হয়। সেই মুহূর্তে প্রধান লক্ষ্য ছিল সাংগঠনিক, অবশ্য পাশাপাশি সংগ্রামে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তত্ত্বগত মত প্রতিষ্ঠার একটা উগ্রতাও ছিল নানা পক্ষে। সেই সংশয়কাল ঠিক হয়তো গানের পক্ষে অনুকূল ছিল না। গণসংগীতকাররা বরং খানিকটা হতচকিত বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন সে সময়, তবে থেমে থাকেননি। এমনকি এদেশের নকশালবাদী দলেও গানের একটা সজীব ভূমিকা ছিল, যার অনেকটাই রক্ষিত হয়নি। উদ্যমী সন্ধানীরা চেষ্টা করলে সত্তরের দশকের অনেক গান সংগ্রহ করতে পারেন এখনও। অনেকের স্মৃতিধার্য হয়ে আছে সেসব গান, জানি।

আজকের এই সমসময়ে, নানা বিভাজন সত্ত্বেও গণসংগীত-শিল্পীরা গানের সৃজনে ও প্রচারে রত আছেন। প্রাচীনদের মধ্যে ভূপেন হাজারিকা সহ অনেকেই এখনও ক্রিয়াপর। অজিত পাণ্ডের সদ্যতন এক ক্যাসেটে ঘোষণা রয়েছে : 'শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নাটক চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতে রুচি ফেরানোর আন্দোলন আপনি আমার সহযোদ্ধা।' এমত অঙ্গীকার থেকে গণশিল্পীর প্রত্যয় এবং শ্রোতৃ-সচেতনতা ফুটে ওঠে। লক্ষ করা যায়, সাম্প্রতিক প্রবণতা হলো, ক্যাসেটের একটি শিরোনাম দেওয়া। এখনকার গণশিল্পীদের কয়েকটি ক্যাসেটের শিরোনামের তালিকা দিচ্ছি, তার থেকে একটা দৃষ্টিভঙ্গীগত ধারণা ফুটে উঠবে।

অজিত পাণ্ডে— 'প্রেমে ও প্রতিবাদে'

নরেন মুখোপাধ্যায়— 'ম্যাণ্ডেলা ও মুক্তির গান'

সুরেশ বিশ্বাস— 'সুপ্ত আগুন আছে ক্রোধে মিশে'

অনুশ্রী ও বিপুল চক্রবর্তী— 'আমরা হাঁটি যেখানে মাটি'

মেঘনাদ— 'মে দিনের শতবর্ষে'

অনুপ মুখোপাধ্যায়— 'ককিয়ে ওঠা কান্নাগুলো ভুলিয়ে দাও'

গণসংগীতের এই ক্যাসেটবদ্ধতা ও প্রচার এক ধরনের বহতার সূচনা করছে। অনুরাগী প্রগতিপন্থী ব্যক্তি ও নানা সংগঠন সহজে গানগুলি পেয়ে যাচ্ছেন এবং তার ফলে এ-সব গান নতুন প্রাণশক্তিতে বয়ে চলছে এবং চলবে। তার থেকে নতুন গান জেগে উঠবে এ-প্রত্যাশাও স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত ও নাটক আকাদেমি গণসংগীতের সংকলন ও স্বরলিপি প্রচার করছেন স্বল্পমূল্যে। সেখানে প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ সেনগুপ্ত-র মতো অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিরা আছেন তাই ভরসা রাখা যায়।* গণসংগীতের সঙ্গে যুক্ত নানা মত ও পথের গীতিকার-সুরকার-শিল্পীদের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে অবিলম্বে লেখা দরকার বাংলা-গণসংগীতের ধারাবাহিক ইতিহাস।

গণসংগীতের সাম্প্রতিক প্রবণতা বিচার করলে দেখা যাবে দেশকালের সমস্যা ও সংকটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চেতনার একটা বড় ভূমিকা রয়ে গেছে। নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে নিয়ে কালোমানুষ ও আফ্রিকার পক্ষে গান তৈরি হয়েছে। সাউথ আফ্রিকান লিবারেশন ফ্রন্ট, পল রবসন ও নখুমার গানের বাংলা রূপান্তর গেয়েছেন নরেন মুখোপাধ্যায়। প্রতিবেশী বাংলাদেশের সিকান্দার আবু জাফর, অধ্যাপক সামাদীর লেখা গান এখানকার গণশিল্পী গাইছেন। ১৯৭৫ সালের এমার্জেন্সীর সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনৈতিক বন্দী কিষ্টা গৌর ও ভুমাইয়ার ফাঁসির প্রতিবাদে গান গেয়েছেন মেঘনাদ। মে-দিন, চের্নোবিল ও ভূপালের দুর্ঘটনা হয়েছে গণগানের প্রসারিত প্রসঙ্গ। এর পাশে ড্রাগ ও মদ্যপানবিরোধী গান লেখা ও প্রচার চলছে। এ-সব কোনো নন্দনের বিষয় নয় হয়তো, কিন্তু আধুনিক সচেতন জীবনের যাপনগত দৈনন্দিনের অংশ। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বাংলা গণসংগীতে বলা হয়েছে :

মানুষের নাম হয় ঈশ্বর আল্লা আরেক নাম
কত শত নাম যে তাহার হরি বিষ্ণু রাম।

সুরেশ বিশ্বাসের উদাত্ত কণ্ঠে শহীদদের আত্মদানের বেদনা ঝংকৃত হয়। অনুশ্রী বিপুল 'অনেক বরণ গাভী রে ভাই' গানে সৌভ্রাত্রের বাণী ছড়ান। অনুপ মুখোপাধ্যায় তাঁর গানে বলেন,

স্বপ্নলোক হতে রূঢ় বাস্তবের পথে
এসো মিলি জীবনের মিছিলের সাথে।
লক্ষ প্রাণ বন্ধ কারার অন্তরালে
আজও ধুঁকে মরে—
ডাণ্ডাবেড়ির বিনা বিচারের আঁধারে।
মুক্তকণ্ঠে তোলো এ আওয়াজ—
একটি রাতও কাটাবো না বিনা বিচারে
কোনো থানার লকআপে।

বিনা বিচারে বন্দীর বেদনা গণসংগীতের থিমে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছে সন্দেহ নেই। মনে হয়, এখনকার বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক প্রগতি-শিবির সত্ত্বেও গণসংগীত রচনা ও প্রচারের ধারা চলমান আছে।

রাজনৈতিক মত ও পথের ভিন্নতা মেনেও গানের,গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়নি। এই কারণেই হয়তো জেগে উঠবে গণসংগীতের নতুন সম্ভার, অদূর ভবিষ্যতে।

তবে দরকার নতুন গানের দল, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুনতর গীতিকার-সুরকার। এখনকার গণগীতি সুর ও বাণী বিদেশি রীতি ও লোকায়ত ঢঙের নানা নিরীক্ষায় সবল। সুরে কর্ডের ব্যবহার ও বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের নমুনা যেমন রয়েছে তেমনই একতারা, আনন্দলহরী, সারিন্দার ব্যবহারও কানে বাজে। গণসংগীতের কয়েকটি ক্যাসেটে মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের কিছু অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা ও আয়োজন আধুনিক চেতনাকেই প্রমাণ করে। তেমনই উত্তরবঙ্গে বা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ডায়েলেক্টে লেখা গানের বাণী মাটির সংযোগে প্রাণবান লাগে। আমরা এ-সব প্রবণতাকে সাধুবাদ জানিয়ে অপেক্ষা করে থাকব সেই চরম সংগীতের গভীরতার সন্ধানে, যা একই সামগ্রিকতায় বাঁধবে গান ও গণবোধকে।

উল্লেখপঞ্জি

১. মাটির সুরের খোঁজে : রণজিৎ সিংহ। কলকাতা। ১৯৯০। পৃষ্ঠা ১৭
২. বাংলা স্বদেশী গান : গীতা চট্টোপাধ্যায়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী। ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ৬৮।
৩. উজান গাঙ বাইয়া : হেমাঙ্গ বিশ্বাস। অনুষ্টুপ। কলকাতা। ১৯৯০। পৃষ্ঠা ৮৬
৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ : সুধীর চক্রবর্তী। কলকাতা। দ্রঃ 'স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব' অধ্যায়।
৫. শিলাদিত্য। নবপর্যায়, প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। জানুয়ারি, ১৯৮২। পৃষ্ঠা ১০
৬. বাংলার প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য আন্দোলন কেন ব্যর্থ হলো? —সৌরি ঘটক। শিলাদিত্য। ঐ। পৃষ্ঠা ৯-১০
৭. ঐ। ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৮-৯
৮. উজান গাঙ বাইয়া। পৃষ্ঠা ৯৭
৯. শিলাদিত্য। ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৬
১০. লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম। কলকাতা। ১৯৭৮। পৃষ্ঠা ১৪১-৪২
১১. শিলাদিত্য। ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৭-৮
১২. প্রস্তুতিপর্ব। শারদীয়া ১৩৮৬। 'সলিল চৌধুরী : একটি সাক্ষাৎকার'। পৃষ্ঠা ৭৩
১৩. শিলাদিত্য। মার্চ, ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৭
১৪. উজান গাঙ বাইয়া-তে উদ্ধৃত। চিঠিপত্র বিভাগ। পৃষ্ঠা ৫০
১৫. শিলাদিত্য। মার্চ, ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৫
১৬. উজান গাঙ বাইয়া। পৃষ্ঠা ৯০
১৭. শিলাদিত্য। মার্চ, ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৮



যে-গান আমাদের নেই

ফাদার দ্যতিয়েন দু'দশক ছিলেন কলকাতায়। তারপরে ফিরে যান স্বভূমি বেলজিয়ামে। কলকাতায় থাকাকালে তিনি যে চমৎকার বাংলা লিখতেন বা বলতেন শুধু তাই নয়, বাংলা গান সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। এক দশক বেলজিয়ামে কাটিয়ে কিছুকাল আগে হঠাৎ আবার স্বল্প ক'মাসের জন্য কলকাতা এসেছিলেন দ্যতিয়েন। বাঙালি সংস্কৃতির একটি বন্ধ্যত্বের লক্ষণ, বিশেষত গানের ক্ষেত্রে, এবারে তাঁর চোখে পড়ে। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন যে, গত এক দশকে গানের ব্যাপারে বাঙালি এক পা-ও এগোয়নি। মনে পড়ে, যখন তিনি বেলজিয়ামে ফিরে যান তখন এখানে রবীন্দ্রসংগীতের একচ্ছত্র স্বমহিম চলমানতা ছিল, ফিরে এসে দেখলেন দশবছরে শিষ্ট শিক্ষিত বাঙালি সমাজে, সভাসমিতিতে, সেই একমেব রবীন্দ্রসংগীতই চলছে। নতুন গান কিছু জাগেনি। একটি ঘরোয়া সভায় এই বৃত্তান্ত জানিয়ে দ্যতিয়েন মন্তব্য করলেন, এমনকি আশ্চর্য যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র লোক-সংস্কৃতি বিভাগে (যেখানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে ঐ বিষয়ে) উদ্বোধন সংগীত হিসাবে ব্যবহৃত হল একটি রবীন্দ্রনাথের গান। একটা লোকসংগীত গাওয়াই কি সঠিক হত না ঐ বিশেষ বিভাগে? প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বিষণ্ণভাবে চেয়ে রইলেন।

বিদেশি শ্রোতার সামনে আমাদের যে সৃষ্টিহীনতার দৈন্য ধরা পড়ল, সচরাচর আমাদের তা মনেই আসে না। তার কারণ, বিশেষত গানের ক্ষেত্রে বাঙালির কোনো নতুন প্রত্যাশা বোধহয় নেই। লোকসংগীত বিষয়ে খানিকটা দেখনদারি দরদ হয়তো আছে, আধুনিক গান বা তার বিচিত্র বিষয়গত সম্ভাবনায় কিন্তু বাঙালি উৎসাহী নন। গণসংগীত হয়ে উঠেছে প্রথারক্ষার মতো। সমকালীন বাংলা গানে রুগ্ন রোমান্টিক প্রেম-বিরহ ছাড়া কোনো সমাজসত্য বা ক্ষোভ-বেদনাকে কি আমরা চাই না? আর এইসব শূন্যতা বা আত্মপ্রবঞ্চনাই কি আমরা ঢাকতে চাই রবীন্দ্রসংগীতকে সদা সর্বদা ও সর্বত্র ব্যবহার করে? আজ থেকে বেশ ক' বছর আগে লেখা আমার একটি রচনাংশ এখানে প্রসঙ্গত উদ্ধার করছি :[১]

রবীন্দ্রসংগীত এখন আমাদের সবচেয়ে মননহীন অপচয়ের সামগ্রী, তার ব্যবহার দারুণ অপরিকল্পিত হেলাফেলায়। তার প্রধান কারণ গুরুগম্ভীর সম্মেলনের সভাশোভন উদ্বোধকের মতো রবীন্দ্রসংগীত সব জায়গায় বেশ মানানসই ও রুচিকর। সভাসূচনা ও সমাপনের রবীন্দ্রসংগীত, তা যত বিসদৃশভাবেই নির্বাচিত হোক, সুনিশ্চিতভাবে উদ্যোক্তাদের করে নিশ্চিন্ত, সভাকে করে নিশ্ছিদ্র। রবীন্দ্রসংগীত এখন আমাদের সবচেয়ে এলোমেলো সমাবেশেও জনপ্রিয় রক্ষাকবচ। ...রবীন্দ্রসংগীত নামক এক সম্পন্ন উত্তরাধিকার বাঙালি এখন ধ্বংসোন্মুখ কুলীন গৃহকর্তার মতো শুধু ভাঙছে আর খাচ্ছে।

কথাগুলি এখনও দেখছি, এমনকি দ্যতিয়েনের দৃষ্টিকোণ থেকেও, সমান সত্য ও প্রাসঙ্গিক। সেইসঙ্গে মনে আসে এমন জিজ্ঞাসা যে সর্বত্র সব দেশে কি এমনই চলছে গানের ক্ষেত্রে? জানি, বুঝি, খবর পাই, পাশ্চাত্য জগৎ সব সময়ে ঝমঝম করছে পপ গানের উত্তাল তরঙ্গে, তার তীব্র তীক্ষ্ণ তালে স্পন্দে। উৎকট পোশাক পরা গানের দল, অদ্ভুত মুখসজ্জা করে, নেচে, গানকে করে তুলছে শরীরী ও ইঙ্গিতপূর্ণ। তার ঢেউ আমাদেরও বাণিজ্যজগতের গানে, মঞ্চে, বিভ্রান্ত যুবসমাজে কম আলোড়ন আনেনি। এখানেও, এমনকি কলকাতায়, অভারতীয় বেশবাসে ভারতীয় পপ-রক গায়কগায়িকাদের আকর্ষণ যুবসমাজে কম নয়; এবং তার কারণও স্পষ্ট অনুমেয়। কিন্তু পশ্চিমীদেশে এই বাণিজ্যিক পপ-রকের সমান্তরালে বা একটা সীমায়িত শ্রোতৃ-পরিমণ্ডলে যে আরেকরকম মর্মভেদী গানের আয়োজন চলছে তার খবর আমরা তেমন জানতে পারি না। যেমন ধরা যাক, অস্ট্রেলিয়ায় এমন একটি গানের দল আছে যাদের নাম মিডনাইট অয়েল (সংক্ষেপে MNO)। দলটি আধুনিককালের অস্ট্রেলিয়ায় বিপুল জনপ্রিয় শুধু নয়, বিশেষভাবে বাণিজ্যসফল। অথচ এই গায়কদলের যিনি মূল গায়েন ও গীতিকার সেই পিটার গ্যারেট ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে লড়েছিলেন নিউক্লিয়ার ডিসআর্মামেন্ট দলের হয়ে। তাই আশ্চর্য লাগে না, যখন শুনি MNO-র গানের একটা বিষয় হল শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলীয় ভূমিপুত্রদের ক্ষোভ ও বেদনার অন্তর্বাষ্প। গানটির শিরোনাম 'The Dead Heart', এখানে অনেকটাই উদ্ধার করছি।'[২]

We don't serve your country
Don't serve your king.
Know your custom don't speak your toungue
White man came and took everything.
White man listen all the songs we sing
We carry in our hearts the true country
And that can not be stolen
We follow in the steps of ancestry
And that can not be broken.
We don't need protection
Don't need your land
Keep your promise on where we stand
We will listen we'll understand.
Mining companies, Pastoral companies
Uranium companies
Got more right than people
Got more say than people

আমরা এদেশে ভাবতে পারি না এমন একটি গান তৈরি করব এবং তা গাইবে লক্ষ লক্ষ রেকর্ড বিক্রির এক জনপ্রিয় তরুণদল। অবশ্য এ আক্ষেপের একটা উলটো দিক আছে। আমাদের গণসংগীত, প্রতিবাদ ও ক্ষোভের গান, উদ্দীপনা ও জাগৃতির গান রয়েছে। কিন্তু তার কোনো পরিব্যাপ্তি নেই, সঞ্চালন নেই,

অর্থকরী সফলতা নেই। যেন তা শুধু একটি দলের ভাষ্য, কয়েকজন বিশ্বাসী ব্রতী মানুষের সংবৃত বাণী। তার আবেদন আছে কিন্তু গ্রহণীয়তা নেই।

এর একটা কারণ, প্রথম থেকেই ভারতীয় গানের অন্তঃপ্রকৃতিতে একধরনের নির্জন একাকী মন পরিতৃপ্ত হয়। সম্মেলক গান ও তার বহুবর্গের শ্রোতা এদেশে গড়ে ওঠেনি। শেষ উনিশ শতকে গড়ে উঠেছে বাংলা গানে কোরাস গানের সংযোগ। সেটাও বিলিতি আদর্শে এবং প্রধানত জাতীয়তাবাদী গানে। আর এখন, রবীন্দ্র-নজরুল গানের জনপ্রিয়তার যুগে, গজলের উত্তুঙ্গতায় ও ফিল্মি গানার বীভৎসতায় এদেশে গানের মধ্যে গীতিকারের দায়, সমাজ-ইতিহাস-বাস্তবতার দায় কমে যাচ্ছে বা নেই। বিদেশে এটা আছে তাই সেখানে অন্যধরনের গান লেখা হচ্ছে। এইরকম একটা চমকে দেওয়া গানের অংশে বলা হচ্ছে (রচনা ১৯৮০) :

Holding you in my world car,
It's like eating pie-floater with Soya Sauce.
With the design drawn in Europe
And assembled cheap in Asia
And the profit going to America still of course.

আন্তর্জাতিক শোষণের এমন একটা গান কিন্তু আমরা লিখতে পারি না। অথচ লিখতে পারি না এখনকার ব্যক্তি-হতাশার ও স্বপ্নভঙ্গেরও তেমন গান, যেমন শুনি :

Christ! I want to be somebody!
A millionaire, a rock star,
A saint, a prophet or at least
I want to be myself,
It's possible, but only here (in the bathroom)।[৩]

ভাববার কারণ নেই এই গান, যার শিরোনাম 'Ode to a Bathroom' একটা যেমন- তেমন গান। এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুলভাবে বিপণনক্ষম গান এবং সমাজতাত্ত্বিকের মতে, এতে আছে 'youth situation in their usual ironic but also rather dramatic manner'। সারা পৃথিবীর মধ্যে রুদ্ধ স্নানঘরের একাকিত্ব একমাত্র আত্ম অনুভবের জায়গা আজকের যুবসমাজে, বিচ্ছিন্নতা এতখানি আত্মগ্রাসী? এমনই আরো নিঃসঙ্গতাময় গানে ফুটে উঠেছে তীব্র আতর্তি :

The years are flying past.
Soon you and I together
Will leave the town.
Somewhere in the dense dark woods
Or on a steep mountainside
We'll build ourselves a house.
There is such a silence there
As we could never dream of
Behind that wall of silence
There will be room for both of us.
We'll build heavy door,
We'll chain by the door
Eight big hungry dogs.

They won't sleep nor let near
Sorrow, enemies or fools.

সমাজের বাইরে উচ্চচূড়ার মস্ত প্রাসাদ। শূন্যতা, নীরবতার মধ্যে ভারি দরজার নিরাপত্তায় আটটি ক্ষুধার্ত কুকুরের প্রহরা— এইসব প্রতীকী প্রতিমা আধুনিক ব্যক্তিমানসতার অন্তর্গত সত্তা আর তার কল্পজগৎকে চিনিয়ে দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মূর্খদের কাছ থেকে বাঁচতে এটাই নাকি শেষ অস্ত্র। এ প্রশ্নে মতভেদ থাকতে পারে, সমাধানটাও তেমন গ্রহণযোগ্য হয়তো লাগে না আমাদের, কিন্তু পশ্চিমীদেশের গানে আধুনিক ভাবনার বিচ্ছুরণ এ সবে মেলে। বুঝতে পারি ওদের গান ব্যক্তির সংকটকে ধরতে চাইছে নানাভাবে। দুটি উদাহরণই আশির দশকের, তাই প্রতিতুলনায় মনে পড়ে ঐ দশকে আমাদের গান অমনতর আত্মপ্রশ্নে জটিল নয়। এই জটিলতা, নতুন প্রজন্মের সংবেদন শুধু ইউরোপে নয়, এমনকি গরবাচভ-পর্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বে-ছন্দে উত্তাল হয়ে উঠেছে মূল সোভিয়েত ভূখণ্ডে। ১৯৮৫ সালে লেনিনগ্রাদে Alica নামে একটি গানের দল গড়ে উঠেছে সদ্যযুবাদের নিয়ে। তাদের গান, সংগীতবেত্তার মতে, যদিও গীতলতায় কিছুটা দুর্বল কিন্তু বক্তব্যের ঝাপট সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় সদ্যতন যুবকদের অসহায় অবস্থান বুঝিয়ে দেয়। তাদের চোখে রুশ প্রশাসকদের মনে হয়েছে অপদার্থ 'social engineers'। তাদের সঙ্গে রুশ যুবকের বিপ্রতীপ ভূমিকা ফুটেছে একটি গানে : [৪]

Experimentator in up and down movement
Formulates new models and consciousnes
He is well shaved, smart and serious.
He carries his brick to the alter of creation.
Experimentator in up and down movement
Sees expanse where I see the wall.
He reckons he is right, he is sure in his ideas
He gets to the bottom of every process.

প্রসারতার জায়গায় রুদ্ধতার প্রাচীর দেখাতেই এ গান শেষ হয় না। ঝলকে ওঠে আরেকটি অসহায় অরুন্তুদ বেদনার গান এই বাণীতে যে,

There is my generation sitting silently in the corners,
My generation does-not dare to sing,
My generation feels pain,
But submits again to the whip.
My generation looks down,
My generation is afraid of the day light
My generation celebrates night
But in the morning they regret,

'অ্যালিসা' দলের এইসব গান ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম সাইবেরিয়ায়। সেখানে উফা শহরে গড়ে উঠেছে কীটনাশক 'ডিডিটি' শিরোনামে একটি দল। তাদের গানে আরও তাপ, আরও স্বপ্নভঙ্গের গাঢ়তা। খবরে জানা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক রুশদেশে সবচেয়ে প্রতিবাদী ও আক্রমণাত্মক গান তৈরি হচ্ছে লেনিনগ্রাদের 'টেলিভিশন' আর মস্কোর 'নিউ সাউণ্ডস' দলের। তাদের গান গরবাচভ ও তাঁর গ্লাসনস্তের সম্পর্কে দু'বছর আগেই অবিশ্বাস জানিয়ে ঘোষণা করেছে :

He could call himself whatever he likes,
But the world will die if hands are in blood,

I don't like labes myself,
But the disease symptoms are all too well-known.
As long he remains up above
He will oppress.

পড়তে পড়তে বিস্ময় লাগে গীতিকার যুবকদের মনের সজীবতায়। এ গানের মর্মকথা মানি বা না-মানি, সেটা বড় কথা নয়, আমার কেবলই এই শূন্যতা জাগে যে আমাদের এমন গান রচনার সজীব মন নেই। নেই, তার কারণ এমন গানের শ্রোতাই নেই। এমন গানের রেওয়াজ নেই। আর সত্যি কথা বলতে গেলে, আমাদের সর্বাধুনিক গানের জগৎ, তার শ্রোতার ধরন-ধারন, প্রতিক্রিয়া, এসব নিয়ে ভাববার মতো সমাজবিজ্ঞানীই বা কই? গান আমাদের সভা ও জমায়েতের আরম্ভ ও অবসানকে সূচিত করে কেবল। তা শুধু বিনোদন বা নন্দনের সামগ্রী, তাতে সমাজসত্যের আঁচ আমরা চাই না। আহা, ফুটে থাক তারা, শোভাময় গন্ধবিধুর হয়ে—ভাবটা এমনই আল্‌সে। আমাদের গান ব্যক্ত করুক আমাকে, আমার অবস্থানের সংকটকে, আমার দৈনন্দিন মর্মবেদনাকে, এ আমরা চাই না। তাই 'আমার প্রতিবাদের ভাষা' আর 'আমার প্রতিরোধের আগুন' শুধু শহুরে কয়্যারে আর একটিমাত্র দীর্ঘবাদন রেকর্ডে বদ্ধ থাকে। সলিল চৌধুরির এসব গানও তো অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেছে। নতুন গান কই? কবে আমরা বিদেশি যুবগীতিদলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফুঁসে উঠব এই বলে :

How can we dance when our earth is turning
How can we sleep when our beds are burning?

আশু সম্ভাবনা সুদূর কেননা শ্রোতারা প্রত্যাশী নন, সঠিক শ্রোতা তৈরি হয়ে ওঠেনি, গানের দল প্রবল জনপ্রিয় সঞ্চালনে সারাদেশে ঘোরে না, সংগীতরসিক নীরব, সমাজতাত্ত্বিকরা নিষ্ক্রিয়।

২

সমাজতাত্ত্বিকরা নিষ্ক্রিয় কথাটা উঠল এইজন্য যে বিদেশে সমসাময়িক গান এবং সে-গানের সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা হয়েই চলেছে। তার ফলাফল জানিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখা বেরোচ্ছে, ফলে উৎসাহী জনগণ জানতে পারছেন অনেক কিছু। এখানে মনে আসবে এমন কথা যে কই আমরা যে মাঝে মাঝে উদ্বেগ প্রকাশ করি রক'এন রোল বা পপ বা হিন্দি গান বা টিভি এদেশে অপসংস্কৃতি ছড়াচ্ছে, বিষিয়ে দিচ্ছে যুবমন, সত্যিই কি তা দিচ্ছে বা দিলে কতটা? এসবের সমীক্ষা করছে কে বা কোন্ প্রতিষ্ঠান, তার সারণি বা তথ্য কি? কোন্ অনুমান থেকে আমাদের উদ্বেগ?

প্রসঙ্গক্রমে একটি বৈদেশিক ঘটনার কথা তুলব। সাউথ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বেস্টসেলার গানের রেকর্ড শুনিয়ে ২৫জন কিশোর ও ৩৩ জন কিশোরীর প্রতিক্রিয়া জানা হয়েছে। ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে এই ক্যাম্প বসেছিল দু'সপ্তাহের জন্য।[৫] লেখাপড়ায় তুখোড় অথচ সুকুমারমতি এই শ্রোতাদের বয়স ছিল ১১ থেকে ১৫ বছর এবং গড় বয়স ১৩ বছর ১০ মাস। দক্ষিণ ইলিনয়ের গ্রামীণ অঞ্চলের ৩০টি স্বতন্ত্র জনপদ বা বিদ্যালয় থেকে এদের বেছে নেওয়া হয়। সমসময়ে অতি জনপ্রিয় '40 Top Hits' গানের রেকর্ড থেকে তিনটি গান তাদের শোনানো হয় এবং লিখতে বলা হয় তার প্রতিক্রিয়া। গানগুলি তাদের আগেও শোনা ছিল ভিডিও ক্যাসেটে। গান তিনটি :

১. 'Physical' : Olivia Newton John (1982, সর্বোচ্চ জনপ্রিয়)
২. 'Material Girl' : Madonna (1983, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনপ্রিয়)
৩. 'I want a New Drug' : Huey Lewis (1984, সর্বোচ্চ জনপ্রিয়)

পাঠকদের সুবিধার জন্য এই তিনটি গানের বাণী হাজির করছি।

প্রথম গান 'Physical' গানের বিষয় হালকা ক্ষণিক যৌনতার অনুভব, বিবাহ-সম্ভাবনাহীন শরীর-সম্পর্কের কৌশলী ইঙ্গিত। যেমন :

I took you to an intimate restaurant
Then to a suggestive movie
There's nothing left to talk about
Less it's horizontally.
Let's get physical, physical,
I wanna get physical.

দ্বিতীয় গান 'Material Girl'-এর ভাববস্তু হল প্রার্থীদের পক্ষে প্রত্যাশিত-নারীর মনোভাব পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাকে উপহারে অলংকারে ভরিয়ে দেওয়া। পুরুষ নারীর সম্পর্ক ব্যক্তির গুণগত মূল্যে নয়, নির্ধারিত হয় বস্তু-সঞ্চয়ের বিপুলতায়। তাই বলা হচ্ছে :

They can beg and they can plead
But they can't see the light
That's right,
'Cause the boy with the cold hard cash
Is always Mr. Right
'Cause we're living in a material world
And I am a material girl.

তৃতীয় গান 'I want a New Drug'-এর বক্তব্য খুব স্পষ্ট। এখানে সন্ধান করা হচ্ছে এমন মাদকের যার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিকরতা নেই। যেমন :

I want a new drug
One that won't hurt my head
One that won't make my mouth too dry
Or make my eyes too red.
One that won't make me nervous
Wondering what to do
One that makes me feel like I feel
When I'm with you.

গান তিনটি শুনিয়ে কিশোর-কিশোরীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কী তাদের আকর্ষণ করল, গানের লিরিক না ধ্বনি? তারা লিখিতভাবে জানায় ১২ শতাংশ জন বাণীসচেতন, ৫৮ শতাংশ শুধু ধ্বনিতেই মশগুল। বাকি ৩০ শতাংশ ধ্বনি ও বাণীর যুগপৎ গ্রাহক।

'Physical' গানটির বক্তব্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ৩৬ শতাংশ জন জানায় এতে আছে যৌনতার ইঙ্গিত, ৩৬ শতাংশ জানায় এতে বলা হচ্ছে ব্যায়াম করতে, ২৮ শতাংশ গানের বক্তব্য তেমনভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। 'I want a New Drug' গানটির ২৬ শতাংশ সনাক্ত করেছে মাদকের প্রচার প্রসঙ্গিত বলে, ৪৫ শতাংশের মতে রূপকার্থে এটি প্রেমের গান, ২৯ শতাংশ গানের বক্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেনি।

এইধরনের প্রত্যক্ষ গবেষণার ফলাফল বিষয়ে আরও বিস্তারে যাবার দরকার নেই। তবে দুটো সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত দেখা গেছে ওদেশের কিশোর-কিশোরীদের জীবনে গান শোনা আর গানের

ভিডিও দেখা খুবই জলবৎ ব্যাপার এবং তাতে তাদের মনে খুব একটা তরঙ্গ ওঠে না। দ্বিতীয়ত, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পরিমাণে বেশি গান শোনে। যারা 'Physical' গানের যৌনতার ইঙ্গিত ধরতে পারে (৩৬ শতাংশ) এবং 'I want a New Drug' গানে খুঁজে পায় মাদক-সন্ধানের দিকটা (২৬ শতাংশ) তারা কিন্তু প্রশ্নোত্তর- পর্বে জানায় ব্যাপারটা তাদের মনঃপূত নয় অর্থাৎ যৌনতা ও মাদকতায় তাদের উৎসাহ নেই। প্রসঙ্গটি আমি এখানে শেষ করব বিনা মন্তব্যে এবং বলব যে আমাদের দেশের সংগীততাত্ত্বিক বা সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে এখনই সময় এসে গেছে আমাদের যুবসমাজে গানের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে সব কিছু জানা-বোঝার। তার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্‌ভাবনে এখনই সচেষ্ট হতে হবে।

কিন্তু আমাদের দেশে গান যাঁরা লেখেন বা সুর করেন এবং সেই গান যাঁরা শোনেন তাঁদের চাহিদা ও সৃজনের দিকটিও ভেবে দেখতে হবে। সেই ভাবনা থেকে আমরা বুঝতে পারব আমাদের লোকসংগীতে কেন জীবন আসক্তির চেয়ে বৈরাগ্যের বা আত্মসমর্পণের দিকটি বেশি ফুটল। কেন আধুনিক গান হয়ে রইল প্রেমবিরহ আর হালকা অনুভূতিতে আবিল, তাতে কেন এল না সমসময় আর ব্যক্তিসংকটের তাপ। গণসংগীত কেন গণআন্দোলনের মূল আবেগ ও আত্মত্যাগের মহিমা ধরতে পারল না, ছড়িয়ে পড়তে পারল না তেমন করে দিকে দিকে। শিক্ষিত বা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি, রুচিমান উচ্চসামাজিক সত্যিই কি রবীন্দ্রসংগীতে নিজেকে খুঁজে পান, নাকি চলছে এখানেও একধরনের গূঢ় আত্মপ্রতারণা?

এ প্রসঙ্গে বিরলপঠিত একজন রসজ্ঞের রচনা তুলব, যাঁর নাম সুনীল চট্টোপাধ্যায়। অশীতিপর এই প্রাক্তন ইতিহাসের অধ্যাপক প্রাঞ্জল গদ্যে রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে মন্তব্য করেছেন :

> আপাতদৃষ্টিতে যাকে জনপ্রিয়তার বিস্ফোরণ মনে হয়, আসলে তার অনেকটাই, বোধহয় জনতার বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ভগ্নাংশ যেমন স্কুল-কলেজে, টেস্ট ক্রিকেটের মাঠের হিন্দি ফিল্মে, তেমনি রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন আসরে। রবীন্দ্র-সংগীতের আবেদন এখন অন্য পাঁচটা আনন্দের উপকরণের মতো জনতার সরণিতে।
>
> রবীন্দ্রসংগীতের আপাত-জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ জনতা। কিন্তু এই একমাত্র কারণ নয়। ঢাকের সঙ্গে কাঁসর ঘন্টার মতো এই বড়ো কারণটার সঙ্গে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র কারণ যুক্ত হয়েছে। এরকম একটি কারণ কিছুসংখ্যক লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসামর্থ্য। তা যদি না হত, তাহলে দুটি অধিবেশনের মধ্যে দশ মিনিটের বিশ্রামের সুযোগে এত বেশি লোক পুডিং-পেসট্রি কফি বা সফট ড্রিংকসের জন্যে লাউনজের দোকানগুলিতে ভেঙে পড়ত না।
>
> যাঁরা উচ্চবিত্ত, তাঁরা আজ যদি পিকনিক-এ যান, তবে কাল একস্‌কারসনে এবং পরশুদ্দিন রবীন্দ্রসদনে বা কলামন্দিরে। ...তাই হল থেকে বেরিয়ে বার-এ যেতে তাঁদের পা কাঁপে না। অনুষ্ঠান শেষে পকেট থেকে টিকিটটির মতো, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মন থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করেন।
>
> রবীন্দ্রসংগীতের স্ফীতকায় শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকটা তাই মেয়েদের খোঁপার মতো ফাঁপানো। ...বিভিন্ন আসরে যাঁরা এই গান পরিবেশন করেন... তাঁদের অনেকের একমাত্র মূলধন কণ্ঠ। ...তাঁদের দিকে তাকালে অনেক সময় মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীত তাঁদের কাছে প্রসাধনের শেষ স্পর্শ। ধ্রুপদী ভিত্তির অভাবে তাঁদের সুর কখনও বা নিরাশ্রয় অসহায়। ভিড়ের মধ্যে শিশু যেমন মাকে, এদের সুরও তেমনি স্বরলিপিকে, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকে।
>
> রবীন্দ্রসংগীত এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। সভায়, গানের আসরে, বিবাহবাসরে তো বটেই, এমনকি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পর্যন্ত এই সংগীতকে মর্যাদার আসন দেওয়া হচ্ছে। আগে এমনটি ভাবা যেত না। কেননা তখন অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন এবং বাধা ছিল।

এখন জনতার প্রচণ্ড চাপে, পার্কের রেলিংয়ের মতো, এই বাধার প্রাচীরগুলি ভেঙে পড়েছে। ....এক শ্রেণীর অনতিদক্ষ দাতার সঙ্গে বিরাট সংখ্যক অদীক্ষিত গ্রহীতার একটি সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।[৬]

লেখকের মন্তব্যে কিছুটা পরিহাস বা অত্যুক্তি থাকলেও তিনি প্রায় পচনের উৎসমুখটি চিহ্নিত করেছেন কিন্তু প্রতিরোধের উপায় বিষয়ে আমাদের মতো অসহায়। তাঁর লেখার অবশ্য সদর-মফস্বলের এলিটিস্টদের কথাই ফুটে উঠেছে, কারণ রবীন্দ্রসংগীতের 'অনতিদক্ষ দাতা' এবং 'অদীক্ষিত গ্রহীতা'রা তো গ্রামে থাকেন না। গ্রামে তাই ঐ গানের তেমন প্রসার ও প্রতিষ্ঠা নেই। কিন্তু সেখানে থাকতে পারত আগের মতো লোকসংগীতের স্বতোশ্চল দেওয়া-নেওয়ার একটা অফুরন্ত উৎসব। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সার প্রয়োগে আজকাল আমাদের গ্রামীণ জমিগুলি হয়েছে তে-ফসলা। উন্নত বীজ এবং স্বয়ম্ভর সেচন সামর্থ্যে আজকের চাষি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কিন্তু তার মুখে আগের মতো গান নেই। গ্রামীণ পুকুরে ও খালে-বিলে সংকরজাতীয় মাছের চাষে হয়তো জোয়ার এসে থাকতেও পারে কিন্তু মাঝি ও জেলেরা তাদের নিজেদের গান লেখে না, গায় না। তাদের কণ্ঠে ক্বচিৎ কদাচিত গান জেগে উঠলেও, দেখা যাবে তা সংকরজাতীয় শহুরে বিজের ফসল। না আছে স্বাদ, না আছে গন্ধ।

গানের উৎসমুখ শুকিয়ে যাবার একটা বড় কারণ দেশভাগ। পূর্ববঙ্গে যে সমৃদ্ধ লোকগানের ধারা ছিল তা আজ যোগাযোগের অভাবে স্মৃতিমাত্র। বাস্তুহারা গানের মানুষগুলি তাদের গান ভুলেছে অভাবে, দুঃখে, নানাস্থানী জীবনের অভিশাপে। পশ্চিম-বঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের লোকশিল্পীদের সৃষ্টির উৎসাহ কমে যাচ্ছে শ্রোতাদের অনাদরে। শ্রোতারা উৎসাহী শহুরে গানে, যা ট্রানজিস্টর ও ক্যাসেটবাহিত, সুলভ। কৃষিসমাজের উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যেই গ্রামীণ গানের একটা স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল। যাকে বলে কর্মসংগীত, যা শ্রমের আনন্দজাত উদ্দীপনার সৃষ্টি, তা মন ভরাতে পারত নানাবর্গের গ্রামীণ কর্মিদের। এমন গান আমরা আগে পেয়েছি। যেমন কার্তিকশাল ধানের প্রতি দরদ জানিয়ে কেউ একদিন গেয়েছিলেন :

হারে আমার কাতিশাল বছর বছর থাকিস বহাল।
ভুঁই আমাদের মাতাপিতা ভুঁই আমাদের নাতি ছাওয়াল।
সাত পুরুষের জমি আমার
তিন পুরুষের হাল।।
কাঠকাটা রোদ্দুরে পুড়্যা বলদজোড়া হল আধমরা
আবার পানিকাদায় ভিজা সারা
হইলাম আমি নাজেহাল।
তোর আশাতে ভাবি বস্যা কতই না রাইত সকাল।[৭]

মাতা-পিতা পুত্র-পৌত্রের মতো পরম আপন জমি এবং বছর বছর আসা অতিথি কার্তিকশাল ধানের আবাহনী এ-গানে এত মর্মস্পর্শী যে একটা আস্ত কৃষিজীবী সমাজের স্বপ্ন ও কর্ম যেন ধরা রয়েছে। এমন গান আর কেন লেখা হয় না? এই গান দেয় গায়ককে-শ্রোতাকে স্বস্তি ও আনন্দ। ধানের স্বপ্নে, রৌদ্রের প্রহার, জলকাদার বাধা যাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় সেই মানুষগুলি তো আছে, তাদের গান কোথায় গেল?

অবশ্য কেবল আনন্দ নয়, বঞ্চনার কথাও গানে আসতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলার অভ্যন্তরের গ্রাম থেকে ছাদ পেটানোর দলের একটি গানে পাচ্ছি অনুযোগের সুর। সারাদিন ছাদ পেটাই শেষ করে হাজরি নিতে গিয়ে শ্রমিক বলছে :

বেলা গেল সন্ধ্যা হাজরি কর বাবুজি
এখন ছুটি দেবার উপায় কি?
সারাদিন খেটে খেটে পেটের ভাত তো নাহি জোটে
খিদের জ্বালায় জ্বলে মরি
এখন ছুটি দেবেন বাবুজি?
দালান দিলে মহাল দিলে বাড়ির নামু পুষ্করিণী
আমার পেটের ভাতের উপায় কিবা
তুমি তো জানাওনি।।[৮]

শ্রেণি অবস্থানগত তফাত এ গানে ফুটে উঠেছে। দালান-মহাল-পুষ্করিণী-ভরা সচ্ছলতার পাশে ছাদ পেটাইকরের পেটের ভাতের সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলাবে কে?

অন্য এক গানে শ্রমের কর্মনিষ্ঠতায় পুরস্কার প্রাপ্তির সাফল্য ব্যক্ত হয়েছে হেমাঙ্গ বিশ্বাস সংগৃহীত চমৎকার ভাটিয়ালি রচনাটিতে :

সেলাম চাচা, সেলাম তোমার পায়
বড় নাও-য়ের মাঝি মোরে বানাইছে আল্লায়।
কইও গিয়া চাচীর কাছে
আল্লায় মোরে দিন দিয়াছে—
গুণ টানাটানি ঘুইচ্যা গেছে বইস্যাচি পাছায়।

গানটির আন্তর মূল্য বুঝিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন :

'গুণটানা নাইয়া' নৌকার 'হাইলধরা' প্রধান মাঝির পদে 'প্রমোশন' পেয়েছে। শ্রমজীবনের এর চেয়ে বড়ো সাফল্য আর কি থাকতে পারে? তাই বাপ-মা-মরা ছেলেকে যে চাচী মানুষ করেছিল, তার কাছে কৃতজ্ঞতা সুরে সুরে নির্জন পল্লীর বাতাসকে মুখর করে তুলেছে।[৯]

শ্রমজীবী মানুষের গান বোধহয় এমনই দ্বন্দ্বে-ছন্দে উত্তাল হয়ে থাকে সবদেশে। যেমন বাংলা অনুবাদে একটি বিদেশি গান এখানে তুলছি, যে গান গাইছে একজন নার্স :

এই দুটো হাত কী ব্যর্থ মনে হয়
যেই আমি ভাবি এই দুটো হাত বাঁচাতে পারেনি
শিশু মৃত্যুর ক্ষয়।
এই দুই হাতই গর্বে দুচোখে দেখি
এই দুই হাতই সে কি
জন্ম দেয়নি গোলাপি শিশুর জন্ম, স্বপ্নময়?[১০]

কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে প্রশ্ন ওঠে কেবল কর্মজাত আনন্দ-বেদনা বা শোষণের বঞ্চনা নিয়ে যে গান স্বতই জেগে ওঠে, আমাদের দেশে তেমন গান বেশি হয় না কেন? প্রশ্নটা ওঠে এইজন্যে যে এদেশ গানে গানে সুফলা, কিন্তু তার উৎস কি হঠাৎ শুকিয়ে গেল? একটু চোখ কান খোলা রাখলে বোঝা যায় বৈরাগ্যের গান, আত্মসমর্পণের গান, নানা ধরনের গূঢ়ার্থের শব্দগান ও দেহতত্ত্বের গান এবং বাউল-মুর্শিদা-মারফতি গানের পরম্পরা এখানে যতটা সক্রিয় ও সচল, শ্রমসংগীত ততটা তার সচলতা বা সৃজন পায়নি। এর কারণ কি এই যে ইহলৌকিক জীবনের আনন্দের চেয়ে পরজন্মের ভয় আমাদের গ্রামীণ সমাজে বেশি? কর্মের আনন্দের চেয়ে কর্মহীন সমর্পণের দিকেই সকলের টান? প্রতিদিনের

শ্রমকিণাঙ্ক জীবনের লবণাক্ত আস্বাদ জীবনস্পর্শী গান লিখতে গ্রাম্য মানুষকে প্ররোচনা দিতে পারে না। বরং সেখানে গ্রাম্য গায়ক তাঁর গান দিয়ে বোঝাতে চান : জীবন অনিত্য— দেহের গর্বগুমোর কোরো না, দেহ-খাঁচায় অচিন পাখি এই যায় এই আসে— অতএব গুরুকে ধর, আত্মসাবধান হও, ভজন কর। হেমাঙ্গ বিশ্বাস অনুমান করেছেন :

> সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন না আসায়. সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে কৃষিবিদ্রোহগুলি সব ব্যর্থ হওয়ায়— জনজীবনে সামন্তবাদী আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যেজন্য লোকায়ত বাউল মতবাদে বিভিন্ন পশ্চাদমুখী ধর্মীয় মিশ্রণ ঘটতে থাকে। বাউলরা শ্রমজগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আখড়াবাসী হতে থাকলেন এবং আত্মকেন্দ্রিক তন্ত্রাচারী যোগী হয়ে উঠলেন।[১১]

হেমাঙ্গ বিশ্বাস আরও মনে করেন শ্রমজীবনের সাফল্যের বোধ থেকে যেমন 'সেলাম চাচা, সেলাম তোমার পায়' লেখা হয়, তেমনি শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত হয়ে যে-গান জাগে তার মর্মকথা হতাশার ও কর্মত্যাগের। তাই সেই গানে বলা হয় :

মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি তো আর বাইতে পারলাম না।
আমি সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে
নদীর কূল কিনারা পাইলাম না।
একে আমার ভাঙা তরী পাপের বোঝা হইল ভারী
এখন উপায় কি করি।

ভাষ্যকারের মনে হয়েছে :

> দিনরাত্রি শ্রম করেও তার ফল থেকে সে বঞ্চিত। বহির্জীবনে এই বঞ্চনার কারণ সে জানে না, শোষণের স্বরূপ সে বুঝতে পারেনি— তাই অন্তর্জীবনে গুমরে মরছে। সারাজীবন বৈঠা বেয়ে নদীর কূল কিনারা না-পাওয়াটাকে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বেড়ানোটা শোষণ ব্যবস্থার উপর আবরণ সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়।

কথাগুলি মেনে নেওয়া কঠিন কেননা 'মন-মাঝি' আর 'ভাঙা-তরী'-র রূপক ভাঙলেই বোঝা যায় এতে কোনো কর্মী-মাঝির কর্মফল সংক্রান্ত হতাশা ব্যক্ত হয়নি। 'ভাঙা-তরী' হল ভজনসাধনহীন নবদ্বারের ছিদ্র মুক্ত মানবদেহ আর 'মন-মাঝি' আসলে গুরু। এ একান্ত দেহতত্ত্বের গান। তাই বলে কি বাংলা লোকায়ত গানে গীতিকারের কর্মসচল সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় নেই? আছে, পদে-পদেই আছে, কিন্তু তার ব্যবহার বেশির ভাগ দেহতত্ত্বের রূপকে ঢাকা থাকে। এসব গানের ভেতর কোনো কর্মীকে খোঁজা নিরর্থক।

আসলে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক পল্লীব্যবস্থায় সবরকমের কর্মী গায়ে গা দিয়েই থাকত কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো সাংগঠনিক সমন্বয়বোধ ছিল না। যে নৌকা গড়ে, যে লোহা পেটায়, যে তাঁত বোনে, যে নৌকা বায়, যে ফসল ফলায়, যে কাঠের কাজ করে, যে চাকা ঘোরায়— তারা সবাই সবাইকে জানত চিনত, লেনদেনও ছিল কিন্তু জাতিভেদ ও বর্ণভেদ তাদের এক হতে দেয়নি। সমন্বয় ও সংগঠনচেতনা ছিল না বলে বিদেশের মতো Trade Union Song তৈরি হয়নি আমাদের। তাই উনিশ শতকের লৌকিক গীতিকার কুবির গোঁসাই যখন ভিক্ষাজীবীর বেদনা বুঝিয়েছেন তখন ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা প্রকট হয়েছে এই হাহাকারে যে,

মুষ্টি ভিক্ষা করে আমি খেতে পাইনে উদর পুরে—
লয়ে ঝুলি কাঁধে মনের খেদে
বেড়াই লোকের দ্বারে দ্বারে।
বাড়ি বাড়ি হাঁটব কত ভূত খাটুনি খাটব কত
রৌদ্রে পুড়ে মরব কত মনের দুঃখ কই কারে।।[১২]

এর মধ্যে সাজানো কথা কিছু নেই, সবটাই ঠেকে শেখা, বোঝা, ঘর্মাক্ত জীবনের করুণ গান, তাই মর্মস্পর্শী কিন্তু বড় একক। এর পাশে উদ্ধৃতি দিলে গমগম করে উঠবে বিদেশি ট্রেড ইউনিয়ন গান তাদের সম্মেলকতায়, উচ্চারণের মন্দ্রে, বিশ্বাসে—

1.
How often have you heard it said, 'I can't afford the fees!
No, I don't need the union and they don't need me',
But when the chips are down, they're the first to complain,
When you don't join the union, you play the bosse's game.
2.
Our fathers learned this lesson well, so many years ago,
That workers must be ready to trade blow for blow,
For when it comes to the crunch, in the factory or mine,
All gains must be won by the strike and picket line.
3.
We'll fight for shorter hours, for a Health and Safety Bill,
And end to conditions that injure and kill,
A future for our kids and fair taxes as well,
And then that don't like it, well they can go hell.[১৩]

'Stand by the Union' নামের এই ট্রেড ইউনিয়ন গানের লেখক Lyell Sayer করণিক, স্টোর কিপার, ড্রাইভার, সেলসম্যান এবং শুল্ক অফিসার প্রভৃতি নানাজন এত সব রকমের পদে কাজ করে তাঁর অভিজ্ঞতার সারাৎসার দিয়ে এ গান গেঁথেছেন। গানের বাণীতে কোনো আত্মদৈন্য বা নিঃসঙ্গতা নেই। প্রতি স্তবকের গভীর উচ্চারণের পরে পরে স্বনিত হয় কোরাস ·

For when you stand by the union, the union stands by you. When we all band together we can stand straight and true,
If he tries to stand alone, then a worker's sure to fail,
But if he stands by the union, the union shall prevail![১৩]

এমন গান কেন আমাদের নেই তার যদিবা উত্তর মেলে কিন্তু এমন গান এখনও কেন আমাদের বাংলা ভাষায় হয় না তার কারণ অনুসন্ধান করলে লজ্জা পেতে হবে। আসলে আমরা বড় আত্মবৃত্তে বন্দী থাকতে ভালোবাসি। এই আত্মতার আস্বাদন সমন্বয়ধর্মী সাংগঠনিক গানে পাওয়া যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েই এখনও আমাদের বলতে হয় 'বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো', নজরুলের গান গেয়ে বলতে হয় 'ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট', আমাদের শ্রমিক কর্মী চাষী মজুর তাঁদের নিজেদের গান লেখেন না। অথচ একসময়ে নিবারণ পণ্ডিত, বিশু পণ্ডিত, রমেশ শীল, গুরুদাস পালের মতো ব্রতী গ্রামীণ কর্মী গণনাট্যের চেতনা-বিপ্লবে গলাযোগ করেছেন। সে ধারা থামল কেন? গ্রামের মানুষের নিজের

গান কই? সেইসঙ্গে প্রশ্ন উঠবে, কেন গুরুদাস পালের গণসংগীতকে একজন আধুনিক বাণিজ্যিক শিল্পী বাদছাদ দিয়ে তালসর্বস্ব বিনোদনে ভ্রষ্ট করেন? আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আছে, তাতে দাবি ও শ্লোগান আছে, কিন্তু গান নেই কেন?

৩

গান নেই কেন এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, স্বতই সব প্রসঙ্গে গান লেখার আকুলতা আমাদের স্বভাবে নেই। আমাদের জাতিগত আর একটা মারাত্মক প্রবণতা হল, বাঙালি অন্যের লেখা প্রাসঙ্গিক গান পেলে বড় একটা নিজের সমসময়ের গান আর লিখতে চায় না। এই কারণে পূর্বজদের গান ভাঙিয়ে আমাদের চলে যায়। ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়ে লেখা গান একশো বছর চলছে। শহীদদের আত্মদানের গান প্রসঙ্গে 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' আজও ব্যবহৃত। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'এসো মুক্ত কর' কিংবা সলিল চৌধুরীর গানগুলি ছয়দশক অতিক্রম করেছে। অথচ প্রতিবেশী বাংলাদেশ 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' এই তো সেদিন লিখল, আর তার কী দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা! স্বীকার করতে হবে যে, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, পরেশ ধর, সাধন দাশগুপ্ত, অজিত পাণ্ডে এবং পরবর্তীকালে প্রতুল মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ, বিপুল চক্রবর্তীদের প্রয়াসে আন্তরিকতার অভাব নেই কিন্তু তাঁদের গান নিজেদের ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রার্থিত প্রচার পায়নি, রেকর্ডে বাণিজ্যিক সাফল্য তো সুদূর স্বপ্ন! পশ্চি মবঙ্গের নানা অনুষ্ঠানে ভূপেন হাজারিকা, সবিতাব্রত দত্ত এবং রুমা গুহঠাকুরতার ইয়ুথ কয়্যার প্রায়শ যেসব লোকপ্রিয় গান গেয়ে বাজার মাত করেন তাতে নতুন গান কটা? সাম্প্রতিক প্রসঙ্গে বাঁধা গান কই?

অথচ খোঁজ করে দেখছি খাঁটি Trade Union Song-গোছের কিছু প্রয়াস বাংলায় হয়েছে অদূর অতীতে। দুটি উদাহরণ এখনই মনে পড়ছে। দিলীপ সরকার নিজের কথা ও সুরে রিকসাঅলার দুঃখ নিয়ে একটা সুন্দর গান রেকর্ডে গেয়ে জনপ্রিয় করেছিলেন এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান'-এ শ্রমজীবীদের গান ছিল। নতুন কালের পাঠকদের জন্য একটু নমুনা রাখছি।

১. কাঠফাটা রোদে পিচঢালা পথে
ঝড় বাদলেতে শীতের রাতে
রিক্সা চালাই মোরা রিক্সাঅলা।
ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং ঘন্টি বাজে
সোয়ারী হাঁকে 'জলদি চালাও' ওরা বোঝে না যে
পেটের টানে মোরা পিঠে মানুষ বই
তবু জোটে কই দুটি বেলা?

২. আমরা ফিরি করি পথে বিড়ি পাকাই।
কলে ও কারখানায়
নিজেদের আয়ু বিলিয়ে যাই
আমরা মার খাই, তবু মার দিই
আর বেঘোরে মরি,
যুঝবই তবু গড়বই মোরা কাহারে ডরি।

দুটি গানেই শ্রমজীবীর নিজস্ব বেদনা ও সংকটকে গানে গেঁথেছেন দুজন 'ভদ্রলোক'। প্রথম গানটি

অরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা তাই শুধুই দুঃখের কথায় ভরা, দ্বিতীয়টি একজন কমিউনিস্টের লেখা তাই 'মার খাই, তবু মার দিই' এবং 'যুঝবই' 'গড়বই' শব্দগুলি সচেতনভাবে গ্রথিত। তবু এ গান ট্রেড ইউনিয়ন গান নয়, কেননা সত্যিকারের ট্রেড ইউনিয়ন গান কর্মী নিজেরাই লেখেন। লেখেন তাঁর অভিজ্ঞতা ও জীবনের স্পন্দন মিলিয়ে। সলিল চৌধুরীর সুরে সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনা 'রানার' একজন বঞ্চিত উপেক্ষিত দরিদ্র মানুষের গান। রসোত্তীর্ণ গান, সভাসমিতি ও রেকর্ড উভয়তই জনপ্রিয়তম, তবু এটি ভদ্রলোকের লেখা।

এইখানে একটা ঠিকে ভুল যেন না হয়। আসলে ট্রেড ইউনিয়ন গানের কোনো নির্দিষ্ট ফরমূলা নেই, থাকতে পারেও না। তাতে প্রথমে দুঃখকষ্টের কথা বলে পরে সংগ্রামের শপথ ও নবসূর্যোদয়ের কথা বললেই হয়ে যায় না; প্রত্যক্ষ জীবনের কম্পন থাকা চাই— সমস্যাটা যেন স্পর্শ করে শ্রোতার অন্তরে। আর এ জাতীয় গান সবরকমের বৃত্তির মানুষই তো লিখবে। যেমন ধরা থাক বিদেশী শিক্ষকের গান একটি :

Have no fear this career
Is no honoured vocation,
Don't expect great respect
For your hopes and yours dreams
You'll prepare and you'll care
For a new generation.
While the wise criticise—
They know better it seems.
Educate stimulate
A desire for knowledge.
Chalk and talk give some thought
That's enough of your cheek
While the wise criticise—
Teacher's work— there is nothing to it.
Holiday all the year round.
Teacher's work... if you only knew it...
Teacher's work... Teacher's work.

পড়তে পড়তে এদেশের শিক্ষকদের গায়ে কাঁটা দেবে। সমস্যাটি কতখানি সার্বজাতিক, কত প্রাসঙ্গিক। আমাদের শিক্ষক সংস্থা আছে, শিক্ষক আন্দোলন আছে কিন্তু শিক্ষকদের গান নেই। কিন্তু উদ্ধৃত গানটি ('Chalki') সম্ভাষিত হল কী ক'রে? তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে :

The South Australian Institute of Teachers (SAIT) is the trade union in South Australia covering education workers in a wide range of schools and institutions. As a major lobby group for education, it is concerned about the learning conditions of students as it is about the working conditions of teachers. 'Chalki' comes from a play of the same name, initiated by SAIT with Mainstreet Community Theatre Co. The play offers an insight into teachers. Working lives, the pressures and responsibilities they face and the issue and problems they have to deal with such as stress, assessment proce-

dures, industrial democracy, education policy and funding as well as sometimes negative community attitudes.[১৪]

তথ্য থেকে বোঝা যায় কত বড় কর্মজাল ও সংগঠন থেকে, কতখানি প্রত্যয় ও সঙ্কল্পপালনের নিষ্ঠা থেকে, এমনতর নাটক লেখা হচ্ছে, বড় মাপে মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং সেই নাটকের অন্তর্গত শিক্ষকের চরিত্রটি পরিস্ফুটিত করতে এমন একটি চমৎকার গান রচিত হয়েছে।

সমগ্র কর্মধারা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন আমাদের শিক্ষকরা এমন গান লিখতে পারেন না। লেখার মতো শিক্ষক নিশ্চয়ই আছেন, নাটকও হওয়া অসম্ভব নয়, সহযোগী নাট্যসংস্থা পাওয়া খুবই সহজ, কিন্তু আমাদের সেই সৃজনশীল উৎসাহ কোথাও নেই। নেই, কেননা আমাদের সবরকম সংগঠনের মূল লক্ষ্য অধিকসংখ্যক ব্যক্তির সমাবেশের দিকে, নেতার বক্তৃতা এবং কর্মীদের বিক্ষুব্ধ ধ্বনি সন্নিবেশের প্রতি। তার কোনো নান্দনিক উন্মোচন নতুন সৃজনশীলতার পথে এগোয় না। তাই আমাদের শিক্ষক সম্মেলনে সাধারণত উদ্বোধন সংগীত থাকে একটা এবং বক্তৃতাপ্রবাহের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। এই দুটি অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকেন আঞ্চলিক উদ্যোক্তাদের নিয়োজিত কোনো কালচারাল স্কোয়াড। তাঁরা বস্তাপচা গান করেন কয়েকটি।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নানা বৃত্তির মানুষই যে শুধু ঐ বর্গের গান লেখেন তা নয়, দরদী আরও কবি-গীতিকার-সুরকার এসব রচনার সঙ্গে জড়িত হতে পারেন, বিশ্বের নানা জায়গায় হয়েছেন। তাতে উৎসারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে ঐ জাতীয় গান। বিশেষত শ্রমিক কৃষক মজুরের অমার্জিত রচনাশৈলী সর্বদা রসোত্তীর্ণ নাও হতে পারে, তবে তাঁদের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা অনেক ত্রুটি ঢেকে গানকে সজীব ও মর্মস্পর্শী করে তোলে। এমন এক গানে একজন নার্সের অভিজ্ঞতা এইভাবে বিবৃত হয়:

কল্পনা কর কী ভয়াবহই না লাগে
চোখ মেলে দেখা চিকিৎসকের ছুরি
কর্তন করে পা।
কল্পনা কর কী মনোবেদনা জাগে
ছোট্ট শিশুকে যখন জানাই
মরে গেছে তার মা
পুঁজ সাফ করা ক্ষততে সেলাই
প্রতিদিন প্রতিদিন—
আমরা এখন স্বপ্নই দেখি রোজ
আসবে আলাদা দিন।[১৫]

এর পাশে আমাদের গণকর্মী সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গান তুলছি প্রতিতুলনার জন্য :

আমরা দুনিয়ার খেটে খাওয়া মজদুর শ্রেণি
কেউ খাটি লেদে কেউ খাটি মিলিংয়ে
কেউ খাটি ফার্নেসে কেউ খাটি শেপিংয়ে
এই সব মিলে মোরা কাজ করি।
পৃথিবীর সব দেশ জুড়ে মোরা জানি
আমরা এ যুগের বঞ্চিত শ্রেণি।

আমরা খুইয়েছি যে যার সব কিছু গ্রামে
স্ত্রী শিশু ঘর হয়ে গেছে পর
দলে দলে থাকি নিয়ে বস্তিতে ঘর
তবু শক্তিতে মোরা সব খানদানি।[১৬]

দুটি নমুনায় কতই তফাৎ। বোঝা যায় প্রথমটা জীবন থেকে উঠে আসা অথচ স্বপ্নবহুল দ্বিতীয়টা বানিয়ে তোলা ও চাপিয়ে দেওয়া। সে যাই হোক, সমরেশের রচনা তুলে আমি শুধু বোঝাতে চাইছি বাংলাতেও ট্রেড ইউনিয়ন গান হতে পারে, হয়েছেও। ভূপেন হাজারিকার অসমীয় সুরে-বোনা এমন একটি অসমীয় গান (মূল রচনা : ভূপেন হাজারিকা, বাংলা রূপান্তর : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) বাংলা রূপান্তরে খুবই জনপ্রিয় ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে:

আঁকা বাঁকা পথে মোরা কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই
রাজা মহারাজাদের দোলা,
আমাদের জীবনের ঘামে-ভেজা শরীরে
বিনিময়ে পথ চলে দোলা।
দোলার ভিতরে ঝলমল করে যে
সুন্দর পোশাকের সাজ,
আর ফিরে ফিরে দেখি তাই ঝিকমিক করে যে
মাথায় রেশমের কাজ—
হায় মোর ছেলেটির উলঙ্গ শরীরে
একটুও জামা নেই, খোলা
দুচোখে জল এলে মনটাকে বেঁধে যে
তবুও বয়ে যাই দোলা।

উৎকৃষ্ট গান, বলার কথাটাও স্পষ্ট। সামন্ততন্ত্র আর মেহনতী দোলাবাহকের বিপ্রতীপ অবস্থান প্রত্যক্ষ। দোলাবাহক তার আবেগ আর শোষণের কান্নাকেও গোপন রাখে না। লক্ষণীয় যে শেষকালে তাকে কোনো রক্তিম শপথ নিতে হয়নি। ফর্মুলার বাইরে থেকেও এটা তবু গান হয়ে উঠেছে। 'দোলা হে দোলা হে' সুরের রিফ্রেনটাও নিশ্চয় পাঠকদের মনে পড়ছে। পাশাপাশি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা 'পাল্কী গান'-এর (সুর : সলিল চৌধুরী) গীতরূপ সকলের স্মৃতিতে জাগবে। যে-গানে সলিল চৌধুরির অসামান্য সুরপ্রয়োগের নৈপুণ্য, রেকর্ডের বাঁধভাঙা জনপ্রিয়তার কথা মনে রেখেও বলতে হয় যে, গানের থিম প্রসঙ্গভ্রষ্ট হয়েছে। কারণ পাল্কীর গানে পাল্কীবাহকের শারীরিক কষ্ট ও মনের বেদনা অনুল্লিখিত থেকে বড় হয়ে উঠেছে পাল্কী-পথের পরিবর্তমান দৃশ্যচিত্রের সুষমা ও লালিত্য। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাতে সেটাই ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভূপেন হাজারিকার লক্ষ্য অন্যতর ও অব্যর্থ। তাই ভূপেনের গানে সুরের রিফ্রেন এবং 'হুঁইয়া না হুঁইয়া না' ধ্বনি একটা আলাদা ক্লান্তি ও অনুক্ত কান্নার আভাস বয়ে আনে। অথচ পাল্কীর গানে 'সূর্য ঢলেরে অঙ্গ টলেরে' সুরের চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও মূল ক্লান্তি ছুঁতে পারে না।

শুধু ক্লান্তি নয়, নিঃসঙ্গতাও। চারিদিকের শোষণ-বঞ্চনার চক্রপথে শ্রমজীবী মানুষকে যা চোরা অন্তর্ঘাতে মুষড়ে দেয় তা তার অসহায় অবস্থান এবং বিরতিহীন কর্মের পৌনপুনিক প্রহার। তার কাছে

অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতার চেয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পারিবারিক সাহচর্য অনেক উষ্ণতা ও জৈবনিক তাৎপর্য এনে দেয়। সেই সঙ্গহীনতার বিরহ সুকান্ত ভট্টাচার্য নারীর দিক থেকে ফুটিয়েছিলেন 'রানার' কবিতায় :

অনেক দুঃখে বহু বেদনায় অভিমানে অনুরাগে
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

এর পাশে উদ্ধৃত করব একটি বিদেশি ট্রেড ইউনিয়ন গান, যেখানে রেলের বেচারি গার্ড, তীব্র শীতের রাতে, তার একলা রাতের অন্ধকারে চলেছে :

On a cold dark night in a lonely brake van,
A guard sits there, a solitary man.
Far away from the kids and his wife.
He's been away from home nearly half of his life.
For six long days they've been waiting for him,
It's a job to be done but they think it's a sin.
He works all night, hoping that they might,
Be together in the morning light.

Railway man.... Railway man...

এ গানে বেদনা-নিঃসঙ্গতা-রাতের শীতার্ত ঝাপট— স্ত্রী পুত্র পরিবারের টুকরো স্মৃতি— ছদিনের ব্যাকুল প্রত্যাশা— আবার শুধুই চলা, রাতের বুক চিরে, আরেকটি নতুন ভোরের প্রিয়মিলনের প্রত্যাশা বুকে রেখে। বড় মানবিক সংবেদনের গান।

ট্রেড ইউনিয়ন গানের আরেক ধরন পেতে পারি চেরাবান্দারাজুর রচনা থেকে। যার একটি অনুবাদ করেছেন সমর সেন, আরেকটি শঙ্খ ঘোষ। দুটি রচনাতেই সুর করেছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। দুটিরই নমুনা রাখছি :[১৭]

১. আমরা আগাছা করেছি সাফ চাষ করেছি ক্ষেতে
সারা মাঠ জুড়ে দ্যাখো শস্যের সে কি সম্ভার,
আমাদেরই ঘাম দিয়ে, জল দিয়ে তো নয়!
কিন্তু ফসল কার? খুদকুঁড়ো কার জোটে?
আমরা সুতো বুনি চালাই তাঁত
রাতদিন দিনরাত
বানিয়ে চলি কত ঝলমলে রঙিন পোশাক
আমাদের নাড়ি দিয়ে, সুতো দিয়ে নয়।
কিন্তু কারা পায় ওম, কারা মরে শীতে?

২. কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
মাটি হেনে যখন ইঁটের পাঁজা বানাচ্ছি
যে ইঁট দিয়ে তৈরি হবে তোমাদের ওই ঘর
খিদেয় ধুঁকে বইছি যখন শস্য এ বুকভর।
কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী

জুতোর জন্য কত জীবের মুণ্ডু খসাচ্ছি
রাঁধবে খাবে বলে বানাই থালা বাটি গ্লাস।
নিজের জন্য পাইনা যখন সামান্য এক গ্রাস।

চোরাবান্দারাজুর দুটি রচনার সামান্য কয়েক স্তবক ব্যবহার করে আমি বোঝাতে চাইছি এ বর্গের থিমে একটা শ্রেণিবৈষম্যগত সচেতনতা আগাগোড়া বোনা আছে। কৃষক-শ্রমিকদের অনুক্ত বেদনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তার পেছনে ছিল একটা স্পষ্ট প্রত্যয়ের বিন্যাস। দুটি রচনার অন্তিম স্তবক দুটিও একই বক্তব্যে ঋজু। প্রথম রচনাটির শেষ শপথ :

বিপ্লব আনবই, আনবই বিপ্লব
সংগ্রামে সংগ্রামে ক্লান্তিবিহীন।
তখন তোমাদের হবে শেষ, আর আমাদের শুরু।

দ্বিতীয় রচনাটির শেষ উচ্চারণ :

ভাবো যদি ভিন্ন করে দেবে সবার জাত
তোমাদের যে দিন ঘনালো ভালো সেই কথাও
ঘাম ঝরিয়ে এক হয়েছি, মেলাচ্ছি সব হাত।

এমন রচনার লক্ষ্য স্পষ্ট, প্রতিবাদের শস্ত্র উদ্যত। শ্রমজীবী-কৃষিজীবী এবং তাদের কর্মের লভ্যাংশ যাদের করতলগত লড়াই সেইখানে। দক্ষিণ ভারতে চেরাবান্দারাজু এই বৈষম্য এই সংগ্রামকে এনেছিলেন তাঁর রচনায়। বাঙালি শ্রোতাদের মনে পড়বে, এখন যাঁরা সত্তর পেরিয়েছেন, একদা সলিল চৌধুরির বাণী ও সুরে 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা' গানে ঠিক এমনতর বক্তব্যই তাঁরা শুনেছিলেন। কিংবা একটু বুঝি পরিহাসদ্রব ভঙ্গীতে আত্মকরুণার ঢঙে :

তাই তোমরা রাজভোগ খেলে আমরা ঢেঁকুর তুলি কষে
আর তোমরা প্রাসাদচূড়ায় রইলে, আমরা তাহার ইঁটকাঠ বইলুম।

পঞ্চাশের দশকের এ জাতীয় গানের সঙ্গে কোনো প্রতিতুলনা না টেনে আমরা ১৯৮৫ সালে রন রাসেলের লেখা ও সুর করা একটি গান 'The Work Ethics' তুলছি, সেখানকার শ্রমিকদের পরিহাসদ্রব কণ্ঠও কম অন্তর্ভেদী মনে হবে না। তারা গাইছে :

The bosses say the work ethics is something we all lack,
That all the bloody workers are very blood slack.
They say we're very lazy, bludging all the time,
And that we need more discipline to make us to the line,
Now businessmen and doctors, stock brokers and QC's,
All complain : 'The workforce has brought us to our knees.
It's the fault of the workers, if they worked hard enough,
Our lives would be so easy then and not so bloody tough.'
CHORUS
Work! work! work!
And don't you ever stop it
'Cause how do you think the boss can make
A big fat handsome profit.

মুনাফালোভী মালিক ও নিরন্তর কাজের চাপে পিষ্ট শ্রমিকের মধ্যে যে তিক্ত আড়াল তা ব্যঙ্গ হয়ে ঝরেছে

এমন গানে। কোরাসে শ্রমিকরাই মালিকের হুমকি আওড়াচ্ছে। এতটা সচেতনতার গান পশ্চিমে সম্ভব হয়েছে তার কারণ তাদের বহুদিনের বহুরকমের শ্রমিক আন্দোলন। এর সবই যে গণকণ্ঠে কলে-কারখানায় বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে তা নয়। ছোট ছোট শ্রমিক জমায়েতে, পানশালায়, বাড়িতে সমবিশ্বাসের বন্ধুদের মধ্যে খুব একান্তে লালিত হয় যে জাতীয় গান। লেখাও হয় আনমনে, গোপনে। হয়ত লুকানো থাকে ড্রয়ারের এক কোণে। বন্ধুরা টেনে বার করে হৈ হৈ করে কোনো পরিচিত সুরে ফেলে গাইতে থাকে, তারপরে ছড়িয়ে পড়ে ছোট ছোট দলে। আবার হয়তো কোনো কোনো গান প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে, চলে যায় বিস্মৃতিতে। এইজাতীয় গানগুলির বিষয়ে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে গিলিয়ান হ্যারিসন মন্তব্য করেছেন :

> These songs form an important part of our 'invisible' culture, as the stories of working class lives are too often ignored by writers of conventional history. They are the creations of ordinary people, of unacknowledged activists for social and political change and provide the human perspective on the effects of such conditions and changes.

এই অদৃশ্য বা অনামা উপেক্ষিত সংস্কৃতির সৃজনশীলতা বহু সময়েই আন্তরিক অনুভবের স্পর্শে কলারূপ পেয়ে যায়, সত্যিই আমরা তা তেমনভাবে খেয়াল রাখি কই?

এমনই একটি গান লিখেছেন জিওফ্রি ও'কনেল 'Life of a working man' নামে। গানের মুখপাতে সামান্য ভূমিকা করে তিনি বলতে চেয়েছেন, শুধু কর্মরত মানুষ কেন, কর্ম থেকে অবসরপ্রাপ্ত মানুষের দু'একটা কথা বলবার নেই কি? যেমন এই কথাটা তো বলা যায় যে একজন কর্মী রিটায়ার করলেই তার আত্মতুষ্ট ভাবটা ভেঙে পড়ে। তাই বোঝা উচিত যে জনসমাজের পক্ষে কর্ম জিনিসটা শুধু উৎপাদনমুখী হলেই চলে না, একজন কর্মীকে তো যেন ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন ধরে একটা সন্তুষ্টির বোধ এনে দিতে পারে। নইলে সে অবসর গ্রহণের পরে থাকবে কী নিয়ে, কোন্ অনুভূতিতে? সারাজীবনের কর্মময়তা থেকে নইলে সে কী পাবে?

এই পর্যন্ত ভূমিকা করেও ও'কনেল যে গানটা লিখেছেন সেটা যেন একখানা গল্প। গল্পের মতো করেই তা আমি বলছি।

> ধরো একজন মানুষ। বাড়িটা তার জীর্ণ হয়ে উঠেছে, বাগানের বেড়া ভাঙা, লনে আর সেই ছিরিছাঁদ নেই। অথচ একদিন আমি, মানে ঐ মানুষটা আর কি, বাগানে দিয়েছিলাম ঢাকা, করেছিলাম চমৎকার এক ফুলবাগান আর সুন্দর একখানা গেট কু-ড়ি ব-ছ-র আগে। আমার ছেলেপুলেরা যখন ছোট প্যান্ট পরতো তখন একজনের কাছ থেকে বীজ চেয়ে এনে পুঁতেছিলাম একটা, লেবুগাছ। বাড়ির পেছনে নরম ঘাসে আমরা ক্রিকেট খেলতাম। একবার এমন একটা ছক্কা হাঁকড়েছিলাম যে ওপরের দরজার কাঁচ ভেঙে গিয়েছিল। বর্ষার দিনে যখন আমরা ঘরের মধ্যে থাকতাম তখন বৃষ্টিভেজা কী সুন্দর মাটির গন্ধ ভেসে আসত। কিশোরী মেয়েটির একলা থাকার জন্যে আমরা একটা ঘর বানিয়েছিলাম। আর ছিল সবুজ রঙের একটা ফোর্ড গাড়ি। তাতে চড়ে সপ্তার শেষে বাড়ির সবাই চলে যেতাম কোথায় না কোথায়।
>
> ধরো এই ছিল মোটামুটি আমাদের জীবন। কষ্টে-সৃষ্টে এই জীবন সুখে-দুঃখে কেটেই গেছে। আর আজ? জীবনটা কেমন জানো? যেন বাগানের ছ্যাতলা পড়া শেডের মতো, তার আবার খানিকটা ভাঙা। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যে যার মতো চলে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে আমার আর বউয়ের জন্যে কি আর রইল বল? এই হল একজন কর্মীর জীবন। এই কি একজন কর্মীর জীবন?

গল্পটা শেষ করেই মানুষটা এবারে গেয়ে ওঠে শেষ স্তবক :

I will keep working till I drop,
When I stop it won't matter.
Working till I drop,
Couldn't be any better.
Working all your time
And the times are getting harder,
That's the life of a working man
That's life, for a working man.

শুনতে শুনতে মনে হয়, আহা কী সুন্দর! কিন্তু এমন একখানা গান কেন আমাদের নেই?

এইরকম নিঃসঙ্গ মানুষের স্পর্শকাতর গানের পাশে পশ্চিমে গড়ে উঠেছে 'disregarded mass'-দের মর্মবেদনার গান। হঠাৎ-বড়লোক যে শ্রেণি, যাতে আছে কূটনীতিক-রাজনীতিক মানুষ, অধ্যাপক-মন্ত্রী-অভিনেত্রী-ব্যবসায়ী-সাংবাদিক-বাণিজ্যসফল কবি-জনপ্রিয় সুপারস্টার গায়ক— এসব গানের লক্ষ্য তারা ও তাদের সন্তানরা। গানের বাণী ও ভঙ্গিতে কী তির্যকতা, কী সুচয়িত বিশেষণ :

I honour you, sons of diplomats,
Ministers and professors,
Well-fed actresses, journalists, magnets,
Paperback poets and superstar singers—
In short those who are always encored.
Is there any soul there?
Daddy will see you alright.
Daddy will grant all his baby's demands.
They've dug into the sexy bodies of bureaucrat's daughters
They've dug their noses into sperm-spitting videos.

মাঝে মাঝে পশ্চিমী গান এতটাই বিদ্রূপমুখর হয়ে ওঠে। সবসময় নয়।

উল্টোদিকে শ্রমিকদের সতর্ক করে দেবার গানও আছে। অতিরিক্ত মদ্যপান শ্রমিকদের লক্ষ্যহীন এক বৃত্তেই যেন ঘুরিয়ে মারে। তারা সেই অর্থহীন সংক্রমণের ধরনটা বুঝে উঠতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন গায়ক তাদের পানশালায় গিয়ে শোনায় :

I have a way of knowing
You hide more than you show,
But I can see through you lies
All the sadness in your eyes.
You're running around and heading on down
That long, long, long road to nowhere.

স্বস্তির কথা, গণশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে একটি গান পেয়েছি যা শ্রমিকশ্রেণিকে সর্বনাশা মাদকের কুফল সম্পর্কে সতর্কীকরণ। একটু উদ্ধৃত করছি :

খাদে ঠকি, কলে ঠকি, ওই শুঁড়িখানায়
আমরা যখন নেশায় বেহুঁশ কসাই তখন ছুরি শানায়।

ভেঙে ফেল মদের বোতল মরণ-নেশা কর রে কোতল,
মাতি আর বাঁচার নেশায় রুখি দুশমনের হানায়।[১৮]

বলিষ্ঠ বক্তব্য, সহজ ভাষায় সমস্যাটা বলাও হয়েছে, কিন্তু এ গান ফ্যাক্টরি মিলসংলগ্ন ভাঁটিখানায় গিয়ে সতেজ কণ্ঠে গাইবার মতো প্রত্যয়ী গায়ক কী আছে আমাদের? নেই। এসব গান তাই মাদকগ্রস্ত মানুষের কানে বা হৃদয়ে আঘাত করতে পারবে না। কিন্তু এসব গান রচনার তাৎপর্য তো সেখানেই, কেননা এ তো বিনোদনের গান নয়। তাই মনে হয় আমাদের শ্রমিক আন্দোলনে একধরনের ফাঁক বা ফাঁকি থেকেই যাচ্ছে। যোগ্য এবং স্বনিয়োজিত গীতিকার-সুরকার আছেন কিন্তু তাঁর রচনা ঠিক ঠিক প্রচারের জন্য গায়ক-সংগঠন নেই। এ গান তাহলে লেখা হবে কোন্ উৎসাহে, কাদের জন্য?

একই কারণে বিপুল চক্রবর্তীর কথা ও সুরে বোনা চমৎকার একটা কর্মসংগীত লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই পারে। গত কয়েক দশক প্রতুল, বিপুল, মেঘনাদ, সমরেশরা নতুন ধরনের গানে নানা রকমের নিরীক্ষা করে চলেছেন। এঁদের বা অন্যদের গান নতুন নাটকে সন্নিবেশ হলে তা জনপ্রিয় হতে পারে। যাই হোক, বিপুল চক্রবর্তীর কর্মসংগীতটি এখানে বিশেষ উদ্ধৃতির দাবি রাখে এইজন্য যে ট্রেড ইউনিয়ন গানের ব্যাপারে আমরা একটু-আধটু পিটুলিগোলা পেতেও পারি। গানটি অংশত দিচ্ছি :

এইবার দোস্ত লাইনটা যেন ঠিক থাকে...
হেঁইও মারো হেঁইও সাবাস জোয়ান হেঁইও
ঘাবড়াও মাত্ জানতে হবেই এগিয়ে যাবার দিকটাকে।

নাট-বল্টু ঠিকসে লাগাও শীত কুঁড়েদের তুরন্ত ভাগাও
থাক কুয়াশা, নখের আঁচড়, খুন থাকতে ভয় কাকে।[১৯]

যথার্থ ঝোঁকবহুল কর্মসংগীত, আধাহিন্দি মেশানো বুলি, সচেতন বাণীবহ। কিন্তু এ-গান সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে কে? কবে? কীভাবে?

৪

বিদেশি ট্রেড ইউনিয়ন গানের রচনার মূলে সংগঠন, প্রচারের মূলেও সংগঠন, যা পশ্চিমবঙ্গে ভাবা যায় না। এখানে তাই নিতান্ত ব্যক্তিক প্রয়াসে ছিটেফোঁটা আমরা যা পাই তাও প্রচারের অভাবে স্ফূর্তি পায় না। তাই আমরা এর খবর রাখি না। শুধু তাই নয় কতরকম যে হতে পারে এ-বর্গের গান, কত বিচিত্র বিষয়ে, জীবনের কতদিক যে ছুঁয়ে যায়—তার কোনো ধারণাও কি আমাদের আছে? বিদেশে কোথাও কোথাও এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন গানের প্রতিযোগিতা হয়, সবরকম বৃত্তির মানুষ তাতে গান পাঠান। তারপরে একদিন তার থেকে বিশেষ নির্বাচিত গানের অনুষ্ঠান হয়। পুরস্কারবিজয়ী গানগুলি সংকলিত হয়ে স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত হয়। ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। গানগুলি কর্মীমহলে বহুলভাবে গাওয়া হতে থাকে। তার থেকে জাগে নতুন ভাবনার গান, নতুন বৃত্তিকে ঘিরে।

কতরকমের যে গান আছে এই কর্মজগতের! ইচ্ছে থাকলেও প্রবন্ধের পরিসরে সব তো দেখানো যায় না। তবুও আরও দুয়েকটি বৈদেশিক নমুনা দেব, কিন্তু তার আগে উল্লেখ করব শুধু কয়েকটি গানের বিষয়, তাদের বহুস্পর্শিতার দিকটি বোঝাতে। যেমন জানা যায়, একটা ট্রাইবুনাল মামলায় (Equal Opportunity Tribunal) নিউ সাউথ ওয়েলসে ৩৪ জন নারীশ্রমিক ১৯৮৫ সালে ফ্যাক্টরিতে পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে সমঅধিকারের কাজের অনুকূলে রায় পেয়েছে। তাদের বিজয় নিয়ে লেখা হয়েছে গান, 'The giant feels their sting'। নার্সদের দুঃবেদনার গানের গোড়াতেই বলা হচ্ছে ধুয়োর মতো 'Nursing my anger... nursing frustration'। দৌড়ে যারা ট্রেনে উঠে জীবিকা চালায় তাদে গান পাচ্ছি। কাজের অধিকার পায়নি যেসব অভিবাসী তাদের গান 'Silenced Voice'। ইউনিয়নের সঙ্গে কোম্পানির লড়াই চলছে, চলছে স্ট্রাইক, গ্রেপ্তার। শিশু মাকে বলছে 'If we win the strike will

Dad come back?' যুদ্ধবিরোধী ট্রেড ইউনিয়ন গানে বলা হচ্ছে 'we have to know that we can make peace'। ক্রমাগত কাজ করে করে যাদের হাত অচল হয়ে গেছে সহানুভূতি বেজেছে তাদের জন্য লেখা গানে। একটা গানে পাচ্ছি অ্যাসবেস্টস-ঘটিত দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। একটা গানে সতর্ক করে বলা হচ্ছে 'The bad old days are coming back'— অর্থাৎ শোষণ উৎপীড়নের দিন। তাই গানের শেষে বলা : 'Stand fast... Be strong... Hang in... Hold on'। এই গানেই মালিকপক্ষের বর্ণনায় বলা হয়েছে :

Soft hands, hard heart, the silver spoon
Fat smiles across the conference table!

আমার সম্পূর্ণ অন্যরকমে গান, অন্য ভাবনার, তাও আছে। একঘেয়ে দিনে গান যান্ত্রিক, রোমাঞ্চহীন, সম্ভাবনাশূন্য, নীরক্ত। তা এইরকম :

সকালে ওঠা... স্বয়ংক্রিয় যেন
রেডিও শোনা... শোনা তাদের ভাষ্য
মুদ্রাস্ফীতি... আমার কাপে চা
একঘেয়ে সেই আবার একটা দিন।

কী আর করি, খাওয়াই বেড়ালটাকেই
স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরুত্তাপ...
সামনে একটা ছুটির দিন কি আছে?
তেলের দাম বাড়ছে হু হু করে
ট্রেনের গতি ক্রমেই হচ্ছে শ্লথ
ইস....

কর্মপ্রবাহের নিত্যবৃত্ত জীবন আনছে এমন একঘেয়েমি। যেন এলিঅটের সেই কবিতার মতো গানে আউড়ে যাচ্ছে :

Cups of tea, tomatoes on toast
Getting the weather coast to coast.
Power in the hands of men in grey,
Lace up shoes, old schools ties,
Controlling the world by satellite.

এ যেমন একরকম স্বগত সংলাপের একঘেয়েমি তেমনই কর্মচক্রের আরেক দিকে রয়েছে শ্রমিক জীবনের উপর একটানা ক্ষত আর আঘাতজনিত ব্যাধি। সেই ব্যাধি আনছে মনেরও জড়তা, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য, তাপ। আস্তে আস্তে কর্মক্ষমতা কমে এসেছে নারীশ্রমিক মারিয়ার, ঝিমিয়ে পড়ছে নিপুণ কৌশলী হাতের নাড়াচাড়া। সেই হাতের বর্ণনা :

Your hands that were quick once, Maria,
Were slowed by the stiffness and pain,
That nagged in your wrists
Till you clenched into fists
Those hands that seemed useless and maimed.

Now your skill has been lost,
You're angry, but who can you tell?

ট্রেড ইউনিয়ন গান এইভাবে খুব সন্তর্পণ অন্তর্ঘাতে আমাদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে, আবার অন্যদিকে আধুনিক যন্ত্রপীড়িত জীবনের মুখে একটা ত্রাসের ভঙ্গি এনে দেয়। বোধহয় নিজের কর্মিষ্ঠ হাত দুটির দিকেও আশংকায় চাইতে হয় আমাদের। কিন্তু সেই অবসর ফোটবার আগেই বেজে ওঠে আরেকটি মর্মভেদী বাণী, অন্য একটি গানের :

I was digging down a ditch when my body got a twitch,
I got the work jerk, I got the work jerk.
My old mum used to tell me, 'Son, get a steady job'
But all I got right now is a steady steady throb
I got the work jerk. I got the work jerk.
Well I went to see the doctor and the doctor said 'Son
It's a recent rare phenomenon, there's nothing can be done'
I got the work jerk. I got the work jerk.
I said doc you gotta help me, gim me a cure
Just how much of this shaking do you think I can endure
I got the work jerk. I got the work jerk.

উত্তেজনাপূর্ণ রুদ্ধশ্বাস এই গানের বিশ্ব এবারে জানায় :

I was typing and a tapping when I got a sudden spasm
From my head down to my hand became an aching gaping spasm
I got the work jerk.
I went to see the doctor and the doctor said 'sorry
Take and a valium and please try not to worry.'
I got the work jerk. I got the work jerk

শেষপর্যন্ত গানের পেছন পেছন দৌড়ে আমরা এই ভয়ংকর অনুভবে দাঁড়াই যে,

Now in the factory and the office, in the home and in the street
I got the work jerk. I got the work jerk.
Everybody is jerking to the work jerk beat.

সত্যিই কত প্রত্যক্ষ কত সত্য এই অনুভব। আধুনিক জীবন আর আধুনিক মনের গান এখানে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায়। বিস্মিত অভিভবে ভাবি, এমন গান কেন আমাদের নেই।

তবু কথা থাকে। যে-গান আমাদের নেই তার জন্য খেদ সত্ত্বেও আশা রাখা চলে এই সম্ভাবনার দিকে যে, ফুটে উঠতেও তো পারে সেই গান একদিন। আমাদের তরুণ গীতিকার-সুরকাররা নতুন করে ভাবতেও তো পারেন ট্রেড ইউনিয়ন গানের নানা পর্যায়ের ভাবনাকে তাঁদের গানে ধরতে। আর কে বলতে পারে যে, নানা স্তরে এই বর্গের গান লেখা হয়নি বা হচ্ছে না? সবদিককার খবর আমরা রাখি না। যেমন, ডানলপের শ্রমিককর্মী অজয় মিশ্র ব্যক্তিগত চিঠি লিখে আমাদের জানিয়েছেন :

ট্রেড ইউনিয়ন গান নিয়ে আমাদের দেশে সত্যিই কি কিছু হয়নি? রেকর্ডে বা ক্যাসেটের কথা আপনি লিখেছেন। তার বাইরে আমাদের এই শ্রমিক মহল্লায় কিছু কিছু গান সাধারণ শিল্পীদের

কণ্ঠে আমরাই শুনেছি। স্বভাবতই সে সব আপনার জানবার কথাও নয়। '৭৯ সালে ডানলপ এলাকায় একটি মুশায়েরা'র আসর বসেছিল। মনে আছে সেখানে হঠাৎ একজন দুর্গাপুরের শ্রমিক এসে বাংলা ও হিন্দীতে কিছু গান শুনিয়েছিলেন যার বিষয়বস্তু আপনার কথিত গানের সঙ্গে খুবই মেলে। বিষয়ে বলিষ্ঠতা ছিল। কথা আজ খুব একটা মনে নেই, তবে গান দুটি বেশ সুরেলা। 'সত্যিকারের জীবনের কম্পন' ছিল। আজ সেই শিল্পী হারিয়ে গেছেন, নামও খুব একটা শুনতে পাই না। রেকর্ডও হয়নি। হলে নিশ্চিত তা জনপ্রিয়তা পেত। তিনি নিজেই গান লিখতেন। আর একবার ৭৫-৭৬ সাল জুট মিল মহল্লায় শ্রমিকদের গান শুনেছিলাম। জগদ্দলের শিল্পী বেশ ইনিয়ে বিনিয়ে শ্রমিক পরিবারের মজার কথা গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ভালো লেগেছিল। গান লিখেছিলেন উর্দু কবি শান্তি ভট্টাচার্য।

এরকম ইতস্তত কিছু গান এলাকায় শুনেছি। তখন বুঝিনি। আজ সেই গানগুলোর জন্য মনটা হাহাকার করে উঠল।

একই রকম অভিজ্ঞতার কথা বললেন কাঁচড়াপাড়া ওর্য়াকশপের কর্মী শান্তি নাথ। মুখে মুখে নিত্যই সেখানে নাকি শ্রমিকদের গান রূপ পায়। কতই শুনেছেন, শোনেন। প্রার্থিত গুরুত্ব দেননি, তেমন করে সেসব গানের তাৎপর্য অনুধাবন করেননি। এবারে নজর রাখবেন, সংগ্রহ করবেন।

তাহলে শেষ কথা হতাশার নয়। যে-গান আমাদের নেই ভাবছি, তা থাকতেও পারে। কেবল চাই খোঁজার মতো মন, সন্ধানী সচেতনতা, সঠিক দৃষ্টিকোণ।

উল্লেখপঞ্জি

১. 'রবীন্দ্রসংগীত : বাংলা গানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব'। গানের লীলার সেই কিনারে। ১৯৮৫। পৃ ৫৪ ও ৬৫।

২. Album by MNO। এ সম্পর্কে তথ্যসূত্র : *Homage to Catatonia :* Mekenzia Wark, Meanjin, Vol. 47, No. 2. 1988.

৩. *Popular Music and Society.* Vol. 2, No. 4, 1987, p. 86.

৪. *Soviet Rock Lyrics : Their Content and Poetics.* 1987.

৫. 'Rock Music and Socialization of Moral Values in Early Adolescence', James Leming. *Youth & Society.* Vol. 18, No. 4, 1987.

৬. 'জনতার সরণিতে রবীন্দ্রসংগীত' সুনীল চট্টোপাধ্যায়, লঘুপক্ষ। ১৩৯৭। পৃ ১৫৭।

৭. *বঙ্গীয় লোক-সংগীত রত্নাকর* : আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ২য় খণ্ড ১৯৬৬। পৃ. ৯৮৪-৮৫।

৮. ঐ। ১ম খণ্ড। পৃ. ৪৯৫।

৯. 'পল্লীসমাজের সংগীত ও সংঘাত', হেমাঙ্গ বিশ্বাস। *লোকসংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম।* ১৩৮৫। পৃ ৬২

১০. অনুবাদ : সুধীর চক্রবর্তী।

১১. *লোকসংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম।* পৃ ৬৬।

১২ *সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান* : সুধীর চক্রবর্তী। ১৯৮৫। পৃ ২০৬।

১৩. *Strike a Light.* Ed. by Gillian Harrison, Sydney, 1988, p. 76.

১৪. ঐ, পৃ. ২০।

১৫. অনুবাদ : সুধীর চক্রবর্তী।

১৬. *গণসংগীত সংগ্রহ* : সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত। ১৯৯০। পৃ ৩৮৪।

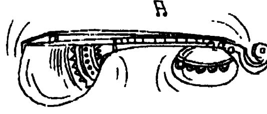
১৭. ঐ, পৃ ৫৯৭, ৬০১।

১৮. ঐ, পৃ. ৩৬২।

১৯. ঐ, পৃ. ৪৯২।

২০. অনুবাদ : সুধীর চক্রবর্তী।

৪



গানের দুই রাজা : রবীন্দ্রনাথ, রবার্ট বার্নস্

শিল্প বা সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে তুলনার আশ্রয় নেওয়া একটা পুরোনো কৌশল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তুলনা করেছিলেন টেম্পেস্টের সঙ্গে শকুন্তলার। রবীন্দ্রনাথকে তুলনা করা হত শেলির সঙ্গে, পরে এমনকি গ্যয়টের সঙ্গে। কিন্তু এসব প্রতিতুলনা সাহিত্যবিচারের বড়জোর একটা অন্যতম উপায়, কখনই উপেয় নয়। কেন-না সাহিত্যের রচয়িতা যে-ব্যক্তিমন তা যুগে যুগে স্বতন্ত্র, দেশে দেশে, আর সত্যি বলতে কি এক দেশেও দুজন লেখকের মধ্যে কতটুকুই বা তুলনা চলে! তবু এই তুলনার অভ্যাস আমাদের আজও রয়ে গেছে। তবে অন্য একজনের সঙ্গে তুলনা করলে হয়তো মূল লেখকের কোনো কোনো দিক বোঝা সহজ হয়, কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি বোঝা যায় না। তুলনার ঝোঁকে ভুলও বুঝতে পারি। লেখকের বিশেষত কবির সৃষ্টির জগৎ এমন নিজস্ব যে একজনের সৃজনের আলোয় অন্যের প্রাঙ্গণ স্পষ্ট হয় না। বড়জোর তৈরি হয় এক বিতর্কের অবকাশ কিংবা চমকে দেওয়া যায় তথ্য সাজানোর কৌশলে।

আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে ছাপা 'গীতবিতান বার্ষিকী' সংকলনে হেমেন্দ্রলাল রায় 'রবীন্দ্রনাথ ও বর্নস্' ব'লে আড়াই পৃষ্ঠার এক শীর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। গীতিকার হিসাবে রবার্ট বার্নস্ ও রবীন্দ্রনাথের তুলনা করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ওইটুকু নিবন্ধে অতবড় একটা বিষয় সম্পর্কে সুবিচার হতে পারে কেমন করে? তাই দিকনির্দেশী কয়েকটি ইঙ্গিত, যুক্তি দিয়ে টেঁকসই না-করা আলগা কিছু মন্তব্য হেমেন্দ্রলাল করে যান। যেমন রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে তাঁর ধারণা :

> সংগীতে তাঁর সৃষ্টি সর্বাঙ্গীণ ও সুসম্পূর্ণ হয়নি।... প্রতিভার প্রশ্ন উঠছে না, বস্তুত অবসর তাঁর যথেষ্ট ছিল না। অসাধারণ মানুষেরও শক্তি ও উৎসাহ পরিমিত, অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তাঁর ইচ্ছা- অনিচ্ছা তুচ্ছ ক'রে তাঁকে ইউরোপীয় সাহিত্যের এক দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যে, অর্থাৎ রোমান্টিক উজ্জীবনের (Romantic Revival) প্রারম্ভ থেকে ভিক্টোরিয়ান যুগ পর্যন্ত ইংরাজি কাব্য রবীন্দ্ররচনায় প্রতিবিম্বিত ও ভারতীয় ঐতিহ্যে স্বীকৃত।

সংগীতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সর্বাঙ্গীণ ও সুসম্পূর্ণ হয়নি এই মন্তব্য আমাদের হয়তো গ্রহণযোগ্যই মনে

হবে না আজ, কেন-না আধুনিক বাঙালির ধারণা তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যে সংগীতই সবচেয়ে সর্বাঙ্গীণ। যাইহোক, ওই বিতর্কযোগ্য মন্তব্যের পিঠোপিঠি হেমেন্দ্রলাল বলে বসেন :

> রবীন্দ্রনাথের গায়কী অভিজ্ঞতা বর্নসের চেয়ে বেশি না হলেও তাঁর রচনা-প্রণালী কোনো সুর-বিশেষের হুবহু অনুকৃতি নয়।...বর্নসের গান মানবপ্রকৃতির নিকটতর ও সহজ।...কত সময় ভাবতে ইচ্ছে করে, রবীন্দ্রনাথ ' বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি, নেই কেন'-র মতো গান আরও কিছু লিখে গিয়েছেন।

এ মন্তব্য পড়ে আমাদের মনে হবেই যে রবীন্দ্রনাথের গায়কী-অভিজ্ঞতা কি খুব কম ছিল? বার্নসের সংগীতসিদ্ধি তো জগৎপ্রসিদ্ধ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগীত সিদ্ধি কী স্তরের? এ প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা বরং জেনে নিই বার্নস্ সম্পর্কে ডেভিড ডাচেসের এই সিদ্ধান্ত যে,

> It is in his songs that his growth as a poet after 1786 can chiefly be traced, as it in his songs that have spread his reputation throughout the world. An account of Burn's poetry without a full discussion of his achievement as a song-writer is like Hamlet without the Prince of Denmark or what is even less excusable water without whisky.

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এতবড় মন্তব্য করা আমাদের দেশে এখনো শুরু হয়নি, তবে শিষ্ট সমাজের মতামত এরই ধার-ঘেঁষা। আজ না হয় কাল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই দাবি উঠবেই যে, *গীতাঞ্জলি* থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত লেখা তাঁর গানগুলি বাদ দিলে তাঁর সম্পর্কে সুবিচার হবে না। যাইহোক, তার আগেই আমরা বরং বার্নস্ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গীতিকার হিসাবে একটা প্রতিতুলনার ছক খাড়া করে রাখি। তা শুধু হেমেন্দ্রলালের চকিত মন্তব্য যাচাই করার জন্য নয়। সামগ্রিকভাবে এই দুই ভিন্ন স্বভাবের কবি, আলাদা দুই দেশকালে জন্মে কেন আত্মপ্রকাশের সেরা উপায়রূপে বেছে নিয়েছিলেন একসঙ্গে কবিতা আর গান, তাও বোঝা দরকার। অন্তহীনভাবে কবিতা লিখেও তৃপ্তি হয়নি এঁদের দুজনের, লিখে গেছেন অনেক গানও। বার্নসের কবিতা তো আজ ইতিহাসের সামগ্রী, কিন্তু তাঁর গান ইংরাজি গানের পরম্পরায় উজ্জ্বল স্থান নিয়ে এখনো গাওয়া হচ্ছে। হার্ডির লেখা '*মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ*' উপন্যাসে শুধু যে বার্নসের গান শোনা যায় তাই নয়, ইংরাজি সাহিত্যের নানা জায়গায় পাই বার্নস্-সংগীতের উৎকলন।

গানের দুই রাজা রবার্ট বার্নস্ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য কোনোভাবেই এক নিশ্বাসে উচ্চারণযোগ্য নন। সংগীতনির্মিতি, তার প্রয়োগ, রূপবৈচিত্র্য বিচারে দুজনের যেমন চলে না কোনো তুলনা, তেমনি রচিত গানের সংখ্যা, পরবর্তীকালে স্বদেশে তার অনুবর্তন এবং শিল্পসিদ্ধির বিচারেও দুজনের মধ্যে অনেক তফাত দেখা যায়। বার্নস্ গান লিখেছিলেন ১৭৮২ থেকে ১৭৯৬ প্রধানত এই চৌদ্দ বছর। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই গান রচনার পর্ব দীর্ঘ অন্তত চৌষট্টি বছরের। বার্নসের গানের সংখ্যা ৫০০ অতিক্রম করে বড়জোর, রবীন্দ্রনাথের গান, প্রভাতকুমারের গণনা অনুযায়ী, ২,২৩২ খানি। তার মধ্যে ১৮৯০ খানির স্বরলিপি আছে স্বরবিতানের নানা খণ্ডে। ৩৪২ খানি গানের সুরতাল পাওয়া যায়নি, সেগুলি গানরূপেই গীতবিতানে আছে।

দুজনের প্রতিতুলনার একটি সামান্য লক্ষণ হল ভাঙা গানের বিপুল সমারোহ। বার্নসের পঁচাত্তর শতাংশ গান স্কটিশ লোকগীতির সুরভাঙা এবং রবীন্দ্রনাথ মার্গসংগীত, ইংরাজি গান ও বাংলা লোকগীতি ভেঙে বহু গান নির্মাণ করেছিলেন। দুজনেই মূল সুরের কাঠামো রেখে বাণী বদলে ছিলেন। এইভাবে অনেক স্কচ গানের সরল ও মর্মগ্রাহী সুর বার্নসের কবিত্বে সমৃদ্ধ হয়ে সভ্যসমাজে পাংক্তেয় হয়েছে, অন্যথায় সেগুলির ভাবের স্থূলতা ও ভাষার অমার্জিত অশালীনতা সভ্যসমাজের রুচিবোধ ও আভিজাত্যের পক্ষে গৃহীত হত না। আরেকটি ঘটনাগত মিল আছে এই দুই গানের রাজার। একদা Auld Long Syne নামে যে-লৌকিক

অবজ্ঞাত গানটিকে বার্নস্ তাঁর বাণীলাবণ্যে পুনর্নির্মাণ করে পৃথিবীবিখ্যাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই গানটি অবলম্বন করে সৃষ্টি করেছিলেন একটি বিখ্যাত ('পুরানো সেই দিনের কথা') গান। নানা তথ্যসূত্র ও সৃষ্টিপ্রযত্নের অনেক হদিশ থেকে আমরা দেখি বার্নস্ ও রবীন্দ্রনাথের অন্তঃস্বভাবের বহু সাধর্ম্য। সেসবের বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করার আগে বার্নসে্র জীবন ও সংগীত সাধনার খানিকটা পরিচয় জেনে নেওয়া দরকার।

২

ইংরাজি গানের ইতিহাস বেশ পুরোনো। শেকসপিয়ারের আমলে অর্থাৎ আজ থেকে চারশো বছরেরও আগে ইংরাজি গান শিষ্ট সমাজে বেশ চালু ছিল; তার প্রমাণ মেলে শেকসপিয়ারের নাটকের গানে। তাঁর আগে বেন জনসন, টমাস ডেকার ও জন ফ্লেচার গান রচনায় খুব জনপ্রিয় ছিলেন। অবশ্য গোড়া থেকেই বিলিতি গানের বনিয়াদে ছিল লোকগীতির লেনদেন। বিশেষ করে আয়ার্ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে ছিল এক সমৃদ্ধ লোকগীতির ধারা আর সেখানকার সমাজ পরিবেশ ছিল গ্রামীণ স্বতঃস্ফূর্ততায় সুরোচ্ছল। এ.এল.লয়েড তাঁর *সং ইন ইংল্যান্ড* বইয়ে বিলিতি গানের এই লোকজীবনভিত্তি নানা বিভাজনে দেখিয়েছেন। অবশ্য এখানে উল্লেখ জরুরি যে, স্কচ উপভাষায় লেখা লোকগীতির সন্ধান সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মিললেও সেগুলির মুদ্রিত রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পাওয়া যায় না। সেকালে স্কচ ভাষা ও গান খুব জনপ্রিয় ছিল শিষ্ট সমাজে। জেন অস্টেনের উপন্যাসে তাই দেখা যায় অভিজাত ঘরের সুন্দরী পিয়ানো বাজিয়ে স্কচ গান গাইছেন। রবার্ট বার্নসের আগে র‍্যামজে ও ফারগুসন স্কচ গান লিখে বিখ্যাত হন ১৭৮৪ সালে। ফারগুসনের গান পড়ে রবার্ট বার্নস স্কচ উপভাষার প্রকাশ ক্ষমতা ও গীতিধর্মিতা বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। বার্নস ছিলেন কৃষক-সন্তান। ফলে গ্রামীণ পরিবেশে গাঁথা লোককাহিনি আর মেঠো গান জন্ম থেকেই শুনে এসেছেন। তাঁর মা তাঁকে শোনাতেন নানা স্কচ গান আর ব্যালাড। ভবিষ্যতে রোমান্টিক রিভাইভালের এই কবি তাঁর গান দিয়ে উজ্জীবন ঘটান হারিয়ে-যাওয়া ছড়িয়ে-থাকা নানা সুর, গাথা ও সরল জীবনবাদের ভাষ্য। বার্নসের গানে একইসঙ্গে উঠে আসে স্কচ গানের সারল্য, বাসনাময় জীবনবেগ, সাবলীল হৃদয়ধর্ম ও যৌনতার তাপ।

যাকে বলে সাংগীতিক প্রতিভা বার্নসের তা ছিল না। নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে সংগীত রুচির প্রতি তাঁর যে-ঝোঁক সে নিতান্তই অশিক্ষিত এক প্রাকৃত ঘটনা, শিক্ষের দ্বারা পরিশীলিত নয় আদৌ। সমালোচকরা তাঁর সম্পর্কে লিখে গেছেন : কণ্ঠে সুর আসত না রবার্টের, আর শ্রুতিও ছিল এত বাজে যে দুটো সুরের তফাত ধরা তার পক্ষে ছিল কষ্টকর।

কিন্তু বার্নস গান জানতেন। পিয়ানো বাজিয়ে গাইতেও পারতেন। তাঁর গান রচনার ছকটা ছিল এইরকম : একটা লোকগীতির স্বরলিপি পিয়ানোয় বারবার বাজাতে বাজাতে তাঁর ভেতরে গানটা ঢুকে যেত, এরপর সুরের কাঠামো না পাল্‌টে বাণীবিন্যাস করে নিতেন। হয়ে উঠত একটা নতুন গান। ব্যাপারটা খুব মজা করে লিখেছিলেন বার্নস্ একটা চিঠিতে। 'Laddie lie near me' স্কচ গানটি কেমন করে নতুন বাণীর সাজ পরবে তার আভাস দিতে গিয়ে বার্নস্ লেখেন :

> 'Laddie lie near me' must lie by me for sometime.I do not know the air; and untill I am complete master of tune, in my own singing (such as it is), I never can compose for it.

আসলে তিনি তাঁর বিনয় বাচনে নিজের সম্বন্ধে কী লিখে গেছেন বা সংগীত সমালোচকরা তাঁর শ্রুতি

সম্পর্কে কী বলে গেছেন তা এখনকার দিনে অবান্তর। কেন-না আমরা দেখি, স্কচ গানের রাজা বলে তাঁর পৃথিবী-জোড়া খ্যাতি। সে কি আকাশ থেকে পাওয়া? তিনি খুব ভালো গান লিখে গেছেন এবং পরের যুগেও রয়েছে তার প্রচলন। এই সত্যটুকুই যথেষ্ট।

তাঁর জীবনতথ্য সাজালে দেখা যায় তাঁর গান রচনায় রয়ে গেছে স্পষ্ট তিনটি প্রভাব ও প্ররোচনা। প্রথমে তাঁর মার-কাছে শোনা নানা টুকরো গানের স্মৃতি। তারপরে স্কচ গানের অজস্র বিচিত্র ঐতিহ্য, যে-পটভূমিতে তাঁর জন্ম আর বিকাশ। গান রচনায় সবচেয়ে বড়ো প্রত্যক্ষ প্রেরণা অবশ্য ছিল বার্নসের অসংখ্য প্রেমের ঘটনায়। তাঁর ক্ষণ-প্রণয় বহু গানের জন্ম দিয়েছে। এই রকম একটা ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করে গেছেন : 'আমাদের লৌকিক প্রথা এই যে, কৃষিকাজের জন্য জোড় বাঁধা হত ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আমার সে বার পনেরো বছর বয়স চলছে। সে সময় আমার চেয়ে মাত্র বছর খানেকের ছোট, প্রায় ডাইনির মতো সাংঘাতিক দেখতে, একটা মেয়ে হল আমার সঙ্গিনী। ভালোবাসা জাগিয়ে দেবার মতো একটাই গুণ ছিল তার। দারুণ গাইত। আমি তার গানের সুরের চাকার ওপর বসিয়ে দিতাম আমার গানের গাড়ি।'

এই রকম নানা তাৎক্ষণিক উপলক্ষে গান রচনার অনেক ঘটনা ঘটিয়ে এবং সেইসঙ্গে প্রণয়রঙ্গউত্তাল জীবনযাপনে কেটে গেল বার্নসের কবিতা ও গান রচনার উন্মেষ-পর্ব। তাঁর বয়স যখন ২৮, সেই ১৭৮৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর আলাপ হল জেমস্ জনসন বলে স্কচ গানের এক উন্মাদ ভক্তের সঙ্গে। জনসন ছিলেন পেশায় খোদাইকর। তিনি বার্নসের ওপর চাপালেন এক কাজের ভার টাকার বিনিময়ে। ঠিক হল *স্কচ মিউজিকাল মিউজিয়াম* নামে কয়েক খণ্ডে গানের সংকলন করবেন বার্নস। বার্নস মহা আনন্দে এই কাজে ডুবে গেলেন। ১৭৮২-তে এই সংকলন প্রথম বেরোয়, তাতে বার্নসের দুখানা গান ছিল। বার্নসের সম্পাদনায় দ্বিতীয় সংকলন বেরোয় ১৭৮৮ সালে, তাতে বার্নসের গান ছিল ৪০ টি। ১৭৯০ সালে তৃতীয় সংকলন (বার্নসের গান ৫০) এবং ১৭৯২ সালে চতুর্থ সংকলন (বার্নসের গান ৫০)। শেষ সংকলন বেরোয় বার্নসের মৃত্যুর পর। এই সংকলনে বার্নসের নিজের গান ছাড়া রয়েছে তাঁর সংগৃহীত বহু গান। সেসব গান নানা সূত্রে, বহু প্রয়াসে তিনি সংগ্রহ ও পরিমার্জনা করে সংকলনভুক্ত করেন। তাঁর ভাষায় : I have collected, begged, borrowed and stolen all the songs I can find.

এই সংকলনগুলিতে বার্নসের গানগুলি আসলে পুরোনো স্কটিশ লোকগীতির সুরে বাঁধা নতুন বাণীর বিন্যাস। এইভাবে অনতিপ্রচলিত বা অজ্ঞাত নানা স্কচ গান পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। পুরনো স্কচ গান সম্পর্কে বার্নসের ছিল গভীর অনুরাগ। আবেগময় ভাষায় তিনি লিখে গেছেন :

> There is a certain something in the old Scotch songs, a wild happiness of thought and expression, which peculiarly marks them, not only from English songs, but also from the modern efforts of song wrights. in our native manner and language.

স্কচ গানের সুর বজায় রেখে নিছক শব্দ পালটানোতেই বার্নসের প্রয়াস শেষ হয়েছিল ভাবার কারণ নেই। স্কচ লোকনৃত্যের তালে তিনি গানের লয় পালটে নিয়েছিলেন গানের মর্জি বুঝে। বস্তুত, স্কটিশ নৃত্যের সহযোগী কিছু সুরে তিনি কথা বসিয়েছিলেন—সংগীতের মন্দিরে ওই রচনাগুলি ছিল বার্নসের উজ্জ্বল উপচার। নাচের বাজনার প্রতি তাঁর শ্রুতি ছিল যেমন অনুভূতিশীল, তেমনই সেই সুরের বিষাদ তাঁকে প্রেরিত করত গান রচনায়। বহু সুরকারই তো সাজানো-কথায় সুর বসিয়ে গান বাঁধেন, কিন্তু যে-সংগীতকার তৈরি-সুরে নতুন কথা সাজাতে পারেন তাঁদের সংখ্যা খুব কম। এই দিক থেকে, বার্নসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা এসে পড়ে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে ওই কাজে কোনো জনসন জাতীয় ব্যক্তি প্ররোচিত করেননি, পাননি কোনো অর্থপ্রাপ্তির ইশারা। এ কাজ তাঁর স্বেচ্ছায় করা, ভালোবাসায়। তাঁর হাতেই আমাদের লোকগীতির পুনরুজ্জীবন ঘটে।

এবার দেখা যেতে পারে, কেমন করে পুরোনো স্কচ বাণীতে বার্নস্ সংশোধন করতেন, কতটা পালটাত বাণী। যেমন একটা পুরোনো লৌকিক স্কচ গানের ভাষা ছিল :

He spied a maid both young and sweet,
At a window looking through.

বার্নসের বাণীবিন্যাসে গানটি দাঁড়াল :

O' there he spied a bonnie lass,
The window looking through.

এমন কিছু নয়, কিন্তু ওই যে একটু মিষ্টি মোচড়, বাণীর সংহতি আর ধ্বনি-পেলবতা ওতেই গানটি পেল জীবন। তরুণী ও মিষ্টি মেয়েটির বার্নসীয় বিশেষণ দাঁড়াল Bonnie lass। চমৎকার গীতলতা বেজে উঠল।

আরেকটি উদাহরণ :

মূল গান

The seas thy shall dry
And the rocks melt into sands.
Then I will love you, so, my dear
When all these things are done.

বার্নসের রূপান্তর

Till a' the seas gang dry, my dear
And the rocks melt wi' the sun,
And I will love thee still my dear
While the sands of life shall run.

একেই বলে ভাবের রূপান্তর এবং তা নিষ্পন্ন হয় বর্ণনীয় নিসর্গের দৃশ্যান্তর বিন্যাসে। 'টিল' ও 'হোয়াইল' এই দুই ক্রিয়া-বিশেষণের সূক্ষ্ম কাব্যিক প্রয়োগ, 'গ্যাংগ্' এই স্কচ শব্দের ধ্বন্যাত্মক ব্যবহার লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে ' মাই ডিয়ার' শব্দটি গানের রিফ্রেইনের ঢঙে দুবার দুলিয়ে দেওয়া, 'অল' এবং 'উইথ' শব্দের ধ্বনি সংবরণ (গানের কারণেই শুধু a' এবং wi') বার্নসের সৃজন মানসের অভিনবত্ব দেখায়। আর sands-এর জায়গায় কী করে কোন্ জাদুতে যে sun এল এবং sands রূপ নিল sands of life-এ তা ভাবলে কাব্যসৃষ্টির রহস্য অগম্য থেকে যায়। শুধু ফোটে তার মাধুর্য। গানের এই দ্বিজত্বসাধন, এই নবীন রসসঞ্চার বার্নসের কাছে খুব পবিত্র, খুব নিবিষ্ট কর্তব্য। গানের ঠিক ঠিক আবহ রাখার জন্য, তার উৎসমুখের প্রতিটি অনুষঙ্গ বজায় রাখার জন্য তিনি শুধুই ঘুরতেন সেইসব জায়গায় যেখান থেকে ওই সব গানের জন্ম। নিজেই লিখেছেন :

> I am such an enthusiast, that in the course of my several peregrinations through Scotland, I made pilgrimage to the individual spot from which the song took its rise.... I have paid my devotions at the particular shrine of every Scots Muse.

তাঁর এই সততা ও সংগীতে আনুগত্য কিন্তু তেমন করে মূল্য পায়নি। কেন-না তাঁর আরেক প্রকাশক জর্জ টমসন ছিলেন মূর্তিমান দিঙ্নাগ। জেমস জনসনের মতো তিনি বার্নসের প্রতিভা ও স্বভাবের স্পর্শকাতরতা বিষয়ে মরমি ও অনুকম্পায়ী ছিলেন না। বার্নসের অনেক রূপান্তরিত গান তিনি নির্মমভাবে বর্জন করতেন, অনেক গান দুবার লেখাতেন, অনেক গানে নিজেই চালাতেন সংশোধনী কলম। বেচারি অসহায় বার্নস্ কী আর করেন! চিঠির পর চিঠি লেখেন টমসনকে, তাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নানা যুক্তিতে। কেন ওই

বিশেষ শব্দটা পালটালেন, কেন ওই গানটার প্রতি তার ভালোবাসা নানাভাবে তিনি বোঝাতে চান। ল্যানসি ফারগুসন সম্পাদিত *দি লেটারস্ অফ রবার্ট বার্নস্* সংকলনে ওইসব রক্তিম চিঠি রয়েছে। একজন সৃজনশীল গীতিকারের সৃষ্টি রহস্যের করুণ রঙিন পথ আর ব্যক্তিহৃদয়ের নানা স্বপ্ন-আকাঙক্ষা, সানন্দ আস্বাদন ধরা পড়েছে সেসব চিঠির অক্ষরে। বার্নসের জীবনের শেষ পাঁচ বছর টমসনের সক্রিয় উৎসাহ ও প্রেরণায় সঞ্জীবিত ছিল। ১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্নসের সঙ্গে জর্জ টমসনের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। টমসন বার্নসকে বলেন স্কটল্যান্ডের জাতীয় সুরসম্পদগুলির এক মহৎ সংকলন-গ্রন্থ প্রস্তুত করতে। কেন-না তাঁর মনে হয়েছিল বহু স্কচ গানের হৃদয়গ্রাহী সুর মূল্যহীন ও অব্যবহার্য হয়ে গেছে অশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের জন্য এবং বহু গান শুধু তার ভাবগত অশ্লীলতার জন্য শিষ্টসমাজে রূপায়ণের অযোগ্য থেকে গেছে। তিনি চেয়েছিলেন গানগুলির মনোহরণ সুর সংরক্ষিত হোক বার্নসের শব্দ-রূপান্তরে। এ কাজের জন্য টমসন তাঁকে উপযুক্ত দক্ষিণার আশ্বাস দেন। বার্নস্ এই কাজে সানন্দে সম্মত হন তবে দক্ষিণাপ্রসঙ্গে লেখেন : যে-কোনো অর্থমূল্যের চেয়েই আমার গান মূল্যবান বা মূল্যহীন বলে আপনি ধরে নিতে পারেন। যে শুদ্ধ অনুপ্রেরণায় আমি এই কাজে হাত দিয়েছি তার কাছে টাকা, মজুরি, বেতন, ভাড়া সবই যেন আত্মার অবনতি বলে আমার মনে হয়।

টমসন আর বার্নসের যুগ্ম উদ্‌যোগে ১৭৯৩ সালে বেরোয় শোভন মুদ্রণ সৌষ্ঠবে *A Select collection of Original Scottish Airs*। এই গীতি সংকলনের পরবর্তী পাঁচ খণ্ড অবশ্য বেরোয় বার্নসের প্রয়াণের পরে। বার্নস অনুরাগীদের অবশ্য দৃঢ় সন্দেহ যে বার্নসের মরণোত্তর সংকলনগুলির গানে নিশ্চিতভাবে আছে টমসনের স্থূল হস্তাবলেপ। আসলে এই দুই জনের মধ্যে ছিল ব্যক্তিত্বের বিরোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। টমসন চাইতেন স্কচ গানে একটু ইংরেজিয়ানার পরিশীলন আনতে, আর বার্নস চাইতেন পিয়ানো আর চায়ের টেবিলের সংস্কৃতি থেকে বহুদূরের এক আবেগময় সরলতা।

গীতি সংকলনের দায়িত্ব দিয়ে টমসন দুটি বিষয়ে বার্নসকে স্পষ্ট নির্দেশ দেন। গানে যেন কোনো স্থূলতা না থাকে আর স্কচ শব্দের বদলে যেন ইংরাজি শব্দের প্রাধান্য থাকে। এখানেই মূল বিরোধ। কেন-না বার্নস্ বিশ্বাস করতেন স্কচ গানের গ্রামীণ সারল্যে এবং তার সঙ্গে স্কচ শব্দ ও বাগ্‌ধারার অল্পস্বল্প মিশ্রণে।

আসলে গানের ভাষা ব্যাপারটি তো গানের ভাবের বাইরের জিনিস নয়। কাজেই জোর করে গানের শব্দকে ইংরেজিয়ানায় ভরিয়ে দেওয়া যায় না। বার্নস্ সারাজীবন ভরে খুব মন দিয়ে শুনেছিলেন সরল বন্য ও বাসনাবহুল স্কচ গান এবং তাঁর নিজের সৃষ্টির তার বেঁধেছিলেন সেই স্বাভাবিকতায়। অনুভূতির অনাহত ও স্বাভাবিক উচ্চারণ তাঁর গানে স্কচ গানের মতোই শোনা যায়। তাঁর স্বভাব ছিল সরল উচ্ছ্বাসময় ও আবেগতাড়িত। একবার এক শুভার্থীর স্মৃতিতে বার্নস্ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে লেখেন : 'সদ্য-বিবাহিতা হয়তো ভুলে যেতে পারে তার স্বামীকে, রাজা হয়তো ভুলতে পারেন রাজকীয় মুকুটের কথা, এমনকি মা হয়তো ভুলতে পারে তার সন্তানকে, কিন্তু আমি তোমায় ভুলব না।' তাঁর প্রকাশ ছিল এতটাই অনর্গল ও অতিরেকবহুল।

বার্নস্ যেভাবে তুলনার পর তুলনা গেঁথে তাঁর বক্তব্যের আন্তরিকতা বোঝান, লক্ষ করলে দেখা যায় লোকসাহিত্যের জোর ওই জায়গাটায়। অভিজাত সংহত সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত আমাদের মন, বাচনিক ঋজুতায় বিশ্বাসী আমাদের জীবন হয়তো সায় দেবে না বার্নসীয় উচ্ছ্বাস ও অতিকথনে। কিন্তু লোকায়ত জীবনবাদী বার্নস্ তো অমন করেই বলবেন। মনে পড়ে কি সেই বিখ্যাত ছড়া যাতে আছে সংস্কারহীন এই উচ্চারণ?

জাদু এ তো বড় রঙ্গ জাদু এ তো বড় রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ।।
হিম জল হিম স্থল হিম শীতল পাটি।
তাহার অধিক হিম কন্যা তোমার বুকের ছাতি।।

এই ছড়ায় হিম জল হিম স্থল জাতীয় বাক্যগঠনের লৌকিক বাগ্‌ভঙ্গির সংক্ষিপ্তি তারিফ করবার মতো। কন্যা তোমার বুকের ছাতি উচ্চারণে সরল গ্রামীণ স্বীকারোক্তি চমৎকার ব্যক্ত। এখানে অন্য কোনো শিষ্ট শব্দ দিয়ে 'বুকের ছাতি'-র দুদণ্ড শান্তি বোঝানো যেত কি? বার্নসের গানে এরকম শব্দ অনেক আছে, যাতে ধরা পড়েছে তাঁর অনুভূতির মুক্ত, বন্য, আবেগময় প্রকাশ। লোকসংগীতে ভাব ও ভাষা এমনই সহজ সম্পর্কে আবদ্ধ। নাগরিক পরিশীলন তার সুর কেটে দেয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের একই থিমে ও ঢংয়ে লেখা :

উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত—
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।।

'বিনি ভাষায় উক্ত' এই অংশের নিরুচ্চার দ্যোতনা পুরোপুরি অভিজাত সাহিত্য রসের বৈদগ্ধ মেশানো। এ-ছড়ার ভঙ্গি লৌকিক কিন্তু বাচন নাগরিক। এর লক্ষ্য উন্নত রসরুচিকে খুশি করা। আরেকটি নমুনা :

লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা—
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।।

লোহা আর বজ্রের কাঠিন্যের পাশে নাগরাজুতোর তলার উল্লেখ অনেকটাই বৈপরীত্যের ঝোঁকে, বুদ্ধি দিয়ে বানানো। এর পেছনে *প্রহাসিনী*-র কবির যে জীবন রস উথলে ওঠে তা করুণ পরিহাসে দ্রব হয়ে যায় বাপের বাড়ি চলার অসম্ভাব্যতায়। ভাব ও ভাষার এই চাতুর্য ও তির্যকতা বার্নসের রচনায় আশা করা যায় না। তাঁর গান বরং অনেক সহজে বলে ফেলে :

O, my Luve's like a red, red rose
　　That's newly sprung in June :
O, my Luve's like the melodie
　　That's sweetly played in June.

সদ্যফোটা লাল গোলাপ ফুল কিংবা মধুর গানের সুর— বার্নসের ভালোবাসার উপমা ছিল এমনই পেলব, বর্ণময়, ইন্দ্রিয়গোচর ও স্পষ্ট। স্কচ গানের রাজা এমনই অনেক আনত, কোমল, বিধুর ও উত্তেজক গান লিখে যান সারাজীবন। নিজের সম্পর্কে নম্র বিনয়বচনে বলেন :

That I for pure old Scotland's sake
Some useful plan or book could make
Or sing a song at least.

বার্নসের গানে মিশে আছে তাঁর স্বদেশ চেতনা। তাঁর গান-রচনার ভাষা বিচারে সেই দেশানুরাগের সূত্রটুকু বাদ দিলে চলবে না। পরবর্তীকালে স্কটল্যান্ড এমনকি ইংল্যান্ড তাঁকে জাতীয় গীতিকারের মর্যাদা দিয়েছে। তিনি পাগলের মতো ভালোবাসতেন নিজের দেশ ও তার উপভাষা। শুধু তাঁর নিজের ভাষা নয়, তার সব কিছু, তার ব্যালাড, মন্দির, পুরাবৃত্ত, ধ্বংসস্তূপ সব কিছুকেই ভালোবেসেছিলেন। রোমান্টিক উজ্জীবনের এই কবি কেবলই পুনর্জীবন দেন ধ্বংসকে স্মৃতিকে সংগীতকে। কেবলই ঘোরেন দেশটার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে। গানে ধরতে চান তার আর্তি আর আনন্দ। টমসনকে লেখেন এক চিঠিতে :

> আর কিছু নয়, আমি শুধুই দেখেছি প্রাচীন মন্দির আর ধ্বংসাবলি, দেখেছি ফোয়ারা আর নানা সম্ভাবনার স্বপ্ন। গলায় তুলে নিয়েছি হাইল্যান্ডের সুর, স্কচ গান আর জ্যাকোবাইট লোকগাথা।

তাহলে বোঝা গেল স্কচ গানের স্কচ ভাষা, সুর, সংস্কৃতি সবই তাঁর প্রিয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল গীতিকারের আত্মপ্রকাশের পক্ষে তার মাতৃভাষার সহযোগ খুব দরকারি। মৃত্যুর দু-বছর আগে এক চিঠিতে লেখেন :

আমার তো মনে হয় স্কচ ভাষায় আমার চিন্তাভাবনা বেশ খুলে যায়, ইংরাজি ভাষায় তা হয়ে থাকে বন্ধ্যা।

এই কারণেই গান রচনার সময় তিনি স্কটিশ-মিশাল এক জোড়কলম ইংরাজি ভাষার বাণী ব্যবহার করে যান, টমসন ক্রফোর্ড যার তারিফ করে বলেন, আঠেরো শতকের শেষ ভাগের সরল গ্রাম্যতার ভাবাবেগ ও ফূর্তির সঙ্গে বার্নসের ভাষা খুবই মানানসই।

এখানে একটা বিতর্ক সেরে রাখা যাক। লোকগীতির বা কোনো দেশি গানের কাঠামো আর সুর বজায় রেখে তাতে বাণী বদলে নিলেই কি নতুন গানটি শিল্পপদবাচ্য হবে বা রসিকের অনুমোদন পাবে? কথাটা এইজন্য ওঠে যে লোকগীতির সুরে থাকে ভাবানুষঙ্গের সংগতি। সাধারণভাবে দেশি গানে বা লৌকিক গানে সুরের একটা সরল কাঠামো থাকে, থাকে সারল্য ও আর্তি, যা অশিক্ষিত কানকেও ভরিয়ে দেয় অজানা কোনো আনন্দে। এই সারল্য আর আর্তি আসে গানের বিষয় থেকে। যেমন দেখা যাক গৌরীপুরের একটা গান :

আজি গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে।।

হস্তী নড়ান হস্তী চড়ান কেকোয়া বাঁশের তলে
কী সাপে দংশিলে মাহুতকে কয়্যা যাও বা মোরে।

রোজায় ঝাড়ে গুণীনে ঝাড়ে ঢেকিয়ার আগাল দিয়া
মুই নারী ঝাড়িবাম মাহুতকে কেশের আগাল দিয়া রে।।

এখানে মাহুত বন্ধুর জন্য যে আর্তি এবং তাকে বাঁচাবার জন্য মেয়েটির যে-আকুতি আর লোক-বিশ্বাস-নির্ভরতা (চুলের আগাল দিয়ে ঝাড়ফুঁক) তার গানে ব্যক্ত হয় সেই উদ্‌বেগের সঙ্গে সংগতি রেখে একমুখী করুণ সুরের ছক আঁকা হয় গানটিতে। এখন এই সুরটা অপরিবর্তিত রেখে তাতে যদি শিষ্ট বাণী বসানো যায় তবে কি তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে? শিল্পের অনুমোদন পাবে?

এইখানেই গীতিকারের অগ্নিপরীক্ষা। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি বিস্ময়কর। তিনি বাউল বা অন্যতর লোকায়ত গানের কাঠামোয় চমৎকার দেশপ্রেমের বাণী বিন্যাস করেছেন এবং তা সার্থক শিল্পরস ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। লোকসংগীত ভাঙার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যেসব পদ্ধতি ও প্রকরণ মেনেছেন বা সৃষ্টি করেছেন বার্নসের প্রয়াস অতটা গভীরে নয়। কিন্তু বার্নসও চমৎকার দক্ষতায় পুরোনো লোকসংগীতের নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে বার্নসের নির্মিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদায় সংগীতে Auld long Syne-এর উল্লেখ ও উদাহরণ আসে।

বার্নসের সমকাল পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত বিদায়-সংগীত ছিল : Guid night and joy be wi' you a'। এ-গান বার্নসের খুব প্রিয় ছিল এবং এর সুরে তিনি 'Adieu! a heart-warm fond adieu' গানটি বেঁধেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে Auld long Syne হয়ে ওঠে সারা বিশ্বের ইংরাজি ভাষাভাষীদের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণীয় বিদায় সংগীত এবং Good night and joy be with you all-এর জায়গা নিয়ে

নেয়। Auld long Syne গানটি বার্নস্ প্রথম শোনেন এক বৃদ্ধের মুখে। গানের সুরটি ছিল সাদামাটা। ভাষা ছিল অমার্জিত স্থূল। বার্নসের ভাষায় : a piece of obscure doggeral dross। গানটি মুখে মুখেই চালু ছিল। কোনো লিখিত বা মুদ্রিত রূপ ছিল না। বার্নস্ সেই অমার্জিত গানকে ঘষে মেজে তৈরি করলেন এক অপূর্ব শিল্প। গানটির সম্ভাব্য আদি রূপ ছিল এইরকম :

How doth your presence me affect
With ecstacies divine,
Especially when I reflect
On old long Syne.

Is thy kind heart now grown so cold,
In that loving breast of thine,
That thou can't never once reflect
On old long Syne.

এবারে দেখা যাক বার্নস-কৃত গীতিরূপের অংশ (স্কচ শব্দ ও উচ্চারণসংগত বানান লক্ষণীয়) :

Should auld acquaintance forgot
And never brought to min'?
Should auld acquaintance be forgot
And days O' long Syne?

CHORUS

For auld long Syne, my dear
For auld long Syne,
We'll tak a cup o' kindness yet.

* নিচে উদ্ধার করা গেল বার্নসের এই পৃথিবী-বিখ্যাত গানের দুখানি বঙ্গীয় রূপান্তর। মনস্ক পাঠক লক্ষ করবেন, 'Auld long Syne' রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক-যৌবনের রচনায় স্মৃতি জাগানোর কাজ করছে। মূল স্কচ গানের বিধুরতা ও প্রত্যাশার বাণী রবীন্দ্র-সংগীতটিতে রক্ষিত আছে, কেবল পেয়ালা ভরার অনুষঙ্গটুকু তিনি সযত্নে বাদ দিয়েছেন। সঞ্চারী অংশে 'কালমৃগয়া'-র একটি গীতাংশ চমৎকারভাবে ভরা আছে :

পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।
আয় আরেকটি বার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়।
মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়।
মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়—
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়।
মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়—
আবার দেখা যদি হল, সখা, প্রাণের মাঝে আয়।।

একই গান অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। মূল গানের স্কচ ভাষার স্বাদ রাখার জন্য দেশোয়ালি বাণীর পরীক্ষা মন্দ কি ?

পুরাণ প্রেমকো নহি যাও ভঁইয়া হো,
পুরাণ প্রেমকো আওর যো দিন গিয়া হো,
হো যো দিয়া গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভররে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।।

For auld long Syne.*

মূল গানের ভাবান্তর হয়েছে বার্নসের রচনায় অথচ ফর্ম বজায় আছে। বার্নসের নতুনত্ব শুধু কোরাস প্রবর্তনায় নয়, বস্তুত গানটির সার্বিক বিধুরতা ও নতুন ভাবমণ্ডলের সৃজনে। সময় ও দূরত্ব মানুষের বর্তমান আনন্দ আর উজ্জ্বল অতীতের মধ্যে যে শূন্যতা সঞ্চার করে এই গানে তারই অন্তর্বাষ্প। প্রাক্-বড়দিন সন্ধ্যায় যখন মন কী পাইনি আর কী পাবো এই দুইয়ের সুতো বোনে তখন মনের মধ্যে এই গান বেজে ওঠে। গানটির ভাবের আবেদন সম্ভবত এর চেয়েও সর্বগ্রাসী। রসিক বিশ্লেষক তাই এই গানে পান বৃহত্তর কিছু। তাঁর মনে হয় :

> সময়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যে ট্র্যাজিক রহস্যময়তা তার এক মহৎ উদাহরণ এই গানে। এ গান স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ঈপ্সা, পুরানো বন্ধুতাকে সরিয়ে নিয়ে আসে নতুন বন্ধুত্ব, চঞ্চল শৈশব থেকে নিয়ে যায় বার্ধক্যের স্মৃতিমেদুরতায়। পাল্‌টে দেয় চেতনার স্তর এবং একই সঙ্গে আনে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি আর ধ্বংস।

সুতরাং দেখা গেল, লোকগীতির নবরূপান্তরে বার্নসের পটুত্ব বেশ ঈর্ষাজনক। একজন বৃদ্ধের কাছ থেকে শোনা গান তাঁর সাংগীতিক প্রতিভার স্পর্শে সর্বজনীন বিদায়গীতির মহিমা পেয়ে যায়। এই জাতীয় রূপান্তর কত কঠিন তা বুঝেছিলেন আইরিশ গানের রূপান্তর সাধক টমাস মুর। *আইরিশ মেলোডিজ্*-এর ভূমিকায় তিনি জানিয়েছিলেন, এইসব বিষাদগীতিতে নতুন কথা বসানোর কাজ সহজ নয়। যে-কবি সেই মূল গানের আবেগময়তার মধ্যে ঢুকবেন তাঁকে বুঝতে হবে অনুভব করতে হবে সেই প্রাণনার ওঠানামা। বিষাদ আর উচ্ছ্বাসের সেই বর্ণনার অতীত মিশ্রণ যা সেই দেশবাসীর চরিত্রে ও স্বভাবে মিশে আছে যার থেকে উঠে আসে ওইসব গান।

এই রূপান্তর বার্নস্ এমন অনায়াসে করেছেন যে, মুর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন : বার্নস যদি হতেন একজন আইরিশ তবে এই সংকলনের গান রূপান্তরের জন্য তাঁর গর্ব হত। তাঁর মনন ও সৃজন সামর্থ্য অমর করে রাখত এই গানকে।

এবারে বার্নসের গানের আরেকটা দিকের কথা বলা যায়। তাঁর গানের সৃজনে পরিবর্তমান প্রেমিকাদের প্রেরণার কথা বলা গেছে, কিন্তু যৌন চেতনার দিকটি বলা হয়নি। বস্তুত, পুরোনো স্কচ গানে ও স্কটল্যান্ডের গ্রামীণ পরিবেশে একটা স্বাভাবিক উত্তাল যৌবনের স্পর্শ ও যৌন আবেগ ছিল। জাতি হিসাবেও স্কচরা ইংরেজদের চেয়ে অনেক সংস্কারমুক্ত ও নীতিশৃঙ্খল-বিহীন। সুস্থ স্বাভাবিক যৌনচেতনা ও গ্রামের প্রণয় রাগরক্তিম স্কচ গানে অনেক সময় লেগে যেত অসংযত যৌবনের মত্ততা আর অসম্ভ্রান্ত ভাষার কলুষ। তার সঙ্গে তাল রেখে সুরের মধ্যে এসে যেত একটা চাপল্যের ধরন। আইরিশ গান ও সুর সে তুলনায় অনেক সংযত ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ আইরিশ গান ও সুর সম্পর্কে বলেছিলেন : 'মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল'। স্কচ গানের ভাবগত চপলতা ও শব্দগত অসম্ভ্রমতাকে টমসন বদলাতে চেয়েছিলেন বার্নসের সাহায্যে। করতে চেয়েছিলেন স্কচ গানের ভাষাগত সংস্কার। পুরোনো অনেক স্কচ গানের বাণী তাঁর মনে হয়েছিল 'unprintable'। তিনি বার্নস্‌কে অনুরোধ করেছিলেন বর্জনের শল্য দিয়ে শব্দ বদলে প্রতিভার সৃষ্টিধর্মিতায় এ জাতীয় গানগুলিতে নতুন বাণী সংযোজন করতে। বার্নস্ নিজেও এইরকম কিছু গানের কলুষ বাণীর জন্য বেদনা বোধ করতেন। একটা বিশেষ গান সম্পর্কে একবার তিনি টমসনকে লেখেন, গানটির সুর চমৎকার কিন্তু অশালীন পদ্যের জন্য কষ্ট হয় তাঁর মনে। অবশ্য তাই বলে তাঁর বাণীও খুব ভালো আর লাগসই হবে এমন কোনো অহংকার ছিল না তাঁর। তবু আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন : আমার মনে হয় জনপ্রিয় গানের সুরে অন্তত মাঝারি রকমের বাণী দেওয়াও ভালো। আমার চেষ্টা তারই।

অবশ্য বার্নসের এই মন্তব্য নিতান্তই বিনয় বলে ধরতে হবে আমাদের। কেন-না অ্যালান এবং ক্যাম্বেলের মতো সংগীত-সমালোচকও উল্লেখ করে গেছেন যে, বার্নসের বাণী স্কচ গানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তো বটেই, এমনকি অনেক গানে তিনি শিল্পিতায় মূল গানের আবেদনকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এমন উত্তরণের নমুনা হিসাবে কয়েকটি গানের কথা আলাদা করে বলেছেন। যেমন :

মূল সুর ও গান	বার্নসের রূপান্তর
১ I am a man unmarried.	O once I loved a bonnie lass
২ The Ruffian's Rant.	A' the lads o' Thornibank
৩ My Jo Janet.	Husband husband, cease your strife.

এসব গানে বার্নস্ শব্দগত পরিমার্জনার পূর্বসূত্র হিসাবে ভাবগত পরিমার্জনার দিকটিও লক্ষ রাখতেন। কোনো বিশেষ সুর বার বার গাইতে গাইতে, পিয়ানোয় কেবলই বাজিয়ে তাঁর মনে ভাবগত যে নব প্রেরণা জাগত সেই প্রণোদনা থেকে গান বাঁধতেন তিনি। ব্যাপারটা ঠিক যান্ত্রিকভাবে পুরোনো সুরে নতুন বাণী বসানো নয়, নবসৃষ্টি। এই কাজে পুরোনো গানের মেজাজ আর চালটা আগে বুঝে নিতে হয়। প্রিন্সিপ্যাল শার্প তাঁর অনন্য বিশ্লেষণে বার্নসের প্রতিভার এই দিকটি সম্পর্কে বলেন :

> প্রথম থেকেই তিনি নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, গান লেখার প্রেরণা ও প্রকৃত স্বাদ পাবার জন্য বারবার গুনগুন করতে হবে মূল সুর যতক্ষণ না উপযুক্ত বাচন উঠে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাঁর নিজের যে-বাণী তারও প্রেরণা কোনো না কোনো পুরোনো সুর। কখনই আগে গান লিখে পরে সুর দেননি তিনি। এইসব পুরোনো গান ও তার বাতাবরণ সম্পর্কে তাঁর নিষ্ঠা আর ভালোবাসা কোনো কাজেই আসত না যদি না দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কবির গহন অন্তঃস্তলের নিজস্ব এক সুর তৈরি হত, যার মধ্যে একটা জাতির সংগীতের সমস্ত কিছুই মিলে গিয়েছিল। এই সব সুর তাঁর সত্তার মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে যেতে তাঁর প্রতিভার স্পর্শে আরও সম্ভ্রান্ত আর মহিমান্বিত হয়ে উঠত। তিনিই এনেছিলেন স্কচ গানের পবিত্রতা।

এখানে বলা দরকার যে, গানের রূপান্তরে পুরোনো সুরের ঢং আর চাল যেমন মনে রাখতে হয় তেমনি ভোলা চলে না মূল ভাবের টোন। বার্নসের সরল গ্রাম্য যৌনচেতনা স্কচ গানের অন্তঃশীল অশ্লীলতাকে খুব মরমি ভঙ্গিতে আত্মসাৎ করে তাকে অন্য ভাবে ব্যক্ত করেছে। ফলে স্কচ গীতির অশ্লীল ইঙ্গিত তাঁর গানে নিরুচ্চারভাবে শিল্পিত হয়েছিল। এর উদাহরণ রূপে পুরোনো ও রূপান্তরিত এমন একটা গান তুলনা করে দেখা যেতে পারে। মূল স্কচ গান 'Let me in this aenight' -এর ভাব ও ভাষার ইঙ্গিত রুচিদুষ্ট :

She let him in sae cannily
She let him in soe privily
She let him in soe cannily
To do the thing you Ken, Jo.

But ere a' was done, and a' was said,
Out fell the bottom of the bed;
The Lassie lost her maidenhood,
And her mither heard the din,Jo.

এখানে স্পষ্ট শৃঙ্গারের উল্লেখ আর সেই মাতামাতি শব্দ মা-র কানে যাওয়া এই সব স্থূলতা বার্নস্ ঢেকে দেন রূপান্তরের অবগুণ্ঠিত সুষমায়। তাঁর 'O Lassie, Are ye sleeping yet' গানটি ওপরের গানটির রূপান্তর। সংলাপের ঢঙে বোনা ওই গানের অংশবিশেষ প্রতিতুলনায় এবারে উদ্ধার করছি :

O Lassie, art thou sleeping yet?
Or art thou walki' I would wit?
For love has bound me, hand and foot
And I would fain be in, Jo.

CHORUS

O let me in this ae night,
This ae, ae, ae night ;
For pity's sake this ae night
O rise and let me in, Jo.
Thou hear'st the winter wind and weet
Nae star blinks thro'the driving sleet ;
Tak pity on my weary feat
And shield me frae the rain, Jo.

HER ANSWER

O tell na me of wind and rain,
Upbraid na me wi' could disdain !
Gae back the gait ya cam again,
I, winna let you in, Jo.

CHORUS

I tell you now this ae night
This ae ae ae night,
And ance for a' this ae night,
I winna let go in, Jo.

মূল গানের প্রত্যক্ষতা অনেকটাই পালটে গেছে অথচ অন্তর্নিবিষ্ট আছে আদিরসের ব্যঞ্জনা। সেরেনেড জাতীয় এই গানের দ্যোতনা থেকে বোঝা যায়, শেষ পর্যন্ত নায়কের করাঘাত ব্যর্থ হবে না, ভেঙে পড়বে নায়িকার মনের কপট অবরোধ। নায়কের ছদ্মকাতরতায় খুলে যাবে দরজা। প্রথমে নায়িকার শয্যাগৃহের ও পরে দেহের। স্কচ গানের সরল গ্রামীণ যৌনতা বড় মধুরভাবে গানটিতে আপ্লুত হয়ে থাকে। নীতিবাদীর মতো ভাবের শুদ্ধতা আনতে গিয়ে বার্নস্ মূল গানটির বিষয়ান্তর ঘটান না। বরং নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তির ছক বানিয়ে তাতে কোরাসের বৈচিত্র্য এনে তুষারঝড়ে নৈশনির্জনে মিলনকাতর দুটি যুবক-যুবতীর আকুতি সুন্দরতর করে গড়ে তোলেন। এই দিক থেকেই বার্নস্ স্কচ গানের রাজা। তাঁর ভূমিকা নীতিবাগীশ সংস্কারের নয়, জীবনবাদী উজ্জীবকের। সংগীতের সঙ্গে অসুন্দরের বিচ্ছেদ ঘটান তিনি সুন্দরের ধ্যানে রত থেকে। 'He was emphatically the purifier of Scottish songs'—রসিকের এই উক্তি সত্য।

সুতরাং সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, বার্নসের সারস্বত সিদ্ধি ঘটেছে তাঁর গানে। বৈচিত্র্যে, সৃজনবেগে, রূপান্তরে ও গ্রহণীয়তায়। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে গান তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পীমনের অন্তঃস্তল থেকে বিনা প্ররোচনায় উঠে আসেনি। অনেকসময় লেগেছে জনসন বা টমসনের প্রত্যক্ষ তাগাদা। তবু কৃত্রিম সাজানো প্ররোচনা থেকে উৎসারিত এসব গান পরিণামে হয়ে যায় শিল্পরসসমৃদ্ধ। তার কারণ, অন্য গানের

সুরের আগুনে অনেক সময়ই বার্নসের আত্মদীপ জ্বলে ওঠে। অবশ্য বার্নস তাঁব স্বভাবকুণ্ঠ বিনয়বচনে তাঁর রচনার সাফল্যকে খুব বড় করে না দেখে বলেন :

I was only as the wind to the sleeping harp, and all the wild sweetness I waked was its own.

৪

রবার্ট বার্নসের সংগীত জীবন ও প্রবণতা সম্পর্কে এতক্ষণকার বিশদ আলোচনার সার্থকতা এই যে, তাঁর তুলনায় ঐজাতীয় গানে রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্য, নৈপুণ্য ও সিদ্ধি কত বেশি তা বোঝানো। হেমেন্দ্রলাল তাঁর নিবন্ধে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গায়কী অভিজ্ঞতা বার্নসের চেয়ে বেশি নয়। তাঁর মন্তব্য খুব তথ্যভিত্তিক নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গান শেখা বা গাওয়ার অভিজ্ঞতা প্রাতিষ্ঠানিক বা নিয়মমাফিক ছিল না প্রকৃত অর্থে এবং হয়তো একটানাও নয়। বিষ্ণু, যদুভট্ট, শ্রীকণ্ঠ সিংহ বা জ্যোতিদাদার কাছে তিনি প্রথম জীবনের নানা পর্বে গানের তালিম নেন। প্রথম বিলাত-প্রবাসে এবং স্বদেশে ফিরে তাঁর গান গাওয়ার খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি নিজেও নানা জায়গায় লিখেছেন, অন্যেরাও সোচ্ছ্বাসে স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* ও *সংগীতচিন্তা* বইয়ে এবং সরলা দেবী চৌধুরানি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি, সাহানা দেবী ও শান্তিদেব ঘোষের রচনায় গায়ক রবীন্দ্রনাথের অনেক বিবরণ আছে। বাহুল্যবোধে এ প্রবন্ধে সেগুলি পুনরুদ্ধার অপ্রয়োজন। তবে মনে রাখা চলে রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত উক্তি : 'কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহ মনে পড়ে না'। এরই কথাটিকে তাঁর গীতি-জীবনের ধুয়ো বলে মানলে, তার অন্তরা হল বিষ্ণু ও শ্রীকণ্ঠ সিংহের কাছে গান গাওয়া। এই সম্প্রসারণ জ্যোতিদাদার কাছে গান গাওয়া ও তাঁর সুরে গান বাঁধা। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় ষোলো বছর বয়সি রবীন্দ্রনাথের লেখা 'গহন কুসুমকুঞ্জমাঝে' ছাপা হয়। সতেরো বছর আগে বিলাত যাত্রার আগে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গীতিসংকলন *রবিচ্ছায়া*। তাঁর সংগীত অভিজ্ঞতার সঞ্চারী পর্বে আছে বিলাত-প্রবাসে ইংরাজি-আইরিশ-স্কচ গানের সংসর্গ। এই সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথা ইংরাজিভাষায় এইভাবে লেখেন যে :

At seventeen, when I first came to Europe, I came to know it intimately, but even before that time I had heard European music in our household. I had heard the music of Chopin and others at an early age.

বিলাতে তাঁর দ্বিতীয় ভ্রমণকালে (১৮৯০) গান সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয় তা-ও বেশ রোমাঞ্চকর। তিনি লেখেন :

Waiter Mull বেশ পিয়ানো বাজায়। Miss Mull-এ আমায় মিলে অনেকগুলো গান গেয়েছি। এরা আমার গলার অনেক তারিফ করছে। Mull বলছিল, আমি যদি গলার চর্চা করি তাহলে St. James Hall Concert-এ গাইতে পারি— আমার রীতিমতো উচ্চশ্রেণীর গলা আছে। Miss Mull আমাকে সব গানগুলো গাওয়ালে। 'Remember me' বলে একটা গানের পর সে আস্তে আস্তে আমাকে বললে Mr. T.I shall remember you.

Schiller একজন জার্মান সহযাত্রী আমাকে বলেছিল, তুমি যদি তোমার গলার রীতিমতো চর্চা করো তাহলে আশ্চর্য উন্নতি হতে পারে : you have a mine of wealth in your voice.

ওই সময়ে বিলেত যাবার পথে জাহাজে তাঁর গায়নের অভিজ্ঞতাও চমৎকার :

Mrs Moeller আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলে, সে আমার সঙ্গে পিয়ানো বাজালে। Mrs Moeller বললে : It is a treat to hear you sing। Webb এসে বললে: What would

we do without you Tagore — there's nobody on board who sings so well। যা হোক জাহাজে এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্ছে।

সারাজীবন ধরে এমনিতর গায়নের নানা ছবি অনেক জায়গায় ধরা আছে। পিতাকে গান শুনিয়ে পারিতোষিক লাভ, ব্রাহ্মসমাজে গান গাওয়া, টাউন হলে স্বদেশি গান, শান্তিনিকেতনে গানে গানে ভরা জীবন আর সবচেয়ে প্রত্যক্ষ আজও যা, রেকর্ডে তাঁর কণ্ঠ কী অভ্রান্তভাবে তাঁর গায়কী অভিজ্ঞতার প্রমাণ দেয়। তবু তাঁর অন্যতর দুটো গায়নের স্মৃতি আলাদাভাবে শোনা যায় :

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি (১৮৮১) গঙ্গার জলে-উৎসর্গ করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম। কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম ; জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম— পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিম তটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত।

ওই যে উল্লেখ রয়েছে বিদ্যাপতির গানে নিজের ইচ্ছামতো সুর বসিয়ে গাইবার প্রসঙ্গ ঐখানেই হয়তো গান সৃষ্টির একটা আলাদা নেশা রয়ে যায়। ওই যে 'খ্যাপার মতো' গান গাওয়া ওর মধ্যে গাঁথা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের গায়ক রূপ। বার্নস্‌কে কি কোনোভাবেই ঐ গায়ক ও স্রষ্টার মূর্তিতে দেখি? তবে একটা স্তরে বার্নসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান রচনার (বা গান ভাঙার) মিল আছে বলে এমন একটা গুরুভার প্রবন্ধের অবতারণা। লক্ষ করলে দেখা যায় বাল্মীকি প্রতিভার সময় থেকে জীবনের মধ্যকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নানা ধরনের গান ভেঙে নতুন গান বেঁধেছেন, তাতে জড়িয়ে আছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বার্নসের গান রচনার প্রধান পদ্ধতির সঙ্গে যেহেতু রবীন্দ্রনাথের অনেকটা মিল খুঁজে নেওয়া যায় তাই বিপুল রবীন্দ্রগীতির মধ্যেকার ওই সীমায়িত প্রান্তরটুকু আমি আলোকিত করব। তার থেকে বোঝা যাবে বার্নস যেমন নিদ্রিত বীণায় বায়ুস্পর্শের মতো গান জাগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার থেকেও বোধহয় প্রবলভাবে বাংলা গানের ঘুম-ভাঙানিয়ার কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে যাবার আগে আর কয়েকটি কথা ভেবে নেওয়া ভালো। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ কোনো জনসন বা টমসনীয় প্রবর্তনা থেকে গান ভাঙেননি, এ তাঁর নিজেরই খেয়াল, নিজেকেই খুঁজে পাবার জন্য। এই গান ভাঙতে ভাঙতেই তিনি যখন পেয়ে যান নিজস্ব গানের ছন্দ তখন আর ও-বিষয়ে তেমন করে উৎসাহ নেননি। দ্বিতীয়ত, গান ভাঙার আগে নতুন গান তৈরির সময় বার্নসের মতো তাঁকে গানটি বারবার গেয়ে বাজিয়ে প্রেরণা সঞ্চয় করতে হত না। তৃতীয়ত, বার্নস্‌ যেমন শুধু লৌকিক দেশি গান থেকে সুর নিয়ে তাতে বাণী বসিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস তার চেয়েও ব্যাপক। তিনি ভেঙেছেন মার্গসংগীত, লোকসংগীত, বিলিতি গান, প্রাদেশিক গান ও বাংলা অন্য গান থেকে। সবচেয়ে বড় কথা, রবীন্দ্রনাথের এই গান-ভাঙা যেমন তাঁর সৃজন প্রাবল্যের খেলা তেমনই গানের ভিতর দিয়ে আসলে তাঁর কাব্যানুসন্ধান। তিনি নানা ধরনের গান ভেঙে তার ভেতরে খুঁজে দেখেছেন কথা ও সুরের অনুপাত। তাঁর গান রচনা আসলে বাকের সাধনা। তাঁর গান ভাঙার বিভিন্ন পদ্ধতি ও পরীক্ষাগুলি তলিয়ে বুঝলে গানের শিল্পরূপ এবং রবীন্দ্রসংগীতের স্বরূপ আমাদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট হবে।

রবীন্দ্রনাথ গান লেখার শিক্ষানবিশি শুরু করেন জ্যোতিদাদার বানানো সুরে বাণী বসিয়ে। এর পরে

বিলিতি সুর ও মেলোডিক স্ট্রাকচার মোটামুটি বজায় রেখে সেই অনুযায়ী গানের বাণী রচনার সূচনা ঘটে প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণের পরে। Nancy Lee বা Robin Adair প্রভৃতি আইরিশ গানের সুরে রচিত তাঁর বাংলা গান ভাব ও ভাষা কোনো দিক থেকে মূলকে অনুসরণ করেনি। এখানেই বার্নসের সঙ্গে তার মূল পার্থক্য। যেমন :

মূল গান

Of all the wives as ever you know
Yes ho! Lads ho! Yes ho! Yes ho!
There's none like Nancy Lee I trow,
Yes ho! Lads ho! Yes ho!

রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর

কালী কালী বলো রে আজ
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো,
নামের জোরে সাধিব কাজ
বলো হো হো হো, বলো হো, বলো হো।

এ ক্ষেত্রে বিলিতি সুরের উদ্দীপনাটুকু দস্যুদলের মনের উত্তেজনার ভাব প্রকাশে কাজে লেগেছে। হার্বার্ট স্পেনসরের সংগীত বিষয়ক মতামতের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু সতর্ক পাঠক লক্ষ করবেন 'Yes ho' এবং 'বলো হো' এই ধ্বনিনির্মাণের সমতাটুকু। বলা বাহুল্য, 'বলো হো' ধ্বনি বাঙালি বা ভারতীয় দস্যুদের ধ্বনিরীতির পক্ষে স্বাভাবিক নয়, ধ্বনিটি এসে গেছে মূলের প্রভাবে। এবারে দেখা যেতে পারে Robin Adair গান, যার সুরে একজনের বিরহজনিত বেদনার আকুতি রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষাকে খানিকটা প্রভাবিত করেছে।

মূল গান

What's this dull town to me?
Robin's not near
What made th'as seınbly shine
Robin Adair

রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর

সকলই ফুরালো স্বপনপ্রায়।
কোথা সে লুকালো কোথা সে হায়।

মূল গান বিরহের pathos-এ ভরা, রবীন্দ্রনাথও গানটি লিখেছেন শোকগীতিরূপে। 'কালমৃগয়া'য় ঋষিকুমারের মৃত্যুজনিত বিরহ হল এ গানের বিষয়। তাই সুরটি গানে বেশ খাপ খেয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা চলে ওই গানেরই দ্বিজেন্দ্রলাল-কৃত রূপান্তরের নমুনা :

কিসের নগর আর
নবীন যে নাই
কি দেখিতে এনু আমি
কি শুনিতে ছাই—
কোথা সে আনন্দ উল্লাস এখন
আনিত যা ভবে স্বরগভুবন ;

গিয়াছে তোমার সনে
নবীন আমার।

এ প্রয়াস, যাকে বলে, নিছক বঙ্গীকরণ এবং অনেকটাই শিশুতোষ ভঙ্গীতে। এমনকি Robin হয়েছে নবীন, এত দূর?

রবীন্দ্রনাথ বার্নসের একটি বিখ্যাত গান ('Ye banks and braes of bonnie doon') ভেঙে 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' গানটি লেখেন। দুটি গানেই ভাবের দিক থেকে রয়ে গেছে প্রকৃতি-সম্পৃক্ততা। সুরের দিক থেকে ও স্তবক বিন্যাসেও গঠনগত মিল খুব বেশি। তবে রবীন্দ্রসৃষ্টির অভিনবত্ব বেজে ওঠে যখন পিক কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু করে ওঠে। মূল গানে Warbling bird-এর প্রসঙ্গ আছে অবশ্য, কিন্তু তাকে ইংরাজি সুরের সম্ভাবনার সূত্রে ডাকিয়ে দেওয়া নিতান্তই রবীন্দ্রকল্পনার লীলা। বার্নস্ লেখেন :'Thou'll break my heart,thou warbling bird' রবীন্দ্রনাথ সেই পাখির গানের উদ্দীপনাটুকু রোমান্টিক বিষাদে ভরিয়ে লেখেন : 'কী জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়'।

আইরিশ মেলোডি বা বিলিতি গানের নেশা রবীন্দ্রনাথের বেশিদিন ছিল না। দুঃখ ক'রে সে বিষয়ে লিখেছেন :

> দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং হইয়াই আত্মহত্যা সাধন করে। আইরিশ মেলডিজ বিলাতে গিয়া কতগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম, কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রইল না।

রবীন্দ্রনাথ যেসব বিলাতি সুরে কথা বসিয়েছেন লক্ষ করলে দেখা যায়, গানের ফর্ম হিসাবে সেগুলির কোনো ভারতীয়করণ করেননি। গানগুলিতে ধুয়ো বলে কিছু নেই। রবীন্দ্রগীতির স্বাভাবিক চারটি তুক নেই। এর একমাত্র ব্যতিক্রম Ben Johnson-এর 'Drinke to me only, with thine eyes'-এর রূপান্তর 'কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া'। এ গানটির অভিনবত্ব হল, মূল গানের চরণক্রম অনুসরণ না করে রবীন্দ্রনাথ সুর অনুসরণ করেছেন। সাধারণ বিলিতি গানের চরণক্রম থাকে AB AB AB এই রীতিতে, অথবা AA BB CC ধাঁচে অথবা AAA BBB এইভাবে। যেমন AA BB CC ধাঁচের চরণক্রমের একটি নমুনা এইরকম :

Sing we and chant it,
While love doth grant it.
Not long youth lasteth,
And old age hasteth.
Now is best leisure
To take our pleasure.

দেখা যায় 'কতবার ভেবেছিনু' গানটি এই রীতিতে লেখা :

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে, সখা, কত ভালোবাসি।

অথচ বেন জনসনের মূল গানে চরণক্রম ছিল AB CD AB। যথা :

Drinke to me, onely, with thine eyes
And I will pledge with mine ;

Or leave a kisse but in the cup.
And I'll not look for wine.
The thirst, that from the soule doth rise,
Doth aske a drinke devine.

আর্নল্ড বাকে লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ আইরিশ ও স্কচ যে-গানগুলি ভেঙেছিলেন সেগুলি, 'characteristically those were tunes where the connection between the melody and the words was very direct indeed'। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই, যে-বিলাতি গানগুলি রবীন্দ্রনাথ ভাঙেন দ্বিজেন্দ্রলালও প্রায় তার সবগুলি বঙ্গীকরণ করেন। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বদাই আক্ষরিক অনুবাদ করে গেছেন এবং সম্ভবত তাঁর প্রয়াণের পরে সেগুলি আর গান রূপে গাওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথ রূপান্তরের সময় বড়জোর নিয়েছিলেন ভাবানুষঙ্গ ও সুরটুকু। একটি গান শুধু আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করেন তিনি।

Oh! the days are gone, when beauty bright
my heart chain wove ;
When my dream of life, from morn till night
Was love, still love,
New hope may bloom,
and days may come
Of milden calmer bean,
but there's nothing half so sweet in life
As love's young dream.

এই আইরিশ মেলডি থেকে গৃহীত গানটির প্রথম ও শেষ স্তবক অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ যে গান রচনা করেন সেটি এইরকম :

গিয়াছে সেদিন যেদিন হৃদয় রূপেরই মোহনে আছিল মাতি,
প্রাণের স্বপন আছিল যখন— 'প্রেম' 'প্রেম' শুধু দিবস রাতি।
শান্তিময়ী আশা ফুটেছে এখন হৃদয়-আকাশপটে
জীবন আমার কোমল বিভায় বিমল হয়েছে বটে,
বালক কালের প্রেমের স্বপন মধুর যেমন উজল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না—
তেমন কিছুই আসিবে না।।

গান-ভাঙার ব্যাপারে প্রথম যৌবনের বিলিতি গান রবীন্দ্রনাথকে বেশিদিন আকর্ষণ করেনি। তার কারণ সম্ভবত আঙ্গিকের পার্থক্য। আর এক কারণ বিলিতি গান সাধারণত বহু কণ্ঠের উপযোগী করে সৃষ্টি করতে হয়। তার মাধুর্য ফোটে টেনর-সোপ্রানো ইত্যাদি নানা মাত্রার স্বরসংযোগে। একক কণ্ঠে তেমন ফোটে না। যাই হোক, বিলাতি গান থেকে রূপান্তর আর না করলেও অচিরে তিনি শুরু করেন পাঞ্জাবি মহীশূরী ইত্যাদি স্বাদেশিক গান-ভাঙা। তবে তাঁর ভাঙা গানের সংখ্যাধিক্য দেখা যায় ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা থেকে রূপান্তরিত গানের এবং বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় লোকগীতি থেকে ভাঙা গানে তাঁর একটা আলাদা স্ফূর্তি ছিল। কালক্রমের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ লোকসংগীত ভেঙে গান লিখেছিলেন সবশেষে, বঙ্গভঙ্গের আমলে। এই সময় বাউল অঙ্গের গানের প্রতি তাঁর একটা আলাদা টান আসে। অনেকগুলি বাউল গান যেমন ভাঙেন তেমনই ওই সময়ের মৌলিক গানেও বাউল ঢঙের সংক্রাম সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এখানে উল্লেখ করা

দরকার যে মূল লোকগীতি যখন তিনি শোনেন তার অনেক পরে সেগুলি ভাঙেন। গানগুলি অনেক ক্ষেত্রে তিনি শোনেন প্রথম বয়সে কলকাতাতেই অথবা তাঁকে শোনান তাঁর ভাগ্নী সরলা দেবী চৌধুরানি। এসব গানের সংগ্রহ তিনি সব শিলাইদহ-পতিসর-কালীগ্রাম থেকে করেছিলেন এ খবর অর্ধসত্য।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে হঠাৎ তাঁর একঝাঁক গান সৃষ্টি হয়। তার কিছু মৌলিক, কিছু লোকগীত-ভাঙা। স্বদেশি গানে কী করে যে তিনি লোকগীতির, বিশেষত বাউল সুরের, আঙ্গিক খাপ খাওয়ালেন সে এক বিস্ময়। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

সাধারণত গ্রাম্য গানের ভাবে ও সুরে একটা বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকে। যেমন গগন হরকরার এই গান :

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে !

এ তো সাধারণ 'ফোক কম্পোজিশন' নয় যে তার সুর থাকবে এলোমেলো। সেসিল শার্প একবার যেমন খাঁটি লোকসংগীত-গাইয়ে হেনরি লারকোম্‌বেকে একটা গান যতবার গাওয়ালেন সে বাণী ঠিক রাখলেও প্রত্যেকবার সুর পালটাতে লাগল ('he sang it differently, providing a set of most ingenious and handsome variations')* 'আমি কোথায় পাবো তারে' গানটার সুর বা ছক পাল্‌টাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেন-না ওটি তো বাউল বিশ্বাসের গান। ফোক কম্পোজিশ্যন নয়, স্পষ্টত গগন নামের একজন গীতিকারের ব্যক্তিগত রচনা, সুরের ধরনটি বড়জোর খানিকটা ঐতিহ্যগত। কিন্তু গানের থিমে নিঃসঙ্গ বাউলের মনের মানুষের জন্য আর্ত অনুসন্ধান নিতান্তই ব্যক্তিগত। তাঁর সেই আত্মিক আর্ত উচ্চারণকে ভেঙে রবীন্দ্রনাথ তাতে ভরে দিলেন সম্পূর্ণ অন্য থিম। এসে গেল স্বদেশধ্যানের সর্বজনীন সংযোগ। গানটি দাঁড়াল :

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।

এক্ষেত্রে সুরের একমুখী আর্তি ও গভীরতাটুকু বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ ঘটালেন ভাবের বিস্তার। ফলে বাউলের একক আত্মানুসন্ধান হয়ে উঠল বহুর ব্যবহারোপযোগী জাতীয় সংগীত। শেষ পর্যন্ত সাম্প্রতিককালে এই গান যখন গৃহীত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপে তখন বাংলার পল্লিপ্রদেশের অযত্নবর্ধিত এই চারাগাছ দক্ষ মালির প্রযত্নে পেয়ে যায় মহিরূহের ব্যাপ্তি। স্কচ জাতীয়তা-বোধের উদ্দীপক পটভূমিকায় বার্নসের Banockburn-জাতীয় গান যেমন মুখে মুখে নবজীবন পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রাম্য গান-ভাঙা স্বদেশি সংগীত তার চেয়েও বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ যতরকম গান ভেঙে নতুন সাজ পরিয়েছিলেন তার প্রধানত তিনটি পর্যায়। প্রথম জীবনে বিলিতি গান-ভাঙা, পরবর্তীকালে হিন্দি শাস্ত্রীয় গান ভাঙা এবং মধ্যবয়সে বাংলা গ্রাম্য গান ভাঙা। এই তিনরকম রূপান্তরের সূচনা আলাদা আলাদা প্রবর্তনা থেকে। বিলিতি গান ভেঙেছিলেন মূলত হার্বার্ট স্পেনসরের গান সম্পর্কে মতামতগুলি যাচাই করবার জন্য। হিন্দি গান ভাঙার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত তাঁর ভাষাগত দুর্বলতা মোচন এবং ভাবগত অকিঞ্চিৎকরতার লাঘব করা। আর লোকসংগীত ভাঙার পশ্চাদ্‌পটে ছিল মূল গানগুলির দৃপ্ত সুর ও মুক্ত ছন্দ থেকে শক্তি নিয়ে স্বদেশি গানে সংযোগ করা।

* খাঁটি লোকসংগীতের ধর্মই এমন। এ ব্যাপারে এ. এল. লয়েডের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে : The 'flokloric' tendency to reproduce the words unaltered while treating the tune with great freedom is seen very much in practice.

আরেকটি কথা বিচার্য। ইংরিজি বা হিন্দি গানের সুরময় আঙ্গিক তাঁর মতো বাণীবিলাসীর আত্মপ্রকাশের পক্ষে খুব স্বচ্ছন্দ ছিল না। বাংলা লৌকিক গানের মধ্যে কথার প্রাধান্য ও ভেতরের শব্দগত কারুকাজ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল মনের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছিল। যেমন দেখা যায় একটি গানে তিনি পেয়ে যান বাংলা গানের নিজস্ব assonance :

যাদের এখন দিয়ে প্রাণধন
করছো যতন আপন ভেবে।
যেদিন পাবে অক্কা সবই ফক্কা
সঙ্গে তাদের কেউ না যাবে।।

গানের এই শব্দগত ধ্বনিসৃষ্টির কৌশল রবীন্দ্রনাথের মতো বাণীশিল্পীর তো পছন্দ হবেই : তিনি অনায়াসে কৌশলটি আয়ত্ত করে লেখেন :

মনের আশে দেশবিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে—
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা ভুলতে সে যে পারব না মা।।

বাংলা লৌকিক গানের ভেতরকার নিজস্ব Refrain বা পুনরাবৃত্ত অংশও রবীন্দ্রনাথকে নতুন পদ গঠনে উৎসাহী করেছে। যেমন মূল গানে আছে

ও মন অসার মায়ায় ভুলে রবে
কতকাল এমনি ভাবে।
এ সব ভোজবাজি প্রায়, (মন রে) কেউ কারও নয়,
দেখতে দেখতে কোথায় যাবে।।

এ গানের 'সব ভোজবাজি প্রায় মন রে' অংশটি দুবার গাওয়া হয় কথাটায় জোর ফোটাতে। র… এই দুবার বলার কায়দাটি বেশ কাজে লাগান এই ভাবে :

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা।
আমি তোমার চরণ—
মাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা।।

তার মানে গানটির ভাব ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে একেবারে জমকালো হয়ে উঠল। দেখবার ব্যাপার এইটাই যে, রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথের গানের ধরন যেমন পালটান না, বিড়ম্বিত করেন না যুক্তাক্ষরের শাসনে, তেমনই রেখে দেন লৌকিক বুলি। 'ছেঁড়া কাঁথা' 'ধার ধারব না', 'আদর কাড়ব না', 'ধনে মানে'— যুক্ত করেন বাঙালির এইসব নিজস্ব লৌকিক বাক্‌ভঙ্গি। এমন সার্বিক মনোযোগের ফলে গানটি পুরো শিল্পরূপ পেয়ে যায়। অথচ একই প্রয়াস বার্নসের ক্ষেত্রে এমন সামগ্রিকভাবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠেনি। স্কচ উপভাষার কূটত্ব ও দুর্বোধ্যতা বার্নসের গানকে আটকে রেখেছে। এই কথা বিবেচনা করেই বোধহয় কাউপার বলেছিলেন :

> Poor Burns loses much of his deserved praise in this country through our ignorance of his language... His candle is bright, but shut up in a dark lantern.

এ বারে তাহলে স্পষ্ট উচ্চারণে বলা যাক, রবীন্দ্রনাথের লোকসংগীত ভাঙা-গান মূল রচনার কার্বন কপি নয়। তার ভেতরে ভেতরে আছে অনেক নির্মাণের গূঢ়তা ও ভাবনার রূপবন্ধ।

এমনই এক নির্মাণের নমুনা রয়েছে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ' গানের মধ্যে। মূল গানটি ভক্তিরসাপ্লুত ঢপকীর্তন ধাঁচের, সঙ্গে আখরযুক্ত :

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই
আমার একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই।
আমার নিতাই যদি (ডাক্‌রে নিতাই গৌর বলে)
যদি মনে করে, তবে গৌর দিলিই দিতি পারে
একলা নিতাই (ও নিতাই)।।

'একলা নিতাই' শব্দের অনুষঙ্গ কোন্ অজানা সৃজনরহস্যে 'একলা চলো রে' স্লোগান তৈরি করে নেয় ভাবলে প্রথমেই লাগে বিস্ময়ের অভিঘাত। তারপর এ গান আমরা যতই অনুধাবন করি ততই খুলে যায় রবীন্দ্রনাথের গান রচনার কারু-কৌশল আর বুদ্ধিমত্তা। দেখা যায়, 'ওরে ওরে ও অভাগা' এই নতুন একটা Refrain তৈরি করে বারবার এই আত্মবিস্মৃত জাতির মর্মে তিনি আঘাত করেন। তার চেয়েও নির্মাণের চমৎকারিত্ব রয়েছে 'একলা চলো রে' বাক্যে। প্রথমে বলা হল :

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।

গানের এই মুখটি একক কণ্ঠেরই উপযোগী। কিন্তু তারপরে যেই 'একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে' গাওয়া হয়, তখন হঠাৎ সম্মেলক গানের এফেক্ট তৈরি হয়। আবার যখন গাওয়া হয় :

যদি সবাই ফিরে যায়
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়।

শ্রোতাদের কি মনে পড়ছে 'যদি গহন পথে যাবার কালে' অংশ দুবার দুরকম সুরে গাওয়া হয়? কেন? লক্ষ করলে দেখা যায়, গানের নির্মিতি এমন যে প্রথম সুরটি যেন মূল গায়েন এককভাবে গাইলেন, পরের সুরটি যেন দোহারকিদের জন্য। একেই বোধহয় বলতে হবে গানের দ্বিমাত্রিকতা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বার্নসের প্রবণতার মিল এইখানে যে, দুজনেই লোকসংগীতকে ভিত্তি করে নতুন গান তৈরি করেছিলেন। তফাত এইখানে, বার্নস-এর নির্মাণ প্রতিভা অনেক ক্ষেত্রে শুধু রুচিদুষ্ট শব্দ পরিবর্তনেই ব্যয় হয়েছে আর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভাঙতে গিয়ে গড়েছে নতুন গান। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ লৌকিক গানের সুর ও ভঙ্গিকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করে গেছেন তাঁর নানা মৌলিক গানেও। বার্নস্ উপাদানগত ভাবে লোকসংগীতের সুরের আগুনে নিজ সৃষ্টির আত্মদীপ জ্বেলে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ যে তা পেরেছিলেন তার কারণ লোকসংগীত তাঁর সৃজনপ্রতিভার মধ্যে জারিত হয়ে নব প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। তাঁর গান যিনি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলেন ও বিদেশে প্রচার করে গেছেন নিজে গেয়ে, সেই আর্নল্ড বাকে ঠিকই বলেছেন :

> বাংলার লোকসংগীত থেকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে প্রেরণার উৎস লাভ করেছেন। এই লোকসংগীতের স্পর্শে এসে তাকে আত্মসাৎ করার ফলে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা হয়েছে অত্যন্ত মনোরম!...... যে দেশের গভীর অন্তরাত্মার প্রতিরূপ ছিলেন তিনি নিজে. সেই দেশের লোকসংগীতের চেয়ে যোগ্যতর প্রেরণার ধারা তাঁর পক্ষে আর কী হতে পারত?

রবীন্দ্রনাথ যদিও স্কচ-গীতি মুখরিত গ্রামীণ পরিবেশের মতো শৈশব-কৈশোরের পটভূমি পাননি, মা-র কাছেও শোনেননি লৌকিক গান ও গীতিকা, প্রণয়সঙ্গিনী সংরাগেও নয় তাঁর সংগীতের নিত্যনব স্ফূর্তি, তবু তাঁর মধ্যেই ঘটে গেছে বাংলা লোকায়ত গানের দ্বিতীয় জন্ম। তাঁর লৌকিক গান ভাঙার মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি একটা আলাদা স্তর। নিছক রূপান্তরকে পেরিয়ে যা উত্তরিত হয় নবসৃষ্টির ইঙ্গিতে, অথচ

খাঁটি দেশজ গানের স্বভাবধর্ম মেনে। পাশাপাশি এমন দুখানি গান দেখলে কথাটি বোঝা সহজ হবে। এ গান তিনি ভাঙেন এক সারি জাতীয় গান থেকে :

মূল সারি গান

মন-মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী
ভবনদীর তুফান ভারি।
তোর হেলে পেলে না জল, কি করবি বল্
কেমনে জমাবি পাড়ি।।
তোর হেলে ছয়খান দড়ি যাচ্ছে ছিঁড়ি
ঐ দ্যাখ্ পটাস্ পটাস্ করি,
ডুবল তোর ভগ্নতরী, হায় কি করি
কেমনে জমাবি পাড়ি।।
মাঝি তরঙ্গ হেরি সইতে নারি
তাই তোরে জিজ্ঞাসা করি,
বল্ দেখি কোন্ মিস্তিরি শিখায় তোরে
ওজ্‌গুবি এ মাঝিগিরি।।

রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর

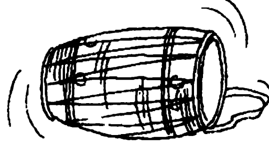
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
'জয় মা' বলে ভাসা তরী।।
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি—
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।।
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলিনে কেউ বেচাকেনা
হাতে নাই যে কড়াকড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন ক'রে—
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি।।

পরপর দুখানি গান দেখতে তো প্রায় একই রকম কিন্তু নির্মাণ কৌশলে কত যে পৃথক ! মূল গান দ্রুত তালের সারি গান। ছিপ নৌকার দ্রুত ধাবমান ছন্দে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথ তার দ্রুততার চলন একটু শ্লথ করে দিয়েছেন অব্যয়ের ব্যবহারে আর বিপুল স্বরধ্বনির সন্নিবেশে। প্রথম গানটি খাঁটি দেহতত্ত্বের এবং সেখানকার মাঝির তত্ত্ব এক বিশেষ ধর্মীয় রূপকে বাঁধা। তার তরি মানে দেহ-তরি আর নদী এই বিশ্ব। রবীন্দ্রনাথ সেই তরি-নদী-মাঝির চিরায়ত প্রতীকগুলি নিয়ে নেন তাঁর রূপান্তরে, তবে তার প্রতীক অর্থগুলি দেন পালটে। তাঁর ঘোষণায় মরা গাঙে বান বলতে বোঝায় পরাধীন দেশের চিত্তে নবচেতনার জোয়ার। মাঝি মানে

অধিনেতা। নৌকা মানে নতুন অভিযানের অবলম্বন। মূল গানের খেদমূলক আত্মবেদনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান (সামাল সামাল) রবীন্দ্রনাথের গানে পালটে যায়, দেশোদ্দীপনার অভিযানের শপথে। গানের স্ট্রাকচারেও একটি ছোট মোচড় আছে। মূল গানে আছে বাংলা লৌকিক গানের নিজস্ব স্বভাবে একটা আস্থায়ীর পর কয়েকটি অন্তরা। রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এক সঞ্চারীর মাধুর্য। 'দিনে দিনে বাড়লো দেনা' এই উচ্চারণে এক অভিনব ভাবান্তর এনে সুর ভরিয়েছেন অন্য এক ধারা এবং লোকগীতির সুরের একঘেয়েমিতে এসেছে নববিচিত্রতা। এই অংশটুকু তাঁর নবনির্মাণ— ভাব ও সুর দুদিক থেকে। এই পথেই তাঁর রূপান্তরের লীলা পৌঁছে যায় নতুন সৃষ্টির উপকূলে।

হেমেন্দ্রলাল রায় চল্লিশ বছর আগে বার্নস্ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেসব চকিত ও প্রান্তবাদী মন্তব্য করে যান আমরা এতক্ষণে তার উলটো দিকে এসে পড়লাম। দুজনের গায়কী অভিজ্ঞতা, গান রচনার কৌশল, সমকালীন ও পরবর্তীকালে গানের অনুবর্তন, শিল্পিতা, মৌলিকতা এবং গানের সম্ভারের তুলনা করে বলতেই হয় রবীন্দ্রনাথ বার্নসের চেয়ে অনেক বড় স্রষ্টা। এ ছাড়াও প্রস্তুতি ও মননের দিকটি বিশেষ করে উল্লেখের প্রসঙ্গ বাকি থেকে যায়। এই প্রস্তুতি ব্যাপারটি বার্নসের একেবারে ছিল না, অথচ রবীন্দ্রনাথ খুব ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন নতুন এক ভাব ও রীতির গান রচনার জন্য। বাংলা গানের সত্যিকারের রূপটি কেমন হওয়া উচিত, তার যে হিন্দুস্থানি গানের সুরের পরাধীনতা কাটিয়ে দাঁড়ানো উচিত স্বয়ম্বশতায়, বাংলা গানে কথা ও সুরের একটা আনুপাতিক শোভন সংগতি থাকা দরকার এসব কথা তিনি অন্তহীনভাবে লিখে গেছেন ও নিজের গানে তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর গানের সৌন্দর্য ও গভীরতার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পাওয়া যায় একটি মননের ক্রিয়া। সেই মনন ফুটে ওঠে কখনো পদ-গঠনের অভিনবত্বে, কখনো অবাক-করা চিত্রকল্পে, নতুন তালসৃজনে, অসম রাগ-মিশ্রণে, সঞ্চারীর বৈপরীত্যে কিংবা সাবলীল কবিত্বের লীলায়। এই মনন ধর্ম তাঁর গানকে নিছক বিনোদনের স্তর থেকে আমাদের প্রতিদিনের দ্বন্দ্ব-ছন্দ-উদ্‌বেলিত জীবনের সামগ্রী করে দেয়। শেষবিচারে আমরা বুঝি, গান যেমন তাঁর সৃজন-মানসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাঙ্গীণ উচ্চারণ, তাঁর গান তেমনই আমাদের সবচেয়ে বড় ও স্থায়ী সারস্বত অর্জন।

এতসব গুরুতর কথা বাদ দিয়ে শুধু গান-ভাণ্ডার রাজকীয়তায় বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ থেকে যান বার্নসের চেয়েও বড়ো সাম্রাজ্যের সম্রাট। স্কচ ও বাংলা গানের এই দুই রাজা তাঁদের গানে রেখে গেছেন নিঃসন্দেহে প্রতিভার অভ্রান্ত শিলমোহর। তবু রবীন্দ্রনাথের গান অনেক বিচিত্র, ব্যাপক ও পরাক্রান্ত।



রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে

একথা ভাবলে অবাক লাগে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সেরা গীতিকারকে এই বলে খেদ করতে হয় : 'আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই।' এখানে সংশয় কি কোনো বিশেষ গান খুঁজে না-পাওয়ার? না কি বিষয়বিহীনতাই তাঁকে পৌঁছে দেয় নীরবতায়? আশ্চর্য যে, এই গীতিকার তাঁর পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে কয়েক সহস্র কবিতা লেখার পরও লিখেছিলেন, 'যে কথা বলিতে চাই বলা হয় নাই'। গানে ও কবিতায় উপলব্ধি আর উচ্চারণের এই সমাপতন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগৎকে ভারী চমৎকারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে। এতক্ষণে আশা করি পাঠকদের একথা নতুন করে আর বলতে হবে না যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা আর গান রচনা আসলে সম্পূরক বাণীসাধনা। তাঁর গান রচনার ব্যাপার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এডওয়ার্ড টমসনকে জানিয়েছিলেন, 'A parallel growth to my poetry' বলে। যদিও অবশ্য সংখ্যা-বিচারে তাঁর গানের চেয়ে কবিতা অনেক বেশি তবু স্রষ্টার নিজের মনে হয়েছিল : 'if all my poetry is forgotten, my songs will live with my countrymen and have a permanent place.'।

কেন রবীন্দ্রনাথের এমন মনে হয়েছিল সেকথার যুক্তিবিচারে যাবার আগে একবার দেখে নেওয়া যায় রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যাতত্ত্ব। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী* বইয়ের ভূমিকায় জানিয়েছেন গীতবিতানের মোট গানের সংখ্যা ২২৩২। তার মধ্যে ১৮৯০ খানা গানের স্বরলিপি আছে স্বরবিতানের ৬০ খণ্ডে। ৩৪২ খানা গানের সুর তাল পাওয়া যায়নি। তাহলে নির্ভয়ে বলা যায়, মোট ১৮৯০ খানা গানেরই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার এই অহংকার। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গান বাদে স্বরলিপি সমন্বিত রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃত সংখ্যা ১৫৯৮। যখন পড়বে না তাঁর পায়ের চিহ্ন, যখন জমবে ধুলো তানপুরার তারে, যখন সুনিশ্চিতভাবেই গানে গানে তাঁর বন্ধনমোচন ঘটে যাবে, তখনো তাঁর গান সম্পর্কে এই দীপ্র অঙ্গীকার আমরা শুনব। সত্যিই যদি তাই তাহলে কীসের জোরে গানগুলি বাঁচবে? সুরের মৌলিকতায় না কথা ও সুরের নিরুপম যৌগপদ্যে? একটা বিশেষ গান রচনার 'বন্দিশ্'-রূপে, নাকি আধুনিক জীবনের সঠিক উচ্চারণ এ-গানে আছে বলে? একথা স্বভাবত ওঠে এইজন্য যে, এখনকার

বেশিরভাগ বাঙালি কবি এমনকি প্রতিষ্ঠিত কবিরাও, তাঁদের রচনার প্রেরণাভূমিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভূমিকা মানেন না অথচ তাঁর গানের নিগূঢ় সংক্রমণ মেনে নেন। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁদের ভালো লাগে, তাঁদের জাগায়, তাঁদের চমকে দেয় মৌলিক উচ্চারণের শুচিময় ঔজ্জ্বল্যে। রবীন্দ্রসংগীত তাঁদের জীবনে অনেকটাই প্রাসঙ্গিক লাগে। এই প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নটিই সবচেয়ে গৌরবের, বিশেষত একজন স্রষ্টার পক্ষে। কোনো রচনা তার রচনাকালকে অতিক্রম করেও যদি থাকে প্রাসঙ্গিক এবং নতুন প্রজন্ম যদি তার অন্তর্নিবিষ্ট ভাবনা বা বলার ধরনকে মনে করেন আধুনিক, তবে তার জীবন সম্ভাবনা অনেকটা সুনিশ্চিত বলতে বাধা থাকে না। এই প্রাসঙ্গিকতা বা আধুনিকতা কেমন করে অনুস্যূত থাকে গানে? সে কি শব্দবিন্যাসেরই কোনো পরমাশ্চর্য কৌশল? সে কি কোনো চকিতভাবনার বিচিত্র বিস্ফোরণ? তার ভাষণে কি থাকে কোনো বৈপরীত্যের টান?

এখনকার প্রতিষ্ঠিত একজন সফল কবি আমার প্রশ্নের জবাবে জানান, রবীন্দ্রসংগীতে অনেক আধুনিকতা তাঁকে অবাক করে। উদাহরণত এসে যায় 'চিরসখা ছেড়ো না' এই পঙ্‌ক্তিটুকু। যে চিরসখা তাকে কেন ছেড়ো না এমন বিনতি করতে হয়, কিংবা 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়' খুব নতুন ধরনের প্রেমের প্রত্যাশা জাগায় না কি? তাঁর এমনও মনে হয়, 'যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে' এইটুকু বলার পরে গানটার বাকি অংশ তাঁর কাছে আর দরকার হয় না। ওই বাক্যাংশই তো চমৎকার ও পরিপূর্ণ। একটা সার্থক উচ্চারণ। আবার 'ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময়' গানের 'সুসময়' শব্দের প্রয়োগ তাঁর কাছে মনে হয় অমোঘভাবে সর্বাধুনিক। পেশায় অর্থনীতিবিদ্ নেশায় শিল্প সংস্কৃতি উৎসাহী একজন মননশীল মানুষ প্রশ্নোত্তরে আমাকে জানান, তাঁর মনের সবচেয়ে সংলগ্ন রবীন্দ্রসংগীত 'এ পরবাসে রবে কে হায়'। কেন বা কীসের এই সংলগ্নতা তার বিশ্লেষণে বোঝা যায় সাম্প্রতিক জীবনের যে-শিকড়বিহীন অস্তিত্ব আর উজ্জ্বলতা, তার যথার্থ অনুভূতি গানটিতে ধরা রয়েছে। তাঁর মননশীল জীবন আর বুদ্ধিমার্গ, সচল ও সানন্দ জনজীবনের সঙ্গে তাঁকে কেন যেন মিলতে দেয় না। তাঁর কেবলই এই জীবনকে পরবাস বলে মনে হয়। গানটি তাই তাঁর আত্ম আস্বাদন।

এসব উত্তর আর গান নির্বাচন থেকে একটাই জরুরি প্রশ্ন জাগে। রবীন্দ্রনাথের গানের সফলতা তবে কি বিষয়গত, Thematic? রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে যে তাঁর কবিতার Parallel growth বলেছিলেন সেকি এই দিক থেকেই? এ কথা তো সত্যি যে রবীন্দ্রসংগীত অনন্য কিন্তু সেকি শুধু সুরে তালে গায়কীতে? এমনও মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী ও গানের বিষয় অথবা কোনো উজ্জ্বল এপিগ্রাম, কোনো অভিনব শব্দবিন্যাসের বৈপরীত্যে তাঁর গানকে টেনে নিয়ে যাবে একুশ শতকের বৈদ্যুতিন বিশ্বে।

রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের সমানুপাত আছে একথা অনেকেই মানেন না। সুরের চলন যে তাঁর গানে অনেক সময়ই কথার উপলখণ্ডে বাধা পায় এমন মত অনেক গীতরসিকেরই, যেমন ধূর্জটিপ্রসাদ। আবু সয়ীদ আইয়ুব আরও একধাপ এগিয়ে জানিয়ে দেন : 'রবীন্দ্রসংগীত তাঁর এত প্রিয় হলেও কথার সঙ্গে তার সুর তাঁর মনে থাকে না। এমনকি অত্যন্ত প্রিয় গানের সুরটি যন্ত্রে বাজালে তিনি সে-সুর শনাক্ত করতে পারেন না।' (দ্রষ্টব্য *রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ*—সন্‌জিদা খাতুন। ঢাকা। ১৯৮১। পৃষ্ঠা ১৪৯।) মরমি মানুষদের এমনতর মতামত আমাদের নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়গত মহিমার দিকে বা ভাবসম্পদের অভিনবত্বের দিকে চোখ ফেরাতে বলছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অবশ্য তাঁর কুড়ি বছর বয়সে 'সংগীত ও ভাব' নিবন্ধে বুঝতে ও জানাতে দ্বিধা করেননি, 'ভাব ব্যক্ত করাই সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য' এবং 'সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষাব (Language of the emotions)

পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে।' এ কথার পর আমরা রবীন্দ্রসংগীতের অন্তঃস্বভাবটাই ধরে ফেলি। বুঝি যে তাঁর কিঞ্চিদধিক ষাট বছরের গান রচনার জীবনে রবীন্দ্রনাথ আবেগের ভাষার পরিস্ফুটনে একাগ্র ছিলেন। তাঁর আগে ও সমকালে বাংলা গান ছিল ভক্তিনিবেদন, বিনোদন আর রঙ্গব্যঙ্গের আকর। অথচ রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই জানতেন, 'সংগীত কেবল চিত্তবিনোদনের উপকরণ নয়; তা আমাদের মনে সুর বেঁধে দেয়, জীবনে একটা অভাবনীয় সৌন্দর্য দান করে।' শুধু তাই নয়, তাঁর গান 'They are real songs, songs for all seasons and occassions' তাঁর এই 'সত্যিকারের গান' যে সব উপলক্ষের এবং ঋতুর উপযোগী তার কারণ, তাতে আছে বিষয়গত বৈচিত্র্য ও ভাবগত অনুপুঙ্খের বর্ণালি। তাঁর গান অনুভূতির নানাচারী বিন্যাস, অভিজ্ঞতার অত্যাশ্চর্য উন্মোচন। সেদিক থেকে তাঁর 'গান দিয়ে দ্বার খোলার' অঙ্গীকারটি বড়ই সত্য। এখানে গান দিয়ে যেসব নতুন দরজা তিনি খুলতে চেয়েছেন তাতে সুরের চেয়ে বাণীর অভিঘাত বেশি। তাই সেসব গান আমাদের 'পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়'। তাঁর নবসৃষ্ট গানের আস্বাদনে তিনি যেন নিজেই শেষ পর্যন্ত মোহমুগ্ধচিত্তে আত্মগতভাবে বলে ওঠেন : 'আমার সব চেতনা সব বেদনা/ রচিল এ যে কী আরাধনা।' সত্যিই বড় অভিনব এই সৃজন। বিশেষত বড়ই নতুন আর গতিময় এই মরাদেশের ঊষর চিত্তক্ষেত্রে। রবীন্দ্রসংগীত শুধু বিষয়ের দিক থেকেই একটা জাতির জীবনে মস্ত বড় অর্জন। বলতে দ্বিধা নেই সে জাতির নাম বাঙালি জাতি, সামূহিক ভারতীয়দের জন্য রবীন্দ্রসংগীত নয়। রবীন্দ্রনাথ খুব ঋজুভাবে জানতেন, 'It is nonsense to say that music is a universal language.I should like my music to find acceptance, but I know this cannot be' কারণ রবীন্দ্রসংগীত কেবল বাঙালিরই উপভোগ্য, তার বাণীর গভীরতার জন্য। রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির সবচেয়ে সমাদরের উত্তরাধিকার হয়ে উঠেছে তার সৃজনের নিবিড়তায়। এই সৃজনে কথা ও সুরের সুষমাময় মেলবন্ধন অবশ্যই মান্য। কিন্তু বেশিরভাগ রবীন্দ্রগীতের আবেদন যে নতুনতর বাণীবিন্যাস, নবভাবের দ্যুতিতে এবং শিল্পীহৃদয়ের সূক্ষ্ম নানা অনুভূতি রঞ্জনে সে কথাটা বোধহয় অধিকতর মান্য। রবীন্দ্রনাথ *শেষ সপ্তক* কাব্যে এবং অন্যত্রও বার বার বলেছেন, 'আমি আনন্দিত।' এই কথাটার ভাবগত সম্প্রসারণের চমৎকার গীতিরূপ হল :

> ভালো আমার লেগেছে যে রইল সেই কথাই।

কিংবা আরও নিপুণ গীত ভাষণের নমুনা :

> লাগল ভালো, মন ভোলালো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই

সেই সঙ্গে তাঁর মর্ত্যসংসক্তির আবেগ তিনি সিক্ত মাধুর্যে ভরিয়ে বলেন :

> আমার এ যে বাঁশের বাঁশি, মাঠের সুরে আমার সাধন।
> আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।

গানে এই সুযোগটা থাকে। অর্থবোধকতার সীমা ছাড়িয়ে গান কেবলই আবেগদ্রব হয়ে ওঠে। ভালো লাগার কথাটা কতভাবে, কত বর্ণরঞ্জনে, কত পুনরাবৃত্তিতেই বলা যায় গানে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন এই রহস্য। তাই লিখেছিলেন একবার, 'গান জিনিসে বেশি বোঝাই সয় না।' এখানে বেশি বোঝাই বলতে তিনি নিশ্চয় বহুল বর্ণনা, জটিল ভাবচিন্তন ও অলংকার প্রাধান্য বুঝেছেন। কবিতায় ওই সব উপাদান থাকতেই পারে অথচ গানে বর্জনীয়। কেন-না গানে শব্দকে তরঙ্গিত করতে হয় সুরের প্রবাহে, ভাবকে সংগতি রাখতে হয় লিরিক লাবণ্যের তালে তালে এবং সেইসঙ্গে ভেতর ভেতর টান থাকে অতলতার। রবীন্দ্রনাথ গানে যদিও আহ্বান করেন 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া' সে-আহ্বান আসলে ঘরমুখো কূপমণ্ডুক আমাদের প্রতি। গানের সৃজনাবেগ বরং অন্য কথাটাই বলে। গীতিকার রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বলেন, 'আমারে

ডাক দিল কে ভিতরপানে'। এই ভিতরের ডাক, এই অতল জলের আহ্বান রবীন্দ্রনাথকে সার্থক গীতিকার করে তুলেছে। এর জন্য তিনি খুব শান্ত অথচ সুনিশ্চিতভাবে নিজেকে প্রথম কৈশোর থেকে প্রস্তুত করেছেন। হিন্দুস্থানি গানের ভাব, ভাষা ও প্রসঙ্গের অকিঞ্চিৎকরতা বিষয়ে তিনি বহুবার মন্তব্য করেছেন। ওস্তাদ কালোয়াতদের মাত্রাধিক তানবাজি এবং গতিহীনতা তাঁকে হতাশ করেছে। বাঙালির সাহিত্য ও চিত্রকলায় তাঁর সমকালে যে-নবজীবনের ও জাগরণের সোনার কাঠি ছোঁয়া লেগেছে, গানেও যে সে-স্পর্শ লাগা খুব দরকারি একথা তিনি বারবার লিখেছেন। গভীর বেদনায় তিনি মন্তব্য করেছেন :

আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে গান জিনিসটা চলছে না। ওস্তাদরা বলছেন— গান জিনিসটা তো চলার জন্যে হয়নি, সে বৈঠকে বসে থাকবে, তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে।

আবার ইউরোপ যাত্রার পথে আরব সাগরে জাহাজের কেবিনে বসে বিলিতি গানের আসরে তাঁর মনে হয়েছে :

> একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি গান চলিতে থাকে। কোনো গান বা ইংলন্ডের গৌরবগর্ব, কোনো গান বা হতাশ প্রণয়িনীর বিদায় সংগীত, কোনো গান বা প্রেমিকের প্রেমনিবেদন। সবগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমি এই দেখি— গানের সুরে এবং গায়কের কণ্ঠে পদে পদে খুব একটা জোর দিবার চেষ্টা। সে জোর সংগীতের ভিতরকার শক্তি নহে, তাহা যেন বাহিরের দিক হইতে প্রয়াস।..... কিন্তু সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না।..... অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই।

এই মন্তব্য থেকে গীতিকার রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমরা বুঝে নিতে পারি। তাঁর লক্ষ্য অনুভূতির অন্তরে বেজে ওঠা গানটি বাণীবদ্ধ করা। যদিও একটি গানে তিনি খেদোক্তি করেন : 'সুরে বাজে মনের মাঝে, কথা দিয়ে কইতে পারিনে', কিন্তু আমরা জানি, তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব গানের বেদনাকে আনন্দকে কথার আভায় ধরে ফেলার গৌরবে। এ লক্ষ্যে তাঁর সাফল্য আজ তর্কাতীত কিন্তু সম্ভ্রম জাগে বিশেষত এই ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথকে বাংলা গানের ভাবভাষা ও বিন্যাস প্রায় এককভাবে গঠন করতে হয়েছে। তাঁর আগে বাংলা গানের কোনো শিষ্ট ও উচ্চ মানসম্মত আদর্শ ছিল না। অথচ কবিতায় তাঁর আগে অন্তত মাইকেল ছিলেন, উপন্যাসে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। গানে তিনি ব্যাপক অর্থে কোনো উন্নত উত্তরাধিকার পাননি। তাঁর আগের বাংলা গান মানেই শান্তরসাস্পদ নির্বেদমূলক ব্রহ্মসংগীত, চটুল সুরে তালে বাগান-বাড়ির গান, কলঙ্ক ও ছলনামূলক প্রেমগীতি, সুর ও তানসর্বস্ব কালোয়াতি হিন্দুস্থানি আর হালকা রগড়ের গান। কাজেই নতুন যুগের সূক্ষ্ম চেতনাসম্পন্ন রুচিমান বাঙালির গাইবার এবং শোনাবার উপযুক্ত গান তাঁকেই লিখতে হল। সে গান খুব নিপুণ পদসঞ্চারে এক শতক ধরে ছড়িয়ে গেল সবখানে। বাংলা আধুনিক গান রচনায় রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য ও একক কৃতিত্ব পুরোপুরি বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে দেখতে হবে তাঁর আবির্ভাব কালের ও অনুশীলন পর্বের বাংলা গানের বাতাবরণ। দেখতে হবে ইতিহাসের পটভূমিতে কতটা সাহস, কী পরিমাণ সৃজন-সামর্থ্য এবং বিপুল স্বাধীন কল্পনা তাঁকে দেখাতে হয়েছিল। এই প্রয়াসে যেমন তিনি রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রবিরোধী সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তেমনই তৈরি করে নিয়েছেন তালের নতুন ব্যঞ্জনা এবং তানবিহীন কণ্ঠবাদনের কৌশল। কিন্তু এসব কিছুকেই ছাপিয়ে গেছে গানে তাঁর ভাবকল্পনার অভিনবত্ব ও অনুভূতির অনুসূক্ষ্ম রূপায়ণে বাণীবয়নের কৃতিত্ব। তাঁর গানের এপিগ্রাম আর ইমেজারি, 'শরতশিবিরে ভিজে ভৈরবী'-র গানের মতো আর্দ্র বর্ণনা কিংবা 'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু'-র মতো মহৎ কল্পনার বিশাল বিস্তার বাংলা গানে ছিল অপূর্বকল্পিত ঐশ্বর্য। তাঁর এ জাতীয় সমস্ত কৃতিত্বই গানের বিষয়গত—এই কথাটা স্পষ্ট করে বোঝা চাই। কথাটা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথেরই

একটি রচনাংশ ঘুরিয়ে তাঁর সম্পর্কে ব্যবহার করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন :

> পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলে-বকাওলি, সেই-সব বালক-ভুলানো কথা। কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।

রবীন্দ্রনাথও কি বাংলা গানে এতটাই করেননি? আমরা কি এমন করেই বলতে পারি না যে, 'কোথায় গেল সেই খেউড় তর্জা পাঁচালি, সেই ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা-র অকিঞ্চিৎকরতা বা কাদের কুলের বউয়ের সস্তা ইতরতা, কোথায় গেল গতিহীন তানসর্বস্ব ওস্তাদি গান আর ভাবহীন শুষ্ক ধর্মসংগীত?'

রবীন্দ্রনাথ যেমন সংহতভঙ্গিতে সিদ্ধান্ত করেছেন— 'বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত... নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন' ঠিক তেমনই আমরাও বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব প্রয়াসে বাংলা গানের সঙ্গে গতিময় নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম ভাবের পরিণয় সাধন করেছিলেন। সেই পরিণয়ের ফলে বাংলা গানে যে নতুন বৈচিত্র্য ও ভাবসম্পদ সঞ্চারিত হল তারই সন্তান দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান। কিন্তু বাংলা গানে, রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব ভাবলাবণ্য যোজনার যথার্থ স্বরূপ ও মহিমা বুঝতে গেলে তাকে আমাদের ফিরে দেখতে হবে পুরোনো বাংলা গানের ঐতিহ্যে। তখন দেখা যাবে কোন্ পঙ্কে রবীন্দ্রনাথ ফোটালেন গতিরাগের স্বর্ণকমল।

২

রবীন্দ্রনাথের আগে বা সদ্য সমকালে বাংলা গানের ধারা বলতে বুঝি কয়েকটি শ্রেণিবিভক্ত রচনা। এই শ্রেণির একটা বড় অংশ ছিল বাংলা ধ্রুপদ ও ব্রহ্মসংগীত, আরেকটি শ্রেণি কলকাতার রঙ্গমঞ্চআশ্রয়ী নাট্যগান, আরেকটি ছিল হিন্দুমেলাকে ঘিরে স্বদেশি গান। এর পাশে ছিল অর্থহীন বা অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে লেখা কারদানিবহুল গান যার নমুনা লালচাঁদ বড়ালের কোনো কোনো রেকর্ডে লভ্য। আর অবক্ষয়ী নগর কলকাতার ভোগ্যব্যসনপুষ্ট বিলাসীরা চর্চা করতেন বাগানবিলাসী গান ও রঙ্গরসের গান, যার অনেকগুলি ভাবাংশে রুচিদুষ্ট ও ভঙ্গিতে ইতরতাময়। বরং বৃহত্তর বাংলায় গানের জগৎ ছিল শুদ্ধ ও সুরময়। সেখানে চলত কীর্তন ও বাউল, ফিকিরচাঁদি ও রামপ্রসাদী গান, চলত পাঁচালি ও দেহতত্ত্বের গান। এসব গানের ভাবাংশও ছিল সমৃদ্ধ। সারা দেশের রাজারাজড়া জমিদার ও সামন্তরা বাড়িতে পুষতেন অবাঙালি কালোয়াতদের। সেই ওস্তাদরা বাংলা গানকে অচ্ছুৎ মনে করতেন। বাংলা ভাষার আদপে যে গান লেখা সম্ভব সেটাই তাঁরা বিশ্বাস করতেন না।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পরিবারের সৌজাত্যে পেয়ে গিয়েছিলেন এক রুচিশীল গানের পরিমণ্ডল। জ্যোতিদাদার পিয়ানোর ধ্বনিময় জগৎ তাঁকে অশ্রুত বাণীরচনায় কৈশোরেই প্রেরিত করেছিল। বিষ্ণুর কাছে শিখেছিলেন খাঁটি বাংলা গানের কিছু নমুনা। যেমন :

> এক-যে ছিল বেদের মেয়ে— এল পাড়াতে
> সাধের উল্কি পরাতে

কিংবা

> এক-যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়াল-কাঁটার বন
> কেটে করলে সিংহাসন।

এসব গানের ভাবপ্রসঙ্গে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই মন্তব্য করেছেন, 'পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায়' বলে। তার মানে বাংলা গানের ভাবদৈন্য তাঁকে প্রথম থেকে পীড়িত করত। তবে ঠাকুর পরিবারের মুক্ত সংগীত সংস্কার এবং বিষ্ণুর তানবর্জিত গানের ধরন তাঁর মনে কিছুটা স্বাধীন সংগীত চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল। শেষ কৈশোর থেকে নাট্যসংসর্গ, বিলিতি গানের চর্চা ও হার্বার্ট স্পেনসরের সংগীততত্ত্ব তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করত নতুন রচনায়। তবুও তাঁর প্রথম জীবনের প্রয়াসে সংগীতে ভাবের মুক্তি তেমনভাবে আসেনি। কারণ সে ছিল তাঁর শিক্ষানবিশির কাল। অন্যের সুরে নিজের ভাবকে ঢালাই করতে শিখছেন তখন। সেই প্রয়াসে কখনো ভাঙছেন হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ, কখনো আইরিশ মেলোডিতে বসাচ্ছেন নাটকের সংলাপের মজা। বিষ্ণুর কাছে রীতিমাফিক গানের তালিম যে তাঁর শেষ হল না, জ্যোতিদাদার পিয়ানো যে বেশিদিন টানল না তাঁকে, তার কারণ ওসবের অন্তর্নিহিত রস তাঁর নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। বরং বিলেতে গিয়ে ইংরাজি গানের বৈচিত্র্য ও বিস্তার তাঁর বেশি ভালো লাগল। আসলে তাঁর ভিতরের প্রকাশপিয়াসী গীতিকবির মন তাঁকে তাড়না করে বেড়াচ্ছিল অন্তরকে বিকশিত করার নিবিড় টানে। আমাদের পিপাসিত চিত্তে গীতসুধা সঞ্চার করবার জন্য যাঁর আবির্ভাব তিনি কখনো শুধু ব্রহ্মসংগীত আর 'সুরে নাটিকা' লিখে তৃপ্ত হতে পারেন? কিন্তু ইতিমধ্যে সব দিক থেকে বাংলা গানের মুক্তিদাতার সামনে ঘনিয়ে এসেছিল এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়।

বাংলা গানের অনেকগুলি স্রোতস্বিনী ধারা রবীন্দ্রজন্মের দশ-পনেরো বছরের আগে ও পরে যে অকস্মাৎ রুদ্ধস্রোত হয়ে পড়েছিল এ এক ঐতিহাসিক সত্য। এর প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় ১৮৫৭ সালে দাশরথি রায়ের মৃত্যু ঘটে। অন্য দুই প্রখ্যাত পাঁচালি গায়ক ও রচয়িতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও রসিকচন্দ্র রায় প্রয়াত হন যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৮৯৩ সালে। কীর্তনাঙ্গ গানের সফল ও জনপ্রিয় রচয়িতা গায়ক গোবিন্দ অধিকারী তিরোধান করেন ১৮৭০ সালে। ঢপকীর্তনের অবিসম্বাদী নায়ক মধু কান দেহ রাখেন ১৮৬৮ সালে। গোপাল উড়ে বিদায় নেন ১৮৫৭ সালের কিছু পরে। হাসির গানের রাজা রূপচাঁদ পক্ষী সবাইকে কাঁদান ১৮৬৫ সাল নাগাদ তাঁর অকালপ্রয়াণে। ১৮৯৬ সালে তিরোধান করেন কাঙাল হরিনাথ— বাউল গান যাঁর রচনায় পেয়েছিল এক নতুন মাত্রা। ইতিমধ্যে কলকাতা তার সর্বগ্রাসী চরিত্র নিয়ে নতুনভাবে জেগে উঠছিল নানা ভাবসংঘর্ষে ও সমন্বয়ে। ভাগ্যান্বেষীরা ভিড় করলেন শহর কলকাতায়। পরিত্যক্ত গ্রাম্য কৃষিপরায়ণ মানুষ পড়ে রইল তাদের চিরায়ত যাত্রা-পাঁচালি, তর্জা-কবিগান, বাউল-ভাটিয়ালি, জারি-সারি-মুরশিদা নিয়ে! কলকাতা জেগে উঠল নাট্যমঞ্চেও ব্রাহ্মসমাজে। বিনোদন ও শুচিব্রতের চলল দোলাচল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনার প্রথম পর্বে এই দোলাচল ছুঁয়ে নেন খুব সাবলীলভাবে। নাট্যগান লেখেন তিনি, এমনকি গীতিনাট্যও। ব্রহ্মসংগীত রচনাতেও তিনি সফলতা পান। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি নিশ্চয়ই খুঁজছিলেন সত্যিকারের বাংলা গান— যা শিষ্ট ও রুচিসম্মত মানুষ গাইবে। ধর্মনিরপেক্ষ, গতিময়, অনুভূতিগাঢ় গান— যা আমাদের শিক্ষিত বাঙালির হৃদয়াবেগকে ভরিয়ে দেবে। তখনও তিনি জানেন না ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁর গানকে রূপকল্পের দিক থেকে যেমন ঘুরিয়ে দেবে বাউল-কীর্তনের দিকে তেমনই গানের বিষয়কে ব্রহ্ম ও নাট্যপ্রসঙ্গ থেকে টেনে আনবে স্বদেশভাবনায়। তখনও তিনি ভাবেন নি শান্তিনিকেতনকে ঘিরে কী প্রবলভাবে তাঁর গানের বিশ্ব আলোড়িত হবে বিচিত্র উৎসবের গানে, নৃত্যনাট্যে আর প্রকৃতির উন্মোচনে। তাঁর গান কত বিষয়কেই যে আলিঙ্গন করবে ভবিষ্যতে! তাঁর গান কী রহস্যে ছুঁয়ে প্রেম ও প্রকৃতির উভবল সম্পর্ককে ব্যক্ত করবে, এমনকি তাঁর গান ভাঙনের জয়গান গাইবে, অভ্যর্থনা জানাবে মর্ত্যধূলির ঘাসে রোমাঞ্চ লাগানো মহামানবকে, এসব কি আগে ভাবতেন? তিনি কি জানতেন নটরাজের বিশ্বনৃত্য কোনোদিন তাঁর গানের বিষয়ীভূত হবে কিংবা জীবনের পরিণামে শান্তি পারাবারের

শান্ত আহ্বান? তাঁর গানের সূক্ষ্ম বোধের জগৎ বিষয়রূপে পরবর্তী স্তরে বেছে নিয়েছে কত গভীর ও গোপন অনুষঙ্গ তা খতিয়ে দেখলে বড় বিস্ময় লাগে। তাঁর গানের আবরণ খুললে শুধু সুন্দর নয়, জেগে ওঠে বিচিত্র বর্ণিকাভঙ্গ ও অন্তর্মগ্ন অভিজ্ঞতা। এভাবেই আমরা জীবনে প্রথম জানতে পারি মৃত্তিকাসম্ভব ফুলের অন্তরে কোনো গ্লানির ধূলি থাকে না, দুই হাতে কালের মন্দিরা বাজে সর্বদা. স্বদেশের মাটিতে আসন পাতা থাকে বিশ্বমায়ের তথা বিশ্বময়ীর, আগুনকে মনে হয় ভাই, দেখা যায় তালের বনের করতালি কিংবা নীলদিগন্তে ফুলের আগুন। পর্বান্তরে জেগে ওঠে বসন্তের বেদনাভরারূপ, সাগর কূলে জ্বলে ওঠে অতল রোদন, বসন্তের ফোটা ফুলের গভীরে ঝরা ফুলের খেলা দেখেন তিনি। আরও মগ্নতায় সুদূরের মিতাকে জানাতে ইচ্ছা করে দীপ্র বেদনার কথা, অপ্রাপণীয়ের হাওয়া সোনার হরিণের মতো কেবলই ডাকে, আপন রিক্ত ডালি দিতে ইচ্ছা করে ঐশ্বর্যময়কে। মায়াবী চেতনা জানান দেয় পুষ্পবনে পুষ্প থাকে না,— থাকে অন্তরে, তাই বসন্তের জাগৃতি ঘটে প্রাণে প্রাণে। অকারণের আনন্দে রবীন্দ্রনাথের গানের জগতে মাটির কলস ছাপিয়ে পড়ে, পূর্ণচাঁদের মায়ায় সেখানে ভাবনাও পথ ভোলে আর দুখের পারাবারে চোখের জলের জোয়ার লাগে।

এসব ব্যক্ততা আর দ্যোতনা কি শুধুই গীতিকারের বাগ্‌বিলাস বলে ধরে নেব আমরা? বিষয়ের এমন গূঢ়চারিতা, প্রকাশের এমন লাবণ্যময় সংকেত, ভাষণের এমন সুমিত বৈপরীত্য কি কোনো দেশের গানে আছে? নেই, এবং বিশেষভাবেই ছিল না রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা গানে। নিধুবাবু আর শ্রীধর কথক— রবীন্দ্রনাথের আগে এই দুইজন গীতিকারের প্রগাঢ় গানে সেকালের পক্ষে অনেক নতুনত্ব ও প্রকাশচারুতা থাকলেও অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি নেই, অভাবিত চিত্রকল্পের ধাক্কা নেই। কেন-না তাঁরা তো সুরের ছাঁচে গান বাঁধতেন কিংবা অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে টপ্পার বিস্তারে ফোটাতেন। গানের বিষয়গত গুরুত্ব তাঁরা জানতেন না! একটা মৌলিক ভাবনা কেমন করে গানের গোত্র পালটে দেয় তা কি তাঁরা কল্পনাও করেছেন? উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের এই গানখানি :

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে?
* * *
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে?

এ-গানে সৃষ্টির যে বিরোধাভাস, নিসর্গ ও মানুষের যে বিচিত্র অবস্থান ও অসহায়তা ফুটেছে তা যে গানের বিষয় হতে পারে তা কি রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ ভেবেছেন? অথচ উনিশ শতকের সার্থক ও জনপ্রিয় প্রেম সংগীতে এমন ব্যঞ্জনাহীন পঙ্‌ক্তিও পাই যে—

সে আমার আঁখিরঞ্জন
আমি তার মনোরঞ্জন।

কিংবা খুব বিখ্যাত এই প্রেমগান নিধুবাবুর :

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখতে বড়ো ভালোবাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে।

এ গানে খুব মহৎ ভাব কিছু আছে কি? অথচ অনেকেই এ-গানকে নিধুবাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমসংগীত বলে মনে করেন। সে কি শুধু প্রকাশের সারল্যে না বক্তব্যের সংহতির জন্য?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা প্রাসঙ্গিকভাবে বিচার করা দরকার। আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিকালে যখন প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সহজ সরল বাংলা গান জেগে উঠছে নিধুবাবু বা শ্রীধর কথকের রচনায় তখন তাঁদের সামনে পাঞ্জাবি টপ্পার আদর্শ (যার বিষয় প্রণয়) ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাই গানের আরও যে কত বিষয় হতে পারে এবং সে-বিষয়কে রঞ্জিত করতে পারে কত যে সূক্ষ্ম অনুভূতি সেসব তাঁদের জানা ছিল না। সেই কারণে গোপাল উড়ের লেখা 'ওই দেখা যায় বাড়ি আমার চৌদিকে মালঞ্চঘেরা' শুনেই সেকালের লোক হই চই করে উঠেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথায় সেকালের দুখানা জনপ্রিয় গানের নমুনা পেশ করেছিলেন। তার একখানা—

নববিধানের কলের গাড়ি চলে যায়।

আরেকখানা—

ভেটকি মাছের তিনখানা কাঁটা।

এমন সকরুণভাবে দুর্বল গানের জগৎ থেকে বাংলা গানকে উত্তরণ করাতে যাঁরা সচেষ্ট ছিলেন তাদের একজন রামমোহন আরেকজন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। দুজনেরই কাব্যরচনার ক্ষমতা ছিল সাধারণ মানের। বিশেষত রামমোহন ভারী চালের ধ্রুপদী ধাঁচের গান লিখতেন বলে যুক্তাক্ষরবহুল অক্ষর-ডম্বর শব্দবিন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন। সে গানের মুক্তি কোথায় ভাবে বা চালে? ঐসময় সহজভাবে স্বাভাবিক গান ফুটতে পারত প্রণয় সংগীতে, কিন্তু দুর্ভাগ্যত সেকালের রুচিবাগীশ শিক্ষিত বাঙালি প্রেমের বিষয়টাকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন। সংগীতবিদ্ অমিয়নাথ সান্যাল সেই সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব বাগ্‌ধারায় এইভাবে :

> যেহেতু টপ্পা গান ও যাত্রা-পাঁচালি প্রভৃতি গানের মধ্যে প্রেম প্রণয় মিলন বিরহ ইত্যাদি ভাবের কথা ও উদ্দীপনা আছে অতএব এগুলি সব অশ্লীল, এরূপ মনে করে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের একদল গান-বাজনার উপর নিষেধ প্রচার ক'রে ফেলেছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তি ডুগি-তবলা দেখে চমকে উঠে যেতেন....ফলে গান-বাজনার চর্চার ভার পড়ল অশিক্ষিত ব্যক্তির উপর। এই কারণে শিক্ষা প্রধান শহরগুলিতে গান-বাজনার তথা বাংলা গানের উৎকর্ষ নিরুদ্ধ হয়েছিল।

এই নিরুদ্ধ দেশে রবীন্দ্রনাথ একাই গানের অন্ধ সংস্কারের অচলায়তন ভাঙেন এবং নিয়ে আসেন ভাব ও বিষয়স্রোতের মুক্তধারা। খুলে যায় জট। জেগে ওঠেন অন্য গীতিকাররা। রবীন্দ্রগীতির বিষয়বহুলতা তাদের চোখ খুলে দেয়।

৩

এর আগে আলোচনার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের দুটি মন্তব্য এখানে আবার ব্যবহার করে আমি আসতে চাই পরবর্তী বক্তব্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গান তাঁর কবিতা রচনার সমান্তরাল বিকাশ ('a parallel growth to my poetry') এবং সে-গান বঙ্গভাষাভাষীদের রসরুচির সীমায় আবদ্ধ থাকবে ('they will not be known outside my province')। প্রথম মন্তব্যটির ব্যঞ্জনা বোঝা তবু কিছু সহজ কিন্তু মন্তব্যটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। অথচ দ্বিতীয় মন্তব্যের ভাষ্যরচনায় প্রথম মন্তব্যই সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথের গান যে বাণীপ্রধান এবং সেই বাণীর মহিমা ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের হতে হবে বাংলা গানের ঐতিহ্য ও সংস্কারবিষয়ে মনস্ক— দ্বিতীয় মন্তব্যের লক্ষ্য সেটাই। রবীন্দ্রপূর্ব ও সমকালীন বাঙালি গীতরচয়িতাদের রচনারীতির সঙ্গে তাঁর যে বেশ তফাত ছিল সেকথা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়িয়াছিলাম খুব অল্প বয়সেই। তখন ভদ্রগৃহস্থের কাছে অনেক তাড়া খাইয়াছি। সংগীতেও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না।

সংগীতে তাঁর লক্ষ্মীছাড়া স্বভাব ব্যক্ত হয়েছিল রাগরাগিণীর বাঁধা নিয়ম আর কালোয়াতি বাদ দিয়ে কথা ও ভাবের দিকে আশ্রয় নেওয়ায়। কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি উনিশ শতকের যুগোচিত মহাকাব্যের ঘনঘটা বা বীররসের তীব্র নিনাদ ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন একলা কবির কথাতে অর্থাৎ আত্মতাকে ফোটাতে। গানে সুরের প্রাধান্যকে খর্ব করে কথা ও সুরকে মেলানো ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়ো সাধনা। এই সাধনা বিশুদ্ধভাবে বাঙালিরই সাধনা। এ ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য :

সংগীতেরও....দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সংগীতের এই দুইরকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানি আর বাংলাদেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত; বাণী তার 'ছায়েবানুগতা'।...পশ্চিমে সংগীত যে বাক্য আশ্রয় করে তা অতি তুচ্ছ।

ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রসংগীত বাংলার বাইরে চলবে না। গানের বাণীর গুরুত্ব একমাত্র বুঝবে বাঙালি শ্রোতা। প্রশ্ন ওঠে, বাংলা গানে বাণীর ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের আগে তেমন করে কোনো বাঙালি গীতিকার বোঝেন নি কেন? সম্ভবত তার কারণ তাঁদের ক্ষেত্রে গান আত্মগত প্রকাশের বাহন ছিল না, তাঁরা কেউই মূলত কবি ছিলেন না। তার উপর সারা বাংলায় ছিল সামন্তদের বেতনভোগী হিন্দুস্থানি ওস্তাদদের দাপট। রবীন্দ্রনাথ চমৎকার বলেছেন :

কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গান কর্তার ভাগে, আর ওস্তাদদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদদের হাতে খাদের মিশল বাড়িতেই থাকে। কেন-না ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইতিহাস ঘেঁটে দেখেন বাংলা গানে কীর্তন ও বাউল ঐতিহ্যে বহুকাল আগে থেকেই কথার দিকে ঝোঁক। অকস্মাৎ উনিশ শতকে বাংলা গান ওস্তাদদের কণ্ঠগত হয়ে সুরসর্বস্ব তথা কারদানিবহুল হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে বাংলা গানকে উদ্ধার করে তার আপন স্বভাবে ফিরিয়ে আনলেন এবং নিজের কবিজীবনের সমান্তরাল উদ্‌ঘাটন সূত্র হিসাবে গানকে সামনে রেখে তার মধ্যে এতসব বিষয় বৈচিত্র্য ও ভারসম্পদ ভরে দিলেন যা একমাত্র বাঙালিরই আস্বাদ্য হয়ে উঠল।

বাঙালির সংগীত রুচি মূলত বাণীবহুলতায় অভ্যস্ত একথা তো স্পষ্ট। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বুঝতে হবে। এক, গরিষ্ঠসংখ্যক বাঙালি কোনোদিন যন্ত্রসংগীতে রস পায়নি। [রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'বীণ্ রবাব শরদ্ সেতার এস্‌রাজ সারেঙ্গী প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশি বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়'।] দুই, শিক্ষিত বাঙালির রসবোধ উদ্দীপনে উনিশ শতক থেকে বাংলা কবিতার ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ঈশ্বরগুপ্ত, মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এবং রবীন্দ্রোত্তর বাঙালি কবিরা এত অবিরলভাবে বাঙালি মনকে আধুনিক করে দিয়েছেন যে সেই refined sensibility-র কাছে রবীন্দ্রসংগীত হয়ে উঠেছে অধিকতর আস্বাদনীয়। বৃহত্তর ভারতের গান ও কবিতা জগতে আধুনিক ভাবনা ও বিষয়ের এতটা জাগৃতি ঘটেনি। রামলীলায় উৎসাহী হনুমানপূজক গরিষ্ঠসংখ্যক হিন্দিভাষী ভারতীয়দের চেতনায় আজও তুলসীদাস সুরদাসদের কবিত্ব অনেক রোচক। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের অভ্যন্তরে গাঁথা নিশীথরাতের প্রাণের আকুতি বুঝবেন কী করে? প্রেমিকের নিভৃত প্রতীক্ষায় কেমন করে বিস্ময় এসে পড়ে তা একমাত্র

ভাবপ্রবণ বাঙালিমনই যথার্থ বুঝবে। রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির refind sensibility-র সর্বাধুনিক বিস্ফার। একেক সময় এমনও মনে হয় যে কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙালির চিত্তক্ষেত্রকে লিরিকের উপযোগী করে নিয়েছেন আর গীতিকার রবীন্দ্রনাথ সেই দীক্ষিত চিত্তে সঞ্চার করেছেন গানের রস। রবীন্দ্র-কবিতা করেছে আমাদের অন্তরে কর্ষণের কাজ আর তাঁর গান করেছে আমাদের আকর্ষণ। প্রথমটি না হলে দ্বিতীয়টি তেমন করে হত না। রবীন্দ্রভাবনার নানা স্বরূপ তাই তাঁর গানে অনেক বেশি দ্যোতনাময়। ধরা যাক গোটা কয় রবীন্দ্রগীতির পঙ্‌ক্তি :

ক) কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসার ঘায়ে
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।

খ) যে ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকালো।

গ) আপনারে দিয়ে রচিলিরে কি এ
আপনারই আবরণ।

ঘ) আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ভালোবাসায় ভোলাব।

এসব ভাষণ আসলে তো উচ্চতম কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের সার্বিক কবিমানসের অনেক সংলগ্ন। যতই সুরের সহযোগ থাক এ-জাতীয় পঙ্‌ক্তি স্বতঃস্ফুট, স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুর এসব মহৎ উপলব্ধির বাচনিক সম্ভ্রান্ততাকে বড়জোর রেখায়িত করতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতের মেলোডিক প্যাটার্নকে সহজ সরল বলতেই হবে। তাঁর গানে সুরের কখনোই লাগামছাড়া ঔদ্ধত্য দেখা যায় না। গানের ভাবগাম্ভীর্য ও বিষয়গৌরবকে ফুটিয়ে তোলাটুকুই সেখানে সুরের বিনত প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ ভারতের বেদমন্ত্রগানের স্বরে এমনটাই লক্ষ করে বলেছিলেন :

> তার সঙ্গে একটি সরল সুর লাগিয়া থাকে, মহারণ্যের মর্মরধ্বনির মতো, মহাসমুদ্রের কলগর্জনের মতো। তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে, এই কথাগুলি একদিন দুইদিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের, ইহা মানুষের ক্ষণিক সুখদুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।

কথাগুলি অবিকলভাবে প্রযোজ্য রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে। তাঁর গানের গভীরে বাণী হয়ে গেছে অনন্তকালের সামগ্রী। বেদমন্ত্রের সুর হারিয়ে গেলেও বেদমন্ত্র যেমন বিষয়গত গুরুত্ব, ভাবগত মৌলিকতা এবং ধ্বনিগত মহিমা হারায়নি, রবীন্দ্রসংগীতও তেমনই ভবিষ্যৎকালের মানুষের কাছে ভাবগত মূল্যে, বিষয়গত কূটত্বে এবং ধ্বনিময় মাধুর্যে থেকে যাবে অন্তহীন আস্বাদনীয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের দিকে একটু নিবিড়ভাবে দেখলে যে চমৎকৃতি জাগে তার অন্যতম কারক উপাদান হল সঞ্চারীর কাব্যিক ব্যবহার। এই দিক থেকে তিনি বাংলা গানের দিশারি। এ কথা সত্য যে, বাংলা গানে কোনোদিন সে ভাবে সঞ্চারী ছিল না। আস্থায়ীর পর এক বা একাধিক অন্তরা— এই হল খাঁটি বাংলা গানের বরাবরের গঠন। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর গানে সঞ্চারী সংযোগ করলেন তার কারণ তাঁর সৃজনমানসে ধ্রুপদের প্রভাব, আরেকটি কারণ অন্তরা আভোগের একই সুর সমন্বয়ের মধ্যে একটু variation of tone সঞ্চার করা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ নিশ্চয়ই গানে ভাবগত বিন্যাসের নতুনত্ব আনার চেষ্টা। এমন নির্মাণ কৌশল কাব্যে বেশি চলে। একটা উদাহরণ দেখা যাক।

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ুরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।।

কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা, কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর—চরণ রঞ্জিব অলক্ত অঙ্কনে।।

গানের আস্থায়ী আর অন্তরাতে নায়িকাকে ভূষিত করার এমন কোনো চমকপ্রদ আয়োজন উপচার বা অভিনব বার্তা নেই যা আমাদের টানে। অকস্মাৎ সঞ্চারীতে এসে চকিত একটা কাব্যিক অভিঘাত আমরা পাই যা গানটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। বলা হয় :

সখীরে সাজাব সখার প্রেমে
অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে।

গানের চিরায়ত বর্ণনার ভাবস্রোতে সঞ্চারীর এমন আকস্মিক পরিবর্তন আমাদের অভিভূত করে দেয়। আমরা বস্তু থেকে মুহূর্তে ভাবে চলে যাই। সখীকে সাজাবার এমন নিরঙ্গ আয়োজনের কথা এখানে বলা হয় যা অনেকটাই কবিতার জগতে নিয়ে যায় আমাদের। বিচার করলে বোঝা যাবে পুরো গানটা দাঁড়িয়ে আছে ওই সঞ্চারীর নির্মাণকৌশলে।

এবারে আরেকটি গানের সঞ্চারী-রহস্য দেখা যেতে পারে—

ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী।
বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ,
পাখাতে পাবি আনন্দ,
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি।।

গানের দুই তুক্ ছুঁয়ে গান যেখানে দাঁড়াল সেখান থেকে একটা variation of theme অথবা অন্য ভাবটা খুব জরুরি হয়ে ওঠে, অন্যথায় গানটা ওখানেই থামাতে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গানকে সামলে দিয়ে আবার সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন এই অসামান্য উচ্চারণে যে,

নির্মল দুঃখ যে সেই তো মুক্তি
নির্মল শূন্যের প্রেমে—
আত্মবিড়ম্বনা দারুণ লজ্জা,
নিঃশেষে যাক সে থেমে।

গানের এমন যে নতুন মুক্তি, নতুন স্তরে, তা কি কবিতা-ধর্মী নয়? বেশিরভাগ রবীন্দ্রসংগীতে সঞ্চারী আসলে রবীন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য কাব্যগত কৃৎকৌশল বা তাঁর অমোঘ প্রতিভার দান। বিস্ময়ের কথা এই যে তাঁর পরে বাঙালি গীতিকাররা অবিরলভাবে সঞ্চারী লিখেছেন তাঁদের গানে কিন্তু কেউই তার সাহায্যে নতুন দ্যোতনা আনাতে পারেননি রবীন্দ্রনাথের মতো। কেন-না তাঁদের গীতিরচনা রবীন্দ্রনাথের মতো কবিসত্তার দ্বিজত্বসন্ধানের প্রয়াস নয়।

৪

রবীন্দ্রনাথের গানে বিষয়গত গুরুত্ব খুবই বিবেচনাযোগ্য। প্রসঙ্গের শেষ পর্বে কিছু গান দিয়ে সেই বিষয়বৈচিত্র্য এবং তার ভাবনার ব্যাপ্তি দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রথম সংস্করণ *গীতবিতান*-এ (১৮৩৮) তাঁর গান অনেকগুলি উপনামের পর্যায়ে সাজিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই সেই পর্যায়গুলি গড়ে উঠেছিল বিষয়-বিচিত্র্য ধরে। তার শিরোনামগুলি এইরকম—

পূজা পর্যায়ে : গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ,নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়।

প্রেম পর্যায়ে : গান এবং প্রেমবৈচিত্র্য।

প্রকৃতি পর্যায়ে : সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। এ ছাড়া ছিল 'স্বদেশ', 'বিচিত্র' ও 'আনুষ্ঠানিক' পর্যায়।

এখনকার গীতবিতানে এতগুলি বিষয়গত উপপর্যায় বর্জিত হয়ে ছটি ঋজু শিরোনামে গ্রন্থিত হয়েছে। সেগুলি পূজা-প্রেম-প্রকৃতি-স্বদেশ-বিচিত্র-আনুষ্ঠানিক। উপপর্যায়গুলি বর্জিত হবার সবচেয়ে বড় যুক্তি সম্ভবত এই যে, দুই সহস্রাধিক রবীন্দ্রগীতির সত্যিকারের উপপর্যায় অন্তত শতাধিক হবে এবং তার চেয়েও বড় কথা রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গান আছে যা একই সঙ্গে একাধিক ভাবকে ছুঁয়ে যায়। পূজা পর্যায়ের অনেক গান স্বচ্ছন্দে প্রেমের গান বলে শনাক্ত হতে পারে, তেমনই অনেক প্রেমের গান স্পর্শ করতে চায় পূজা পর্যায়কে। অন্য পর্যায় সম্পর্কেও এমন কথা বলা চলে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের গানের এই বিষয় বিভাজনের বিতর্কে না গিয়ে আমরা বরং হাজির করি রবীন্দ্রসংগীতের এমন কটি নমুনা যা বিষয় গৌরবে অপরূপ, মৌলিক ভাবকল্পনায় অত্যাশ্চর্য এবং গূঢ়ভাবে বাণীবহ। প্রথমেই উৎকলনযোগ্য—

এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্য তারা দলে দলে
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগনতলে।।
তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা
আলোয়-চরা ধেনু এরা ভিড় করেছে ফুলে ফলে।।

গানটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। মাত্র চার পঙ্‌ক্তিতেই ভাবনার যে অভিনবত্ব এবং Cosmic imagination ধরা হয়েছে তার আবেদন সম্পূর্ণ বিষয়গত।

এবারে দেখা যেতে পারে অন্য একটি গানে ভিন্নতর গহনতা এবং বিষয়কে ভেদ করে স্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টির কৌশল, যার প্রত্যক্ষ বিষয়ভূমি নিসর্গ অথচ পরোক্ষে যা জীবন ও জগতের সৃজনছন্দকে ধরে দারুণ দক্ষতায়—

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখের 'পরে নাচে।।
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে ওই দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখো তালবনের ওই গাছে গাছে।।
ওরে, সেই আগুনের পুলক ফুটে কদম্ববন রাঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ আমার গানের পাখার পাছে।।

এবারে দেখা যেতে পারে একটি প্রেমের গান যার গূঢ়ার্থে পূজার সংকেতও দেখেন কেউ কেউ—নিছক বিষয়ের অভিনবত্বে ও বাচনে যা আমাদের চমকে দেয়—

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই।
ওগো ভিখারি আমার ভিখারি, চলেছ কী কাতর গান গাই।।

যে-কাঙাল নিজেকে কাঙাল করেছে অন্যের প্রেমে, সেই আবার অন্যকেও করেছে তার প্রেমের কাঙাল—এ গানে তার আর্তি নিজের নিঃস্বতায়। নিজেকে নিঃশেষে দান করার পর আরও দিতে না পারার সন্তাপ তার মনে। তাই সবশেষে বিনতি তার—

হেরো মম প্রাণ যৌবন নব করপুটতলে পড়ে আছে তব—
ভিখারি আমার ভিখারি,
হায়, আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব তাই।

এখানে ভিখারি কে? যে আরও চাইছে, না যার কিছু নেই? প্রেমের এমন বিষয়গত সূক্ষ্ম অনুধাবন আমরা কখনো গানে দেখিনি। এখানে বলার কথাটা কি এই যে, প্রেম কেবলই ভরায় আর কেবলই নিঃস্ব করে?

দেখা যেতে পারে আরও একধরনের গান যার চলন আদৌ কাব্যিক, যার গঠন সুরকে ভৃত্যের মতো আজ্ঞাবহ করে টেনে নিয়ে যেতে পারে—

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা,
জাগায় দেহে মনে একি বিপুল ব্যথা।।
বহে মম শিরে শিরে একি দাহ, কী প্রবাহ,
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা।।
ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়
দুরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে দিগন্তে কাহার পানে—
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে নাহি নাহি কথা।।

এ-গান বিষয়গত দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতে খুব নতুন মাত্রার। নারীর যৌবন সম্ভার আর প্রেমকাতর অন্তর নিসর্গের উপমায় কেমন করে জেগে ওঠে দাহে প্রবাহে তার ক্ষুব্ধ রুদ্ধ কল্লোলমুখর বিস্ফার অথচ শেষ পর্যন্ত কথাহীন ইঙ্গিত রহস্য এমন করে বাংলা গানে আমরা শুনিনি।

রবীন্দ্রনাথের আরেক গোত্রের বিষয়মুখী গান আছে যার মধ্যে ধরা রয়েছে জীবন বিবর্তনের স্মৃতির আভাস। 'কবে আমি বাহির হলেম' গানে 'সে তো আজকে নয়' সংকেতে বিশ্বে জীবন-পরম্পরায় আশ্চর্য ভাষণ আছে। 'কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে' গানে প্রতিবছরের বৃষ্টিসজলতা সম্পর্কে হঠাৎ সঞ্চারীতে বেজে ওঠে একটা নতুন কথা—

ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা,
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা—

জীবনের জড়তার বন্ধ্যত্বের বিরুদ্ধে প্রাণের সংগ্রাম— তার সুদীর্ঘ পরম্পরা— এ গানে বিষয়গত ভাবান্তর এনেছে। এমনই করে রবীন্দ্রসৃজনে বিষয়ের পর্বান্তরে ভাবনা পালটায়। একেবারে অভাবিত কোনো প্রসঙ্গ গানকে টেনে তোলে নতুন অভিজ্ঞতায়। যেমন এইবারে আলোচ্য গান যা শুরু হয়েছে খুব সাদামাটা উচ্চারণে যে,

আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।।

আকাশের মনের কথা ঝরে পড়া— অলংকার হিসাবে অভিনব, তবে রবীন্দ্রগীতির পক্ষে খুব চমকপ্রদ নয়। কিন্তু হঠাৎ অন্তরাতে নতুন বিষয় ঝলকে ওঠে—

দীঘির কালো জলের 'পরে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে।
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।।

ভাবনার অভিনবত্ব এখানে যে, বর্ষার মেঘের কালো ছায়া যখন দিঘির কালো জলে সন্নত হয় তখন অকস্মাৎ বাতাসে বয়ে আসে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা। এরপরেই সারা প্রহরের ব্যাপ্তিতে সেই বেদনা সঞ্চারিত হয়ে গানটি অনেক বড় বাতাবরণ গড়ে তোলে। এ সব গানের মহিমা বুঝতে গেলে Thematic

transformation-এর ব্যাপারটি বুঝতে হবে। এখানে সুর বড় নয়।

আরেক আশ্চর্য যে. রবীন্দ্রনাথের গীতিভাবনার কোনো কোনো অনুকণার সঙ্গে চমৎকার মিল পাওয়া যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির রচনার। 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল' গানে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সীমাবদ্ধতার ('রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল') পাশে নিজ সৃষ্টির অমরতার গৌরব করেছেন এইভাবে :

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান।

নিজের রচনার অমরতার বিষয়ে এই গর্বোক্তি শেকস্‌পিয়ারের সনেটেও কেমন অবিরলভাবে লভ্য (বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য *রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ* : গৌরাপ্রসাদ ঘোষ [পৃ. ১০৭]) তার অনেক নমুনার একটি :—

Not marble nor the glided monuments
Of princes shall outline this powerful rhyme.

খোঁজ করলে হয়তো, রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয় ও ভাবনার এমনই অনেক আন্তর্জাতিক সংরাগ মিলবে।

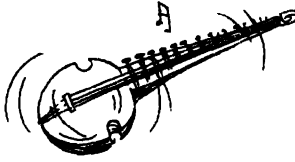
এ লেখার শেষ বাক্যটি ব্যবহারের আগে প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত গানে ফিরতে চাই আমি। 'আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই'— এই ভেবে না-পাওয়ার প্রসঙ্গ অনেকগুলি ভাবনার আভা জাগায়। বর্ষার অন্তর্বাষ্পবহুল দিনের মুখরতায় কী গানই বা গাইতে পারে মানুষ? সে গান কি আজও লেখা হয়েছে? গান গাওয়ার এই আকুতিময় অন্বেষণ নিয়ে আরেক গানে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

কি যে গান গাহিতে চাই
বাণী মোর খুঁজে না পাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো সফল মুখর গীতিকার সবশেষে কথার চেয়ে নিষ্কথার দিকে ঝোঁকেন, স্থির বিষয় থেকে বিষয়হীনতার দিকে। প্রায় আশি বছর বয়সে লেখা তাঁর গীতিসত্তা স্বীকার করেছে :

বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি
*   *   *
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমাকে দিই ফিরায়ে

এ কেবল মুখর কবির নীরবতা নয়— এ গানের পর বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকার হয়তো আমাদের নিয়ে যেতে পারতেন গানের বিষয়গত গভীরতার অন্তঃস্তলে। কিন্তু রোগ তাঁকে পরাস্ত করল, করুণ রঙিন পথে ঘনিয়ে নিয়ে এল মৃত্যুরাজার রথ।



সে-আগুন ছড়িয়ে গেল

রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, তাঁর রচিত গান চিরকালীনতার মহিমায় সম্পূর্ণ। এডওয়ার্ড টমসনকে জানিয়েছিলেন তাঁর গান আসলে তাঁর কাব্যপ্রবাহের সমান্তরাল বিকাশ। এও জানিয়েছিলেন 'if all my poetry is forgotten, my songs will live with my countrymen and have a permanent place'। সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাও তাঁর ছিল, 'it is nonsense to say that music is a universal language. I should like my music to find acceptance, but I know this cannot be' এবং রবীন্দ্রসংগীত 'will not be known outside my province'। স্বস্তির কথা, তাঁর এ-সব আশঙ্কিত ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হয়নি। কবিদের বলা হয় ক্রান্তদর্শী, কিন্তু সম্ভবত সেটা তাঁর নিজের সৃষ্টিবিষয়ে নয়। কারণ এটা তো আজ প্রত্যক্ষ যে রবীন্দ্রপ্রয়াণের অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রসজ্ঞ ও বিচারশীল মানুষের কাছে রবীন্দ্রসংগীত তার স্বকীয় মূল্যে প্রতিষ্ঠিত ও সত্য। তাকে 'a parallel growth to my poetry' বলে তাঁর নিজের মনে হলেও, আমরা ভিন্নরকম ভাবতে পারি, ভাবি। ভাবতে চাই তাঁর গানকে এক স্বতন্ত্র স্বয়ম্বশ প্রবল ও অতুলনীয় উদ্‌গীরণরূপে। এই সেই পবিত্র ও ব্যক্তিগত অগ্নি, যা ছড়িয়ে গেল সবখানে—দেশকালের বেড়া টপকে, ভাষার আড়াল ভেঙে, প্রাদেশিকতার সীমা পেরিয়ে। এ কথা আজ বলার দিন এসেছে : রবীন্দ্রসংগীত সব অর্থে এক মৌলিক শিল্পমাধ্যম— পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো ভাষার কোনো স্রষ্টার রচনায় বাণী ও সুরের এমন সুষম, সমঞ্জস, শোভন রসরূপ নেই। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য শুবার্ট, হুগো উলফ্ বা রবার্ট বার্নস্-এর প্রসঙ্গ ও প্রতিতুলনা এনে ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা প্রকাশের প্রয়োজন নেই। আমাদের হাজার বছরের বাংলা সারস্বত সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল রবীন্দ্রসংগীত এবং বাংলা সংস্কৃতির সর্বোজ্জ্বল প্রতিনিধি। সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে, রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে এমনতর বোধোদয় ও নিশ্চিতি গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে। কারণ সত্যি সত্যি একাকী গায়কের নহে তো গান। তার উন্মোচন ও ব্যাপ্তির জন্য লাগে ধারাবাহিক গায়ন ও শিল্পীদের নিষ্ঠ প্রয়াস, লাগে উন্মুখ ও রুচিমান শ্রোতাদের ক্রমোন্নত রসবোধের পরম্পরা। সেইসঙ্গে থাকা দরকার শিক্ষা ও রবীন্দ্রদীক্ষা,

পরিবেশ ও মানসভূমি। সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত প্রচারমাধ্যম, ধ্বনিপ্রক্ষেপের সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিন কৌশল, যন্ত্রানুষঙ্গ ভাবনার ও সংগতের ব্যাপারে নতুন চিন্তাও জরুরি। গত পঞ্চাশ বছর এ-সব হয়ে চলেছে নানাভাবে, নানা নেপথ্যবিন্যাসে। তার ফলে, আজ, এত দিন পরে, আমরা বুক বাজিয়ে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে স্রষ্টার অনুমান সত্য হয়নি। তাঁর স্বভূমি আর স্বভাষার আড়াল ডিঙিয়ে রবীন্দ্রসংগীত এখন ভিন্ন রাজ্যে, ভিন্ন দেশে এমনকি ভিন্ন ভাষাভাষীদের কাছে সমাদৃত ও চলমান। শুধু অনুবাদে আর পঠনীয়তায় নয়, গায়নে আর অনুভবেও। গানের যে একটি সর্ববোধগম্য বিশ্বভাষা আছে তা মানেন নি রবীন্দ্রনাথ তার কারণ সে তো কেবল সুরময় নয়, তাতে বাণীলাবণ্যের একটা আলাদা অন্তর্দীপ্তি আছে। সেই বাণী— এ কী গভীর বাণী— যা নাকি স্বভাষার মানুষের পক্ষে এক অনন্যকল্পিত উপার্জন। এমন গান আমরা আগে শুনিনি। বাংলা গানের পরম্পরায় রবীন্দ্রসংগীতের মতো কোনো নিজে নিজে গড়ে-ওঠা গানের ধরন বা ধারণা নেই। হয়তো গানের প্রচলিত ও পরিচিত পরিধির বাইরে এই সংজ্ঞা খুঁজতে হবে। এর কোনো জাত নেই।

সেই অচেনাকেই চিনে চিনে, দিনে দিনে বাড়ল আমাদের দেশ। বাঙালির প্রতিক্ষণের পরিম্লান পরাজিত যাপনের পাংশু দৈনন্দিনে রবীন্দ্রনাথের গান শুশ্রূষার মতো— স্বপ্ন ও উজ্জীবনের আলো তার মধ্যে দীপ্র হয়ে আছে। আমাদের উৎসবে, আনন্দে, সমন্বয়ে ও সংকটে এই গানের সঙ্গ যেন সুন্দরের অনিবার্য অভিবন্দনা। আবার নিঃসঙ্গ আত্মরিক্ত জীবনে এ-গান নির্জন ক্ষরণের তাপে উষ্ণ। নানা উপলক্ষে ও লক্ষ্যে রবীন্দ্রসংগীতের সাহচর্য আমাদের দিশা। সেই কথাটা স্পষ্ট হয় বাংলাদেশের গায়িকা সন্‌জীদা খাতুনের মন্তব্যে যে 'জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আপনার দিকে ফিরে তাকাবার কালে, সমগ্র জাতিসত্তার ঐক্যবদ্ধ জাগরণের দিনে রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালিকে গাইতেই হয়।'

তার কারণ রবীন্দ্রসংগীত তো কোনো অর্থেই আত্মসর্বস্ব নয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সেই গান তার প্রবল প্রাণবেগে বেরিয়ে এসেছিল জোড়াসাঁকোর শুদ্ধান্তঃপুর থেকে উদ্দীপ্ত জনতার সরণিতে। আবার দেখি, পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বঙ্গভাষাভাষীদের শস্ত্র ছিল রবীন্দ্রসংগীত। তাঁদের সেই পবিত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে, ১৯৭১ সালে, মুক্তিযোদ্ধাদের অবলম্বন ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানগুলি। আবু জাফর শাসসুদ্দিন লিখেছেন : 'স্মরণীয় যে, স্বাধীনতার যুদ্ধকালে যে রবীন্দ্রসংগীতটি ছিল আমাদের প্রেরণা, স্বাধীনতা অর্জনের পর সেটিই হয়েছে আমাদের জাতীয় সংগীত।'

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' প্রসঙ্গে এই উক্তির সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'-র দ্বিরায়তনিক মর্যাদার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক। এ-গান আমাদের জাতীয় সংহতিবোধকে একদা সংগঠিত করেছিল পরাধীন দেশে, আজকেও এর তাৎপর্য রয়ে গেছে বিপন্ন সংহতির সংশয়ী দিনে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের গান কেবল তাঁর বা বিশ্বভারতীর মধ্যে সীমায়ত থাকে না— একদিকে যেমন রাজ্য ও আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে সব মানুষের সামগ্রী হয়ে ওঠে আর-এক দিকে তেমনই আবিষ্কৃত হয় নির্জন একক কণ্ঠের সংগীতরূপে। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি গাইতে গাইতে আমাদের এক ব্রতী স্বদেশসেবী ফাঁসির মঞ্চে নির্ভীকভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এই তথ্য প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রসংগীতের বিনোদন বা শিল্পকর্মের গভীরে রয়ে গেছে কোনো সত্য। এমনকি দেশব্রতীর একাগ্র স্বপ্নে সে-গান জড়িত।

রবীন্দ্রসংগীতের এই রকম দ্বিমুখী তাৎপর্য বা দ্বিরায়তনিক স্বতন্ত্র রূপ অন্যভাবেও দেখা যায়, অন্য

একটা গান দিয়ে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' গানটি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় লিখেছিলেন। এর মর্মের কথা হল, স্বদেশদীক্ষার কঠিন লক্ষ্যে, আত্মোৎসর্জনের একাগ্র আবেগে যদি সবাই না আসে, যদি সবাই ফিরে যায়, যদি ভয়ে দুয়ার রুদ্ধ করে, তবে ঝড়বাদলে নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একলা চলতে হয় আদর্শবাদী দেশপ্রেমীকে। এ কথাগুলি এমন করে এ দেশের কোনো গানে কোনোদিন কেউ শোনেনি। তাই প্রদেশ আর ভাষার গণ্ডি ভেঙে এ গানের সত্য স্পর্শ করেছিল মহাত্মা গাঁধিকে। অহিংস সত্যাগ্রহী একক সেই মানুষ বারেবারেই শুনতে চাইতেন গানটি। কিন্তু সহিংস বিপ্লবপন্থী গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভালো লাগত এই বিশেষ গানটি গাইতে। কেন ভালো লাগত? হেমাঙ্গ বিশ্বাস মনে করতেন হয়তো তার সহজ-সরল আবেগমুখর কথাগুলির জন্য না কি অপরূপ সুরমাধুর্যের জন্য? 'যে সুরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে মাটির সোঁদা গন্ধ, বাংলার বাতাসের আশ্চর্য সজীবতা।' এ ছাড়া ছিল কথারও একটা আলাদা টান। বুঝতে পেরেছিলেন গানের মধ্যে বলা হয়েছে 'যিনি সত্যের পূজারি তাঁকে সত্যের সপক্ষে বহু সময়ই একলা দাঁড়াতে হয়, বহুবার তাঁকে পরাণ খুলে মনের কথা একলাই বলতে হয়।' অথচ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা থেকেই জানতে পারি :

> ১৯৪২-৪৩ নাগাদ এই গানটি নিয়েই পার্টি অফিসে বিরাট আলোচনার ঝড় উঠেছিল। একজন নেতৃস্থানীয় পার্টিকর্মী বললেন, 'আমাদের কর্মপন্থা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমরা জনগণকে নিয়ে চলতে চাই। যদি কেউ না আসে এরকম ব্যাপার ঘটলে বুঝতে হবে আমাদের ভুল হচ্ছে এবং ভুলটি হচ্ছে হয় আপনাদের নীতিতে নয়তো আমাদের কর্মপন্থাতে।' তখন বুঝেছিলাম কথাটি সাংঘাতিক।...
>
> আমি যখন প্রথম চিনে যাই তখন কুনসিং শহরের (ইউনান) এক কমরেডের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাগুলি উঠেছিল। ওখানকার সাংস্কৃতিক ব্যুরোর সভাপতি তিনি। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো রবীন্দ্রনাথের গান জানি না, তবে তোমার কথায় মনে হচ্ছে গানটির বক্তব্য ঠিকই। যুগে যুগে যাঁরাই সত্যের সপক্ষে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের কি সময় সময় একাকী দাঁড়াতে হয় না? সেদিক থেকে তো মনে হয়, গানটি ঠিকই আছে।'

এইভাবেই আমাদের কাছে উন্মোচিত হয় রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতরকার সত্য— যা বহুমাত্রিক এবং দেশ-কাল ও তত্ত্বের ঊর্ধ্বে। তাকে ব্যক্তিগতভাবে আস্বাদন করা যায় আত্মসংকটে বা আত্মত্রাণে, আবার সম্মেলক জীবনের সারাৎসাররূপে। সেই অর্থে রবীন্দ্রসংগীত বিশ্বজনীন এবং চেতনাসম্পন্ন সকল মুক্তমনা মানুষের অন্তরের সামগ্রী। কিন্তু এ-সব ব্যাপ্তি ও গভীরতার বার্তা তাঁর জীবিতকালে সকলের কাছে এসে পৌঁছায়নি। তখন হয়তো বা আবদ্ধ ছিল বিনোদনে। কোনো সভাসমিতিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিতে বা প্রবন্ধ পাঠ করতে গেলে অনিবারণীয়ভাবে শ্রোতারা সবশেষে বলে উঠতেন, 'রবিবাবু একটা গান' এবং পকেট থেকে ছোট নোটবই বার করে তিনি গাইতেনও, সে কি তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য শুধু? বোধহয় নয়। তিনি একান্তভাবে চাইতেন রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার, চাইতেন ধীমান শ্রোতাদের প্রশ্রয়, কারণ তাঁর জানা ছিল তাঁর গানে রয়েছে নানা রূপরসের সঞ্চয়— তাঁর মানসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ উচ্ছ্বাস। কিন্তু তা যথার্থভাবে, দরদ দিয়ে মীড় দিয়ে গাইবার মতো সংখ্যায় বেশি শিল্পী ছিল না তেমন। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের সম্ভ্রান্ত কটি নারীকণ্ঠ এবং দিনেন্দ্রনাথ আর ব্রাহ্মসমাজের কিছু অনুকম্পায়ী গায়কের গায়নে চুঁইয়ে পড়ত তাঁর গান। এ ছাড়া ছিল শান্তিনিকেতন তার অজস্রতা নিয়ে, কিন্তু তখন সেই আশ্রম তো সব অর্থেই ছিল সুদূর ও সন্দেহজনক। কাজেই নির্জনে গড়ে তোলা তাঁর গানগুলি

রুদ্ধকমলের মতো ভিতরের তাপে কম্পিত হত শুধু। তার অবারিত স্বতোচ্ছল সুরের ধারোষ্ণ আবেগ মাটির কলস ছাপিয়ে উপচিত হতে পারত কই? তিনি তাই কেবলই গাইতেন আর গাওয়াতেন তাঁর গান।

রবীন্দ্রনাথের গান রচনার অভিজ্ঞতা ও উপলক্ষ ছিল বিচিত্র ধরনের। জ্যোতিদাদার পিয়ানোর সুরে বাণীবয়ন দিয়ে যে-শিক্ষানবিশির সূচনা তা বাঁক নেয় নিজের বাণীর সন্ধানে। কিন্তু তার সন্ধান পেতে তাঁকে পার হতে হয় গীতিনাট্যের গান রচনার পর্ব এবং ব্রহ্মসংগীত রচনার তদ্‌গত গভীরতা। দুই অভিজ্ঞতা দুই রকমের। প্রথমটায় ধরতে হয় গানের নাটক তার তরল তরঙ্গিত সুরের ত্বরায় আর দ্বিতীয়টার গানকে ধরেন অন্বর তালে-তানে, গাম্ভীর্যে ও রাগের বুনটে। এরপরে আসে স্বদেশ পর্যায় এবং পূজা-প্রেমের দোলাচলের গান। তার মধ্যে কখন অগোচরে গানের সুরের আসনখানিতে আশ্রয় নেয় ঋতুপরম্পরিত বাংলার নিসর্গ। তবু প্রথম দিকের রবীন্দ্রগানের বোদ্ধা যাঁরা—সেই অজিতকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ বা দিনেন্দ্রনাথের লেখনীতে রবীন্দ্রসংগীতের অন্তর্বর্তী আধ্যাত্মিকতা অনেকটা বড় জায়গা নেয়। গীতিময় বিগ্রহের আড়ালে তাঁর সাধক সত্তার উঁকিঝুঁকি খোঁজা স্বাভাবিক সে সময়ে। *গীতাঞ্জলি* এবং গীতাখ্য অন্য দুটি সংকলনে ভক্ত-ভগবান তত্ত্ব নিয়ে গানের খোঁজ করলেন যাঁরা তাঁদের কি চোখ এড়িয়ে গেল তাঁর গানের নিগূঢ় আড়াল? গানের ভিতর দিয়ে দেখা রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব যে কতখানি অন্য রকম তা তখনো সর্বাংশে ধরা পড়েনি। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। সে অপেক্ষা ছিল গায়নের সফলতার উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু সে পরিমাণ যোগ্য শিক্ষক ও দক্ষ শিল্পী তখন কই? তাঁর গানের সুরকারুর নিজস্বতা তখনও ছিল অনাবিষ্কৃত।

আর একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসে। আজ যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে ও যাপনে রবীন্দ্রনাথের গানের স্থান সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট, আগে তা ছিল না। এখন শিল্পীরা গান নির্বাচনে সতর্ক ও অধ্যবসায়ী, উদ্যোক্তারাও বেশ সচেতন। বছরব্যাপী নানা রবীন্দ্রগীতানুষ্ঠানে গানের বিষয়গত নানা বিন্যাস ও পরিবেশন চোখে পড়ে। তাঁর ভাঙা গান, স্বদেশি গান, বিদেশি সুরে বোনা গান, বর্ষার গান, আরাধনার গান—এইভাবে গানের সম্পুট ভরে নেওয়া আজকাল কতই দেখা যায়। কিন্তু এমন উদ্যমের সূচনা যখন ঘটেনি, আর পাঁচটা বাংলা গানের মতো যখন রেকর্ডে বার হত রবি ঠাকুরের গান বা রবিবাবুর গান, তখন তার আভিজাত্য বা ভিন্ন জাতগোত্রের স্বাতন্ত্র্য কেই বা বুঝতেন? সে-সব গান রেকর্ডে যাঁরা গাইতেন তাঁদের অনেকেরই রবীন্দ্রদীক্ষা ছিল না, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার যে শিক্ষা বা প্রস্তুতি তাও ছিল না। এইরকম পরিকল্পনাহীন এলোমেলো সময়ে তাঁর গানকে যিনি যেমন করে নিয়েছেন তা অপ্রতিবাদে গৃহীত হয়েছে। এমনতর একটি গান 'অমলধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'। গীতাঞ্জলি পর্বের এই গানটি সম্পর্কে বাঙালি বিপ্লববাদীদের অন্যরকম ধারণা ছিল। নলিনীকিশোর গুহ তাঁর বাংলার বিপ্লববাদ বইতে জানিয়েছেন তখনকার বিপ্লবীরা মনে করতেন নবীন বাংলার 'নূতন বিপ্লবপথের যাত্রাকে লক্ষ্য করে' কবি এই গান রচনা করেছেন। ব্যাখ্যা করে নলিনীকিশোর বোঝান, 'এমনটি এ দেশে আর হয় নাই, একেবারেই নূতন তাই কবি লিখিয়াছেন, "দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া।" নব ভাব কোথা হইতে কোন্ সুদূরসাগর পার হইতে আনিল? কবিরও ইচ্ছা যায়, কূল ছাড়িয়া এই নব অভিযানে যোগ দিতে—

কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন।'

এখানে সেই দ্বন্দ্বের জট রয়েছে— অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় আর শ্রোতাদের ব্যাখ্যা। এইভাবে তাঁর অনেক গান একটা সময়ে অন্য তাৎপর্যে, যা মূলত থিমেটিক, গৃহীত ও জনপ্রিয় হয়েছে। গানের সুর তাল লয় বা গায়নরীতি সে ক্ষেত্রে গৌণ হয়ে গেছে। ধরা পড়েনি রবীন্দ্রসংগীতের চারতুকের গঠন স্বাতন্ত্র্য, সঞ্চারীর নিগূঢ় দ্যোতনা, রাগমিশ্রণের শাস্ত্র-না মানা সংগঠন, গানের ভাবের অনুষঙ্গ ও শব্দের সৌজাত্য বোঝাতে সুরারোপের কৌশল। তিনি যে তাঁর গানে রাগবিস্তার বা তানালাপের কোনো ফাঁক রাখেননি, শিল্পীর নিজস্ব কণ্ঠবাদনের অলংকরণ যে সেই গানে অনাকাঙ্ক্ষিত তা বুঝতে সময় লেগেছে, বিতর্কও হয়েছে। অথচ খুব নিভৃতভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর গায়নের নিজস্ব মানুষগুলি, রুচি আর শীলতার সাযুজ্যে। প্রতিটি গান ধরে রাখা হচ্ছিল সতর্ক স্বরলিপিতে। নিজের গান সম্পর্কে এই শ্রদ্ধা ও মমতা, পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে তা সুরে-তালে-লয়ে সংরক্ষণের আকুতি বাংলা গানের ইতিহাসে খুব অন্যরকম। তাঁর আগে ও সমকালে গান সংরক্ষণের উৎকণ্ঠা বা দায়বোধ দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ বা নজরুলের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। তাঁদের যেমন সংগঠন ছিল না বিশ্বভারতীর মতো, তেমনই নিবেদিত ভক্ত-শিষ্যও ছিল না দিনেন্দ্রনাথ-ইন্দিরা-ভীমরাও শাস্ত্রী-অনাদিকুমার দস্তিদার-শৈলজারঞ্জন-শান্তিদেবের মতো। গানের প্রচার প্রসারে, সঠিক গায়নে ও শিক্ষকতায়, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধরনের শিল্পী গড়ে তোলায় তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নিঃস্বার্থভাবে এ-সব কাজ যে করে গেছেন তাঁরা তার সবচেয়ে বড় কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্ব, তাঁর আশ্রমিক জীবনের অনুপ্রেরণা, সৃষ্টিশীল নানা ঘটনার অনবদ্য উন্মাদনা। এ-সব অনুরাগীদের প্রতিদিনের যাপনে, গানে নাট্যে পরিহাসে ও আসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দীপ্যমান মানুষ। তাঁর উপস্থিতি, স্বীকৃতি আর সমাদরে সবাই পেতেন ধন্যতার স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে তাঁদের সত্যিই মনে হত 'ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন'। দ্বিগুণ আবেগে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন ব্রতীদের মতো, রবীন্দ্রনাথের গান শেখানো, গাওয়া আর প্রচারের কাজে। তাঁদের পক্ষে একটা আনুকূল্যও ছিল সময়ের বা যুগের। সেই সময়টা ছিল গ্রহণ ও দানের পুণ্যে সুন্দর। এখনকার মতো সব-কিছুতে বাণিজ্যিকতার ছাপ লাগেনি তখন, গান হয়নি বিপণনের বস্তু, তার কোনো বিনিময়মূল্য নির্ধারিত হয়নি। রেডিয়ো-রেকর্ড-সিনেমা ও টিভির সম্প্রচার তখন সুদূর।

তারপরেই পট পাল্টে গেল এই শতাব্দীর প্রথম দশকের পরে, যখন রেকর্ড বেরোল রবীন্দ্রনাথের গানের। তখনো তার জনপ্রিয়তা আসেনি, শিল্পীরাও ছিলেন না নির্ভরযোগ্য। ক্রমে শুরু হল রেডিয়োর প্রচারতরঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সংকুচিত পদক্ষেপ। কিন্তু সত্যিকারের অভিঘাত এল তিরিশের দশকে চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রগীতের প্রয়োগ থেকে। পঙ্কজ মল্লিক, কাননদেবী ও সায়গলের কণ্ঠে ছায়াছবিতে রবীন্দ্রসংগীত সারা দেশে অভূতপূর্ব উন্মাদনা নিয়ে আসে। লক্ষণীয় যে, এ-সব অদীক্ষিত শিল্পীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান কিন্তু নতুন এক পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল, কারণ এঁরা তিনজনই ছিলেন উচ্চশ্রেণির পারফরমার বা জাতশিল্পী। এঁদের গায়নে হয়তো রবীন্দ্রগানের স্বরপ্রয়োগের নিখুঁত শুদ্ধতা ছিল না কিন্তু প্রাণ ছিল। সেই কারণে এই প্রথম তাঁর গান প্রেক্ষাগৃহের সীমা পেরিয়ে উঠে এল বাঙালির কণ্ঠে ও ঘরে। রেকর্ডে ধ্বনিবদ্ধ চলচ্চিত্রের গানগুলি ঘরে ঘরে সমাদৃত হল এবং এই প্রথম জেগে উঠল রবীন্দ্রসংগীতের বিপণন সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ উদার মনে এই সব পারফরমারদের তাঁর গান গাইবার অনুমতি দিলেন— কারণ তাঁর তখনকার একতম লক্ষ্য ছিল নম্র, সংবৃত আর অন্তঃপুরআশ্রয়ী কিংবা ব্রহ্মোপসনার বেদি থেকে রবীন্দ্রসংগীতের মুক্তি—উন্মুখ শ্রোতাদের কাছে।

গানের মুক্তি দুভাবে হতে পারে। প্রথমটা স্রষ্টার হাতে অর্থাৎ চিরাচরিত গান নির্মাণের যে-কৌশল বা পদ্ধতি তাকে লঙ্ঘন করে নতুন বন্দিশ এনে। সে কাজটা রবীন্দ্রনাথ সুষ্ঠুভাবে করেছিলেন বাণী

ও সুরের সুষম যৌগে ও লাবণ্যে। এর পরের যে মুক্তি তা গায়ননির্ভর। যে বিশেষ গান তিনি সৃষ্টি করলেন তা যথার্থভাবে গাওয়ানো দরকার, কারণ এ-জাতীয় গান গাইবার কোনো পূর্ব সংস্কার এদেশে কারোর ছিল না। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজে গাইতে পারতেন তাই কেমন করে গাইতে হবে তাঁর গান সেটা গেয়ে বোঝাতে পেরেছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ কিংবা ইন্দিরা সেই ধরনটি আয়ত্ত করেছিলেন। সাহানা দেবীর কণ্ঠে নিজের গান শুনে রবীন্দ্রনাথ অন্য একটা রসলোকের সন্ধান পেতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে গড়ে উঠল রবীন্দ্রসংগীত শুদ্ধভাবে গাইবার মতো শিল্পী, তাঁরা কেউ আশ্রমকন্যা, কেউ বা কলকাতার কিন্তু রবীন্দ্রবৃত্তের। নুটু কিংবা সাহানা কিংবা বিবি ছাড়াও সতী দেবী, কনক দাস, মালতী ঘোষাল, অমলা দাশ বা চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত। দিনেন্দ্রনাথ ছাড়া তেমন পুরুষকণ্ঠ, দীক্ষিত পুরুষকণ্ঠ, তখনো তেমনভাবে আসেনি। হঠাৎ চলচ্চিত্র সূত্রে এসে গেলেন পঙ্কজ ও সায়গল— ফলে এসে গেল রবীন্দ্রসংগীতের আর এক রকম মুক্তি। দিনেন্দ্রনাথের পরে অনাদিকুমার দস্তিদার রবীন্দ্রনাথের গান শেখানোর কাজে হলেন তৎপর। সন্তোষ সেনগুপ্ত এক জায়গায় দুটি দ্যোতক মন্তব্য করেছেন এ প্রসঙ্গে। যেমন— 'পঙ্কজ মল্লিক অহেতুক নমনীয়তা ও কমনীয়তা থেকে রবীন্দ্রনাথকে মুক্তি দিয়েছিলেন' এবং অনাদি দস্তিতার বিষয়ে 'রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারের ব্যাপারে তাঁর কোনরকম গোঁড়ামি ছিল না।... স্বরলিপি নিয়ে চুলচেরা বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, বা সামান্য ভুলত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।' সে সময়ে সেইটাই প্রয়োজন ছিল হয়তো। পরবর্তীকালে প্রয়োজনেই রাশ টেনে ধরেন শৈলজারঞ্জন। গান পরিবেশনে শুদ্ধতা ও যাথাতথ্যের প্রশ্ন এবারে উঠল তার কারণ ততদিনে একদল দক্ষ গায়ক-গায়িকা আর প্রশিক্ষক তৈরি হয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের প্রয়াসে এবং কলকাতার কয়েকটি সংগীত প্রতিষ্ঠানে।

রবীন্দ্রপ্রয়াণের পরের বছরে প্রতিষ্ঠিত হয় গীতবিতান (১৯৪২), তারপরে রবিতীর্থ (১৯৪৬), দক্ষিণী (১৯৪৮), সুরঙ্গমা (১৯৫৭), ও ইন্দিরা (১৯৬৬)। শৈলজারঞ্জন, শুভ গুহঠাকুরতা, নীহারবিন্দু সেন, সমরেশ চৌধুরি, সুবিনয় রায়, প্রফুল্লকুমার দাস, দ্বিজেন চৌধুরি, সুনীল রায়, সুভাষ চৌধুরি এ-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারণযোগ্য নাম এবং এদেশের রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সুনামসম্পন্ন এমন কেউ নেই যাঁরা এদের কারও কাছে কোনো-না কোনোভাবে তালিম নেননি। সুচিত্রা-কণিকা-নীলিমা-রাজেশ্বরী-সুবিনয়-অশোকতরু-মায়া-অর্ঘ্য-কমলা বসু-গীতা সেন-ঋতু গুহ গড়ে উঠেছেন নানা অভিজ্ঞতায়, ভরে উঠেছে তাঁদের গানের সঞ্চয়। পরবর্তীকালে, ১৯৬১ সালে, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষকে ঘিরে এদেশে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ও পরিধির যে বিস্ফোরণ ঘটে, মনে রাখা উচিত তার সার্বিক দায় ও চাহিদা মিটিয়েছেন এই সব শিল্পী অত্যন্ত যোগ্যতা আর সামর্থ্যের সঙ্গে। পঙ্কজ-কানন-সায়গল-সাহানা ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গায়নের পরে এঁরা এনেছেন যুগান্তর। জনপ্রিয়তা শব্দটি রবীন্দ্রসংগীত অর্জন করেছে এই সব নিবেদিত শিল্পীদের পরিশ্রমে, শিক্ষণে, অনুশীলনে ও গায়নে। সেইসঙ্গে যুক্ত হবে দেবব্রত বিশ্বাসের নাম। এমনতর তালিকা প্রণয়নের সময়ে আমাদের মনে থাকে না ১৯৪৭ সালে জাতাপুর্ব পাকিস্তানের কথা। সেখানে পরম মমতায় রবীন্দ্রনাথের গানকে যাঁরা ঝড়ঝাপটার মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুল আহাদ, হামিদুল হক, কলিম শরাফি, ওয়াহিদুল হক ও সনজীদা খাতুনের নাম মনে রাখা উচিত। সুদূর দিল্লিতে সুধীর চন্দ এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের প্রয়াসও মনে পড়ে।

এত সব গুণী মানুষের জীবনব্যাপী শ্রম ও আত্মোৎসর্গ, কেবল রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধতা রক্ষা আর প্রচার কামনার জন্য কেন? দ্বিজেন্দ্রগীতি বা নজরুলগীতির জন্য তো এমন নিবেদিত মানুষ দেখা যায়নি? আসলে রবীন্দ্রনাথের মতো হিরণ্যব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ, শান্তিনিকেতনের রসরুচি, রবীন্দ্রসংস্কৃতির শতকান্তি

বিচ্ছুরণ যে-কোনো আদর্শকামী ব্যক্তির সারাজীবনের দিশা ও আশ্রয়স্থল হতে পারে। তা ছাড়া গান হিসেবেও রবীন্দ্রসংগীত এত পূর্ণাঙ্গ ও বিচিত্র, এমন অন্তর্দ্যুতিময় ও ব্যঞ্জনাবহুল, ঔপলক্ষিক অথচ চিরকালীন, গান হয়েও উৎকৃষ্ট কাব্য যে তার নিজস্ব একটা টান আছে। বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত চর্চাকারীদের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য ব্যক্তি প্রবীণ ওয়াহিদুল হক বলেছেন :

এই সংগীতের কাব্য এবং সুরছন্দ একে অপরে লতিয়ে উঠে যে কেবল স্বর্গলোকের চাবি কাড়ে তা নয়, মর্ত্যজীবনমন্থন অস্তিত্বে এক অমৃতনিষ্যন্দী নবমাত্রা যোগ করে তা। এবং এ সংগীত নিঃসন্দেহে বাঙালির কয়েক হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন মানসসাধনা ও সংস্কৃতিনির্মাণ ইতিহাসের জীবন্ত শ্রেষ্ঠ ফসল। কিন্তু ফসল শব্দে পিছনে শ্রমপ্রয়াস নিরন্তর যত্ন এবং পরে ভোগের জন্য প্রস্তুত সার্থকতার যে আবহ আনে রবীন্দ্রসংগীত যেন সেইমতো করে জীবনধারক নয়। এও নির্মিত হয়েছে, বরং নির্মাণের মাত্রা ছড়িয়ে 'সৃজিত' হয়েছে, অর্থাৎ কৃৎকৌশলের চূড়ান্ত পারঙ্গমতার স্তর পেরিয়ে এ সহজেই ব্যক্তিত্ব থেকে সরাসরি উৎসারিত হয়েছে এবং ব্যক্তিস্বরূপকে তার সকল যোগ এবং সকল বিরহ, সকল প্রাপ্তি-সমৃদ্ধি এবং সমস্ত অপ্রাপণীয়ের বোধ অতৃপ্তি-হাহাকার ইত্যাকার অদৃশ্য অশ্রুত গহীন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ছাপ ধরে আছে। এবং নির্দিষ্ট অবয়বে প্রকাশ পাবার পর ও কেবল ভুক্ত হবার অপেক্ষায় নেই, যুক্ত হওয়াটাই তার প্রশস্ততর কাজ।

ওয়াহিদুল হকের বিশ্লেষণ থেকে একটা সত্য প্রকাশ পায় যে, রবীন্দ্রসংগীত কেবল শ্রোতার বিনোদন নয়, তা বাঙালি চিন্তাবিদ ও কবি-ভাবুকদেরও অবলম্বন। অজিতকুমার চক্রবর্তী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস নাগ, শঙ্খ ঘোষ, গৌরীপ্রসাদ ঘোষ, অনন্তকুমার চক্রবর্তী এবং সত্যজিৎ রায়— বহু প্রাজ্ঞ মানুষদের মধ্যে এ-ক'জনের নাম আলাদাভাবে মনে পড়ে তাঁদের রবীন্দ্রসংগীতের অন্তঃপুর অবলোকনের মৌলিকতা প্রসঙ্গে। এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের গান শুনে প্রথমে মজেছেন তারপরে নিমজ্জিত হয়েছেন তার বাণীময় উদ্ভাসে। এঁদের প্রয়াস থেকে বিশেষভাবে এটাই প্রমাণিত যে এই গান শুধুই শোনার বস্তু নয়, ভাবারও বিষয়। এমনকি গানের চাবিকাঠি দিয়েই হয়তো সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে সঠিক বোঝার পথ খোলা সম্ভব। কারণ গানেই তিনি সবচেয়ে নিরলংকৃত ও অনর্গলিত। ক্ষিতিমোহন সেন একবার গায়ক অশোকতরুকে বলেছিলেন :

তোমরা গায়করাই চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় পেতে পারো। তাঁর কাব্যই বলো আর নাটকই বলো, বা অন্য যে-কোনো গদ্যরচনাই বলো, সব কিছুর মধ্যে দিয়েই ক্ষণে ক্ষণে হয়তো দেখবে তাঁর সেই দাড়ি জোব্বা উঁকি মারছে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথ এ কথা তিনি ভুলতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর গান রচনার সময়, আমি কাছ থেকে দেখেছি— তাঁর আত্মসচেতনতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হত, তখনি দেখতে পেতাম সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথকে— যেন একেবারে খোলস ছাড়ানো ন্যাংটো মানুষ।

এ কথা ঠিক যে গানের ঝরণাতলাতেই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছন্দ গতায়াত, গানে গানে কেটেছে তাঁর বন্ধন, 'গান দিয়ে হাত বুলিয়ে যাই এই ভুবনে'— এ তাঁর সবচেয়ে সত্য উচ্চারণ।

এইখানে বসে আমি একটু তুলনার প্রসঙ্গ তুলব। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের শাশ্বত জনপ্রিয়তা এবং নজরুলের ব্যাপক জনাদরের এককালীন উন্মাদনার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সাম্প্রতিক ব্যাপক প্রতিষ্ঠার প্রতিতুলনা একটা সত্য তুলে ধরে। যদিও জানি তুলনামূলকতা একটা উপায় (means) কিন্তু উপেয় (end) নয়, তবু আধুনিককালে এর প্রয়োগ অনেক কিছুর বস্তুসত্য ও ভাবসত্যকে নির্দেশ করে। একটা সময়ে, অর্থাৎ ত্রিশ-চল্লিশ দশকে বাংলায় নজরুলের উত্তেজক কবিতা আর বৈচিত্র্যপূর্ণ গান এ দেশকে

এতটা আচ্ছন্ন করেছিল যে তার পাশে রবীন্দ্রসংগীত ততটা প্রতিষ্ঠা পায়নি। কিন্তু আজ দেখছি বঙ্গ ভাষাভাষী জনপদের বাইরে নজরুলের কবিতা ও গান তেমন প্রসারিত নেই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তাঁর জীবিতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমান জনপ্রিয় এবং সেই জনাদরের প্রতিষ্ঠাভূমি কেবল বঙ্গীয় জনপদে বা বঙ্গভাষাভাষীদের মধ্যে সীমায়ত নয়— বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার বন্ধন কেটে তা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের বহু প্রদেশে ও ভাষানুবাদে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পের কাহিনি অবলম্বনে বহু ভারতীয় ভাষায় অনেক চলচ্চিত্র হয়েছে। ভিন্ রাজ্যে তিনি সর্বাধিক পঠিত কথাসাহিত্যিক। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর জীবিতকালে তেমন জনাদর পায়নি, এমনকি বাঙালি শ্রোতাদের কাছে এবং গাঙ্গেয় জনপদে। কিন্তু আজ ছবিটা পালটে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের চর্চা ও পরিচর্যা এখন সারা ভারত জুড়ে, নানা ভাষান্তরে এমনকি পৃথিবীর বহু দেশে। নোবেল পুরস্কার পাবার পর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজোড়া খ্যাতি হয়েছিল। হয়েছিল তাঁর বেশ-কটি কাব্য ও নাটকের অনুবাদ। তারপরে টেগোর সম্পর্কে ইউরোপ খানিকটা উন্নাসিক হয়ে পড়ে। তাঁর একদা অনুরাগীদের কেউ কেউ হয়ে ওঠেন প্রচ্ছন্ন অনুৎসাহী। তবু সামগ্রিকভাবে বিদেশে রবীন্দ্রচর্চা কখনো থামেনি। কিন্তু জোয়ারও নেই তেমন।

তারপরে পটভূমি পালটাতে থাকে তাঁর শতবর্ষের লগ্ন থেকে। কিন্তু এবারে রবীন্দ্রনাথের যে আন্তর্জাতিক পুনরুত্থান তার ভিত্তি কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান এবং ইউরোপের নানা দেশে রবীন্দ্রনাথের গান ছড়াতে থাকে— তার কারণ বিদেশে একা ও সপরিবারে বসবাসকারী বাঙালির সংখ্যা আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে। তাদের ভারতীয় ও বাঙালি রুচি-সংরক্ষণে রবীন্দ্রনাথের গান একটা বড়ো আশ্রয়। ভিন্ন সভ্যতা আর সংস্কৃতির ঘোর কাটাতে, জাতিসত্তা ও আত্মপরিচয়ের গর্বগৌরব প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রসংগীতের মতো সর্বজনগ্রহণীয়, উন্নত কলার পূর্ণাঙ্গ রসরূপ আর কোনো মাধ্যমে কি থাকতে পারে? আর রবীন্দ্রনাথের গান মানে তো শুধু গান নয়, তার দৃশ্যরূপ ফুটে ওঠে ঋতুরঙ্গে, নৃত্যনাট্যে, একক নৃত্যে ও আলোকোজ্জ্বল কোরিওগ্রাফিতে। এক দিকে রূপলোকের উদ্ভাস আর-এক দিকে রসবোধের উন্মোচন রবীন্দ্রসংগীতের এই উভবল ঐশ্বর্যের কথা আমরা এত দিনে জেনে গেছি। কাজেই নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে কলকাতা থেকে আনা বা আনানো প্রিয় শিল্পীর ক্যাসেট শোনা আর তার থেকে সন্তানদের শেখানো এখন বিদেশে রবীন্দ্রচর্যার এক অনিবার্য কৃৎকৌশল। কিছু অর্থসংগ্রহ করে কলকাতা থেকে নামি কোনো রবীন্দ্রগানের শিল্পীকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া প্রায় মাসিক কৃত্যে দাঁড়িয়েছে। এই অনুরাগ যে কেবল বাঙালির তা নয়, ভিন্ন প্রদেশীয় ভারতীয়দের এমনকি বিদেশিদের মধ্যে সংক্রামক ও প্রবর্ধমান। বনানী ঘোষ ও শর্মিলা রায় পোমো বিদেশে থেকে রবীন্দ্র গান শেখাচ্ছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। এর চেয়ে ব্যাপক প্রয়াস হচ্ছে বাংলাদেশে গত কয়েক দশক ধরে। শৈলজারঞ্জন, নীলিমা, কণিকা, সুচিত্রা, সুবিনয় প্রমুখ অনেকে সেখানে সমাদরের সঙ্গে গান গেয়ে এসেছেন, শিখিয়েছেন বেশ কিছুকাল থেকে। এ ব্যাপারে শৈলজারঞ্জনের ব্যক্তিগত শ্রমদান বিশেষ উল্লেখ্য। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও বেশ-কিছুকাল থেকে ব্যাপক হারে আসছেন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী থেকে রবীন্দ্রসংগীতে ডিগ্রি নিতে। বলা ভালো এর ষোলোআনাই হয়তো রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি প্রেম থেকে নয়। আসলে গত এক দশক ধরে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী ও শিক্ষকদের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা বেশ উঁচু থাকে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের গান শেখা তাঁদের কারও কারও কাছে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রার মতো আকর্ষণীয় এবং পরিণামে অর্থকরী।

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে হালফিল একটা নতুন সংকট দেখা দিয়েছে। বেশ কিছু রবীন্দ্রসংগীত-ব্যবসায়ী আজকাল গানের সত্র খুলেছেন, পাড়ায় পাড়ায়। ডিগ্রিধারী বা ডিপ্লোমাধারী গায়ক-গায়িকারা পেতেছেন

পরীক্ষার বেড়াজাল। সেখানে সিলেবাস-মাফিক কয়েকটি বাছা রবীন্দ্রসংগীত শিখলে এবং বস্তাপচা বাজারি সহায়ক বই পড়লেই সফলতা। কাজেই অভিভাবকরা তাদের আদরের সন্তানটিকে (কন্যা সন্তানরাই প্রধানত) লেখাপড়া, ছবি আঁকা, সাঁতার ও কম্পিউটারের শর্ট কোর্সের মতো রবীন্দ্রসংগীতের একটা খেতাব নেওয়াচ্ছেন। তাতে তাদের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠেছে নিশ্ছিদ্র ও সম্ভাবনাপূর্ণ। আর কে না জানে যে রবীন্দ্রনাথের গানের চর্চা সমাজে মুখোজ্জ্বল করবার একটা বড় সিঁড়ি। পরে বহু উদ্যমে ধরাধরি করে বা নগদ টাকা ব্যয়ে একটা ক্যাসেট বার করা এমন কী আর কঠিন? একটা-দুটো অনুষ্ঠানে গান গাইতে পাবার সুযোগ খুব দুর্লভ নয়। দূরদর্শনে কোনোভাবে সুযোগ পেলে পোশাক নির্বাচনে দৃষ্টিনন্দন হতে বাধা নেই। কিন্তু এঁদের চটুল গানবাজিতে সবচেয়ে ধ্বস্ত হচ্ছে রবীন্দ্রবিগ্রহ, কারণ গলা ভালো হলেই তো এ-গানের শিল্পী হওয়া যায় না। হতে হয় দীক্ষিত রবীন্দ্রমন্ত্রে— জানতে হয় তাঁর অভিপ্রায় ও জীবনের সত্য উপলব্ধিগুলি। তাঁর গানের ভাব বিভাজন, পূজা ও প্রেমের গানের মায়াময় যুগ্মতার রহস্য, তাঁর গানের অন্তর্গত নাট্য এবং সুরমিশ্রণের অনুপাত আলাদা করে বুঝতে হয়। রবীন্দ্রসংগীতের সিদ্ধ শিল্পী হতে গেলে জানতে হয় তাঁর গানের পর্ব-পর্বান্তর, সুরপ্রয়োগের সূক্ষ্ম নিরীক্ষা আর থিমেটিক গূঢ় বিন্যাস। এ-সব বোঝাবে কে? সারা দেশে যেভাবে মেজো সেজো ছোটো সংগীতশিক্ষায়তনগুলি চলছে, তাতে যাঁরা এই গান শেখাচ্ছেন, যাঁরা পরীক্ষা নিচ্ছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দেখলে ভরসা হয় না। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড কর্তৃপক্ষ রেকর্ড, ক্যাসেট বা সিনেমার রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে যত আঁটাআঁটি করুন, এইসব শিক্ষাসত্র আর শিক্ষকদের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ এরাই দলে ভারী। এ-সব প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা বার্ষিক 'ফাংশানে' একটা-না একটা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য বারেবারে ধর্ষিত হচ্ছে— অথচ প্রতিবাদ নেই। কোনো মৌলিক চিন্তাশীল শিল্পী মফস্‌সলে যদি 'দই চাই গো দই চাই' গানটিকে বলেন 'মেহনতি মানুষের গান' তবে আহ্লাদে বিগলিত হতে হয় বৈকি! এমনতর অন্তর্ঘাত খুব গোপনে হচ্ছে এবং ঘুলিয়ে যাচ্ছে গানের শুদ্ধান্তঃপুর। তাঁর গানের প্রচার ও পরিব্যাপ্তি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই বলে একটা নির্মনন পরিব্যাপ্তি চাননি—চাননি এমন সংখ্যাগত বিস্ফার।

অথচ বাঙালি রবীন্দ্রভক্তদের আন্তরিক ইচ্ছার দাম আছে নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতাদের সংখ্যা ও সচেতনতা বেড়েই চলেছে। শুদ্ধভাবে যাঁরা গান করেন তাঁদের ক্যাসেট বিক্রি হয় সহজেই। নতুন শিল্পীদের অনেকে তাঁদের নিজের যোগ্যতায় স্থান করে নিচ্ছেন। ভালো রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠানে শ্রোতা সমাগম ভরসা জাগায়। গীতবিতান, দক্ষিণী, রবিতীর্থ, ইন্দিরার মতো নামি সংগীতায়তনে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, মান ও আগ্রহ বর্ধমান। লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, কিশোরকুমার, মান্না দে, উষা উত্থুপ, কবিতা কৃষ্ণমূর্তির গাওয়া রবীন্দ্রগানের রেকর্ড ও ক্যাসেট আমজনতাকে এই গান সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে। অথচ পাশাপাশি সুবিনয় রায়, সুচিত্রা-কণিকা-নীলিমা-রাজেশ্বরী, ঋতু-পূর্বা-গীতা, অশোকতরু-অর্ঘ্য প্রমুখের গান সংগ্রহে তৎপর শ্রোতার অভাব নেই। দেবব্রত বিশ্বাসের জনাদর আজও ঈর্ষাজনক। বাংলাদেশের শিল্পীদের আন্তরিক নম্র নিবেদন শুনতে কলকাতার প্রেক্ষাগৃহ ভরে ওঠে। এইভাবে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার পরিধি ও সেই গানের বিশ্ব কেবলই বেড়ে চলেছে। বাংলার বাইরে বাঙালি সমাজে রবীন্দ্রনাথের গান উন্নত সংস্কৃতির মডেলরূপে অনুসরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রসংগীতের হিন্দি অনুবাদ ও তার গায়নপ্রয়াসের কথা উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষাচর্চার ব্যাবহারিক সুযোগ যেখানে ক্ষীণ বা সীমায়ত সেখানে এই গান জাহ্নবীর মতো পবিত্র ও সংরক্ষিত। *স্বরবিতান* বহু অনুরাগীর কাছে *গীতা*। অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর ইত্যাদি পূর্বাঞ্চলে, পাটনা, জামসেদপুরে, দিল্লি-মুম্বইয়ের মতো বড় শহরে নানাভাবে

চলছে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা। 'দেশ' পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে ২ মে ১৯৯৮ সংখ্যায় গুহাহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুভাষ দে জানিয়েছিলেন :

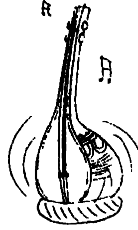
> বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা বাঙালি হলেও অন্য ভাষামাধ্যমে পড়াশুনা করেন, অনেক ক্ষেত্রে বাংলা জানেন না অথচ রবীন্দ্রসংগীত শিখছেন। বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট বিক্রির একটা খতিয়ান নিলে অবাক হতে হবে।'

তাঁর চিঠির একটি সমুজ্জ্বল তথ্য :

> ত্রিপুরায় স্থানীয় কক্‌বরক ভাষায়, অসমে ডিমাসা ও অসমিয়া ভাষায় রবীন্দ্রসংগীতের অনুবাদও হয়েছে। বেশ কিছু অবাঙালি গুণী শিল্পী ও শিক্ষকেরা আছেন— এ গানের প্রচারে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। অসমের শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট বিশ্বভারতীর অনুমোদনক্রমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে যার মান যথেষ্টই ভালো।"

বোঝা যাচ্ছে, খোঁজ করলে দেশে-দেশান্তরে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের আসনখানি কতটা বিস্মৃত হচ্ছে তার বিশদ বৃত্তান্ত মিলতে পারে।

এইসঙ্গে যোগ করতে হবে জরুরি তথ্য যে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের গত ক'বছরের বেস্ট সেলার পর্যায়ে আছে *স্বরবিতানের* খণ্ডগুলি। তার মানে রবীন্দ্রনাথের গান শেখার একাগ্রতা ও আততি এখন প্রবল। হয়তো স্বয়ং এ-গানের স্রষ্টা এতটা বৃহৎ বলয় চাননি। চেয়েছিলেন দরদি মনের গায়ন, যথাযথ সুরস্বরপ্রয়োগের শমতা। বাঙালি জীবনের উন্মেষ ও নানা প্রবর্তনায় চেয়েছিলেন তাঁর গানের সংযুক্তি। অনেকদিন পর্যন্ত তা সঠিক পথে চলেছিল, তারপর নিয়ন্ত্রণহীন এক সমারোহে আর নির্বিচার আনুষ্ঠানিকতায় এ-গানের ভবিতব্য আজ দিশাহীন, তবে ভ্রষ্ট নয়। সচেতন শ্রোতাদের সতর্ক বিবেক নিশ্চয়ই রবীন্দ্রসংগীতকে বাঁচিয়ে রাখবে। একদল লঘুরুচির মানুষ যেমন এমন মহৎ রবিশস্যের অযথা বণ্টনে একে নষ্ট করতে পারবে না, তেমনই স্বরলিপিগ্রস্ত একদল ত্রস্ত সাবধানী পথিক তাদের যান্ত্রিক গায়নে এর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে হরণ করতে পারবে না। সুনিশ্চিতভাবে সামনের বেশ-কটি দশক বাঙালির পিপাসিত সত্তা পাবে এই মহৎ রচনার স্নিগ্ধ সঙ্গ, যা সুন্দরের নামান্তর। অন্যান্য ক্লাসিক্‌স-এর মতো *গীতবিতান* অভিজাত গৃহের শোভাবর্ধন না করে নিত্যচর্চিত থাকবে মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন যাপনে। হয়তো *গীতবিতানের* গানগুলি ক্রমে উচ্চতর পাঠক্রমে গৃহীতও হতে পারে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সারস্বত অভিব্যক্তিরূপে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের সুদীর্ঘ সাধনায় ব্যক্তি থেকে হয়ে উঠেছিলেন প্রতিষ্ঠান। আজ সেই প্রতিষ্ঠান বিতর্কিত ও ক্ষয়গামী হচ্ছে কেউ কেউ যদি মনে করেন তো করতে পারেন— কিন্তু ইত্যবসরে রবীন্দ্রসংগীত হয়ে উঠেছে স্বয়ম্ভর এক প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠান অচলায়তনের মতো অনড় নয়— কেন-না তাতে লেগেছে নতুন পাঠার্থীদের সচল মনের তাপ। একটা সময় ভাবা হত, সুচিত্রা-কণিকাদের পর বোধহয় তেমন নিবেদিত শিল্পী পাওয়া যাবে না। পাওয়া গেছে কিন্তু— সেই পূর্বা-ঋতু-গীতাদের পার হয়ে এসেছেন সংঘমিত্রা-এণাক্ষী-অভিরূপ-প্রমিতা-স্বস্তিকা-রমা-শ্রীনন্দা-অগ্নিভ-দেবারতি-রাজশ্রীদের দল। তারও পরে স্বাগতালক্ষ্মী-ইন্দ্রনীল-শ্রীকান্ত-অনিরুদ্ধ-ইন্দিরারাও সমুপস্থিত। একটা কথা গর্বের সঙ্গে বলতেই হবে— রবীন্দ্রনাথের গানে গত এক-দুই দশকে যাঁরা এলেন তাঁদের তালিম ও বোধবুদ্ধি অনেক পরিণত। তাঁদের কণ্ঠসমৃদ্ধি ও গায়ন কিন্তু সে অনুপাতে স্বীকৃতি পায়নি। কেউ কেউ রবীন্দ্রসংগীতের জগতে কপাল ঠুকে চলে যাচ্ছেন অন্য গানের দিকে। নিঃসন্দেহে এই সময়টা বড়ো অস্থির ও কৃপণ। দরদি মানুষের মরমি অভ্যর্থনা এখন পাওয়া কঠিন। সব বর্গের গানের মতো রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদেরও ভাবতে হচ্ছে প্রচার আর বাণিজ্যের দিকে। সেখানেও ইঁদুরদৌড় চলছে।



কোন্ ভাঙনের পথে এলে?

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হিসাবমতো রবীন্দ্রসংগীতের মোট সংখ্যা দু'হাজার দু'শো বত্রিশ। এর দুটি ভাগ করে নেওয়া যায় : মৌলিক আর ভাঙা গান। এই ভাঙা গান বলতে বোঝায় ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ যেসব গান নিজে বা অন্য কারোর কাছে শুনে পছন্দ করে সেগুলির কাঠামো রেখে তাতে ভাষা বসিয়েছেন। এই নতুন বাণী রচনার পদ্ধতি অনুসরণ করলে আমরা মোটামুটি দেখি, কখনো তিনি গানটির আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন (তার সংখ্যা খুব কম), কখনো মূল গানের ভাবের সঙ্গে তাঁর লেখার আকাশপাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। কখনো মূল গানের প্রথম পঙ্‌ক্তির সঙ্গেই শুধু নতুন গানের প্রথম পঙ্‌ক্তির মিল, বাকি গান একেবারে অন্যভাবের। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই গান-ভাঙার মূল প্রেরণা সুরের দিক থেকে। এ ছাড়া বিশদভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে স্তবকবিন্যাস, গঠনগত রূপান্তর, তুকবদল এমন সব স্ট্রাক্‌চারাল পরিবর্তনও অনেক গানে ঘটেছে।

ভাঙনের পথে সৃষ্টি কথাটা নিতান্ত ভারতীয়। সে-কথাটা যে রবীন্দ্রনাথের গানে এমন সত্য হবে এ আমরা ভাবিনি কখনো। কিন্তু তাঁর এই ভাঙা-গানের বিপুল বৈচিত্র্য আর প্রবাহ দেখে বোঝা যায়, ওই প্রবণতা থেকে তিনি যেমন উপহার দেন প্রচুর গান তেমনই ওই গানের সুরের থেকে প্রেরণা নিয়ে মনের মধ্যে গড়ে তোলেন এক নতুন সৃষ্টির জগৎ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগৎ লৌকিক বিদেশি ও মার্গসংগীতের ত্রিবেণী সংগমে গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই তিন প্রভাব মিলিয়ে আসলে তিনি তৈরি করলেন চতুর্থবস্তু নয়, একটা সমন্বিত নতুনত্ব। গানের সেই নতুন ধারাই রবীন্দ্রসংগীত। ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রসংগীতের গভীর অন্তঃস্বভাবে কোথায় যেন এই ত্রিবেণী সংগমের জলকল্লোল স্মৃতির মতো সংসক্ত। আজ আর তাদের আলাদা করে শনাক্ত করা যাবে না হয়তো। তবে মেনে নিতে বাধা হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের গান রচনার মূলে উপাদানগতভাবে এইসব গান-ভাঙার শিক্ষানবিশি খুব কাজে লেগেছিল।

শিক্ষানবিশি কথাটা উঠল এইজন্য যে. এই জাতীয় গান-ভাঙার কাজ তাঁর সংগীতজীবনের গঠনপর্বে ঘটেছে প্রধানত। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি বলেন, 'কবি নিজে যেখানে যে ভালো সুরটি শুনেছেন, অথবা অন্য

লোকে দেশ বিদেশ থেকে যে-সব গান আহরণ ক'রে তাঁকে এনে দিয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিই তিনি পূজার বেদিতে নিবেদন করেছেন, এ বললে অত্যুক্তি হয় না। মাঘোৎসবে নতুন নতুন গান সরবরাহের তাগিদ তার অন্যতম কারণ হ'তে পারে।' ইন্দিরা দেবী চৌধুরানির অনুমান অনেকটাই ঠিক, হয়তো ঔপলক্ষিক কোনো কারণে তিনি গান ভেঙে নতুন গান বেঁধেছিলেন, বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার শান্তরসের গান রচনায় ধ্রুপদের ভারীচালের গানের সূত্র তাঁর খুব কাজে লেগেছিল। তবে অনেক সময়েই রবীন্দ্রসৃষ্টির মূলে আমরা যেমন দেখি যে, প্রবর্তনার ঔপলক্ষিকতা ছাড়িয়ে তিনি পৌঁছে যান সৃষ্টির বিচিত্র বর্ণাঢ্য পথে, তিনি খোঁজেন নিজেকেই, এখানেও তাই।

গান-ভাঙার পেছনে হয়তো বা রয়ে যায় সৃষ্টিরই কোনো দ্যোতনা, কোনো বিশ্বাস। এ কথা আরও স্ফুট হয় এই ভেবে যে, তাঁর অগ্রজরাও তো গান ভেঙেছিলেন কিন্তু তাঁদের মৌলিক রচনায় তো সেগুলির তেমন ব্যবহার ঘটেনি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গান-ভাঙা শুধু পূজা বেদিতে অর্ঘ্য দেবার জন্য নয়। অনেক সময় সুরে উদ্দীপনা আনার জন্য। নাটকের উত্তেজনা বা করুণ রস সৃষ্টির জন্য এবং স্বদেশি যুগে গানের সুরে নির্ভীক ওজস্বিতা আনতে তিনি গান ভাঙেন। তাঁর গান-ভাঙার আরও কতকগুলি স্বভাবধর্ম লক্ষ করলে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা মুশকিল। যেমন বোনঝি সরলা দেবী মাদ্রাজ বা মহীশূর থেকে কোনো গান শিখে এসে শোনালেন রবীন্দ্রনাথকে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি গানটি ভেঙে নতুন গান বাঁধলেন। কিন্তু প্রথম জীবনে শোনা বাংলা লোকসংগীতের সঞ্চয় যখন তিনি দীর্ঘদিন পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ভাঙলেন তখন ব্যাপারটা অতখানি সরলীকৃত রাখা যায় কি আর? বীজ যেমন করে উঠে আসে মাটির আঁধার পার হয়ে এ কি তেমনই আশ্চর্য উত্থান নয়?

ভাঙনের স্বভাব তো তাঁর শুধু গানেই নয়। তিনি যে কেবলই ভাঙেন নিজেকে আর নিজের প্রকরণকে। নিজের প্রতিষ্ঠাভূমিকে নিজেই পেরিয়ে যাওয়া এই হল খাঁটি রাবীন্দ্রিকতা। তাই নিরন্তরভাবে যেমন নিজের মতামতগুলিকে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখেন তিনি তেমনই দেখেন তাঁর সৃষ্টিকে। উপন্যাস হয়ে যায় নাটক, নাটক হয়ে যায় নৃত্যনাট্য, কবিতা হয় গান, গান হয় কবিতা, কবিতা কেটে হয় ছবি, ছবি দেখে লেখেন গান। আর একটু খেয়াল করলে দেখব, প্রায় সারাজীবনই গান ভাঙেন তিনি। হয়তো প্রথম বয়সেই বেশি কিন্তু শেষ জীবনেও ঘটে অনেক চমৎকার গানের জন্ম অন্য গান ভেঙে। যেমন উনসত্তর বছর বয়সে সাবিত্রী গোবিন্দনের কাছে দক্ষিণী গান 'মিনাক্ষী মুদম্‌' শুনে তিনি লেখেন 'বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী'-র মতো বিখ্যাত গান। তাহলে গান-ভাঙার খেলা তাঁর কোনো বিশেষ বয়সের খেয়াল নয়। মৌলিক গান রচনায় সমান্তরাল এক প্রবণতা। কেন এমন ঘটে? প্রতিষ্ঠিত একজন গীতিকার কেন অন্য একজনের সুরের কাঠামোয় ঢালাই করে দেখতে চান নিজের গানকে? বৈচিত্র্যসৃষ্টি, নতুনত্ব অথবা দুরূহের দারুণ আকর্ষণে?

একটা বিষয় অবশ্য আলাদাভাবে চোখে পড়ে। ইংরিজি বা আইরিশ-স্কচ গান তিনি ভাঙেন তাঁর গান রচনার আদি-পর্বে। পরে আর ভাঙেননি। তার একটা কারণ, বিলিতি গানের সঙ্গে তাঁর গানের প্রকরণ ও সুরের কোনো সাধর্ম্য নেই; আর একটা কারণ মধ্য ও অন্ত্যজীবনে বিলিতি গানের সঙ্গে তাঁর আর তেমন সংসর্গ ঘটেনি। তেমনই বাংলা লোকসংগীত থেকে যে-কখানি গান তিনি ভাঙেন তার সবই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে রচনা।

এর বাইরে নানা প্রাদেশিক গান যেমন পাঞ্জাবি. মহীশূরী, দক্ষিণী, বাংলা প্রভৃতি থেকে ভেঙেছেন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, যখন যেমন পৌঁচেছে তাঁর কাছে মূল গানটি। যেমন প্রথম বয়সে, ১৮৮১ সালে তিনি কানাড়ি ভাষার মূল গান 'সখি বা বা' থেকে গান ভেঙে লেখেন 'বড়ো আশা করে এসেছি গো'। এ-গান রচনার উৎস জানা যায় ইন্দিরা দেবীচৌধুরানির লেখায় :

পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল বোম্বাই প্রদেশ, তাই সেই প্রদেশের নানা ভাষার গান ভাঙার নমুনার কথাই আমাদের প্রথমে মনে পড়ে। বিবাহের অনতিপূর্বে কবি কারওয়ার নামক বোম্বাইয়ের যে সুন্দর বন্দরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেখানে এক সময়ে একদল নর্তকী গান শোনাতে আসে, মনে পড়ে। তাদের কাছে কয়েকটি কানাড়ি ভাষায় গান শুনি ও শিখি, যা পরে তিনি 'ভাঙেন'।

মূল।। সখি বা বা	ভাঙা।। বড়ো আশা করে	রচনা।। ১৮৮১*
মূল।। পূর্ণ চন্দ্রাননে	ভাঙা।। আজি শুভদিনে	রচনা।। ১৮৮১*
মূল।। চারি বর্ষা পর্যন্ত	ভাঙা।। সকাতরে ওই কাঁদিছে	রচনা।। ১৮৮৪*

আবার সরলা দেবী চৌধুরানি তাঁর স্মৃতিকথায় জানান :

আমি গানের বাতিকগ্রস্ত ছিলুম।...কর্তাদাদামশায় চুঁচুড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত— তাঁর মতো সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম— অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙে, কখনো-কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক-একখানি নিজের গান রচনা করতেন। 'কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি অনেক গান সেই মাটির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসানো। মহীশূরে যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবিমামার পায়ের তলায় সে গানের সাজিখানি খালি না করা পর্যন্ত মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক-একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, সেগুলিকে মুগ্ধচিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন— তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হল। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এসো হে গৃহদেবতা', 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ', 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর' প্রভৃতি আমার সুরে বসানো গান।

সরলা দেবীচৌধুরানির বর্ণনা মানলে মনে হয় তাঁর শেখা গানগুলি রবীন্দ্রনাথ বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে বা খুব সমসময়ে ভেঙেছেন। বস্তুত সব সময়ে তা ঘটেনি! মহীশূরি গানগুলি অবশ্য ১৮৯৩-৯৪ সালে ভাঙা, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বত্রিশ। কিন্তু চুঁচুড়ায় সংগৃহীত গানগুলির সুরে গান বাঁধা হয় অনেক পরে ১৯০৫ সালে, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চুয়াল্লিশ।

প্রাদেশিক গান ভাঙার সূচনা ঘটে রবীন্দ্রনাথের কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে। এ সময়ের কিছু পরে তিনি ইন্দিরার কাছে পাওয়া একটি বাংলা গান ('চাঁচর চিকুর আধো') ভেঙে 'বেঁধেছ প্রেমের পাশে' লেখেন। তাঁর এই গান-ভাঙার পালা চলে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। কখনো সাহানা দেবী কখনো শান্তিনিকেতনের দক্ষিণী ছাত্রী সাবিত্রীর কাছে গান শুনেও তার থেকে গান ভাঙেন। ১৯২৩ সালে বাষট্টি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের গান-ভাঙার বিবরণ পাওয়া যায় সাহানা দেবীর লেখায় :

আমার মুখে নানা কাজওয়ালা হিন্দি গান শুনতে কবি খুব ভালোবাসতেন। আমি প্রায়ই ওঁর কাছে গেলে এটা ওটা যা জানতাম গাইতাম। অমনিতর দুটি হিন্দি গান সে সময় একদিন আমি গাই কবির কাছে বসে। শুনেই কবি বললেন, 'রোসো রোসো, আমি কথা বসিয়ে দিচ্ছি'। আমি গাইতে লাগলাম আর উনি তখনই-তখনই কথা বসাতে লাগলেন। কী তাড়াতাড়ি যে শেষ করলেন কথা বসানো!...হিন্দি গান দুটি হচ্ছে 'মহারাজা কেওয়ারিয়া খোলো' (এটি আমি অতুলদার কাছে শিখি) আর 'প্রেম ডগরিয়া সে ন করো'। 'মহারাজা কেওয়ারিয়া' ভেঙে করলেন 'খেলার সাথী' আর 'প্রেম ডগরিয়া' ভেঙে করলেন 'যাওয়া-আসারই এ কি খেলা'।

* রচনার কাল প্রভাতকুমারের *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি থেকে* গৃহীত।

তিনটি উদ্ধৃতি থেকে একথাই নিষ্পন্ন হয় যে, গান-ভাঙা তাঁর কোনো বিশেষ বয়সের প্রবণতা বা খামখেয়াল নয়। গান রচনায় সকল স্তরেই তিনি গান-ভাঙার নিরীক্ষা চালান। এর পিছনে তবে কি তাঁর কোনো বিশেষ ভাবনা কাজ করছিল?

২

রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানের যে-তালিকা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি তাঁর *রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম* বইয়ে প্রথম প্রকাশ করেন ১৩৬১ বঙ্গাব্দে, তার সম্প্রসারিত ও সংযোজিত তালিকা করেছেন শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস *রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা-গ্রন্থমালা* বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে। তার থেকে দেখা যায়, লোকসংগীত থেকে তাঁর ভাঙা গানের সংখ্যা ৬, ইংরাজি ও অন্যান্য বিদেশি গান থেকে ১১, বাংলা , পাঞ্জাবি, তামিল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাদেশিক গান-ভাঙা ১৩, মার্গসংগীতের ধ্রুপদ শাখা থেকে ভাঙা গান ৮১, খেয়াল ভাঙা ৫৬, টপ্পা ভাঙা ৫, ঠুংরি ভাঙা ১১, তেলেনা ভাঙা ৪, ভজন ভাঙা ২, এবং পূর্ববর্তী হিন্দি মার্গগান ভেঙে রচিত অথচ যার মূল গানের হদিশ মেলেনি এমন ভাঙা গানের সংখ্যা ২৩। অর্থাৎ মোট ভাঙা-গানের সংখ্যা দু'শোর বেশি। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি গান মার্গসংগীত থেকে, যার ভাষা হিন্দি।

এই হিন্দুস্থানি গান বিষয়ে তাঁর মনোভাব সম্পর্কে তাঁর মধ্যবয়স থেকেই এদেশে বিতর্ক ছিল। দিলীপকুমার রায় তো স্পষ্টই বলেন : 'অনেকের আপনার সহজ হাল্‌কা সুরের গান শুনে উলটো ধারণা জন্মে থাকে যে, ওস্তাদি সংগীতের আপনি বিরোধী।'

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্পষ্টভাষায় জানান : 'গোড়াতেই একটা কথা জোর ক'রে বলে রাখি, ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানি গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানি গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে।'

এর পাশে উদ্ধারযোগ্য তাঁর আরেকটি মন্তব্য যেখানে হিন্দুস্থানি সংগীত থেকে গ্রহণীয় দিকটির ইঙ্গিত দিয়ে বলেন : 'হিন্দুস্থানি সংগীত ভালো করে শিখলে তা থেকে আমরা লাভ না করেই পারব না। তবে এ লাভটা হবে তখনই যখন আমরা তাদের দানটা যথার্থ আত্মসাৎ করে তাকে আপন রূপ দিতে পারব। তর্জমা করে বা ধার করে সত্যিকার রসসৃষ্টি হয় না; সাহিত্যেও না, সংগীতেও না।'

এবারে হয়তো আমরা বুঝব, কেন হিন্দি গান ভেঙে রবীন্দ্রনাথ বহুসংখ্যক গান তৈরি করেন। সে-গানের যথার্থ ভাবটি আত্মসাৎ করে তাকে আপন রূপ দেওয়াই তাঁর সংকল্প। এ গান তাঁর প্রেরণার উৎস, শিল্পীমানসের দ্বিজত্ব সাধনের উপায়। কথাটা আরও স্বচ্ছ হয় যখন তিনি আরেক জায়গায় বলেন : 'অজন্তা থেকে, তাজমহল থেকে, হিন্দুস্থানি সংগীত থেকে আমরা কী পাব? না, প্রেরণা— ইন্সপিরেশন। সুন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া। কীসের? না, নবসৃষ্টির।'

ভাঙনের পথে রবীন্দ্রনাথ যে গান রচেন তার মূলধর্ম এই নবসৃষ্টি। যার ভিত্তিতে আছে এক নবদৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ স্বরূপটি কেমন তা বোঝার জন্য তাঁর গান-ভাঙার কিছু উদাহরণ বিশ্লেষণ করা উচিত। তাহলে দেখা যবে গান-ভাঙা তাঁর কাছে কেমন করে হয়ে ওঠে একটা নির্মাণগত পরীক্ষা। তার মধ্যে কেমন করে নিজের সৃজনবুদ্ধিকে প্রক্ষেপ করেন তিনি।

প্রথমেই দেখা যাক ১৩২০ বঙ্গাব্দের রচনা একটি পাঞ্জাবি ভজন ভাঙা গান।

মূল গান	রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান
এ হরিসুন্দর এ হরিসুন্দর!	এ হরিসুন্দর, এ হরিসুন্দর,
তেরো চরণপর সির নাবেঁ।।	মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।।
সেবকজনকে সেব সেব পর,	সেবকজনের সেবায় সেবায়

প্রেমী জনাকে প্রেম প্রেম পর,	প্রেমিকজনের প্রেম মহিমায়,
দুঃখীজনাকে বেদন বেদন,	দুঃখীজনের বেদনে বেদনে
সুখীজনাঁকে আনন্দ এ।।	সুখীর আনন্দে সুন্দর হে
	মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।।

গানটির প্রায় আক্ষরিক রূপান্তর করেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির চমৎকারিত্ব রাখলেন 'মস্তক নমি তব চরণ-'পরে' বাক্যটিকে ধুয়োর মতো দুবার ব্যবহার করে। আর সহসা চোখে পড়ে না কিন্তু 'সুখীর আনন্দে সুন্দর হে' বাক্যে এই সুন্দরের আকস্মিক আবির্ভাব (মূলে শব্দটি নেই) মেলে ধরে রাবীন্দ্রিক ঘরানা। গানটির বাকি অংশ :

	কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল,
বন-বনামে সাঁবল-সাঁবল,	পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
গিরি-গিরিমে উন্নিত উন্নিত,	নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল
সলিতা-সলিতা চঞ্চল-চঞ্চল,	সাগরে সাগরে গম্ভীর হে,
সাগর সাগর গম্ভীর এ।।	মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
চন্দ্র সূরজ বঁরে নিরমল দীপা,	চন্দ্রসূর্য জ্বালে নির্মল দীপ
তেরো জগমন্দির উজার এ।।	তব জগমন্দির উজল করে,
	মস্তক নমি তব চরণ- 'পরে।।

মূল গানের তৎসম শব্দবাহুল্য রূপান্তরে খুব সাহায্য করেছে। তবু বাংলা বাগ্‌ধারার বিচারে এ গানের রূপান্তরে কিছু কৃত্রিমতা রয়ে যায়। উন্নত উন্নত, চঞ্চল চঞ্চল এ জাতীয় যুগ্ম শব্দ ব্যবহার বাংলায় খুব স্বাভাবিক নয়।

আরেকটি পাঞ্জাবি গানের রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় ত্রুটি সামলে নেন বাংলার নিজস্ব ধ্বনিমাধুর্যে। যেমন :

মূল গান	রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান
বাদে বাদে রম্ম বীণ বাদৈ	বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
অমল কমল বীচ, বিমল রজনী বীচ।	অমলকমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজর ঘন বীচ, নিস আঁধিয়ারা বীচ।	কাজলঘন-মাঝে নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুম সুরভি বীচ, বীণ রণন সুনায়ে	কুসুমসুরভি-মাঝে বীণরণন শুনি যে
প্রেম প্রেম বাদৈ।।	প্রেমে প্রেমে বাজে।।

নিখুঁত ভাষান্তর। মূল গানের ছন্দ ও যতি পর্যন্ত অবিকৃত। নতুনত্বের মধ্যে 'বিমল রজনী' হয়েছে 'জ্যোৎস্না রজনী' এবং 'বীণরণন শুনি যে' চমৎকার ভাবে অন্যান্য অন্ত্যমিলের সঙ্গে মিলে গেছে। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানি এ-গান বিষয়ে জানান : 'শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছে শুনেছি যে, শুধু প্রথম কলির কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন,বাকি দুটি কলি তিনি পূর্বাপর সংগতি রেখে নিজেই সংযোজন করেন।'সেই সংযোজিত অংশ :

নাচে নাচে রম্যতালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্মমরণ নাচে, যুগযুগান্ত নাচে,

ভকতহৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে—
প্রেমে প্রেমে নাচে।।

সাজে সাজে রম্যবেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষাসন্ধ্যা সাজে,
ধরণী ধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে—
প্রেমে প্রেমে সাজে।।

শেষের দু'স্তবক যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা তার জন্য ক্ষিতিমোহনবাবুর সাক্ষ্য জরুরি নয়। দুই স্তবকে রবীন্দ্রবাণীর স্বাক্ষর অভ্রান্তভাবেই রয়েছে। জন্মমরণ নাচে, বিশ্বছন্দে নাচে, ভকতহৃদয় নাচে এই শব্দকটি রবীন্দ্রনাথকে আভাসিত করছে। তেমনই শেষ স্তবকের উষাসন্ধ্যার সাজার প্রসঙ্গের পাশে ধরণি-ধূলি ও দীন-দুঃখীর সাজার উল্লেখ শনাক্ত করে তাঁর সামগ্রিক জীবনভাবনা। প্রথম স্তবকের সীমায়িত ভাবনা পরের স্তবক দুটিতে বিশ্ববোধে ব্যাপ্ত হয়েছে। তবে একটু লক্ষ করলে ধরা পড়বে যে, মূল পাঞ্জাবি গানের ধ্বনি-সংহতি ও শব্দ বিন্যাসের গাঢ়তা রবীন্দ্ররচিত শেষ কলি দুটিতে নেই। তবে যুক্তাক্ষর ভেঙে স্বরভক্তির সাহায্যে (ভকতহৃদয়) বা নীল, ধূলি, উষা শব্দগুলিকে উচ্চারণের দ্বিমাত্রিকতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধ্বনির গাম্ভীর্য আনতে চেয়েছেন। সব মিলিয়ে ভাঙা-গানের আসরে এ গানটি চমৎকার। একটি স্তবক কেমন করে নব সৃষ্টির প্রবর্তনা আনে এ তারই নমুনা।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভাষা ভাব ও গীতরীতির সঙ্গে কোনো পরিচয় না জেনেও কেমন করে দক্ষিণ ভারতীয় গান-ভাঙা সম্ভব হয়েছিল ভাবলে আজ অবাক লাগে। পাঞ্জাবি গানের ভাষা ও ভাব তো সহজবোধ্য। তার তাল ও সুরও অত্যন্ত সরল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় গানের ভাষা, অতএব ভাবও বাঙালির পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। তার তীব্র তাল, দ্রুত গতি, বিশেষত তালবাদ্যের প্রবল নির্ঘোষ যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মনে হবেই যে, কর্ণাটকী গানের তাল আমাদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। অথচ রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর নৈপুণ্যে স্বাভাবিক লয়ে কানাড়ি গান ভেঙেছেন বাংলা রূপান্তরে। ছন্দোস্পন্দের মিলটি আশ্চর্য রকমের :

মূল গান	রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান
সখি বা বা।। মারণ।। কিড়ি বেড়।। বড় গিরিয়ে।।	বড়ো আশা করে।। এসেছি গো।। কাছে ডেকে লও
মদন।। মনো হরণ।	ফিরায়ো না।। জননী।
মোহিনী কা।। লাহি বেনীপূ।। র্ণেন্দু সমান।।	দীনহীনে।। কেহ চাহে না।। তুমি তারে।।
নে কমলাক্ষি।। বা	রাখিবে।। জানি গো।

স্বাভাবিক আবৃত্তির উচ্চারণে গানটি পড়া মুশকিল। অথচ কোথাও কোথাও সহজভাবে ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন :

বা বুনুতে।। কড়ু সুমতে।। কনক লতে।। সুখ বিনুতে

রবীন্দ্রনাথও এসব জায়গায় স্বচ্ছন্দে লেখেন :

আর আমি— যে।। কিছু চাহিনে।। চরণতলে।। বসে থাকিব

অবশ্য এর মধ্যে একটা কৌশলও চোখে পড়ে। মূল গানে 'বা বুনুতে' পদটি দু'বার দুই সুরে গাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ 'আর আমি-যে' পদটি দুবার দুই সুরে গাইবার ঝোঁকে দ্বিতীয় একটি পঙ্ক্তি বানিয়ে নিয়েছেন :

আর আমি-যে।। কিছু চাহিনে।। জননী ব'লে।। শুধু ডাকিব

চমৎকার সংযোজন, যার থেকে গানে এসে যায় ভাবের সম্প্রসারণ। কাব্যাংশে অনেক গভীরতা এসেছে নতুন ভাবের যোজনায়। অন্য একটি কানাড়ি গানের রূপান্তরে মূলের সঙ্গে রবীন্দ্রসৃষ্টির সংলগ্নতা আবিষ্কার করাই কঠিন এত অবাক করা বাণীবিন্যাস।

মূল গান	রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান
পূর্ণ চন্দ্রাননে চিন্মনহরণে	আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে
মন্মথমোহনে মোহিনী	চলো যাই,
নাকলোক কলোনিলে।	চলো চলো, চলো ভাই।।
আশা ভঙ্গ মরণবিতরণ	না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে
পঞ্চবাণ নানে যানে।।	আনন্দের নিকেতনে—
	চলো চলো, চলো ভাই।।
	মহোৎসব ত্রিভুবন মাতিল, কী আনন্দ
	উথলিল—
সা সা সা সা, নি সা রে সা	চলো চলো, চলো ভাই।।
নিধা পা	
সা নি ধা পা মা গা রে সা	দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান, গাহ
	সবে একতান—
সা পা ধা পা সা নি ধা পা	বলে সবে জয় জয়।।

এ গানের নির্মিতি খুব বিস্ময়কর। কারণ মূল গানের লয় খুব দ্রুত। রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণীতালের সেই তীব্র স্পন্দ তাঁর গানে যথাযথ রেখেছেন। এমনকি সরগমের তেলেনা ভেঙে সেই নিরবয়ব সুরে ঠিক ঠিক বাণী সংযোগ ক'রে গেছেন। এই গান রচনার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি, একথা ভাবলে নির্মাণের অভিনবত্ব আরেকটু স্পষ্ট হয় এবং প্রমাণিত হয় তাঁর সামর্থ্য।

৩

হিন্দি গান ভাঙার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন। সেখানে বহু ক্ষেত্রে মূল গানের সুনির্দিষ্ট ধ্বনিউত্তাল তরঙ্গের ইঙ্গিতটুকু নিয়ে নিজের সৃষ্টি-সুখে গান বেঁধেছেন। যেমন হরিদাস স্বামীর লেখা মূল গান প্রচণ্ড তালবদ্ধ (তেওরা দ্রুত):

নাচত ত্রিভঙ্গ রে নন্দনন্দন বৃন্দাবন যমুনাতট
অমিত মনমথমদবিমর্দন মৃদুল অভিনব জলদ সুন্দর অঙ্গ!
তক্ তক্ তক্ দিগ দিগ দিগ দিগ দ্রিমিক দ্রিমিকট
ছং নং নং নং নং নং ধ্রিধিক ধ্রিধিকট ছং নং নং নং নং নং নং
ত ত থেই ত থেই ধা ধা ধু ধু ধু ধুঙ্গ।।

এই ধ্বনিবহুল গান রবীন্দ্রনাথের রূপান্তরে পেয়েছে আরও সমৃদ্ধি; ভাবসম্পদের গভীরতা ও গাম্ভীর্যে:

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে।
সব গগন উদ্‌বেলিয়া মগন করি অতীত অনাগত
আলোকে-উজ্জ্বল জীবনে চঞ্চল একি আনন্দ তরঙ্গ।।

তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,
চমকি কম্পিছে চেতনাধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার, কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ।।

এক্ষেত্রে গানের প্রকরণগত ঘন বুনোন এবং অন্ত্যমিলের মূল ধ্বনি অপরিবর্তিত রেখে মূল গানটি (এগারো পঙ্ক্তির) সংহত করে ভাবের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে নন্দনন্দনের যমুনাতটে নৃত্যলীলার চিরায়ত প্রসঙ্গ বদলে নির্বিশেষ বিশ্ব-আবর্তনের ভাবসংগীতের মহত্ত্ব এসেছে। মূল গানেব গাঢ় বিন্যাস নিশ্চয়ই কবিকে প্রেরণা দিয়েছিল।

এমন ধ্রুপদভঙ্গিম গানের সাহায্যে গভীর ভাবপ্রকাশের সুযোগ রবীন্দ্রনাথ আরও নিয়েছেন। যেমন :

প্রথম আদ শিবশক্তি নাদ পরমেশ্বর
নারদ তুম্বুর সরস্বতী ভণরে।

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় রূপান্তর নিয়ে দাঁড়ায়:

প্রথম আদি তব শক্তি—
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে।

'শিবশক্তি' শব্দের বদলে 'তব শক্তি'-র সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে গানটিতে নতুন ভাবের মাত্রা যোগ হয়। বিশেষ দেবতার স্থানে নির্বিশেষ পরমশক্তির বন্দনা-স্তোত্র হয়ে ওঠে। মূল গানে আছে :

প্রথম আদি ধরণী শেষ আদি সূর্যচন্দ্র
আদি পবন পানী আনুমান রে।
আদি বৈজু কবিগুরু প্রসাদ তে
লোকন কে আয়ত গুনীপন রে।।

রবীন্দ্রনাথের রূপান্তরে দাঁড়ায় :

তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরয চন্দ্র তারা,
প্রাণতরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদি কবি, কবি গুরু তুমি হে,
মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে।।

ব্রহ্মসংগীতের মহিমময় ধ্যানশ্লোক রচনার এই পারিপাট্য দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকেই ফিরিয়ে বলতে ইচ্ছা করে : 'তুমি আদি কবি কবিগুরু তুমি হে'।

আগের উদাহরণে 'শিবশক্তি' বদলে গিয়ে হয় 'আদি তব শক্তি' ফলে গানের ভাবগত চরিত্র যায় পালটে। এবারে দেখা যাবে প্রসঙ্গ না পালটেও কেমন করে রবীন্দ্রনাথ নতুন গানের মধ্যে আনেন অন্যতর ভাবসম্পদের মহিমা।

মূল ধ্রুপদ	রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর
দেবনদেব মহাদেব	দেবাদিদেব মহাদেব!
ত্রিশূল খপ্পর ডমরু লিয়ে।।	অসীম সম্পদ, অসীম মহিমা।।
বৃখবাহন, অঙ্গে বিভূতি, গরে রণ্ডমালা,	মহাসভা তব অনন্ত আকাশে।
চন্দ্রমুণ্ড ললাট রি।।	কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে।।

লক্ষণীয় যে মূল গানে আছে শুধু মহাদেবের বর্ণনা এবং তাতে নেই কোনো কবিত্ব। রবীন্দ্রনাথ সেই মহাদেবেরই অন্যতর রূপ আঁকেন তবে তা নির্বস্তুক, ভাবময় ও ব্যাপ্ত। ধ্রুপদের গাম্ভীর্য রবীন্দ্রনাথের গানে অনেক প্রবল।

গান ভাঙার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গের এই ব্যাপ্তি ও গভীরতা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে আনেন, যার কয়েকটি পরপর দেখানো যায়। প্রথমে দেখা যাক, গঙ্গাস্তোত্র কেমন করে ব্রহ্মসংগীত হয়। মূল গানে আছে :

জয় প্রবল বেগবতি সুরেশ্বরী জয়তি জয় গঙ্গে
ত্রিজগৎতারিণি জগ-কলুষ-নাশিনি পার্বতী

রবীন্দ্র-রূপান্তরে দাঁড়ায় :

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি,
জয় তোমার করুণা।
জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা।

শুধু তো শব্দ পালটানো নয়, গানের অন্তরঙ্গ কেঁপে ওঠে শব্দের তাপে। বিচিত্র আনন্দ, কবি, করুণা, ভীষণ, কলুষ-নাশন রুদ্রতা— এমন ব্যঞ্জনাগভীর রাবীন্দ্রিক শব্দের অনুষঙ্গ গানটিকে ভাঙা গান বলে চিনতেই দেয় না। ফলে গানটির প্রায় জন্মান্তর ঘটে যায়।

আরেক গানে দেখি ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ কেমন করে বৃহৎ হয়ে পড়ে :

ক্যায়সে কটোঙ্গি রয়না সো পিয়া বিনা,
একেলি জাগি সজনি আজু,
মোর নয়ন মেঁ নিদ ন আওয়ে ছোড়ি সৈয়াঁ।

এ তো নিতান্ত বিরহিনীর সামান্য খেদ। প্রিয় বিহনে কেমন করে কাটবে রাত একা একা জেগে? এ গানের সামান্যতা ঢেকে দেন রবীন্দ্রনাথ, শুধু সুরের আর্তিটুকু কাজে লাগান পরমব্রহ্মের আকুতি নির্মাণে। ফলে গানটি পৌঁছায় এতদূর :

তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে
জীর্ণভবনে, শূন্যজীবনে—
হৃদয় শুকাইল প্রেমবিহনে।।

জীর্ণভবন, শূন্যজীবন আর শুষ্ক হৃদয়ের অপ্রেম এ-গানের চারপাশে অন্য এক তিমির রাতকে টেনে আনে যার মোচন ঘটে অন্যভাবে, তাঁর পরমোজ্জ্বল আবির্ভাবে। গানটি যে গীতাঞ্জলি-পর্বের সমলগ্ন তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর গানের বাণীতেই উৎকীর্ণ।

মূল গানের অত্যাশ্চর্য উন্নততর ভাব-রূপান্তরের উদাহরণরূপে এবারে লক্ষ করা যেতে পারে আরেক গান। এখানে এক বর্ষার রাত্রির ভয়ংকুরতা অন্যভাবে ব্যবহৃত।

মূল গান	রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর
প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখা ঋতু	প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন—
কাম আগম অত বিরহিনী জিয়ন তর্জন।	দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি তর্জন।।
ঝট অস দামিনী মতঙ্গসম যামিনী	ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী।
অরু দ্রুম চাপ কর্কশ বুঁদ বারি বরখন।	অম্বর করিছে অন্ধনয়নে অশ্রু-বরিষণ।।

চাতক চকোর পিউ পিউ করত সোর	ছাড়ো রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস,
মৌর বিকট বোরী চতুর দিশন।	আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
কদম্ব তরু কুসুমিত সুবাসী বৃন্দাবন	অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হেরো প্রশান্ত বিরাজিত
তিয়া ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া	মহাভয়-মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে
গাবত ব্রজবাসী হরখ মন।	ভয়হরণ।।

মূল গানে রয়েছে ক্লিশে-কণ্টকিত কামীজনপ্রিয় বর্ষা ঋতুর 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত' বর্ণনা। চাতক ময়ূর পাপিয়া চকোর কারোর উল্লেখ বাকি নেই। গানটির শুরু সজল বর্ষার প্রচণ্ড গর্জনে আর পরিণতিতে শোনা যায় ব্রজবাসীর আনন্দ সংগীত। রবীন্দ্রনাথও অবশ্য প্রথম চার পঙ্‌ক্তিতে আঁকেন প্রচণ্ড গর্জনের মেঘনিবিড় অন্ধকার। তবে তাঁর লেখনীর মহিমা ফোটে দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত রাতের চিত্রকল্পে আর আকাশের অন্ধ নয়নের অশ্রু-বর্ষণের অভিনব উল্লেখে। মূল গানে প্রেমিক-প্রেমিকার ভাবী মিলন ঘটানোর জন্য দূতীর মতো বর্ষাঋতুর কল্পনা করা হয়েছে, যা ভারতীয় গীতসাহিত্যের এক পুরোনো কৌশল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই প্রচণ্ড গর্জনমুখরিত বর্ষাকে আনেন ভয়হারী মৃত্যুঞ্জয়কে আহ্বান করার পটভূমিরূপে। আসলে মূল গানের সুরের আয়োজনে যে-গম্ভীর নিনাদ সেই আবহের সঙ্গে মিল রেখে রবীন্দ্রনাথও আঁকলেন রুদ্রবেশে কালো মেঘের ভ্রূকুটি। তবে মূল গানে যেখানে বর্ষাকে আঁকা হয় প্রত্যাশা আর মিলন কাতরতার পটভূমিরূপে রবীন্দ্রনাথ সেখানে আনেন শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। তারপর সহসা সঞ্চারীর সুর বদলাতেই আসে নতুন প্রসঙ্গ : 'ছাড়ো রে শঙ্কা জাগো ভীরু অলস/ আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি'। গানটি এবার রবীন্দ্রগীতির নিজস্ব রঞ্জনে আভাময় হয়ে ওঠে। তৈরি হয় সেই শুভ্র ভাবপীঠ যেখানে মহাভয়-মহাসনে বসবেন ভয়হরণ অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়।

সামান্য সূত্র থেকে কেমন সুন্দর গান বানাতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ এ গান তার সার্থক উদাহরণ। প্রসঙ্গত প্রভাতকুমার জানান, গানটি মাঘোৎসবে গীত এবং ১৩১৪ বঙ্গাব্দের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত। 'কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩১৪ অগ্রহায়ণ মাসে। বোধ হয় তারপরেই গানটি রচিত'। এই অনুমানাত্মক তথ্য যদি সত্য হয় তবে গানটিতে যোগ হয় এক নতুন বিভা। ব্যক্তিগত শোক কেমন করে মোচন হয়ে তাঁর সামনে তৈরি হত নতুন শক্তি এ গানে তার সংযত ইতিহাস।

প্রসঙ্গান্তরের আরেক ধরন পাই অন্য একটি রবীন্দ্রসংগীতে। আটচল্লিশ বছর বয়সে লেখা এই গান কীভাবে মূল গানের প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন হয়ে অপরূপ হয়ে উঠেছে ভাবলে অবাক লাগে। মূল গান—

মুরলী ধুনি শুনি অরী মাই যমুনাতীর
তবসোঁ হম তন মন যোবনসোঁ বিকাই।

রবীন্দ্রনাথের সৃজনমানস এ গানকে পরিকীর্ণ করে তোলে বিপুল ব্যাপকতায় :

চরণধ্বনি শুনি তব, নাথ, জীবনতীরে
কত নীরব নির্জনে কত মধু সমীরে।

কোন্ মোহন যন্ত্রে মুরলিধ্বনি হয়ে যায় বিরাটের চরণধ্বনি এবং চিরকালের প্রেমবাহিনী যমুনাতীর মেনে নেয় জীবনতীরের দার্শনিক সূক্ষ্মতা তা কে বলবে? কিন্তু আমাদের মন ভরে ওঠে চমৎকৃতিতে। পেয়ে যাই এক নতুন গান এবং তৃষাতুর পাখির মতো আরও গানের জন্য অপেক্ষা করি।

ভারতের বহু যুগবাহিত শাস্ত্রীয় গানগুলির সাহিত্যরসহীনতা রবীন্দ্রনাথকে বার বার বেদনা দিয়েছিল। তাঁর হিন্দিগান ভাঙার মূল কারণ তার ভাব ও ভাষার দৈন্য আপনোদন করা। শাস্ত্রীয় গান সম্পর্কে তাঁর খেদ

প্রকাশ পায় এইভাবে : 'বিখ্যাত গুণীদের রচিত সংগীতের মহৎ রূপসৃষ্টি বলে তারা বিশেষ শিল্প আকারে রক্ষিত ও কালে কালে ঘোষিত হয়ে আসেনি। তানসেন প্রভৃতির রচনা নানা কণ্ঠে পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে হতে যুগপ্রবাহে ভেসে এসেছে বাক্যের তরি আশ্রয় করে। অনেকস্থলেই সে তরি সামান্য ডিঙি বা ভেলা।' এখানে তাঁর বেদনা বাণীর নগণ্যতা বিষয়ে। অন্যত্র বলেন :

'কারি কারি কমরিয়া গুরুজি মোকো মোল দে' অর্থাৎ, 'কালো কালো কম্বল গুরুজি আমাকে কিনে দে'। এটা হল মোটা মশাল, এর চূড়ার উপরে জ্বলছে পরজ রাগিণীর আলো; মশালটার কথা মনেও থাকে না। কিন্তু কারুখচিত বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন ক'রে তোলে তাহলে কোন্ দিক থেকে মূল্যের কিছু হ্রাস হতে পারে বলে তো মনে করি না।

এখানেও তাঁর ঝোঁক কারুখচিত বাণীর দিকে। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা করে এই পরজ রাগিণীর আলোর নিচে তিনি কেমন বাণীর কারুখচিত রূপ ফোটাতে আগ্রহী। প্রতিতুলনার সুযোগ থাকায় আমাদের সে-জিজ্ঞাসা মিটে যায় :

কারি কারি কামলিয়া গুরুজী	তব প্রেম সুধারসে মেতেছি।
মোহে মোল লে দে।।	ডুবেছে মন ডুবেছে।।
	কোথা কে আছে নাহি জানি—
রাম জপনকো মালা লে দে	তোমার মাধুরীপানে মেতেছি,
পানি পিবনকো তোঁবরিয়া গুরুজী।।	ডুবেছে মন ডুবেছে।।

পরজে বাঁধা রবীন্দ্রসংগীতটি যাঁর শোনার অভিজ্ঞতা আছে তিনি মানবেন একটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বাণীসম্পন্ন পুরোনো গানের কী অন্তর্গাঢ় রূপান্তর ঘটে গেছে। ডিঙি বা ভেলার আশ্রয়কে তিনি এইভাবেই দেন অর্ণবপোতের শক্ত আশ্রয়।

রবীন্দ্রনাথের কেবলই মনে হয় হিন্দুস্থানি গানে বাণীর মূল্য অত্যন্ত গৌণ। বলেন, 'ওরা কেমন অকিঞ্চিৎকর কথা গানের মধ্যে অম্লানবদনে চালিয়ে দেয়। অক্ষমতাবশত নয়, সুরের তুলনায় তাদের কাছে কথার খাতির কম ব'লে। বাঙালি ভাগ্যদোষে কুকাব্য লিখতে পারে, কিন্তু অকাব্য লিখতে কিছুতেই তার কলম সরবে না।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সংগীত জীবনে যত গান ভেঙেছেন তার মধ্যে হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতের সংখ্যা বেশি। তার কারণ কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত বহু রকম হিন্দুস্থানি গান তিনি শুনেছিলেন ও বহু ক্ষেত্রে শিখেছিলেন। তাঁর বাষট্টি বছরেও যে হিন্দুস্থানি গানের আবেদন কিছুমাত্র কমেনি তার প্রমাণস্বরূপ দাখিল করা যায় সাহানা দেবীর মন্তব্য : 'আমার মুখে নানা কাজওয়ালা হিন্দি গান শুনতে কবি খুব ভালোবাসতেন।' হিন্দি থেকে গান ভাঙার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়স পর্যন্ত বেশ সক্রিয় ছিল। এর থেকে বোঝা যায়, মৌলিক গান সৃষ্টিতে বিলিতি বা লোকসংগীতের চেয়ে হিন্দুস্থানি গানের কাঠামো অনেক বেশি ক্রিয়াশীল।

সবশেষে উদাহৃত হতে পারে বাগেশ্রী রাগিণীতে বাঁধা তাঁর একটি ভাঙা গান ও তার মূলরূপ, যার মতো সংক্ষিপ্ত পরিসরের অথচ লক্ষ্যভেদী গান রবীন্দ্রনাথের বেশি নেই। মূল গানটি তিন পঙ্ক্তির সংহতিপূর্ণ :

তুম বিন কৈসে রহোঙ্গী রে পিয়ু
যে নিশিদিন মোহে কঠিন বীতত হৈ
ব্যাকুল ভরে জিয় মোরা রে।

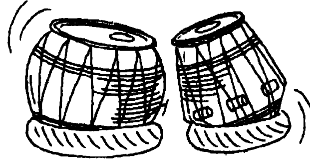
সামান্যই আয়োজন এ গানের। প্রোষিতভর্তৃকার বেদনায় আর্দ্র অথচ গভীর কোনো উপলব্ধিতে উত্তরিত নয়। প্রকাশভঙ্গীরও নেই কোনো অসামান্যতা। এমন সামান্য তিন পঙ্ক্তি রবীন্দ্রনাথের সৃজনবেগে রূপ নিল :

তোমা-হীন কাটে দিবস হে প্রভু,
হায় তোমা-হীন মোর স্বপন জাগরণ—
কবে আসিবে হিয়া মাঝারে?

বিরহী অন্তরের আর্ত দিনযাপনের সঙ্গে যে-অব্যক্ত আকাঙক্ষাটুকু অনুদ্‌ঘাটিত ছিল রবীন্দ্রনাথ তা উৎসারিত করে দেন : 'কবে আসিবে হিয়া মাঝারে?' গানটির সামান্যতা ঘুচল এই প্রশ্নশীলতায়। অবশ্য তাঁর বিচিত্র সৃজনবুদ্ধির শল্য কখন প্রিয়কে করে দিয়েছে প্রভু আর বসিয়েছে এক অব্যয়ের মতো শব্দ 'হায়'। মনে পড়ে অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত ও কবিতা' নিবন্ধে লিখেছিলেন :

মনে করো— আমি বলিলাম "হায়"! কথাটা ওইখানেই ফুরাইল; কথায় উহার অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। সংগীত সেই 'হায়' শব্দটি লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে থাকে —'হায়' শব্দে হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিতে থাকে— 'হায়' শব্দের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর দুঃখ, যে অতৃপ্ত বাসনা, যে আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে, সংগীত তাহাই টানিয়া বাহির করিতে থাকে— 'হায়' শব্দের প্রাণের মধ্যে যতটা কথা ছিল সবটা তাহাকে বলাইয়া লয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাঙা-গানের জগতে এমনই অনেক সৃষ্টির ইঙ্গিত অন্তঃশীল হয়ে আছে। অনেক রহস্য ও আত্মবীক্ষণের ইশারা তার সর্বাঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ নানা ধরনের গান ভাঙতে ভাঙতে আসলে তৈরি করেন নিজেরই গানের গড়ন। তাঁর চরণস্পর্শে যা ভাঙে তা-ই হয় ধন্য, সৃষ্টির লাবণ্য ও চমৎকারিত্বে।



দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া

দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে—
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে?

এই গভীর প্রশ্নটি ছিল চণ্ডালিকার প্রকৃতির। ১৯৩৩ সালে লেখা এই গান অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার অন্তর্ভুক্ত করেননি, তবু প্রকৃতির এই গান কোনো নাটকীয় চরিত্রের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণ নয়। এর ভেতরে লুকিয়ে আছে গীতিকার বা ব্যাপক অর্থে কবি রবীন্দ্রনাথেরই এক গূঢ় জিজ্ঞাসা। শুধু দেবার ব্যথা আর নেবার মানুষের বিপ্রতীপতা নয়, তাঁর সমগ্র গীতজীবন আলোড়িত করে আছে আরও নানা দেওয়া-নেওয়া সমস্যা ও আর্তি, ক্ষোভ ও অন্তর্বেদনা। বিশ্বের আর কোনো গীতিকারের এ যন্ত্রণা বাজেনি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো আর কোনো গীতিকারই পরতে-পরতে নিজেকে খোলেননি, নিজের অভিপ্রায়কে শনাক্ত করতে চাননি। বারে বারে, ফিরে ফিরে, নিজেকে গানের ভিতর দিয়ে দেখা; গান দিয়ে এই ভুবনের পরিচয় নেওয়া, এ একেবারে রাবীন্দ্রিক অনন্যতা।

আসলে গান লেখা ব্যাপারটা কবি রবীন্দ্রনাথের অন্যতর আত্ম-আস্বাদন, তাঁর স্বরূপ-সন্ধানের আরেক মুকুর। সেইজন্য কবিতায় তাঁর অনেক অব্যক্ত ও ধূসর উচ্চারণ, গানের প্রতিবিম্বনে হয়ে ওঠে স্বচ্ছ ও সংহত। সেই সঙ্গে সুরের অন্যমাত্রা এবং লয়ের অবিচ্ছেদ্য আয়োজন তাঁর গানকে আমাদের সামনে এমন করে মেলে ধরে যে, রবীন্দ্রসংগীতে আমাদের অন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়, খুলে যায় দরোজা।

রবীন্দ্রনাথের গানের কালক্রম ধরে তার থিমেটিক বা বিষয়গত দিকটি আমরা অনেকসময় দেখতে ভুল করি। এই ভ্রান্তি বা ভ্রষ্টতা রবীন্দ্রনাথেরই বানানো। কেন-না তাঁর গানগুলিকে তিনি গীতবিতানে পূজা-প্রেম-প্রকৃতি-স্বদেশ-বিচিত্র মাত্র এই পাঁচটি পর্যায়ের বিভাজনে সাজিয়ে দিয়েছেন এবং তার ফলে আমাদের বীক্ষণ আর কৌতূহল ওই পাঁচটি বিভাগকেই শুধু মেনে নেয়। গানগুলি যে বিষয়গত বা ভাবগত দিক থেকে দাবি আরও অনেক শিরোনাম এবং আরও অনেক সূক্ষ্ম অনুধাবন, তা আমরা মনে রাখি না।

এমনই এক চোখ-এড়িয়ে-যাওয়া প্রসঙ্গ, যা রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের গান রচনায় বারে বারে ছায়াসঞ্চার করেছে তা হল দেওয়া-নেওয়া। বিশেষভাবে এই ভাবপ্রসঙ্গ *গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যর* যুগে বেশি এসেছে বলে ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলার আশঙ্কা থেকে যায়, ভুল করে দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টিকে ভক্ত-ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয় স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়ভূমিতে দেওয়া-নেওয়া বহুমাত্রিক এবং নানা-দিক-মেলা একটা পরিপ্রেক্ষিত। সেই বিচিত্র দিক থেকে লক্ষ করলে দেওয়া-নেওয়ার আরও অনেক তাৎপর্য, অনেক সংকেত আর বর্ণময়তা তাঁর গান থেকে খুঁজে পাই। শুধু ভক্ত-ভগবান নয়, প্রেম। প্রেমের অন্তঃসুঞ্চারী নানা নিগূঢ়তা, মানুষ আর প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন দেওয়া-নেওয়া, মানুষে মানুষে অপরূপ লেনদেন এবং আরও অনেক ইঙ্গিত ফোটে।

একাকীত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের জয়সিংহ বলেছিল : 'যবে দিতে চাই নিতে কেহ নাই'। দেওয়া-নেওয়ার মূল সত্য তাহলে এইখানে? দোসরের জন্য প্রতীক্ষা, মরমির। এমনকি এতদূর যে একটি গানে বলা হয় :

তোমার কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন।।

তাহলে শুধু দেবার আনন্দেই দেওয়া, অপ্রয়োজনে, তাতেই মাধুর্য। প্রয়োজন পূরণ নয়, সে তো ভিক্ষা দেওয়া। এ হল দেবার স্বতঃসামর্থ্য এবং তার আনন্দ। সেইটাই নেওয়া। দিতে পারার আনন্দকেই আস্বাদন।

অবশ্য এই দেওয়া-নেওয়ার তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ অচিরে ঘুরিয়ে দেন অন্যমুখে এবং আমাদের বিহ্বল বিস্ময়ে ভরিয়ে বলে ওঠেন আরেক গানে :

কেন রে তোর দুহাত পাতা
দান তো না চাই, চাই যে দাতা—
সহজে তুই দিবি যখন সহজে তুই সকল লবি।।

গ্রহীতার চেয়ে দাতার ভূমিকা বোধহয় অনেক বড়। কেন-না সহজে দিতে পারলে সহজেই পেয়ে যাওয়া যায় অন্বিষ্ট। এখানে সহজ মানে অনায়াস, সংস্কারশূন্য, অহমিকাবর্জিত। এই সহজে দিতে পারা তো কম সাধনা নয়। অবশ্য এই দিতে পারা মানে সবসময়ে বস্তু দেওয়া নয়, অনেক সময়ই নিজেকে দেওয়া।

তাঁর গান রচনার একেবারে আদিযুগে পঁচিশ বছর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

আমায় অনেক দিয়েছ নাথ
আমার বাসনা তবু পুরিল না—
দীনদশা ঘুচিল না অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না, মিটিল না।

আধ্যাত্মিক আকুতি থেকে তিনি বুঝেছেন জীবন, পরিজন, সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর আর শ্যামশোভা ধরনিবেষ্টিত এই সুন্দর বেঁচে থাকা তবু নিষ্ফল কেন-না তিনি পরমকেই পাননি। তাই গানের শেষে বলতে হয় :

এত যদি দিলে, সখা, আরো দিতে হবে হে—
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না, ফিরিব না।।

পঁচিশ বছরের এই ঈশ্বর-প্রত্যাশী যুবার আকুতি কিন্তু ভারী মনোহর স্বরূপ পায় যখন ওই গান রচনার প্রায় সমকালে তিনি লেখেন এই আত্মদৈন্যের গান যে :

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান, সুখ দুখ ভাবনা।।

পরমকে সম্পূর্ণ না-পাবার আর্ততা যতটা গভীর, নিজেকে সম্পূর্ণ দিতে-না-পারার দীনতাও ততটা গাঢ়। এই দুয়ের মধ্যে হয়তো রয়েছে প্রকৃত সত্য।

এই পুরোপুরি দিতে-না-পারার কারণ কতরকমের আত্ম-আবরণ আর লজ্জা। সেইজন্য তাঁকেও পুরো পাওয়া হয় না। নিজের জন্য একান্ত করে যা রাখি আমরা তাতেও সুখ নেই, তা টেনে আনে শুধু কান্না আর ভাবনা। কবির শেষ অনুনয় তাই :

আমার জগতের সব তোমারে দেব
দিয়ে তোমারে নেব— বাসনা।।

সব দিয়ে তাঁকে পাবার এই বাসনা নিতান্তই যুবোচিত সংকল্প। এর মধ্যে ইচ্ছার আবেগটুকু আছে, দেবার বিষয়গত স্পষ্টতা নেই। কী দেব, কতটা এবং কীভাবে এসব অনুপুঙ্খ থাকে অব্যক্ত। কিন্তু *গীতিমাল্য*-র গানে, কবির বয়স যখন বাহান্ন, তখন এই নিজের সকল দিতে-না-পারার দৈন্যের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে একটা প্রত্যয় ও দৃঢ়-বিশ্বাস :

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।।

যুবক গীতিকারের সবকিছু দেবার অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা প্রবীণ গীতিকারের কাছে স্পষ্ট ও তালিকাবদ্ধ। তাই 'আমার যা আছে' না বলে এখানে বলা হচ্ছে বিত্ত আর বাণীর কথা আলাদা করে। তারও পরে আসে চোখের দৃষ্টি, কানের শ্রুতি, সেবা নিপুণ হাত, আসা-যাওয়ার প্রসঙ্গ একে একে। এমনকি প্রভাত আর সন্ধ্যাও। 'সব দিতে হবে' 'সব দিতে হবে' এই অমোঘ আকুলতা গান গাইবার সময় স্থায়ী অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ ভেদ করে দীর্ণ করে বেজে বেজে ওঠে। আগের গানে, নিজের বলে রেখে দেওয়া যা-কিছু সে সম্পর্কে আত্মধিক্কার আছে এই মর্মে যে,

যাহা রেখেছি তাহে কী সুখ—
তাহে কেঁদে মরি, তাহে ভেবে মরি।

আর 'আমার যে সব দিতে হবে' গানে রবীন্দ্রনাথ বলেন সম্পূর্ণ অন্য কথা অন্য অনুভব থেকে। বয়সের প্রবীণতা ধ্যানতন্ময়তা তাঁকে জানায়—

আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে—

প্রথম গানের 'যাহা রেখেছি' আর দ্বিতীয় গানের 'যা পেয়েছি' যেন যুগোত্তীর্ণ দুটি শব্দগুচ্ছ। মাঝখানে অনুভব আর উপলব্ধির অনেক যোজন পার হবার অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের প্রবীণ অন্তর্দৃষ্টি বুঝেছে যা রেখেছি-র অহমিকা আর যা পেয়েছির গূঢ় স্বীকৃতির মধ্যে ঘটে গেছে চেতনার গুরুতর রূপান্তর। যা নিজের বলে পেয়েছি সেটাও নিজের নয়, তাও পরমদাতার দান এবং সেই প্রাপ্তিটুকু তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরম প্রত্যুপহার আরও অনেক বড় পাওয়া এইটাই যেন এ গানের বাণী। এই চরম কথাটির মাঝখানে লুকিয়ে রয়েছে, ফুলের মধ্যে গন্ধের মতো, আরেকটা সত্য :

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।।

তাঁর আনন্দ আর আমার দুঃখ-সুখের সমবায় এবং তারই পারস্পরিক দেওয়া নেওয়া হ'ল এই জীবন।

'যা পেয়েছি' রবীন্দ্রসংগীতে খুব বড়ো ধ্রুবপদ। যা পেয়েছি প্রথমদিনে তাই যেন শেষেও পাই এ কথা ব্যক্ত হয়েছে এক গানে। অর্থাৎ প্রাপ্তির পূর্বাপরতা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে এই আবেদন। আরেক গানে তিনি রাজি হননি 'কী পাইনি' তার হিসাব মেলাতে। কেন-না পাওয়ার দিকটি যে অনেক বড়, উপচীয়মান।

অবশ্য ওই গীতিমাল্য-র যুগেই রবীন্দ্রনাথ অন্য গানে যে অভিনব আত্মদীনতা ও চিত্তবিক্ষোভ জানিয়েছেন তা বড় ঝলমলে। যার ধুয়ো হল :

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে এমন গানে গানে?

এমন কথা কোনো দেশে কোনো গীতিকার বলেননি। চোখে দেখার দৃষ্টি, ভালো লাগার মন অর্থাৎ আমাদের সকল আত্মতার মূলে তাহলে প্রেম এবং সেই প্রেমও নিজস্ব নয়, তা-ও দান। অপরূপ এ গানের বাতাবরণ। একদিকে ভোরের আকাশের ভরা গান, তারার মালা-গাঁথা রাত, ফুলের শয্যা, দক্ষিণ বাতাসের মত্ততা, অবারিত অসীম আকাশের আকুল-করা-চোখ, আর একদিকে অসহায় মর্মপীড়িত অপ্রেমী কবিসত্তা। জগতের সমগ্র আয়োজন আর উদারতা যেন তাঁর প্রেমবিহীন ক্ষুদ্রতাকে গ্রাস করতে আসছে। কবি ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইছেন কেন তিনি পান না প্রেমের করুণা। একমাত্র এই প্রেমের দান থেকে ভরে উঠবে তাঁর পৃথিবী। সংসক্ত হবেন বৃহৎ জগতের আয়োজনের সঙ্গে। মনে হবে জগতের আনন্দযজ্ঞে সত্যিই তাঁর নিমন্ত্রণ। বড় নির্মম শক্তিশালী সেই দাতা। জীবনের চারিদিকে ভরিয়ে দিয়ে গ্রহীতাকে করে রাখেন কাঙাল, উৎকণ্ঠিত, বিষাদভারাতুর। তখন মনে জাগে প্রার্থনা আর আকুতি, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে আরও আরও প্রাণের জন্য। গভীর মন্ত্রে বিনত বেদনায় বলতে হয়, শুধু প্রেম নয়, আনন্দ নয়, বরং :

তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।

আরো বেদনা আরো বেদনা,
প্রভু, দাও মোরে আরো চেতনা।

আরো প্রেম আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।

এ হল স্তরে স্তরে নিমজ্জন আর আত্মউৎসর্জন, যার চরম হল আমিত্বের বিলোপ। 'আমার যা আছে' বা 'যা পেয়েছি'-র অহমিকা থেকে মুক্ত হবার জন্য কবির প্রার্থিত এখন, এই *গীতিমাল্য*-র গানে (লোহিত সমুদ্র ভ্রমণকালে লেখা), 'আরো বেদনা আরো বেদনা'। এই বেদনা থেকেই ঘটে চেতনার জাগরণ, সেই চেতনা থেকে জাগে দাতার সর্বশক্তিমান সত্তা সম্পর্কে বোধ। আসে আত্মদৈন্য, অহমিকাশূন্য ভক্তিপ্রণত শুদ্ধতা। সে-ই প্রেম। চারিদিকের বিপুল আয়োজন ও প্রেমরিক্ত কবির একাকীত্ব আর নয়। এবার আরও আরও স্থানলাভের অভীপ্সা। অংশগ্রহণের উচ্চারণ। এবারে আবার দেওয়া।

একেকবার মনে হয় পরম শক্তিমানের করুণাপ্রত্যাশী এই যে আত্মনিবেদনের পৌনপুনিক আবেদন এ কি শুধু একা কবির? কেন এত কাঙালপনা? অপরপক্ষ কি শুধুই উদাসীন দ্রষ্টা? তা যে নয় সেকথা বুঝতে রবীন্দ্রনাথ অন্যতর গানে দেখান :

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।।

একদিকে আকুলতা আরেকদিকে অবারিত প্রত্যাশার চোখ এই দুই নিয়ে জীবন। নইলে যে সব ব্যর্থ হত। তবে দুজনে সমান সমান নয়। আমি নইলে তোমার প্রেম হত যে মিছে ঠিকই কিন্তু দুজনের দেওয়া-নেওয়ার সামর্থ্য আর ধরন-ধারণ ভিন্নতর। ছাপান্ন বছর বয়সে, তাঁর গীতাখ্য কাব্যরচনার পালা সাঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসবের জন্য যে গান লেখেন তাতে দাতা-গ্রহীতার এই বিচিত্র দিকটি ফুটে ওঠে।

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই
তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে।।

অথচ আশ্চর্য যে,

তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি
আপন-মাঝে গোপন রতনভার,
হারায় না সে আর।।

দুজনের এই বিপরীত স্বভাব আর উপার্জন খুব চিত্তাকর্ষক। ভিক্ষা করে যা পাই তা বারে বারেই আমি হারাই। এর কারণ তো স্পষ্ট । আমার রাখার সামর্থ্য নেই, নেই সাধনা। আমার লোভ, আমার একান্ত করে-আঁকড়ে-রাখার উদগ্র বাসনা তাকে ভ্রষ্ট করে। আমি তো কিছু দিই না বিনিময়ে, তাই আমারটুকুও যায়। এইজন্য, এই ক্ষুদ্রতার জন্য, কণাটুকু হারালে প্রাণ হায় হায় করে। অথচ তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার কাছে তখন অগোচরে দিয়ে যান গোপন রত্ন। সে রত্ন কখনো হারায় না। কারণ তিনি রেখে যান নেবার আনন্দটুকু, তার তৃপ্তি, যাকে বলে acceptance। তিনি তো নিতেই আসেন হাত পেতে আর দিয়ে যান পূর্ণপ্রাপ্তির সন্তোষ। আমি নিতে চাই ছিনিয়ে, তাই রাখতে পারি না। দুজনের দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা তাই আপাত অসম। এইজন্যই বোধ হয় পূর্ণ বয়সের একটি গানে (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন :

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা রিক্তহাতে চাস্‌নে তারে,
সিক্ত চোখে যাস্‌নে দ্বারে।।

নেওয়ার মধ্যে রিক্ততার দৈন্য রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত ছিল। দানের সঙ্গে প্রতিদানের আবশ্যিকতা তাঁর সংগত মনে হয়েছে। যে-আকাশ তাঁকে আলো দিয়ে ভরিয়েছে সেই আকাশকে তিনি ভরাতে চেয়েছেন গানে। দেওয়া-নেওয়ার এ মাধুর্যও কম নয়।

অবশ্য 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে' গানের অন্য এক ভাষ্য বিবেচনাযোগ্য, বিশেষ করে গানটির পুরো বক্তব্য বিচার করে। যেন এখানে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আমার দ্বারে আসেন, তখন দান করতে গিয়ে বন্ধ তালা খুলে হঠাৎ আবিষ্কার করি অবিনশ্বর রত্ন, তাঁরই দেওয়া। ঠিক তেমনই প্রভাত আসে তাঁর কাছে যে-আলোক ভিক্ষা নিতে সে-আলো তাঁরই আসনতলের নিত্য-সামগ্রী। আবার তিনি যখন সন্ধ্যার কাছে ঊর্ধ্ব করে ভিক্ষু হন তখন অন্ধকারে স্তরে স্তরে ফুটে ওঠে তাঁরই দেওয়া তামস সত্তা। তাঁর মুকুটে শোভা পায় তাঁরই দেওয়া দান। যেন তিনি একই সঙ্গে হয়ে যান দাতা-গ্রহীতা আবার দাতা। দেওয়া-নেওয়ার অবিরত লীলা চলে এমনই ভাবে। তাই কি রবীন্দ্রনাথ বেশ পরিণত বয়সে ১৯২৩ সালে লেখেন নতুন এক গান?

সে গানটির স্থায়ী অংশ বলবার কথাটি তো বেশ স্পষ্ট :

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া তোমায় আমায়—
জনম জনম এই চলেছে, মরণ কভু তারে থামায়?

এখানে দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটি নতুনভাবে আসে, যার সংক্রমণ জন্ম-জন্মান্তর ধরে। এ দেওয়া-নেওয়া ও ফিরিয়ে দেওয়া মানুষের সঙ্গে তার স্রষ্টার, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতিরও বুঝিবা। 'মরণ কভু তারে থামায়' এই জিজ্ঞাসা আসলে তুচ্ছার্থক। অর্থাৎ মরণের সাধ্য কি যে এই অবিরত বিনিময়কে থামায়? অন্তরার সম্প্রসারণে এবারে বোঝানো হয়:

যখন তোমার গানে আমি জাগি আকাশে চাই তোমার লাগি,
আবার একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায়।।

অর্থাৎ এখানে প্রত্যাশা অন্যোন্য, পরস্পরসাপেক্ষ। তাঁর গানে আমার জাগরণ ও উর্ধ্বায়ন, আবার আমার একনিষ্ঠ আহ্বানে তাঁর অবরোহণ। কাঠিন্য থেকে করুণায়। স্বাতন্ত্র্য থেকে সহজে।

এই পর্যায়ক্রমে দেওয়া-নেওয়া আবার দেওয়া আবার নেওয়া চলে সৌরআবর্তনে ঋতুচক্রে। এই নিয়মেই তাঁর সূর্যের আলোর ঋণ শোধ হয় মানুষের শ্রমলব্ধ মৃত্তিকাসম্ভব পুষ্পপল্লবে। আবার শরতের শেফালিবনের উতল গন্ধের মর্ত্যঋণ শোধ হয় শ্রাবণের আকাশবাহী বর্ষণধারার উৎসবে। এই অন্যোন্য সম্পর্কের বিগ্রহ যেন আমাদের নিসর্গ আর তার পটভূমিকায় করুণাপ্রত্যাশী মানুষ। মরণ কভু তারে থামায় এ প্রশ্ন আসলে সাজানো। মরণের সাধ্য কি যে জীবনবৃত্তকে থামায়। তার সম্ভোগ যে দেওয়া-নেওয়ার পুষ্টি ও ত্যাগে। চকিত পূর্ণতা আর স্বতঃউৎসারণে। এ বড়ো মধুর দ্বন্দ্ব।

দেওয়া- নেওয়ার গানের আরেক পর্যায় প্রকৃতি ও মানবজীবন ঘিরে রবীন্দ্রনাথ গেঁথেছেন। তা যদি না হত, শুধু ভক্ত-ভগবানের মধ্যেই প্রসঙ্গটি যদি বলয়িত থাকত থিমেটিক দিক থেকে, তবে ব্যাপারটি গুরুতর মনোযোগ দাবি করত না। কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করা যায়, দেওয়া-নেওয়ার বিচিত্র রহস্য তিনি নিসর্গ ও মানবসম্পর্কের মধ্যেও টেনে এনে আমাদের প্ররোচিত করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় বিষয়টি তাঁর সারাজীবনের ধ্যানের লক্ষ। অবশ্য *গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি* পর্বের পর ভক্ত-ভগবান সম্পৃক্ত বিনিময়-প্রশ্ন তিনি আর গানে আনেন নি। তার কারণ এ প্রশ্নের এক সংগত মীমাংসা ঘটে গেছে তাঁর সৃজনে। অর্থাৎ ভক্ত-ভগবানের বা স্রষ্টা-মানবের পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়টি তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাই সে সম্পর্কে কৌতূহল গেছে কমে। তাঁর বাকি জীবনের গান রচনায় দেওয়া-নেওয়ার ওই দিকটি আর আসেনি।

এসেছে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে। যেমন ধরা যাক তাঁর বাষট্টি বছর বয়সে লেখা 'বিচিত্র' পর্যায়ের একটি গান, যার শিরোনাম 'প্রত্যাশা'। এখানে এক রাখাল ছেলে আর গীতিকার রূপকে চমৎকার এক বিনিময়ের আলেখ্য।

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে।

কাহিনিস্পর্শী এই গানের 'আস্থায়ী' আমাদের মনে কোনো পূর্বাভাস জাগায় না। এ যেন শুধুই বিবৃতি। এর পরে 'অন্তরা' অংশে জানা যায় সেই ছেলের দুর্বোধ্য গানের প্রসঙ্গ :

গাইল কী গান সেই তা জানে, সুর বাজে তাঁর আমার প্রাণে—
বলো দেখি তোমরা কি তার কথার কিছু আভাস পেলে।

রাখাল বালকের গান আসলে তার নিজেরই সহজ গুঞ্জরণ তার নিজেরই জন্য। যদিও তার সুর বেজে থাকে অন্য নিরপেক্ষ শ্রোতার মনে। হয়তো ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য তার কথার আভাস বোঝা যায়নি তবু সুর মনে লেগেছে। এইবারে শুরু হয় দেওয়া-নেওয়ার চমৎকৃতি:

আমি তারে শুধাই যবে 'কী তোমারে দিব আনি'—
সে শুধু কয়, 'আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।'

গানের সঞ্চারীতে এসে রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব বিচিত্রতা আনলেন। সঞ্চারিত হল গল্পরস ও নাট্যবেগ। অসম এক বিনিময়ের শর্ত আমাদের কৌতূহলী করে তুলল। কী নেবে তোমার ওই অপরূপ গানের জন্য? সামান্য এই প্রশ্নের কী অসামান্য প্রত্যুত্তর : 'তোমার গলার মালা'। দেবার ইচ্ছা ছিল বোধ হয় কোনো বস্তু, কোনো কিশোরশোভন উপহার। কিন্তু সে চেয়ে বসল সৌন্দর্যকে। এর পরের অংশ একেবারে অনবদ্য :

দিই যদি তো কী দাম দেবে যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে—

যে মালাখানি সে চায় তার বিনিময়ে কোন্ মূল্য তাকে দেওয়া যায় তা ভাবতে ভাবতেই দিন যায় গড়িয়ে কখন আনমনে। তারপরে প্রসঙ্গটি যখন প্রায় ভুলে যাওয়ার পর্যায়ে তখন বটের ছায়ায় ফিরে এসে পরম বিস্ময়ে দেখা গেল রাখালছেলে তাঁর বাঁশিটি ফেলে গেছে। যাকে আপন গলার মালাখানি দিতে গিয়ে সারাদিন ভাবনায় কাটে, অর্থাৎ দেব কি দেব না, যদি দিই তবে বিনিময়ে কী পাবো, সে কিন্তু তার নিঃশ্বাসের মতো সদাসহচর বাঁশিখানি ফেলে রেখে গেছে। এই ফেলে যাওয়া কি ইচ্ছাকৃত না ভ্রান্তি? গানের নাম যখন 'প্রত্যাশা' তখন বোঝা সহজ যে এই ফেলে যাওয়াটা নিতান্তই প্রত্যাশাবিহীন। উত্তমর্ণের দরাদরির পাশে অধমর্ণের এই অনায়াস দান কী অপরূপ মানব সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয় এবং আমরা পেয়ে যাই দেওয়া-নেওয়ার আরেক মাধুর্যমণ্ডিত রূপ।

এর চেয়েও চমৎকাব বিনিময়ের কাহিনি রবীন্দ্রনাথ আঁকেন '*পূরবী*র যুগে, যখন তাঁর বয়স তেষট্টি। গানটির আদিরূপ সম্ভবত কবিতা, নাম 'বদল'। ১৯২৫ সালের ১৭ জানুয়ারিতে জাহাজে বসে লেখা। রবীন্দ্রনাথ তখন চলেছেন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইতালি অভিমুখে। 'বদল' কবিতাটির গীতরূপ আগে না পরে? প্রভাতকুমার তাঁর *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচির* ৮৩ পৃষ্ঠায় গানটিকে ১৯২৫ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখই নির্দেশ করেছেন। তথ্য যাইহোক, গানটি স্থান পেয়েছে গীতবিতানের 'প্রেম' পর্যায়ে। আসলে এই গান কিন্তু একটি সুন্দর রূপক কাহিনি যার বিষয়বস্তু বিনিময় এবং তা নরনারীর মধ্যে। জীবনের পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে আপাতলাভের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে কত পরিণামী বৈপরীত্য এ গানে তারই ইঙ্গিত। গানটি এই রকম :

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা।।

দুজনের সঞ্চয় দুরকমের। নারীর হাতে বর্ণময় হাসির ফুলের হার, যার মধ্যে রয়েছে সাফল্য ও আনন্দের অন্তর্গূঢ় আভাস। পুরুষের হাতে রয়েছে অশ্রুময় ফলভার, অকৃতার্থতায় ভারী, দুঃখসমাকুল। এই অসম জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে :

সহসা আসিল কহিল সে সুন্দরী 'এসো না বদল করি'।
মুখপানে তার চাহিলাম, মরি মরি, নিদয়া সে মনোহরা।।

সুন্দরী মনোহরা নারীর 'নিদয়া' বিশেষণ খুবই ইঙ্গিতবহ। তার প্রস্তাব তো গৃহীত হবেই। তার নির্দয় হৃদয়ের প্রচ্ছদে রয়েছে সুন্দর আনন। সেই দিকে চেয়ে পুরুষের মনে জাগে ভাগ্যবদলের লোভ,

সেইসঙ্গে দুঃখ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটাও সত্য। ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটে, কেবল উপমা বদলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য বাণীতে লেখেন :

সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা চাহিল সকৌতুকে।
আমি লয়ে তার নবফাগুনের মালা তুলিয়া ধরিনু বুকে।

গান রচনার সুচতুর কৌশলে আস্থায়ীর 'হাসির ফুল' সঞ্চারীতে এসে হয়ে যায় 'নব ফাগুনের মালা' আর 'দুখের ফল' রূপান্তরিত হয় 'ভরা বাদলের ডালা'। তবু বিনিময়ের বস্তুগত অসমতা থেকেই যায়। কিন্তু এ দেওয়া-নেওয়ায় জিতল কে? সুন্দরী মোহময়ী হেসে দূরে চলে গেল ত্বরিতে, সঙ্গে নিয়ে গেল পুরুষের সারাজীবনের বেদনাপ্লুত অর্জন, তার কৃতি, তার নিজস্ব যা কিছু এবং দৃপ্ত ঘোষণায় জানিয়ে গেল তারই জয় হয়েছে। এদিকে পুরুষ ঘরে ফিরে :

সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা।

দেওয়া-নেওয়ার পরিণামে এই ব্যর্থতা এই সন্তাপ একান্ত অপ্রত্যাশিত বলেই গানের শেষ পঙ্‌ক্তি আমাদের দেয় অনির্বচনীয় আনন্দ।

এই রূপক কাহিনি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় আমাদের বোঝাতে চান, সব কিছুর বিনিময় হয় না। যদি বা স্বেচ্ছায় তা আমরা ঘটাই তবে পরিণামে আপাতলাভের বদলে জোটে রিক্ততা। আর একের অর্জন অন্যের পক্ষে ভিন্ন স্বরূপে দেখা দেয়।

দেওয়া-নেওয়ার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের কবিতা রচনায় নানাভাবে এসে গেছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তবে সবচেয়ে প্রগাঢ়ভাবে এই বিনিময় তত্ত্ব তাঁকে গ্রাস করে তাঁর উত্তরপঞ্চাশ বয়সে '*বলাকা*' কাব্য রচনার সমসময়ে। সেই দেওয়া-নেওয়া অবশ্য নিতান্তই ভক্ত-ভগবানের বলয়ে সীমায়িত। সেখানে বলার কথাটা প্রধানত এই যে আর সবাইকেই ঈশ্বর দেন, শুধু মানুষের কাছে তাঁর ফিরে পাবার প্রত্যাশা। আর একটা কথা হল ঈশ্বর নিজেকে আস্বাদন করার জন্যই যেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া, আকাঙ্ক্ষা আর আকুতিতেই দান তাঁর ঈশ্বরিক পূর্ণতা। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটা বড় তফাত, অন্তত ভগবানের চোখে, *বলাকার* অন্য একটি কবিতায় ব্যক্ত হয়। সেখানে পাখির সঙ্গে প্রতিতুলনায় মানুষের ভূমিকা স্রষ্টার কাছে কতটা বড়, কতখানি অন্যরকম প্রত্যাশায় রঙিন, তা বোঝানো আছে। বলা হয়েছে, স্রষ্টা ঈশ্বর পাখির কণ্ঠে শুধু গান দিয়েছেন এবং পাখি তাই শুধু গানই গায়, তার বেশি কিছু দেবার সামর্থ্য তার নেই।

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।

কিন্তু স্রষ্টা মানুষকে যা দিয়েছেন মানুষ তার বেশি কিছু প্রত্যর্পণ করে। তাই বলা হয় :

আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

এখানে পাখির গান বলতে দুর্বোধ্য সুরলহরী যা বাণীহীন। আর মানুষের গান মানে স্বর ও বাণীর বিন্যাস অর্থাৎ সংগীত। এই বাণীর মধ্যে লুকিয়ে থাকে মানুষের স্বনির্মাণ। সেই গভীর বাণীর মধ্যেই মানুষের আত্মতা, তার আর্তি ও আনন্দ, তার বিশ্বাস ও বেদনা। এ তার একেবারে নিজস্ব আস্বাদন। সংগীতের শরীরে মানুষের সেই গভীর-গোপন মহা আপন আত্মতাটুকু ভরে ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দেওয়া। এমনকি হয়তো এতদূর যে সে-গানের বিষয়ভূমিতে রয়ে যায় কখনো-কখনো স্রষ্টারই বন্দনা, যা মানুষের স্বরসৃষ্টির সময় তিনি ভাবেননি পর্যন্ত।

এখানেই মানুষের প্রতিদানের মৌলিকতা নয় শুধু। উপমার টানে রবীন্দ্রনাথ ওই কবিতাতে দেখান স্রষ্টা বাতাসকে স্বাধীন ভারবিহীন করেছেন বলেই বাতাস স্বচ্ছ বহমান স্বতোশ্চল। কিন্তু মানুষকে নানা বন্ধনে বেঁধেছেন, শোক মায়া মোহ দেহ কান্না আর স্মৃতির বন্ধন, সেই বন্ধন মুক্ত হয়ে তবে তো মানুষের ঊর্ধ্বায়ন। তবে তো প্রতিদান দেওয়ার প্রশ্ন। আরেক উপমায় গাঁথা হয় এই কথা যে, পূর্ণিমাকে দেওয়া হয়েছে সানন্দ হাসি আর সুখস্বপ্নের আশীর্বাদ। তাই দিয়ে সারা পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয় পূর্ণিমার মত্ত জ্যোৎস্না। কিন্তু মানুষ জন্মেছে তার সহজাত দুঃখবোধ নিয়ে। সারাজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও দহনের পালা শেষে মানুষ তার স্রষ্টার দেওয়া দুঃখকে ফেরত দেয় আনন্দে অনুবাদ করে। এ কী কম কঠিন সাধনা। তাই কবিতার শেষে মানুষের এই অহংকার আর চাপা থাকে না। ঈশ্বর যে মানুষকে শুধু দেন না, ফিরে পেতেও চান এখানেই জীবজগতের মধ্যে নবজীবনের সার্থকতা। সেইজন্যই :

আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেওয়া-নেওয়ার তত্ত্ব খুবই স্পষ্ট, অত্যন্ত বিশদ। গানে দেওয়া-নেওয়ার কথাটা যেন অনেক নিগূঢ় সংকেতে বলা হয় সুরের আবরণের মর্যাদা রাখতে অনেক সংবৃত ভাষায়। গানের ধর্মই যে বড় অবগুণ্ঠিত। তাই তার বাণীর অনেক অব্যক্ততা খুলে যায় সুরের সূক্ষ্মতায়। 'আমি যে আর সইতে পারিনে' কথাটা বাণীতে আর কতটুকু ফোটানো যায়, অসহতা তো ফোটে গানের সুরে। কেন-না যা সুরে বাজে মনের মাঝে তাকে কি কথা দিয়ে ব্যক্ত করা যায়? রবীন্দ্রনাথের দেওয়া-নেওয়ার কবিতা তাই তেমন করে আমাদের জাগায় না। মনে হয় বড় বেশি উচ্চারিত, স্পষ্ট, অনেকটাই অহংকৃত। অথচ সকল অহংকার শেষপর্যন্ত চোখের জলেই ক্ষান্ত হয়।

তাই কবিতা নয় গান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিনিময়ের তত্ত্ব আর দেওয়া-নেওয়ার স্বভাব বেশিরভাগ গাঁথেন গানে। গানের সুরের আসনে তার সবচেয়ে সাবলীল স্থিতি। দেওয়া-নেওয়ার অহংকার হোক বা দিতে-না-পারার বেদনাই হোক তা গানে যেমন ফোটে তেমন কবিতায় নয়। গানে আর এক সুবিধা থাকে। তার স্বভাবের অস্পষ্টতা আর সুরের দূরত্ব গানের বাণীকে অনেকসময় ঢেকে রাখতে পারে, বিষয়কে করে তুলতে পারে বহুমাত্রিক। তাই এমনও হয় মাঝে মাঝে যে খাঁটি একটা দেওয়া-নেওয়ার গানকে আমরা হয়তো চিনতেই পারি না। কেয়াফুলের মতো তা ঢাকা থাকে সুরের আবরণে। রবীন্দ্রনাথের যখন ছিয়াত্তর বছর বয়স তখন অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে বর্ষামঙ্গলে গাইবার জন্য তিনি লেখেন :

ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী,
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কিসের আহ্বানে।।

প্রভাতকুমার একটি টিপ্পনী সংযোগ করে জানিয়ে দেন এ-গানের উৎসভূমিতে আছে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্মৃতি।

সেই স্মৃতির প্রভাব থাকা বা না-থাকা আপাতত আমাদের পক্ষে খুব প্রাসঙ্গিক নয়। বরং অনেক জরুরি এই গান একটি সূক্ষ্ম দেওয়া-নেওয়ার ব্যর্থতার ছবি এতে আভাসিত আছে বলে। আমরা বুঝি

দেওয়া-নেওয়া মানে সব সময় পূর্ণতাই নয়। কখনো কখনো কোথায় কীভাবে ফাঁকও থেকে যেতে পারে। যেমন এই চির-অচেনা পরদেশির ক্ষেত্রে হয়ে যায়। তার কথা ভালো বোঝা যায়নি তবু তার আভাস সর্বদাই হৃদয়কে আন্দোলিত করে কোন্ মনোমোহন সুরে। এবারে সেই চির-অচেনার অন্যপক্ষ সম্পর্কে একটা বিবরণ ফোটে গানের-সঞ্চারী অংশে। বলা হয়—

প্রভাতে একা ব'সে গেঁথেছিনু মালা
ছিল পড়ে তৃণতলে অশোকবনে।।

প্রভাতে একা একা বসে প্রত্যাশার যে-মালা গাঁথা হল তা পড়ে রইলো কেন তৃণতলে উদাসীন? মালা কি গাঁথা হয়নি শেষপর্যন্ত? নাকি মালার প্রাপক সম্পর্কে ছিলো কোনো সন্দেহ? কোনো মগ্ন সংশয়? আশ্চর্য যে,

দিনশেষে ফিরে এসে পাইনি তারে,
তুমিও কোথা গেছ চলে—
বেলা গেল, হল না আর দেখা।।

দিনান্তে সেই প্রভাতের মালা আর কি পাওয়া যায়? দয়িতও তো অনিবার্যত কোথায় চলে যায়। এই ভাবেই ঘটে এক সম্ভাবনাপূর্ণ দিনের মর্মান্তিক অবসান। দেওয়া-নেওয়া আর ঘটে ওঠে না কোনোভাবে কোনো পক্ষে। এই রিক্ততার ব্যর্থলগ্নের কথাটাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ধরে দেন।

১৯১০ সালে উনপঞ্চাশ বছর বয়সে মুখ্যত *রাজা* নাটকের প্রয়োজনে ঠাকুরদার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ভরে দেন দুটি গান যা খুব সহজে ঐশী সংরাগে ধূপাচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু একটু গভীরতর দৃষ্টিপাতে সেই গানেই শরীরী আভাসন জাগে প্রেমের, দহনের। প্রথম গান:

আমার সকল নিয়ে ব'সে আছি সর্বনাশের আশায়
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।।

এ-গানকে কি কিছুতেই আধ্যাত্মিক বলতে মন সাড়া দিতে পারে? মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয় শুধু নয়— এ গানে শরীরের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা কি একেবারে অলক্ষ্য থেকে যায়? এ তো সেই প্রথম জীবনের অস্ফুট উচ্চারণে বলা নয় যে 'আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ'। এখানে সকল নিয়ে বসে থাকা আর সর্বনাশের ইঙ্গিত কি মিলিতভাবে দেহকেও দ্যোতিত করে না? সর্বনাশ তো এখানে সর্বাত্মক। তাতেই পরম করে পাওয়া এবং সেইজন্যই পথ চেয়ে থাকা। এ-সর্বনাশ কোনো হঠ পরিরম্ভন নয়। এ হল পরম প্রার্থনীয় সর্বনাশ যার নিশানা ফোটে প্রার্থিতের চোখের অগ্নিকোণে। 'তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ' হয়তো এমন দারুণ কবোষ্ণ শান্তির আভাসেই লেখা। এই সর্বনাশ আসলে ঘটিয়ে দেয় প্রাপ্তি। নিজেকে নিঃশেষে দিতে পারার গর্বে।

এই গর্ব প্রেমের স্বাভাবিক অলংকার। তাই এর লাগোয়া গানে বলা হয় আরেকটু স্পষ্ট কামনার কথা। এখানে শুধু সর্বনাশের আশায় বসে থাকা নয় বরং 'প্রিয় আমার'কে নিজের উতলা পরাণের অলজ্জ ঘোষণা জানিয়ে খুব তপ্ত আহ্বানে বলা যে,

কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।
তুমি সাধ করে, নাথ, ধরা দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—

এইখানে বিচ্ছুরিত হয় প্রেমের সত্যকারের শক্তি। একমাত্র প্রেমের ভেতরকার শক্তি এতখানি দাবি তুলতে পারে যে কেবল একজনই তো শুধু রাঙিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে না। দেবার ব্যথা যে দোসরের বুকেও। তাই সাধ করে ধরা দেওয়ার মধুর আহ্বানরক্তিম কামনাটুকু ব্যক্ত করে নিজের রংটুকু

দেওয়ার প্রার্থনা জানানো। সেটাই তো স্বভাব বিনিময়। একই রঙে দুজনের উত্তরীয় রাঙানো। লক্ষণীয় যে এ প্রার্থনায় নেই দীনতার লেশ বরং রয়েছে গর্বিত উচ্ছ্বাস।

এই যে নিজেকে দেওয়া, নিজের বাসনা থেকে দেওয়া, নিজেকে সানন্দে কাঙাল করা এও এক পাওয়া। এর মধ্যে অণুতম গ্লানি নেই। তাই মত্ত অহংকারে আরেক গানে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল, কিছু তো নাই বাকি
ওগো নিঠুর, দেখতে পেলে তা কি।।

এবারে তবে সর্বনাশের শেষ পর্যায়। 'সব দিবি কে' এ প্রশ্নের স্বস্তিকর সমাধান। যাকে বাসনার পথে আহ্বান করা হল সেই প্রাপণীয়কে এবারে নতুন করে বলতে হয় নতুন বিনতিতে :

তার সব ঝরেছে, সব মরেছে, জীর্ণ বসন ওই পরেছে—
প্রেমের দানে নগ্ন প্রাণের লজ্জা দেহো ঢাকি।।

সব ঝরেছে, সব মরেছে এই স্বগত উপলব্ধির বিশেষণ হয়তো এই কথাই বোঝায় যে ঝরে গেছে আত্মতার অহংকার, মরেছে শরীরী কামনা। এখন সেই নগ্ন প্রাণের একমাত্র শুশ্রূষা তাই প্রেম। বলতে আর লজ্জা নেই,

তার দীপের আলো কে নিভালো, তারে তুমি জ্বালো জ্বালো—
আমার আপন আঁধার আমার আঁখিরে দেয় ফাঁকি।।

আলোহীন প্রদীপের উপমায় প্রেমহীন দেহকে বোঝানো হয় এ-গানে। যেমন করে আলোর গর্বে প্রদীপ হয়ে ওঠে শিখাময়ী তেমনই অপরের প্রশ্রয়ের প্রেমে জ্বেলে নেওয়া যাক এবার আত্মদীপ। আপন আঁধার যে বড়ো প্রবঞ্চক। আত্মপ্রবঞ্চনা ঘটুক তাই বাসনা শিখার দহনে।

দেওয়া-নেওয়ার গান অনেক সময়েই ঢেকে থাকে ঐশী সংক্রামে তাই সেগুলি চিনতে ভুল হয়। যেমন অমোঘ এই গান, রবীন্দ্রনাথের ছত্রিশ বছর বয়সে লেখা, পতিসরে বসে :

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই।
ওগো ভিখারি আমার ভিখারি, চলেছ কী কাতর গান গাই।।

এমন কী দায় আছে যে এখানে কাঙাল আর ভিখারি বলতে শুধু ভগবানকেই বুঝতে হবে, যেমন বলেন অনেক সমালোচক? যে-কাঙাল নিজেকে কাঙাল করেছে অন্যের প্রেমে, অন্যকেও করেছে প্রেমের কাঙাল সেই রাজভিখারির আবার কেন কাতর গান গাওয়া? এই কথাটির উত্তরের মধ্যে আছে গানটির মাধুর্য।

চিত্রাঙ্গদার মতো 'দেওয়া হ'ল না আপনারে' এমন দুঃখব্যথা এই গানে কোথাও নেই বরং নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে দেওয়ার পরও আরও দিতে না পারার বেদনায় বলা হয়েছে :

প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে—
ভিখারি আমার ভিখারি,
হায়, পলকে সকলই সঁপেছি চরণে, আর তো কিছুই নাই।।

কথাটা একেবারে নতুন, বেদনাও তাই অভিনব। যা প্রতিদিন তিলে তিলে নতুন নতুন সম্ভারে দান করার সাধ ছিল তা পলকেই প্রার্থিতকে একসঙ্গে দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য ভিখারি কেন কাতর কণ্ঠে গান গেয়ে বেড়ায়? রহস্য সেখানেই। তারও যে প্রতিদিন পাবার আকাঙ্ক্ষা। দাতার ক্ষমতা সীমায়িত, গ্রহীতার চাওয়া প্রতিদিনের। এর সমতা ঘটবে কেমন করে? একজনের আশা পূর্ণ করতে আরেকজন তার নিখিল ভুবন পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে, শূন্য হয়ে গেছে তার সম্বল। তাই তাকে বলতে হয় :

হেরো মম প্রাণ মন যৌবন নব করপুটতলে পড়ে আছে তব—
ভিখারি আমার ভিখারি।
হায়, আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব তাই।।

শূন্যতা এইখানেই যে নিজের যা-কিছু অর্থাৎ প্রাণ মন যৌবন সবই তো অন্যের করতলগত তাই নিজের বলতে আর কিছু থাকে না। তবে কী দেওয়া হবে আরও? এইখানে বলার রহস্য চমৎকার তাই জানানো যে আরও যদি কিছু চাও তবে আরও দাও তবেই তো প্রত্যপর্ণের প্রশ্ন। ভিখারি তাহলে কে? যে আরও চাইছে না যার আর কিছু নেই? কেউই কি কাঙাল নয়? ভিক্ষা কি তাহলে ভান? দেওয়া-নেওয়ার সবচেয়ে আবিষ্ট গভীরতা এই গানে লুকিয়ে আছে। প্রেমের সবচেয়ে মহিমা এইখানে যে কাঙালিনীর আঁচলই সে দাবি করে শুধু।

দেওয়া- নেওয়ার সম্পূর্ণ অন্য এক পর্ব পাই আরেক গানে, যেখানে 'বাদলদিনের প্রথম কদমফুল' প্রতীক হিসাবে এসেছে। এই গান রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর দু'বছর আগে লিখেছিলেন ১৯৩৯ সালে এবং এটিরও একটি কবিতারূপ পাওয়া যায় *সানাই* কাব্যে। সেখানে কবিতাটির নাম 'দেওয়া- নেওয়া'। গানটি নিশ্চয়ই প্রেমের, যদিও গীতবিতানের প্রকৃতি পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। একদিক থেকে গানটি প্রকৃতি ও মানবসম্পর্কের জটিল রহস্য-সম্পর্ককে নির্দেশ করে। গানটির সূচনার উচ্চারণেই রয়েছে বেশ উচ্চকিত নাটক :

বাদল-দিনের প্রথম কদমফুল করেছ দান।
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান।।

দুজনের দেওয়া- নেওয়ার বিষয়টি স্বভাবে কত বিপরীত। প্রথম কদমফুল নারীহৃদয়ের রোমাঞ্চিত প্রেমের প্রতীক নিশ্চয়ই, কিন্তু তার বিনিময়ে শ্রাবণের গান প্রেমিক হৃদয়ের অভিনব প্রত্যুপহার সন্দেহ নেই। এ গান দুর্লভ, বহু প্রয়াস সম্ভব এবং বহুদিনের প্রত্যাশাজাত। তাই তার বর্ণনায় বলা হয়েছে :

মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে
রেখেছি ঢেকে তারে
এই-যে আমরা সুরের ক্ষেতের
প্রথম সোনার ধান।।

এ সেই রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা নামের মতো পবিত্র গোপন প্রেম এবং এও সুরের ক্ষেতের প্রথম স্বর্ণাভ ফসল। তবে প্রথম কদমফুলের সঙ্গে প্রথম সুরের ধানামঞ্জরীর একটা মূল তফাত আছে। সে কথা বলা হয় সঞ্চারীতে এই ভাবে :

আজ এনে দিলে, হয়ত দিলে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলে ডাল।।

অর্থাৎ বাদলদিনের অমন যে-প্রথম কদমফুল তারও মাধুর্যসীমা বড়ো সংক্ষিপ্ত। কারণ সে তো প্রকৃতির ফসল। তাই প্রকৃতিরই নিয়মে অনিবার্যভাবে তার ডাল হবে একদিন রিক্ত পুষ্পহীন। তখন? তোমার দেওয়া ফুলে তো চিরন্তনের অঙ্গীকার নেই, তার সঞ্চয় তো অনিঃশেষ নয়। কিন্তু আমার যে-গান তা অনিঃশেষ। প্রতি শ্রাবণের স্মৃতি-সংকুল এই গান বারবার উৎসারিত হবে তোমার স্মরণে তোমার প্রেমের সম্মানে। তাই :

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে

ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান।।

এখানে বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবন বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তোলে। যেন বলা হচ্ছে, তুমি ভুলেও যদি যাও তবু আমার গানের উৎসার থামবে না। যেন প্রকৃতির উপর জয়ী হল মানব। প্রেমের দান হিসেবে এক বর্ষা কদমফুল যে স্মৃতি-বিস্মৃতির মালা গাঁথে তার চিরন্তনতা ঘটে যায় চিরদিনের প্রেমিক সত্তার গান রচনায়।

কালক্রমের দিক থেকে ঈষৎ আগেকার আরেকটি লক্ষণীয় গান হল 'তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে'। *সানাই* কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ গানের কবিতারূপ পরে দেওয়া। গান রচনার তারিখ ১২ জুলাই ১৯৩৯ শ্রীনিকেতনে। গানটি সঠিকভাবে স্থান পেয়েছে গীতবিতানের প্রেম পর্যায়ে। কিন্তু এ গানে যে এক অগোচর দেওয়া-নেওয়ার অন্তর্ঘাত লুকিয়ে আছে তা সহসা চোখে পড়ে না। যেন কত সহজেই বলা হল সূচনায় যে,

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে
আমার ভাঙল যা তা ধন্য হল চরণপাতে।।

ভাঙনের পথে যার স্বৈর আগমন তার অভিসার ঝড়ের রাতেও নয় এবং সে নয় রবীন্দ্রগানের বহু চেনা দুঃখ-রাতের রাজা। এ একেবারে নতুন। হয়তো নামান্তরে প্রেম। যা ভাঙনের পথ ধরে এসে আমাদেরই ভেঙে দেয়। ঘুচে যায় সুপ্তির জড়িমা। তাই তার দৃপ্ত চরণপাতে নিজেকেই ধন্য বলে মানতে হয়। তার আগমনের স্মৃতি, ধ্বস্ততার যন্ত্রণা গোপনে রক্তমণির হারে আপন বেদনায় আস্বাদনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে এর পরে। সুর পালটে যায় তারপর সঞ্চারীতে এসে, পালটে যায় অনুষঙ্গ। বলা হয় :

তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে
ছিন্ন যবে হল তার ফেলে গেলে ভূমি 'পরে।

এই সেতার কোলে তুলে নেওয়াই আসল অধিগ্রহণ। শুধু ভাঙনের পথে আসাই নয়, সেতারে ঠিক সুরটি তুলে দেওয়াও জীবনের পূর্ণতার চিহ্ন। এই তার বাঁধতে গিয়েও যে বিষম ব্যথা। সে তো নিজে নিজে হবার নয়। তাই একজনের সংকীর্ণ জীবনের একক সুরে বাঁধা যে সেতার তাতে নিষ্ঠুর করের মার্জনা বড়ই প্রার্থিত। কিন্তু সেই বড়-জীবনের মীড়মূর্ছনা তো ধরবে না শীর্ণ সেতারে। তাই তার ছিন্ন তন্ত্রীর ব্যর্থতা এনে প্রেম তাকে বড় কিছুর জন্য প্রস্তুত করে দিয়ে যায়। এইটাই তার দান। মুখর সেতার নয় বরং তার নীরবতা এখন অনেক ইঙ্গিতবহ। তাই স্বীকৃত হল :

নীরব তাহারি গান আমি তাই জানি তোমারি দান
ফেরে সে ফাল্গুন-হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরহারা মূর্ছনাতে।।

নীরবতার এই নতুন অনুভব জীবনকে এমনভাবে পূর্ণ করে তোলে, তৈরি ক'রে দেয় এবং বৃহৎ এক নির্মাণের পথে যে জীবনের তথা প্রেমের ঘটে সার্থকতা। দেওয়া-নেওয়ার এক আপাত অগোচরে মাধুর্য এ গানে ফুটে ওঠে। আশ্চর্য যে, বাদলদিনের প্রথম কদমফুলের গানে সবশেষে উচ্চারিত হয়েছিল শ্রাবণে শ্রাবণে উৎসারিত গানের প্রসঙ্গ আর এ গানে জেগে উঠল ফাল্গুন-হাওয়ায়-হাওয়ায় বারবার ফিরে-আসা মূর্ছনার কথা। মূলে যে একাকীত্বের গান শ্বাসরুদ্ধ হয়েছিল সীমার শঙ্কায়, নতুন প্রেম তাকে বিতত করে অসীমে চিরকালীনতায়।

দেওয়া-নেওয়ার গান হিসাবে খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে গানটি এবারে বিবেচ্য তা রচনার দিক থেকে আরও আগের, রবীন্দ্রনাথের ঊনসত্তর বছর বয়সের। এ গানের গঠন ও সুরে রয়েছে সাবিত্রী গোবিন্দনের এক

দক্ষিণী গানের চিহ্ন। টপ্পা অঙ্গের এই গান স্থান পেয়েছে গীতবিতানের 'বসন্ত' উপবিভাগে। আসলে এ গানও প্রেমের, তবে বসন্তের উদ্দাম আবেশে। দুই তুকের সংক্ষিপ্ত গানটিতে বলার কথাও যৎসামান্য। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির বিনত আবেদন :

তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো—
ফুলের গন্ধে বাঁশির গানে, মর্মরমুখরিত পবনে।।

এই গোপনে কিছু দিয়ে যাওয়ার জন্য আকুলতা ফোটে সুরের কারুণ্যে, টপ্পার দানায়। ফুলের গন্ধ, বাঁশির গান আর মর্মরমুখর বাতাসের নেপথ্যে রয়ে যায় মত্ত বসন্তের হা-হা আভাসন। এই পর্যন্ত কিছু পাওয়ার ব্যাকুলতা। কিন্তু শুধু পাওয়াই তো নয়, কিছু দেওয়ার আবেগটুকুও সত্য। তাই এবারে বলা :

তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে—
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে।।

এই প্রতিদানের প্রশ্নে গানটি হয়ে ওঠে মানবসম্পর্কিত ও জটিল। বসন্তই যদি এক্ষেত্রে হয় দাতা তবে তার সানন্দ দানের বদলে তাকে নিতে বলা হচ্ছে বেদনা হতে আরও বেদনা। এ কেমন অসম প্রতিদান? একদিক থেকে বোধহয় এটাই সঠিক প্রতিদান। সবচেয়ে সংগত আর আন্তরিক। কেন না বেদনাই তো মানুষের সবচেয়ে আপন ও নিভৃত অর্জন। তাই প্রকট হাসির গভীরে নিহিত যে-অশ্রু, নিতে বলা হল তাকেই। নীরবে নয়নের অন্তরালে যে অব্যক্ত ভাষণ, বসন্তের কাছে সেই তো মানুষের আন্তরিক উৎসর্গ।

দেওয়া-নেওয়ার মূল সত্য রয়ে গেছে অসমতায়—রবীন্দ্রনাথের সব দেওয়া-নেওয়ার গানে সম্ভবত এই কথাটাই বড় হয়ে আছে। সেখানে কখনো দাতা বড় হয়ে ওঠে, কখনো গ্রহীতা। কখনও দাতাই হয়ে যায় গ্রহীতা। তবু দেওয়া-নেওয়া চলে অবিরত, অনাদ্যন্তকাল আর সব কিছুর মধ্যে।



রবীন্দ্রনাথের গান ও তার গায়ন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা ও সুর করা অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি যখনই আমি শুনি, তখনই শুরুতে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। গানটি দ্বিজেন্দ্রলাল রেকর্ডে গেয়েছিলেন, সেকালের এক চওড়া রেকর্ডে, সঙ্গে কোরাসে দোহারকি দিয়েছিলেন তাঁর কিশোর পুত্র দিলীপকুমার ও বালিকা কন্যা মায়া। সেই দুর্লভ ও অ্যান্টিক রেকর্ডটির গান আমি শুনেছিলাম কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে পঞ্চাশের দশকে। ১৯১৩ সালে প্রয়াত হন দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজেই তার আগে কোনো সময়ে রেকর্ডে তিনি এ-গান দিয়েছিলেন। তখনও তো বাংলায় রেকর্ডিং ব্যবস্থা সাবালক হয়নি তাই ধ্বনিগত সমস্যা ছিল, তবে গায়কের সুরেলা গলা ও দৃপ্ত বিশ্বাসের উচ্চারণ শনাক্ত করতে অসুবিধা হয়নি। কেমন ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের গানের গায়নরীতি, কতটা ওস্তাদি ও কী নিপুণ সুর মিশ্রণের (দেশিবিলাতি) লীলা তা ওই এক রেকর্ডেই স্পষ্ট। পরে দিলীপকুমার ওই গান রেকর্ড করেছেন, তাতে খানিকটা গায়নগত মার্জনা করেছেন, স্বরলিপিও করেছেন। তবু গানটি সুরের দিক থেকে শুদ্ধ চরিত্র রক্ষা করতে পারেনি। তার কারণ দ্বিজেন্দ্রগীতি গায়নের কোনো নির্দিষ্ট মান এ দেশে গড়ে ওঠেনি, তাঁর কোনো অছি নেই, তাঁর একমাত্র পুত্রও ছিলেন প্রবাসী। ফলে অমন অসামান্য গানের সুর ও তাল তো বিকৃত হয়েছেই, গায়নও গেছে বদলে। আমার কাঁটা হয়ে থাকার কারণ অবশ্য অন্য আরেক কাণ্ডে। ওই বিখ্যাত গানের বাণীও বিকৃত হয়ে গেছে। 'ধনধান্য পুষ্পভরা' হয়েছে 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' এবং প্রায়ই শুনি 'চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা কোথায় উজল এমন ধারা'র বদলে 'চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা কোথায় এমন উজল ধারা'। দূরদর্শনে কোনো দলের সম্মেলক গানে, সভাসমিতিতে, স্কুল-কলেজে এমন ভাষা সংহার প্রায়ই শুনি এবং মনের মধ্যে শোচনা হয়।

পাশাপাশি মনে আসে, রজনীকান্তের গান বা কান্তগীতির গানের গায়ন বিষয়ে কোনো ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি এবং তার প্রচারও অত্যন্ত সীমায়িত। অতুলপ্রসাদের ২০৮খানি গানের বাণী পাওয়া গেছে। তার মধ্যে স্বরলিপি আছে ৬৫খানি গানের। বাকি গানগুলির বাণী-শরীর শুধু এখন আমরা পেতে পারি বা পড়তে পারি। সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত ১২টি অতুলপ্রসাদের গানে সুর দিয়ে রেডিয়ো ও রেকর্ডে প্রচার

করেছেন নিজে বা অন্যকে দিয়ে গাইয়ে— কেউ জানতেই পারেননি, প্রতিবাদের প্রশ্ন তো ওঠেই না। এ ব্যাপারে আরেক কাণ্ড করে গেছেন দিলীপকুমার রায়। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই তাঁর জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে যথেচ্ছ সুরবিহার করে দিলীপকুমার যেভাবে ও গায়নে অতুলপ্রসাদের গান প্রচার করে গেছেন বা অন্যকে শিখিয়ে গেছেন তা বেশ অন্যরকম। সাহানা দেবীর গানে সেই ধাঁচা পাওয়া গিয়েছিল এবং মঞ্জু গুপ্ত-র গানে। সেই গায়নের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের প্রত্যক্ষ শিষ্য পাহাড়ি সান্যালের গায়নের প্রায় কোনো মিলই নেই। আসলে অতুলপ্রসাদের বেশিরভাগ গানে আস্থায়ীর পরে তিনটি অন্তরা আছে একই সুরের ছাঁদে— দিলীপকুমার ওই ধাঁচের সুরের ও চলনের একঘেয়েমি কাটাতে কয়েকটি গানের দ্বিতীয় অন্তরাটিতে সুরান্তর ঘটিয়ে প্রায় সঞ্চারীর বৈচিত্র্য এনে ফেলেছেন। তার ফলে গানটি হয়তো সুখশ্রাব্য হয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই তাতে অতুলপ্রসাদের সাংগীতিক ইচ্ছাকে মান্য করা হয়নি। সেটা গুরুতর অপরাধ।

এই অপরাধের মাত্রাগত বেশি বা কম নানা সংগীতকারের গায়ন-পরম্পরার ক্ষেত্রে দেখি, তবে আধুনিক শ্রোতার কাছে তার মূল্য নানারকম। যেমন ধরা যাক, নিধুবাবুর টপ্পা গানের কোনো স্বরলিপি সে কালে করা হয়নি (কেন-না স্বরলিপি উদ্ভূত হয়নি তখনও) বলে তার গায়নরীতি ও সুরের ধাঁচা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা যেমন নেই তেমনই কোনো বিচ্যুতির প্রশ্নও নেই। ফলে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় যে'কটি নিধুবাবুর গান রেকর্ড করেছেন তাতে লেখা আছে 'সুর : প্রচলিত'। তার মানে পরম্পরাগত একটা গায়নরীতি ও সুরকাঠামো, যা রামকুমারের শ্রুতিবাহিত, সেটাই আমরা শুনি। তাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত অলংকরণ নিশ্চয়ই আছে, আছে ওস্তাদি ও কারদানি। সেটা আমরা মেনে নিয়েছি কেন-না বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ করে আমরা জেনেছি যে নিধুবাবুর গানের কোনো শিল্পী-পরম্পরা বা গায়ন-পরম্পরা নেই, তাই প্রত্যাশা বা প্রত্যাশাভঙ্গের কথা ওঠে না। ওসব গানের কোনো cerebral value বা শব্দগত ব্যঞ্জনাও তেমন নেই যাতে সুরবিচ্যুতি বা গায়নরীতি বিভ্রাটের অভিযোগ উঠবে। কথাটা গুরুতর হয়ে ওঠে আধুনিক কালের গানের ক্ষেত্রে, যেখানে গীতিকার ও সুরকার একই ব্যক্তি এবং তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির প্রয়োগগত কৌশল তাঁরই পরিকল্পিত। যেমন ধরা যাক নজরুলের গান। রেডিয়ো, রেকর্ড, সিনেমা ও থিয়েটার— এতগুলি গণমাধ্যমের জন্য তাঁকে সংগীত সৃষ্টি করতে হয়েছে এবং সেইসঙ্গে তাঁর নিজস্ব গজল-বর্গের গানের ঢং তো তাঁরই ভাবনার ফসল। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা ছিল পরিমাণে বিপুল এবং বৈচিত্র্যে ব্যাপক। ভারতীয় রাগরাগিণী, মধ্যপ্রাচ্যের নানা গীতরীতি ও বাংলার লোকগীতির বহুতর ভঙ্গি তাঁর আয়ত্ত ছিল বা অনুসরণের নেশা ছিল। গান ছিল তাঁর পেশা। তাই জন মনোরঞ্জনের কথা সব সময়ে আলাদাভাবে তাঁকে ভাবতে হয়েছে এবং গড়ে নিতে হয়েছে নতুন নতুন শিল্পী। তাঁরা সবাই মার্জিত সংস্কৃতিসম্পন্ন জগতের শিক্ষিত মানুষ ছিলেন না। যে-অর্থে গিরিশচন্দ্র নটনটিদের তৈরি করে নিয়েছিলেন সেই অর্থেই নজরুলকে গড়ে নিতে হয়েছিল তাঁর গানের কারিগরদের। সেই পর্বে শত শত গান রচনার তোড়ে, বিপণন জগতের নিত্যনতুন চাহিদার টানে, রেকর্ড কোম্পানির নানা উদ্ভট প্রত্যাশা পূরণের বাধ্যতায় তাঁর অবকাশ ছিল না সুস্থিতিসম্পন্ন অন্তর সংগীত রচনার শান্ত ধ্যানে মগ্ন থাকার। সাংগঠনিক বোধবুদ্ধি ছিল কম, যতটা মেতেছেন ও মাতিয়েছেন গানে গানে, ততটা ভাবেন নি সেই গানের চারিত্র্য নিয়ে বা তার স্থায়িত্ব নিয়ে। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে প্রমত্ত উজ্জীবিত অফুরন্ত নজরুলগীতি ক্ষণকালের ছন্দে দিশাহারা। তাই বলে উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাবার পরিণাম হয়তো ছিল না তার। স্থায়িত্বের নিশ্চিত স্বাক্ষর এবং আধুনিক গানের সরণিতে পরম্পরাগত সম্পদ তাঁর অনেক গানেই স্পষ্ট। তাঁর গানের সুর ও বাণীর রসদ নিয়ে পরবর্তী বাংলা গান খুব কম রচিত হয়নি। অথচ তিনি নিজের গান সম্পর্কে খানিকটা উদাসীন ছিলেন, যার ফলে তাঁর গানের স্বরলিপি করা বা তাকে সংরক্ষণ করার প্রবণতা ছিল না— যদিও তাঁর চারপাশে গান-জানা মানুষের বৃত্ত কখনো আলগা হয়নি। তাঁর গানে

অন্য লোক সুর দিয়েছেন, তিনি বাধা দেননি, বরং অনেকক্ষেত্রে তারিফ করেছেন। ফলে তাঁর চেতনকালেই তিনি অসহায়ভাবে দেখতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর গানের চেহারা অন্য গায়করা বদলে দিচ্ছেন কিংবা গানের রাগভিত্তি সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে।

প্রমাণস্বরূপ দেখা যাচ্ছে, তখনকার 'নবশক্তি' পত্রিকায় তিনি বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছেন চিঠি লিখে যে, তাঁর সুর-করা গান বেতারে ভিন্ন সুরে এমনকি ভিন্ন রাগে পরিবেশিত হচ্ছে। তখনও বোধশক্তি তাঁর নিশ্চল হয়ে যায়নি, তবুও শুরু হয়ে গেছে নজরুলগীতির সুরান্তর। তারপর যখন রয়ে গেলেন নজরুল শুধু জড় পুতুলের মতো নির্বোধ ও বাক্‌শক্তিরহিত, বছরের পর বছর, তখন আমরা দেখেছি নজরুলগীতিমেধ যজ্ঞ, একাধিক শিল্পীর কণ্ঠে। তার ফলে এখন আমরা মোটামুটি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি একই নজরুলগীতি বিভিন্ন শিল্পীর পরিবেশনায় ভিন্ন ভিন্ন সুরে ও গায়নে। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের কট্টর ইসলামপন্থীরা এক সময় তাঁর গানে শব্দ পাল্‌টে হিন্দুয়ানির চিহ্ন মুছতে চেয়েছিলেন। ফলে 'নবনবীনের গাহিয়া গান/সজীব করিব মহাশ্মশান' পঙ্‌ক্তি সংস্কারবাদীদের কলমে বদলে গিয়ে মহাশ্মশান পরিণত হয়েছিল গোরস্থানে। এ রকম অনেক স্থূল হস্তাবলেপের বৃত্তান্ত এখন পাওয়া যায়— বাংলাদেশের নজরুল অনুরাগীরাই সেসব তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন।

গানের ওপর এই যে গায়নের দাপট, স্রষ্টার চেয়ে পারফরমারদের ওস্তাদি, তা ভারতীয় গানে খুব নতুন নয় এবং এই জায়গাটায় সব মৌলিক সংগীতকারই অসহায়। রবীন্দ্রনাথ একবার পরিহাস করে তাই বলেছিলেন যে, বনিতা আর গান অন্যের কণ্ঠ আশ্রয় করে বেঁচে থাকে এই এক সমস্যা। এই সমস্যার মূল সংকট ভারতীয় সংগীতের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে প্রথম থেকেই আছে —কেন-না ভারতীয় সংগীত প্রধানত কণ্ঠাশ্রিত এবং সেই কণ্ঠ ঘরানাশাসিত। তাই ঘরানার নির্দেশিকা অর্থাৎ গুরুর অভিরুচি অনুযায়ী গানের রূপায়ণ ঘটে তান কর্তবের উচ্চাবচ ব্যবহারে এবং যদৃচ্ছ সুরবিহারে। এর ফলে একই খেয়াল বা ঠুংরি একেক ঘরানার শিল্পীকণ্ঠে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা শুনি। পরিণামে যা ঘটেছে তাতে গানের স্রষ্টার মূল অভিপ্রায়ের ওপর চেপে বসেছে ঘরানা ও তার রূপায়ণকারী শিল্পীর কর্তৃত্ব। সকলেই স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের গায়নের শুদ্ধতার দাবি রাখেন। শ্রোতা এক্ষেত্রে অসহায়।

সংগীতের সুরের ইতিহাস আমাদের দেশে ফলত উপেক্ষিত। তাই ক্ষতিটা বেশি অনুভব করা যায় ব্যক্তি-সংগীতকারের নিজস্ব সুরকারুর খোঁজ করতে গেলে। যেমন ধরা যাক উত্তর ভারতের কবিরের রচনা, যা প্রধানত বাণী ও বক্তব্যপ্রধান, তার গীতরূপটির পূর্বাপর কোনো স্বীকৃত ধরন নেই। ফলে পালুসকর, কেশরবাই ও ভীমসেন যোশী সম্পূর্ণ নিজ নিজ বন্দিশে ও স্বরকৌশলে ফুটিয়ে তোলেন কবির-ভজন। মীরাবাঈয়ের ভজন সম্পর্কেও একই কথা। সেই গানের বাণীতে লৌকিক রাজস্থানি বুলি যেমন শনাক্ত করা যায়, সুরেও তো তেমনই একটা রাজস্থানি বনিয়াদ খুঁজে পাবার কথা। কিন্তু কোথায় যে তা অন্তর্হিত হল। দিলীপকুমারের সুরারোপে শুভলক্ষ্মীর-গাওয়া 'মীরা' চলচ্চিত্রের গান আর কয়েক বছর আগেকার 'মীরা' চলচ্চিত্রের অন্তর্গত বাণী জয়রামের গায়ন ও সুর কি এক? একেক সময় এ ছাড়াও এসে পড়ে কোনো কোনো ঐতিহ্যবাহী গানের রূপায়ণে ব্যক্তি-শিল্পীর প্রবল স্বাতন্ত্র্য, যেমন 'উমরাও জান' চলচ্চিত্রের গানে আশা ভোঁসলের কর্তৃত্ব।

তবু এখনো অনেকে অনুসন্ধান করতে চান, কেমন ছিল বাংলা পাঁচালি বা কৃষ্ণযাত্রার গানের গায়নরীতি আর সুরের ধরন। এ জাতীয় গীতরীতির আদল মৌখিক শ্রুতিবাহিত থাকার কথা কিন্তু শিল্পীদের ও রূপকারদের পরম্পরা নষ্ট হয়ে গেছে বলে তার ধারণা করাও কঠিন। আসলে ইহলোক উদাসীন ও পারত্রিক ভাবনাসর্বস্ব আমাদের দেশ শিল্পকে যত মর্যাদা দিয়েছে, শিল্পীকে বা স্রষ্টাকে ততই করেছে উপেক্ষা। সেই সঙ্গে আমাদের

মজ্জাগত ইতিহাসবৈমুখী স্বভাব এবং কালক্রম-অচেতন মানস কোনো কিছুই ধরে রাখতে চায়নি। সেইজন্যই বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের নির্মাতা এবং কারুভাস্কর্যের শিল্পীগোষ্ঠীর বৃত্তান্ত, জাঁতপরিচয় ও বাস্তুবিবরণ সংগ্রহ করতে ক্ষেত্রগবেষকদের বহু সময় নষ্ট হয়েছে। সব তথ্য পাওয়াও যায়নি।

একইরকম অচেতনতা ও ভাবাতিরেকের আতিশয্যে বাংলার অতিসমৃদ্ধ কীর্তন গানের সঠিক রূপরীতি আজ বিতর্কের বিষয়। মনোহরশাহি কীর্তনের স্বরূপ যদি বা কিছুটা আবিষ্কার করা বা অনুমান করা যায় কিন্তু বাংলা কীর্তনের অন্য তিনটি ধারা সম্পর্কে গায়ক মহল ও কীর্তনীয়ারা সুনিশ্চিতভাবে তেমন ওয়াকিবহাল নন। শ্যামাবিষয়ক গান সম্পর্কেও আমরা খুব বেশি জানি না— কেবল রামপ্রসাদী গানের একটা চলন ও রূপরীতি আমাদের আয়ত্ত বলে মনে করি। কিন্তু অত দূরবর্তীকালে কেন, অনতিকাল আগেও কলকাতার বহু জায়গায় কর্তাভজাদের যে 'ভাবের গীতি' প্রচারিত ছিল তার বৈঠকি গায়নরীতি কি কেউ মনে রেখেছেন?

বাংলা গানের আর একটা দুর্বল দিক হল গ্রামীণ গান সম্পর্কে উদাসীনতা। আঠারো-উনিশ শতকে নবগঠিত কলকাতার নববাবুবিলাসের বিনোদনের কারণে যেসব গান রচিত হয়েছিল এবং তার যেসব বিশিষ্ট গীতিরীতি কল্পিত হয়েছিল তার সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বাঙালি খুব সচেতন ছিলেন কিন্তু আশ্চর্যরকম অচেতন ছিলেন সমসময়ের গ্রাম্য বাউল-মুরশিদা-সহজিয়াদের গান সম্পর্কে। ভারী রাগতালের ব্রহ্মসংগীতের সংরক্ষণ ও প্রচার বিষয়ে ভদ্রশ্রেণির উদ্যমের অভাব ছিল না, তার কারণ নবজাগ্রত কলকাতা ও ঢাকার এলিট সমাজ ব্রহ্মোপাসনার উপলক্ষে গানের সৃষ্টি ও তার গায়ন সমাজের পোষকতা করতেন— বেতন দিয়ে ব্রহ্মসংগীত গায়কদের নিযুক্ত করতেন সমাজ এবং পরে বহু ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপিও প্রণীত হয়ে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়েছিল যাতে নিশ্চিতভাবে গড়ে ওঠে এই জাতীয় গানের বিস্তারিত পরিধি। একথা ঠিক যে, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের চার্চকেন্দ্রিক উপাসনার আদলে ব্রহ্মসংগীতের সূচনা। কিন্তু পরোক্ষে এই গান ঠাকুরবাড়ির নানামুখী সংগীত প্রতিভার স্পর্শ বাংলা গানকে নতুন দিশা দেখায় পরবর্তীকালে। কিন্তু এতসব উদ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে মনে না এসেই পারে না যে , ১৮৯০ সালে প্রয়াত লালন শাহের গান সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কেউই কিছু জানতেন না। তাই অমন সমৃদ্ধ বাণী ও সুরের সঞ্চয় থেকে বাঙালি শ্রোতা বরাবরই বঞ্চিত থেকে গেলেন। 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় ইন্দিরা দেবীচৌধুরানি মাত্র দুটি লালনগীতির স্বরলিপি প্রকাশ করেন। সভ্যসমাজে এখনো পর্যন্ত ওই দুটি গানই অবিতর্কিতভাবে লালনগীতির মূল ধরনটির সাক্ষ্য দেয়। বলাবাহুল্য লালনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রধান স্থপতি রবীন্দ্রনাথ।

২

এতক্ষণ বাংলা গানের সম্পর্কে নানান রকম আলাপচারী করে আমি পাঠকদের সম্মুখীন করতে চাইছি একটি তত্ত্ব বা সত্যের দিকে। সেটি এই যে, আমাদের ভারতীয় মানস গানের কোনো স্থায়ী বা অনড়রূপে বিশ্বাসী নয়— কালে কালে নতুন নতুন গায়ক ও তাঁদের গায়ন গানের চেহারা সূক্ষ্মভাবে বদলে দিতে চায়। সেইজন্যই একশো-দুশো বছর আগেকার গানের আদলও এমনকি আমাদের আয়ত্তে থাকে না। ভারতীয় গান গুরুমুখী তথা ঘরানানির্ভর, তার ফলে একই গানের একাধিক আদলে আমরা খুব একটা বিচলিত হই না। প্রতীচ্যের গান তত্ত্বগতভাবে আমাদের গানের একেবারে বিপরীতধর্মী। সে গান রচনা ও সুরসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী ও অনড় রূপ পেয়ে যায়. তার ওপর আর খোদকারি চলে না। সুরবিহার করে তাতে নব নব বিভঙ্গ সৃষ্টির অবকাশ থাকে না পরবর্তীকালের শিল্পীদের কণ্ঠবাদনে। তা জন্ম মুহূর্তেই পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সতর্ক স্বরলিপিজালে আবদ্ধ। সেই জাল থেকে কোনো গায়কের মুক্তি নেই। চোখের সামনে সেই স্বরলিপি সেঁটে একেবারে কর্তার ইচ্ছায় কর্মের মতো গানটি গেয়ে যেতে হয়। আসলে শিল্পীর

স্বাধীনতার চেয়ে পাশ্চাত্য গান অনেকবেশি তৎপর থাকে স্রষ্টার ইচ্ছাকে রূপায়ণ করতে। তবে কালে কালে, দেশে দেশে, একেকজন গায়কের গায়নে কি কোনো ভেদ বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না? থাকে, তাকে বলা চলে ব্যক্তিত্বের ছোঁওয়া, যা ধরা পড়ে স্বরক্ষেপের কুশলী নিজস্বতায়, কণ্ঠধ্বনির স্বাতন্ত্র্যে এবং ইন্টারপ্রিটেশনে। তাতেই তো গানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। একই নজরুল গীতি ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আর ফিরোজা বেগমের গায়নে হালে চালে যেমন আলাদা হয়, ঠিক তেমনই।

এখানে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কথাটা সাবলীলভাবে এসে পড়ল। তার মানে সত্যিকারের ভালো গানের নির্মাণে এমন একটা সামঞ্জস্য ও সুষমা থাকে যে শিল্পী সেইটা আবিষ্কার করে ফেলেন এবং তার অন্তর্বার্তাটুকু বুঝিয়ে দেন গায়নকৌশলে। সুরের সেতু বেয়ে সেই গহন অন্তর্বার্তা পৌঁছে যায় দীক্ষিত ও মরমি শ্রোতার কান থেকে মর্মে। সব শিল্পী এই সেতু বাঁধতে পারেন না কিন্তু যিনি পারেন তিনি অনায়াসে পারেন। যেমন 'কোমলগান্ধার' চলচ্চিত্রে দেবব্রত বিশ্বাস 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গানের রূপায়ণে যখন 'বিস্ময়ে' শব্দটি একাধিক রকমের স্বরক্ষেপণে 'ইনটারপ্রেট' করেছিলেন তাতে স্বরলিপি বজায় রেখেও একটা অন্য ব্যঞ্জনা জেগে উঠেছিল। এই গান কিন্তু আর কেউ অমন করে গাইতে পারেন নি—হয়তো পারবেনও না। কেন এমন হয়? এক একটা গান কেন একেকজনের কণ্ঠ ও গায়নের সঙ্গে অবিস্মরণীয় মাধুর্যে জড়িয়ে যায়? সে কি গানেরই নিজস্ব কোনো অন্তর্গত গুণ না কি শিল্পীরই সেই নির্মাণ? এখানে সংগীত রসিকদের কথা একটু বলতে হবে। একজন রসজ্ঞ যেমন বলেছেন যে, প্রকৃত ভালো গানের মধ্যেই নাকি নিহিত আকাঙক্ষা থাকে, যোগ্য শিল্পীর কণ্ঠাশ্লেষ করে যা নিজেকে ছড়িয়ে মেলে দিতে চায় স্বতঃস্ফূর্ততায়। সেটাকেই বলা চলে সার্থক যুগলসম্মিলন, যাতে গীতমূর্তির পূর্ণ উদ্ভাস। অর্থাৎ আততি থাকে দুপক্ষেরই। গান চায় যথার্থ দরদি শিল্পীর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আর শিল্পী চান গানের অন্তরাত্মাকে শ্রোতার সামনে সঠিকভাবে সুন্দর করে পৌঁছে দিতে। কিন্তু সর্বদা মনে রাখা চাই যে আগে স্রষ্টা আর পরে শিল্পী।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কোনো শিল্পীর যদি মনে হয়, স্রষ্টার গানে আরেকটু কলাকৌশল, সামান্য অলংকরণ গানটিকে আরও প্রাণবন্ত এবং শ্রোতার পক্ষে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলবে, তাতে স্রষ্টা কী বলবেন? এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল রাগপ্রধান বাংলা গানের যশস্বী শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর জীবনে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'অল্প লইয়া থাকি' গানটি তিনি সামান্য তান ও মিড়-মুড়কির খোঁচ দিয়ে গেয়ে রেকর্ড করতে চেয়েছিলেন। তাতে স্রষ্টার অনুমতি মেলেনি। এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বাঁধা যুক্তি ছিল এই যে, তাঁর গানে তিনি এমন কোনো ফাঁক রাখেননি যা অন্যের তানকর্তবে-বা অলংকরণে ভরাট করতে হবে। প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর হয়তো বলার কথা ছিল এটাও যে, বাড়তি অলংকরণ করতে হলে নিজে গান বানিয়ে তাতে করাই তো সংগত। রচিত পদার্থের দায়িত্ব রচয়িতারই হাতে থাকা ভালো। স্রষ্টার এই যুক্তি ও নিষেধাজ্ঞা জ্ঞান গোঁসাইয়ের পছন্দ হয়নি। অথচ গানটা ওইভাবে গাইবার ইচ্ছা ছিল তাঁর এত প্রবল যে অন্য কোনো উপায় না দেখে ওই গানের ধাঁচায় তিনি বাণী বয়ন করিয়ে নেন নজরুলকে দিয়ে। নজরুল ছিলেন অর্ডারি গানের দক্ষ কারিগর, কাজেই অচিরে অনায়াসে বেঁধে দিলেন সেই গান : 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়'। জ্ঞান গোঁসাইয়ের অনন্য কণ্ঠের জাদুস্পর্শে, চমৎকার মিড়ের কাজে ওই গানের রেকর্ড সকলের মনোহরণ করল, বিপণনও হল সফল, কিন্তু তাই বলে 'অল্প লইয়া থাকি' গানের অনুষঙ্গ কাটাতে পারল কি? বরং হয়ে উঠল আরেকটি গান।

গানের পুনর্নির্মাণের এই জেদ কিংবা বলা চলে স্রষ্টা ও রূপায়ণকারীর কর্তৃত্বের লড়াই কাগজে-কলমে অনেকদূর এগিয়ে ছিল দিলীপকুমার রায় আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পত্রবিনিময়ে। দিলীপকুমার ছিলেন নিজেই বড়মাপের স্রষ্টা এবং আরও বড়মাপের গায়ক, তাই তর্কবাগীশ তাঁর সত্তা হার মানতে চায়নি। তিনি চিঠি

লিখে পিতৃপ্রতিম রবীন্দ্রনাথের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন, 'গায়ককে গানের সুরের variation করবার স্বাধীনতা দিতে হবে', কারণ 'ভারতীয় গানের ধারায় শিল্পী চিরকাল কমবেশি স্বাধীনতা পেয়ে এসেছেন।'

শুধু চিঠি লিখে বিতর্ক সৃষ্টি করে ক্ষান্তি দেবার মানুষ ছিলেন না দিলীপকুমার। নিজে রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত হয়ে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি নিজের প্রার্থিত অলংকরণে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বকর্ণে তাঁর নিজের গানের অমন নবরূপ শুনে ও বুঝে তারিফ করে শেষ পর্যন্ত যে মন্তব্য করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। মোটামুটি তাঁর বক্তব্য ছিল অনেকটা এইরকম: বেশ গাইলে তুমি। লাগলও বেশ ভালো। কিন্তু সবাই তো দিলীপকুমার নয়, তাই আমি এ অনুমতি দিতে পারি না। কিন্তু লক্ষ করা যায় এটাও যে তিনি তো পরম স্নেহাস্পদ দিলীপকুমারকেও অনুমতি দেননি ওই ভাবে গান প্রচারের। ক্ষোভে দুঃখে দিলীপকুমার ভবিষ্যতে আর কোনোদিন প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের গান করেননি। তাঁর শেষদিন পর্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রসংগীতের মূল কাঠামোটা বজায় রেখে ইচ্ছামতো স্বরবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে সেই গানকে একটা নতুন সৌন্দর্যে গরীয়ান করে তোলা যায়। অভিমান করে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন : 'আপনি এতে করে বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানেরcaricature নিবারণ করতে পারবেন না।'

দিলীপকুমারের আশংকা অনুযায়ী বাজে শিল্পীর দ্বারা গানের ক্যারিকেচার, পরবর্তীকালে, অন্তত রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে হয়েছিল কিনা সে-বৃত্তান্ত জানা দরকার। কিন্তু তার আগে জানতে হবে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যাপারটি ঠিক কী। তাঁর কুড়ি বছর বয়সে লেখা 'সংগীত ও ভাব', প্রবন্ধে এবং 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গানের তত্ত্ব। তবু তাঁকে পরবর্তী ষাট বছরে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল নিজস্ব গানের টানে। যেন জীবনদেবতার মতোই অঙ্গুলি হেলনে সংগীতের প্রচ্ছন্ন পূর্ণ স্বরূপ তাঁকে কেবলই নিরীক্ষার নব নব পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথমে ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের জন্য যথার্থ গানের বন্দিশটি খুঁজে নেওয়া সেই সঙ্গে আত্মকণ্ঠটিকেও চিনে চিনে জীবনকে ভরিয়ে নেবার ব্রত। ঠাকুরবাড়ির বহুতর গানের চর্চার অব্যবহিত পরিধি, ব্রাহ্মসমাজের রাগভিত্তিক গানের চর্চা, জ্যোতিদাদার পিয়ানোর সুরের নৃত্যচপল ছন্দ এবং নানাজনের কণ্ঠে শোনা নানা কিসিমের অমার্জিত লঘুবিষয়ের হাল্কা গান, বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সমসময়ের মঞ্চগীতি—সবই তাঁর গানের চেতনা ও চিন্তাক্ষেত্রকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। এত সব শ্রুতি-অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়ে তাঁর ভাবনা ছিল বাংলা গানের একটি নবরূপের পথসন্ধান— বাণী ও সুরের সুষম অনুপাতে গড়ে তোলা এক নতুন গানের ধরন, যার গায়ন পদ্ধতিও হবে অনুচ্চকিত বিশেষ এক রকমের। তার সময়কার চলতি গানের অনুসরণ করায় তাঁর মর্জি ছিল না কারণ ওস্তাদি গানের অতিকৃতি তাঁর বহুভাবে শোনা ছিল। হিন্দুস্থানি গানের বাণীর অকিঞ্চিৎকরতা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। বাংলা গানের উত্তমর্ণ যে কখনোই পশ্চিমা বাগদাবী গান নয়, বরং বাংলার কীর্তনই তার দিশা একথা ঘোষণা করতে তাঁর দ্বিধা ঘটেনি। ব্যক্তিহৃদয়ের উৎসারণ ঘটাবার জন্য লিরিকাল গানের পাশাপাশি তিনি আত্মনিরপেক্ষ নাট্যগান রচনা করেও বুঝে নিয়েছিলেন বাংলা গানের বহনক্ষমতা। পরে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবনে নানা পার্বণ, অনুষ্ঠান আর নিসর্গরঙ্গ তাঁকে এবং তাঁর গানকে ভরিয়ে দিয়েছে বিচিত্রতর সৃষ্টির জ্যোতিরুৎসবে। মাঝখানে স্বদেশিয়ানার ঝোঁকে উদ্দীপ্ত গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গ্রাম বাংলার লৌকিক সুরকাঠামোর মৌলিক সারল্য তিনি অনুভব করেন। বাউল গানের তাল ও লয় তাঁর গানকে বরাবর স্পর্শ করে যায়। বিলেতফেরত রবীন্দ্রনাথ বিলিতি গানের উচ্চাবচ চলনে গান বেঁধে সংগীতের মুক্তির কথাই ভেবেছিলেন প্রথম যৌবনে।

রবীন্দ্রনাথের ছিল এক স্পষ্ট সংগীত-চিন্তা এবং গানরচনা ও গায়নের স্বাতন্ত্র্যে সেই চিন্তাকে রূপ দিয়ে গেছেন। সমসময়ের তিনটি প্রতিকূলতা তাঁকে পেরোতে হয়েছিল। প্রথমে অমার্জিত রুচিহীন হাল্কা

গানের বাণী ও সুর থেকে তিনি বাঙালিকে বাঁচালেন তাঁদের জন্য রুচিপূর্ণ শিষ্ট গান লিখে। তারপরে নাট্যগানকে অন্যদের মতো উন্নাসিক ভঙ্গিতে সরিয়ে না রেখে মঞ্চাশ্রয়েই গড়ে নিলেন বিচিত্র গানের নবীন জগৎ। সবশেষে তিনি ওস্তাদদের গানের নামে তানবাজি আর কালোয়াতি বর্জন করে এমন গানের গড়ন তৈরি করলেন যাতে কথা ও সুরের সমান আসন— কেউ কাউকে ছাপিয়ে যায় না। বাংলা গানকে তার নিজস্ব চারিত্র্যে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর এই প্রয়াস খুব সহজে ঘটেনি। নানা প্রতিবন্ধ পেরিয়ে, নানা সমালোচনার জবাব দিয়ে, নিজে গেয়ে, নিবন্ধ লিখে, তর্ক করে এবং শেষপর্যন্ত নিজের গানের পক্ষে উপযুক্ত ও যথার্থ গায়নবৃত্ত তৈরি করে তবে সফল হয়েছেন। আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে শ্রোতৃসমাজও।

'প্রাণহীন ও দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার' বলে যদিও নিজের দেশের হীন অবস্থাকে সে সময়ে শনাক্ত করতে রবীন্দ্রনাথের ভুল হয়নি এবং গানহীনতার বেদনা থেকে দেশ ও সংস্কৃতিকে মুক্ত করে তাঁর প্রয়াস যদিও একাগ্র ছিল গানের আধুনিকতার সন্ধানে, তবু তখনও তিনি জানেন নি যে তাঁর গানের চাবি দিয়েই ভবিষ্যতে খোলা হবে বাংলা গানের রুদ্ধ গৃহ—তাতে বয়ে যাবে বহুজনের সংযোগে সৃষ্টির সুবাতাস। রবীন্দ্রনাথের গান রচনার ইতিহাস যাঁরা বিশেষভাবে করেছেন তাঁরা কবুল করেছেন যে সেই অগ্রসৃতি হল রবিবাবুর গানের রবীন্দ্রসংগীত হয়ে ওঠার গভীর নির্জন পথে। তাঁর গান নিঃসন্দেহে নির্জন এককের গান, যদিও তিনি একলব্য নন। গানের ক্ষেত্রে, অন্তত নিজত্বের সামর্থ্যে এবং গায়নের স্বমহিমায় তাঁর কোনো পূর্বাচার্য ছিল না। ঠাকুরবাড়ির সুদর্শন এক যুবা সুললিত কণ্ঠে যখন সভাসমিতির শেষে বা ঘরোয়া জমায়েতে নিজের গান গাইতেন শ্রোতাদের অনুরোধে, তখন তার পরিচয় দেওয়া হত রবিবাবুর গান বলে। ঈষৎ পরবর্তীকালে কলকাতার মঞ্চনটি বা অশিক্ষিত পেশাদার গায়িকারা যখন অদ্ভুত সুরে ও চটুল চালে রবিবাবুর গান রেকর্ডে গেয়েছিলেন তখন তাঁরা বা তাঁদের ট্রেনাররা জানতেও পারেননি ঐতিহাসিকভাবে কত বড় এক মহান শিল্পের কী করুণ সূচনা তাঁরা করে যাচ্ছেন। কোনো বিবেচনাতেই রেকর্ডধৃত ওই সব গান সম্পর্কে 'বাজে শিল্পীর দ্বারা গানের ক্যারিকেচার' বলা সংগত নয়, কেন-না সে গানের মূল চেহারাটাই তো তাঁদের কাছে ছিল অজানা। এমনই অজ্ঞতাবশত 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' এবং আরও কটি রবীন্দ্ররচিত গান বটতলা প্রকাশিত *বেশ্যা সংগীত* সংকলনে এসে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গান রচনার জীবন-পথ তাই প্রথম থেকেই উপলব্যথিত এবং সারাজীবন ধরে নিজের গানকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড় করানোর কাজে কঠিন অধ্যবসায় ও মনের শমতার পরিচয় তাঁকে রাখতে হয়েছে। সেকালের প্রচলিত ধারার বাংলা গানের পক্ষে দলছুট তাঁর বিশিষ্ট ধরনের গান গাইবার জন্য যে সংযত কণ্ঠকৌশল, পেলবতা ও দরদ প্রয়োজন ছিল, ছিল মননের দীক্ষা ও রুচিমান মনের শান্ত শুশ্রূষা, সমসাময়িক সমাজ পরিবেশে তা কজনই বা সে সময়ে অর্জন করতে পারতেন? প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে তাই নির্ভর করতে হয়েছিল পরিবারবৃত্তের মধ্যে স্নেহভাজন অভিজ্ঞা-প্রতিভা-ইন্দিরা-সরলার গায়নের উপর। কিছু পরে তাঁর গানের যথার্থ ভাণ্ডারী হয়ে ওঠেন সংগীতপ্রাণ দিনু ঠাকুর, কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে। তাঁর ওপরেই এসে পড়ে রবীন্দ্রগীতির সম্প্রচার, শিক্ষণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব বা কর্তব্য। তারই টানে তিনি স্বরলিপি প্রণয়নে মন দেন এবং কীভাবে গাইতে হয় এসব বিশিষ্ট ধরনের গান সেটা বুঝিয়ে, গান গেয়ে, তৈরি করে নেন বেশ কজন আশ্রমিক ছেলেমেয়েকে। তাঁরাই ক্রমে ওই গানের ও গায়নের বৃত্তকে আরও বড় করে তোলেন। বিনোদনের গড়পড়তা চাহিদা মেটানোর পরেও রবীন্দ্রনাথের গান তাঁদের কাছে হয়ে পড়ে অত্যাগসহন সম্পদ, জীবন-স্বপ্নের পাথেয়, আত্মবিকাশের দিশা এবং বলাবাহুল্য এই সব কিছুর পেছনেই ছিল স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ ও উৎসাহ, উৎকণ্ঠা ও আততি, নির্দেশ ও অনুশাসন। ক্রমে গানের ভাণ্ডারী দিনু হয়ে ওঠেন শান্তিনিকেতনের সকল নাটের কাণ্ডারী— ফলে স্রষ্টার গানের রাজরথ ঢুকে পড়ে নাট্যমঞ্চে—গানে আসে আরও নানা সম্ভাবনা ও গায়নের বৈচিত্র্য।

রবীন্দ্রনাথের কুড়ি থেকে আশি বছর বয়সব্যাপী গান রচনার প্রকৃত বৃত্তান্ত নানা বাঁকে ও বহুরকম ব্যক্তি সমবায়ে গ্রথিত — এমনটি বাংলার সংগীতকারদের কারোর জীবনে ঘটেনি। পরিবারবৃত্ত থেকে রসদ নিয়ে নিজের গীতিসত্তা গড়ে তোলা ব্যক্তিত্বের সংহত ধ্যানে এবং তারপরে সেই ব্যক্তি সত্তার উজ্জীবন ও বিকাশ ঘটানো আশ্রমের নানা ব্যক্তির সহযোগে ও উৎসবে-অনুষ্ঠানে-উদ্দীপনে, এ একেবারে অভিনব সংঘটন। কেবল নিজের ভাবনার গান রচনা করেই সেই উদ্যমের ক্ষান্তি ঘটেনি, নানা উপলক্ষকে বা আশ্রমিক জীবনের ছোটোখাটো ঘটনাকে ঘিরে স্বতই উচ্ছ্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান। কেউ কেউ আবদার ও বিনতি জানিয়ে তাঁকে দিয়ে অনেক গান লিখিয়েছেন, নাচের নব ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে তাঁকে কতবার ঘটাতে হয়েছে সুরান্তর তথা নতুন গানের প্রস্তাবনা। এইভাবে গান সৃষ্টির আবেগ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একক ভাবনা থেকে সামূহিক ভাবনাতেও ব্যাপ্ত হয়েছে। তার কিছু উদাহরণ আমরা জানতে পারি সেকালে বিশ্বভারতীর আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচারণে। শ্যামা-চণ্ডালিকা-চিত্রাঙ্গদা বর্গের নৃত্যনাট্য যখন গুরুদেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মঞ্চস্থ হত খোদ শান্তিনিকেতনে,তখন হয়তো শ্যামার গান গাইত বেশ কজন মেয়ে। অর্জুনের গান গাইত বেশ কজন ছেলে। রবীন্দ্রনাথ আসলে চাইতেন তাঁর গানের আনন্দে সবাইকে সামিল করতে। আর্টের শর্ত নিয়ে তত মাথাব্যথা ছিল না তাঁর, তিনি চাইতেন সংযোগ। 'পারবি কি তুই যোগ দিতে এই ছন্দে রে' আহ্বান ছিল তাঁর এইটাই। তাঁর কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে বিশিষ্ট ধরনের বাংলা গান তিনি রেখে যাচ্ছেন তাঁর সংগত ও যথার্থ উত্তরাধিকার হিসাবে, তার প্রচার প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ গায়নের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রস ফোটানোর দায়িত্ব নিতে হবে তাঁর পরিমণ্ডলের অনুরাগীদের। সেই জন্যেই সংগীতভবনের প্রতিষ্ঠা-পরিকল্পনা তাঁর, যে আনন্দের ও নন্দনের থেকে সূচনা ঘটবে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার শুদ্ধ ও সাবলীল পরিবেশের। আশ্রমের সব রকমের স্তরের পাঠক্রমে রবীন্দ্রসংগীতের অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে তাঁর শিক্ষাচিন্তার নিজস্বতা। সেই আনন্দযজ্ঞে পাঠ গ্রহণ তাই আর থাকে না পরীক্ষা পাশের যান্ত্রিকতায় একঘেয়ে, তার মধ্যে গান ও নাচের মুক্তি এসে অবাধ প্রকৃতিময়তার মধ্যে শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ ও প্রসার ঘটায়।

এবারে সম্ভবত স্পষ্ট হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। শিক্ষক-শিক্ষাসত্র-শিক্ষণ-শিক্ষার্থী এই চতুরঙ্গ সমন্বয়ে শান্তিনিকেতনের সংগীতভবন জমজমাট হয়ে উঠল। সেখান থেকে গুরুদেবের গানের দীক্ষা নিয়ে যেসব মানুষ ছড়িয়ে পড়লেন অখণ্ড বাংলায় এবং সারাভারতে,তাঁরা নিজ নিজ জনপদে গড়ে তুললেন গুরুদেবের গানের পরিমণ্ডল, প্রচার করতে লাগলেন সেই গানের গায়নের শুদ্ধ ও সংযত মহিমা। শিক্ষকদের সতর্ক প্রহরায় ও তত্ত্বাবধানে স্বরলিপি পাঠে তাঁরা দক্ষ হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রসংগীতের 'শান্তিনিকেতনি ঘরানা' বলে একটি লোকপ্রসিদ্ধি সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রবহমান। এমনতর প্রসিদ্ধি অর্জনে সময় ও সাফল্যের যোগ থাকা স্বাভাবিক এবং সেইসঙ্গে ধারাবাহিকতার। প্রবাদপ্রতিম গুরুকুল এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ রবীন্দ্রনাথের গানের গায়নে যে-মিথ তৈরি করেছিল এক সময়ে, তার রেশ এখনো আছে। শান্তিনিকেতনের পুরোনো কালের এমনই এক ছাত্র সুধীর চন্দ দীর্ঘকাল ধরে দিল্লিতে বসবাস করলেও রবীন্দ্রগীতির প্রচার ও শিক্ষণে মশগুল হয়ে আছেন, সে সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য বইও লিখেছেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর সুধীর চন্দ-র শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপর্ব কেটেছে, তবু তখনও কতটা সমৃদ্ধ ছিল আশ্রমের গানের আনন্দময় পরিবেশ তার বর্ণনা পাই তাঁর স্মৃতিকথায় (*সাত ঘাটের জল*)। একজায়গায় লিখেছেন :

> বৈতালিকের একটি দল তৈরি হয়েছিল। সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার রোজ এক একটি নতুন গান শেখাতেন...

ভ্রাম্যমাণ গানের দলের বর্ণনা এইরকম :

শৈলজাদার হাতে অবিচ্ছেদ্য খঞ্জনিটি, বীরেনদা, বিশালাকায় এস্রাজ কোমরে বেঁধে বিনায়ক মাসোজি, বেহালা কাঁধে চৈতীদা, খোল নিয়ে শ্যামদা, আমরা সব দল বেঁধে গাইতে গাইতে চলেছি, 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে'। তখন একটা কী উৎসাহের জোয়ার। যেন এক অত্যাশ্চর্য নতুন দেশ আবিষ্কার করেছি, সব পেয়েছির দেশ।

এই সব পাওয়া এত বড় মাত্রায় যে সুধীর চন্দ সারাজীবনের আনন্দের ও সন্ধানের রসদ পেয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের গানে। নিজেকে তাঁর মনে হয়েছে 'ওখানকার মাটি-জল দিয়ে শান্তিনিকেতন-কুমোরের হাতে গড়া জিনিস।'

এতক্ষণে বোধহয় স্পষ্ট হল আমাদের যে, রবীন্দ্রসংগীত ঠিক কী বস্তু এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তি আর স্বাতন্ত্র্য কতটা গভীর। এ সম্পর্কে পুথির পাতা আর না বাড়িয়ে এবারে উদ্ধৃত করব একজন বিদেশি সংগীতরসিক ও গায়ক আর্নল্ড বাকে-র মন্তব্য, শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবের জীবৎকালে যিনি রবীন্দ্রসংগীতে নিষ্ণাত হয়েছিলেন এবং স্বরলিপিসহ অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ২৬টি গান। তাঁর মতে :

He was the first composer in India to regard his songs as indivisible entities, into which other singer should not introduce their own variations as they habitually do when singing anybody's song. He is undoubtedly the first Indian composer who felt his compositions were finished pieces of work, where ornaments were admissible only where he himself had intended them to be. A change in the melody, a change in the rhythm and on extra tril or run here and there only could detract from the original meaning.

As he felt strongly that his melody expressed the hidden sense of his words, a change from what he had composed meant, without fail, a falsification of his intention.

৩

কিন্তু সমস্যা এই যে, সমাজ ও সংস্কৃতি তো একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, তার পরিবর্তন হয়। রবীন্দ্রসংগীত ও তার স্রষ্টা যতদিন শান্তিনিকেতনবাসী ততদিন সংকট দেখা দেয়নি। উৎসুক ছাত্রছাত্রী এবং আশ্রমবাসীদের মধ্যে কারোর কারোর সন্তানরা গান শিখতেন প্রথমে দিনুঠাকুর, তারপরে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানি, ভীমরাও শাস্ত্রী, বীরেন পালিত, শৈলজারঞ্জন, অনাদিকুমার দস্তিদার, সুধীরকুমার কর, রমা মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষের কাছে। এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিও করে গেছেন। বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীতের সম্বৃত পরিবেশ ও তার শুদ্ধ পরিবেশনের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে মানানসই ভঙ্গিতে লিখতে পেরেছিলেন : 'রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই' এবং 'যার যেটি কীর্তি তার সম্পূর্ণ ফলভোগ তার একলারই'। প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন : 'কবির কাব্য সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত, চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধেও।'

কিন্তু কবিতা আর ছবির সঙ্গে গানের তুলনা তেমন টেঁকসই নয়, কারণ গান হল পারফরমিং আর্ট—তাই তার রূপায়ণে ও প্রচারে গায়ক গায়িকার সহযোগ লাগে এবং সমস্যার সূচনাবিন্দু এইখানে। স্রষ্টার রচিত পদার্থ গীতশিল্পী কীভাবে পরিবেশন করবেন, তার বিবেচনায়, শ্রোতাদের কথাও এসে যাওয়া স্বাভাবিক। বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গান ছিল হয় ঠাকুরবাড়ির ব্যাপার নয় শান্তিনিকেতনি কাণ্ড। তার গায়ক গায়িকা, গায়ন ও শ্রোতাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি যোগাযোগের সূত্র ছিল, ছিল স্রষ্টার প্রতি নির্দ্বিধ আনুগত্য ও

স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ। অমন একজন হিরণ্ময় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর খ্যাতির বলয় সকলকে করে রেখেছিল বশীভূত ও প্রশ্নহীন। 'যে ব্যক্তি গান রচনা করেছে তার সুরটিকে বহাল রাখা' তাই খুব কিছু কঠিন হয়নি— অন্তত বেশ কিছুকাল।

প্রথম সংকট দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যবয়সে, ১৯৩৭ সালে, যখন কলকাতার সবাক চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। হয়তো তাঁর স্বায়ত্ত গণ্ডির বাইরে নিজের গানকে স্রষ্টা একটু ব্যাপকতায় দেখতে চেয়েছিলেন জীবন সায়াহ্নে— দেখতে চেয়েছিলেন আপন গানের আত্মনিরপেক্ষ রূপ। চেয়েছিলেন অদীক্ষিত শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া জানতে। কারণ যাইহোক, প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবিতে সংগীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিককে তিনি অনুমতি দিলেন রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারের। পঙ্কজকুমার ও কাননবালার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে সাধারণ দর্শক ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি একই সঙ্গে আবেগতাড়িত হয়ে পড়লেন। এই প্রথম রবীন্দ্রসংগীত হল ব্যাপক অর্থে জনপ্রিয় এবং গ্রামাফোন রেকর্ডে 'মুক্তি' ছবির গান বাঙালির ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গেল। মুক্তি নামটি ভারী দ্যোতক হয়ে উঠল, কারণ সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে তাঁর গানের মুক্তি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল—সব স্রষ্টারই তা থাকে। পঙ্কজ মল্লিক সুযোগ পেয়ে আরেক কাণ্ড করে বসলেন। 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' কবিতায় সুর দিয়ে সেটিও ছবিতে ভরে দিলেন নিজে গেয়ে এবং তা হয়ে গেল চিরকালের জন্য সফল ও সুন্দর এক গান। তাহলে কবিতা হিসাবে 'রচিত পদার্থ' এবার অন্যের করা সুরের অলংকার পরে গান পদবাচ্য হয়ে গেল। 'মুক্তি'-র পরেই সাহস পেয়ে রাইচাঁদ বড়াল 'পরিচয়' ও 'জীবনমরণ' ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইয়ে দিলেন পঞ্জাবতনয় সায়গলকে দিয়ে। সে গানও জনাদরে ভেসে গেল।

এতে কি ভালো হল? জানি না, কিন্তু কিছু সংশয়ী রবীন্দ্রানুরাগীদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে গড় বাঙালি শ্রোতাদের সামনে এক নতুন রসের উৎস খুলে গেল। সেই সঙ্গে ভেঙে গেল আরেকটা সংস্কারের অচলায়তন যে অদীক্ষিত (অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের দীক্ষায়) গায়কগায়িকার গায়নে তাহলে রবীন্দ্রসংগীতের রসাবেদন সৃষ্টির খুব একটা হানি ঘটে না। পঙ্কজ-সায়গল-কানন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন বড় মাপের পারফরমার. তাই তাঁদের একটু আধটু ঘরানাবিচ্যুতি বা উচ্চারণঘটিত দোষ কেউ বিচারের মধ্যেই আনেননি। আর একথা তো আজ সর্বাত্মকভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে যে সেই প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে শুরু করে তপন সিংহ-ঋত্বিক-সত্যজিৎ হয়ে আজকের অপর্ণা-ঋতুপর্ণ-গৌতম পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথের গানের নানা সূক্ষ্ম ও দ্যোতনাময় ব্যবহার বা প্রয়োগ চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধতর করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই ১৯৩৭ সালে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন বলতে হবে।

কিন্তু শুধু তো চলচ্চিত্র নয়, রবীন্দ্রনাথের গান ক্রমেই অধিকার করে নিল বেতার, মঞ্চও রেকর্ডের জগৎ। তাঁর রচিত গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি কলকাতা ও বাংলার মঞ্চেরূপায়িত হতে থাকল। বাঙালির রসরুচি ও সংগীত-সংস্কৃতির গঠনে রবীন্দ্রসংগীত ধীরে ধীরে হয়ে উঠল অবিচ্ছেদ্য সম্পদ, অবিস্মরণীয় উত্তরাধিকার ও প্রতিদিনের যাপনগত অভ্যাস। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রপ্রয়াণ ঘটে এবং ঠিক তার পরের বছর কলকাতায় প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাকেন্দ্র 'গীতবিতান'-এর সূচনা। তারপরে খুব নিশ্চিত পদক্ষেপে ১৯৬১ সালে তাঁর শতবর্ষের কুড়ি বছরের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত ছড়িয়ে গেল সবখানে। দুই বাংলায়, বহির্বঙ্গে, এমনকি বহির্ভারতে। তার ফলে এই গান সম্ভাবিত করে তুলল বিপণনের নতুন ইঙ্গিত। রবীন্দ্রসংগীতের বাণিজ্যিক সফলতা বিশ্বভারতী ও দেশের নানাস্তরের শিল্পীদের এনে দিল অর্থ যশ সচ্ছলতা। *স্বরবিতান*-এর খণ্ডগুলি পেয়ে গেল বেস্ট সেলারের শিরোপা। রবীন্দ্রসংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল।

এবারে আঁটাআঁটি শুরু হল প্রধানত বিশ্বভারতীর তরফে। কপিরাইট আইনের রক্তচক্ষু দেখিয়ে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড নানা অনুজ্ঞা ও অনুশাসন জারি করলেন। স্বরলিপি অনুসরণের কঠোর নির্দেশ, সংগীতানুষঙ্গ নিয়ে মতান্তর এবং নানা কূটকচালিতে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যেন এক শংকা ও ভীতির বিষয় হয়ে উঠল কোনো কোনো শিল্পীর পক্ষে। সাবধানী পথিকের দল স্বরলিপিশাসিত ঊষর পথে কৃত্রিম গায়নে ছাড়পত্র পেতে লাগলেন। অনেক শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রগীতির রেকর্ড বা ক্যাসেট মিউজিক বোর্ডের অনুমোদন না পেয়ে প্রকাশের মুখ দেখতে পেল না। অভিমানে দেবব্রত বিশ্বাসের মতো জনাদৃত শিল্পী রবীন্দ্রসংগীতের পরিসরে নিজেকে ব্রাত্য বলে ঘোষণা করে প্রায় ' ওরা আমাদের গাইতে দেয় না' গোছের গান গাইতে লাগলেন মঞ্চে তাঁর পরিচয় দাঁড়াল 'বিতর্কিত শিল্পী' বলে। সভানুষ্ঠানে তিনি প্রকাশ্যে গাইতে শুরু করলেন পরিমল হোমের সুর করা রবীন্দ্রবাণী। সে সব গান দেবব্রত-র স্বর্ণকণ্ঠ ও খোলামেলা গায়নে সভানুষ্ঠানের পরিসরে জমে উঠলেও বাণিজ্যের বাজারে বিকাল না। অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীতের কোনো বিকল্প নেই সেটা স্পষ্ট হল। কিন্তু এর মধ্যে খোদ সংগীত সমিতির অনুমোদনে কি অন্যতর অনাসৃষ্টি হয়নি? সংগীতজ্ঞজন বিশ্লেষণ করে দেখালেন 'তবু মনে রেখো' গানটি শৈলজারঞ্জনের তত্ত্বাবধানে কণিকা সুচিত্রা ও নীলিমা তিনভাবে গেয়ে রেকর্ড করেছেন এবং সব কটি রেকর্ডই অনুমোদন পেয়ে গেছে। অনেক ব্যক্তি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন খোদ *স্বরবিতান*-ই দ্বিচারিতায় ভরা। বহু গানের স্বরলিপি যা আগের *স্বরবিতান*-এ ছিল তা সাম্প্রতিক সংস্করণের *স্বরবিতান* থেকে কে বা কারা অদৃশ্য করে দিয়েছেন। সন্তোষ সেনগুপ্তের মতো রবীন্দ্রপ্রেমিকের পরিচালনায় গ্রামোফোন কোম্পানি যে 'চিত্রাঙ্গদা' বার করলেন, সেই রেকর্ডে কোনো অজ্ঞাত কারণে কুরূপা ও সুরূপা চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠ ঠাঁই বদল করে নিল সুচিত্রা ও কণিকার মধ্যে। এমন অযৌক্তিক প্রযোজনা কেমন করে সংগীত সমিতির মেধাবী সদস্যদের অনুমোদন পেল? সুরূপা ও কুরূপা চিত্রাঙ্গদার পার্থক্য তো কেবল বর্ষকালীন দেহগত বহিরঙ্গের, তাই বলে তার কণ্ঠস্বরও কি পালটে যাবে? এর পিছনে তবে কি কোনো বাণিজ্যিক অভিসন্ধি ছিল?

ভেতরে ভেতরে একধরনের গুমোট তৈরি হচ্ছিল, বেশ খানিকটা চাপা ক্ষোভও। রবীন্দ্রনাথের গানের গায়নে খোলামেলা ভাবটা যেন আর থাকছিল না। চারিদিকে 'বাজে গুরুগুরু শঙ্কার ডংকা' অবস্থা। শুদ্ধতাবাদীদের অনুজ্ঞা প্রচ্ছন্নভাবে সারা দেশের রবীন্দ্রসংগীতের পরিমণ্ডলে অনুভব করা যেতে লাগল। অথচ তারই মধ্যে সংগীত সমিতির অনুমোদনে আশা ভোঁসলের গাওয়া রবীন্দ্রগীতির রেকর্ড বেশ বাণিজ্য করল ভুল উচ্চারণে কণ্টকিত হয়েও— যদিও দেবব্রত-র গান ছাড়পত্র পেল না বিশ্বভারতীর। তবে একটি সত্য ইত্যবসরে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুদ্ধভাবে স্বরলিপি মেনে যথাযথ ভঙ্গিতে বাণী ও সুরের সুষমা বজায় রেখে যেসব শিল্পী রেকর্ডে, রেডিয়োতে বা সভানুষ্ঠানে গাইতে লাগলেন তাঁদের সমাদর করবার মতো শ্রোতা বা ক্রেতা ক্রমশ বাড়তে লাগল। সুবিনয় রায়, অশোকতরু, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ঋতু গুহ, অর্ঘ্য সেন, সাগর সেন, সুমিত্রা সেন, মায়া সেন, চিত্রলেখা চৌধুরি, নীলিমা সেন, এনাক্ষী-সংঘমিত্রাদের গান শোনার জন্য গানের আসরে শ্রোতার সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। যদিও একদল শ্রোতা কিংবা খবরের কাগজের কলমচিরা কেবলই লেখালেখি করে জানান দিচ্ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের মুক্তি আসন্ন, কেন-না কপিরাইট আইনের শক্ত বাঁধন কেটে যাবে ১৯৯১ সালের পরে। কিন্তু বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্তৃপক্ষ নজিরবিহীনভাবে স্বত্বাধিকার আইনকে আরও দশ বছর পেছিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায়। বাণিজ্যগত রেকর্ড সংস্থা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল, বহুতর গজিয়ে ওঠা ক্যাসেট কোম্পানি নানা ছাঁদের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রগীতির বেসাতি করতে লাগল। আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম কিশোরকুমার, কুমার শানু, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, উষা উত্থুপ বর্গের অনেক অদীক্ষিত গায়ক গায়িকাদের গান ও ক্যাসেট সংগীত

সমিতির অনুমোদন পেয়ে গেল। কিন্তু অনেক বঙ্গবাসী শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত তাঁদের খুশি করতে পারল না। বিশ্বভারতীর এতে কোনো হেলদোল ঘটেনি, কারণ তাঁরা কপিরাইটের সীমা বাড়াতে চেয়েছিলেন যাতে রবীন্দ্রসাহিত্য বিক্রয় করে তাদের আয়ের উৎস আগের মতো স্ফীত থাকে। সব রকম রবীন্দ্র প্রসঙ্গে তাঁদের খবরদারি, অনুশাসন ও কর্তৃত্ব তাঁরা একচেটিয়া ভাবে ভোগ করবেন এটাই তো প্রার্থিত। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বইয়ের দাম যে বাজার-ছাড়া ছিল সে তো সবাই মানবেন। সাধারণ পাঠকদের জন্য তার সুলভ সংস্করণ পাওয়া ছিল প্রশ্নাতীত। এ সময়ে কোনো বিখ্যাত শিল্পীকে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে বললেই তিনি বলতেন, 'ওরে বাবা— দরকার নেই। কোথায় কী ভুল হয়ে যাবে। আটকে দেবে। খুঁত ধরবে। আমি বরং অন্যের গান শোনাচ্ছি।'

এই ভাবেই চলতে চলতে গড়াতে গড়াতে রবীন্দ্রনাথের গানের জয়রথ এগোতে লাগল দীক্ষিত শ্রোতাদের আনুকূল্যে। ইন্দ্রনীল সেন, শ্রীকান্ত আচার্য ও ইন্দ্রাণী সেনদের মতো সুকণ্ঠ ও মঞ্চনিষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের অন্যান্য গান পরিবেশনের সমান্তরালে রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেটেও বেশ বাণিজ্যসফল হলেন। এবারে এক নতুন ধরনের নতুন বর্গের শিল্পী পেলাম আমরা, এই শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীতগত প্রাণ নন। কিন্তু প্রচণ্ড প্রফেশনাল, তাই গায়নের ও স্বরক্ষেপণের নিষ্ঠা তাঁদের বিশেষ লক্ষণীয়। সুবিনয়, শান্তিদেব, অশোকতরু, গীতা ঘটক, কণিকা, নীলিমা সেনদের মতো শুধু রবীন্দ্রগীতিসমর্থ শিল্পীদের দিন কি তবে ফুরিয়ে এল? ইন্দ্রাণী তো সাবলীল ভাবে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গান গাইতে লাগলেন। ইন্দ্রনীল ও শ্রীকান্ত একইসঙ্গে আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীতে বাজার মাত্ করে দিলেন—টেলিভিশনের সিরিয়ালের শীর্ষ-গানেও তাঁরা সমান দক্ষ দেখা গেল। এইখানে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের কথা এসে যাবে। নব্বইয়ের দশকে তাঁর নতুন ধরনের বাংলা গান নিয়ে আকস্মিক উত্থান, মঞ্চব্যবহারের ও যন্ত্রবাদ্যের কুশলী প্রয়োগ এবং সেইসঙ্গে বাক্চাতুর্যে মঞ্চ থেকে শ্রোতাদের সঙ্গে সংলাপ গড়ে তোলা— এতদিনকার বাঙালি শ্রোতা-শিল্পী সম্পর্কের মধ্যে একটা অদৃষ্টপূর্ব নতুন সেতু গড়ে তুলল। সুমন কখনো খোলা মঞ্চে জলসা করতেন না। তাঁর কৌশল ছিল চারিদিকে আঁটা অডিটোরিয়ামে ধ্বনি ব্যবস্থার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে বৈদ্যুতিন যন্ত্রের সাহায্যে তুখোড় কণ্ঠবাদন। দেশিবিদেশি দু'রকম গানেই তাঁর অধিকার ছিল, এবং সেইরকম গানের পরিবেশনের ফাঁকে একটা দুটো রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে দিতেন আধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গের সুমিত প্রয়োগে। এই সূত্রে বাঙালি শ্রোতা, বিশেষত নবীন বয়সিরা, পেয়ে গেলেন রবীন্দ্রসংগীতের এক নতুন ধরনের গায়ন। লক্ষ করার বিষয় ছিল এইটাই যে, বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির খবরদারি রেকর্ডের ক্ষেত্রে থাকলেও সভাসমিতিতে কিংবা অডিটোরিয়ামে রবীন্দ্রনাথের গানের রূপায়ণে তাঁদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়। লক্ষ করার বিষয় এটাও যে, 'সুমনের গান' বিষয়টি যতটা আলোড়ন তুলল এবং বিপণনে সাফল্য পেল (বারে বারে গোল্ডেন ডিস্ক) তাঁর গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের ক্যাসেট তেমন সমাদর বা স্বীকৃতি পায়নি। তবে কি এতদিনে শ্রোতাদের মধ্যে এসে গেছে একরকম শুচিতাবোধ বা শুদ্ধতাবাদের নেশা? অনেকেই আশংকা প্রকাশ করতে লাগলেন রবীন্দ্রসংগীতের সুদিন এবার বোধহয় অস্তমান। রবীন্দ্রগীতির নানা আসরে শ্রোতাদের আসন ফাঁকা হতে লাগল ক্রমে ক্রমে।

এই সময়ে একেবারে হঠাৎ মঞ্চঅধিকার করে রবীন্দ্রনাথের গানের এক নতুন বোধভাষ্য তৈরি করে এসে গেলেন পীযূষকান্তি সরকার। তাঁর চেহারা, পোশাক, মননক্রিয়া, উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠ এবং সংগীতানুশীলনের ঐতিহ্য সকলকে চমকিত করে দিল। ১৯৯৩ সাল থেকে তাঁর রেকর্ড করা রবীন্দ্রসংগীত আটকে ছিল বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির দপ্তরে, ১৯৯৫ সালে তা প্রকাশের ছাড়পত্র পায়। কিন্তু প্রকাশিত ক্যাসেটে ছিল মাত্র ৪ খানি গান। মাত্র ৪খানি কেন? পীযূষকান্তি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, ক্যাসেটে

চারটে মাত্র গান, এটা হয় না। কিন্তু আরও আটটা গান মিউজিক বোর্ড আটকে দিয়েছে। এখনো আটকে আছে। রিলিজ হয়নি।' এই আটকে যাবার কারণও শিল্পীকে জানানো হয়েছে : 'আর্টিকুলেশন' ঠিক হয়নি। তার মানে, সোজা বাংলায় তাঁর গায়ন বা সুর নয়, আপত্তি ছিল উচ্চারণে।

পীযূষকান্তির আবির্ভাব তাঁর ৫৮বছর বয়সে এবং এসেই আলোড়ন তুলে দেন দর্শকদের মধ্যে। হ্যাঁ, সচেতনভাবে শ্রোতা না বলে দর্শক বলছি, কারণ পীযূষের রবীন্দ্রসংগীত গায়ন যতটা শ্রাব্য তার চেয়ে বেশি ছিল দর্শনীয়। তাঁর বিচিত্র অঙ্গবিক্ষেপ, হাতের মুদ্রা, তাঁর পরিকল্পিত পোশাক এবং ঠোঁটের গোড়ায় সংলগ্ন ছোটোমাইক সবই রবীন্দ্রসংগীতের এতদিনের আসরে কখনো দেখেনি কেউ। ব্যাপারটা সম্পর্কে শিল্পী যে বেশ সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাচ্ছি তাঁর জবানিতে।

প্রশ্ন : আপনার 'কেশদাম' এবং 'শ্মশ্রু'— এটাও রবীন্দ্রপ্রভাবিত?

উত্তর : (হাসতে হাসতে) এটা অনেকে বলে মার্কেটিংয়ের জন্যে। তবে এটা স্বাভাবিকভাবেই গজিয়ে গেছে।

প্রশ্ন : তবে বেশ মাপ মতো রেখেছেন চুল আর দাড়ি —রবীন্দ্র-রবীন্দ্র ভাব আছে।

উত্তর : তুমি যদি দুষ্টুমি করে বলো তাহলে তাই।

প্রশ্ন : আপনার পোশাক? একই কাপড়ের পাজামা, পাঞ্জাবি। বেশ ভাবনা আছে। কত বছর এই পোশাক পরছেন?

উত্তর : এটা আমার তৈরি। আমার রুচি থেকে। রবীন্দ্রনাথের গান গাইব বলে নয়। বছর পনেরো এই পোশাকেই। মঞ্চেগান গাওয়াটা কিন্তু শো-বিজনেসের মধ্যে পড়ে।

গান গাওয়াটা যে শো-বিজনেস তা প্রথম দেখান সুমন ও নচিকেতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশনে পীযূষকান্তি কলকাতার নাগরিক মঞ্চব্যবহারে নতুনত্ব দেখিয়েছেন। গায়নের ক্ষেত্রেও তাঁর অভিনবত্ব ছিল। যেমন, কোনো কোনো রবীন্দ্রগীতি গাইবার আগে সেই গানে যে-রাগ ব্যবহার হয়েছে তা গেয়ে দেখাতেন। এটা কেন জানতে চাইলে তাঁর স্পষ্ট কবুলতি : 'উনি হচ্ছেন ফিউশন মিউজিকের স্রষ্টা। যত দেখি, তত অবাক মানি। শ্রোতাদের মধ্যে সেই অনুভূতিটা বেঁটে দিতে চাই। এলেম দেখাবার জন্য নয়।'

তবে এটা ঠিক যে পীযূষকান্তির সংগীতচর্চায় বহুদিনের প্রস্তুতি ছিল এবং এলেমের অভাব ছিল না। দেশি-বিদেশি গান বেশ ভালোমতো জানতেন। যদিও একা একা তাঁর গায়ন ক্যাসেটে শুনে তাঁর কোনো কেরামতি বোঝা যায় না। নিজেই জানিয়েছেন : 'মঞ্চেআমি সাংঘাতিক দুঃসাহসী। যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহারে, গায়নভঙ্গিতে। ক্যাসেটে যা পারি না, সেই অভিব্যক্তিগুলো মঞ্চেকরে থাকি।'

এইবারে তাহলে স্বচ্ছ হল কথাটা— পীযূষকান্তি একজন সব অর্থে 'আরবান পারফরমার'। এখনকার ভাষায় বলা চলে তাঁর 'টারগেট অডিয়ান্স' ছিল প্রধানত জিনস্ পরা ইংরিজি কপ্চানো তরুণ-তরুণীরা এবং প্রত্যাশিতভাবেই তাঁর অনেক অনুষ্ঠানে 'গেট ক্র্যাশ' করত। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেকে বসাতে চাইছিলেন দেবব্রত বিশ্বাসের শূন্য আসনে। কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যম তাঁকে রবীন্দ্রসংগীতের রবিনহুড বা স্পার্টাকাসের আখ্যা দিলেন। এ সবই তাঁর জনাদর বাড়াল, বিতর্ক টেনে আনল, গ্রামোফোন কোম্পানির যে-কোনো নতুন প্রিন্টে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের অর্ডার যাচ্ছিল দশ হাজারের বেশি। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই জাতীয় ঘটনার সমাহার শিল্পীহিসাবে তাঁর মূল্য নির্ধারণে ভিন্ন সুর জাগিয়ে দিল। তাঁর বিপুল সংখ্যক অনুরাগীদের পাশাপাশি সংশয়বাদীদেরও সংখ্যা বাড়ছিল।

এ কথা সত্যি যে রবীন্দ্রসংগীত গায়নের যে পূর্বাপর ঐতিহ্য তার সঙ্গে পীযূষকান্তির গায়নরীতি মেলে নি। একে তো তাঁকে উপস্থিত হতে হয়েছিল বেশি বয়সে, তার ওপর বিশ্বভারতী তাঁর গায়নে অনুমোদন

দিতে রাজি হচ্ছিল না, ফলে যেন একটা প্রতিশোধের মতো তিনি গড়ে তুললেন বিদ্রোহী গায়নের ধরন। ইংরিজি শব্দের আশ্রয় নিয়ে বলা যায় রবীন্দ্রসংগীতের musical value আর aesthetic value-র সঙ্গে তিনি আনতে চাইলেন cerebral value এবং সেইজন্যে গানে বিন্যস্ত শব্দের দিকে শ্রোতার মনকে বসাতে উদ্‌ভাবন করলেন দেহভাষার এক অভিনব প্রয়োগ। আলপনা রায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন :

> পীযূষকান্তি গানে নিযুক্ত করেন নাটকীয়তা। স্বরক্ষেপণের ঝোঁকে অতিপ্রবণ বা অতিতরল উচ্চারণে তিনি যেমন ধরে দিতে চান শব্দের অর্থ, তেমনি সুরের ওঠাপড়াকে দেখাতে চান হাতের আন্দোলন বা ভঙ্গিমায়। 'নীলঅঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায়' গানের 'অঞ্জনঘন' বা 'পুঞ্জ' শব্দের সুরের প্যাটার্নকে রূপ দিতে চান অঙ্গুলি সঞ্চালন বা মুদ্রায়, 'হে গম্ভীর' কথাটির উঁচু ও নীচু সুর দেখিয়ে দেন হাতের ওঠা-নামায়। কণ্ঠের সঙ্গে তাঁর শরীর তৈরি করে সজীব ছবি।...
>
> পীযূষকান্তির ঋজু দেহ, বাউলসুলভ মুখাবয়ব, কণ্ঠ ও দেহের নাট্যভঙ্গি মঞ্চেসৃষ্টি করেছে আশ্চর্য সম্মোহ।... গানের অন্তর্লীন নাট্যকে পীযূষকান্তি দেখাতে পছন্দ করেন গানের শরীরে, শব্দের সত্যকে পৃথক-পৃথক করে বোঝানোয় তাঁর রুচি। এই নাটকীয়তাই হতে পারে তাঁর গান পছন্দ ও না-পছন্দের কারণ, এইকারণেই তাঁর গান কেউ বরণ করতে পারেন, কেউ প্রত্যাখ্যান।

নিছক গায়নের তত্ত্বে গানের গ্রহণীয়তা বা প্রত্যাখ্যান ব্যাপারটি বেশ নতুন। সেই গায়ন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ব্যক্তি শিল্পীর মর্জিতে, গান নির্বাচনেও নিশ্চয়ই তার ছাপ পড়ছে। পীযূষকান্তি সম্পর্কে সুভাষ চৌধুরির মতান্তর অন্য এক দিক থেকে। তাঁর মতে :

> 'বিতর্কিত শিল্পী' হয়ে ওঠার প্রধান কারণ ছিল তাঁর ব্যতিক্রমী গায়ন ভঙ্গি— যা তথাকথিত রাবীন্দ্রিক নয়.... যে মানুষটির এরকম অসামান্য সুরঋদ্ধ কণ্ঠ, কণ্ঠের এরকম স্বরগ্রাম বিস্তৃতি, এই বয়সেও এরকম দম, যতি বিন্যাসের এমন উপলব্ধি, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে তাঁর প্রবেশ সুস্পষ্ট, তিনি অধিকাংশ শিল্পীদের মতো গান উদ্‌গার করেন না। তবুও পরিবেশনে এমন হাল্‌কা চমকের আশ্রয় নেন কেন?
>
> হালকা চমকের প্রসঙ্গটি এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এর মধ্যে প্রধানতম হল একই গানের ভিন্ন ভিন্ন ছত্রের ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বর প্রকাশ যা কোনোভাবেই মডিউলেশন নয়। কণ্ঠের চরিত্রটিই বদল করে দিতেন তিনি।... এইভাবে কণ্ঠস্বর প্রয়োগের কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি জনপ্রিয়তা অর্জন ছাড়া।... আমার মনে হয়েছে এটি গানে অতিনাটকীয়তার অভিব্যক্তি।... এর সঙ্গে গানে যুক্ত হত বিশেষ বিশেষ শব্দ অপ্রয়োজনীয়ভাবে উচ্চাকিত ভাবে উচ্চারণ করা। মনে হত শব্দটির গুরুত্ব শ্রোতার সমাজে ঢুকিয়েই ছাড়বেন। কেন সমস্ত শ্রোতাকে একই ছাঁচে মেনে নিতেন?

এই চাপান উতোরে আমাদের কোনো পক্ষ নেবার দরকার নেই, তবে যতদূর জানি এই বিশেষ গায়নপদ্ধতি বেশ ভেবেচিন্তেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর গায়নে বুদ্ধির যোগ ছিল। অবশ্য তিনি বেশি সময় পাননি। আকস্মিকভাবে গানের পালা শেষ করে তিনি অনেক দূরে চলে গেছেন। তবু বহুজনের প্রত্যাশা ছিল তাঁকে ঘিরে। অনেকে ভাবছিলেন ২০০২ সালে বিশ্বভারতীর হাত থেকে অনুশাসন দণ্ডটি চলে গেলে পীযূষকান্তি হয়ে উঠবেন আরও কত সাহসী, গায়নে আনবেন আরও কত কৌশল, কিন্তু সেই আততি জমা রয়ে গেল।

৪

ইতিমধ্যে এসে গেল ২০০২ সাল এবং দিকে দিকে মুক্ত রবীন্দ্রনাথের কথা শোনা যেতে লাগল। কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশনা ঘরগুলিতে প্রথম পরিবর্তনের ছোঁওয়া লাগল এবং বেরোতে লাগল নানা ধাঁচের বই, বহুতর প্রচ্ছদচিত্রে বিচিত্রতর রবীন্দ্ররচনা। ক্রমে দেখা গেল রবীন্দ্রকাহিনি নিয়ে টি.ভি. সিরিয়ালের উপস্থাপন। তার অন্তর্গত চরিত্ররা হঠাৎ হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে ওঠে— তাব মান সম্পর্কে খুব একটা ছুৎমার্গ নেই কারোর তরফে, প্রত্যাশাও নেই শুদ্ধতার। *স্বরবিতান* বিক্রি কিছুমাত্র কমেনি এবং ক্যাসেটে নামকরা শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের সমাদর ম্লান হয়নি। শুধু একটা তরঙ্গ উঠল চারিদিকে যখন কুমারজিৎ নামধেয় একজন ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব সুরে ও গায়নে কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত ক্যাসেট করে বার করলেন। সবাই ধিক্কার জানালেন এবং ক্যাসেটটি উধাও হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'অদ্যাবধি সুরসন্ধানহীন' দুশোটির বেশি গানের তালিকা পেশ করেছেন সুধীর চন্দ তাঁর *রবীন্দ্রসংগীত : রাগ ও সুর নির্দেশিকা* বইতে। স্বত্বমুক্ত রবীন্দ্রপর্বে কেউ যদি এসব গানে সুর দিয়ে প্রচার করেন তাতে কোনো আইনি বাধা নেই, কিন্তু নীতির প্রশ্নে কেউ কেউ তর্ক তুলতে পারেন। দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর ব্রাত্য-পর্বে পরিমল হোমের সুর করা কয়েকটি রবীন্দ্রবাণী সভায় গাইতেন। সম্প্রতি সেই গানগুলি নিয়ে একটি ক্যাসেট বেরিয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কয়েকটি রবীন্দ্রবাণীতে একসময় সুর করে ব্যক্তিগতভাবে ক্যাসেট-বদ্ধ করে রেখেছিলেন, সম্প্রতি সেগুলিও বাণিজ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের কোনো প্রয়াসই শ্রোতাদের সমাদর বা বিপণন পেয়েছে বলে এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। কাজেই কপি রাইট উঠে গেলে কী হবে ভেবে যাঁরা শংকিত হচ্ছিলেন তাঁদের পক্ষে কোনো বড় আঘাত এখনো আসেনি। স্বপন বসু ও তপন রায় লোকায়ত বাংলা গানের শিল্পীরূপে সমাদৃত ও যশস্বী। সম্প্রতি তাঁরা যোগ্য ট্রেনারের কাছে শিখে রবীন্দ্রনাথের বেশ কটি লৌকিক ছাঁচের গান ক্যাসেট করেছেন। তার প্রতিক্রিয়া মিশ্র। নচিকেতা তাঁর টিভি অনুষ্ঠানে ('সা থেকে সা') মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন অকুতোভয়ে।

কিন্তু রবীন্দ্রগীতিতে নতুনত্বের দিশা দেখাতে অকস্মাৎ আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। প্রথমে ২০০২ সালে আনন্দ পুরস্কারের অনুষ্ঠানে গ্র্যান্ড হোটেলের বিদ্বজ্জন সমাগমে কয়েকটি গান গেয়ে এবং তারপরে 'অজানা খনির নূতন মণি' নামে ১২টি রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট বার করে তিনি শোরগোল তুলেছেন।

তাঁর গানে উচ্চারিত রাগরাগিণীর আয়োজন এবং রবীন্দ্রবাণীর অকিঞ্চিৎকরতা শুনে বহুজন লজ্জিত হয়েছেন। আমরা এ সম্পর্কে মতামত দেব না শুধু উদ্ধৃত করব কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য। বিশেষজ্ঞ সুভাষ চৌধুরির মতে :

> তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের এমন অসংলগ্ন বিভ্রান্ত রূপ কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। হতে পারে 'লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ।'

সংগীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় মনে করেন :

> এই অ্যালবামটি যদি রবীন্দ্রনাথের গানের বদলে অন্য কথায় রাগপ্রধান হত, তাহলে অনবদ্য অ্যালবাম আমরা উপহার পেতাম।

গায়িকা আলপনা রায়ের ভাষ্য :

> স্বত্ব তিরোহিত হওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যে শঙ্কা, অথবা যা কখনোই হবে না বলে নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল অনেকের, তাই ঘটল এই ক্যাসেটে।

গায়ক অলক রায়চৌধুরির মর্মবেদনা এই যে :

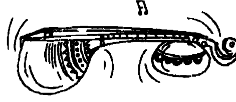
হিন্দুস্থানি গানের সুরধর্মী সর্বস্বতার কাছে আর একবার লুণ্ঠিত হল রবীন্দ্রনাথের গানের বাক্‌প্রতিমা। রবীন্দ্রগানের মর্মজ্ঞ শঙ্খ ঘোষের স্পষ্ট উচ্চারণ :

> 'অজানা খনির নূতন মণি' ক্যাসেটটি আমি বারবার শুনতে চাইব কিনা, তাহলে আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর হবে 'না'।...
>
> রবীন্দ্রনাথের গানের কথাগুলিতে এসব অতিরিক্ত রাগকৌশল আমার রুচি পছন্দের বাইরে।

অবশ্য এতসব বিদগ্ধ রসিক ও শিল্পীজনের বিরুদ্ধ মতামত ও তির্যক ব্যঙ্গ সম্পর্কে স্বয়ং অজয় চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত নির্বিকার ও আত্মম্ভরিতায় অসহনীয়। তিনি স্পর্ধাভরে অবিনয়ী অশিষ্টতায় বলেছেন :

> কে কী বলল, কে রবীন্দ্র স্বরলিপি অনুসরণ করে গাইনি বলে গাল পাড়ল, কী ধৃষ্টতা বলল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তাদের কথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না।

আমাদের লেখা এবারে শেষ হয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের মতো সংগীতকার সারা পৃথিবীতে এখনো দু'জন আসেননি। কাজেই সেই অনন্য স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি ও তার গায়ন প্রসঙ্গে যে বৃত্তান্ত এতক্ষণ আমরা লিখলাম তার পরিণামে মনে এল দিলীপকুমারের সেই পূর্বকথিত উক্তি : 'আপনি....বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানের caricature নিবারণ করতে পারবেন না।' এই উক্তি আজ কিন্তু উলটোভাবে ফলে গেল। বাজে শিল্পীর দ্বারা নয়, মস্ত বড় এক ওস্তাদ অনিবারণীয় ঔদ্ধত্যে রবীন্দ্রনাথের গানে হস্তাবলেপ করে গেলেন।



রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের প্রভাব

অন্যান্য শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রভাব শব্দটি যত সহজে উচ্চার্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তত নয়। যদিও তাঁর কবিস্বভাবে কালিদাসের প্রভাব অথবা ঔপনিষদিক চিন্তার সংক্রাম বিষয়ে গ্রন্থ বা নিবন্ধ রচিত হয় তবু তা সর্বাংশে সত্যসন্ধানী নয়। তাঁর গানের ক্ষেত্রে প্রভাবের প্রসঙ্গটি আরও ধূসর। সাংগীতিক কতরকম অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে পুঞ্জিত হয়েছিল অথচ সব-কিছুকে উত্তরণ করে কেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি নিজস্ব গানের ভাবরূপ তৈরি করে নিয়েছিলেন তা মনে রাখলে গতানুগতিক লঘুচিন্তার সুযোগ থাকে না। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে সকল রসিক, ভাবুক ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা একটা বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, খাঁটি রবীন্দ্রসংগীতের ভিত্তিমূলে রয়ে গেছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, বাংলার লোকসংগীত, ও ইংরাজি গানের ত্রিবেণী। যেন সেই 'That out of three sounds he frame, not a fourth sound, but a star' জাতীয় অভিনব প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে একটি নতুন কিছু তৈরি করেছেন। এখন, পরবর্তী বিশ্লেষণে, সেই অভিনব সৃষ্টি সুষমা থেকে কোনো-একটা-কিছুর প্রভাব খুঁজে বার করে দেখানো সহজ নয়। যেমন সহজ নয় ফুটে-ওঠা ফুল থেকে বর্ণ ও গন্ধকে আলাদা করা। যেমন অসম্ভব খাঁটি গান থেকে কথা ও সুরের স্বাভাবিক অনুপাতকে আলাদা করে দেখানো।

তবু, যেহেতু নির্বোধ আসক্তির চেয়ে বিশ্লেষণযোগ্য সৌন্দর্যসন্ধান অনেক বাঞ্ছনীয় তাই 'রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের প্রভাব' প্রসঙ্গটি তথ্য ও যুক্তির সতর্কতার সঙ্গে অথচ নান্দনিকভাবে দেখতে হবে। প্রসঙ্গটি বিচারের পক্ষে প্রথমে লক্ষ করতে হবে, কীর্তনের প্রভাব রবীন্দ্রসংগীতে সাময়িক না সার্বিক। দ্বিতীয়ত দেখতে হবে কীর্তনের প্রভাব তাঁর ক্ষেত্রে কতখানি ভাবগত আর কতখানি রীতিগত। তৃতীয়ত সিদ্ধান্ত করতে হবে, তাঁর কীর্তন-প্রভাবিত গানগুলি ক্রমশ বিবর্তিত ভাবরূপ নিয়েছে কিনা এবং সে ক্ষেত্রে কীর্তনের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমানসের ক্রমোত্তরণে কতটা নতুন স্তর বা মাত্রা যুক্ত করতে পেরেছে। এই বিচার যথাযথভাবে করতে গেলে প্রথমে বুঝে নিতে হবে কীর্তন গানের উদ্‌ভব কীভাবে হয়েছে, তার মুল উদ্দেশ্য কী ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ কেন কীর্তন আঙ্গিকটি নিলেন তাঁর গান রচনায়।

২

কীর্তন গানের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্', অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম লীলা ও গুণের উচ্চভাষণই কীর্তন। যতীন্দ্র রামানুজদাস লিখেছেন, 'হৃদয়ে ভগবদ্‌ভাবের উদ্দীপনা করাই কীর্তন গানের প্রধান উদ্দেশ্য।' এই প্রসঙ্গে স্পষ্টতই বুঝে নেওয়া ভালো যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে কীর্তনের মূল সংজ্ঞা ও আদ্য উদ্দেশ্য থেকে সরে এসেছেন। কীর্তন গান তাঁর পক্ষে নিজস্ব হৃদয়ের আর্তি ও আকুতি প্রকাশের খুব নির্ভরযোগ্য মাধ্যম মনে হয়েছে। তাঁর লোকসংগীত-প্রভাবিত গানে এর বিপরীত পদ্ধতি দেখা যায়। সেখানে বাউলের নিঃসঙ্গ একক হৃদয়ার্তির সরল মর্মস্পর্শী সুরে তিনি সম্মেলকভাবে গাইবার মতো স্বদেশি গান লিখেছেন। উদাহরণত 'আমি কোথায় পাবো তারে' গানের সুরে 'আমার সোনার বাংলা'গানের রূপান্তর প্রাপ্তি লক্ষণীয়। লোকসংগীতের সুর সরল ও একমুখী বলেই সকলের গলা মেলাবার পক্ষে উপযোগী। রবীন্দ্রনাথ যখন 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে' এই লোকসংগীত ভেঙে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' লিখলেন তখন শুধু থিমেটিক পরিবর্তন হল না, গানে নতুন মাত্রা এল। একক গান রূপ নিল কোরাসের। লক্ষণীয় যে, আঙ্গিকের দিক থেকে কীর্তন শুধু একক গান নয়। দোহার সহযোগে কীর্তনিয়া আসরে দাঁড়িয়ে এ-গানকে রূপায়ণ করেন তান-মান-লয় রেখে, আখর বানিয়ে এবং মাঝে মাঝে তালফের করে সুরে নাট্যরস এনে। যন্ত্র-সমন্বয় কীর্তনকে প্রাণবন্ত করে। খোল ও করতালের সমন্বয়ে গীত হয় বলে কীর্তনের আরেক নাম সংকীর্তন। রবীন্দ্রনাথের কীর্তন-প্রভাবিত গানে কিন্তু এই আসর-গানের অলংকৃতি নেই, আছে আত্মনিবেদনের প্রশান্ত আকুতি ও প্রেমের করুণ রঙিন দহনবেদনা।

'আখর ইত্যাদি বর্জিত বাউলের প্রভাবযুক্ত ও গুরুদেবের শান্তিনিকেতন জীবনে যার সূত্রপাত এরূপ কীর্তনাঙ্গ গানকেই আমি প্রকৃত রাবীন্দ্রিক কীর্তন বলব'— শান্তিদেব ঘোষের এই উক্তির মধ্যে একটি বড় সত্য আছে। অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক-কীর্তনে বাউলের প্রভাব আছে। ব্যাপারটি বিস্ময়কর। কারণ কীর্তন ও বাউল স্বতন্ত্র-জাতীয় সংগীত। বাউল নিঃসন্দেহে লোকসংগীত, কীর্তন নিঃসন্দিগ্ধভাবে উচ্চসংগীতের বিবর্তিত পর্যায়ভুক্ত।

'রাগসংগীতকে গ'ড়ে-পিটে বাঙালি ক'রে কীর্তন গানের সৃষ্টিতে একটা প্রথম শ্রেণির সংগীত-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কীর্তনের বাঙালিয়ানা তার ভাবে ছন্দে সুরে অলংকারে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে আছে, এতে রাগের আমেজ আছে, কিন্তু তার বিস্তারের শাস্ত্রীয় বাধ্যবাধকতা নেই; এতে কাব্যের মাধুর্য আছে—অর্থাৎ সাহিত্য-বিচারে কথার মূল্য আছে এবং গাইবার রীতিতে কথাকে মর্যাদা দেবার সুযোগ আছে, কিন্তু সেটা অলংকার বাদ দিয়ে নয়।... সবশেষে, কীর্তনের যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ শ্রোতার মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করা— সেটা পূরণ করার স্বাভাবিক ও অসীম ক্ষমতা আছে। এ ছাড়া আরও যে জিনিসটা আছে, সেটা হল এর তালের বৈচিত্র্যে রচয়িতার মননশীলতার পরিচয়। এই কারণেই কীর্তনকে কেউ কোনোদিন লোকসংগীতের পর্যায়ে ফেলতে পারেনি।'— সত্যজিৎ রায়ের এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, কীর্তনের পিছনে রয়েছে সুদীর্ঘ সাধনা ও মননক্রিয়া আর লোকসংগীতে আছে সারল্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ এক ধরনের গানে এই দুই বিরোধী গোত্রের মধ্যে ঐশী মন্ত্রবলে পরিণয়সাধন করেছিলেন।

বাংলা পদাবলির ছন্দঝংকার ও ধ্বনিলাবণ্য রবীন্দ্রনাথের কানে বেজেছিল নিতান্ত কৈশোরক কালে। প্রথম যেদিন জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্য তার ছন্দোবৈশিষ্ট্যসমেত তাঁর কণ্ঠে ধরা পড়ল সে দিনই তিনি পদাবলির প্রেমে পড়েন। কিন্তু কীর্তন গানের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও নিবিড় পরিচয় হয় শিলাইদহ পর্বে। তার

আগে *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলিতে* পদ রচনার ক্ষেত্রে মহাজনদের অনুকরণ খুব স্পষ্ট। যেমন গোবিন্দদাসের:

আজু বিপিনে আওত কান মুরতি মুরতি কুসুমবান।
জনু জলধর রুচির অঙ্গ ভঙ্গি নটবর মোহিনী।।

এবং *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলির* :

গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো।।

কিংবা জয়দেবের 'নামসমেতং কৃতসংকেতং' অনুকরণে ভানুসিংহের 'সতিমির রজনী সচকিত সজনী' জাতীয় রচনা ঠিক কীর্তনের প্রভাবজাত গান নয়, বরং পদাবলির ছন্দ ও আঙ্গিকগত অনুকরণ।

কীর্তন গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ব্যাপকভাবে হয়েছিল তাঁর শিলাইদহ বাস-পর্বে। অবশ্য কালক্রমের দিক থেকে তাঁর প্রথম রচিত দুখানি কীর্তনাঙ্গ গান হল ১২৯১ বঙ্গাব্দে লেখা 'আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি' এবং 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'। এ দুটি গানে প্রথম পাঠে আখরযুক্ত ছিল না। আখরযুক্ত হয় যথাক্রমে ১৩০৫ ও ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। এরপর ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে রচনা করেন 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে'। এ গানে আখর যোজনা করেন ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গান শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকে পাঁচশো টাকার চেক পেয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, আখরযুক্ত রাবীন্দ্রিক কীর্তনের একটা তরঙ্গ উচ্ছ্রিত হয়েছিল ১৩০৫ থেকে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। সে গানের সম্পূর্ণ তালিকা কালানুক্রমিকভাবে এইরকম :

তুমি কাছে নাই বলে হের সখা তাই (১৩০৫)
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে (১৩০৫)
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই (১৩০৫)
ওহে জীবনবল্লভ ওহে সাধনদুর্লভ (১৩০৫)
কে জানিত তুমি ডাকিবে (১৩০৬)
আমি সংসারে মন দিয়েছিনু (১৩০৬)
আমি জেনে শুনে তবু ভুলে থাকি (১৩০৮)

আখরযুক্ত রীতিমাফিক কীর্তন রচনার এই আবেগতরঙ্গের নেপথ্যভূমিতে ছিল শিলাইদহের পুণ্যাহ উৎসবে অংশগ্রহণকারী কীর্তনওয়ালাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা, এমন অনুমান করেছেন শান্তিদেব ঘোষ। প্রসঙ্গত তিনি উদ্‌ধৃত করেছেন ১৩০১ বঙ্গাব্দে পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পত্রাংশ :

> কাল বাজনাবাদ্য উপাসনা ইত্যাদি করে পুণ্যাহ হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় কাছারিতে একদল কীর্তনওয়ালা এসেছিল। তাদের কীর্তন শুনতে রাত এগারোটা হয়ে গেল।

শিলাইদহে সে সময়ের রবীন্দ্রসঙ্গী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী একজন বিশিষ্ট কীর্তনিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংযোগের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর *রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে* বইয়ে। তার থেকে জানা যায় শিবু সা নামে প্রসিদ্ধ এই মনোহরসাহি কীর্তন-গায়ক ঠাকুর-জমিদারির অন্তর্গত কমলাপুরের জানিপুরে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ মহাল পরিদর্শনে গেলে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে শিবু সা-র কীর্তন হয়। ওই রাতে তিনি 'শিবু সা-র সঙ্গে অনেকক্ষণ বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও ভক্তিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। জানিপুরে গেলেই রবীন্দ্রনাথ শিবু সা-কে ডেকে আনিয়ে কীর্তন শুনতেন। শিলাইদহ কাছারিতে প্রতি বৎসর পুণ্যাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে শিবু সার কীর্তন গান হত।'

এই বিবরণ থেকে মৃণালিনী দেবীকে লেখা পত্রে উল্লিখিত কীর্তনওয়ালার কিছু হদিশ মিলছে। তা ছাড়া শিবু সা-র মনোহরসাহি কীর্তন আঙ্গিক (অর্থাৎ 'লয় ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, সুরের কারিগরি ও মাত্রার জটিলতায় সমৃদ্ধ। মনোহরসাহি কীর্তনে আখরের পরিপাটি বিশেষ লক্ষণীয়') থেকে সরাসরি আনন্দলাভের অভিজ্ঞতাটুকু উল্লেখযোগ্য। শিবু সা-র সাংগীতিক সংস্পর্শ থেকেই সম্ভবত এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ আখরযুক্ত কীর্তন গানগুলি লেখেন এবং আগে লেখা আখরবিহীন কীর্তন গানে আখর যোগ করে নতুন রূপ দেন। এইসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ পরিবেশিত আরেকটি বিবরণ দেখলে বোঝা যায় এইসময় রবীন্দ্রনাথ নিজেও কীর্তনগানে অংশ নিতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংবাদে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১৩ মাঘের এই উৎসব-প্রতিবেদনে রয়েছে :

> প্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু তাঁহার নব রচিত সুমধুর কীর্তন আরম্ভ করিলেন "আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ"। আদি সমাজের কয়েকজন গায়ক এই কীর্তনে যোগদান করিলেন এবং সঙ্গে মৃদঙ্গ করতাল বাজিতে লাগিল; শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হারমোনিয়াম বাজাইয়া সংগীত ও কীর্তনের মাধুর্যের মধুরতর করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত মানসে কীর্তনসংক্রান্ত ঘনিষ্ঠতার বিবরণ একটু বিশদভাবে দেওয়া হল। এর থেকে বোঝা যায় প্রথমত, ১৩০০ বঙ্গাব্দের প্রথম দশকে তিনি কীর্তনগানে মশগুল ছিলেন; শ্রবণ, সৃজন ও গায়ন তিন দিক থেকেই। দ্বিতীয়ত, এই পর্বে তিনি আখর রচনায় উৎসাহী ছিলেন। তৃতীয়ত, গানগুলি প্রধানত মাঘোৎসবের আধ্যাত্মিক উপাসনায় গীত হয়েছিল অর্থাৎ ভাবগত দিক থেকে এগুলি পূজা পর্যায়ের গান।

এরপরে রবীন্দ্রনাথের যে-সব কীর্তনাঙ্গ গান আমরা পাই তা শান্তিনিকেতন পর্বে লেখা এবং সেগুলিতে আখর নেই অথবা অন্য প্রকরণে নিবদ্ধ আছে। কীর্তনাঙ্গ গান রচনার এই সুদীর্ঘ বিরতি ও আখর বিষয়ে তাঁর অনীহার কারণ কি? কীর্তনাঙ্গ গান রচনার আকস্মিক বিরলতার কারণ, মনে হয়, স্বদেশি জাগৃতি ও বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন। এই পর্বে উপাসনার সান্দ্র নিভৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছিলেন উদ্‌বেলিত জনসংযোগের অগ্নিবিন্দুতে। এ পর্বে বিচ্ছুরিত হয়েছে দেশধ্যানের গাঢ় মন্ত্রে উচ্চারিত স্বদেশি গান, যার অনিবার্য বাহন হয়েছে বাউল গানের বলিষ্ঠ সুরের তীব্রতা। এরপরে এসে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, প্রবাস ভ্রমণ, আশ্রমবাসিক পর্ব ও নোবেল পুরস্কারের স্বীকৃতি। *গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি* পর্ব থেকে গড়ে উঠেছে তাঁর গানে খাঁটি রাবীন্দ্রিক ভাব ও রূপ, যা প্রাতিস্বিক ও লাবণ্যময়। এ-সব গানের অন্তর্গূঢ় রহস্য হল কথা ও সুরের অভিন্নতা এবং সুর স্পন্দের নেপথ্যে ধ্বনিত কীর্তন-বাউল গানের মিলিত অঞ্জলি। আলাদাভাবে কীর্তন ধাঁচের গান বাঁধার উৎসাহ ও প্রয়োজন রবীন্দ্রজীবনে আর হয়নি। অথচ কীর্তনের নানা নিগূঢ় প্রভাব ও নিরীক্ষা তাঁর পরবর্তী নানা গানে খুঁজে পাই। আখরকেও তিনি নতুন ভঙ্গিতে কাজে লাগিয়েছেন। এমন একটি উদাহরণ ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৪ চৈত্রে লেখা গানের মধ্যে দেখা যাক মূল গানের সঙ্গে প্রতিতুলনায় :

মূলগান

ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই
    এমন মনের মতো ঠাঁই
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
    দিয়ে আমার সকল মন।।
সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে
মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ

যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন।।

রূপান্তর

ওরে বকুল পারুল, ওরে শাল পিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই আমার মনের মতন ঠাঁই
যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন
দিয়ে আমার সকল মন।।
সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে
তোদের মাঁতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ,
নেই একটি বিরলক্ষণ
যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন,
দিয়ে আমার সকল মন।।

পুরো গানটি উদ্ধৃত করা হল না। শুধু স্তবকবিন্যাসের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা এবং নবযোজিত শব্দগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে কীর্তন গানের আখরের রীতি রবীন্দ্রসংগীতে কেমন নতুন সাজে ফিরে এসেছে। অথচ গানের অনুষঙ্গ পালটে গেছে ঈশ্বর থেকে প্রকৃতিতে। আরেকটি গানে তিনি পদের সঙ্গে আখর মিলিয়ে এক অভিনব গান বেঁধেছেন :

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নামল তিমির নিবিড় রাতে।
দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে
প্লাবন-ঢালা শ্রাবণ-ধারাপাতে
সেদিন তিমির নিবিড় রাতে।

৩

রবীন্দ্রনাথের গান রচনার ক্ষেত্রে কীর্তনকে একটি রূপবন্ধ বলে যদি মানি তবে দেখতে হবে এই রূপবন্ধ কেন তাঁর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। গীত রচনার প্রথম পর্বে তিনি বিলিতি সুরে বাংলা গানের ভাব ভরে দেখতে চেয়েছিলেন। হিন্দি ধ্রুপদী গানগুলির ভারী সুরে নিজের ভাষা বুনে তিনি এক সময়ে অনেক গান বানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দুই প্রয়াস তিনি আর করেননি। কিন্তু তেরশো বঙ্গাব্দের প্রথম দশকের কীর্তন-সাধনায় পরবর্তীকালে কীর্তন-রূপবন্ধ বিষয়ে তাঁর আবেগ অব্যাহত ছিল। তবে আখরযুক্ত শাস্ত্রীয় কীর্তনের অনুসরণ ব্যাপারে তাঁর আবেগ কমে গিয়ে নতুন ভাব ও মৌলিক রীতির কীর্তনাঙ্গ গান রচনার দিকে ঝোঁক পড়েছিল। কীর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মূলগত আকর্ষণের কারণ তার ভাব ও রূপবন্ধের যৌথ সামর্থ্য। প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করার জন্য কীর্তন বিষয়ে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করা যায় :

> বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানি গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না.....অথচ হিন্দুস্থানি রাগ-রাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে।

এই উক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কীর্তন গান রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক প্রত্যয় ও সৃষ্টিদর্শনের

অনুকূল বলেই তাঁর মনোমত হয়েছিল। রবীন্দ্র-সংগীতও হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরভাঙা উদ্দাম হৃদয়াবেগ থেকে উৎসারিত এক নতুন গীতলহরী, যার কলস্বনে রাগ-রাগিণীর স্পন্দ কান পাতলেই শোনা যায়।

কীর্তন গান সম্পর্কে তাঁর আসক্তির অন্যতর নানা কারণ ছিল। কখনো তিনি কীর্তনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন 'ভাবপ্রকাশের নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি'। আবার 'সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি' অথচ 'সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা' বলেই কীর্তন তাঁর ভালো লেগেছে। কীর্তনের ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ করেছেন 'রাগ-রাগিণীর রূপের প্রতিভার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক'। এবং মনে হয়েছে 'এই কীর্তনের সংগীত অপরূপ। কিন্তু সংগীত যুগ্মভাবে গড়া— পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবে এর সার্থকতা'। কীর্তন সম্পর্কে এই-সব উক্তিসমুচ্চয় কি রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য নয়? আসলে, কীর্তনের আয়নায় রবীন্দ্রগীতি আত্মবিম্ব দেখেছে। সেইজন্য খাঁটি রাবীন্দ্রিক গানে কীর্তনের ভূমিকা পরোক্ষ হলেও তাৎপর্যে গভীর।

কীর্তনের প্রাণরস ও আবেগ রবীন্দ্রনাথের একসময়ের গান-রচনায় খুব নাড়া দিয়েছিল। ভারতীয় রাগসংগীত কিংবা বিলিতি সুরের পরীক্ষানিরীক্ষা তাঁর পক্ষে সে তুলনায় অনেকটা ছিল শিক্ষানবিশি। রবীন্দ্রনাথের হিন্দি ভাঙা গানের মহৎ সুগম্ভীর ও কৃত্রিম বাণী বুঝিয়ে দেয় ওই সব গানে তাঁর অন্তরের সায় ছিল না। আর বিলিতি সুরের ছাঁচে কথার ঢালাই ছিল নিতান্ত নাট্যসম্পৃক্ত প্রচেষ্টা। এর পাশে কীর্তন গান রচনায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা পাওয়া যায় গানের বাণী ও ভাবের গভীর আবেগে। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৪ ভাদ্র এক চিঠিতে কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> আজ সকালে ব'সে ব'সে আমার নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম— সুরটা যে খুব নতুন তা নয়, একরকমের কীর্তনের ধরনের ভৈরবী। কিন্তু তবু ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে।

গান রচনার সময় শরীরের রক্তে সংগীতের মাদকতার বিবরণ থেকে সৃষ্টি সুখের অকৃত্রিম প্রাণময়তার আভাস মিলছে। গানটি হল 'এসো ফিরে এসো'। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে শশিভূষণের কণ্ঠে আখরসমেত যুক্ত হয়ে এই গান এক অপরূপ নাট্যাবেগ সৃষ্টি করেছে। গানে আবেগ সৃষ্টির কাজে কীর্তনের আখর খুব বড় শিল্প-কৌশল। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন পর্বে যে-সব কীর্তনাঙ্গ গান লিখেছেন তাতে আর তেমনভাবে আখর যোজনা করেননি কেন এ প্রশ্নও প্রাসঙ্গিক।

কীর্তনের আখরকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কথার তান'। মনে রাখতে হবে আখরের কাজ মূল গানের ভাষ্য রচনা নয়, ববং মূল গানের অবগুণ্ঠিত মাধুর্যের ব্যঞ্জনাকে ফোটানো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *গীতাঞ্জলি*-পর্বের সময় থেকে গান রচনার ক্ষেত্রে অভীষ্ট পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন কথা ও সুরের সমন্বয়ে। এই সময় তাঁর গান এমন স্বয়ম্ভর ও সুন্দর যে আখরের প্রগল্‌ভতা তার পক্ষে রসহানিকর। পূর্ণ পরিস্ফুট ফুলের সৌন্দর্যের ওপর তুলি বুলিয়ে নতুন বর্ণসম্পাত হয় কি?

রবীন্দ্রসংগীত থেকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ তুলে তাঁর গানে কীর্তন-সংক্রাম বিষয়ে আরেক তত্ত্ব পাই। যেমন :

১. মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।।
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি।। (রচনা ১২৯১)

২. দুজনে দেখা হল— মধু যামিনী রে—
কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে।।....
আর তো হল না দেখা, জগতে দোঁহে একা—
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে।। (রচনা ১২৯১)

৩. ওগো শোনো কে বাজায়
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।। (রচনা ১২৯৩)

৪. এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি—
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।।
শুনেছি মুরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো।
সখী, বলো আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি।। (রচনা ১৩০০)

এক দশকে লেখা এই চারটি গীতাংশে ভাবানুষঙ্গ, আকুতি, পাত্র-পাত্রী এবং অন্যান্য নানা মিল বিস্ময়কর। বাঁশি রবীন্দ্রনাথের গানে অনন্তের প্রতীক হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ-সব গানে সে-বাঁশি শুধুই নায়িকার মন উচাটন করে। যমুনাতীরে এখানে মিলন-বিরহের মুখ্যকেন্দ্র। কালোবরণ কৃষ্ণের আভাস একটি গানে চকিতে উঁকি মেরে যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে পুরোপুরি কীর্তনের রূপবন্ধ চর্চার আগে লেখা এই জাতীয় গানে তবে কীসের অনুবৃত্তি? উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের গানে পাই লোকায়ত কীর্তনের প্রভাব: যাকে বলে ঢপ্ কীর্তন। শাস্ত্রীয় কীর্তনের জটিল ও বহুচারী তাল থেকে মুক্ত ও রাগ-রাগিণীর বিচিত্র সূক্ষ্মতার বাইরে একসময় এক সরল কীর্তনের ধারা বাংলায় প্রবাহিত ছিল।

মুরশিদাবাদের রূপচাঁদ অধিকারী (১১২৯—৯৯) এবং বনগ্রামের মধুসূদন কিন্নর বা মধু কানের (১২২৫—৭৫) উদ্‌যোগে ঢপ্ কীর্তনের সৃষ্টি হয়। মনোহরসাহি কীর্তনের সুর ভেঙে সহজগ্রাহ্য সুরে তালে ঢপ্ কীর্তন এক সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। আখরহীন এই কীর্তনে পাঁচালি ও যাত্রাগানের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। ঢপ্ কীর্তনে সাধারণত তিন,চার পাঁচ ও সাত মাত্রার তাল ব্যবহার হত, শাস্ত্রীয় কীর্তনের মতো দশকোশি, আড়, লোফা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি জটিল তাল ব্যবহার হত না। রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ গানে ছয়, সাত, আট বা দশ মাত্রার সহজ তাল ব্যবহৃত হয়েছে। কীর্তন গানের তালফেরতার রীতি তিনি বর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কীর্তন প্রভাবিত গানের বেশ গরিষ্ঠ সংখ্যায় ঢপ্ কীর্তনের ভাব ও রীতি দেখা যায়। 'ওকে বলো সখি বলো, কেন মিছে করে ছল' মায়ার খেলার এই গানে মধু কানের স্পষ্ট প্রভাব আছে।

অন্তত দুটি গানে রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানসে কীর্তনের 'তুক' রীতির প্রভাব দেখা যায়। তুক বলতে বোঝায় ছন্দোময় অনুপ্রাসযুক্ত সমিল এক পদবন্ধ। যেমন :

ধ্বজ বজ্রাকুশ পায় রহি রহি চলি যায়
যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
বুঝি উহার কেহ আছে আসিতেছে অতি পাছে
তেঞি চায় ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গো।।

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি' ছাড়াও তুক রীতির স্পষ্ট প্রভাব পাই পরবর্তী গানে :

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল
ও চুপি চুপি কী বলে গেল,

ও যেতে যেতে গো কাননেতে গো
কত যে ফুল দ'লে গেল।

কীর্তন গানের প্রকরণ এবং তার রূপায়ণ এই দুটি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতামত ছিল খুব স্পষ্ট। কীর্তন যে বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব সম্পদ এই কথাটার ওপর তাঁর ছিল খুব ঝোঁক এবং এ-গান গাওয়া বিষয়ে তিনি সাহানা দেবীকে এতদূর বলেছিলেন : 'কীর্তন ভাবলেই একটা বেশ বড়ো-কিছু মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। কীর্তন সবাই গাইতে পারে না। এর জন্য একটি বিশেষ ভাবের গলার প্রয়োজন।' দিলীপকুমার রায়কে একবার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'আমি কল্পনা করতে পারিনে হিন্দুস্থানি গাইয়ে কীর্তন গাইচে, এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবাদ্রর্তার দরকার হবে।'

হিন্দুস্থানি গাইয়ে কীর্তন গাইছেন এ কল্পনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব এইজন্য যে বাঙালির ভাবুকতা ও শব্দোচ্চারণের আলাদা মনোযোগ তাঁদের নেই, তাঁদের মনস্কতা শুধু সুর আর রাগরূপায়ণের দিকে। আরেকটা দিকের কথাও রবীন্দ্রনাথ অন্য জায়গায় বলেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য : 'এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তন হয়ে উঠল পালাগান। স্বভাবতই পালাগানের রূপটি নাট্যরূপ। হিন্দুস্থানি সংগীতে নাট্যরূপের জায়গা নেই।'

কীর্তনের বাঙালিয়ানা আসলে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত একটি তত্ত্ব। তাঁর নিজের সংগীত সৃজনে এই তত্ত্ব খুব কাজে লেগেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন : 'হিন্দুস্থানি গানের রীতি যখন রাজা বাদশাহের উৎসাহের জোরে সমস্ত উত্তরভারতে একচ্ছত্র হয়ে বসল তখনও বাঙালির মনকে বাঙালির কণ্ঠকে সম্পূর্ণ দখল করতে পারেনি।... বাংলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগান হিন্দুস্থানি গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে দিল।' কীর্তন অতএব একইসঙ্গে উত্তরভারতীয় রাগসংগীতের বিরুদ্ধে বাংলার সংগীত জগতের প্রতিরোধের শস্ত্র, প্রতিবাদের ভাষা। একদিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতও কি তাই নয়? তাঁর গানে রাগমিশ্রণের ঝোঁক, ভাবের সংগতি রেখে কোথাও কোথাও শাস্ত্রছুট সুর বসানো, নতুন তালের সৃষ্টি, কথার দিকে জোর দেওয়া— এসবই কি তাঁর সমকালীন বাংলা গানের ক্ষেত্রে নতুন নয়? এবারে দেখা যাবে কীর্তনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি সাহানা দেবীকে যা বলেছিলেন, তা এখন রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বলেছিলেন : 'এর মধ্যে ধার-করা কোথাও কিছু নেই। সবটাই তার নিজের সৃষ্টি। সুরধারা, ভাবধারা, তালের ধারা, গাইবার প্রণালী, পদ্ধতি, ভঙ্গী সব নতুন, তার গঠনও নতুন।'

কীর্তন বিষয়ে তাঁর আর একটি মতও তাঁর নিজের সংগীত প্রত্যয়ের একেবারে ঘনিষ্ঠ। দিলীপকুমারকে তিনি বলেছিলেন : 'বাংলার সংগীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।'

এই সংগীতের অবিমিশ্র আনন্দের বদলে কাব্যরস বিমিশ্রিত আনন্দ সৃষ্টিই ছিল রবীন্দ্রনাথের গান রচনার প্রধান অভিপ্রায়। এ ব্যাপারে কীর্তনের ইতিহাস ও প্রকরণ তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, সাহস দিয়েছে, এই পর্যন্ত। তাই বলে তিনি নিছক কীর্তন প্রকরণটির অনুকরণ করেননি। কীর্তন তাঁর একটি উপায় কিন্তু উপেয় নয়। এই জায়গাটায় তাঁর সঙ্গে সমকালীন বা অনুজ গীতিকারদের কীর্তন রচনার তফাত। তাঁর সদ্যতন বা ঈষৎ পরবর্তী দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গানে কীর্তন-প্রসঙ্গ মিলিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বোঝা যাবে।

সবচেয়ে বড় তফাত এইখানে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতিরা কীর্তনকে একটি গানের প্রকরণরূপেই শুধু দেখেছেন মাত্র, তার মধ্যে ভাবপ্রকাশের একটা বিশেষ ক্ষমতা বা নাট্যশক্তি তাঁরা আলাদা করে আবিষ্কার

করেননি। যেহেতু তাঁদের গানের গঠনে উত্তর ভারতীয় রাগরীতি খুব সহজেই মিশে গিয়েছিল (দ্বিজেন্দ্রলালের টপ্‌খেয়াল, অতুলপ্রসাদের ঠুংরি) তাই বিশেষ করে কীর্তনের প্রকাশ ক্ষমতা তাঁদের পরীক্ষা করে দেখতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু তাঁর গানে একটা নিজস্ব প্রকরণ সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন তাই কীর্তনের প্রকাশ ক্ষমতা তাঁকে আলাদাভাবে প্রয়োগ করে বুঝে নিতে হয়েছিল। কীর্তন তাই তাঁর গানের অন্তস্তলে রাসায়নিক যৌগের মতো মিশে আছে। অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতিদের কাছে কীর্তন অন্য নানা রূপবন্ধের মতো গান রচনার এক আঙ্গিক মাত্র। যেমন করে তাঁরা খেয়াল ঠুংরি বা বাউল আঙ্গিককে কোনো বিশেষ গানের ভাবপ্রকাশক রূপে ব্যবহার করেছেন কীর্তনও তেমনই একটি রূপবন্ধ হয়ে থেকেছে। তার কোনো গাঠনিক রূপান্তরের পরীক্ষা বা গূঢ় প্রয়োগ এঁদের গানে দেখা যায় না। কীর্তন তাঁরা সরাসরি নিয়েছেন এবং অপরিবর্তিতরূপে সরাসরি ব্যবহার করেছেন। কোথাও কোথাও হয়তো গানের ভাবটির সঙ্গে কীর্তনের সুর চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে, ফলে গানের মর্মরস উঠেছে নিবিড় হয়ে। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমি সারা সকালটি বসে বসে আমার সাধের মালাটি গেঁথেছি' বা 'ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়' গানে কীর্তন ছাড়া অন্য কোনো প্রকরণের চিন্তা করাও যায় না। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল এবং তাঁর অনুকরণে রজনীকান্ত মাঝে মাঝে কীর্তন গানের কাঠামো এমনকি আখর ব্যবহার করেছেন হাসির গানে রস ফোটাবার জন্য। এ প্রচেষ্টা খুব অভিনব সন্দেহ নেই। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের এমন একটি হাস্যরসাত্মক কীর্তন :

এস এস বধুঁ এস, আধ ফরাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি (তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতি নও ঘোড়া নও
যে সোয়ার হইয়া পিঠে চড়ি।
তুমি চিঁড়ে নও বধুঁ তুমি চিঁড়ে নও।
যে খাই দধিগুড় মেখে (বধুঁ হে)

এ-গানে কীর্তনের ব্যবহার হয়েছে বৈপরীত্যের রস ফোটাতে। 'এস এস বধুঁ এস' বস্তুত ভাবাত্মক একটি বিখ্যাত পদাবলি কীর্তন। এখানে তার প্যারডি করে সুরের লঘুচালে হাসির রস আদায় করা হয়েছে। হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্ত্রশিষ্য রজনীকান্ত ঠিক একই কাণ্ড করেছেন। যেমন, মনোহরসাহি গড়-খেমটা তালে :

যদি, কুমড়োর মত চালে ধ'রে র'ত,
পানতোয়া শ'ত শত;
আর, সরষের মত হ'ত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত।
(প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফলত গো)
(আমি তুলে রাখিতাম) (বুঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে
আমি তুলে রাখিতাম);
(গোলা বেঁধে তুলে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে)
(গোলায় চাবি দিয়ে চাবি কাছে রাখিতাম, বেচতাম না হে)!

কীর্তনের এমন বিচিত্র ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ কখনো করেননি বা বলা চলে করবার কথা কল্পনাও করেননি। কেন না তাঁর সারাজীবনের সংগীত চেতনায় কীর্তনের বিগ্রহটি বসানো ছিল খুব উচ্চাসনে। কীর্তনকে তাই তিনি গানের স্বভাবে অন্তঃশীল করে নিয়েছিলেন নতুন সৃষ্টির প্রবর্তনায়। তার যে-কোনো রকম লঘুকরণ ছিল তাঁর পক্ষে অবাঞ্ছনীয়।

রজনীকান্ত অবশ্য কীর্তনের গভীর ব্যবহারও করেছিলেন তাঁর নানা শান্তরসাস্পদ গানে। তবে তাতে প্রয়োগগত কোনো আলাদা কুশলতা দেখা যায় না। বরং বেশিরভাগ জায়গায় মনোহরসাহি পদ্ধতির এক আখরসর্বস্ব অনুকরণ চোখে পড়ে। যেমন :

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙে দিয়ে হে,
উধাও ক'রে ল'য়ে যাও এ মন।
(আমি) গগনে চাহিয়া দেখি, অনন্ত অপার হে!
(আর) আজনম বন্দী পাখি, পক্ষপুট ভার হে;
(উড়ে যাবে কেমনে);(আর উড়ে যাবে কেমনে);
(নিজবলে উড়ে যাবে কেমনে);(তোমার কাছে উড়ে যাবে কেমনে);
(তুমি না নিলে তুলে, উড়ে যাবে কেমনে)
(তুমি দয়া ক'রে না নিলে তুলে, উড়ে যাবে কেমনে?)

এই আখর-সর্বস্বতা গানটির ভাবপ্রতিষ্ঠার পক্ষে নিশ্চিত অন্তরায়। এর পাশে আমাদের মনে না পড়ে পারে না যে, রবীন্দ্রনাথ কেমন অবগুণ্ঠিত লাবণ্যে আখরের সৌন্দর্য ফুটিয়ে গেছেন অথচ তার সোচ্চার বন্ধনীযুক্ত উপস্থিতি ঘোষিত হয়নি। নিচের গানে আখরের তেমনই অর্ধগোচর চমৎকৃতির নির্মাণ :

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক, আমি দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপন-মম দেখা দিলে বনেরই কিনারে।।
ফাগুনে যে বান ডেকেছে মাটির পাথারে।
তোমার সবুজ পালে লাগল হাওয়া, এলে জোয়ারে।।
ভেসে এলে জোয়ারে— যৌবনের জোয়ারে।।

রজনীকান্তের গানে কীর্তনাঙ্গ সুরের সার্থক প্রয়োগ অবশ্য একেবারে অগোচর নয়। 'যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে তেমনটি আর নাই হে সখা' কিংবা তুমি 'অরূপ স্বরূপ সগুণ নির্গুণ' অথবা আরও সুন্দরভাবে কীর্তনের রস ফোটে 'কেন বঞ্চিত হবো চরণে' গানে। তবে রজনীকান্তের মূল ঝোঁক বন্ধনীযুক্ত আখরসম্বলিত মনোহরসাহি কীর্তনের দিকে।

রবীন্দ্রপরবর্তী গীতিকারদের মধ্যে অতুলপ্রসাদের গানেই কীর্তনের একটি সুষমাময় মিশ্রণ দেখা যায়; তাঁর গানের অন্তর্গোপন স্বভাবের সঙ্গে কীর্তনের অন্তর্গূঢ় সুরের মিড় খুব সহজে মিশে যায়। তাঁর কীর্তনভঙ্গিম গানে সাধারণত আখর থাকে না। আরও আশ্চর্য অনেকক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের নিজস্ব গীতাঙ্গিক (একটি আস্থায়ী ও তিনটি অন্তরা) কীর্তনের জন্য অন্যভাবে গড়তে হয়নি। তাঁর একটি চমৎকার কীর্তন এখানে দেখা যেতে পারে :

আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর,
ওগো অনেক দিনের পর।
আজ আমার সোনার বধূঁ এল আপন ঘর,
ওগো অনেক দিনের পর।

এখানে 'ওগো অনেকদিনের পর' পদটি কখনো তৈরি করে ধুয়োর মাধুর্য, কখনো আনে আখরের মধুর বিভ্রম। অন্য কোথাও তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা কীর্তনের রূপ ও রীতি অবিমিশ্রভাবেই দেখা যায়। যেমন :

আমি কি দেখিব তোমায় হে?
তোমার সকলি সুন্দর হে—অতি সুন্দর!
তব চরণ সুন্দর, বরণ সুন্দর, সুন্দর তব নয়ন:
তুমি দাঁড়ায়ে সুন্দর, বসিয়া সুন্দর, সুন্দর তব শয়ন।
তব গমন সুন্দর, থমক সুন্দর, সুন্দর তব আলস;
তব গরব সুন্দর, অশ্রু সুন্দর, সুন্দর হাসি-বিকাশ।

এই অবিমিশ্র কীর্তনভঙ্গির পাশে অতুলপ্রসাদ লেখেন আরেক রকম গান যাকে বলা যায় কীর্তনাঙ্গ-ঠুংরি। এর একটি আস্থায়ী ও তিনটি অন্তরা। 'পরাণে তোমারে ডাকিনি হে হরি' এই পর্যায়ের সেরা গান। আসলে তাঁর গানে কীর্তন লুকিয়ে আছে গানের গভীরে অনুস্যূত হয়ে! খুব দীপ্র নয় তার ভঙ্গি, অনেকটাই তার মগ্ন থাকে সুরের একমুখী রূপায়ণধর্মিতার মধ্যে। হয়তো নিতান্তই সাদামাটা ভৈঁরোতে বাঁধা সে গান গুনগুন করতে করতে আমরা তাকে দেখি একটু অন্তরালে, আর বলি : 'কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!'

কিন্তু অতুলপ্রসাদের সেইসব বিশেষ গানে কীর্তন প্রকৃতই সুন্দর মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে যেগুলির রূপ মিশ্র। যেখানে কীর্তনের সঙ্গে মিশেছে বাউলরীতি। এই ধরনের একটা সেরা গান :

আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে?
বঁধু আমার।
তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে?
বঁধু আমার!

আত্মনিবেদনের এই গানে কীর্তনের কারুণ্যের সঙ্গে মিশেছে বাউলের ছন্দের একটা ঝোঁক, তাতেই ফুটেছে সৌন্দর্য। এই প্রকরণে বাঁধা অতুলপ্রসাদের গান যা সকলের মনে পড়বে :

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে
ও আকাশ, বল্ আমারে।

তবে এ-পর্যায়ের সবচেয়ে বাউল-কীর্তনের আনুপাতিক মিশ্রণসম্পন্ন রসোত্তীর্ণ গান হল:

যদি তোর হৃদ-যমুনা
হলো রে উছল, রে ভোলা,
তবে তুই এ কূল ও কূল
ভাসিয়ে দিয়ে চল্‌রে ভোলা।

এ-গানে শুধু সুর ও রূপবন্ধের সাফল্যটুকু নয়, দেখবার মতো এর ভাবগত উৎকর্ষ। সত্যিসত্যিই শ্রোতার হৃদ্-যমুনার এই দুকূল-ভাসানো গানের স্রোত বাংলা গানে অতুলপ্রসাদের খুব বড় উপহার। রবীন্দ্রপরবর্তী কীর্তন গান হয়তো এই বাউল-কীর্তনের বন্ধুর পথে বন্ধুর মতো এগিয়ে যেতে পারত যদি দক্ষ সুরকাররা দিশারী হতেন।

এমন দুজন দিশারী নিশ্চয় নজরুল ও দিলীপকুমার রায়। বাংলা গানের ইতিহাস খুব অভিমানের সঙ্গে মনে রাখবে এই দুই অসামান্য সুরকারকে। নজরুলের সুরের সমৃদ্ধি আর দিলীপকুমারের গায়ন সামর্থ্য বাংলা গানের কীর্তন-সম্ভাবনাকে বহুদূর নিয়ে গিয়েও পরবর্তীদের সুর রচনায় প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ কীর্তনের প্রতি নজরুলের ছিল খণ্ড অভিনিবেশ আর দিলীপকুমারের কীর্তন আসক্তির মূলে তাঁর

ধর্মানুরাগ। পরবর্তী আধুনিক বাংলা গান কোনো অজ্ঞাত কারণে তেমন করে কীর্তন প্রকরণকে কাজে লাগায়নি। অথচ কীর্তনকে যে ধর্মনিরপেক্ষভাবে শুধু ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনার উন্মোচনে এমনকি প্রকৃতির গানে সুসমঞ্জসভাবে ব্যবহার করা যায় তার বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের বেশ কিছু গান।

৪

রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের প্রভাব আলোচনার কোনো তাৎপর্য থাকত না যদি দেখা যেত কীর্তনের প্রভাব তাঁর জীবনে ছিল তাৎক্ষণিক নিরীক্ষা বা খামখেয়ালিমাত্র। আমরা তথ্য ও বিশ্লেষণ দিয়ে দেখেছি যে, রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম উপাদান কীর্তন। শিলাইদহ বাসকালে 'কীর্তনে আর বাউল গানে' তাঁর মনের নিভৃত তারগুলি শুধু বেজে উঠেছিল তাই নয়, তাঁর সৃষ্টির উৎসের যে পরিপূর্ণ তম্বুরা, কীর্তন তার অন্যতম তারে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ তানপুরায় কখনো ধুলো জমেনি। তাই দেখতে পাই শেষ জীবনেও কীর্তনের সুর নিয়ে তাঁর গানে নানা নতুন প্রয়াস চলছে। 'তবু মনে রেখো' গানের সজল মিনতি, একদিন খেলা থেমে যাওয়ার আশঙ্কিত মর্মদাহ এবং তবু তার মধ্যেও যে গূঢ় আর্তিতে মনে রাখবার অন্তিম বিনতি তার অন্তস্তলে সুরের ভাঁজে ভাঁজে কীর্তনের সকরুণ মূর্ছনা বেজে উঠেছে। রাগ-রাগিণী মেনেও সুরের এই মর্মস্পর্শী সারল্য ও লোকায়ন রবীন্দ্রনাথের গানে সুনিশ্চিতভাবে কীর্তনজাত। আবার ঈশানকোণে সজল মেঘের বাতাবরণে দাঁড়ানো লজ্জা পাবার অবকাশহীন ত্রস্তপদ শ্যামা মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে যখন উচ্চারণ ওঠে, 'কালো?' তখন কীর্তন আর কথকতায় কখন অগোচর-সখিত্ব ঘটে যায়। কীর্তনের জন্মান্তর-স্মৃতি এমনি করে রবীন্দ্র-সংগীতের ক্রমোত্তরণের ধাপে ধাপে সঙ্গ নেয় শিল্পীর মানসে। আমরা বিহ্বল হয়ে শুনি চিত্রাঙ্গদার ব্যাকুল বসন্তের রোদনে রঙিন কিংশুকের ছায়ান্তরালে ঝরে পড়ে নায়িকার অব্যক্ত কান্নার মতো কীর্তনের ছন্দ-মিড়। পরাক্রান্ত গীতিকার লিরিকের লাবণ্য-সমুদ্র থেকে কীর্তনকে তুলে এনে এ গানে মিলিয়ে দেন নাটকের উত্থানপতনে।

কীর্তন রচনার মূল উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ কীর্তনাঙ্গ গানে আত্মনিবেদনের গভীরতার সঙ্গে রবীন্দ্রগীতমানসের আত্মোন্মোচনের মাধুর্য পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। গানের অনুষঙ্গে বাঁশির সুর, নিভৃত কুঞ্জ, যমুনার জল, মরমিয়া সখী এবং নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলনের চিত্রকল্প থাকলেও ভাবের দিক থেকে এ-সব রচনা পদাবলির অনুসৃত যেমন নয়, সুর ও রূপবন্ধের দিক থেকেও নয় নিছক কীর্তন। যেন বিমিশ্র এক ছায়াসন্নিপাতে আর সৃজন-রহস্যের আলোকচ্ছটায় রাবীন্দ্রিক কীর্তন সঞ্জীবিত। শান্তিনিকেতনের গান রচনার উদ্দীপিত দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ কীর্তন সুরে প্রকৃতির গান সৃষ্টি করে বাংলা কীর্তনকে নিয়ে এলেন এক নতুন অভিজ্ঞতার উপকূলে, ছাড়িয়ে গেলেন নিজেরই বৃত্ত। মল্লিকাবনে প্রথম কলি ধরার আবেগোচ্ছ্বাস যখন কুহেলীছিন্ন তরুণী উষাকে রাঙিয়ে দিল তখন আমরা পেয়ে গেলাম অপরূপ এক নিসর্গের গান যার এক প্রান্তে নবীনের আলিম্পন, আরেক প্রান্তে কীর্তনের নবসাজ। শিশিরে শিশিরে কিরণমালিকার মতো দ্যুতিময় এ গানে কীর্তনের দোলাচল। এর মধ্যে বিস্ময়ের অনন্যতা অবশ্য নেই। কারণ এই রবীন্দ্রনাথই একদিন ব্রাত্য ছড়ার ছন্দে গভীর কবিতা লিখেছিলেন। জীবনের উপান্তে তিনিই কীর্তনের অন্তর্মুখী করুণ কম্পনে ফুটিয়ে তুললেন হৃদয়ে বৈশাখী ঝড়ের আবেশ। একেই বুঝি বলে বেড়াভাঙা কাঁপন উল্লাস। এ-গানের অন্তর্ভূমিতে মোহন এসেছে ভীষণ বেশে আর বহিরঙ্গে কীর্তনের মোহন সুর মেতে উঠেছে দারুণ সর্বনাশে। রবীন্দ্রনাথের আকৈশোর পদাবলি প্রেম এবং আযৌবনের কীর্তনানুরাগ

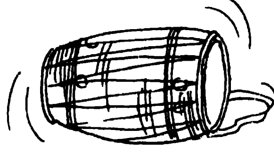
যখন পরিণতি পায় প্রকৃতির গানে কীর্তনের সুরে, তখন এই অদ্বিতীয় স্রষ্টার অন্তর্লোকে সৃজনের অপরিমিত সামর্থ্যের কথা ভেবে আমরা নির্বাক হই, আর কীর্তন সুরে বাঁধা তাঁর আরেকটি গান গাই :

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক
আমি দেখি নাই তোমারে।

তারপরে আমাদের বিস্ময়-পরিকীর্ণ চেতনার দিগন্তে ঝলমলিয়ে ওঠে আকাশ-ছাওয়া কার সর্বগ্রাসী দৃষ্টি। কীর্তনাঙ্গ সেই নিসর্গমূলক রবীন্দ্রসংগীতটি গেয়ে ওঠে মন; আত্মসমর্পিত আনন্দে স্বীকৃতি জানায় :

এ গান আমার লাগল যে গো
লাগল মনে।

পিপাসিত মন খুঁজতে থাকে কীসের মধু। ভ্রমরগুঞ্জনের সঙ্গে যুগলবন্দি সেই মাধুরীক্ষরণে বুঝি, রবীন্দ্রনাথ নিজের ধরনে এক পরাক্রান্ত কীর্তনের মোহমগ্ন রূপবন্ধ আমাদের সামনে মেলে ধরলেন যাকে পুরোনো বলে অর্ধদৃষ্টিপাতের কৃপা দান করা চলে না, বরং চিত্রাঙ্গদার পরিণত অর্জুনের মতো বলতে হয় : 'ধন্য ধন্য ধন্য আমি'।



রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারী

রবীন্দ্রনাথের গান যে বাংলা গানের ঐতিহ্যে একটু নতুন ধরনের সেকথা প্রায় সকলেই আজ মেনে নেন। সেই অভিনবত্বের অনেক কারণের মধ্যে এক অনতিআলোচিত কারণ হল তাঁর গানের গঠনে অন্তঃশায়ী সঞ্চারীর রহস্য সৌন্দর্য। রবীন্দ্রগানে সঞ্চারীর মহিমা ও অন্তর্নিহিত ভূমিকা যে সবাই আজ পর্যন্ত তেমনভাবে বুঝেছেন তা নয়। তার কারণ তাঁর সংগীতনির্মিতির ভেতরকার পরিকল্পনা অনেকে তলিয়ে বুঝতে চান না। আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত-সংক্রান্ত গরিষ্ঠসংখ্যক আলোচনা ব্যয়িত হয়েছে তার কথা ও সুরের সংগতি প্রসঙ্গে কিংবা সেই গানের ভেতরকার কাব্যকে আবিষ্কার করার দুরূহ ব্রতে।

আসলে রবীন্দ্রগানের চেহারায় এমন এক আয়োজনহীন সারল্য রয়ে গেছে এবং তার রূপায়ণে মেনে চলা হয় এমন এক অলংকার ও তানবর্জিত ভঙ্গি যে অনেকেই ভেবে বসেন বুঝিবা এই গানের অন্তঃশরীরে কোনো নির্মাণগত মনন নেই। যেন স্বতই ফুটে উঠেছে তাঁর গান, প্রতিভার অমল পরশে সাবলীল। আশ্চর্য যে, দিলীপকুমার রায়ের মতো সংগীতমনস্ক ব্যক্তি তর্ক তুলেছিলেন এই মর্মে যে,

> সব ললিতকলার বিকাশ ধারাই যে অতিমাত্রায় সরলতার দিকে হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কেন-না, অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ললিত সৃষ্টি দেখা যায় যার মধ্যে একটা Complex structure, একটা বৃহৎ সুষমা, একটা সমষ্টিগত মনোজ্ঞ সমাবেশ পাওয়া যায়।

অথচ রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল,

> আমি গান রচনা করতে করতে, সে গান নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে,দরকার নেই 'প্রভূত' কারুকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়— অতি সূক্ষ্ম, অতি সহজ ভঙ্গি যার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।

তফাতটা সত্যিই বোঝবার মতো। রবীন্দ্রনাথের গানে Complex structure -য়ের বদলে খোঁজা উচিত সূক্ষ্ম ও সহজের গভীরতা। এই সূক্ষ্ম আর সহজের আবরণে আসলে রবীন্দ্রগানে থেকে যায় এক নির্মাণের স্বয়ম্বশ স্বভাব। আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের গানকে যাঁরা পরম্পরাগত বাংলা গানের স্বভাব-ছুট

বলে মনে করেন তাঁরা বোঝেন না যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর গান ঐতিহ্যেরই সমীকরণ। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'সূর্যের যে রশ্মিকে আমরা সাদা বলি তার মধ্যে বর্ণরশ্মির বিরলতা আছে তা নয়, তার মধ্যে সকল রশ্মির ঐক্য।' রবীন্দ্রনাথের গানেও উপাদানের বিরলতা আসলে তাঁর প্রতিভার অপরিমিত গ্রহণক্ষমতার সুষম ঐক্যের দ্যোতক।

কিন্তু এসব বোঝার আগে জানা দরকার গানে সঞ্চারী কাকে বলে। বোঝা দরকার গানে সাধারণভাবে সঞ্চারীর ভূমিকা কতটা আর বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে সঞ্চারী নির্মাণের অপূর্বত্ব কোন্‌খানে। প্রথমেই বলা উচিত সঞ্চারী হল ভারতীয় মার্গ সংগীতে, বিশেষত ধ্রুপদের একটি অঙ্গ। ধ্রুপদের সুরবিন্যাসে থাকে চারটি তুক্ বা কলি। প্রথমটির নাম স্থায়ী, তারপরে অন্তরা, তারপরে সঞ্চারী এবং সবশেষে থাকে আভোগ। সুর নির্মাণের বিন্যাসে অন্তরা আর আভোগে থাকে ঘনিষ্ঠ সমতা। যেন তাদের স্বরকাঠামোর শ্রুতিগত একঘেয়েমি এড়াতেই ধ্রুপদে সঞ্চারীর পরিকল্পনা। খেয়াল বা ঠুংরিতে সঞ্চারী থাকে না। সেখানে দুটি তুক্ : স্থায়ী ও অন্তরা বা একাধিক অন্তরা। আসলে খেয়াল ও ঠুংরি সুরপ্রধান আর ধ্রুপদে থাকে ভাবের প্রাধান্য। তাহলে ধ্রুপদের সুরবিন্যাসে নতুন তরঙ্গ আনা শুধু নয়, তার ভাবেরও নবীনতা আনার জন্য সঞ্চারীর পরিকল্পনা এমন কথা বলেন কেউ কেউ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় খেয়াল ও ঠুংরির নির্মাণকৌশল গ্রহণ না করে কেন ধ্রুপদের আঙ্গিকটি নিয়েছিলেন তার একাধিক কারণ অনুমান করা চলে। প্রথমত, তাঁর আগেই ব্রাহ্মসমাজে ধ্রুপদের খুব চর্চা ছিল। দ্বিতীয়ত, ঠাকুরবাড়িতে যদুভট্ট শেখাতেন ধ্রুপদ। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুরু বিষ্ণু চক্রবর্তী গান শেখাবার সময় নজর রাখতেন কথার মূল্যের প্রতি। এই কথার মূল্য রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে সার্থকভাবে দিয়েছেন সঞ্চারী সৃষ্টিতে।

অবশ্য ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার করা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথের আগেই বাংলা গানে সঞ্চারীর স্থান ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা উচিত যে, রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা গানে সঞ্চারীর ভূমিকা ছিল নিতান্ত ক্ষীণ এবং তার উদাহরণও ছিল অঙ্গুলিমেয়। এখানে তথ্যহিসাবে উদ্ধারযোগ্য রাজেশ্বর মিত্রের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য,

> গত শতাব্দীতে শতকরা নব্বুইভাগ গান কেবলমাত্র স্থায়ী ও অন্তরার মধ্যে সীমাবদ্ধ, বেশি কলির সংযোজন হলে সেগুলিও অন্তরা বলেই গণ্য হত; কিন্তু তথাপি বাংলা গানে সঞ্চারীর পরিকল্পনা এবং সংযোজন গত শতাব্দীতেই করা হয়েছিল।...কিন্তু সঞ্চারীর প্রয়োগ যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধের দাবি করে; সেই কারণে সব কম্পোজার সঞ্চারীর সৃষ্টি সাফল্যের সঙ্গে করতে পারতেন না, অনেকে সঞ্চারীর অবকাশই রাখতেন না।
>
> এই সঞ্চারীর প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে চিরকাল সঞ্চারী সংযোগ করে গেছেন এবং সে সঞ্চারী অতুলনীয়। শেষ জীবনে তিনি যখন নতুন নতুন আঙ্গিক বেছে নিয়েছিলেন তখনও তাঁর গানে সঞ্চারী অংশ অনবদ্য রয়ে গেছে। আর কোনো কমপোজার বাংলা গানকে সঞ্চারীর সংযোগে এমন সুষমান্বিত করতে পারেননি, এমনকি ধারে কাছেও আসতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ।
>
> ('উনিশ শতকের বাংলা গানের পটভূমিকায় রবীন্দ্রসংগীত'। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৩। পৃ. ৬৭)

রাজেশ্বর মিত্র অবশ্য এই লেখায় একটা তথ্য অনুক্ত রাখেন। সেই তথ্য এই যে, রবীন্দ্র সমকালীন ও ঈষৎ অনুজ প্রধান তিন বাঙালি গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ তাঁদের গানে সঞ্চারী

বিশেষ ব্যবহারই করেননি। কাজেই ধারে কাছে আসার প্রশ্ন থাকে অবান্তর। বাংলার চিরায়ত বাউল গান, রামপ্রসাদী গান, শাক্ত গান, ফিকিরচাঁদি গানেও অবশ্য সঞ্চারী নেই। কাজেই বাংলা গানের নিজস্ব বিন্যাসে স্বল্প ব্যবহৃত এই সঞ্চারী রবীন্দ্রনাথ কেন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলেন এবং তার সংযোজনে কেন গড়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে Significant form রূপে অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীতের সেই বিষয়টি বিশেষভাবে অনুধাবন করাই হবে সবচেয়ে সংগত কর্তব্য।

সেই কর্তব্য সাধনের গোড়াতে মনে রাখা চাই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনার আদিপর্ব থেকে সঞ্চারী রচনাতে তৎপর হলেও *গীতাঞ্জলি* পর্বেই সঞ্চারী ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট দ্যোতনা জেগে ওঠে— ভাব ও সুর দুদিক থেকেই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কথা হল, রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে সঞ্চারী নেই অথচ তাতে রস গ্রহণে কোনো হানি ঘটে না। 'হায় এ কী সমাপন', 'কোথা যে উধাও হল মন উদাসী', 'অশ্রুভরা বেদনা', 'বন্ধু রহো রহো সাথে' ইত্যাদি অনেক রসোত্তীর্ণ খাঁটি রবীন্দ্রসংগীতে সঞ্চারী নেই। যদি কেউ তর্ক তুলে বলতে চান উল্লিখিত গানগুলি আকারে ছোটো বলেই সুন্দর, ওইগুলিতে তাই সঞ্চারী বিস্তারের অবকাশ নেই তার জবাবে দেখানো যায় অনেক দীর্ঘ গানের নমুনা যাতে সঞ্চারী নেই। যেমন— 'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে', 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল' বা 'প্রভু বলো বলো কবে' এইসব গান। তবুও সংখ্যাগত বিচারে সঞ্চারীবহুল রবীন্দ্রসংগীতই যে রবীন্দ্র স্বভাবের সবচেয়ে সমীপবর্তী এ সত্য মানতে হয়। নানা ভাবে, নানা স্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সঞ্চারী প্রয়োগ করেছেন। তার প্রত্যেকটি নমুনা তাই কৌতূহলকর ও বিশ্লেষণযোগ্য সৃষ্টির চারুতায় ও গানের পূর্ণাঙ্গ বিস্তারে।

সেইসব চমকপ্রদ নমুনা বিচার বিশ্লেষণ করার আগে গানের একটি স্বাভাবিক রহস্য ও স্বভাবের কথা বলে নেওয়া ভালো। শিল্পরূপের বিচারে গানকে বলা যায় সাইক্লিক বা রিপিটেটিভ। তার প্রধান বলবার কথাটা থাকে ধুয়োতে। যেমন, 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে' বা 'কে হে তুমি সুন্দর অতি সুন্দর'। বলার কথাটা গানের এই ধুয়োতেই সাঙ্গ হয়ে যায়। ঠুংরি বা খেয়ালে বহু সময় এই সামান্য বলবার কথাটাই নানান সুরের সমাবেশে স্বরের বিন্যাসে বোঝানো হয়। বাংলা গান শুধু এমনতর একটি পঙ্‌ক্তির ঘোষণায় সন্তুষ্ট থাকে না। মূল কথাটা বিস্তার করে বোঝানো হয় সুরে ও ভাবে। সেইজন্যেই স্থায়ীর পর আসে অন্তরা। এমনকি একাধিক অন্তরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান ফেরে আবার সেই ধুয়োতেই। গান ঘোরে চক্রাকারে।

রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গান আছে যা প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই মনে হয় সম্পূর্ণ। উদাহরণত মনে আসে : 'ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময়', কিংবা 'তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে', অথবা 'কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে আমি চলব বাহিরে'। মনে আসে সেই বিখ্যাত গান 'চিরসখা ছেড়ো না মোরে'। এসব গীতি পঙ্‌ক্তির সংহত ব্যঞ্জনা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা যে-কোনো গীতিকারের পক্ষে ঈর্ষণীয় সম্পদ। অথচ আশ্চর্য যে এমন অসামান্য গানের পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রনাথ ঢেকে দেন পরবর্তী বিস্তারিত আঙ্গিকে। মাঝে মাঝে মনে হয় সেই বিস্তার কি নিতান্তই প্রয়োজন? তখন বোঝা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ আসলে তো একজন কবি। ভাবনা থেকে ভাবান্তরে যাওয়াটাই বুঝি তাঁব কাজ। একটি গান থেকে কথাটা বোঝানো সহজ হবে। সেই গানের গোড়াতেই বলা হয় :

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

বসন্তের মত্ত বাতাসে সবাই বনে গেছে এই বার্তাটুকুতে গান শেষ হতে পারত। কিন্তু গীতিকার এবারে অন্তরা অংশে জানান আরেকটি বিপরীত বার্তা। তা এই যে সবাই বনে গেলেও আমি যাব না, থেকে যাব গৃহের নিরালা কোণে। এবারও প্রশ্ন ওঠে, কেন এই একাকী থেকে যাওয়া, কীসের প্রয়োজনে? রবীন্দ্রনাথ

এইবার তাঁর স্বকীয় মাধ্যম সঞ্চারীতে ভরে দেন সেই অসামান্য কারণ :

আমার এ ঘর বহুযতন করে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।

তখন ঘর আর ঘর থাকে না, হয়ে যায় দেহ বা অন্তর, যেখানে পা রাখবেন সেই পরম। আভোগে তাই বলা হয় এতটা যে,

আমারে যে জাগতে হবে কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।।

এবারে আমরা গানের শেষে পৌঁছে যাই এক নতুন অনুভবের দ্বৈততায়। বসন্তের মত্ত যে জ্যোৎস্না সবাইকে টানে বাইরে সেই জ্যোৎস্না একজনকে টানে আত্মতায়, পরমের সঙ্গে গভীর মিলনে। তাহলে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে গানটি শেষ হতে পারে না। মানতে হয় তাকে বিস্তারের অলংকরণ। আমরা আপ্লুত হই নির্মাণের সুষমায়।

গানের বিষয়গত বিদেশি পরিভাষায় একে হয়তো বলা যায় থিমেটিক এক্সপ্যানশন। বিলিতি গানে যদিও অন্তরা সঞ্চারী এইসব বিভাজন নেই তবু গানের ভাব সেখানে ছোট থেকে বড় অনুষঙ্গে পৌঁছায়। তাকেই বলে থিমেটিক এক্সপ্যানশন। যেমন রবার্ট বার্নসের সেই বিখ্যাত গান :

O, my love's like a red, red rose
That's newly sprung in June.
O, my love's like that melodie
That's sweetly played in tune.

প্রথম উচ্চারণে ভালোবাসার স্পষ্ট প্রতীকরূপে আসে জুনের সদ্যস্ফুট গোলাপ, দ্বিতীয় উচ্চারণে তা প্রতীক থেকে সম্প্রসারণে নিরঙ্গ অনুভূতিতে চলে যায়। সুরেও খানিকটা variation আসে। রবীন্দ্রনাথের গানে শুধু সুরের variation নয় thematic variationও আলাদাভাবে বোঝবার মতো। এইজন্য তাঁকে বেশি করে নির্ভর করতে হয় সঞ্চারীর উপর। তাঁর একটি গান থেকে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া সহজ। সে গানের স্থায়ী বা ধুয়ো খুবই সাদামাটা :

ওই মালতীলতা দোলে
পিয়ালতরুর কোলে পুব-হাওয়াতে।।

একটি সাধারণ নিসর্গচিত্র। পুব হাওয়ায় দুলছে পিয়াল গাছের সংলগ্ন মালতীলতা। এই দোলা আসলে প্রেমিকের হৃদয়েও দোলা দেয়। তাই অন্তরা-য় বলা হয় :

মোর হৃদয়ে লাগে দোলা, ফিরি আপন ভোলা—
মোর ভাবনা কোথায় হারা মেঘের মতন যায় চলে।।

পুব হাওয়া আর মেঘের উল্লেখ আমাদের মনে জাগায় চিত্রকল্প। তাই বর্ষা জাগায় বিরহ। পিয়াল গাছের আসঙ্গে মালতীলতার দোলন এবারে আর দৃশ্য শুধু থাকে না, মেঘ থাকে না আর মেঘ। সে হয় সুদূরের দূতী। সঞ্চারীতে এবার ধ্বনিত হয় আসল ভাবনা—

জানিনে কোথায় জাগো ওগো বন্ধু পরবাসী—
কোন নিভৃত বাতায়নে।

এইবারে গানটি নিবিষ্ট হল তার মূল প্রসঙ্গে। সঞ্চারীই তা সম্ভব করল।

সঞ্চারী-ভাবনা রবীন্দ্রনাথের গানে কোথাও কোথাও এমন নির্মাণের গভীরতা এনেছে যে আশ্চর্য হতে

হয়। যেমন একটি গানের স্থায়ী ও অন্তরা অংশে বলা হয়েছে :

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ূরে কঙ্কনে কুঙ্কুমে চন্দনে।।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা, কণ্ঠে দোলাইব মুক্তমালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর—চরণ রঞ্জিব অলক্ত অঙ্কনে।।

গানের এই পর্যন্ত কোনো অভিনবত্ব নেই, বাচনে বা বর্ণনায়। কিন্তু এর পরেই সঞ্চারী এসে গানের বাচন আমাদের বোধকে একেবারে নাড়িয়ে দেয় এই বলে :

সখীরে সাজাব সখার প্রেমে
অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে।

সখীকে সাজানোর চিরাগত বস্তুর উপাদানগুলির শেষে হঠাৎ যখন বলা হল সখার প্রেম দিয়ে তাকে সাজানো হবে তখন গানে নতুন ভাবের যে মাত্রা ঘোষিত হল তা প্রত্যাশার বাইরে। কিন্তু গানটি এখানেই শেষ হয় না। আসলে সঞ্চারীর কাজ গানের পরবর্তী বাণীর ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা। তাই এবারে সঞ্চারীর পরবর্তী আভোগের ভাষণ কেমন অনবদ্য হয়ে ওঠে তা দেখা যাক :

সাজাব সকরুণ বিরহ বেদনায়, সাজাব অক্ষয়মিলন সাধনায়—
মধুর লজ্জা রচিব সজ্জা যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে।।

এবারে গান যেন পূর্ণতা পেল। কুসুম রতন কঙ্কন চন্দন সব উপাদানই হয়ে গেল ম্লান। গীতিকার গানের ধুয়োকেই অসার প্রতিপন্ন করে বোঝালেন যুগল প্রাণের বন্ধনে সবচেয়ে বড়ো প্রসাধন হল পারস্পরিক প্রেম আর তার বিরহমিলনের লজ্জাতুর দোলাচল।

গানের মর্মকে এমন করে শ্রোতার মনে নিবিষ্ট করে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিকাররূপে সবচেয়ে বড় সাফল্য এবং সেই সাফল্যের ক্ষেত্রে তাঁর খুব বড় অস্ত্র তাঁর সঞ্চারীর ভাবনাবৃত্ত। রবীন্দ্রসংগীতে সঞ্চারী যেন জ্যা-মুক্ত তিরের মতো এসে লাগে গানের মূল প্রসঙ্গে। কথাটা বিশদ করে নিতে পারা যায় আর একটি গানের উদাহরণ : 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই'।

এ গানের ধুয়ো বা ধরতাইয়ে ধ্বনিত হয়েছে এক চিরন্তন আর্তি, অবশ্য খুব পরিচিত পৌরাণিক রূপকল্পে। সোনার হরিণ আসলে এক অপ্রাপণীয় সম্মোহ, যার আকাঙক্ষা যুগে যুগে ব্যাপ্ত। সেই চপল চরণ মনোহরণ দৃষ্টি-অতীত নির্বন্ধন আহ্বানে কোনো কোনো মানুষ উধাও হতে চায় বারে বারে। কিন্তু কেন? রোমান্টিক এই উৎকণ্ঠা কীসের জন্য আসলে? রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে তার জবাব দেন সঞ্চারীর মাধুর্যে ভরিয়ে এইভাবে যে,

তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে—
যারে যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে।

অপ্রাপ্যের জন্য এই বেদনা তো সমগ্র রবীন্দ্রচেতনারই এক বিশেষ প্রবণতা। কিন্তু গানে কথাটা ধরা পড়ে অনেক সামগ্রিকভাবে। তাই আভোগে বলেন :

আমার যা ছিল তা গেল ঘুচে যা নেই তার ঝোঁকে —
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি মরি তারি শোকে?
ওরে, আছি সুখে হাস্যমুখে, দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই।।

সব হারানোর জন্য ব্যথা এখানে সত্য জিনিসের সন্ধানে ফিরিয়ে আনে আনন্দ। 'সোনার হরিণ চাই' মূলের এই আর্তি আসলে সব হারানোর আহ্বানে ফুটে ওঠে। আমরা পাই এক অভিনব গান।

কোনো কোনো রবীন্দ্রসংগীতে যেন বৈপরীত্যের দ্যোতনা ফোটাতেও সঞ্চারীর সন্নিবেশ ঘটেছে। যেমন মৃত্যুর দুবছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের গান :

বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান।
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান।।

গানের স্থায়ী অংশ শুনে শ্রোতার একটু খট্‌কা লাগে দেওয়া-নেওয়ার অসমতার কথা ভেবে। প্রথম কদম ফুলের লাবণ্যময় উপহারের বদলে শ্রাবণের গান? প্রথমটি যদি বা দুহাত ভরে নেওয়া যায়, রাখা যায় সাজিয়ে, কিন্তু শ্রাবণের গানকে কেমন করে নেওয়া যাবে? বিশেষত গান যে বড় পবিত্র ও গোপন উচ্চারণ। অন্তরা-য় সেই কথাটাই বলা হয় :

মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে
রেখেছি ঢেকে তারে
এই-যে আমার সুরের ক্ষেতের
প্রথম সোনার ধান।।

মেঘছায়ার অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন একান্ত আপন সেই গান, যা নাকি সুরের খেতের প্রথম স্বর্ণাভ ফসল তার মহিমা বাদল দিনের প্রথম কদমফুলের চেয়ে অনেক বড়। কেন না কদমফুল তো প্রকৃতির স্বাভাবিক দান। তার পরিস্ফুটনে ব্যক্তির ভূমিকা কতটুকু? কিন্তু তার চেয়ে বড় কথাটি এবারে ধরা পড়ে সঞ্চারীতে :

আজ এনে দিলে, হয়তো দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।।

অর্থাৎ বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের আয়ু বড় সীমায়িত। প্রকৃতির নিয়মেই যে তা ঝরে যায় তাই শুধু নয়, এমনকি যে-ডাল ভরে থাকে পুষ্প সম্ভারে সেই ডালও হয়ে যেতে পারে রিক্ত। কিন্তু গান থেকে যাবে। থেকে যাবে তার স্মৃতি ও অনুষঙ্গ। এক শ্রাবণ থেকে আরেক শ্রাবণে তা আততি ছড়ায়। প্রকৃতির উপর জয়ী হয় মানুষী প্রতিভা। তার চেয়েও বড় কথা হল, গানে আছে মানুষের আত্মতা। সেই আত্মতার তো বিনাশ নেই। সঞ্চারীতে ফুটে ওঠে এতখানি বৈপরীত্যের গাঢ় সত্য। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের আপাত সুন্দর রূপাঢ্য উপস্থিতির চেয়ে বড় হয়ে ওঠে বর্তমান থেকে ভবিষ্য পর্যন্ত প্রসারণে প্রত্যাশা জাগানো গানের বৃত্ত। যা অমলিন ও অরিক্ত।

২

মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক গান লিখেছেন যার সুরের গঠন ও রূপের বিন্যাস কোনো হিন্দুস্থানি মার্গসংগীত থেকে বিলিতি গান বা বাংলা লোকগীত থেকে নেওয়া। এগুলিকে বলা হয় ভাঙা গান। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তাঁর লেখা *রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম* বইতে এমন ভাঙা গানের অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে থেকে একটি গান বেছে নেওয়া যায়, যার মধ্যে সঞ্চারীর আগমন ঘটেছে। তার মানে, মূল যে গানটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন গান লিখেছেন তাতে কোনো সঞ্চারী ছিল না, কিন্তু নতুন গানে রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারী সংযোজন করেছেন নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ শিল্পগত কারণে। মূলগান একটি সারিজাতীয় বাংলা লোকগীত যাতে স্বভাবত সঞ্চারী নেই। কেন-না বাংলা লৌকিক গানে সর্বদাই থাকে স্থায়ী ও অন্তরা এবং সেই অন্তরা থাকে একাধিক। আলোচ্য মূল সারি গানেও তাই রয়েছে। যেমন :

স্থায়ী

মন মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী
ভবনদীর তুফান ভারি।
তোর হেলে পেলে না জল কি করবি বল,
কেমনে জমাবি পাড়ি।।

প্রথম অন্তরা
তোর হেলে ছয় খান দড়ি যাচ্ছে ছিঁড়ি
ঐ দ্যাখ্ পটাস্ পটাস্ করি।
ডুবলো তোর ভগ্নতরী হায় কি করি
কেমনে জমাবি পাড়ি।।

দ্বিতীয় অন্তরা
মাঝি তরঙ্গ হেরি সইতে নারি
তাই তোরে জিজ্ঞাসা করি
বল্ দেখি কোন্ মিস্তিরি শিখায় তোরে
আজগুবি এই মাঝিগিরি।।

দীক্ষিত রবীন্দ্রসংগীতের শ্রোতামাত্রই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনে শোনা এই লোকগীতিটি ভেঙে স্বদেশ পর্যায়ের একটি গান লেখেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। ভাঙা গানটি হল 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'। মূল গানে ও ভাঙা গানে ভাবের কিছুমাত্র মিল নেই কিন্তু সুরের মিল একেবারে হুবহু এক। প্রথম গানের বিষয় দেহতত্ত্ব। সেখানে তরি মানে দেহতরী। আর ছয়খানি দড়ি মানে ষড়রিপু, নদী মানে কামনার জোয়ার, মিস্তিরি মানে গুরু। রবীন্দ্রনাথের অভিনব সৃজনপ্রতিভা ও কল্পনাপ্রবণ মন নদী-তরি-মাঝির চিরায়ত প্রতীকগুলি তাঁর গানে মেনে নিয়েছেন কিন্তু তাদের রূপক অর্থ পাল্‌টে দিয়েছেন। সেটি বুঝতে গেলে শুনতে হবে সেই গান :

স্থায়ী

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
'জয় মা' বলে ভাসা তরী।।

অন্তরা
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি-
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।।

সঞ্চারী
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই করলিনে কেউ বেচা কেনা
হাতে নাই যে কড়াকড়ি।
আভোগ

ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন ক'রে—
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি।।

ভাঙা গানে 'মরা গাঙে বান' বলতে রবীন্দ্রনাথ বোঝান পরাধীন দেশের দুর্বল চিত্তে নতুন সাহসের জোয়ার, নব চেতনার স্রোত। মাঝি বলতে তিনি বোঝান স্বদেশ জাগরণীর অধিনেতাকে, নৌকা মানে নতুন অভিযানের অবলম্বন। মূল গানের এই অভিনব ভাবান্তরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অবশ্য এক সূক্ষ্ম অন্তর্বয়ন। তা হল সঞ্চারীর সংযোজন। 'দিনে দিনে বাড়লো দেনা' এই আত্মদীনতার ঘোষণা দিয়ে সেই সঞ্চারীর শুরু। ওই দৈন্য থেকেই আসে আভোগের নতুন সংকল্প 'দে খুলে দে পাল তুলে দে।' এই নতুন সঞ্চারী দুরকম কার্যসিদ্ধি করে। ভাবের দিক থেকে তা অনেক নতুন উত্থান, সুরের দিক থেকে তা লোকগীতির দুই অন্তরার একঘেয়েমি কাটিয়ে দেয়। মূল গানের সুর হুবহু অনুকরণ করে অথচ নতুন সঞ্চারী গড়ে রবীন্দ্রনাথ গানটিকে রবীন্দ্র-ঘরানার করে নেন। মূল সুরের সঙ্গে সঞ্চারীর নব উদ্‌ভাসিত সুরের বয়ন যে নিখুঁত লাবণ্যে ও সংগতিতে মিলে যায় তার কারণ তাঁর অসামান্য সীবনদক্ষতা। এই জোড়ার কাজটুকুই এ গানকে চিরঞ্জীব করবে।

কেবল লোকসংগীত ভাঙা গানের ক্ষেত্রেই যে এমন নতুন সঞ্চারী রচনা ঘটেছে তা নয়, মার্গ সংগীত ভেঙে গান রচনার কালেও কখনো-কখনো রবীন্দ্রনাথ নতুন সঞ্চারী বেঁধেছেন, যা মূল গানে ছিল অকল্পনীয় কেন-না তা ধ্রুপদ নয় খেয়াল। সবাই জানেন খেয়াল গানে দুই তুক্— স্থায়ী ও অন্তরা। খেয়াল ভাঙা গানে সঞ্চারীর পরিকল্পনারূপে একটি গান এখানে দেখানো চলে। মূল গান :

লাগি মোরে ধূমক পলঙ্গনা
রে ননদিয়া খর বিরণ মোহে
করক পাল বাজে মুর্ভরিয়া
তন মন ধন নিত চামর করহুঁ
সদারঙ্গ পিয়া লাগত নীক
গোরে গীত খুব জাতমন্দরিয়া।।

এই গান ভেঙে রবীন্দ্রনাথ যেটি রচনা করেন সেই প্রসিদ্ধ গানটি :

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায়
অনন্তগগনে।।

পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া—
সদা দীপ্ত, রহে অক্ষয় জ্যোতি—
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে।।

বসিয়া আজ কেন আপন মনে
স্বার্থ নিমগন কী কারণে

চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে।।

সংগীতরসজ্ঞ সুভাষ চৌধুরি ঠিকই লক্ষ করেছেন যে,

দু'কলির গানটিকে চারকলি করা হল এইটিই কি এ গানের বিশিষ্টতা— তা নয়। সঞ্চারীযুক্ত হল বলেই গানটির খেয়ালের ছাঁচটির সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল গানের মেজাজটিও। বাংলায় হিন্দুস্থানির বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা নতুন সৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল— যা প্রাণবান, গতিবান।
('রবীন্দ্রসংগীতে উপাদান আর প্রকাশ' "দেশ" ৫মে ১৯৯০)

মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, সঞ্চারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের রক্তগত আসক্তি ছিল এতটাই যে, অকারণের খেলায় মেতে তিনি অনেক সঞ্চারী তৈরি করেছেন। এমনই এক কৌতূহলকর সঞ্চারী রচনার নমুনা পাওয়া যায় 'বলাকা'-র অন্তর্গত একটি কবিতার রূপান্তরিত গীতরূপে। এখানে পাশাপাশি মূল কবিতা আর তার গীতরূপ দেখলে বিষয়টি বোঝা যাবে।

মূল কবিতা	গীত রূপান্তর
মোর গান এরা সব শৈবালের দল	গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে	ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
করেনি অচল।	উদ্দাম চঞ্চল।।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে—	ওরা কেনই আসে যায় বা চলে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে	অকারণের হাওয়ায় দোলে-
এরা নাচে।	চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে,
বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়।	পায় না কোনো ফল,।।
অজানা অতিথি ওরা কবে আসে	ওদের সাধন তো নাই,
নাইক নিশ্চয়।	কিছু সাধন তো নাই
যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে	ওদের বাঁধন তো নাই
দুই কূল ডোবে স্রোতাবেগে	কোনো বাঁধন তো নাই।।
আমার শৈবাল দল উদাস চঞ্চল।	উদাস ওরা উদাস করে,
বন্যার ধারায় পথ যে হারায়, দেশে দেশে	গৃহহারা পথের স্বরে
দিকে দিকে, যায় ভেসে ভেসে।	ভুলে যাওয়ার স্রোতের' পরে
	করে টলোমল।।

কবিতা থেকে গানের সাজবদল করতে গিয়ে এখানে কত যে ভাব ও ভাষার রূপান্তর হয়েছে, পালটে গেছে ছন্দের চলন; সেসব লক্ষ করলে রবীন্দ্রনাথের সৃজন স্বভাবের নানাচারী দিক খুলে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা চমকে যাই অন্য এক দিক থেকে। মূল কবিতায় যে ভাবনার কোনো আভাসমাত্র নেই এমন এক ভাববৃত্ত গড়ে উঠেছে সঞ্চারী থেকে। সেই বিচারে এই গানের সঞ্চারীতেই ধরা আছে তার মূল মর্ম। শৈবালের মতো তাঁর গানগুলি সাধনবিহীন ও নির্বন্ধন। রবীন্দ্রনাথের গানের সেইটাই বোধহয় সংগত সংজ্ঞা।

আরেক ধরনের সঞ্চারী আলাদাভাবে দেখাবার মতো। যেমন, 'অন্তর মম বিকশিত করো' গানে যে অন্তরতরকে আহ্বান করা হয় তার কাছে গীতিকারের প্রার্থনা প্রধানত শুদ্ধতা ও উন্মেষের। গীতিকার কেবলই চান নির্মলতর, উজ্জ্বলতর ও সুন্দরতর হতে। জাগ্রত, উদ্যত আর নির্ভয়তারও আবেদন তাঁর, সেই সঙ্গে নিরলস অসংশয় অস্তিত্ব তাঁর কাম্য। কিন্তু কেন এত সব হতে চাওয়া? কীসের বৃহত্তর প্রয়োজনে? সে উত্তর মেলে সঞ্চারীতে এসে :

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।

তাহলে এতক্ষণে বোঝা গেল গীতিকারের প্রধান ও আত্যন্তিক আবেদন আসলে কী। সবার সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং মুক্ত হওয়া সব বন্ধন থেকে—এইটাই লক্ষ্য। তার জন্যই চাই অন্তরের বিকাশ, নির্মলতা, নির্ভয়, নিরলস নিঃসংশয়তা, তার জন্যই চাই জাগৃতি ও উদ্যত থাকার বলিষ্ঠতা। কথাগুলি স্পষ্ট হয় অবশ্য সঞ্চারীতে পৌঁছে।

এ যেমন নিবেদনের গান, তেমনই অন্যন্তরে থাকে, পথ সন্ধানের পর্যায়। কে জানত 'যেতে যেতে একলা পথে'গানের মতো আড়িছন্দের দোলনে রয়ে গেছে সুরের সঙ্গে ভাবনারও পথ বদল? একলা পথে যেতে যেতে ঝড়ে যখন নিবে যায় একমাত্র সহায়ক বাতি, তখন বিধ্বংসী ঝড়কেই পাওয়া যায় সাথিরূপে— গানের স্থায়ী অংশে আছে এমন এক অভিনব উপলব্ধি। অন্তরা-য় ফুটে ওঠে সেই নবসঙ্গী ঝড়ের উদ্দাম উপস্থিতি :

আকাশকোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি।

প্রমত্ত ঝড়ের ক্ষণে ক্ষণে হেসে-ওঠার মূল রহস্য তো এই যে, সে পেরেছে একজনকে ভ্রষ্ট করতে তার একান্ত নিশ্চিত ভ্রামণিকতা থেকে! কিন্তু এইবারে গানটি সঞ্চারীতে এসে দাঁড়ায় মূল সত্যোপলব্ধিতে। আমরা বুঝতে পারি যে,

যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে,
আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।

ঝড়ের কাজ তাহলে শুধু ভুল পথকে ভুলিয়ে দেওয়া নয়, সেই সঙ্গে নতুন পথে যাত্রা করার উদ্‌বোধেও। ঝড়ের বজ্ররবে পাওয়া যাবে সেই নতুন পথের বার্তা। অসামান্য এই গান সঞ্চারীতে এসে তবে স্থিত হয়।

রবীন্দ্রগানে সঞ্চারী আসে কখনো-কখনো পট পরিবর্তনের কারণে। তার ফলে গানের আরম্ভ আর গানের শেষের মাঝখানে একটা সংযোজকের কাজ জোটে তার। 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে' গানে এমন এক চমৎকার সঞ্চারী আছে। একজনের আসা আর যাওয়ার মাঝখানে রয়ে যায় চাঁদ-ওঠা আর না-ওঠার আবছায়া। যখন অন্ধকারে সে আসে তখন চাঁদ ওঠে না, তাই তাকে বুঝে নিতে হয় অনুভবে আর প্রাণের স্পর্শে। এরপরেই চাঁদ ওঠে, কিন্তু তার চেয়েও দীপ্র হয়ে সঞ্চারী জানায় :

তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।

এই চাঁদই এ গানের নির্ণায়ক। কেন-না চাঁদের আলো যেমন ব্যথিত করে প্রেমিকের একলা ফিরে যাওয়ার নির্মম সত্যকে তেমনই সেই চাঁদের আলোতেই খুলে যায় এক নতুন মাধুরী মাখা দৃশ্যের অভ্যন্তর :

তখন দেখি, পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে—
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে।।

মূলত এ এক ভ্রষ্টলগ্নের গান, যাতে মিলনের আসঙ্গ নেই, আছে বিরহের সন্তাপ। অবশ্য সে সন্তাপ বড় মাধুর্যময়। গানের চাবিকাঠি কিন্তু ওই চাঁদ ওঠার অনুষঙ্গে মেশানো। তাই এ গানও আসলে সঞ্চারীপ্রধান, তবে তা বুঝে নিতে হয় অনুমানে। এই রকম করেই কোনো কোনো রবীন্দ্রগানের মাঝখানে সঞ্চারীতে লাগে সম্পূর্ণ অভাবিত সংরাগ। বিজন প্রবাসে এসে পড়ে শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবীর স্মৃতি জাগানিয়া পর্বান্তর, কিংবা সুদূরে পরবাসে কার বাঁশি বেজে ওঠে। কিংবা হয়তো নিতান্ত অন্যমনে পদ্মের পর্ণ ছিন্নকারী একজনকে দেখে কবি ভাবেন তাঁর দিনগুলিও এমনি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে! এ সবই সঞ্চারীর অনুভব।

৩

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে সঞ্চারী কেবল ভাবের দিক থেকে বা থিমেটিক এক্সপ্যানশনরূপে বুঝলে আমাদের চেতনার সম্পূর্ণ প্রস্ফুটন হবে না। সুর বাদ দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে শুধু ভাবের মধ্যে দিয়ে বোঝা যেন আধেক আঁখির কোণে তাকানোর মতো অন্যায়। কেন-না তাঁর গানে অনেকেই খুঁজে পান কথা ও সুরের সংগতি। তা যদি সত্য বলে মানি তবে তাঁর গানের কোনো মূল্য নির্ধারণে কথার পাশে সুর তথা থিমের পাশে টোনকে বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত। রবীন্দ্রসংগীতে স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ এই চতুরঙ্গ বিন্যাসের মূলের যেসব থিমেটিক ভেরিয়েশন তার অনেক নমুনা আমরা পেশ করেছি। অন্তরা আর আভোগের মাঝখানে সঞ্চারীর বয়ন যে ওই দুই তুকের সুরের বিন্যাসগত একঘেয়েমিকে কাটানোর এক মেধাবী হুক তার কিছু ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। এবারে রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারীর সুরের কাঠামোয় যে সব নতুন ভাবনা ফুটে উঠেছে তার কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে।

সাধারণভাবে বেশিরভাগ রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারীর মাধুর্য এইখানে যে স্থায়ী ও অন্তরা-র স্বর বিন্যাসের পরে তাতে থাকে একটু ভিন্নতর স্বরবিন্যাস। কোথাও কোথাও তার থেকে অন্য রীতিও দেখা যায়। প্রথমেই দেখা যাক 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' গানের সঞ্চারী। এ-গানের সঞ্চারীর মাধুর্য এইখানে যে, 'কিছু বা সেই মিলন মেলায় যুগল গলায় রইবে গাঁথা' থেকে 'দুই চাহনির চোখের পাতা' পর্যন্ত পুরো অংশের সুর মোটামুটি স্থির হয়ে থাকে মধ্য সপ্তকের পঞ্চমে। এর ফলে গানের সঞ্চারীতে লাগে এক বিধুর ঔদাস্যের সুর যা ওই তুকের ভাবের সঙ্গে মানানসই। তেমনই 'আমি হেথায় থাকি শুধু' গানের সঞ্চারী অংশে যার শুরু 'নিশার নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন' তার স্বরবিন্যাসের সবটাই মধ্যমে বাঁধা। এই রকমই দেখা যায় 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' গানের সঞ্চারী 'বাহিরে কিছু দেখিতে নাই পাই' অংশে সুর দাঁড়ায় অমিশ্র ষড়জে।

সুর বিন্যাসের আরেক ধরন আমরা পাই 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল' গানে। যেখানে স্থায়ী ও অন্তরার সুরের চলন বেশ ঢিমে। হঠাৎ সঞ্চারীতে এসে গানের বাণী যখন বলে ওঠে 'হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে ভেবে না পাই কূল', সঙ্গে সঙ্গে সুরের চলন হয়ে যায় দ্রুত। সেকি হৃদয়ের অকস্মাৎ জাগা ঢেউকে বোঝাতেই? এই পরিকল্পনায় অন্তত এটুকু স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের বহু গানে কথা ও সুর সমতা রেখে চলে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, গানে সুরের বৈশিষ্ট্য লিখে বোঝানো কঠিন। শ্রোতাদের না হয় গেয়ে শুনিয়ে তারপরে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু পাঠকদের? সে চেষ্টা যে কেউ করেননি তা অবশ্য নয়। যেমন মনে পড়ছে সন্‌জিদা খাতুনের কয়েকটি লিখিত বিশ্লেষণের কথা, যা গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তাঁর *রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ* বইতে। এখানে তাঁর বিশ্লেষণের রীতি ও নমুনা একটু উদ্ধার করা উচিত। 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো' গানের দুটি সুর আছে। তার একটি ১৩২৩ সালে মুদ্রিত দিনেন্দ্রনাথকৃত স্বরলিপিতে দাদ্‌রা তালে নিবদ্ধ, আরেকটি ১৩৩৫ সালে মুদ্রিত ভিন্নসুরে ও কাহারবা তালে নিবদ্ধ। সন্‌জিদা তাঁর আলোচনায় বেছে নিয়েছেন প্রথম সুরের নমুনাটি।

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো, তারে রাখতে নারি টানি।।
আমার রইলো না লাজ লজ্জা, আমার ঘুচলো গো সাজসজ্জা—
তুমি দেখলে আমারে এমন প্রলয় মাঝে আনি
আমার এমন মরণ হানি।।

ওই স্থায়ী ও অন্তরা অংশে সন্‌জিদার মনে হয়েছে :

ধীর পদক্ষেপ। সুরে ঐকান্তিক লজ্জাতুর ভাব। 'আমার মুখের আঁচলখানি' বলতে কণ্ঠস্বর খুব নামিয়ে বলা একেবারে।

'ধ্না্ প্-া/ না্ না্-া/ সা সা -রা/ রা রা-া'।

আ মা র মু খের আঁ চ ল খা নি

ঢাকা থাকে না বিবৃতির পর 'হায় গো' বলে তানে বিব্রত ব্যাকুলতার ভাব। 'আমার রইল না লাজলজ্জা' পংঙ্‌ক্তির লজ্জা বলতে পঞ্চম স্পর্শ নিয়ে কোমল নিখাদে দুমাত্রা কাল থেকে তৃতীয় মাত্রায় আকস্মিক মধ্যমে নেমে আসতে লজ্জার তীব্রতায় কণ্ঠ বুঁজে আসবার ভাবটি ফোটে। 'তুমি দেখলে আমারে'-র শেষে তারার মধ্যম ছোঁয়া কোমল গান্ধার সুরে লজ্জাকুলতা চরমে পৌঁছিয়ে চড়ার সুর থেকে, ধাপে ধাপে, ওঠানামা করতে করতে নেমে সুরের 'সা'-তে এসে বিরাম নেয়।

এরপরে গানের সঞ্চারীতে হঠাৎ একটা ভাবের ও দৃশ্যের দোলা লাগে, তখন গানের বাণী :

হঠাৎ আকাশ উজলি কারে খুঁজে কে ওই চলে,
চমক লাগায় বিজুলি আমার আঁধার ঘরের তলে।

সন্‌জিদা বোঝাতে চান :

সঞ্চারীতে আবার 'সা' থেকে বক্তব্য শুরু হয়, আবার ধাপে ধাপে ওঠে সুর। চমক লাগায় বিজুলিতে কোমল নিখাদ পর্যন্ত উঠে 'আমার আঁধার ঘরের তলে' বিবৃতির জন্য একটু নেমে এসেও সুরের 'সা'-তে থেমে রেখাবের অশান্তিতে আপনাকে যেন জাগিয়ে রাখে শেষ পর্যন্ত। সঞ্চারী থেকেই আসল বক্তব্য বিষয়ে চঞ্চলতার ভাব জেগে উঠেছে।

এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সংগীতে দীক্ষিত শ্রোতা ভিন্ন আর কে তেমন করে বুঝবেন? তাই সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবে রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারীর সুরের স্বধর্ম বিষয়ে কতগুলি মন্তব্য করা চলে। প্রথমত দেখা যায়, স্থায়ী আর সঞ্চারীর সুরের বিন্যাসে একটা সাধর্ম্য থাকে, তেমনই মিল থাকে অন্তরা আর আভোগে। 'কোন্ সুদূর হ'তে আমার মনোমাঝে' কিংবা 'আজ আকাশের মনের কথা' গান দুটি আলাদা করে শুনলে বোঝা সহজ হবে। দ্বিতীয়ত লক্ষণীয় যে, বহু ক্ষেত্রে কোমল স্বর স্থায়ী আর সঞ্চারীতে লাগে, কিন্তু অন্তরা আর আভোগে লাগে না। উদাহরণরূপে শোনা যেতে পারে 'কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে' গান। তৃতীয়ত দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের অনেক গান যখন চড়া পর্দায় শুরু হয় তখন সঞ্চারীতে অবশ্যই শুরুতে লাগে নিচু পর্দার স্বর। যেমন শোনা যেতে পারে, 'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে' গানের সূচনায় চড়া পর্দার সঙ্গে সঞ্চারীর 'মেঘলা দিনের আকুলতা'-য় নিচু স্বর। অথবা 'ওহে সুন্দর মরি মরি' গানের সঞ্চারী 'মধু সমীরে দিগঅঞ্চলে' অংশের সুরের ধরন।

কিন্তু মনে রাখা চাই যে, ব্যতিক্রমও রবীন্দ্রগীতের এক বিশেষ ধর্ম, কেন-না সে বারে বারে ও ফিরে ফিরে নতুন। তাই ব্যতিক্রমের নমুনারূপে দেখানো যায় 'ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' গানের প্রসঙ্গে। এ গানের সবটাই প্রায় চড়া পর্দায় বাঁধা, কিন্তু সঞ্চারীর 'পূর্ণিমার চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়' অংশ তদুপরি তার সপ্তকের ষড়জ থেকে শুরু হয়। ব্যতিক্রমের অন্যতর নমুনা পাই 'আজি গোধূলি লগনে বাদল গগনে' গানে। সেখানে গান শুরু হয় নিচু পর্দায় কিন্তু সঞ্চারীতে যখন উচ্চারিত হয় 'উতলা হয়েছে মালতীর লতা' তখন শুরু হয় চড়া পর্দায় সুরের চলন।

এসব উদাহরণ থেকে আমাদের বলবার কথাটা বেরিয়ে আসে। তা এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনার সৃজন ছন্দে রেখে গেছেন নানা নির্মাণের ইঙ্গিত ও পথনির্দেশ। ভাবের একঘেয়েমি আর সুরের একমুখী গতি বর্জনের জন্যই যে তিনি সঞ্চারী পরিকল্পনা করেছিলেন এতে সন্দেহ নেই। অবশ্য তাঁর ইঙ্গিত আর পথনির্দেশ ব্যর্থ হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গানে সঞ্চারী হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবলই প্রথা আর প্রচল।

৪

অমিয় চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রগীতির অন্তরা' নামে ক্ষুদ্ররচনায় রবীন্দ্রনাথের গানে সঞ্চারী সৃজন বিষয়ে অনেক দিকনির্দেশী মন্তব্য করে গেছেন। তিনি কেবল একটি গুরুতর ভুল করে বসেছেন, সঞ্চারীকে তিনি বলেছেন অন্তরা। এই পরিভাষা ঘটিত বিপর্যয় বাদ দিলে তাঁর লেখাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণে গভীর। এখানে তাঁর কিছু ভাবনা উদ্ধৃত হচ্ছে সঞ্চারী প্রসঙ্গে। পাঠক কেবল 'অন্তরা' শব্দটি 'সঞ্চারী' বলে ধরে নেবেন। অমিয় চক্রবর্তীর মতে :

> রবীন্দ্রগীতির অন্তরা [সঞ্চারী] তাঁর গানে রত মানসলোকে ধ্রুব অবসর দান করেছে, এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। ভাবনা ও সুরের সন্ধিক্ষণে যেন তিনি সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সৃজন গতিকে নতুন পথে চালিত করেছেন। অনেক সময় দেখা যায় অন্তরায় [সঞ্চারী] এসে তাঁর গানের মোড় ঘুরে গেল, ঝোঁক বদলিয়ে অথবা অপ্রত্যাশিত শিল্পিত নতুন গলি বেয়ে তাল এবং বাক্য সাধিত হল। বলা বাহুল্য অবচেতনাব তলে তলে গান তৈরি হয়ে ওঠে, সেই ধ্বনির তরঙ্গময় চিত্তবেগ গণনা করা যায় না। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টির ক্রিয়া দেখা যায় রবীন্দ্রগানের অন্তরায় [সঞ্চারী], অনুশীলন করবার বিষয় এটি।

এই পর্যন্ত বলে অমিয় চক্রবর্তী আনেন, 'সেদিন আমায় বলেছিলে' গানে সঞ্চারীর প্রসঙ্গ। তা বোঝবার জন্য এখানে আগে গানটির স্থায়ী ও অন্তরাটুকু দেখে নিতে হবে।

সেদিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই।।
তখনো খেলার বেলা— বনে মল্লিকার মেলা,
পল্লবে পল্লবে বায়ু উতলা সদাই।।

এরপরেই সঞ্চারীতে বলা হয় :

আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলীবিলীন, ভূষণবিহীন।

অমিয় চক্রবর্তী এই সঞ্চারীর মহিমা বোঝাতে লেখেন :

> এখানে অন্তরা [সঞ্চারী] চিত্র দিয়ে পূর্ণ করল যুক্তির অঙ্গ। বিশেষ ঋতুর স্থির দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাবচ্ছবিকে আরও স্পষ্ট করা হল। সুরও এখানে জ্বলে উঠল বৈরল্য বেদনায় ধীরগামী অনির্বচনীয়তায়। বনে মল্লিকার মেলা, পল্লবে পল্লবে উতলা বায়ু ছিল যে হৃদবসন্তের উচ্ছল প্রতীক, তাকে অতিক্রম করে এই প্রতীক হেমন্তে উদাসীন অপেক্ষমান জীবনে উপনীত। প্রকৃতির বদল, বৎসরের শেষ, প্রাণের দিনান্ত, 'কুহেলীবিলীন ভূষণবিহীন' ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এই অন্তরার [সঞ্চারী] চিত্রপট।

প্রকৃতিপর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সঞ্চারীতে আরও নবীন ভাবনার দৃষ্টান্ত রেখে যান সংগোপনে তাঁর উত্তরপুরুষদের আস্বাদনের জন্য। বর্ষার গান 'বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মেলা' স্থায়ীতেই চমকে দেয় এক সামগ্রিক ও সর্বব্যাপী চিত্রকল্পের বিশালতায়। সেই আষাঢ়ের শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতের জ্বালা আমাদের টেনে রাখে বর্ষার মর্ম প্রদাহের দিকে। কিন্তু এই দৃশ্যচিত্রের ও ভাব সৌন্দর্যের পাশে আষাঢ়ের ধ্বনিগত শ্রাব্যরূপটি বোধহয় আদপেই ফোটেনি। সেটি অবশেষে পূরণ হয় সঞ্চারীর ধ্বন্যাত্মক শব্দের অভূতপূর্ব বিন্যাসে :

মরো মরো পাতায় পাতায় ঝরো ঝরো বারির রবে
গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে তোমার কী উৎসবে।।

সঞ্চারী এসে ভাবরূপের সঙ্গে ধ্বনিকে মিলিয়ে তৈরি করল সর্বাঙ্গীণ পটভূমি।

শ্রোতাদের হয়তো এর গায়ে গায়েই মনে পড়বে বাদল বাউলের একতারা বাজিয়ে নাচের প্রসঙ্গ। সেখানেও সঞ্চারীতে 'পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর' নূপুরের বাজনা আলাদা করে শোনবার মতো। আমাদের মন অবশ্য বেশি আপ্লুত হয় আরেকটি বর্ষার গানের ধ্বনি চিত্রে। তার গোড়াতেই চমক :

পুব-সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী—
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি
সহসা তাই কোথা হতে কুলুকুলু কল স্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী।।

সাপ খেলাবার বাঁশি শুনে জলের ধারায় কুলুকুল স্রোতনৃত্য, কল্পনার এতটাই অভিনবত্ব বহন করছে যার অভিভব সামলাবার আগেই এসে যায় সঞ্চারীর ধ্বনির আঘাত :

আজ দিগন্তে ঘন ঘন গম্ভীর গুরু গুরু
ডমরু রব হয়েছে ওই শুরু।

অল্পপ্রাণ আর মহাপ্রাণের এই ধ্বনি সমন্বয়, ঘোষ আর অঘোষের এই সমূহ ঘর্ষণ আমাদের চমৎকৃত করে। সুর শুধু সেই উত্তাল ধ্বনি স্পন্দের উচ্চাবচতাকে কোনো রকমে সামাল দেয়। এমন মুখর সঞ্চারী রবীন্দ্রসংগীতে খুব বেশি নেই।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক মন ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান' নিবন্ধে সঞ্চারীর আরেক রকম বিস্তারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শাপমোচন নাটোর 'দে পড়ে দে আমায় তোরা'গানে যে বিশ্ববীক্ষার একটা আর্তি ঢাকা ছিল তা আমরা তাঁর আগে বুঝিনি। তিনি লিখেছেন:

'দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে—
গানটিতে প্রেম বিশ্বসাথে চিত্তযোগের ঘটক—
শস্য খেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্ত গমন পান্থ হাওয়া লাগুক আমার মুক্ত কেশে!

শাপমোচনের চরিত্রই হোক আর যে-কোনো নারীই হোক একথা প্রাক্ রবীন্দ্রযুগের প্রেমিকার কখনো মনে হয়নি—

নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের অরুণ বরণ মেলুক আমার বাতায়নে!
এই ব্যাপ্তির পিপাসা আমাদের আজকের প্রযুক্তিবিদ্যাবিহ্বল সংকীর্ণ জীবনে জাগ্রত বলেই আধুনিক মন রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানকে কণ্ঠে ধরে রাখবে।

এই গানে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের সংকীর্ণ ব্যক্তিবৃত্তের বাইরের পিপাসাটুকু দেখিয়েছেন। বিজন মনে নীল আকাশের উদার সুর লাগানো আর মনের বাতায়নটিতে পথের গতিরাগ এঁকে নেওয়ার এই আকুতি যেমন গানটিতে অন্যমাত্রা আনে তেমনই প্রতিষ্ঠিত হয় সঞ্চারীর নিগূঢ়তা।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে নিসর্গের সন্নিপাত বিষয়ে বহু বিশ্লেষণ চলতে পারে। তবে আপাতত আমরা দেখতে পারি ছোট একটি গানের নমুনা যার স্থায়ী ও অন্তরায় নরনারীর প্রেম পটভূমি, অথচ পশ্চাদভূমিতে নিসর্গের সূক্ষ্ম প্ররোচনা রয়ে যায়। স্থায়ী আর অন্তরায় বলা হয় :

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না, না, না।'
যত বলি 'নাই রাতি— মলিন হয়েছে বাতি'
মুখ পানে চেয়ে বলে, 'না, না, না।'

এই যেতে চাওয়া আর যেতে না দেওয়ার মাঝখানে সঞ্চারীতে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুল বসন্ত আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় :

বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা-হা ফুলের বনে।

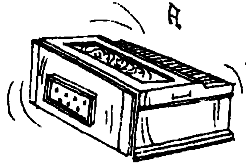
এই হা-হা কি রিক্ততার না হতাশার? তার জবাব সহজ নয়, তবে রবীন্দ্রনাথের গানের সঞ্চারীতে বসন্তের এমন ব্যাপকতা ও এতখানি তাপ আগে দেখিনি আমরা। এই হা-হা করা বসন্তের পটে চলে যেতে চাইছে যে, তাকে ছেড়ে দেওয়া তো আরও কঠিন। তাই :

আমি যত বলি 'তবে এবার যে যেতে হবে'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, 'না, না, না।'

বিভ্রম থেকে যায় কেবল যে কাকে যেতে দেওয়া গেল না। সে কি স্বয়ং বসন্ত না বসন্তসনাথ সেই প্রেমিক?

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভালো গানগুলি স্থায়ী ও অন্তরাতে যেন শিশু তরুর মতো কেবলই বাড়তে চায়, তারপরে সঞ্চারীতে অন্তঃশীল পুষ্টি তাকে মহীরুহের উচ্চাশা এনে দেয়। খুব গূঢ় সেই শুশ্রূষা। গান শুনতে শুনতে সব সময় খেয়াল থাকে না কখন গানের অন্তরে প্রাণের বাঁশির সুর লাগে, কখন লুকানো কথার আভাসন জাগে, কখন সুরের সংকেতে ভরে ওঠে পুঞ্জিত বেদনা। তবে সঞ্চারীর মধ্যেই সঞ্চরিত থেকে যায় রবীন্দ্রগানের বীজপত্র। আমরা শুধু দেখতে পাই পুষ্পপল্লব পরিকীর্ণ সম্ভার।

৫



এ কি মধুর ছন্দ

দিলীপকুমার রায় তাঁর পিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি একদিন বলেছিলেন বাঙালি গীতরসিকরা তাঁকে বা রবীন্দ্রনাথকে কখনো ভুলে যাবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় কথাগুলি এইরকম : 'না রে না, আমাকে কি রবিবাবুকে ভুলে যাবে না। আর কেন যাবে না জানিস্ ?— এইজন্যে যে, আমরা রেখে যাচ্ছি যা বাঙালির প্রাণের জিনিস — সুরে বাঁধা গান। আমি যে কী সব গান বেঁধে গেলাম সেদিন তুইও বুঝবিই বুঝবি।'

পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন দ্বিজেন্দ্রলালের অকাল প্রয়াণ ঘটে তখন দিলীপকুমারের বয়স মাত্র সতেরো বছর। বাকি জীবনে দিলীপকুমার নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন তাঁর পিতার সংগীত-নির্মাণের অনন্যতা ও সৃষ্টির ঐশ্বর্য। তার সম্প্রচার ও স্বরলিপি প্রণয়নেও তিনি ছিলেন যথাসম্ভব যত্নশীল। যথাসম্ভব, কেননা তাঁর সতেরো বছরের সংগীত-মেধায় কতটাই বা ধারণশক্তি ছিল! দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যূন পাঁচশো গানের সুর ও প্রকরণ কি দিলীপকুমারের স্মৃতিধার্য থাকতে পারে? অন্যদিকে গানের রচনা বিষয়ে অনর্গল ও সোচ্ছ্বাস দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু গানের সংরক্ষণ ও প্রচার বিষয়ে ছিলেন সম্বৃত ও উদাসী। তাঁর চারপাশের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ এবং স্তাবকের দল যতটা রবীন্দ্র-বিদ্বেষে মশগুল ছিলেন ততটা দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। এককথায় বলা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের যদি থাকত একজন দিনেন্দ্রনাথের মতো ভাণ্ডারী তবে দ্বিজেন্দ্রসংগীত আজকের এই কুণ্ঠিত ভূমিকার দীনতা মেনে নিত না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের অনন্যতা আর তার আবশ্যিক সুর সংরক্ষণ সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন গুণজ্ঞ প্রমথ চৌধুরি। দ্বিজেন্দ্রপ্রয়াণের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি সভায় তিনি তাই বলেছিলেন : 'আমার শেষ কথা এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের সুরগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারলেই তাঁর যথার্থ স্মৃতিরক্ষা করা হবে। এ সকল সুরের বিশেষত্বের লোপ পাবার সম্ভাবনা খুব বেশি, কেন-না সুর মুখে মুখে কথার চাইতেও বেশি বদলে যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি যদি আমরা অতি সত্বর স্বরলিপিতে আবদ্ধ না করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সেসব সুর আমাদের চল্‌তি সুরেতে পরিণত হবে।'

এমন ভবিষ্যৎদর্শী ইঙ্গিত আজ আয়রনির মতো দ্বিজেন্দ্রলালের গানে জড়িয়ে গেছে। আমাদের স্মরণকালের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রসংগীতের সুর এতটাই বিকৃত হয়েছে, এতখানি চল্‌তি সুরে (যাকে বলে 'বন্যার সুর') বদলে গেছে তার মূলরূপ কেমন ছিল তা গবেষণার বিষয়। সে-গানে ভাষা ও শব্দবিকৃতিও ঘটেছে যথেচ্ছ। 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' কথাগুলি এখন প্রায় সকলেই উচ্চারণ করেন 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' এইভাবে। গ্রামোফোন কোম্পানি ও আকাশবাণী দ্বিজেন্দ্রলালের গান একাধিক সুরে সম্প্রচার করেন এমন ঘটনা আমরা নিত্যই দেখি। তাঁর একই গান দু'রকম সুরে ও ঢঙে গেয়ে দুজন প্রখ্যাত শিল্পী রেকর্ড প্রকাশ করেছেন এমন নমুনা দুষ্প্রাপ্য নয়। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দ্বিজেন্দ্রলালের গান আমাদের সবচেয়ে অবহেলিত উত্তরাধিকার এবং সকরুণভাবে অভিভাবকত্বহীন। রবীন্দ্রসংগীতের তত্ত্বাবধানে আছে *স্বরবিতান* ও বিশ্বভারতী অতুলপ্রসাদের গানের অভিভাবক ব্রাহ্মসমাজ এবং স্বরলিপি *কাকলি*, রজনীকান্তের গানের প্রত্যক্ষ পরিচালক তাঁর সুযোগ্য দৌহিত্র। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের উদাসী স্বভাব যেমন তাঁর জীবিতকালে গান সংরক্ষণে তৎপর ছিল না, তেমনই তাঁর অকালপ্রয়াণের দুর্ভাগ্য এবং অকারণ রবীন্দ্রবিরোধিতার কালিমা একশ্রেণির গীতরসিকের মনকে চিরকালের মতো তাঁর গান সম্পর্কে করেছে অনুৎসাহী। দিলীপকুমারের সন্ন্যাসগ্রহণ, পণ্ডিচেরি ও পুনায় প্রবাসী জীবনও দ্বিজেন্দ্রসংগীতের প্রার্থিত প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রকে চঞ্চল করে দিয়েছে অনেকটাই। তাঁর গানে সুরবিকৃতি ও সুরের সাধারণীকরণ ঘটেছে দুই সূত্রে। রঙ্গমঞ্চে সাধারণ নটনটীদের অমার্জিত কণ্ঠপ্রয়োগে এবং অদীক্ষিত স্বৈরতায় আর স্বদেশি গানের সম্মেলক সুরমর্দনে। জনপ্রিয়তার স্বভাবই এই বিকৃতিকরণ। এখন যে-কোনো বিদ্যালয়ে প্রারম্ভিক গান হিসাবে 'জনগণমন' গায়ন শুনলে একথা হৃদয়ঙ্গম হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশি গানগুলি এককালে এদেশে এতখানি জনপ্রিয় হয়েছিল যে তাতে সকল দেশানুরাগীর সুর ও অ-সুর কণ্ঠ সংযোজিত হয়ে আজ সেগুলির রূপ দাঁড়িয়েছে এক ধ্বস্ত উপসংহারে। দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনায় তাই আজ প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর দুর্ভাগ্যজড়িত জীবন এবং মরণোত্তর অখ্যাতির দায়ভাগের কথা। সে সব বিস্তারিতভাবে নানা রচনাতেই আছে। আপাতত আমাদের প্রয়াস হবে তাঁর সাংগীতিক জীবন উন্মোচন ও সংগীত-রচয়িতা হিসাবে মূল্যনির্ধারণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের রক্তে ছিল গান। তাঁর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন উনিশ শতকের প্রখ্যাত কালোয়াত। রাগরাগিণীর জ্ঞান তাঁর ছিল খুব পাকা। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক এবং গান রচনাতেও দক্ষ। পিতার সংগীত-সংস্কার দ্বিজেন্দ্রলালের চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছিল। ছ'সাত বছর বয়সেই তিনি পিতার কণ্ঠে 'ক্যায়সে কাটে পেয়ালা মের নাগরী' গানটি শুনে নিজের চেষ্টায় হারমোনিয়াম শিখে নেন। মাত্র ন'বছর বয়সে অগ্রজের ফরমায়েশে মৌলিক গান রচনার কৃতিত্ব দেখান। স্বভাববিষণ্ণ এই কিশোরের গান শুনে রামতনু লাহিড়ী মন্তব্য করেন :

> এই অল্প বয়সে তোমার হৃদয়ে এমন কী বিষাদ বা দুঃখ থাকিতে পারে যাহাতে তোমার প্রায় প্রত্যেক গানেরই সুরে এমন বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে?

সন্দেহ কি যে এই বিষাদ, এই রোমান্টিক সন্তাপ দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্গত গীতিস্বভাবেরই এক সামান্য লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুই বছরের অনুজ দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩—১৯১৩) স্বপ্রবর্তনায় গান লিখতে থাকেন খুব কিশোর বয়সে। তাঁর প্রথম গীতসংকলন *আর্যগাথা প্রথম ভাগ* (১৮৮২) প্রকাশিত হয় তাঁর বিলাত যাত্রার আগে। এ-সংকলনে রয়েছে তাঁর বারো থেকে সতেরো বছরের মধ্যে লেখা একশো আটখানি গান। বিষয়, প্রধানত প্রকৃতি ঈশ্বর ও স্বদেশস্তুতি। গানগুলির ধরন যে অনেকটাই কবিতা-ঘেঁষা তা খুব সহজেই বোঝা যায়। ভবিষ্যতে যিনি বাংলাগানের ক্ষেত্রে উপহার দেবেন অসামান্য সব প্রেমের গান, তাঁর কিন্তু *আর্যগাথার* যুগে মনে হয়েছিল,

যতদিন না দুঃখিনী মাতৃভূমির এই দুঃখ, দৈন্য ও হীনতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় ততদিন ভারতবাসীর মুখে প্রেম-সংগীত ভালো দেখায় না।

অচিরে এই স্বদেশপ্রেমী এদেশে তাঁর উচ্চশিক্ষা সাঙ্গ করে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করতে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে রওনা হন ইংল্যান্ড অভিমুখে ১৮৮৪ সালে এবং সেখানে তাঁর ভারতীয় মার্গসংগীতশীলিত জীবনে খুব বড় অভিঘাত আসে বিলিতি গানের সুর সংক্রামে। বিলিতি গানের প্রথম অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে মনোরম হয়নি। সেকথা স্বীকার করে লিখেছেন :

> আমি সলজ্জে স্বীকার করি যে, এককালে আমারও ইংরাজি গানে বিশুদ্ধ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল। আমি যেদিন ইংলন্ডের সর্বপ্রধান সংগীত রচয়িতার রচিত সর্বোত্তম oratoria শুনিতে টিকিট কিনিয়া 'আলবার্ট' হলে প্রবেশ করিলাম ও গুটিকতক গান শুনিলাম সেদিন ইংরাজি সংগীতের হীনত্ব ও অপদার্থত্ব আরও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুতপদচারণ করিয়া, একেবারে শয়নকক্ষে উপনীত হইলাম এবং কেন যে লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া এরূপ সংগীত শোনে, ইহা পর্যালোচনা করিতে করিতে শয়ন করিয়া কতক শান্তি উপভোগ করিলাম।

কিন্তু কালক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। সেই কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> ক্রমে বিলাত-প্রবাসে, নানা বন্ধুর নিকটে ছোটোখাটো ইংরাজি গান শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম, "বাঃ, এ মন্দই বা কি ?" ক্রমে তাহার অনুরাগী হইয়া আরও শুনিতে চাহিতাম;এবং শেষে আমার ইংরাজি গান শিখিবার প্রবৃত্তি হইল ও পয়সা দিয়া গান শিখিতে আরম্ভ করিলাম।

এখানে আমাদের মনে পড়ে, বাঙালি সুরকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের গানেই সবচেয়ে বেশি ও সার্থকভাবে বিলিতি সুরের ব্যবহার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও একটা পর্যায় পর্যন্ত তাঁর গানে বিলিতি সুরের প্রয়োগ করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের সামগ্রিক নির্মিতিতে বিলিতি সুরের প্রভাব খুব নগণ্য। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের স্বভাবধর্মে বিলিতি গানের ধরন একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। গিরিশচন্দ্র বসু ইংলন্ডের সিসিস্টার কলেজে দ্বিজেন্দ্রলালের সহপাঠী ছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের বিলিতি সংগীতের শিক্ষা সম্পর্কে জানান :

> যাঁহার কাছে সেখানে তিনি গান শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন সে রমণীটি তাঁহার নাকি সুরের সংস্কার ও ভরাট গলার চর্চা করার জন্য তাঁহাকে বহুবার বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। সেই অনুরোধের পরিণামে, পরে যে কী ফল ফলিয়াছিল তাহা আজ বঙ্গবাসী কাহারও অজ্ঞাত নাই। যিনিই তাঁহার গান একবার শুনিয়াছেন তিনিই জানেন দ্বিজুর গলা কীরূপ ভরাট ছিল এবং পরে তাঁহার সুরের সঙ্গে নাকের আর অণুমাত্র সংস্রব ছিল না।

ইংলন্ড প্রবাসে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু বিলিতি গান শিখলেন না, আইরিশ ও স্কচ গানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। এরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিনি ১৪টি ইংরাজি গান, ১৩টি স্কচ গান, এবং ৭টি আইরিশ গান বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদগুলি আক্ষরিক। প্রসঙ্গত বলা দরকার দ্বিজেন্দ্র-অনূদিত অনেকগুলি স্কচ ও আইরিশ গানের মূল রূপ রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল, তবে রবীন্দ্রনাথ সেই গানের সুরে নতুন বাণী বসিয়েছিলেন।

১৮৮৬ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত থেকে ফিরে ১৮৮৭ সালের এপ্রিল মাসে সুরবালা দেবীকে বিবাহ করে সংসারী হন। যদিও সম্ভবত বিদেশে একজন ইংরাজ নারীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয় তবে শেষ পর্যন্ত তা পরিণয়ে সার্থকতা পায়নি। পত্নী হিসাবে সুরবালা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বনির্বাচন। তাঁদের ষোলো বছরের অবিমিশ্র

আনন্দের দাম্পত্যজীবন মূলত দ্বিজেন্দ্রলালের গান রচনার সবচেয়ে ফলবান সময়। ইতিমধ্যে ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সরকারি চাকুরির (তাঁর ভাষায় 'দাস্য') বিড়ম্বনা, যার অবসান ঘটান তিনি ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যুর তিন মাস আগে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে। প্রথম যৌবনে তাঁর বিলাত প্রবাসের অপরাধে নৈষ্ঠিক হিন্দুসমাজ তাঁকে একঘরে করেন। এই অবরোধ তাঁকে প্রতিবাদী করে তোলে। একদিকে ব্যঙ্গ প্রহসন লিখে আরেকদিকে হাসির গান রচনা করে তিনি সব্যসাচীর মতো স্রষ্টার আসনে বসলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সমাজ আর দেশকাল অনেকাংশে তাঁকে গীতিকাব বানিয়েছে। অবশ্য তাঁর অন্তস্তলে স্ফুটনোন্মুখ ছিল এক স্বভাব লিরিক গীতিকারের একান্ত সম্ভাবনা। সুখী প্রণয়ের শুশ্রূষা আর সরকারি বদলির চাকরির খণ্ডিত-প্রবাস জীবনের মজলিশি পরিবেশ তাঁর চমৎকার প্রেমের আর নিসর্গের গানগুলি আদায় করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর গানের সংস্কার অনেকটাই হয়ে গেছে পরিমার্জিত। চাকরিসূত্রে তিনি ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে। সেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় সেকালের বিখ্যাত খেয়াল গায়ক তাঁর আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বিস্তারধর্মী খেয়াল গানে টপ্পার অন্তর্দ্যুতি লাগিয়ে একরকম গীতি-প্রকরণ খুব চমৎকার গাইতেন। তাকে চল্‌তি কথায় বলে টপ্ খেয়াল। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্মুখী প্রেমের ও বিষাদবেদনার গানগুলি গড়ে ওঠে এই টপ্ খেয়ালের রীতিতে। সেই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত জীবনে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব খুব সুদূরপ্রসারী। এ সম্পর্কে সত্যিকারের ভাষ্য পাওয়া যায় দিলীপকুমারের স্মৃতিচারণায় এই ভাষায়,

> ওস্তাদ গাওয়াইয়ার চেয়ে আমাদের কাছে ঢের বেশি আদরের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর খেয়াল (বা টপ্ খেয়াল) ছিল এমন অদ্বিতীয় সৃষ্টি যে শুনলে চমকে যেতে হত। কবি হিন্দুস্থানি গানের মর্মে প্রবেশ করেন কৈশোরেই তাঁর পিতৃদেবের খেয়াল শুনে শুনে। কিন্তু তারপর তিনি খুব বেশি ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন বিলিতি গানের। সুরেন্দ্রনাথই তাঁকে ঘরের ছেলে করে ঘরে ফিরিয়ে আনেন অর্থাৎ ভারতীয় গানের নিজস্ব ক্ষেত্রে।

সংগীতের ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে এই সঠিক রূপবন্ধের নির্বাচন খুব জরুরি। রবীন্দ্রসংগীতের নিজস্ব চারতুকের বিন্যাস অথবা অতুলপ্রসাদের স্বক্ষেত্র ঠুংরি তাঁদের গীতিস্বভাবের উন্মোচনের সবচেয়ে কার্যকর হয়েছিল। তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের এই টপ্‌খেয়াল আর তার সঙ্গে বিলিতি সুরের চলন মিলেমিশে একটা চমৎকার নির্মিতি। এই প্রকরণ তিনি পঁচিশ বছরের মধ্যেই আয়ত্ত এবং আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীনচিত্ততা ও সাহসী স্বভাব ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পদে পদে মনান্তর সৃষ্টি করে চাকুরিক্ষেত্রে। ফলে তাঁকে অনবরত বদলি করা হতে থাকে স্থানান্তরে। সেই বদলির ঘনঘটা এবং চাকরিস্থলের দূরত্ব দেখবার মতো। যেমন মধ্যপ্রদেশ (১৮৮৬), মজঃফরপুর (১৮৮৭), মুঙ্গের ও ভাগলপুরের অন্তর্গত শ্রীনগর ও বনেলি এস্টেট (১৮৮৮-১৮৯৩), দিনাজপুর (১৮৯৩), বাঁকিপুর-পাটনা (১৮৯৪), ঢাকা (১৮৯৪-৯৫) কলকাতা (১৮৯৫-১৯০৫ মোট ৬টি পদে ৮ স্থানে), খুলনা (১৯০৫-০৬), মুরশিদাবাদ (১৯০৬), জেহানাবাদ (১৯০৭), গয়া (১৯০৭), ২৪ পরগনা (১৯০৯)। দ্বিজেন্দ্রলাল একটি চিঠিতে দেবকুমার রায়চৌধুরিকে লেখেন : 'ক্রমাগত transfer (বদলি) আমাকে যথার্থই যেন অস্থির করে তুলেছে।' এই অস্থিরতা যে তাঁর সৃষ্টিশীল জীবন তথা গান রচনার প্রশান্ত অবকাশকে বারে বারে বিপন্ন করেছে তাতে আর আশ্চর্য কি? দিলীপকুমার তাঁর পিতার সম্পর্কে লিখেছেন :

> তিনি সুগায়ক ছিলেন, কিন্তু ওস্তাদ ছিলেন না যেমন ছিলেন ঠাকুরদা। শিখলে ওস্তাদ হতে পারতেন কিন্তু আশৈশব তাঁকে পড়াশুনোই বেশি করতে হয়েছিল, ফিরে এসে চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনি।

তবু এই ভয়ানক স্থানান্তরের অভিশাপের মধ্যে তাঁর মজলিশি স্বভাব এবং উপভোগ্য দাম্পত্য জীবন দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এমন এক স্বয়ম্বশয়তা সৃষ্টি করেছিল যে তার টানে বহু বিচিত্র হাসির গান ও প্রণয়সংগীত রচনায় তাঁর ক্ষান্তি ছিল না। সেই সব গান নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় গীতি সংকলন *আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ* (১৮৯৩) প্রকাশ পায় প্রথম ভাগের দশ বছর পরে। এ-সংকলনের অধিকাংশই প্রেমের গান। গানগুলি দুই পর্যায়ে সাজানো— 'কুহু' আর 'পিউ'। পিউ-পর্যায়ে রয়েছে স্কচ, আইরিশ ও ইংরাজি গানের অনুবাদ। *আর্যগাথার* ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন, 'দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে।' গানের সুরের গভীরতা ও বিন্যাসের চাতুর্যে সেই যুগান্তর আভাসিত।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভেতর ভেতর তৈরি হয়ে উঠেছিলেন তিনি আরেক শস্ত্রে। কাপট্য শঠতা ঘেরা আমাদের সমাজের চালচলন, তার গোঁড়ামি আর সংস্কারান্ধতা, অন্যদিকে নকল সাহেবিয়ানা আর ইংরাজের গোলামি দেখে দেখে তাঁর অমল মনে গড়ে উঠেছিল একটা প্রতিরোধের অঙ্গীকার। *আষাঢ়ে* কাব্যে, নানা প্রহসন নাট্যে এবং প্রধানত হাসির গানে অনর্গলিত হল সেই রোষ আর ক্ষোভ। সে-গান হাসাতে হাসাতে পিঠে চাবুক মারে। সেকালের আত্মচেতন মানুষ সেই গানে চমকে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল যেসব জায়গায় চাকরিসূত্রে বদলি হতেন সেখানেই বসত হাসির গানের আসর। গায়ক ছিলেন তিনি নিজে। এমনই একাধিক হাসির গানের আসরে দ্বিজেন্দ্রলালের গান শুনে রজনীকান্ত সেন শুরু করেন হাসির গান রচনা। হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বিলিতি গানের গায়কী এবং ভারতীয় রাগরাগিণী ব্যবহার করেছিলেন, এইখানেই ছিল নতুনত্ব। বিষয়ের লঘু চপলতা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল সুরনির্মিতির গাম্ভীর্যে। আসরগুলিতে শেষ পর্যন্ত হাসির গান অবশ্য টেনে আনত শোচনা। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সে গান শুনে বলেন, 'এ তো হাসির গান নয় দ্বিজেন্দ্রবাবু, এ যে কান্নার গান'। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এ কি হাসির গান? এ যে cruellest tragedy'।

হাসির গান সংকলিত হয়ে প্রকাশ পায় অনেক পরে ১৯০০ সালে। এদিকে সত্যি সত্যিই ঘনিয়ে আসছিল দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে সবচেয়ে সংকটময় সময়, তাঁর cruellest tragedy। ১৯০৩ সালে নিতান্তই আকস্মিকভাবে তাঁর ষোলো বছরের সস্মিত দাম্পত্যজীবন ভেঙে গেল স্ত্রীর মৃত্যুতে। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স মাত্র চল্লিশ। কিন্তু জীবনের ভরকেন্দ্রই যেন টলে গেল। ছ'বছরের পুত্র দিলীপ আর পাঁচ বছরের কন্যা মায়াকে নিয়ে চিরউদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল নিমজ্জিত হলেন এক অতলান্ত সাংসারিকতায়, যেখানে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেমানান। কল্যাণী গৃহিণীর অভাব তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে পালাবদল ঘটিয়ে দিল। শুকিয়ে গেল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত হাসির গানের উৎস। প্রেমের গানেও রইল না সেই আবেগমত্ততা। এই সময় তাঁর জীবনে যে-শূন্যতা ঘনিয়ে ওঠে তা আর কখনো ভরেনি। ১৯০৬ সালে মাত্র তেতাল্লিশ বছরে লেখা তাঁর চিঠিতে কী শ্রান্তি! সেখানে লেখেন—

> মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র।

১৯০৭ সালে লিখেছেন,

> আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি সেখানে এ সংসারের উপর অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগলিপ্সা তিলার্ধও নাই। তবে, কেন— কীসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ করে মরি?

১৯০৬ সাল থেকে গয়া প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে শূন্যতা ভরাতে দুটি অবলম্বন এসে যায়। একদিকে ব্যক্তিগত ক্লান্তিমোচনে তিনি হয়ে পড়েন সুরাসক্ত, আরেকদিকে আসে ঐতিহাসিক ও স্বাদেশিক নাটক লেখার টান। ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সারাদেশে নতুন করে জাগিয়ে

দেয় আমাদের দেশাত্মবোধ। কলকাতার রঙ্গমঞ্চ উত্তাল হয়ে ওঠে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদী নাটকের আবেগে। তিনি পরপর লেখেন *প্রতাপ সিংহ* (১৯০৫), *দুর্গাদাস* (১৯০৬), *নুরজাহান* (১৯০৮), *মেবার পতন* (১৯০৮), *সাজাহান* (১৯০৯) ও *চন্দ্রগুপ্ত* (১৯১১)। এ সব নাটকে তাঁর অসামান্য স্বদেশি গানগুলি সংযোজিত হয়ে এক নতুন মাত্রা আনে। বিশ্বাসের ওজস্বিতা, ভাবের গাঢ়তা এবং সুরের গূঢ় বিন্যাস তাঁর স্বদেশি গানে এক চমৎকৃতি সৃষ্টি করল। বাঙালি লাভ করল এক নতুন গানের উত্তরাধিকার। কিন্তু তবু আত্মিক অবক্ষয় আর সদাসঙ্গী বিষাদ দ্বিজেন্দ্রলালকে টানতে থাকে মাদকের অনিবার্য আকর্ষণে। আত্মপক্ষ নিয়ে তিনি বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন,

> তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অন্যান্য নানারূপ আশ্রয় অবলম্বন আছে; কিন্তু আমার তার কোনোটাই নাই, কিছুই নাই। এই জন্য, ভয়ানক ঔদাস্য ও অবসাদ আসিয়া যখন আমার দেহ-মনকে অভিভূত করিয়া, জড়াইয়া ধরে তখন— In order to shake off that lethargy, dullness and depression আমার একটু একটু পান করা দরকার বোধ করি। ওটা যে আমার পক্ষে শুধু একটা support and strength (সহায় ও বল) তা নয়, Necessityও (প্রয়োজনও) বটে।

শেষ দশ বছরে (১৯০৩-১৯১৩) পত্নীবিরহিত দ্বিজেন্দ্রলালের যে-ভগ্ন বিগ্রহ আমরা দেখি তা বেদনায় ভারাক্রান্ত, বিষাদে পরিম্লান। এরই মধ্যে গয়াপ্রবাসে তাঁর মধ্যে ঝলকে ওঠে স্বদেশি গান লেখার উন্মাদনা। সে সময়ে একবার গয়ায় বেড়াতে যান জগদীশচন্দ্র বসু। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে গেয়ে শোনান 'মেবার পাহাড়' গানটি। শুনে জগদীশ বলেন,

> আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করতে পারি, কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাঙ্গালার বিষয় ও ঘটনা— বাঙালির বিষয় ও ঘটনা থাকে।

এই অনুরোধের অল্পদিন পরেই, দেবকুমার রায়চৌধুরির বিবরণে জানা যায়, এক দুপুরে আহারান্তে হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেরিত হন এক তাৎক্ষণিক রচনার আবেগে। তিনি বলেন,

> দেখো, আমার মাথার মধ্যে একটা গানের কয়েকটা লাইন আসিয়া ভারী জ্বালাতন করিতেছে। তুমি একটু বোসো ভাই,— আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি। আধ ঘণ্টার মধ্যে রচিত হয় বিখ্যাত গান 'বঙ্গ আমার জননী আমার'। গান তাঁকে এতটাই উজ্জীবিত করতে পারত যে ওই তীব্র হতাশার জীবনেও তিনি আর কিছু না বলিয়া, হাততালি দিতে দিতে, সারাটা ঘরময় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া, আবার গাহিতে লাগিলেন—
>
> কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ?
> সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ?

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ অনুমান করেছেন এই গান দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে নিয়তির মতো এসেছিল। কেন-না এই গান গাইতে গেলেই দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মসংযম হারাতেন। আক্রান্ত হতেন উচ্চ রক্তচাপে।

> এই গীতটি গায়িতে গায়িতে একদিন স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়েব বাটীতে দ্বিজেন্দ্রের মস্তিকে রক্তাধিক্য হয়, আর একদিন ইভনিং ক্লাবে এই গানটি শিক্ষা দিবার সময়, পরে পুনরায় একদিন ঝামাপুকুরে তদীয় মিত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভবনে ওই গানটি গায়িতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রের মস্তিকে শোণিতাধিক্য হয় এবং প্রতিবারই তাঁর সংজ্ঞাশূন্য হইবার উপক্রম হয়। ইহাই দ্বিজেন্দ্রর প্রাণান্তকারী সন্ন্যাস রোগের সূত্রপাত।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে এই গান সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'ও গানটা গায়িতে গেলে আমার কেন জানি না, ভয়ানক মাথা গরম হয়ে উঠে।'

স্বদেশি গান এতটাই ছিল তাঁর জীবন সম্পৃক্ত? শেষ জীবনে অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল নাটক রচনায়। নাটক ও রঙ্গ মঞ্চের তো একটা আলাদা মাদকতা আছে। তা ছাড়া অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শের একটা বিতর্কিত প্রসঙ্গও শোনা যায়। তিনি নিজে অবশ্য পরিহাস করে লিখেছিলেন, 'অ্যাকট্রেসদের কটাক্ষবাণ সদাই নাকের কাছাকাছি/ তবু তো বেঁচে আছি।'

যাইহোক শেষ দশ বছরে দ্বিজেন্দ্রগীতির সবচেয়ে বড়ো আশ্রয় ছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের নটনটীরা। তাঁর গান এঁদের কণ্ঠেই রূপ পেয়েছিল। তাই, মঞ্চের প্রয়োজনেই, দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গান বিন্যাসে খুব নাটকীয় এবং স্বগতোক্তির মতো। বহুশই তাতে আছে নৃত্যের চটুল ছন্দ ও ভাবের তরলীকৃত আবেগ বহুলতা। কে না বলবেন যে তাঁর গীতি প্রতিভা চূড়ান্ত অপব্যয়িত হয়েছে এই রঙ্গমঞ্চে? সকলেই মানবেন মঞ্চেতাঁর গান রূপায়ণে কখনই সুবিচার হয়নি। তাঁর বেশিরভাগ গানই যে নারীর জবানিতে তার কারণ সেগুলি নাটকের নারীচরিত্রের কথা ভেবে লেখা। তাঁর পাঁচশো গানের মধ্যে নাটকে বহুল ব্যবহৃত গানের সংখ্যা আড়াইশো। তবু রঙ্গমঞ্চকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। রঙ্গমঞ্চের উন্মাদনা ছাড়া বিষাদ ভারগ্রস্ত উত্তর-চল্লিশ দ্বিজেন্দ্রলাল আর কি অন্য কোনো প্রেরণায় গান লিখতেন?

দেবকুমার রায়চৌধুরির *দ্বিজেন্দ্রলাল* বইটি পড়লে জানা যায়, নিছক আত্মপ্রেরণার বাইরে কোনো উত্তেজক ঘটনা বা অন্যের প্ররোচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক গান লিখেছিলেন। তাঁর গান রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরি ঠিকই অনুমান করেছেন যে, প্রথমে তাঁর মনে আসত একটা সুরের ছক, বাণী জুড়তেন পরে। যাকে বলে কথা ও সুরের যুগল সম্মিলিত মূর্তি তা দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ওই জন্যই কম। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গান একটা সুরের ও তালের ডিজাইনে বাঁধা। 'এ কী মধুর ছন্দ' বা 'আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে' শুনলে কথাটা স্পষ্ট হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল কত অনায়াসে গান লিখতে পারতেন তার দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ অধরচন্দ্র মজুমদার প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ ঘোষ লেখেন,

> সাজাহান নাটকে একটি জায়গা বাদ রাখা ছিল। একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্র অধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন : 'এখানে একটা কি গান দেওয়া যায় বলুন দেখি?' অধরবাবু স্থান কাল পাত্র দেখিয়া বলিলেন— 'একটি রাত্রির বর্ণনা দিন না।' দ্বিজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ— 'আজি এসেছি আজি এসেছি বঁধু হে' লিখে ওই স্থানে বসাইলেন।

এছাড়া ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে ভাগলপুর-মুঙ্গেরে নববিবাহিত জীবনযাপনের অবকাশে পত্নী সান্নিধ্যে ও দাম্পত্য মাধুর্যে অনেক প্রেমের গান লেখেন তাৎক্ষণিক আবেগে। তার সব অনুপুঙ্খ আজ দুষ্প্রাপ্য। তবে ১৮৮৬ সালে সদ্য বিবাহিত দ্বিজেন্দ্রলালের একটি প্রখ্যাত প্রণয় সংগীতের রচনার উপলক্ষ জানা গেছে। তখন তিনি মেদিনীপুরের সুজামুঠা পরগনার সেটেলমেন্ট অফিসার। বয়স তেইশ। পত্নী সুরবালার বয়স এগারো। কাজলাদিঘির ধারে একটি বকুল গাছের প্রাঙ্গণে ছিল তাঁদের বাসা। সকালে দ্বিজেন্দ্রলাল কাজে বেরোতেন আর সারাদিন কিশোরী বধূ সুরবালা বকুলতলায় দিনযাপন করতেন। একদিন সারা সকাল ধরে বহু প্রযত্নে অবচয়িত বকুল ফুলের মালা গেঁথে সুরবালা অপেক্ষাতুর ছিলেন। কর্মস্থল থেকে ফেরা মাত্রই কিশোরী বধূ তাঁকে মালাটি পরিয়ে দেন। প্রাপ্তির এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা ও মাধুর্য দ্বিজেন্দ্রলালের মনে সাড়া তোলে। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলেন :

আমি সারা সকালটি বসে বসে
এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।

পত্নী বিয়োগের আগে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন পুরোদস্তুর একজন আমুদে লোক। নানা উপলক্ষ গড়ে নিয়ে তিনি নাচগান আনন্দ উচ্ছ্বাসে মত্ত হতে পারতেন; তাঁর মধ্যে এতটাই প্রাণশক্তি ছিল। তাঁর বড় শ্যালকের পত্নী স্মৃতিচারণ করে বলেছেন :

কখনো হঠাৎ নাচের সাধ হল। আমরা সব দোর বন্ধ করে দিলাম। আমার তিন-চারটি ননদ, গিরিশদা ও দ্বিজদার ঘোমটা পরে নৃত্য। সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

এখানে ধরা রয়েছে আনন্দময় কৌতুকপরায়ণ দ্বিজেন্দ্রলালের বিগ্রহ, যিনি শ্বশুরগৃহে ভায়রাভাই ও শ্যালিকাদের নিয়ে সগুণ্ঠন নৃত্য করতেন। এমন স্বতোচ্ছল মানুষটি একেবারে বদলে যান স্ত্রী বিয়োগে। দিলীপকুমার ধরে রেখেছেন সেই উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ণনা এইভাবে,

কবি শেষ বয়সে সাহেবিয়ানা ছেড়ে একেবারে বৈষ্ণব বনে গিয়েছিলেন। সে ফিটফাট ধোপদুরস্ত বেশভূষা ছিল না। খালি গায়েই বারান্দায় বেড়াতেন গুন্ গুন্ করে গান বাঁধতে বাঁধতে। ... এমনি সময়ে হয়তো বা খালি পায়েই, চলে গেলেন সটাং বড় মামিমার কাছে : বউ একটা কী চমৎকার গানই বেঁধেছি—শেখো শেখো।

দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত জীবন শেষ পর্বে হয়ে ওঠে নিতান্ত আত্মমুখী ও সম্বৃত। গানের থিমে এসে যায় প্রেম-হাসি-নাটক-নিসর্গ সব পেরিয়ে এক গভীর বৈরাগ্যের আত্মসমর্পণ। অহেতুক ভক্তির লীলা। প্রথম যৌবনের তার্কিক নাস্তিক কেতাদুরস্ত বিলেত ফেরত ডি.এল.রায় শেষ বয়সে হয়ে পড়েন পরম বৈষ্ণব উদাসীন। যিনি প্রথম যৌবনে তাঁর *Lyrics of Ind* কাব্যে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করে লিখেছিলেন :

We, armed with love, in justice armoured
Defy the hell-fire, plague and dearth
While Science triumphs, Beauty blazes
We all can make a heaven on earth.

তিনি শেষ বয়সে লিখলেন :

পরিহরি ভবসুখ-দুঃখ যখন মা আমি শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথী, জাহ্নবি, সুরধুনি, কলকল্লোলিনী গঙ্গে।
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!

খুবই বিস্ময়কর নয় কি এই পরিক্রমা? নিসর্গ ধ্যান থেকে স্বদেশ গরিমা, হাসির গানের বিদ্রূপ থেকে আনত মধুর প্রেমসংগীত, নাট্যোচ্ছল তরল গীতিময়তা থেকে গভীর ভক্তিতে এমন অবগাহন? দ্বিজেন্দ্রলালের গান প্রগাঢ়ভাবে আত্মজৈবনিক। তাঁর সমগ্র জীবনের পটে এই গান কী গভীর দ্যোতনা আনে, যখন শুনি :

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভালো, দুঃখেই আমি ভালো থাকি।

এ গান শুনতে শুনতে হয়তো সকরুণ নির্বেদে আমাদের মনে পড়ে তাঁর আকস্মিকভাবে ধ্বস্ত দাম্পত্যের কথা। সে বেদনা গাঢ়তর হয় এই উচ্চারণে :

শুধু দুদিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙিতে আঁখি না মেলিতে
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।।

পত্নী প্রণয়হীন ক্ষোভজর্জর তাঁর অভিমানী মনই কি একথা লেখেনি যে :

আমি অপর কাহার জীবনযাপন
করি যেন এসে বসুধায়—
আমি বেঁচে আছি— নাহি জানি কি কারণ
— জীবন শুধুই জীবনধারণ;

অথচ এমনটি তো হবার কথা ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল 'আলোর মতন হাসির মতন কুসুম গন্ধ রাশির মতন, হাওয়ার মতন নেশার মতন ঢেউয়ের মতন' ভেসে যাওয়ার। ইচ্ছা ছিল মলয় বাতাসে ভেসে গিয়ে কুসুমের মধু পান করায়। এমনকি এতদূর যে,

বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব
বৃষ্টির সনে ধরায় লুটিব,
সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব
ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান।

কিন্তু প্রতারক জীবনের সুখ-স্বপ্ন ক্ষণিকের জন্য এসে সরে যায়। 'যেন কোন্ মায়াসরসী, ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো'। এই রিক্ত নিঃস্বজীবনে মৃত্যুই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র সান্ত্বনা ও স্বস্তি। তাই যে-রাতে নীল আকাশের অসীম ছেয়ে চন্দ্রকিরণ পরিপ্লাবিত, সেই মদির রাতে তাঁর মনে হয় :

বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মত ভালোবেসে
আজকে যদি মরতে না পাই তবে আমার মরণ ভালো।

শেষ আকুতিতে তাঁর পরম প্রার্থনা বড়ো অন্তর্ভেদী, কেন-না অসহায়ভাবে তাঁকে বলতে শুনি :

আজি বড়ই শ্রান্ত আমি ও মা কোলে তুলে না
যেখানে ঐ অসীম শাদায় মিশেছে আজ অসীম কালো।।

গানে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত বেদনার ছাপ লেগেছে তেমনই আনন্দ প্রেম প্রণয় স্মৃতির আভাসও কম নেই। *আর্যগাথা* দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর মধুর দাম্পত্য জীবনের আলেখ্য অনেক গানের ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে। যেমন :

(ছিল) বসি সে কুসুম কাননে
(আর) অমল অরুণ উজল আভা ভাসিতেছিল সে-আননে।
(ছিল) এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে)
(ছিল) ললাটে দিব্য আলোক শান্তি অতুল গরিমা ভাসি'।
(তার) কপোলে সরম নয়নে প্রণয় অধরে মধুর হাসি।

এখানে কী অভ্রান্তভাবে সুরবালা দেবীর ভাবকান্তি ধরা পড়েনি? আবার সেই ছায়াচ্ছন্ন সুখী যৌবনের তৃপ্ত দিনযাপনে হঠাৎ নিষ্কপট দ্বিজেন্দ্রলালের কি মনে পড়ে যায় বিদেশিনীর প্রতি তাঁর প্রণয়ের স্মৃতি? সেই টানেই বোধহয় লেখেন :

আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার
আজি সহসা নয়নে কেন ঝরিল এ বারিধার?

স্মৃতি জোয়ার দুকুল ছেয়ে
দশ বরষ উজান বেয়ে
আজি চলেছে প্রাণ তোমার কাছে মানে না বাধা আর।
আজি আমার কাছে বর্তমান ভেঙে ও ভেসে যায়
আজি আমার কাছে অতীত হয় নূতন পুনরায়।

দশ বরষের উজান ঠেলে বর্তমানের সবকিছু ভেঙে ও ভাসিয়ে এই যে অতীত প্রণয়ের রোমাঞ্চস্মরণ, তার আবেগ ও বেদনা এত সৎ ও জীবনতপ্ত যে গানের অন্তরালে গোটা মানুষটাকেই দেখা যায়। বর্তমানের প্রাপ্তি যাকে অতীত-ভিখারি না করে পারে না। অথচ বর্তমান দাম্পত্য প্রণয়ের বন্ধনটুকুও কম আকর্ষণীয় বা উপভোগ্য নয়। তাই আরেক গানে তিনি সে কথাও মানেন যে :

তুমি বাঁধিয়ে কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ, পারি না যেতে ছাড়ায়ে!
এ কি বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর— প্রিয়বাঞ্ছিত কারা এ?

একদিক থেকে তাই মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের গান তাঁর সবচেয়ে অকপট আত্মবিবৃতি। রবীন্দ্রনাথ ছোটখাট ঘটনাকে উপলক্ষ করে গান শুরু করতেন, অচিরে তা নির্বিশেষ গানে রূপ নিত সাময়িকতাকে অতিক্রম করে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের উৎস যাই হোক তার বর্ণনে ও আবেগে শেষ পর্যন্ত তাতে লেগে থাকে জীবনের কবোষ্ণ সংরাগ। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা তাঁর গান।

২

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর জীবিতকালে নিজের গানগুলিকে নানা বিষয় বিন্যাসে সাজিয়ে যাননি, যেমন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদ। তাঁর গীত সংকলন প্রকাশ পায় ১৯১৫ সালে, মৃত্যুর দু'বছর পরে, মোটামুটি দুশো তিরিশখানি গানের সমষ্টি নিয়ে। এর বাইরে থেকে যায় *আর্যগাথার* গান ও *হাসির গান*। অবশ্য তাঁর কোনো গীতি সংকলন অবিমিশ্র নয়। *গান* বইটিতে *আর্যগাথার* গান আছে। তাঁর অনেক গান স্বতন্ত্র স্বভাবে যেমন সংকলিত আছে, তেমনই তাদের পাওয়া যাবে বিভিন্ন নাটকে। তার কারণ, নাটকের প্রয়োজনে অনেক তাৎক্ষণিক গান যেমন তিনি লিখেছিলেন তেমনই তাঁর অনেক পুরোনো গান নতুন করে জুড়ে দিয়েছেন নাটকে — অনেক সময় ঘষে মেজে, কখনো- কখনো সরাসরি। এখন দ্বিজেন্দ্রলালের যত গান আমরা পাই তা বিষয় বিন্যস্ত নয়। তবু সাধারণভাবে প্রেম নিসর্গ স্বদেশ বিচিত্র ও হাসির গান এইভাবে গানগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া যায়। এর মধ্যে তাঁর স্বদেশবিষয়ক গান ও হাসির গান সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। হাসির গানের রূপায়ণ তিনি নিজে নিপুণ দক্ষতায় করতেন। কিন্তু বিলিতি গানের নানা স্কেলে ফেলে তাঁর হাসির গানে যে সব 'হা হা হা' হাসির ধ্বনির দুরূহ সুরের পরীক্ষা আছে তা আজ আর গাইবে কে? গলার সেই বিদেশি পরিমার্জনা কার আছে? একথা সকরুণ সত্য যে, দিলীপকুমারের প্রয়াণের পর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান হয়ে গেছে এক বিখ্যাত কিংবদন্তি। গায়নের মধ্য দিয়ে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা আজ অসম্ভব। দ্বিজেন্দ্রগীতির অন্তত পঁচাত্তর শতাংশ সুর অবলুপ্ত। আর স্বদেশি গানের ক্ষেত্রে সুরবিকৃতি খুবই ঘটেছে।

তাঁর অন্যান্য গানের মধ্যে যতগুলি দিলীপকুমার স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন ততগুলি হয়তো কিছুটা রক্ষা পাবে কিন্তু বাকি অজস্র সংখ্যক গান এই মুহূর্তে অভিভাবকত্বের অভাবে অসহায়। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে আমাদের অচেতনতা কতদূর সকরুণ তার একটা নমুনা এখানে দেওয়া যেতে পারে। শেষ জীবনে তাঁর লেখা একটি ভক্তিসংগীত হল 'চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা'। এ গান খুব বিখ্যাত। দিলীপকুমার গানটি রেকর্ডে গেয়েছেন এবং প্রত্যেক দ্বিজেন্দ্রগীতি সংকলনে গানটি পাওয়া যায়। সুরও

অনেকেই জানেন। তবু 'আকাশবাণী' তাঁদের প্রভাতী সংগীতাঞ্জলি অনুষ্ঠানে ওই গানটি প্রচার করেন জনৈক অঞ্জলি সুর নামক গায়িকার কণ্ঠে এবং ভিন্ন সুরে। তার চেয়েও আশ্চর্য, এই গানটিই একটি রেকর্ড কোম্পানি বার করেছেন জনৈক হীরালাল সরখেলের কণ্ঠে। এ গানের রেকর্ড-লেবেলে সুরকারের নাম অন্য একজনের এবং গানের রচয়িতা বিষয়ে লেখা আছে 'অজ্ঞাত'। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর একটি গানে এই দেশে জন্মে এই দেশেই মরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তখন কি তিনি জানতেন যে এই দেশের মানুষই তাঁকে, তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করবে এইভাবে? এইসব দেখেই মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের গান আমাদের দেশে সবচেয়ে-হেলাফেলার সামগ্রী। নিঃসঙ্গ দুয়েকজন অনুরাগী বা অনুরাগিণী নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর গান গেয়ে চলেছেন সভাসমিতি, আকাশবাণী, দূরদর্শন ও রেকর্ডে। তাঁর নামে নেই কোনো প্রতিষ্ঠান বা আকাদেমি। তাঁর গানের নেই কোনো নির্ভরযোগ্য সংকলন। তাঁর বেশিরভাগ গানের সুর সংরক্ষিত হয়নি।

এই সুর সংরক্ষণ না-হওয়ার অপরাধ খুব গুরুতর, কেন-না দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত সুরকার বা কম্পোজার। তাঁর গান খুব নিরপেক্ষভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় বাণীরচনায় তাঁর প্রতিভা ছিল মধ্যম রকমের কিন্তু সুরসৃজনে তাঁর কারুকৃতি ছিল প্রথম শ্রেণির। কম্পোজার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের মহিমা বুঝতে গেলে একটু ইতিহাসের দিকে চাইতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলালের আগে বাংলা গান স্বনির্ভর ছিল না। কোনো বিশিষ্ট হিন্দুস্থানি গানের স্ট্রাকচারের ওপর বাংলা বাণী বসিয়ে আগেকার বাংলা গান বাঁধা হত। কথা ও সুরের অন্যোন্য সম্পর্কে গান গড়ে উঠত না। রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব প্রথম গানকে কম্পোজ করলেন তার একক স্বাতন্ত্র্যে। সে-স্বাতন্ত্র্য এমনই যে রাগরাগিণীর আভাস থাকলেও তার প্রাধান্য থাকত না। হয়ে উঠত এক নতুন সৃজন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশি গানে তাঁর কম্পোজার-রূপ সবচেয়ে ফুটেছে। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' আলাহিয়া বেলাবল ঠাটে বাঁধা, 'ধনধান্য পুষ্প ভরা'-র ভিত্তি কেদারা। কিন্তু গান শোনার সময় সেকথা কি একবারও মনে পড়ে? তা কি আমাদের নিয়ে যায় না এক গূঢ় নির্মাণের আকাশে?

এ ব্যাপারটা নিধুবাবু বা লালচাঁদের যুগে হত না। তাঁদের গান শুনলেই বোঝা যায় একটা নির্দিষ্ট সুরের ঠাটে গানের কথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটোয় মিলে একটা তৃতীয় সৃষ্টি হয়নি এবং সেইজন্য সেই দুর্বলতা কাটাতে রাখতে হয়েছে বিপুল অপ্রয়োজনীয় তানবাজি।

দিলীপকুমার তাঁর *উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল* বইয়ে স্মরণ করেছেন একটি ঘটনা। দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন লালচাঁদের 'এহো রাজা যাতি হায়' গানটি গ্রামোফোনে শুনে এতদূর মুগ্ধ হন যে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন সেই বৈদেহী গায়ককে। কিন্তু আরেকদিন লালচাঁদের 'অনুগত জনে কেন এত কর প্রবঞ্চনা' গানে উৎকট তান সা নি ধা পাস্ মা পাস্ গা সাস্ গা রে সা শুনে হো হো করে হাসতে থাকেন আর বলেন, 'না হেসে কী করি বল্ দেখি? বাংলা গানে যে ভাব বলে একটা জিনিস আছে রে। তাকে সার্গম-বাজি করে টুঁটি টিপে ধরলে কি সে বাঁচতে পারে কখনো?'

গানের ভাবকে বাঁচানো বা তাকে সঠিকভাবে জাগানো ব্যাপারটিই দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে বড় সিদ্ধি। 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ভেসে আসে' কিংবা 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে' কিংবা 'আমরা এমনই এসে ভেসে যাই' গান ভালো করে শুনলে তাঁর কম্পোজার হিসাবে সফলতা বোঝা যায়। গানের ভাবানুযায়ী সুরের বিন্যাস এ-সব গানে আছে। প্রয়োজনমতো এ তিনটি গানে যথাক্রমে পাওয়া যায় বৈরাগ্য বিধুরতা, প্রেমের আর্তি ও হাল্‌কা চাল। তবে সব জায়গাতেই যে তিনি সফল হয়েছেন তেমন নয়। কোথাও কোথাও সুরের আবর্তে শব্দগুলি ভালো করে মেলেনি। যেমন 'সুখের কথা বোলো না আর' গানের শঙ্করা রাগিণীতে চমৎকার জমে-ওঠা মেজাজে হঠাৎ রসাভাস হয় যখন 'দু-দণ্ডের হাসি হেসে

মৌখিক ভদ্রতা রাখি' এমন একটা স্টেটমেন্ট এসে যায়। তবে এমন স্খলনের সংখ্যা খুবই কম।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পিতার কাছে হিন্দুস্থানি গান শুনলেও তার টানে ভেসে যাননি অনুকরণসর্বস্বতায়। তাঁর মনে ছিল যে, 'বাবাই প্রথম আমাকে গানের দুটি দীক্ষা দেন। এক, হিন্দুস্থানি সুর শেখার—দুই, সে-সুরে বাংলা গান বাঁধার।' এই গান বাঁধার কৈশোরের প্রয়াস *আর্যগাথা*-র প্রথম খণ্ডে ধরা আছে তাঁর বারো থেকে সতেরো বছর বয়সের সৃজনীতে। কিন্তু বিলাতে গিয়ে সেখানকার গান শিখে তাঁর ধ্যানধারণা এতটাই বদলে যায় যে এদেশে ফিরে তিনি বিলিতি গানের সুরে বাংলা গান গাইতে থাকেন তর্জমা করে। যেমন Some folks অবলম্বনে 'কেউ কেউ করে হায়', Rule Britannia থেকে 'যখন নীলিমা জলধি হৃদয়ে', Won't you buy my pretty flowers নিয়ে 'কেউ কিনবি না মোর ফুলগুলিরে' এইসব গান। এসব অনুবাদ তিনি করেছিলেন মূল গানের ছন্দ ও সুর বজায় রেখে। ফলে গাইতে গেলে শব্দের উচ্চারণ এমন দ্রুত করতে হত যে অনেক সময় হাসির তোড় আসত। যেমন

কেউকেউকরে হায়
কেউকেউকরে কেউকেউকরে
কেউকেউ মরতে চায়।

এ তো আর বাংলা গানের সুরবিহারধর্মী ধীর লয়ের গান নয়। এর মধ্যে রয়ে গেছে বিলিতি সুরের তড়িঘড়ি movement, যা স্বরধ্বনিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু দ্রুত উচ্চারণে 'কেউকেউকরে' বললেই হাসি আসবে। অচিরে তাই তিনি গান রচনার এই তর্জমা-পদ্ধতি ত্যাগ করলেন এবং এই দ্রুত সুরের ঢং-টা লাগিয়ে দিলেন হাসির গানে। ইতিমধ্যে চাকরি সূত্রে তাঁকে যেতে হল মুঙ্গের-ভাগলপুর। সেইখানে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের টপ্ খেয়ালের বিস্তারধর্মী লাবণ্যে গানের একটা আলাদা ভুবন পেয়ে গেলেন। গানের আঙ্গিক নিয়ে আর তাঁর চিন্তা রইল না। সাধারণভাবে দুই তুকের খেয়াল অঙ্গের গানে সুরের অন্তর্মুখী বিস্তার আর টপ্পার কারুকাজ মিশিয়ে তাঁর নতুন গানগুলি উৎসারিত হতে থাকল। এইসব গানের অন্তঃশরীরে রয়ে গেছে রাগের ভিত্তি, কিন্তু কখনো কীর্তন, কখনো বিলিতি সুরের মোচড় ও ওঠানামা গানগুলিকে অভিনবত্বে ভরিয়ে দিয়েছে। বেহাগ, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, বাগেশ্রী, বাহার, ভৈরবী ও নটমল্লার তাঁর প্রিয় রাগরাগিণী। গানের বিন্যাসে বিলিতি সুরের সংযোগ তিনি সতর্ক ও সচেতনভাবেই করেছেন। যদিও তার জন্য সেকালে তাঁর প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। অক্ষয়কুমার সরকার সেকালে টাউন হলের ভাষণে অভিযোগ করেছিলেন :

> ইউরোপের সংগীতে মিড় মূর্চ্ছনা নাই, এমন নয়; আছে, অল্প আছে;— সেই সংগীত প্রধানত খাড়া সুরে গড়া। ভারতবর্ষ মিড় মূর্চ্ছনার দেশ। বাঙ্গালা আবার ভারতের ভারত — বাঙালির কীর্তনের সুর কেবল মিড় মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ।... আমার বর্তমান দুঃখ— নবযুবকদলের মধ্যে ইংরাজি সুরে সংগীতচর্চা দেখিয়া।... যে সুরের কথা আমি বলিতেছিলাম, সেটি প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্তৃকই নব্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।... আমার কথা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃত ও প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রেমিক হইলে, তিনি খাড়া সুর বাঙ্গালায় চালাইতে চেষ্টা করিতেন না।

একথার প্রতিবাদ করেন প্রমথ চৌধুরি। তাঁর বক্তব্য :

> দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাতে করে হিন্দুসংগীতের ধর্ম নষ্ট হয়নি—কেন-না ওস্তাদি ঢং ভারতবর্ষীয় সংগীতের একমাত্র ঢং নয়।... দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব এই যে, সে সুরের ভিতর অতি সহজে

একটি বিলেতি চাল এসে পড়েছে।...আর্টের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে Organic। দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দু সংগীতের ন্যায় ইউরোপীয় সংগীতেও পরিচয় ছিল। তাঁর অন্তরে এই দুয়ের অলক্ষিত মিলনের ফলে তাঁর সুরের সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে-সুর তাঁর মগ্ন-চৈতন্যে, দেশি ও বিলাতি সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরির মত সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটি আরও প্রাঞ্জল করলেন এই বলে যে,

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পশ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে 'হিন্দুসংগীত' থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।... হিন্দু-সংগীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে বিলিতি সুরের সংযোগ নিয়ে এত যে অভিযোগ আর সমর্থন তার কারণ তার জনপ্রিয়তা। তিনি সচেতন ছিলেন দেশি ও বিদেশি সংগীতের স্বভাব-পার্থক্য বিষয়ে। বিলিতি গানের গায়ন-অভিজ্ঞতা তাঁর গান রচনায় খুব সহায়তা করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেইজন্যেই তাঁর গানে এক দৃঢ় পৌরুষ, উচ্চারণের ওজস্বিতা এবং সুরের উচ্চাবচ স্বভাব খুব চোখে পড়ে। গানভেদে তার প্রয়োগ নানা ধরনের। যেমন 'আমরা এমনই এসে ভেসে যাই' গানের অন্তরায় আছে বিলিতি সুরের আরোহণ-অবরোহণের অনবদ্য লীলা চাপল্য। 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের কোরাসে 'সে যে আমার জন্মভূমি' অংশ তিনবার তিন স্বরে গাওয়ার কায়দাটাই বিদেশি। 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে' গানটিতে শেষ অংশে সুরের যে ক্রমিক নাটকীয় আরোহণ তা খাঁটি বিদেশি এফেক্ট অথচ তা পরা শক্ত। অন্যদিকে 'মেবার পাহাড়' গানে 'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির' এই গায়নে 'শির' শব্দটির স্বরস্থান যখন এক লাফে চলে যায় মুদারার গা থেকে তারার গা-তে তখন ফোটে বিদেশি সুরের উল্লম্ফন ধর্ম— যা আমাদের গানে খুব নতুন। কোরাস ব্যাপারটাও তো আমাদের গানে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি। কিংবা ভূপালিতে বাঁধা 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' এই মার্চিং সং আর তার তীব্র তালের স্পন্দ একান্তই দ্বিজেন্দ্রীয় উপহার বাংলা গানে। নাটকের গানে, যাকে বলে ইনসিডেন্টাল সং, তাঁর সৃজন প্রতিভার অনন্য উদ্ভাবন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অন্ধভিক্ষুকের কণ্ঠে 'ঘন-তমসাবৃত অম্বরধরণী' গানটি আগাগোড়া ধরে রেখেছে বিলিতি গানের সুরবিন্যাসের উত্থানপতন। উত্তেজনা, উদ্‌বেগ, আর্ত অনুসন্ধান আর সমাপ্তির মূর্চ্ছা গানটির স্বরলিপিতে বাঁধা আছে স্তরে স্তরে। ভাষা বাদ দিয়ে কোনো তারযন্ত্রে (বিশেষত বেহালায়) গানটি বাজালে সুরের বুনন চমৎকার বোঝা যায়। এই দিক থেকে তাঁর প্রতিভা বাংলা গানে আজ পর্যন্ত একক ও অনুসরণহীন।

এই অনুসরণহীনতা দ্বিজেন্দ্রলালের আরেক অভিশাপ। তাঁর গান বাঙালি একসময়ে খুবই ভালোবেসেছে কিন্তু তার অন্তরপ্রকৃতি অনুধাবন করতে পারেনি। তাঁর গানের যে-পৌরুষ আর ওজস্বিতা তা কি আমরা নিতে পেরেছি? বিদেশি সুরমিশ্রণের যে-ইঙ্গিত আর কৃৎকৌশল দ্বিজেন্দ্রগীতিতে অনুস্যূত হয়ে আছে, পরবর্তীকালের কজন কম্পোজার তাঁকে বুঝতে পেরেছেন? পারেননি, তার একটা বড় কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে অপপ্রচার এবং তাঁর গানের অপ্রচার।

লক্ষ করলে দেখা যাবে নানামুখী জীবন তাঁর গানকে সঠিক বিবর্তনের পথে এগোতে দেয়নি। তাঁর সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ হাসির গান তার সমৃদ্ধ যুগে হঠাৎ সাবলীলতা হারাল। আকস্মিক পত্নীবিয়োগে তিনি ত্যাগ করলেন হাসির গানের অধিরাজত্ব। এ কি কম পরিতাপের বিষয়? যাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছিল অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসে এমন অসামান্য ভাষণ যে—

নাঃ! এ জীবনটা কিছু নাঃ!
শুধু একটা 'ইঃ', আর একটা 'উঃ' আর একটা 'আঃ'!

তাঁর কাছে বাংলা গান পেত কতখানি মুক্তি তা ভাবলে পরিতাপ হয় তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য। আর যখন মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতের সত্যিকারের বিকাশ ঘটেছিল পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন মাত্র চল্লিশ বছরে মেনে নিয়েছিল দারুণ বৈক্লব্য তখন নৈরাশ্য জাগে গভীর। মন্দ আয়ুর অভিশাপ অবশ্য রজনীকান্তের (১৮৬৫-১৯১০) এবং অতুলপ্রসাদের জীবনেও (১৮৭১-১৯৩৪) ছিল, কিন্তু তাঁদের গান রচনার সামর্থ্য তো দ্বিজেন্দ্রলালের মতো বহুধাবিস্তারী ও নিরীক্ষাউৎসুক ছিল না। তার চেয়েও শোচনার বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর গান সম্পর্কে আজকের গরিষ্ঠসংখ্যক সংস্কৃতিসেবী বাঙালির অজ্ঞতা। দ্বিজেন্দ্রলালের গান আমাদের দেশে কোনো ট্রাডিশন সৃষ্টি করতে পারেনি বরং তৈরি করেছে এক মহৎ ট্রাজেডি। পরিবর্তিত দেশকালে তাঁর স্বদেশি গানের আজ কী-ই বা মূল্য আছে? পঁচাত্তর শতাংশ হাসির গানের সুর ও গায়ন গেছে হারিয়ে। তাঁর অন্যান্য আত্মমুখী লিরিক গান সুরভ্রষ্টতা ও স্বৈর সুরপ্রয়োগের অন্তর্ঘাতে বিপন্ন। একথা পরিতাপের যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে প্রলুব্ধ ও অনুসারী হন রজনীকান্ত শুধু ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে। হাসির গানের সুরের কম্পোজিশন তাঁর পক্ষে ছিল অপ্রাপণীয় ও অসাধ্য প্রয়াস। আর তাঁর স্বদেশি গান প্রভাবিত করল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। যিনি 'বঙ্গ আমার জননী আমার'-এর মতো ওজস্বী গানকে তরলীকৃত করে ফেললেন তাঁর 'আমরা' নামক ইতিহাসাশ্রিত পদ্যে।

৩

এতক্ষণকার আলোচনায় কেবল নিজেদের দোষারোপ করা হল। যেন দ্বিজেন্দ্রগীতি সম্পর্কে অনাদর আর অনীহা আমাদেরই শীতলতার দায়ে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালই বা কেন আদায় করে নিতে পারলেন না তাঁর প্রাপ্য সম্ভ্রম, কেন তিনি স্খলিত হলেন তাঁর বিপুল জনাদরের নির্ভরযোগ্য আসন থেকে? সে কি শুধুই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণে, কেবল রবীন্দ্রবিরোধিতাজাত ভুল-বোঝাবুঝিতে? আমরা তো দেখি ১৯১৩ সালে যখন দ্বিজেন্দ্রলাল প্রয়াত হন তখন তাঁর স্বদেশি গান আর নাটকের গান জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। এমনকি রবীন্দ্রসংগীতও ছিল না সেই জনপ্রিয়তার ধারে কাছে। রবীন্দ্রনাথ তখনো পাননি নোবেল প্রাইজ তথা বিশ্বকবির শিরোপা। তাঁর কবিত্ব আর সংগীতপ্রতিভা সে সময়ে এক বিতর্কিত বিষয়। যদিও রবীন্দ্রপ্রতিভার অমোঘতা সকলেই বুঝতে শুরু করেছেন তবু স্বীকৃতির ঔদার্য অনেকেই দেখাননি। লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন ও প্রমথ চৌধুরির মতো কয়েকজনের বাইরে বাংলার সারস্বত সমাজের একটা বিরাট অংশ যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন ইতিহাস সেকথা বলে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর উগ্র নীতিবাদ আর অকপট সরলতা থেকে রবীন্দ্রনাথের দিকে যে অসূয়ার তির ছুঁড়েছিলেন তাতে অনেকের পরোক্ষ সায় ছিল। যদিও কাদা লেগেছে শুধুই দ্বিজেন্দ্রলালের গায়ে।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বল্পজীবনে যে-জনস্বীকৃতি পান তা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে সরে যায়? রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি ও বিশ্বজয় সেই বছরেই ঘটে এবং সেই অভিযানে জনোচ্ছ্বাসের ভরকেন্দ্র টলে যায় কি অতিরিক্ত রবীন্দ্রভক্তির আকস্মিক উন্মাদনায়? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তীব্র ঝাপট তাঁর স্বদেশি নাটককে কি সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করে? না কি তাঁর গানে বা নাটকে ছিল না চিরকালের সম্ভাবনা? শেষের অভিযোগ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্পর্কে অবধারিত সত্য। তা সাময়িকতায় আচ্ছন্ন, উচ্ছ্বাসময়, সংলাপবহুল ও অতিনাটকের লক্ষণাক্রান্ত। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁর দ্রুত নিষ্ক্রমণের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রগীতির অবসিত হবার একটা যোগ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালের অসাংগঠনিক বুদ্ধি ও নিজের গান সম্পর্কে ঔদাসীন্য। তাঁর গান কে গাইবে, কেমন করে হবে স্বরলিপিবদ্ধ, সেসব তিনি আদৌ ভাবেননি। শেষ দিকের রিক্ত নিঃস্ব-জীবন তাঁকে এতটাই শিকড়বিহীন করে দিয়েছিল যে এমনকি নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর সম্মানবোধ ছিল না তেমন। নইলে কি তাঁর গানের এমন পরিণাম হতে পারে? রঙ্গ

মঞ্চেনটীদের কণ্ঠে আর বাড়ির নিচের প্রকোষ্ঠে ইভনিং ক্লাবের সদস্যদের সম্মেলক মহড়ায় দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালেই তাঁর গান কোনোরকমে বেঁচে ছিল এমনই বিবরণ দেখা যাচ্ছে। তাঁর হাসির গান গাইবার উত্তরাধিকারী তিনি কাউকে বানাতে পারেননি। কণ্ঠের সে-পর্যায়ের দক্ষতা ও ধারণশক্তি ইভনিং ক্লাবের কারুর ছিল না। তাছাড়া শেষবয়সে ঈশ্বরমনস্ক ঔদাস্যময় যে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা আমরা তাঁর জীবনীগ্রন্থে পাই তার ধারে কাছে প্রেমসংগীত ও হাসির গান নেই। এমনকি হাসির গানে যখন তিনি প্রথম যৌবনে আসর জমাতেন তখনো কি সবাই বুঝত তার গাঠনিক চারুত্ব ও বন্দেশের অভিনবতা? এ ব্যাপারে তাঁর পুত্র একটি সারসত্য বলেছেন যে,

> তাঁর হাসির গানে সারা বাংলা সাড়া দিলেও, সাড়ে পনেরো আনা শ্রোতা তাঁর হাস্যপ্রতিভার রসে এমনি রসিয়ে উঠল যে, তাঁর হাসির গানের সুরের অভিনবত্ব প্রথম দিকে বিশেষ করে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। সভায়-সমিতিতে নানা মজলিশে তিনি গেলেই সবাই ধরত : "হাসির গান দ্বিজুবাবু, একটা হাসির গান"।...তাঁর দেহান্তের কয়েক বৎসর বাদে হাসির গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হবার পরে তবে তাঁর হাসির গানের সুরের বহুবিচিত্র স্বকীয়তা সুররসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

অর্থাৎ হাসির গানের মূল আবেদন ছিল অনেকের কাছে শুধু থিমেটিক। বিষয়ের অসংগতি আর কাহিনির চমক এতটাই অধিকার করেছিল শ্রোতাদের যে সুরের বিন্যাস ও নির্মিতির চারুত্ব কেউ বোঝেননি। বোঝেননি বলেই রজনীকান্ত থেকে নলিনীকান্ত সরকার পর্যন্ত বাংলা হাসির গানের ধারা বয়ে চলেছে শুধু ভাবের মজা আর উদ্ভট কল্পনারসে, গায়নের কৌশলে তথা সুরের আশ্চর্য বৈপরীত্যে নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তাঁর গীতিপ্রতিভার সবচেয়ে মৌলিক অংশ অথচ আজ তা যে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেছে তার কারণ কী? গানের সুরে কঠিন পরীক্ষা আছে বলেই কি? প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে এমনকি স্বয়ং দিলীপকুমার রায় তাঁর পিতার হাসির গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথকে খুশি করতে পারেননি। ১৯২০ সালে বারাণসীতে দিলীপকুমার প্রবাসী বাঙালি সম্মেলনের অধিবেশনে 'নন্দলাল' গানটি গেয়ে আসর জমিয়ে দেন। কিন্তু গানের পর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন : 'দিলীপ, গাইলে বটে— হাততালিও পেলে। কিন্তু তোমার পিতৃদেবের মতো হল না। তিনি যখন এ-গানটি গাইতেন লোকে হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত।' স্বভাবত প্রশ্ন ওঠে, গায়নের কোনো বিশেষ জাদুতে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন করে হাসির গান গাইতে পারতেন দিলীপের মতো প্রসিদ্ধ কণ্ঠবাদক তা পারেন না? এখানেই কি আমরা সাধারণভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের একটা মূল স্বভাব পেয়ে যাই? মনে হয় না কি, তাঁর গান খুব Personal, খুব কূট রূপায়ণধর্মী? তার অন্তঃস্থ প্রাণরস আদায় করা তাই সুকঠিন। এসব গানের 'অরমান্' আলাদা। হাসির গানের ক্ষেত্রে কথাটা অনেকটা ধরতে পেরেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, তাই বলেছিলেন,

> দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কৌতুকের অন্তরালে স্তরে স্তরে করুণা, অনুকম্পা সমবেদনা সাজানো রহিয়াছে। শ্লেষ বিদ্রূপ যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা অভিজ্ঞতা এবং পবিত্রতার উচ্চ আসনে বসিয়া অপরকে হীন জ্ঞানে শ্লেষ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন।... কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যাঁহাদের লইয়া সরল হাসি হাসিতেন স্বয়ং তাঁহাদের দলে মিলিয়া যাইতেন।

হাসির গানে পিছনে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর যন্ত্রণা। সে-গান তাঁর অভিজ্ঞতার আত্মস্থ নির্মাণ। শ্রেষ্ঠ গায়কও তাতে প্রার্থিত আবেদন জাগাতে পারবেন না কোনোদিন।

এবারে এই সূত্রে একটা গুরুতর প্রশ্ন উঠবে। হাসির গান বা স্বদেশি গান যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল বিবিক্ত আত্মস্থতা থেকে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অন্যান্য গান কি তেমন আমগ্ন সৃষ্টি? যদি তা-ই হবে তাহলে গান লেখার আনন্দ তাঁর উত্তর চল্লিশ জীবনের ক্লান্তিমোচন করতে পারে না কেন? প্রসঙ্গত মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের

কথা। দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনায় শোক দুঃখ বেদনা ও মর্মাঘাত কি রবীন্দ্রনাথের কিছু কম ছিল? আসলে সে-সকল উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার যে-পৌরুষ তা ছিল রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের প্রকরণ ও সুরে যতটা পৌরুষ আর ওজস্বিতা দেখি তাঁর জীবন ছিল ততটাই উল্‌টো রকমের অর্থাৎ কোমল, স্পর্শকাতর ও আবেগাত্মক নির্বেদে ভরা। আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে বার বার অতিক্রম করে যান সাংসারিকতার গ্লানি। উজ্জীবনের রসদ খুঁজে নেন সৃজনের আনন্দে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এইজন্যই তৈরি হয় এক আলাদা প্রেরণাভূমি, জীবনকে চালিত করে এক অলক্ষ আত্মশক্তি ও উর্ধ্বস্তরের চেতনা। তিনি চলে যান কবিতা থেকে গানে, নাটক থেকে নৃত্যনাট্যে, উপন্যাস থেকে ছবি-আঁকায়, কেবলই নতুন নতুন রূপের আহ্বানে। অশীতিবর্ষেও ক্লান্তি তাঁকে ছুঁতে পারে না, শোক হয় পরাস্ত। তাঁকে চালনা করে শিল্পপ্রত্যয়ের এক সুনির্ভর লক্ষ্য। এমনকি অতুলপ্রসাদও গানের মধ্যে ঢেকে রাখেন তাঁর অন্তঃশীল সত্তা। 'ওগো দুঃখ সুখের সাথী সঙ্গী দিনরাতি সংগীত মোর' তাঁর এই উচ্চারণ একান্ত সত্য। গান তাঁর এতখানি নির্ভরযোগ্য শস্ত্র যে সত্যিই তিনি ঘোষণা করতে পারেন, 'হানো যদি খরবাণ, আমারও তো আছে গান'। দ্বিজেন্দ্রলালের গান তাঁর আত্মবিক্ষত জীবনের ভাষ্য কিন্তু আত্মবেদনার শুশ্রূষা নয়। নয় বলেই তাঁর লক্ষ্য সুরের দিকে। যেমন কাব্যে তেমনই গানে দ্বিজেন্দ্রলাল বস্তুগত কল্পনার কবি। তাঁর গানের বাণী প্রায়ই উচ্ছ্বসিত, ('এ কি' অব্যয়যুক্ত বিস্ময়ঘেরা গান যে তাঁর কত!) লঘু উদ্‌বেগে তরল এবং স্বভাবোক্তি অলংকারে আচ্ছন্ন। যথাক্রমে দেখা যাক এমন কয়েকটি বাণীর উদাহরণ :

১. একি নিখিল বিশ্বহাসি—
এ কি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
এ কি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
এ কি সরিৎরঙ্গ শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।

২. আমার সারাটি চিত্ত প্রণয়ে বিকশি,
ওগো তোমার বিরহে উঠিছে উছসি।
কবে তুমি আসি অধর পরশি
মোর পানে চেয়ে হাসিবে?

৩. আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
ধীরে দিবা হয় অবসান।

আমি নিভৃতে নয়ন-নীরে
অভিসিক্ত করি নৈশ উপাধান।।

এসব গান কি আমাদের সকলের ভাষাকে বহন করছে? কোনো সমাবেশে বা ব্যক্তিগত অনুভূতি উন্মোচনের জন্য এ গান গেয়ে কি কোনো আত্মতুষ্টি হবে আমাদের? আমরা তো চাইব আরও নৈর্ব্যক্তিক অথচ আত্মগত গভীরতা এবং তা পেয়ে যাব অবিরলভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে, এমনকি অতুলপ্রসাদে। দ্বিজেন্দ্রলালের সামর্থ্য যে এতটা সীমায়িত সেকথা ভাবার অবশ্য সংগত কারণ নেই। কেন-না স্মৃতিতে অনুরণন তোলে তাঁর অনেক সুন্দর গান। যেমন ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে, যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তোমারেই ভালোবেসেছি তোমারেই ভালোবাসিব, নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো—এইসব রচনা। হয়তো আমাদের ছুঁয়ে যায় তাঁর সহজ কবিত্ব লাগা এমন সাবলীল পঙ্‌ক্তি যে,

এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেই ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।

কিংবা,

বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মতন ভালবেসে
আজকে যদি মরতে না পাই
তবে আমার মরণ ভালো।

কিংবা,

তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

সেথা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি পাখির ডাকে জেগে।

আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।

সহজ অনুভূতির নিরাভরণ উচ্চারণে এতখানি ঈর্ষাজনক ছিল যাঁর দক্ষতা তিনি কেন নিসর্গ রূপায়ণে গভীর বাণীর সন্ধান পেলেন না তা ভাবলে বিস্ময় লাগে বৈকি। সেখানে কোকিল বিটপী মলয় সজনী পাপিয়া শশধর নির্ঝর কুসুমমধু সরসি এত পৌনপুনিকভাবে ঘুরে ঘুরে আসে কেন? কেন তাঁকে প্রকৃতি বর্ণনায় এমন 'ক্লিশে' ব্যবহার করতে হয় যে,

যখন সঘন গগন গরজে
বরিষে করকাধারা
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন
লুপ্ত চন্দ্রতারা।

অথবা বর্ষাকে দেখতে হয় এমন দারুণ শব্দ সন্নিপাতে যে,

ঘনঘোর মেঘ আই' ঘেরি গগন
বহে শীকরস্নিগ্ধচ্ছুসিত পবন।

এসবের একটাই উত্তর, প্রমথ চৌধুরির ভাষায়, 'তাঁর কণ্ঠে আগে এসেছে সুর, তারপর সুরকে তিনি দিয়েছেন বাণীরূপ।' এই ইঙ্গিত মনে রাখলে বোঝা যাবে 'যখন সঘন গগন' এমন শিশুতোষ আনুপ্রাসিকতায় দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রস্ত হওয়ার কারণ বিদেশি গানের স্বরের ক্রমিক আরোহণের একটা বুনোট, যা বাণী রচনার আগে তাঁর মনকে অধিকার করে বসেছিল। আর 'ঘনঘোর মেঘ আই' গানের পূর্বসূত্র যে 'ঘনঘটা ঘেরি আই কারী কারী ঘনঘটা' এই তথ্য জানলে বোঝা সহজ হয় যে মূল গানের সুরবিন্যাস তাঁকে এতটাই ভাসিয়ে দিয়েছিল যে 'শীকরস্নিগ্ধচ্ছুসিত'র মতো রূঢ় উপলখণ্ড তাঁর কানে বেমানান লাগেনি।

কিন্তু গান তো একটা পরম্পরাগত শিল্প। যতদিন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গানের গূঢ়তা আমরা শুনিনি ততদিন প্রকৃতির গতানুগতিক গানে আমাদের চলে যেত। বসন্ত বোঝাতে আমরা গাইতে পারতাম,

আইল ঋতুরাজ সজনি, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী,
বিপিনে কলতান মুরলী উঠিল মধুর বাজি।
মৃদুমন্দসুগন্ধপবনশিহরিত তব কুঞ্জভবন
কুহু কুহু কুহু ললিততান মুখরিত বনরাজি।

কিন্তু যখন জানতে পারি বসন্ত শুধুই ফোটা ফুলের মেলা নয়, তার মধ্যে ধরা আছে গভীরতর বেদনার আভাসন তখন আর আমরা 'আইল ঋতুরাজ সজনি' কেন গাইব? যদি বা গাই তবে সিন্ধুরা একতলায় বাঁধা

এক সংহত সুরের নির্মিতির জন্য গাইব। কিন্তু সে কৌতূহল কজনের? ঠিক তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ষাসংগীত যখন ব্যক্ত করবে—

চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন-ঘন-গরজনে
কাঁপে হিয়া সখি রে—

তখন কি এই গতানুগতিক বর্ণনা দেখে আমরা চণ্ডালিকার মতোই বলে উঠব না, 'আমি দেখব না, আমি দেখব না আমি শুনব? ধ্যানের মধ্যে মনের মধ্যে আমরা বর্ষাকে শুনতে চাইব. রবীন্দ্রসংগীত সেই আস্বাদ দিয়েছে বলেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্পর্কে একতরফা দোষারোপ করতে গিয়ে আমরা যেন ভুলে না যাই যে তাঁর গান রচনার উপযোগী একটা স্বচ্ছ জীবন ক্রমিকভাবে গড়ে ওঠেনি। জীবিকার দায়, দাসত্ব, রাজস্ব বিভাগে ইংরাজ প্রভুর সঙ্গে মনান্তর এবং ঘন ঘন স্থানান্তরের গ্লানি একটি সুনিশ্চিত নির্মাণের লক্ষ্যে তাঁকে এগোতে দেয়নি। পুত্র দিলীপকে প্রায়ই বলতেন : 'ওরে কত কি যে আসে মাথায় লিখবার সময় পাইনে। যা খাটায় আমাকে'। এই যেমন একদিকের সত্য তেমনই সত্য তাঁর গানের প্রয়োগক্ষেত্রের শীর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ সেই 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সময় থেকে শেষ বয়সের শেষ জন্মদিন (যেবার তিনি শান্তিদেবের ইচ্ছায় লেখেন 'হে নূতন দেখা দিক') পর্যন্ত গান রচনা ও প্রয়োগের কী বিচিত্র ও বিপুল ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। উৎসব, অনুষ্ঠান, সমাবর্তন, হলকর্ষণ, শারদোৎসব, চা-চক্র, বৃক্ষরোপণ তাঁর গানের ধারা চলত নানা চাহিদার চক্রে। তার বাইরে ছিল গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য পর্যন্ত মেলে-ধরা গানের বিপুল নিরীক্ষা এবং তা লেখার মানসিক অবকাশ। বিদেশ ভ্রমণের সঞ্জীবনী, বিশ্বখ্যাতির সফল আত্মপ্রত্যয়, শান্তিনিকেতনের কর্মবহুল বৈচিত্র্য সঞ্চারী জীবন, লোকসংগীতের সংযোগ, ঋতুচক্রের আবাহনী— এতসব মধুর আয়োজন তাঁর গানকে বিচিত্রতর করেছে। অবশ্য সব কিছু ছাপিয়ে ছিল তাঁর আত্মস্থ চারিত্র, অনুদ্‌বিগ্ন সংযত জীবনের অর্জিত শান্ততা।

দ্বিজেন্দ্রলাল এমন দাক্ষিণ্য পাননি. বা বলা যেতে পারে, গড়ে নিতে পারেননি। সবাই কি সব কাজ পারে? কিন্তু যা তিনি পারতেন, অর্থাৎ বিপুল বিচিত্র গান রচনা, সেখানে তাঁর চারপাশে আনুকূল্য খুব সুখকর ছিল না। তাঁর মজলিশি স্বভাব ও পানভোজনের চাঞ্চল্য বন্ধুবর্গের সমাহারে তাৎক্ষণিক বিনোদনে অপনোদিত হত। তার সঙ্গে মাত্রা রেখে হাসির গানের উচ্ছ্বাস বা দু-একটি প্রণয় সংগীতের মাধুর্য ভালোই জমত। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোনো চরম সংগীতের গভীরতা কেউ তো তাঁর কাছে চায়নি। তাঁর প্রথম যৌবনের 'ইন্ডিয়া ক্লাব', ও 'ডাকাত ক্লাব', পরবর্তীকালের 'পূর্ণিমা মিলন' এবং শেষ জীবনের 'ইভনিং ক্লাবে'র সদস্যরা তাঁর কাছ থেকে বড় কিছু আদায় করতে পারেনি। কারণ তাঁরা স্বভাবে ছিলেন প্রমোদপরায়ণ, স্বল্পে তুষ্ট, নাটুকে। দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁরা প্রেরিত করতে পারেনি কোনো বৃহৎ সৃজনে। দ্বিজেন্দ্রলাল মানুষটিও ছিলেন বন্ধুবৎসল, আবেগপ্রবণ ও অভিনয়প্রিয়। 'আমরা বিলেতফের্তা ক'ভাই আমরা সাহেব সেজেছি সবাই' গানটির নাটকীয়তা জমাতে তিনি নিজেও যে প্যান্ট কোট পরে মঞ্চে উঠতেন এই খবরটুকু তাঁর স্বভাবের স্পষ্ট দিকটাই দেখায়। দিলীপকুমার লিখেছেন :

> পরে এ-সাহেবিয়ানার হসনীয়তা উপলব্ধি করে কখনো-কখনো প্যান্ট কোট প'রেই এ-গানটি গেয়ে তুমুল হাসির তুফান তুলতেন সদীর্ঘশ্বাসে হাহুতাশ করে।

এমন বহির্বৃত্তিসম্পন্ন মানুষটির জীবনে আসে এক গভীর অন্তর্মুখী প্রশান্তি তাঁর ষোলো বছরের সুমধুর দাম্পত্যজীবনে। তাঁর এই সময়ের রচনাগুলি (বিশেষত প্রেমের গান) তাই সবচেয়ে সংযত ও সম্বৃত।

কিন্তু আবেগবহুল এই মানুষটি খুব সহজে সাড়া দিতেন বাইরের সামান্যতম আহ্বানে। বন্ধুসংগম থেকে পত্রিকা প্রকাশ, স্বদেশি গান রচনা থেকে সান্ধ্য আসরে গানের মজলিশ, হাসির গানের মঞ্চ থেকে রঙ্গ মঞ্চের উত্তেজনা, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কাগুজে বিতর্ক থেকে একেবারে *আনন্দ বিদায়* রচনা ও অভিনয়ের

কর্দমনিক্ষেপ পর্যন্ত তাঁকে সব ব্যাপারে খুব সহজে উদ্‌বেজিত করা যেত। তাঁর তথাকথিত শুভার্থীরা তাঁকে সেই কাজে সর্বদা ব্যস্ত রাখতে অনলস থাকতেন। এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলালের গান শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় না তার লক্ষ্যের সম্পূর্ণতায়। অনেক স্থূল ও আপাততুচ্ছ প্রসঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন। তার মধ্যে তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে অপচয় বোধহয় মঞ্চসান্নিধ্যে ঘটে। বিপুল জনপ্রিতা তাঁকে টানে ধ্বংসের দিকে। গানের নৈর্ব্যক্তিক গভীরতা টলে যায় নানা চরিত্রের মুখে ব্যক্তিগত গান জোগাতে বা সিচুয়েশান সৃষ্টির সামান্য উপলক্ষের মর্যাদা রাখতে।

একেক সময় মনে হয় সুরবালা দেবীর আকস্মিক মৃত্যুর অন্তর্গূঢ় আঘাত হয়তো তাঁর মধ্যে আনতে পারত প্রত্যাশিত অন্তর্মুখিতা এবং তার তাপে তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন অনন্ত নির্বেদের কিছু আন্তরিক গান। কিন্তু সে সম্ভাবনা অপনোদিত হয়ে যায় *আলেখ্য* কাব্য রচনার বস্তুমুখিতায়। সাময়িক আঘাতের অন্তর্ঘাত কবি সামলে নেন মাদকে, নাটকে আর স্বদেশি গান রচনার উন্মাদনায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিল একটা বৈপরীত্য, নিজেকে ভাঙার ইচ্ছা। নিজেকে গড়ে নিচ্ছিলেন কোনো বড় কাজের জন্য। তারই পূর্বাভাস হল সরকারি কর্ম থেকে অকাল অবসর গ্রহণ। তারই অন্যতর লক্ষণ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ। অজ্ঞেয়বাদী মানুষটির মধ্যেও চলছিল দোলাচল। তার্কিক অন্তরকে অধিকার করছিল খুব ধীরে ধীরে এক সুনিশ্চিত ভক্তিবাদ। এই সময়, তাঁর জীবনসায়াহ্নে, গানের মধ্যে আসতে থাকে এক সমাহিত আত্মসর্জনের ঔদাস্য। যিনি একদা গানে ভেবেছিলেন 'এ জগতে আমি বড়ই একা' তিনি এবার বললেন—

না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে।

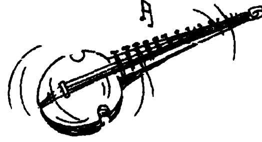
মৃত্যুকে তাঁর সরস মনে হতে লাগল এবার। বুক এগিয়ে সেই মরণ মায়ের মতো ভালোবেসে তাঁকে কোলে নিতে আসছে বলে তাঁর জাগল বিশ্বাস আরেকটি গানে। মনে হল, নীল আকাশ যখন ভরে গেছে চাঁদের আলোয় তখন ঘরের ভিতর প্রদীপ জ্বালার উদ্যম বৃথাই। কিন্তু সেই কথা কি সত্য?

সত্য হোক আর না হোক, দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ জীবনের গানগুলি কেবলই গভীর হয়ে উঠছিল জীবনস্পর্শিতার গৌরবে। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার বন্দনা গান, কিংবা মহাশক্তির 'চরণ ধরে আছি পড়ে' এই উচ্চারণে, অথবা 'ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়' গৌরাঙ্গের এই শরণমন্ত্রে তাঁর গান ক্রমশ আত্মচেতনার অতল টানে প্রকরণ আর সুরের চমক ভেঙে সংবদ্ধ হচ্ছিল ভাবের গহনতায়, বিশ্বাসের বিশ্বে। তাঁর শেষ বয়সের দুখানি গানে ফুটেছে একই শ্রান্তি আর একই আত্মনিবেদনের আর্তি :

সাঙ্গ আমার ধুলাখেলা সাঙ্গ আমার বেচাকেনা
এখন বড় শ্রান্ত আমি, ও মা! কোলে তুলে নে না

সাঙ্গ হল ধুলাখেলা হয়ে এল সন্ধ্যাবেলা
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা তোমার ওই বুকের মাঝে।

এ-গানের আন্তরিক উচ্চারণে সুর কখনো বাণীকে ছাপিয়ে যায় না বরং কানে বাজে কথা ও সুরের একটি সুষম সংগতি। মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল শেষ পর্যন্ত গানের মধ্যে নিঃসংশয়ে বুঝি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর আত্মস্থ জগৎ। কিন্তু ঠিক সেইসময় মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিল।



তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে

রজনীকান্ত জন্মেছিলেন ১৮৬৫ সালে। তার মানে রবীন্দ্রনাথের চার বছরের অনুজ তিনি, দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে দুবছরের। কিন্তু তিনি স্বল্পজীবী। মৃত্যু ঘটে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ১৯১০ সালে। রবীন্দ্রপ্রতিভার তীব্র উদ্ভাসন ঘটেনি তখনও, পাননি বিশ্বস্বীকৃতি, রবিরাহুর দল তখনও তাঁর প্রতিবাদী। রঙ্গমঞ্চে চলছে দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় নাটক ও নাট্য-সংগীতের তুমুল সম্প্রচার। অতুলপ্রসাদ তখন লখনউ শহরে লচা-ঠুংরির ধাঁচে বাংলা গান বাঁধছেন। সে-সময়ের মেডিক্যাল কলেজের একটি কটেজে দুশ্চিকিৎস্য কর্কটরোগে মূক গায়ক রজনীকান্ত নীরবে বিদায় নেন। তবে বিদায়কালেও তাঁর বিশ্ববিধানের ওপর কোনো অভিমান ছিল না। তখনও গান লিখছেন ভক্তির, আত্মসমর্পণের। ঈশ্বরকে বলছেন 'দয়াল'। কর্কটরোগের গলক্ষতে অস্ত্রোপচারে কথা বন্ধ হয়ে গেছে, তবু অসহ্য যন্ত্রণা সয়ে রোজনামচায় লিখছেন :

যাঁর দয়ায় এ পর্যন্ত বেঁচে আছি, তাঁরই দয়ায় কষ্ট পাচ্ছি। নিচ্ছেন, আগুনে দগ্ধ করে পাপের খাদ উড়িয়ে দিয়ে নিচ্ছেন;... আমাকে এই আগুনের মধ্যে ফেলে না দিলে খাঁটি হব কেমন করে?

একেবারে সন তারিখ মেলানো এখন আর সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি একই সময়ে হাসপাতালে বসে লিখছেন 'দয়াল আমার' গানে :

আগুন জ্বেলে, মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে
ঝেড়ে ময়লা-মাটি, করে খাঁটি
স্থান দেয় অভয়-শ্রীচরণে।

রোজনামচা আর গানের এমন মিল রজনীকান্তের আত্মজীবনের দিকে ফেরায় আমাদের। তাঁর গান তাঁর আত্মজীবনেরই অংশ। নিজে আইনজীবী ছিলেন বলেই নিজের মর্মান্তিক রোগযন্ত্রণার মধ্যে দেখলেন বিচারকর্তার দৈবী বিচার, তাই লিখলেন :

আমি যে বিচার দেখছি—Splendid;এমন আর হয় না। Subjudge, মুনসেফেব সাধ্য নেই এমন বিচার করে। আমার সম্বন্ধে যে বিচার হচ্ছে, আমার কথাটি বলবার জো-টি রাখেনি যে Punishment is untimely or too severe, এ বড়ো জবর Penal Code, অভ্রান্ত— নির্দোষ।

রজনীকান্তের গানে ঈশ্বরের এই এক আশ্চর্য প্রতিমা ঘুরে ঘুরে আসে। মর্ত্যপাপের বিচারকর্তার প্রতিমা। গীতিকার যেতে চান সেইখানটায়, 'যেখানে সে দয়াল আমার বসে আছে সিংহাসনে'। ঈশ্বরের এই বিচারক মূর্তি এবং ভক্ত গীতিকারের পাপী বিগ্রহ বাংলা গানে একটু নতুন। এমন নয় যে কর্কটরোগে বাক্যহারা হবার পরে তাঁর মনে জেগেছে এই পাপচেতনা। বস্তুত সেই উৎকট রোগ তাঁর শরীরকে আশ্রয় করবার অন্তত পাঁচবছর আগেই এমন গান জেগে উঠেছে যে,

জ্ঞান-মুকুট পরি', ন্যায়-দণ্ড করে ধরি',
বিচার-আসনে যবে বসিবে, হে বিশ্বপিত;
আজনম পাপ-লিপ্ত, লয়ে এ তাপিত চিত,
দূরে রব দাঁড়াইয়া, লজ্জিত কম্পিত ভীত;

দণ্ডধারী এই ঈশ্বরের দেওয়া ব্যাধি ও বেদনাকে তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন পরম আস্তিকতায় ও দুর্লভ বিশ্বাসে। এমনকি আত্মসন্তুষ্টিকেও মনে করেছিলেন পাপ, তাই ব্যাধিপ্রহৃত মানুষটির মনে হয়েছিল—

ভাবিতাম, 'আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ',
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর।

'সকল রকমে কাঙাল' মানুষটি আসলে তো অন্তরসম্পদে ছিলেন পরিপূর্ণ। রজনীকান্তের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিতর্কিত ও নিন্দিত লেখক, দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগীদের ঘৃণা ও সমালোচনার পাত্র, অতুলপ্রসাদ তাঁর সমাজ-বহির্ভূত পরিণয়ের কারণে ছিলেন উপেক্ষিত ও পরবাসী। একমাত্র রজনীকান্ত ছিলেন অনিন্দিত এবং জনপ্রিয় সারস্বত কর্মী। নিজেও লিখে গেছেন : 'আমাকে দেশসুদ্ধ লোকে কেমন করে যে ভালোবাসলে তা বলতে পারি না। আমার মলিন প্রতিভাটুকুর কত যে আদর করলে।.... এমন নিরবিচ্ছিন্ন নিন্দাবর্জিত যশ বাংলার কোন্ কবি পেয়েছে?'

বস্তুত এই উক্তিতেই গাঁথা আছে রজনীকান্তের সৃজনধর্মের মূল ট্র্যাজেডি। তাঁর জীবন বা জীবনযাপনের ধরন, তাঁর রচনাভঙ্গি বা বক্তব্য কোনোদিন কোনো বিতর্ক বা বিরক্তি জাগায়নি কারও মনে। জীবিতকালেই যে লেখক থাকেন স্বীকৃত ও শ্রদ্ধেয়, ভবিষ্যৎকাল তাঁর আর কোনো পুনর্বিবেচনা করে না। তা ছাড়া তাঁর ক্ষেত্রে স্বল্পজীবনের শোচনীয়তা আর ব্যাধিবিড়ম্বিত অস্তিত্ব তৈরি করে এক কারুণ্যভরা মিথ। তিনি হয়ে ওঠেন এক শ্রদ্ধেয় স্মৃতি। বিচার-বিতর্কে, দ্বন্দ্বে-দোলাচলে উত্তরপুরুষ আর তাঁকে অবলম্বন করে না। কান্তগীতি যে আমাদের দেশে তেমন করে ছড়িয়ে পড়েনি এইটাই তার বড় কারণ।

কিন্তু এটাও ঠিক, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানের ধারায় এমন গভীরভাবে হয়ে যায় আমাদের অবগাহন যে, রজনীকান্তের গান তেমন করে আর টানে না। হয়তো ওই তিন গীতিকারের আলাদা গীতিব্যক্তিত্ব ও ভাববিচিত্রা আচ্ছন্ন রাখে আমাদের। রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি ও অতুলপ্রসাদের গান যেমন বাণী ও রূপে এক-একটা নিজস্ব ধরন গড়ে তোলে শ্রোতাদের শ্রুতিতে, কান্তগীতি তেমন একক ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয় না। এমনও প্রশ্ন মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের গানে যত বৈচিত্র্য ও আত্মতা,

কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের গানে. যেমন নাট্যধর্ম ও বিদেশি সুরের সমীকরণ তেমন কই কান্তগীতিতে? অন্তত একথা তো মনে হবেই যে, অতুলপ্রসাদের গানে তাঁর আত্মবেদনা ও আর্তি যেমন গভীরভাবে নাড়া দেয় আমাদের, রজনীকান্ত তো তার একাংশও ফোটান না তাঁর গানে। তাঁর গানে বরং আত্মবেদনা ঢেকে যায় আত্মদীনতায়, ব্যাধিজর্জরতাকে ভাবেন দৈবী আশীর্বাদ, দুঃখ ও সন্তাপকে ভাবেন পাপজ। এসবের কারণ হল তিনি যত বড় শিল্পী তার চেয়ে বড়ো ভক্ত। সেই ভক্তিতে আবার দীনতা বড় প্রকট। যেমন :

তুমি অন্তহীন, বিরাট, এ নিখিল-ব্যাপী অচ্যুত-অক্ষর।
আমি ধূলি-কণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ, বিনশ্বর।
তুমি পরম সুন্দর, বিশ্বভূষণ, পুণ্য-বিভব-অলঙ্কৃত।
আমি অধম কুৎসিত, দুঃখপীড়িত, নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত।

রবীন্দ্রনাথও অবশ্য তাঁর গানে প্রতিদিন জীবনস্বামীর সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়ানোর বিনতি ঘোষণা করেন অথবা তাঁর চরণধূলার তলে মাথা নত করতে চান, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন উচ্চারণও থাকে যে, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।' রজনীকান্ত যে-দীনতার সাধনা করেন তা কতটা সত্য আর কতটা আত্মপ্রবঞ্চনা বলা কঠিন, তবে রোগশয্যায় বসে ব্যাধির তাড়নায় কাতরতা প্রকাশ না করে গানই তিনি লিখেছেন। চিকিৎসক ও বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে লিখে জানিয়েছেন, 'যন্ত্রণা যখন খুব বেশি বাড়ে, তখন এই রচনা ছাড়া আমার শান্তির আর দ্বিতীয় উপায় থাকে না।' সৃজনের বেদনা তাঁকে ভুলিয়ে রাখত দেহের বেদনা, তাঁর গান ছিল এতটাই আত্ম-শুশ্রূষাকারী। কিন্তু সেইসঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখা দরকার যে রজনীকান্তের কাছে সৃজন মানে ছিল শরণ। তাই ডাক্তার হেমেন্দ্রনাথ বকসি তাঁর চোখে জল দেখে যখন ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেন, 'আপনার কি বড়ো কষ্ট হচ্ছে? কাঁদছেন কেন? ইনজেকশন দেব কি?' উত্তরে রজনীকান্ত লিখে জানান,

আমি কাঁদি যার তরে
সে যে মোর অন্তরের হিয়া
মরমের সবটুকু
জীবনের সবটুকু দিয়া।
তুমি ভাবিতেছ বুঝি
মিথ্যা বেদনার তরে কাঁদি?
ছি ছি বন্ধু, ছি ছি সখা!
আমাকে কোরো না অপরাধী।

এমন মানুষও কিন্তু শেষশয্যায় দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, তাঁকে লিখেছিলেন. 'আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান মহাপুরুষ'। হাসপাতালে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন তাঁর গান। নিজে তখন ব্যাধিতে রুদ্ধকণ্ঠ. তাই, গান গেয়েছিলেন তাঁর পুত্রকন্যা এবং সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন তিনি। স্বভাব-সংযত রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তের সেই ঐশী বিশ্বাস ও জীবনপ্রীতি দেখে, বাড়ি ফিরে গিয়ে, পরে যে অসামান্য চিঠি লেখেন মুমূর্ষু গীতিকারকে তাতে 'মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ' শুধু নয়, সেই সঙ্গে 'আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা'ও দেখা যায়। তিনি লিখেছিলেন এ ছাড়াও :

> সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগ-ক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।

১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ দেখে আসেন রজনীকান্তকে এবং তার তিনমাস পরে ২৮ ভাদ্র দেহাবসান ঘটে সেই ঈশ্বর-সমর্পিত মানুষটির। কিন্তু মাঝখানের দিনগুলিতে গান থামেনি। লিখে গেছেন কাগজ-কলমের সমন্বয়ে, সুর দিয়েছেন হারমোনিয়ামে, গান গাইয়েছেন শিষ্য দেবেন চক্রবর্তীকে দিয়ে।

আর কী সেই সব গান! জীবনসম্পৃক্ত, গাঢ়, বিবিক্ত। বিশ্বাসী উচ্চারণের পাশে মাঝে মাঝে তাতে ঝলসে ওঠে কৌতুকও বুঝিবা। যেমন একটা গানে মৃত্যু বিষয়ে বলে ওঠেন

সে ব'স্‌ল কিনা ব'স্‌ল তোমার শিয়রে—
তুমি মাঝে মাঝে মাথা তুলে
সেই খবরটা নিয়ো রে।
(ও সে ব'স্‌ল কিনা)

মৃত্যু-ভাবনার ছোঁওয়া তাঁর গানের ভুবনে অবশ্য আগেই লেগেছিল। আধুনিক অর্থে কোনো 'অ্যালিয়েনেশন' ছিল না তাঁর, তবু সুস্থ-সবল মানুষটি কতকাল আগেই লিখেছিলেন :

কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ-চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা-চন্দনে!

কোনো জাগতিক তাপ ছিল কি তাঁর? কোনো ব্যর্থতা বা স্ববিরোধ? খুব খুঁজেও তেমন কিছু জানা যায় না। স্বভাবে রজনীকান্ত ছিলেন শান্ত ও সমর্পিত। এই গান রচনার যে বিবরণ পাই তা এই রকম :

> জানিস এটা একটা বাজে কাগজের পাতায় লিখে টেবিলের ওপরেই ফেলে রেখেছিলাম— কখন এসে তোর বউঠান লেখা দেখেছেন— আমি চেম্বারের কাজ সেরে এসেছি— নাইতে যাব— ভাদুড়ী তামাক নিয়ে এল— কোথায় ছিলেন তোর বউঠান— সেই লেখাটুকু নিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'একি লিখেছ তুমি— আমার যে পড়েই কান্না আসছে। কেন এমন করে লিখলে?' আমি বললাম- - 'আরে কেন লিখেছি তার কি কোন জবাব আছে? যা কলমে আসে তাই লিখি।' 'আচ্ছা বলো যে এ গান তুমি গাইবে না।' আমি বললাম, 'না গাইব না।' তবে তোকে বলে রাখি— যখন আমি চলে যাব তখন সবাই মিলে এই গানটি গাইতে গাইতে আমাকে মহাযাত্রা করিয়ে দিবি—ভুলিস্‌নে।

জীবিতকালেই এমন মরণোত্তর আকাঙ্ক্ষা এক আঁচড়ে এঁকে দেয় সত্যিকারের রজনীকান্তকে। আত্মপ্রিয়তা ছিল তাঁর সুগভীর। বোধ হয় সেই জন্যেই হাসপাতালে শুরু করেছিলেন আত্মজীবনের খসড়া।

হয়তো সেই আত্মজীবনী শেষ হবে কি না এ-সংশয় ছিল তাঁর, তাই মৃত্যুশয্যায় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে বলেছিলেন তাঁর জীবন-চরিত লিখতে। 'রোগশয্যা-শায়ী রজনীকান্ত তাঁর জীবন-চরিত লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন'— জানিয়েছেন নলিনীরঞ্জন। সে কথা রেখেছেনও তিনি। কিন্তু সম্ভবত রজনীকান্তের অন্তর্জীবন স্পষ্ট হয়েছে তাঁর গানেই।

২

'আমার জীবন ক্ষুদ্র, বৈচিত্র্যহীন, নীরস' এই বলে রজনীকান্ত তাঁর আত্মজীবনীর খসড়া শুরু করেছিলেন। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, 'এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন কোনো ঘটনাই ঘটে নাই, যাহার সন বা তারিখ

না পাইলে, পাঠকগণের মনে কোনো অভাববোধের সঞ্চার হইতে পারে। এ জীবনে কোনো পানিপথের যুদ্ধ বা চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের মতো বিশিষ্ট ঘটনার সমাবেশ হয় নাই।'

কিন্তু শিল্পীর জীবন গঠনে এমন সব অন্তঃস্রোত থাকে, বহিরঙ্গ ও প্রসারিত দেশকালে এমন সব নিগূঢ় সংযোগে গড়ে ওঠে সৃজনাবেগ যে বাইরের চোখ ধাঁধানো ঘটনা থেকে তার দিশা মেলা কঠিন হয়।

১৮৬৫ সালের ২৬ জুলাই পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ি গ্রামে জন্মেছিলেন রজনীকান্ত সেন। এই ভাঙাবাড়ি আগে ছিল নলবন আর পানের বরজে কীর্ণ। ময়মনসিংহ জেলার সহদেবপুর গ্রাম থেকে বৈদ্যবংশের দুই সহোদর রাজারাম ও রাজেন্দ্ররাম আসেন ভাঙাবাড়িতে। গ্রাম্য বিলটির সংস্কার ঘটে। গ্রামখানি ক্রমে বর্ধিষ্ণু হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ কায়স্থরা বসতি করতে থাকেন, গড়ে ওঠে চতুষ্পাঠী ও বঙ্গ বিদ্যালয়। সহদেবপুর থেকে আসা সেন পরিবারে বিবাহ করেন জনৈক যোগিরাম সেন। তাঁরই পুত্র গোলোকনাথ সেন রজনীকান্তের পিতামহ। তাঁর জন্মের আগেই পিতৃবিয়োগ ঘটে। তার ফলে গোলোকনাথ লালিত হন মামার বাড়িতে। মামার দানরূপে তিনি পান একটি বাড়ি ও সামান্য জমি। গোলোকনাথ ছিলেন হতদরিদ্র। তাঁর দুই সন্তান গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদ। দুই ভাই রাজশাহিতে থেকে খুব কষ্টে বিদ্যার্জন করেন। ক্রমে বড়ভাই গোবিন্দনাথ হন প্রথমে মুহুরি, পরে সফল উকিল। ছোটভাই গুরুপ্রসাদ দাদার আনুকূল্যে পারশি ও সংস্কৃত শেখেন। ব্যুৎপত্তি ঘটে ইংরাজি ভাষাতেও। পরে ওকালতি পাস করে মুনসেফ হন এবং শেষপর্যন্ত সাবজজ হয়ে অবসর নেন। রজনীকান্ত গুরুপ্রসাদের তৃতীয় সন্তান।

ভাঙাবাড়ির সেন বংশ গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদের যৌথপ্রয়াসে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পৈতৃক পর্ণকুটির ভেঙে গড়ে ওঠে প্রাসাদ ও ঠাকুরদালান। শুরু হয় দোল-দুর্গোৎসব। কিন্তু পুরো যৌথ পরিবারটির সুখের দিন ধ্বস্ত হয়ে যায় মৃত্যুর অভিশাপে। দুই ভাইয়ের অজস্র সন্তান বিয়োগ ঘটে। রজনীকান্তের অগ্রজ ও অগ্রজা মারা যান, পরে অনুজ জানকীকান্ত মারা যান জলাতঙ্ক রোগে। আশ্চর্য যে রজনীকান্তের জ্যেঠতুতো দুই দাদা বরদাগোবিন্দ ও কালীকুমার যৌবনকালেই মারা যান মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে। বরদাগোবিন্দের কিশোর-পুত্র মারা যায় কৈশোরে। এই সময় পরিবারে আর্থিক বিপর্যয়ও দেখা দেয়, কেন-না রাজশাহির কুঠিতে গচ্ছিত পরিবারের অর্থভাণ্ডার নষ্ট হয় কুঠি দেউলিয়া হয়ে পড়ায়।

রজনীকান্তের শৈশব থেকে যৌবন এই উন্নয়ন ও অবনমনের দোলাচলে ঘেরা। তার সঙ্গে চলে মৃত্যুর প্রহার। এখানে আমাদের প্রতিতুলনায় মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন ঠাকুরবাড়ির সন্তান, দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান, অতুলপ্রসাদের পিতা ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত চিকিৎসক। এ সব উদাহরণের পাশে রজনীকান্তের ললাটলিপি ছিল ভিন্নতর। উনিশ শতকের অনুন্নত এক গ্রাম্য পরিবেশে তাঁর লালন ঘটে আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যস্ত ও মৃত্যুসন্তপ্ত পরিবারে। মেধাবী ও তৎপর রজনীকান্ত ১৮৮২ সালে বোয়ালিয়া থেকে এনট্রান্স পাস করে রাজশাহি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৩ সালে হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৮৩ সালে তিনি এফ.এ পাস করেন। পরের বছর স্বল্পদিনের ব্যবধানে প্রথমে তাঁর পিতা ও পরে জ্যেঠা মারা যান। তখন বিরাট যৌথ পরিবারের ভার পড়ল জেঠতুতো দাদা উমাশঙ্করের উপর। তাঁরই আনুকূল্যে রজনীকান্ত ১৮৮৯ সালে বি.এ এবং ১৮৯১ সালে আইন পরীক্ষায় পাস করে রাজশাহিতে ওকালতি শুরু করেন। এর কিছুকাল আগে তাঁর সাতাশ বছর বয়সে পাবনার সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'আশালতা' পত্রিকায় রজনীকান্তের প্রথম মুদ্রিত রচনার হদিশ মেলে। তাঁর সারস্বত সাধনার আত্মপ্রকাশে এতটাই দেরি হয়েছিল।

রজনীকান্তের জীবনে আত্মজনের মৃত্যুতে যে ধারাবাহিক বিস্তার আমরা দেখি তার সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ১৮৯৭ সালে তাঁর জ্যেঠতুতো দাদা উমাশঙ্কর গলক্ষতজনিত কর্কটরোগে মারা যান। অচিরে

প্রথমে রজনীকান্তের তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ এবং প্রথমা কন্যা শতদলবাসিনী বিদায় নেন। উভয়ক্ষেত্রেই তিনি গেয়ে ওঠেন :

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।
তোমারি দু-নয়নে তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা তোমারি হা-হা রব।

এই ভক্তি-বিনম্র শুদ্ধশ্রী শান্ত আস্তিক্যবাদ রজনীকান্ত পেলেন কোথা থেকে? মূলত নগরজীবনের বাইরে গ্রামে ও মফস্‌সলের পুরোনো মূল্যবোধে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল তাই সময়ের অসূয়া বা সমকালীনদের নিন্দা-ঈর্ষা তাঁকে সইতে হয়নি। ভাঙাবাড়ি গ্রামে তিনি ছিলেন স্বভাবনেতা। কৈশোর থেকেই তাঁর আবৃত্তিকুশলতা, স্মরণশক্তি, সংগীত-পটুতা, অভিনয়-শক্তি, সমাজহিতৈষা ও জিমনাস্টিকস্-দক্ষতা তাঁকে জনপ্রিয় বিগ্রহে পরিণত করেছিল। যৌথ পরিবারে দেখেছিলেন জ্যেঠার প্রতি পিতার সর্বৈব আনুগত্য, জীবনে পেয়েছিলেন গৃহকর্মনিপুণা সেবাময়ী বিনতা পত্নী, পেয়েছিলেন অগ্রজদের স্নেহময় ভালোবাসা— এ সবই তাঁর অন্তর্জীবনকে শান্তভাবে গড়ে তোলে। সেই অর্জন থেকে তিনি লেখেন :

কে রে হৃদয় জাগে শান্ত শীতল রাগে
মোহতিমির নাশে প্রেমমলয়া বয়।

রজনীকান্তের গানের মূলসুর এই শান্ত শীতলতা। মৃত্যুর রুদ্রতা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি, কেন-না তাকে তিনি মোহতিমিরনাশন রূপে দেখেছেন। ঈশ্বরকে তিনি দেখতে পান প্রসারিত জনসমাজে, পরিবারের বেষ্টনীতে। তাই লিখেছিলেন :

সাধুর চিতে তুমি আনন্দ রূপে রাজ
ভীতি-রূপে জাগ পাতকীর প্রাণে;
প্রেম-রূপে জাগ সতীর হিয়ামাঝে
স্নেহ-রূপে জাগ জননী নয়ানে!

এ-গান শুনতে শুনতে অবশ্য মনে পড়তে পারে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই গান :

সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু মা
শিশুর হাসিটি জননীর চুমা
সাধুর ভকতি প্রতিভা শকতি
এ যে তোমারই মাধুরী তোমারই মহিমা!

উল্লেখযোগ্য যে, রজনীকান্তের গানে দ্বিজেন্দ্রগীতির প্রভাব নানাভাবে পড়েছে। তিনি যখন রাজশাহিতে ওকালতি করতেন তখন ১৮৯৪-৯৫ নাগাদ দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে যান আবগারি বিভাগের পরিদর্শক হিসাবে। তাঁর হাসির গানের মজলিশ রজনীকান্তকে এতটাই মজিয়ে দেয় যে সেই থেকে তিনি বহু হাসির গান লেখেন। তার ফলে তাঁর একমুখী সংগীতের ধারায় এসে মিশে যায় কিছুটা সমাজ-চেতনা ও হাস্যরস। এতে তাঁর গান প্রসারিত হয় আত্মবৃত্ত থেকে ব্যাপকতর অন্বেষণে। রজনীকান্ত সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা তাঁর হাসির গানেই শুধু দ্বিজেন্দ্রপ্রভাবের প্রত্যক্ষতা দেখেছেন। খোঁজ করলে দেখা যাবে তাঁর শান্ত রসাস্পদ গানেও দ্বিজেন্দ্রপ্রভাব অবিরল। আরেকটি কথা বিচার্য, দুজনেরই গান রচনা ও গায়ক-জীবনের ভিত্তিতে ছিল দাম্পত্যপ্রণয়ের আনন্দ ও শান্তি। দুজনেই কর্মস্থলে বসবাসকালে সবচেয়ে বেশি গান লিখেছেন এবং গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন। দ্বিজুবাবুর গান গাওয়ার স্মৃতি সেকালের অনেক লোকই

লিখে গেছেন। জানা যায়, 'রজনীকান্তের গান গাহিবারও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ক্রমাগত পাঁচ-ছয় ঘণ্টা এক সঙ্গে গান গাহিয়াও কখনো তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তন্ময় হইয়া যখন তিনি স্বরচিত গান গাহিতেন তখন তিনি আহার-নিদ্রা, জগৎ-সংসার সবই ভুলিয়া যাইতেন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন।' পরবর্তীকালে দেখা যায় তাঁর কণ্ঠের অতি ব্যবহার কর্কট রোগের কারণ হয়ে ওঠে।

এইখানে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। স্বরচিত গান গাওয়াতেই তাঁর আনন্দ ছিল বেশি। 'তাই তিনি কিশোর বয়স হইতে নিজে গান বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাববিভোর বালক স্বরচিত ভক্তি-রসাত্মক গান গাহিতেছেন— সে এক অপূর্ব দৃশ্য।'এই তাৎক্ষণিক ও ঔপলক্ষিক গান রচনার কৌশল তিনি সম্ভবত পেয়েছিলেন পিতা গুরুপ্রসাদের সূত্রে। সেন পরিবার ছিল শাক্ত কিন্তু গুরুপ্রসাদ ছিলেন কীর্তনে আসক্ত। *পদচিন্তামালা* নামে কৃষ্ণভজনের সম্পূট প্রকাশ করে অগ্রজকে উপহার দিলে গোবিন্দনাথ বলেন, 'বই ভালো হয়েছে, কিন্তু এতে মায়ের নাম কই?' অচিরে গুরুপ্রসাদ লিখে ফেলেন শক্তিগীতিসম্ভার *অভয়া বিহার*। এখানে মনে আসে যে, আগমনী ও বিজয়ার গান নিয়ে রজনীকান্তের ভক্তিসংগীতগুচ্ছ *আনন্দময়ী* প্রকাশ পায় ১৯১০ সালে, তাঁর মৃত্যুর পরে। একই বছরে বেরোয় তাঁর তত্ত্বসংগীতের সংকলন *অভয়া*।

গান লেখার ব্যাপারে তাঁর স্বভাবদক্ষতা ছিল। রজনীকান্তের কন্যা শান্তি দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে বা কোনো উপহার প্রদান-সম্বন্ধে শিক্ষকরাও রজনীকান্তকে দিয়ে গান লিখিয়ে গাওয়াতেন। কলকাতার ছাত্রজীবনে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত এবং গান শোনার ও গাওয়ার কথাও শান্তি দেবী লিখেছেন।

রজনীকান্তের জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমিতে ছিল শোকের ব্যাপক অভিজ্ঞতা কিন্তু বাস্তবের ব্যাঘাত ছিল অসফল আইন ব্যবসায়। 'ওকালতিতে ঐকান্তিক অনুরাগ না থাকায় তিনি সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এমনকি, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের পরিত্যক্ত যৎকিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জমিদারির বন্দোবস্ত করিতে মহলে গিয়াও তিনি গানবাজনায় সময় কাটাইয়া ফিরিয়া আসিতেন। .... মক্কেলরা তাঁহার দ্বারা সময় মতো কাজ পাইত না'— লিখেছেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। রজনীকান্ত লিখে গেছেন, 'আমি আইনব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ওই ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।' এই সূত্রে মনে পড়ে অতুলপ্রসাদ সফল হয়েছিলেন এই আইন ব্যবসায়েই। দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে অবশ্য গানরচনার বাধা ছিল তাঁর সরকারি কর্মের দাস্য।

যাই হোক, আইনব্যবসায়ের ব্যর্থতা ঢাকতে তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন গান গাওয়ায় ও গান রচনায়। 'প্রত্যেক পারিবারিক বৈঠকে ও সাধারণ সম্মিলনে রজনীবাবুকে গান রচনা করিতে ও গাহিতে হইত।' গান রচনার তাঁর তাৎক্ষণিক ক্ষিপ্রতা বিষয়ে কিছু তথ্য মেলে। নলিনীরঞ্জনের সাক্ষ্যে জানা যায়, 'কখনো ভাবিয়া লিখিতে তাঁহাকে দেখি নাই।' আরেকটি বিবরণ আছে জলধর সেনের জবানিতে :

> এক রবিবারে রাজশাহির লাইব্রেরিতে কীসের জন্য যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে? একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড়ো ভক্তি করিত। সে তখন টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তারপরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল।

আমি তো অবাক। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্বজন পরিচিত—

তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা শান্ত-কুশল-দরশা।

এই বিবরণে উল্লিখিত অক্ষয় হলেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যিনি ছিলেন রজনীকান্তের অকৃত্রিম হিতার্থী এবং তাঁর প্রথম গীতসংকলন *বাণী* (১৯০২) প্রকাশনার ব্যাপারে অগ্রণী। বস্তুত রজনীকান্তের গান যখন বিদ্বৎ সমাজে এমনকি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পেয়েছিল তখনও তাঁর গীতসংকলন প্রকাশে সংকোচ যায়নি। তার কারণ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সমালোচনার ভয়। সে সময় একদিন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জলধর সেনের আমন্ত্রণে জলধরেরই বাড়িতে সমাজপতিকে এনে কোনো পূর্ব পরিচয় না জানিয়ে রজনীকান্তকে গান গাওয়াতে বসিয়ে দেন। তারপর অক্ষয়কুমারের বর্ণনা অনুযায়ী : 'প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সংগীত সুধাপানে আহারের কথাও ভুলিয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু করিতে হইল না; সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন।'

এইভাবেই রজনীকান্ত ছড়িয়ে পড়েন রাজশাহির পরিধি ছাড়িয়ে কলকাতায়। গ্রাম্য পরিবেশে গড়ে-ওঠা এক মধ্যবিত্ত মানুষ তাঁর গান রচনার আন্তরিকতায় স্থান পেয়ে গেলেন কলকাতার উচ্চসমাজে। সেখানে তখন চলছে ব্রাহ্মসমাজের শান্ত রসাস্পদ পূজার গান, রঙ্গমঞ্চ ঘিরে প্রচুর থিয়েটারের গান আর ওস্তাদি কালোয়াতি তানবাজির গান। আশ্চর্য যে, রজনীকান্ত রবীন্দ্রসংগীতের দ্বারা তেমন প্রভাবিত হননি। তার একটা কারণ কি সে-সময়ে রবীন্দ্র-বিদ্বেষের একটা বড়ো আন্দোলন চলছে কলকাতায়? তা ছাড়া রবীন্দ্রসংগীত তখন কলকাতার চেয়ে শান্তিনিকেতনেই বেশি প্রচলিত ছিল। রজনীকান্ত তাঁর গীত সংকলন *বাণী* প্রকাশ করেন ১৯০২ সালে, *কল্যাণী* প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে, ১৯১০ সালে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের *কণিকা*-র আদর্শে লেখা নীতিকবিতা *অমৃত*। আশ্চর্য নয় কি যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকারের গান রজনীকান্তের দূরায়ত্ত রইল অথচ তিনি তাঁর নীতিকবিতার নকল করলেন? অবশ্য গভীরতর অনুসন্ধানে দেখা যায় রজনীকান্ত দুখানি গান লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের দুখানি বিখ্যাত পূজার গানের সুরে।

রবীন্দ্রনাথের মূল গান	রজনীকান্তের গান
১ তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে/রচনা ১৯০০	ভীতিসঙ্কুল এ ভবে
২ দাঁড়াও আমার আঁখির আগে/রচনা ১৯০৪	শুনাও তোমার অমৃত বাণী

এক্ষেত্রে তিনি কেবল সুরটুকুই অনুকরণ করেছেন, রবীন্দ্রসংগীতের ভাবরস, তার বিন্যাসের ভঙ্গি তাঁকে প্রভাবিত করেনি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে অপরের বিখ্যাত গানের সুরে বাণী বিন্যাস করে গান রচনা ছিল রজনীকান্তের একরকম নেশা। এখানে সেই রকম গানের একটি তালিকা প্রণয়ন করে দেওয়া হল সকলের অবগতির জন্য।

মূল গান	রজনীকান্তের গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি
স্মরগরল খণ্ডনং	আজি শিথিল সব ইন্দ্রিয়
মাতঃ শৈলসুতা	ভারী সুনাম করেছ
রে গঙ্গামাই প্রাতে দরশন দে	রে তাঁতি ভাই একটা কথা
মধুর সে মুখখানি	পাদপূরণ

তোর নাম রেখেছি হরভোলা	ডাক দেখি তোর.বৈজ্ঞানিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ডাকে	কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ
হেলে দুলে নেচে গেল গোষ্ঠবিহারী	কতভাবে বিরাজিছ বিশ্ব মাঝারে
পাখি ঐ তো গাহিলি গাছে	ওমা এই যে নিয়েছ
তুমি গতি তুমি সার	বেলা যে ফুরায়ে যায়
সোনার কমল ভাসালে জলে	যদি পার হতে তোর
বাঁশের দোলাতে উঠে	যে পথে মরা ছেলে
নিপট কপট তুঁহু শ্যাম	সাঁঝে এ কি হরষ
	তিমিনাশিনী মা আমার
সব দয়াল দয়াল বলে	এমন সোনার বাংলা
ভেবে মরি কী সম্বন্ধ	দুটো একটা নয় রে
	জ্ঞানশ্রেষ্ঠ জ্ঞানসেব্য
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে	ঐ অভ্রভেদী ধবল শৃঙ্গে
	তখন ব্যাখ্যা করল নারদ
গিরি গৌরী আমার এসেছিল	সেথা সর্বসত্তা বিদ্যমান
ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ	মধুমঙ্গল গোধূলি
উঠ গো ভারতলক্ষ্মী	আকুল কাতর কণ্ঠে

এই তালিকার সঙ্গে যুক্ত হবে রবীন্দ্রনাথের গানদুটি। এ ছাড়া উল্লেখ করা দরকার যে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা বিলাত-ফেরতা ক' ভাই' গানের সুরে রজনীকান্ত অন্তত দশখানি হাসির গান লিখেছেন। এই তালিকায় মূল গানগুলির দিকে নজর করলে দেখা যাবে, রজনীকান্তের বেছে-নেওয়া সুরের বেশিরভাগ গান তৎকালীন যাত্রা ও থিয়েটারের অথবা জনপ্রিয় লৌকিক গান বা দেহতত্ত্ব। অন্তত একটি করে ক্ষেত্রে দাশরথি রায়, হিন্দি ভজন ও বাংলা আগমনী গানের অনুসরণের উদাহরণ রয়েছে। শেষ গানটি অতুলপ্রসাদের সুরে। সেই সুর অতুলপ্রসাদ পেয়েছিলেন ভূমধ্যসাগরে গণ্ডোলা চালকদের কণ্ঠে,১৮৯২ সালে, বিলাত যাবার পথে। এই একমাত্র পরোক্ষ সূত্রে কান্তগীতিতে প্রবেশ করেছে বিদেশি সুর। তার বাইরে তাঁর সর্বমোট আনুমানিক আড়াইশো গানে কোনো বিদেশি সংরাগ নেই। থাকবেই বা কী করে? তিনি তো রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদের মতো বিদেশ যাবার বা বিদেশি গান শেখার সুযোগ পাননি।

৩

রজনীকান্তের অতি বড় অনুরাগীও স্বীকার করবেন যে কান্তগীতির ভাব ও রূপের বৈচিত্র্য খুব কম। এই দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সঙ্গে প্রতিতুলনা করলে। একদিক থেকে অবশ্য এই তুলনা যুক্তিহীন, কেন-না রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল গানের যত প্রয়োগক্ষেত্র পেয়েছিলেন, বিশেষত নাট্যগানে, রজনীকান্ত তা পাননি। তাঁদের দুজনের গানে মূল শক্তি রাগমিশ্রণে ও দেশি-বিদেশি সুরের সমন্বয়ে। তা ছাড়া দুজনেরই কবিমন গান রচনায় আনুকূল্য করেছে সেই জন্য ভক্তি ও স্বদেশচেতনার গান ছাড়াও প্রেম ও নিসর্গের গান তাঁদের আত্মপ্রকাশে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। দুজনেরই ভারতীয় মার্গসংগীত ও পাশ্চাত্য গানে ভালোমতো দখল ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতে রয়েছে ধ্রুপদের সংহত কাঠামো, দ্বিজেন্দ্রলালের গানে বিস্তারধর্মী টপ্ খেয়াল। রজনীকান্তের অনুজ অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলেরও ছিল সাংগীতিক বনিয়াদ ও বৈচিত্র্যধর্মী গান রচনার প্রবণতা। রজনীকান্তের শৈশব থেকে

নীতিবশ্যতার জীবন ভক্তিভাবনার অতিরেক এবং বৈচিত্র্যহীন জীবিকা-বিড়ম্বিত দিনযাপন তেমন করে অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করতে দেয়নি। বাল্যবিবাহের সুনিশ্চিত মসৃণতা অভিজ্ঞতা এবং যৌথ পরিবারের অবগুণ্ঠিত শাসন-সংযমে প্রেম-অপ্রেমের কোনো দ্বন্দ্ব জটিল অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আসেনি। নিসর্গের মধ্যে শুধুই তিনি খুঁজে পেয়েছেন জগদীশ্বরের শৃঙ্খলার পরম্পরা ও প্রবল শক্তিরূপ। বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার বেশ কিছু নমুনা তাঁর গানে আছে। তবে তাঁর শেষ কথা হল :

কান্ত বলে আছে জেনো, 'কেন'-র 'কেন', তস্য 'কেন'
যাও নিখিল 'কেন'-র মূল কারণে
সে রেখেছে কালের খাতায় লিখে।

এই নিখিল 'কেন'-র মূল কারণ তো ঈশ্বর। কাজেই রজনীকান্তের সব উদ্‌বেলতা সব জিজ্ঞাসার অবসান ঘটে ঐশী পাদপীঠে।

গানের এই ভাববৈচিত্র্যের অভাব হয়তো তিনি ঢাকতে পারতেন সুর বিন্যাসের চাতুর্যে, তালের বিভাজনে, সুরমিশ্রণের দক্ষতায়। কিন্তু গীতরূপায়ণে তিনি সুরের চটকের চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন বাচনের আন্তরিকতার প্রতি ; সেইজন্য একটি রাগাশ্রিত সুরকে সরলভাবে বিন্যাস করেছেন। স্বরের তীব্র সচকিত ওঠা-পড়া রাগমিশ্রণের সাহসী নিরীক্ষা, তাল ও লয়ের অপ্রত্যাশিত মোচড় তাঁর গানে নেই। স্পষ্টত কীর্তন গানের রূপবন্ধ, বিশেষত আখরবহুল মনোহরশাহি, তাঁর প্রিয় ছিল। আর বিপুলভাবে ব্যবহার করেছেন বাউলধারা। গানের শেষে ভণিতা ('কান্ত বলে') তাঁর লোকায়ত প্রবণতাকেই চিহ্নিত করে। আঙ্গিকের এই সীমাবদ্ধতা এবং সাংগীতিক অভিজ্ঞতার ও প্রয়োগের শীর্ণতা তাঁর গানকে সংগীতিক আবেদনের দিক থেকে দুর্বল করে রেখেছে। তাঁর গানের মূল আবেদন তাই ভাবের ও আত্মস্থ উচ্চারণের। বিশেষত তিনি নিজে অত্যন্ত সুকণ্ঠ এবং ভাবগ্রাহী গায়ক ছিলেন বলে রজনীকান্তের গানের দুর্বলতা ও এই সুরের সদৃশতা তাঁর জীবিতকালে ধরা পড়েনি। এখন কৃত্রিমভাবে অদীক্ষিত কণ্ঠে কেউ কান্তগীতি গাইলেই বোঝা যায় তার মূল দুর্বলতা।

এমন কেন হল তার অনুসন্ধানে রজনীকান্তের জীবনের দিকেই চোখ ফেরাতে হয়। তাতে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর বাড়িতে ছিল না সংগীত পরিবেশ। ছিলেন না বিষ্ণু বা যদুভট্ট, শ্রীকণ্ঠ সিংহ বা জ্যোতিদাদা। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মতো গুণী কালোয়াত ছিলেন না তাঁর পিতা; অথবা কোনো সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো দক্ষ কণ্ঠবাদকের কাছে তাঁর গানের পরিমার্জনা ঘটেনি। পক্ষান্তরে, অতুলপ্রসাদের মতো ঢাকার সম্ভ্রান্ত সংগীত পরিবেশ পাননি শৈশবে, যৌবনে পাননি উত্তর ভারতীয় ঠুংরি বা লাউনি-কাজরী-সাওয়ন-হোরীর সংসর্গ। কান্তকবির জীবনীকার নলিনীরঞ্জন জানিয়েছেন, শৈশবে ভাঙাবাড়িতে হত কীর্তন আর কথকতার আসর। পিতা গাইতেন ভক্তিসংগীত। রাজশাহির ধর্মসভার বাৎসরিক অধিবেশনে প্রসিদ্ধ গায়ক রাজনারায়ণের চণ্ডীযাত্রা ও কীর্তন গান হত। তবে 'বাল্যকাল হইতেই তিনি গান শুনিতে বড় ভালোবাসিতেন, একাগ্রচিত্তে গানের সুর ও ভাষা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন।' এ ছাড়া তাঁর আর একটি প্রবণতার কথা জানা যায়।

> কাহার সুমধুর সংগীত শ্রবণ করিলে তিনি আত্মহারা হইতেন এবং ঘরে ফিরিয়া সকলকেই সেই গান গাহিয়া শুনাইতেন। গানের যে অংশ তাঁহার স্মরণ হইত না, সেই অংশ তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া জোড়া দিয়া লইতেন।... সংগীতচর্চার প্রারম্ভে তিনি একটি ফ্লুট বাঁশি ক্রয় করেন এবং উহারই সাহায্যে সংগীতাভ্যাস করিতে থাকেন।

কোনো নামকরা ওস্তাদ বা বয়স্ক সংগীতকারের সঙ্গ পাননি রজনীকান্ত। তাঁর বয়স যখন চোদ্দবছর তখন ভাঙাবাড়ির তারকেশ্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। দুজনে একসঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা রচনার

অভ্যাস করতেন। তারকেশ্বর কবিওয়ালাদের মতো মুখে মুখে অনর্গল ছড়া ও পাঁচালি বানাতেন। তাঁর বয়স তখন আঠারো। দুজনে বন্ধুত্ব হয় প্রগাঢ়। তার মানে রজনীকান্তের সাহিত্যসহচর ছিলেন তাঁর চেয়ে মাত্র চার বছরের বড়। তারকেশ্বরের কাছে ছড়া-পাঁচালির পর্ব কাটিয়ে ক্রমে তিনি গানের দীক্ষাও নেন। এ সম্পর্কে তারকেশ্বর স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

> তখন সে অল্প অল্প ছোটো সুরে গান করিতে পারিত, ওই গান আমার নিকট বড়োই মিষ্ট লাগিত। আমিও তখন সংগীত বিষয়ে কোনো শিক্ষালাভ করি নাই, শুনিয়া শুনিয়া যাহা শিখিতাম তাহাই গাহিতাম। বৎসরের মধ্যে যে নূতন সুর বা গান শিখিতাম, রজনীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহা তাকে শুনাইতাম, সেও তাহা শিখিত। পরে যখন একটু সংগীত শিখিতে লাগিলাম, তখনও বড়ো বড়ো তাল, যথা চৌতাল, সুরফাঁক প্রভৃতি, একবার করিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিতাম, তাহাতেই সে তাহা আয়ত্ত করিত এবং ওই সকল তালের মধ্যে আমাকে সে এমন কূট প্রশ্ন করিত যে আমার অল্পবিদ্যায় কিছু কুলাইত না।

এই বিবরণ থেকে বোঝা গেল, যাকে বলে সংগীত বিদ্যার ক্রিয়াত্মক শিক্ষা ও তালিম, তা সঠিকভাবে এবং যোগ্য ব্যক্তির কাছে রজনীকান্ত পাননি। গানের এক স্বাভাবিক সংস্কার ছিল তাঁর, ছিল যে-কোনো গান তুলে নেবার স্বভাবপটুত্ব, সুর তাল বিষয়ে ছিল শ্রুতিবাহিত মোটামুটি ধারণা। এই সব নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর গানের সীমায়িত বিশ্ব। তাই তাতে নিরীক্ষা কম, সাহস কম, স্বৈরতা একেবারেই নেই। সেই জন্যই তাঁর হাসির গানে ভাবনা ও কল্পনার মজা আছে কিন্তু তাতে সুরের কোনো আলাদা নির্মাণ নেই, যেমন আছে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে। সেখানে স্বরস্থানের নানা চকিত ওঠা-পড়া আছে, আছে আকস্মিক দ্রুত চলনের মজা কিংবা রাগরাগিণীর সুরে মিড়ের ব্যবহারে হাসির প্রয়োজনে নাকি কান্না, আর সেই সঙ্গে বিদেশি স্বরসংস্থানে নানা স্কেলে হা-হা-হা হাসি। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের বারো আনা মজা সুরে ও গায়নে।

রজনীকান্তের জীবনবৃত্তান্ত অনুসরণ করলে দেখা যায় তিনি মুখ্যত কবি কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধি ঘটেছে গীতিকাররূপে। উনিশ শতকের এক ধরনের নীতিবাদী কবিতা ও ভক্তিরসের পদ্য তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছিল। সেই জন্য তিনি এমন সব বস্তুবিষয়ে গান লিখে গেছেন যা গীতিরসের তত অনুকূল নয় এবং বিরোধী। যেমন :

১. এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই
এতে ভালো জিনিস একটি নাই।
(এটা তো) অস্থি, চর্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,
মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধময় ক্লেদ।

২. অসীম রহস্যময়! হে অগম্য! হে নির্বেদ!
শাস্ত্রযুক্তি করিবে কি তোমার রহস্যভেদ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ন্যায়তন্ত্র।
বিজ্ঞান পারেনি, প্রভু, করিতে সংশয়োচ্ছেদ।

৩. তুই ঘুরে বেড়াস্ পরিধিতে—
সে যে বসে আছে কেন্দ্রটিতে;
সাধনা-ব্যাসের রেখায় পা দিলিনে মোহের ঘোরে।

এই কি গানের ভাষা? এসব কি গানের প্রসঙ্গ হতে পারে? রজনীকান্তের মধ্যে কোথায় যেন বাস

করতেন এক অমার্জিত আত্মতুষ্ট গ্রাম্য মানুষ; উনিশ শতকের নগরায়ণ, উন্নত সাহিত্যের সংযোগ, রূপবন্ধ বিষয়ে উৎসাহ কিছুই যাঁকে ছোঁয়নি। অথচ অনায়াস ক্ষিপ্রতায় তিনি গানের বাণী লিখতেন এবং তাতে বসিয়ে দিতেন রূপায়ণধর্মী এক সুরের কাঠামো। সব সময়ে সেই সুর যে গানের বাণীর সঙ্গে অত্যাজ্য সম্পর্কে জড়িত তা মনে হয় না। যেমন দেখা যায়, মিশ্র খাম্বাজে বসানো তাঁর প্রসিদ্ধ গান 'কেন বঞ্চিত হব চরণে' বাণী ও সুরে চমৎকার সুষমাময়। অথচ পরবর্তীকালে এই সুরেই 'কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষ্যে' লেখেন 'তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া'। নিজের দৃষ্টি সম্পর্কে কতখানি অসাড় হলে এমন অন্তর্ঘাত করা যায় জানি না। এমন তথ্য থেকে এই কথা নিষ্পন্ন হয় যে গানের বাণী তথা বক্তব্য ছিল তাঁর পক্ষে আদ্য মনোযোগের বিষয়, সুর ছিল গৌণ। সর্বক্ষেত্রেই তাই আগে তিনি গানের কবিতা লিখে পরে সুর দিতেন।

সেইজন্য রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি বা অতুলপ্রসাদের গানের মতো কান্তগীতি আজ আমাদের কাছে কোনো আলাদা সুরবিন্যাসের চারিত্র্য নিয়ে দাঁড়ায় না। হিসেব করলে দেখা যাবে তাঁর প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় গানগুলির মূল আবেদন থিমেটিক। এই রকম তাঁর এক অতি প্রসিদ্ধ গানের নির্মাণের প্রতিবেদন এখানে পেশ করা যায় প্রসঙ্গক্রমে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর লেখা 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি সারা দেশে চিত্তক্ষেত্রকে মথিত করে দিয়েছিল। সেই গান প্রসঙ্গে জলধর সেনের স্মৃতিচারণ এই রকম :

> তখন স্বদেশির বড়ো ধুম। একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি 'বসুমতী' আপিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে রজনী এবং ... শ্রীমান অক্ষয়কুমার সরকার আপিসে আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জিলিং মেলে বেলা এগারোটার সময় কলিকাতা পৌঁছিয়া অক্ষয়কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসের ছেলেরা তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইবে। গানের নামে রজনী পাগল হইয়া যাইত। তখনই গান লিখিতে বসিয়াছে। গানের মুখ ও একটা অন্তরা লিখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই গানের জন্য উৎসুক; সে বলিল—'এই তো গান হইয়াছে, চল জলদার ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা হউক।' অক্ষয়কুমার আমাকে গানের কথা বলিলে—রজনী গানটি বাহির করিল। আমি বলিলাম 'আর কই রজনী?' সে বলিল, 'এইটুকু কম্পোজ করিতে দাও, ইহারই মধ্যে বাকিটুকু হইয়া যাবে।' সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভ করিতে করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুজনেই তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল; রজনী ও অক্ষয় ৩০।৪০ খানা গানের কাগজ লইয়া চলিয়া গেল।
>
> সন্ধ্যার সময়...বসিয়া আছি, এমন সময় দূরে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। গানের দল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। তখন আমরা শুনিলাম, ছেলেরা গাহিতেছে, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।' গান শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছিল; তাহার পর ঘাটে মাঠে পথে নৌকায় দেশ-বিদেশে কতজনের মুখে শুনিয়াছি।

বিস্তারিত বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সবচেয়ে জনপ্রিয় গানটি লেখা হয়েছে কতটাই তাড়াতাড়ি। রজনীকান্তের বেশিরভাগ গানের অন্তঃপ্রকৃতিতে এই ত্বরার চিহ্ন যতটা আছে, পরিমার্জন ও আধুনিকতার লক্ষণ ততটা নেই। এত বিখ্যাত এক গানের কবিতা দু-প্রস্তে লেখার পর সুর সংযোজনের তথ্যটুকু বেশ মজার : জলধর সেন ও রজনীকান্ত এ-গানের যুগ্ম সুরকার। সেই সুরে অবশ্য কোনো চটক বা উন্নত পরিকল্পনার আভাস নেই। নিতান্ত সহজ তালের সরল গান। সকলের গাইবার উপযোগী। সেইকারণে গানটি একসময়ে যেমন মাঠে ঘাটে পথে নৌকায় গাওয়া হয়েছিল এখন আর তা হয় না। তাৎক্ষণিকতার সব রকম স্বভাবধর্মে ভরা এই গান।

একেক সময় তাই মনে হয় রজনীকান্তের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিল তাঁর সমকালীন জনপ্রিয়তা। তিনি তাঁর নিজের গান এত চমৎকারভাবে গাইতেন যার ফলে শ্রোতারা একেবারে আপ্লুত হয়ে পড়তেন। তাঁর গানের সবচেয়ে সমঝদার ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। রজনীকান্তের ব্যক্তিচরিত্রের সারল্য ও প্রমোদপরায়ণতা, তাঁর অনর্গল গায়ন-সামর্থ্য ও ভক্তিভাব এইসব পুরাতন ভাবনার মানুষগুলির মনকে তাঁর প্রতি অনুকম্পায়ী ও প্রশ্রয়শীল করে তুলেছিল। ফলে তাঁরা কেউই কান্তগীতির সঠিক মূল্যনির্ধারণ বা বিচারের নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেননি। তাঁদের সংগীতবোধ সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে পারে। এমনতর শ্রোতাদের সাহচর্যে ও উৎসাহে রজনীকান্ত এতটাই আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর মধ্যে কোনো শিল্পীজনোচিত অতৃপ্তি কখনো দেখা দেয়নি। তার স্বতঃস্ফূর্ত সাফল্য এত সহজে অর্জিত হয়েছে যে গানের ভাবগত ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের সাধনা তাঁর অনর্জিত রয়ে গেল। জীবনে প্রেম বা নিসর্গের গান প্রায় লেখেননি তিনি। নাটক ভালোবাসতেন, নিজে অভিনয়ও করেছেন একসময়ে, অথচ কখনো নাট্যসংগীত লেখেননি বা কোনো নাট্যকর্মী তাঁকে দিয়ে তা লেখাননি। তাঁকে বিরোধ বিতর্কে উজ্জীবিত করেননি কেউ, উদ্‌বুদ্ধ করেননি নতুন ধরনের রচনায়। কখনো নিন্দিত হননি তিনি। সবাই ভালোবাসতেন তাঁকে। মাতৃভক্ত, পত্নীপরায়ণ, সন্তানবৎসল, বান্ধবপ্রিয় ভক্তিমান ও বিনত এই গীতিকার জীবনে শোক ও জীবিকার বৈপরীত্য ছাড়া কোনো মর্মবেদনা পাননি। তাঁর নিজের যেমন কোনো স্ববিরোধ ছিল না, তেমনই ছিল না সাহিত্যিক প্রতিপক্ষ বা সমাজের অন্তর্ঘাত। এই সবই তো শিল্পীকে এগিয়ে দেয়, জেদী করে, আত্মপ্রকাশের একাগ্রতা বাড়িয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল— বাংলা গানের সব সফল সংগীতকারের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তো সারাজীবন বিরোধ-বিদ্বেষ-বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালকেও হতে হয়েছিল একঘরে। অতুলপ্রসাদের জীবন প্রেমে-অপ্রেমে কেবলই মথিত হয়েছে, নজরুল ছিলেন অজস্র বিতর্ক ও উত্তেজনার ভরকেন্দ্র। এইসব উত্তেজিত জায়মান অস্তিত্বের পাশে রজনীকান্তের জীবন ছিল কেমন? অনেকটা তাঁর গানে যেমন আছে :

> নিত্য নিয়তি বলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
> শ্যাম বিটপিদলে, সুরসাল ফল ফুলে,
> পাখী গাহে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায়;
> দ্বিধাহীন অনুভূতি হৃদয়ে রাখিয়া যায়;

তিনি বিশিষ্টভাবে এই দ্বিধাহীন অনুভূতির বাণীকার। রোগশয্যায় তাঁর মনে হয়েছিল তিনি খুব ভালো লেখেন, তাঁর গান সকলে ভালোবাসে তাই বুঝি দয়াল তাঁকে দিয়েছেন ব্যাধি ও বেদনা। বস্তুত ব্যাধি ও মৃত্যু তাঁর পক্ষে হয়েছে শোভন ও সংগত। তিনি জীবিত থাকলে দেখতেন বিশ্বযুদ্ধজনিত বিপুল ক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়, যাতে তাঁর গানের মূলকথা আস্তিক্য ও ভক্তিবাদ টলে যেত। তাঁকে দেখতে হত রবীন্দ্রসংগীতের আশ্চর্য ভুবন এবং নজরুল গীতির অসামান্য জনপ্রিয়তার পাশে তাঁর গানের সীমাবদ্ধতা ও মন্দগতি। অকালমৃত্যুর আশীর্বাদে ইতিহাস বিধাতার কৌতুক তাঁকে সইতে হয়নি।

রজনীকান্তের স্পষ্টত ঘটনাহীন জীবন এবং পঁয়তাল্লিশ বছরের সামান্য আয়ু তাঁকে খুব বড়ো সৃষ্টির সুযোগ দেয়নি। তাঁর জীবন পরিবেশ ছিল বাঁধাধরা, পাননি কলাবৎ গুণীর সাহচর্য। মানুষটি ছিলেন আত্মভোলা, স্বল্পে তুষ্ট, গান-পাগল। মনের মধ্যে সাংগঠনিক বিন্যাস ছিল না, তাই ভবিষ্যতে তাঁর গান কে গাইবে এ-ভাবনা করেননি। পুত্রকন্যারা কেবল জানতেন তাঁর গানের ধরন ও গাইবার কৌশল; আর জানতেন কটা

সাহেব নামে এক ব্যক্তি। তাঁর পরিচয় দিয়ে শান্তিদেবী লিখেছেন : 'ইনি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, সেইজন্য নামের পিছনে সাহেব জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ভালো নাম কেউ জানত না। গায়ের রং চিকন আবলুস কাঠের মতো। ঋজু চেহারা। ইনি রজনীকান্তের গানের ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। রজনীকান্তের প্রায় সব গানই নিজের তহবিলে জমা রাখতেন। রজনীকান্তও তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। পরবর্তীকালে সেই গান কটা সাহেবের মাধ্যমেই দেশবাসী পেয়েছিল। দেশবাসী যখন পেয়েছিল রজনীকান্ত তখন কণ্ঠহারা।' এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, শান্তি দেবীর সন্তান রজনীকান্তের দৌহিত্র দিলীপকুমার রায় কোথা থেকে অর্জন করেছেন তাঁর নির্ভরযোগ্য কান্তগীতি পরিবেশনের দক্ষতা ও আন্তরিকতা।

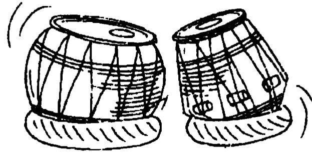
রজনীকান্ত তাঁর রোজনামচায় নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে লিখে গেছেন : 'আমার একটা চেষ্টা ছিল যে, Poetry আর গানে সব class of reader-দের মনস্তুষ্টি করব। এইজন্য average reader-দের জন্য করেছিলাম; একটু higher circle-এর জন্য serious করেছিলাম; আর-এক বিশুদ্ধ আমোদের জন্য comic করেছিলাম।' এই মন্তব্য পড়লে তাঁকে যতটা সচেতন আর্টিস্ট মনে হয় তা অবশ্য তিনি ছিলেন না। তা যদি তিনি হতেন তবে গানের বাণীতে ঘটত বহুল পরিমার্জনা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর গান উত্তরপুরুষদের কাছে কিছুটা বিভ্রান্তি জাগায়। তাঁর গানের প্রকৃত ভাষা কোন্‌টি বা কীরকম তা আবিষ্কার করা কঠিন। এখানে তিনটি নমুনা সাজিয়ে দিচ্ছি।

১ যা ছিল না, হয় না তা আর, যা আছে তাই আছে
এই পাঁচ ভেঙে দশ রকম হচ্ছে, মিশছে পাঁচে।

২ অতল-উচ্চ-চল ঊর্মি-মালশত-শুভ্র ফেনযুত রঙ্গ অধীর;
ভীতি বিবর্ধন তাণ্ডব নর্তন ভীমরোলে করি শ্রবণ বধির।

৩ আমার সাধন বিহঙ্গ শুয়ে বিলাস-আলস্য-নীড়ে
সন্দেহ-পেচক শুধু অন্ধকারে ঘুরে ফিরে;
প্রবেশি' তস্কর-রিপু শান্তিময় মর্ম-গেহে
লুটে মরকত-প্রেম অমূল্য হীরক-স্নেহে
লুটে দয়া-মুক্তা সদ্বিবেক-মানি।

সাবলীল অথবা কৃত্রিমের মধ্যে কোন্‌টি তাঁর আত্মভাষা? মনে হয় কিছুটা আয়ু পেলে শেষপর্যন্ত সমাসবদ্ধ ও রূপকপ্রবণ বাণী আর ভাবের আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে তিনি হয়তো খুঁজে পেতেন নিজের উচ্চারণ। কিন্তু ১৯০৯ সালের মে মাসে কণ্ঠের প্রদাহ নিয়ে রজনীকান্ত রংপুরে গিয়ে পরপর দুই সায়ংকালে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একটানা গান গেয়ে 'রংপুরের বহু লোককে এক মুহূর্তে আপন করে ফেলেন' কিন্তু অর্জন করেন কর্কট রোগ। একবছর মর্মান্তিক যন্ত্রণার শেষে ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। অবিরাম গান গেয়ে যাবার আনন্দ-পরিণামে তাঁর কণ্ঠকেই গানহীন করে দেয়। গান ছিল তাঁর উজ্জীবন তাই তৃষিত মরু ছেড়ে রসাল নন্দনে তাঁর যে যাত্রাপথ, তা ভরা ছিল শোকযাত্রীদের গানে গানে। কোনো বাঙালি গীতিকার এমন গীতময় আন্তরিক প্রত্যুপহার পাননি।



অতুলপ্রসাদের গান

এখন সব বিষয়ে এমন একটা অবিবেচনা আর অসতর্কতার লক্ষণ দেখা যায় যার ফলে বিচার বা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একরকম প্রান্তিক দৃষ্টি এসে যায়। যেমন ধরা যাক, কোনো স্বাভাবিক ভাবনা থেকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রসঙ্গ একসঙ্গে আলোচনাযোগ্য হতে পারে না। দুজনের কৃতি, আদর্শ, সিদ্ধি একেবারে স্বতন্ত্র পর্যায়ের। তেমনই বাংলা গানের পরিচর্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় প্রায় কেউই নেই। তবু রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় অনেকে আনেন দ্বিজেন্দ্রগীতি, কান্তগীতি, অতুলপ্রসাদের গানের প্রতিতুলনা। এদের পারস্পরিক তুলনা বড়োই অসমমাত্রিক। তাই পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ।

বাংলা গানের আধুনিক পর্বে যে চারজনের কথা আমরা উচ্চারণ করি তাঁরা হলেন–– রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩), রজনীকান্ত (১৮৬৫), ও অতুলপ্রসাদ (১৯৭১)। লক্ষ করার মতো তথ্য এই যে ১৮৬১-৭১ এই দশ বছরের বৃত্তে বাংলা গানের নির্মাণ— আধুনিক বাংলা গানের মূল কাঠামোর নির্মাণ হয়েছে। সেই নির্মাণ প্রসঙ্গে একথা মানতেই হবে যে, বাংলা গানের যদি কোনো আধুনিকতা থেকে থাকে তবে তার সূচনা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে এবং এ ধারা এখনো চলে আসছে নতুন নতুন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। এ নিয়ে অবশ্য আমাদের গ্রহণীয়তা বা বিতর্কের শেষ নেই। তবে চলমানতা সম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস আছে। এই চারজনের সংগীতসাধনা যৌথভাবে হয়তো হয়নি, একই লক্ষ্যেও বোধহয় ধাবিত নয়, তবু সুবিধার জন্য একটি উপমা দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে। কামারশালায় কামার যেমন আগুনে-তাতানো গরম-লাল লোহাকে দ্রুত পিটিয়ে পিটিয়ে একটা অবয়ব দেয় তেমনই রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের অনবরত আঘাত বা হ্যামারিং-এর ফলে বাংলা গানের আধুনিকতার একটি রূপ তৈরি হয়েছে। বলতে গেলে এই রূপটিই এখনো পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালির সাংস্কৃতিক-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের আনন্দের উপচিত অংশটুকু যেন আমাদের গান। এখনো আমাদের কোনও ঘরোয়া উপলক্ষে বা সভা-সমিতিতে গান গাইতে বললে আমরা এইসব নির্মাতার গান

গাই। এঁদের ফলবান জীবনপর্বের একশো বছরের অনেক বেশি সময় অতিক্রান্ত— তা সত্ত্বেও এইসব গান আজও আমাদের জীবনে প্রাসঙ্গিক। তার কারণ এমন গানে গভীর আন্তরিকতা আছে,উপভোগ্য মেলডি আছে, সর্বোপরি আত্মনিবেদনের এমন একটা নিগূঢ় সুর ও শমতার বোধ আছে যা আমাদের আধুনিক জীবনে ক্রমশই হারিয়ে ফেলছি। এই ধ্বস্ত, বিচ্ছিন্ন, টেনশনের জীবনে কোনোদিন যদি অন্ধকার ঘরে বসে একমনে অতুলপ্রসাদের একখানি অন্তর্দীপ্ত গান শুনি, তাহলে সারাদিনের বেদনা বিষণ্ণতার পর মনে যেন শান্তির প্রলেপ লাগছে বলে মনে হয়। রজনীকান্তের ভক্তিমুখী আত্মসমর্পণের গানে এই অনুভব আরও প্রবল হয়। তবু আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করব না। তাঁর গানে বৈচিত্র্য ও গভীরতা এত বেশি এবং পৃথিবীর মধ্যে তিনিই একমাত্র গীতিকার যিনি গান নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন,এত সুষম তাঁর গানের লাবণ্য, এত বিচিত্র ও ব্যঞ্জনাময় সেই গানের অন্তঃপুর যে অন্য কোনো গীতিকার তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন না। তাঁর গান কীভাবে গাইতে হবে তা নিয়ে সারাজীবন ধরে ভেবেছেন ও সেভাবে শিখিয়েও গিয়েছেন, তৈরি করেছেন বেশ কিছু দীক্ষিত শিষ্য ও শিল্পী এবং সর্বোপরি গানের তত্ত্ব নিয়ে *সংগীতচিন্তা* নামে একটি বই-ই লিখেছেন বলা যায়। জীবিতকালেই তাঁর গানের নানা সংকলন তৈরি হয়েছে, গান নিয়ে তাঁকে এত ভাবতে হয়েছে যে তাঁর নিজের গানের নতুনত্ব ও বিশেষত্ব বোঝাবার জন্য অনর্গল তিনি কলম চালিয়ে গিয়েছেন। রাগাশ্রয় থেকে মিশ্র রাগিণীকে মিলিয়ে দিয়েছেন, পূর্ব-পশ্চিমের নানা অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দিয়েছেন, মিলিয়ে দিয়েছেন মার্গসংগীতের মতো বাংলা লোকসংগীতকেও—সব মিলে বাংলা গানকে তিনি নতুন দিশার দিকে নিয়ে গেছেন, গানের আধুনিকতাকে স্পষ্ট রূপ দেবার মানসে। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বা যা শুরু করেছিলেন তা থেকে অন্য স্থপতিদের সম্পর্কে আমরা অনুমান করতে পারি। ধরা যাক একটা বড় ইন্দ্রমণির কণ্ঠহার তৈরি হচ্ছে। নানা ধরনের রত্ন যোগ করে যেন সেটিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তার মাঝে আছে একটা দুর্লভ ও মহামূল্যবান নীলকান্তমণি। মনে রাখতে হবে নীলকান্তমণির যে বিভা, যে ছটা, যে সৌন্দর্য ও সুষমা তা নির্ভর করছে বাকি সব পাথরগুলোর বিন্যাসের শিল্পিতার উপর। সব মিলে এক আশ্চর্য বিচ্ছুরণ ও বৈভব সৃষ্টি হচ্ছে বটে, তবু তা থেকে নীলকান্তমণিকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। একটা সোজাসাপটা সাধারণ সোনার হারে নীলকান্তমণিটিকে সেট করলে কিন্তু এমনটি হত না। এবারে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলি রবীন্দ্রনাথ যদি ইন্দ্রমণির হারের নীলকান্তমণি হন তবে সে হারের অন্যান্য মহার্ঘ রত্ন হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ। তাই আধুনিক বাংলা গানের নির্মাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণত জানতে হলে শুধু রবীন্দ্রনাথকে জানলেই চলে না, পাশাপাশি এই মানুষগুলি সম্পর্কেও জানা দরকার।

চেনা-জানার পরিধির মধ্যে এমন অনেককেই আমি সুনিশ্চিতরূপে জানি যাঁরা অতুলপ্রসাদকে খুব ভালো করে জানেন, অতুলপ্রসাদের গান তাঁদের হৃদয়ের গান এবং তাঁরা সে গানের স্পর্শে সঞ্জীবিত হন। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর জীবনকাহিনি এবং তাঁর মূল লড়াইটা সম্পর্কে অনেকে ততটা জানেন না। গানকে নিয়ে তাঁর যে সংগ্রাম— সংগ্রাম শব্দটি এখনকার দিনে খুব খেলো হয়ে গিয়েছে— তাঁর সেই যে আত্মসংগ্রাম, আত্মদীক্ষা— একজন মানুষকে যখন আত্মপ্রকাশ করতে হয় তখন তাঁর ভিতরকার যে লড়াই সেটা অনেক সময় অনুক্ত থেকে যায়। বস্তুত অতুলপ্রসাদের জীবনের তথ্য আমরা খুব কমই জানি—তাও যদি তাঁর জীবনটাকে 'বায়োগ্রাফিকাল স্ক্রিপ্ট'-এর মতো মোটামুটি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরি এবং বোঝার চেষ্টা করি তাহলে অন্তত খানিকটা অনুধাবন করা যাবে তাঁর গান কেন এমন হল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে এমন একটা ধারণা আছে প্রতিভা ইত্যাদি বিষয়গুলি একধরনের ঐশী ব্যাপার, যেন উপর থেকে

পাওয়া আশীর্বাদের মতো। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের যোগ করতে হবে অতুলপ্রসাদের মতো একটা আধুনিক কালের শিক্ষিত লাজুক ধরনের সংবেদনশীল মানুষ, একটা জীবন, তার আধুনিকতা, প্রতি পদে তার উপলব্যথিত গতি, তার মধ্যে থেকে গড়ে ওঠা জীবন-দর্শন, তার যে বিচ্ছুরণ, তা কিন্তু একমাত্র তাঁর কয়েকখানি গানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই সেই মানুষটিকে বাদ দিয়ে তাঁর জীবনকাহিনির বিচিত্র বুনোটটুকু না-জেনে কেন গানগুলি শুনব? তাই আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করব মানুষ অতুলপ্রসাদ সেনকে তাঁর দেশ-কাল সমেত সকলের কাছে তুলে ধরতে।

আসলে অতুলপ্রসাদ সেনের গান গাওয়ার বা রচনার কথাই নয়। এর কারণ কী? তাঁর পিতৃ-পিতামহের যে পরিবেশ তা এখনকার বাংলাদেশের ফরিদপুরের মাদারিপুর পরগনার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের সাধারণ একটি গ্রাম, নাম মগর। সেখানকার সেন পরিবারের কৃষ্ণচন্দ্র সেনের ছিল দুই মেয়ে আর তিন ছেলে। এই তিন ছেলের মধ্যে ছোট ছেলের নাম হল রামপ্রসাদ। বড় ছেলে দুর্গাপ্রসাদ শৈশবেই মারা যান। পিতৃবিয়োগের ফলে মেজো গুরুপ্রসাদ ও ছোট রামপ্রসাদ আশ্রয় ও লেখাপড়ার পাঠ নেন যথাক্রমে দুই দিদি ভবসুন্দরী ও উমাতারার শ্বশুরগৃহে। এই রামপ্রসাদই হলেন অতুলপ্রসাদের পিতা। ইনি এমন এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন যে সেই গ্রাম্য পরিবেশ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে তিনি ডাক্তারিবিদ্যার চর্চা করলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু করলেন। এই কথাটি মনে রাখার যে, তখনকার গ্রাম্য মানুষ তিনি, কলকাতায় এসে ব্রাহ্মসমাজের এনলাইটেনমেন্টের মধ্যে এসে পড়েছেন— চেতনার মুক্তি হচ্ছে, সংস্কারের মুক্তি হচ্ছে, নতুন যুক্তি-বুদ্ধি - আবেগে নতুন যুগ বোঝার চেষ্টা করছেন। এই রামপ্রসাদ পেশায় চিকিৎসক, দীক্ষিত হলেন ব্রাহ্মমন্ত্রে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর তিনি ঢাকায় গিয়ে চিকিৎসা শুরু করলেন। ক্রমে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন। জীবিকায় সফলতা এল। ঢাকার বিখ্যাত ব্রাহ্মভক্ত সাধু কালীনারায়ণ গুপ্তের মেয়ে হেমন্তশশীর সঙ্গে বিবাহ হল। তাঁদের পুত্র অতুলপ্রসাদ এবং তিন কন্যা হিরণ, কিরণ ও প্রভা। অতুলপ্রসাদের বয়স তেরো বছর হওয়ার আগেই অবশ্য তাঁর পিতা মারা যান। কিন্তু মানুষটি চরিত্র ও মননে ছিলেন অসামান্য। তার প্রমাণ তাঁর একটি উক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে (১৮৮৪) তাঁর প্রয়াণের আগে মানুষটি তাঁর স্ত্রী হেমন্তশশীকে বলেছিলেন, 'আমি মারা গেলে তুমি আবার বিবাহ কোরো'। মনে রাখতে হবে সময়টা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক এবং পিতার ওই উক্তি থেকেই যেন অতুলপ্রসাদের জীবনে ট্র্যাজেডির সূচনা। বাবার প্রয়াণের পর অতুলপ্রসাদ আর তাঁর তিন বোন আশ্রয় পেলেন মাতামহের গৃহে।

অতুলপ্রসাদের যখন ষোলো বছর বয়স ঠিক সেই সময়ই তাঁর মা হেমন্তশশী যাঁকে বিয়ে করলেন তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠা দুর্গামোহন দাশ। এই বিয়ে সম্ভব হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের জন্যই, আমাদের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ক্ষেত্রে এমন পুনর্বিবাহে গণ্ডগোল সৃষ্টি হত। কিন্তু এই বিয়ে— যাকে অসম-অস্বাভাবিক বিয়েই বলব, এর ফলে অতুলপ্রসাদের মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম আঘাত লাগল। তাঁর বোনেরা সব ছিলেন বটে, তবে তাঁরা আশ্রয় পেলেন দাদামশায় ও মামাদের কাছে। অতুলপ্রসাদের দাদামশায় ঢাকার সাধু কালীনারায়ণ গুপ্ত নিজে ব্রহ্মসংগীত গাইতেন, গান বাঁধতেও পারতেন। বাউলগানের ঢঙে অধ্যাত্মবিষয়ের গান। ছোট খোল নিয়ে অতুলপ্রসাদ সংগত করতেন এবং দাদুর সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতেন। প্রথাবদ্ধভাবে গান শেখার কোনো খবর অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে কেউ দেননি। তবে সেকালের ব্রাহ্মসমাজে (কলকাতা আর ঢাকায়) তাঁর যাতায়াত ছিল তাই কল্পনা করা যায় যে বহুরকমের ভক্তিগীতি সেই সূত্রেই তাঁর শোনা ও জানা ছিল। ব্রহ্মমন্দিরগুলি ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের স্বতঃস্ফূর্ত সংগীতসত্র। কী জাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে— অতুলপ্রসাদের গানে এই যে লোকায়ত প্যাটার্নটা আমরা পাই, খুব মন দিয়ে

শুনলে বোঝা যায় ওর মধ্যে বাউল কীর্তনের একটা চমৎকার সাংগীতিক ফিউশন আছে। এই ফিউশনটা কিন্তু তিনি ঢাকার পরিবেশ থেকেই পেয়েছিলেন। তখনকার ব্রাহ্মসমাজের গানের মধ্যে শুধুই যে ভারী রাগতালের ধ্রুপদাঙ্গ গান ছিল তা নয়— বাউল-কীর্তনের একটা অপূর্ব মিশ্রণজাত অধ্যাত্ম প্রেম সংগীত ও বৈরাগ্যমূলক গানের ধারাও লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মসমাজের গানের গঠন ও স্বরলিপি নিয়ে আমরা বিশেষ কাজ করিনি। ব্রাহ্মসমাজের গানকে আমরা নিছক ধর্মীয় সংগীত বলে সরিয়ে না ফেলে যদি আজ তার সাংগীতিক পরিচয়টি নতুন করে দেখি তাহলে দেখা যাবে ওর মধ্যে বাউল-কীর্তনের ফর্ম আছে, যেমন তার একটা অংশ ধ্রুপদাঙ্গ যা রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়ির লোকেরা নিয়েছিলেন। বাউল-কীর্তনের একটা চমৎকার মিশ্রণ অতুলপ্রসাদের গান শুনলে বেশ বোঝা যায়। আসলে মানুষটা ওই গানের পরিবেশে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছেন।

মামারা ষোলো বছর বয়সের অতুলপ্রসাদকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে আনলেও মাকে তিনি অসম্ভব ভালোবাসতেন। মায়ের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা ছিল জীবনের মস্তবড় একটা সংবেদী অংশ। মা-র পুনর্বিবাহে তাই অতুলপ্রসাদের জীবনে একেবারে বিপর্যয় ঘটে গেল, লাজুক যুবকটি যেন আরও গুটিয়ে গেলেন সন্তপ্ত বেদনায়। এককথায় তাঁর জীবনটা অস্বাভাবিক হয়ে গেল। তাঁর নতুন পিতা ও তাঁর মা দুজনেই অতুলপ্রসাদকে কাছে টানলেন, কিন্তু তিনি যেতে পারলেন না। তিনি মামার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়লেন। এরপর তাঁর সেজোমামা বেশ টাকাপয়সা খরচ করে অতুলপ্রসাদকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন। ১৮৯০ থেকে ৯২ এই দু-বছর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে বিলেত যান ব্যারিস্টারি পড়তে। তখন তাঁর বয়স ২১। মাত্র দু-বছর তিনি কলেজে কী কোর্স পড়েছিলেন? আই.এ না বি.এ? সেকালে গ্র্যাজুয়েট না হয়েও ব্যারিস্টারি পড়া যেত। যেমন পড়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি ও জিন্না। যখন ব্যারিস্টারি পড়তে যাচ্ছেন তখন ভেনিসের গন্ডোলাচালকের কণ্ঠে গান শুনতে শুনতে সেই সুর থেকে 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' গানটি তিনি কম্পোজ করে ফেললেন। কিন্তু এর আগে তাঁর গান রচনার কোনো খবর পাই না আমরা। বস্তুত তাঁর গানের কোনো কালক্রমও পাওয়া অসম্ভব। 'উঠো গো ভারতলক্ষ্মী' গানটি শুনলে ওর মধ্যে যে বিদেশি সুরের চলন আছে তা বোঝা যায়। আমাদের বাংলা গানের যাঁরা রূপ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ— এই তিনজনের গানের মধ্যে কমবেশি একটা বিলিতি সুরের চলন আছে। লক্ষণীয়, প্রত্যক্ষ বিলিতি গান শোনার অভিজ্ঞতা তিনজনেরই হয়েছে এবং তিনজনের ইংল্যান্ড যাওয়ার ব্যাপারটায় কোথায় একটা যোগ আছে। রজনীকান্ত এই সুযোগটা পাননি বলে তাঁর গান অনেকটাই বাঙালি গান, তাঁর মধ্যে দেশি বিদেশি গানের সমন্বিত নিরীক্ষা নেই।

যাই হোক অতুলপ্রসাদ যদিও বিলেতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বিলিতি গান শিখেছিলেন এ-কথা বলা যায় না। সে সময়ের বিখ্যাত গায়িকা মাদাম প্যাটের গান তাঁর ভালো লাগেনি। যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ গান শিখেছিলেন, যে অর্থে দ্বিজেন্দ্রলাল টাকা খরচ করে বিলিতি গান শিখেছিলেন, এমনকি দ্বিজেন্দ্রলাল গলায় মডিউলেশন ও বিশেষ স্বরক্ষেপ পর্যন্ত শিখে এসেছিলেন, সেদিক থেকে বিচার করলে অতুলপ্রসাদ কিন্তু অনেক বেশি ব্যাপৃত ছিলেন জীবিকা নিয়ে, ভবিষ্যতের ভাবনা করা জীবন নিয়ে। এ সময় চলছে তাঁর কোমল মনের উপর ঘোর দোলাচল। আত্মসংকটের এমন পর্বে শান্তভাবে বিলিতি গান শোনা বা শেখার মন বা অবসর কই? ব্যারিস্টারি পড়ার চাপ তাঁর তিন বছরের জীবনে খুব একটা স্বস্তিকর ছিল না। অনূঢ়া তিন বোনের ভাবনাও ছিল। ভাবছেন আমাকে বাঁচতে হবে, আমাকে নিজের জীবন তৈরি করতে হবে, আমাকে লড়াই করতে হবে। তিনি যখন ব্যারিস্টারি পড়ছেন তখন তাঁর সঙ্গে আর যে তিনজন ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়ছেন তাঁদের নামগুলি জানলে চমকিত হতে হয়— চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ এবং

সরোজিনী নাইডু। এই সময় এবং ওই ব্যক্তিদের যোগাযোগটা মাথায় রাখলে অতুলপ্রসাদের গানে স্বাদেশিকতার সূত্র কতকটা ধরা যায়। এইরকম আশ্চর্য স্বদেশসেবকদের সঙ্গে তিনি তাঁর যৌবনের প্রথম দিনগুলি কাটিয়েছেন। বলা বাহুল্য অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জন-সরোজিনী যেখানে আছেন সেখানে অতুলপ্রসাদ স্বদেশদীক্ষা ছাড়া আর কী পেতে পারেন? তবে তাঁর গানে স্বদেশি মন্ত্রটা খুব সহজে এসে গেলেও সেই অর্থে কখনো তিনি স্বদেশি আন্দোলন করেননি, যেমন করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত। বলা যায় তাঁর গানের মধ্যে স্বাভাবিক যে স্বাদেশিকতা তার কারণ হচ্ছে এসব মানুষের সংস্পর্শ, যেমন দিলীপকুমার রায়ের গানের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব খুব বেশি পড়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁরা সহপাঠী ছিলেন, একসঙ্গে লন্ডনেও ছিলেন। স্বাদেশিকতা ছিল তাঁদের রক্তগত।

১৮৯৫ সালে অতুলপ্রসাদ যখন এ-দেশে ফিরে এলেন— ফিরে এসে কলকাতায় ওকালতি ব্যবসায় বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। অতুলপ্রসাদের প্রবাস জীবনে একবার তাঁর বড়মামা কে.জি.গুপ্ত বিলেতে যান মেয়ে হেমকুসুমকে নিয়ে। প্রবাসী নিঃসঙ্গ অতুলপ্রসাদ এবং হেমকুসুম সহসা জড়িয়ে পড়েন হৃদয়ের টানে। জেদি একরোখা হেমকুসুম পরিণয় প্রস্তাবে অটল থাকেন। মামার বাড়িতে ওঠে ঝড়। যেহেতু ভাইবোনের সম্পর্ক, কোনোভাবেই বিবাহযোগ্য নয়, তাই অতুলপ্রসাদ একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন। স্কটল্যান্ডের একটি বিশেষ গ্রামে (গেটনাগ্রিন) এইধরণের বিবাহ আইনসিদ্ধ ছিল। সেই গ্রামে গিয়ে তাঁরা রেজিস্ট্রি বিবাহ করলেন ১৯০১ সালে। তাঁদের দুটি যমজ সন্তান হল— দিলীপ আর নীলিপ। কিন্তু লন্ডনের প্রচন্ড ঠান্ডায় উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে নীলিপের মৃত্যু হল। এই দুঃখ কোনোদিনই হেমকুসুম ভুলতে পারেননি যে দারিদ্র্যের জন্য যথাযোগ্য ঠান্ডানিরোধক বস্ত্র না থাকায় তাঁদের সন্তান মারা গিয়েছে। হেমকুসুমের পরবর্তী জীবনের যে মানস জটিলতা যার জন্য তাঁর স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া ও একত্রবাসে বাধা পড়েছিল—তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, নিজের পিসিকে শাশুড়ির ভূমিকায় মেনে নেওয়ার জটিলতা। দ্বিতীয়ত, নিজেদের সামাজিক নীতি বিগর্হিত বিবাহ এবং সেই কারণে পিত্রালয় থেকে বিচ্ছিন্নতা। তৃতীয়ত অসচ্ছল প্রবাসজীবনে সন্তানের মৃত্যু। এইসব টানাপোড়েনের ফলে তাঁর মনে হয়েছে সমস্ত পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, জীবন থেকে দু'জন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এই সময়ে অতুলপ্রসাদের এক মুসলমান বন্ধু ব্যারিস্টার মমতাজ হোসেন তাঁকে লখনউ গিয়ে সেখানে প্র্যাকটিস করার পরামর্শ দিলেন। সেইমতো অতুলপ্রসাদ লখনউ চলে গেলেন। সেখানেই ১৯০২ থেকে ১৯৩৪ অর্থাৎ আমৃত্যু তাঁর জীবন কেটেছে। বত্রিশ বছরের দীর্ঘ প্রবাসী জীবন।

এইখানে মনে রাখতে হবে তাঁর জীবন তো মাত্র তেষট্টি বছরের। তুলনামূলকভাবে একটু বলে রাখি যে, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবৎকাল পঞ্চাশ বছরের আর রজনীকান্তের মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের। আর রবীন্দ্রনাথের জীবন হচ্ছে আশি বছরের। এই তথ্যগুলি মনে রাখবার। রবীন্দ্রনাথের গানের যে এত পূর্ণতা তার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘজীবনের এই ব্যাপ্তি খুবই জরুরি। শান্তিনিকেতনের জীবন, তাঁর নানারকম নিরীক্ষা, তাঁর নানারকম সাংগীতিক সাহচর্য, ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ, এগুলি সব ভুলে গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বড় করে ফেলেছি। এবার রজনীকান্তের কথা ধরা যাক। নিঃসঙ্গ, গ্রামের মানুষটি মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর জীবনে এমনকী সাংগীতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন, আমাদের বাংলা গানকে কত আর দিতে পারবেন। এবার দ্বিজেন্দ্রলালের কথা। অসামান্য প্রতিভাবান এই মানুষটি মাত্র পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষের দশ বছর তিনি তাঁর নিতান্ত অসহায় ও শিশু একটি পুত্র ও একটি কন্যা, দিলীপকুমার ও মায়া—সেই মাতৃহারা সন্তানদের জন্য ব্যয় করেছেন। পরিচারিকার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। ছেলেটি

হয়তো না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অফিস থেকে ফিরে সেই ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে বসে থাকতেন। লোকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে একটিকে দেখিয়ে বলতেন 'যথা', অন্যটিকে 'সর্বস্ব'। এই যথাসর্বস্বকে নিয়েই তাঁর জীবনের শেষ দশটি বছর কেটেছিল। সন্ন্যাসরোগে মৃত্যুর আগে এই বছরগুলি এত করুণ ও মর্মন্তুদ ছিল যে গান রচনার শান্ত ও সৃষ্টিময় আনন্দের রসদ তাঁর জীবনে অবশিষ্ট থাকেনি। সেইসময় তিনি নাটকের জন্য গান লিখছেন। একসময়ে মাদকে আশ্রয় নিয়েছেন। এইরকম একটা দ্বিধাচ্ছন্ন মানুষ পঞ্চাশ বছর বয়সে চলে গেলেন। রজনীকান্ত নিরন্তর গান গাইতে ভালোবাসতেন, অনবরত গান গাইতে গাইতে তাঁর গলাতেই ক্ষত হয়ে গেল এবং তিনি মারা গেলেন কর্কটরোগেই। তখন কর্কটরোগের কোনোরকম ফলপ্রদ চিকিৎসাই বেরোয়নি— মেডিক্যাল কলেজে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অতুলপ্রসাদের জীবনের তেষট্টি বছরের মধ্যে শেষ বত্রিশ বছর তিনি ছিলেন লখনউয়ে প্রবাসী বাঙালি। তাঁর গান যে বাংলাদেশে সেভাবে প্রচারিত হয়নি তার প্রধান কারণ তিনি প্রবাসী। তেমনই দিলীপকুমার রায়ের গান যে আমরা বিশেষ শুনিনি তার কারণ তাঁর সমস্ত জীবনটাই প্রায় পণ্ডিচেরি আর পুনাতে কেটে গিয়েছে। এইভাবে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী— তুলনা করলে আমার মনে হয় যে আমরা অমিয় চক্রবর্তীকে একটু কম পড়েছি, ওই প্রবাসী হওয়ার কারণেই। বস্তুত এইরকম প্রবাসীর জীবন আর আমাদের কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের জীবনে একটা ফারাক আছে। তবু কবিতার প্রচারের অবলম্বন যেহেতু বই তাই তার দেশে দেশে প্রচার সম্ভব। কিন্তু গানকে ছড়াতে গেলে লাগে শিষ্য-প্রশিষ্য এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গায়নসম্প্রদায়। লখনউ-য়ে বাস করে অতুলপ্রসাদ কেমন গান লিখেছেন, কেমন সুরে ও ঠাটে তা এতদূর থেকে বঙ্গবাসী টের পাবে কী করে?

অতুলপ্রসাদ যখন লখনউতে থাকতেন তখন তিনি সেখানে খুব ভালো ঠুংরি শিল্পী— কালকাদীন, বিন্দাদীন প্রমুখের গান খুব মন দিয়ে শুনতেন। তখন লখনউতে যেসব বিখ্যাত সানাইবাদক যেমন তামিল হুসেন বা বড় বড় ওস্তাদ ছিলেন অতুলপ্রসাদ যে শুধু তাঁদের গানবাজনা শুনতেন তাই নয়, তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এসে মেহফিল করতেন। তাঁকে গানবাজনা শোনাতে আসতেন নবাব আলি, আহমদ খলিফ খাঁ, ছোটে মুন্নে খাঁ, বরকত আলি খাঁ, আবিদ হোসেন। লখনউতে তখন অতুলপ্রসাদের পরিচয় ব্যারিস্টার এ.পি. সেন। অসম্ভব সফল ব্যারিস্টার এ.পি. সেন আইনজীবী হিসাবে প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন। দয়ালু ছিলেন। খুব খেতে ভালোবাসতেন মোগলাই খানা। অথচ হজমশক্তি ছিল খুব কম। রসিকতা করে বলেছেন,'আমার রুচিটা হচ্ছে মোগলাই, আর পেটটা হচ্ছে বৈষ্ণব'। বৈষ্ণবের পেটে তো আর মোগলাই খানা সহ্য হয় না, তাই প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। গান পাগল এই মানুষটির প্রধান বন্ধু ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্যজন শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর। ভাতখণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, মাঝে মাঝে আসতেন আবদুল করিম খাঁ। লখনউ মরিস কলেজে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং রাধাকুমুদ-রাধাকমলের মতো মননজীবীরা ছিলেন তাঁর বন্ধু। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে যে একটা বুধমণ্ডলী, যেখানে বাঙালি intellectual-রা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের দিন কাটত। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে,অতুলপ্রসাদ গান গাইতেন, গান শুনতেন, আমরাও গান শুনতাম। উনি শতরঞ্চিতে বসে গান শুনতেন আর মুখ দিয়ে 'ওয়া! ওয়া!' করতেন। গান এত ভালো লাগত যে শতরঞ্চিটা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে যেতেন, এগিয়ে একেবারে শিল্পীর সামনে চলে যেতেন। এত গান পাগল ছিলেন যে কতদিন মহফিলের টানে তিনি ওকালতিতেও ফাঁকি দিতেন। গানের জন্য প্রচুর রোজগারের সুযোগও ছেড়ে দিতেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে বলতেন—'শোনো, গান যখন শুনি আমি তো একদম মাত হয়ে যাই, তুমি তখন আমাকে সামলিয়ো।' বলেই বলেছেন, 'তোমাকেই আবার কে সামলায়'। এ-হেন ব্যক্তি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে উনি তাঁকে নিজের গান শোনাতেন,

রবীন্দ্রনাথের গানও শুনতেন। এই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেনদেন, এর উপর জোর দেব এইজন্য যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন গীতিকারের সান্নিধ্য তিনি পাচ্ছেন অথচ তাঁর দ্বারা একটুও প্রভাবিত হচ্ছেন না। যেমন অতুলপ্রসাদের গান শুনলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের গানের যেটা সবচেয়ে বড় লক্ষণ—সঞ্চারীর ব্যবহার— অতুলপ্রসাদ সেই সঞ্চারীর ব্যবহার করেননি। পরপর তিনটি বা দুটি অন্তরা দিয়েছেন যা বাংলাগানের নিজস্ব ধাত। দেখা যাচ্ছে তাঁর গান কোনোভাবেই রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, কি সুরে কি ফর্মে। কেউ কেউ অবশ্য তাঁর গানের বাণীতে রবীন্দ্রবাণীর কিছু তরলিত প্রভাব লক্ষ করেন।

কিন্তু গভীর শোচনার বিষয় হল, ইতিমধ্যে লখনউ-এ বসবাসকালে তাঁর ব্যক্তিজীবনটি একদমই ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। হেমকুসুমের সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক আর কিছুতেই তৈরি হল না— কারণ ঐ অসম বিবাহ এবং হেমকুসুমের বিচিত্র জেদী মানসতা। অথচ একই শহরে তাঁরা থাকতেন আলাদা বাড়িতে। ১৯২৫ সালে তাঁর সংগীতসংগ্রহের প্রথম খণ্ড যখন বের হল তখন মা মুমূর্ষু, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, এককথায় মৃত্যুশয্যায়, অতুলপ্রসাদ সেই মুমূর্ষু মায়ের পায়ের কাছে বইটা নিবেদন করে বলেছেন, 'মা, এই গানের বই তোমাকে দিলাম।' পরে মা হেমন্তশশীর নামে ১৯২৬ সালে নিজের বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'হেমন্ত নিবাস'। লক্ষণীয় এই যে মাতৃময় গৃহ সেখানে কিন্তু স্ত্রী হেমকুসুম কোথাও নেই। অথচ হেমকুসুম ওই লখনউ শহরেই অতুলপ্রসাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আছেন। সেখানে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে অতুলপ্রসাদেরই গান গাইছেন, 'নিদ নাহি আঁখিপাতে, তুমিও একাকী আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে'। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই আত্মকণ্ঠ একটি গানের মধ্যে রয়েছে অথচ দুজনে মিলতে পারছেন না। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

একবার রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের বাড়িতে এসেছেন। কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষে সংবর্ধনা হচ্ছে, এই সূত্রে অতুলপ্রসাদ 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি লিখেছেন। একবার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাড়িতে রয়েছেন বলে হেমকুসুম দিনকতকের জন্য এসে সংসারের হাল ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলে আবার হেমকুসুম তাঁর জায়গায় ফিরে গেলেন। 'আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর/ও গো অনেক দিনের পর' কি এই সময়েই লেখা? একবার দেখা যাচ্ছে, হেমন্তশশী মারা যাওয়ার পর হেমকুসুম এসেছেন। তখন তাঁর পায়ে কিছু একটা হয়েছে, হুইল চেয়ারে ঘুরছেন। ঘুরতে ঘুরতে এক ঘরে এসে দেখলেন হেমন্তশশীর একটা বিরাট তৈলচিত্র টাঙানো হয়েছে। তা দেখে হেমকুসুম বললেন, 'She is still here to guard my house?' বলে ফিরে গেলেন। এই যে তিনি নিজের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে সহ্য করতে পারছেন না, তার জন্য অতুলপ্রসাদের সমস্ত জীবনটা ছিন্ন হয়ে গেল তার অনেক অনুপুঙ্খ উল্লেখ পাওয়া যায়। একদিন ফিটনগাড়ি করে কোর্ট থেকে ফিরে দেখলেন হেমকুসুম স্বামীর প্রিয় যাবতীয় সাহেবি পোশাক— অত্যন্ত শৌখিন স্যুট-প্যান্ট সব একত্রিত করে উঠোনে ফেলে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। তাই দেখে অতুলপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে ফিটন ঘুরিয়ে নিলেন। সেদিনই লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গান 'আমি যাব না যাব না যাব না ঘরে'। সত্যিই তো কোন্ ঘরে যাবেন! তাই মনে হয় অতুলপ্রসাদের জীবনের অনেক গানের উচ্চারণ আসলে হৃদয়ক্ষতের বেদনা ও আততিতে অর্থবহ, সমুদ্রশঙ্খের মতো তার মধ্য দিয়ে যেন সন্তপ্ত হৃদয় বাণীময় হয়ে উঠেছে। তাঁর গানগুলি তাঁর আত্মজীবনের এক-একটি পাপড়ির মতো এবং সম্ভবত এতটাই আত্মসম্পৃক্ত বলে তাঁর গানের সংখ্যা মাত্র ২০৮টি। একেক সময় মনে হয়,বাঙালি শ্রোতা অতুলপ্রসাদের গান খুব ভালোবেসে শুনেছে কিন্তু তাঁর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করেনি। সে কি তিনি প্রবাসী ছিলেন বলে? স্বভাব-লাজুক, আত্মকুণ্ঠ, জীবিকায় সফল অথচ ব্যক্তিজীবনে দুঃখী মানুষটি নিজেকে বেশ

গুটিয়েই রেখেছিলেন। সারাজীবনে গান ছাড়া আর কি কিছু লেখেননি? অন্তত দু-একটি কবিতা? জানা যায় না।

তেষট্টি বছরের জীবন আর ২০৮ খানি গান। এই অঙ্কটা কিন্তু কিছুতেই মেলানো যায় না। অতুলপ্রসাদের গানের সংখ্যা এত যে কম তার প্রধান কারণ স্বপ্রণোদনায় আর কতই বা গান লেখা যায়? গীতিকারকে দিয়ে গান তো তৈরি করিয়ে নিতে হবে, গানের তো উপলক্ষ চাই। রবীন্দ্রনাথের সংগীতজীবন খুটিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে তাঁকে দিয়ে শেষ কৈশোর থেকে বার্ধক্যের চরম পর্যায় পর্যন্ত পরপর গান লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরে, আশ্রমিক পর্বে কত যে উপলক্ষে তাঁকে দিয়ে গান লেখানো হয়েছে, কত যে উৎসবে ও সম্মিলনে। তা ছাড়া গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য পর্যন্ত প্রযুক্ত হয়েছে কত গান—সেসব গানে আছে আত্মনিরপেক্ষ কণ্ঠ। তা ছাড়া ছোটদের পুজোর ছুটির আগে বায়না একখানা নাটকের। গুরুদেব লিখে দিলেন শারদোৎসব, সঙ্গে সঙ্গে গান তৈরি হল। শৈলজারঞ্জন একের পর এক স্লিপ পাঠিয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ গান লিখে গিয়েছেন। বলা যায় তাঁকে সারাজীবন নানাভাবে গানে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন আপনি বেহাগে একটা বর্ষার গান করুন, এবার বাগেশ্রীতে একটা বর্ষার গান করুন—সমানে তাঁকে উত্তেজিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এসব নিয়ে পরিহাস করতেন আবার নানারকম গানও লিখে ফেলতেন। এই যে চারিদিক থেকে অহরহ চাপ—'আপনাকে লিখতেই হবে গাইতেই হবে'— আশি বছর জীবৎকালে তাতে প্রচুর গানের সৃষ্টি হয়েছে। নানা নিরীক্ষা, নানা প্রণোদনা, নানা উৎসব ও ব্যক্তিগত অনুরোধে তাঁকে গান লিখতে হয়েছে সারাজীবন। মৃত্যুর দু-বছর আগে *তাসের দেশ*-এর মতো নাটক লিখেছেন, সুর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন যে, শেষ জন্মদিনে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে তাঁকে বলেছেন, 'আপনি এতরকম গান লিখেছেন এমনকি যন্ত্রের জয়গান করে গান লিখেছেন আর মানুষের জয়গান করে একটি গান লিখবেন না?' তখন আশি বছর বয়স। 'ঐ মহামানব আসে' গানটি সেই অনুরোধে লিখলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ সমকালের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর মনে হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো গীতিকারের মানুষের জয়গান করা একটা গান থাকবে না। এই যে চারিদিক থেকে ঘনিয়ে তোলা গান, রবীন্দ্রনাথের জীবনকে কিন্তু এটাই পরিতৃপ্ত করেছিল। রজনীকান্তের সে অর্থে উদ্‌বুদ্ধ করার মতো কোনো বন্ধুই ছিল না, অতুলপ্রসাদ ছিলেন প্রবাসী এবং তাঁকে দিয়ে কে গান লিখিয়ে নেবে? দ্বিজেন্দ্রলালকে কিন্তু নাটকের প্রয়োজনে এবং স্বাদেশিক আন্দোলনের শরিক হয়ে অনেক গান লিখতে হয়েছে।

অতুলপ্রসাদের সমস্ত জীবন অন্তর্বেদনায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে, একদিকে আইনজীবীরূপে ব্যাবহারিক সাফল্য, অন্যদিকে পারিবারিক ব্যর্থতা। সারাজীবন ধরে একটি অসম সম্পর্ককে ঘিরে অসম লড়াই করে গেছেন। যেন তারের উপর দিয়ে এক পা এক পা করে চলে যাওয়া জীবন অতুলপ্রসাদের। সেদিক থেকে বিচার করলে মাঝে মাঝে মনে হয়, ২০৮ খানি গান লিখেছেন— এই যথেষ্ট। নিজেই তো লিখেছেন : 'কত গান তো হল গাওয়া আর কেন গাওয়াও?' কিন্তু এই গানের অন্তরালে কী বেদনা রয়ে গিয়েছে আজকের দিনে সেটা প্রসঙ্গিক। লখনউতে সে আমলে প্রচুর দাদরা, ঠুংরি শোনা যেত। শোনা যেত বেনারস-ঘরানার গান, তার সঙ্গে শাওন, ঝুলা, হোরি বর্গের লৌকিক গান এবং উত্তর ভারতীয় লচাও ঠুংরির নানারকম নমুনা। অতুলপ্রসাদ এসব গান জীবনে অনেক শুনেছিলেন। তাঁর গানের যদি আমরা সমীক্ষা করি তাহলে দেখব তার বারো আনাই উত্তর ভারতীয় চালে ও সুরের ছাঁচে গড়া, বাকিটা বাংলা। তিনি বাংলা গানে বিদেশির অঞ্জলি দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর জন্য আমরা কী করেছি? তাঁর ২০৮টি গানের মধ্যে মাত্র ৭১টি গান স্বরলিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই স্বরলিপি করেছেন দিলীপকুমার রায় ও সাহানা দেবী যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা *আত্মীয় ছিলেন। এই স্বরলিপিবদ্ধ গানগুলিই কাকলি নামে দু-খণ্ডে ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়েছিল* (১৩৩৬

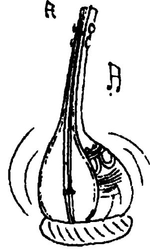
এবং ১৩৩৭ সালে)। এখন আর পাওয়া যায় না। বাঙালির শ্রদ্ধেয় মানুষদের সম্পর্কে উত্তরাধিকারবোধ এত শোচনীয় যে একজন গীতিকারের ২০৮টি গানের মধ্যে ৭১টি রক্ষা করে বাকিগুলি আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি। ফলে ভবিষ্যতে কোনোদিন জানাও যাবে না কেমন ছিল তাঁর অন্তত শতাধিক গানের রূপ।

পরে, ব্রাহ্মসমাজ থেকে নীহারবিন্দু সেনের সম্পাদনায় অতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপি বই *কাকলি* বেরিয়েছে (যার মোট ৬ খণ্ডে ১২০টি গান ছিল)। সে-বই কি এখন পাওয়া যায়? এ ছাড়া গায়ক সুরকার সন্তোষ সেনগুপ্ত অতুলপ্রসাদের ১২ খানি গানে সুর দিয়ে প্রচার করেছিলেন। সেসব গান রেডিয়োতে সম্প্রচারিত হয়েছে, রেকর্ডেও গাওয়া হয়েছে— কেউ ধরতে পারেননি যে সেসব গান অতুলপ্রসাদের দেওয়া সুর নয়। এ ব্যাপারে সন্তোষ সেনগুপ্তের বক্তব্য :

> অতুলপ্রসাদের যেসব গানের কোনো প্রামাণ্য সুর পাওয়া যায়নি— যেসব গান শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় মুদ্রিত হয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে— তাতে যদি নবতর সুর সংযোজন করে পুনর্জীবিত করা যায় এবং তা যদি রসোত্তীর্ণ হয়— যদি তাতে অতুলপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবং সংগীতরসিক সমাজ তা যদি গ্রহণ করে— তাতে আপত্তি করবার হয়তো কিছু নেই, একমাত্র গোঁড়ামি ছাড়া। বিচারের ভার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সন্তোষ সেনগুপ্তের কথাগুলির সারবত্তা আছে কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি? মাত্র ২০৮খানি গান যিনি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে ২০ থেকে ২৫ খানি গানও কি আমরা এখন আর গাই? সন্তোষবাবুর সুরারোপিত ১২খানি গানের মধ্যে কটাই বা প্রচলিত হয়েছে? বাঙালি বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি ঠিকই কিন্তু গানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে উত্তরপুরুষের গায়ন ও শ্রবণের উপর, গানের ভালোমন্দের উপর তত নয়। নিরপেক্ষ বিচারে মনে হবেই যে, অতুলপ্রসাদের গানে সুরের বৈচিত্র্য কম, বাণীর দুর্বলতা প্রবল, খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক এবং আঙ্গিকের মুক্তধারা অনেকটাই অনুপস্থিত। এসবের কারণ কী? কারণ হল তাঁর গান লিরিকের ধর্ম থেকে মুক্তি পায়নি। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত গান রচনার পাশে বহুতর কবিতা (রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন বহু নাটক ও নাট্যসংগীত) এবং হাসির গান লিখেছেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ শুধুই লিখেছেন গান এবং তাও যৎসামান্য। তাতে নাটকীয়তা কম, কি সুরে কি ভাবে। আত্মভাবনায় তা পরিকীর্ণ, আত্মপ্রশ্নে তা আর্ত। 'একা মোর গানের তরী', 'ওগো নিঠুর দরদী', 'কে আবার বাজায় বাঁশি', 'চাঁদনী রাতে কে গো আসিলে', 'আমার মনের ভগ্ন দুয়ারে' বা 'কে হে তুমি সুন্দর' জাতীয় হার্দ্য রোমান্টিক বিরহ বেদনার বেশ কটি গানের জন্য তাঁকে আমরা মনে রাখব। মনে রাখব অন্তত পাঁচ-ছটি অবিস্মরণীয় স্বদেশি গানের জন্যও।

তাহলে সবদিক বিবেচনা করে আজ, এতদিন পরে, আমরা অতুলপ্রসাদের গানকে খুব কি উচ্চাসন দিতে পারি? অন্তত রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সঙ্গে কি এক নিঃশ্বাসে তাঁর নাম উচ্চারণযোগ্য? সংখ্যাগতভাবে ও বৈচিত্র্যে তো নয়ই, এমনকি পরবর্তীকালের গায়ক সমাজের সমাদরের প্রশ্নেও কথাটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ক'জন বড় পারফরমার অতুলপ্রসাদের গান গেয়েছেন বা গাইছেন? তাঁর গানের ধরন কতটাই বা আধুনিক বাংলা গানকে সঞ্জীবিত ও প্রভাবিত করেছে? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, তাঁর গান সুরের দিক থেকে কতটা মৌলিক? তাতে কি প্রধানত উত্তর ভারতীয় ঠুংরি ও গজলের ঢং অনুসৃত হয়নি? বাংলা গানে অতুলপ্রসাদ নিঃসন্দেহে একটি নতুন তার বেঁধে গিয়েছেন, যোগ করে গিয়েছেন এক সন্তপ্ত বেদনাতুর আত্মকণ্ঠ, ভক্তিবিনত এক ধরনের নম্রতাও—কিন্তু সামগ্রিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তাঁর গান আজ অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক। তাতে সচল মনের লীলা নেই, নেই স্ববিরোধী সত্তার আর্তনাদ। 'চিরসখা ছেড়ো না'-র মতো মর্মস্পর্শী আধুনিক উচ্চারণ কি তাঁর গানে একটাও আছে?



রূপে বর্ণে ছন্দে

বাংলা গানের ইতিহাসে দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) একমাত্র গীতিকার-সুরকার-গায়ক, যাঁর ছিল তিনপুরুষের গীতিপরম্পরা। পিতামহ কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কলাবন্ত গায়ক। *গীতমঞ্জরী* নামে গানের বইতে তাঁর গান রচনা ও সুরকৃতির উচ্চস্তরের উদাহরণ রয়েছে। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন যশস্বী গায়ক, গীতিকার ও সুরকার। নাট্যসংগীত ও হাসির গানে তাঁর দক্ষতা ছিল কিংবদন্তীর মতো প্রসিদ্ধ। সব অর্থেই তিনি ছিলেন কম্পোজার বা সংগীতস্রষ্টা, যেমন কম্পোজার রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলাল সাবেকি রীতি মেনে রাগ-রাগিণীর বাঁধা ছকে বাণী ঢালাই করেন নি, বরং গানের বাণীর আভায় সুরের আসনখানি পেতেছিলেন। রাগ-রাগিণী তাঁরা এড়িয়ে যাননি, পেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের রচিত গানের কথা ও সুরে আমরা গানের আধুনিকতা ব্যাপারটা প্রথম বুঝতে শিখি, যে-আধুনিকতার মূলকথা ব্যক্তিতন্ত্র এবং সুরমিশ্রণের সাহস। দেশি-বিদেশি সুরকারুর সমন্বয় তাঁদের গানে এমন একটা আলাদা গোত্রচিহ্ন ফুটিয়ে তোলে, যা পরবর্তী বাংলা গানকে সাবালক করে দেয়। দিলীপকুমার রায় পরম্পরাসূত্রে কার্তিকেয়চন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ধারাবাহী কিন্তু তাঁর গানের বনিয়াদ, ধরন ও চলন একেবারে অন্যরকমের। ঐতিহ্যের চেয়ে ব্যক্তিপ্রতিভা তাঁর গানে অনেক বেশি। তাঁর গায়নরীতি, যাকে 'দৈলীপি ঢঙ' বলে, বাংলা গান অত্যন্ত নতুন এবং অনুকৃতিবর্জিত। স্বচ্ছন্দ, স্বতোচ্ছল সুরময়তায় আচ্ছন্ন তাঁর গান সাবলীল কিন্তু গায়নের পক্ষে আয়াসসাধ্য। দিলীপকুমারের গান কণ্ঠলাবণ্য ও কণ্ঠবাদনের বিপুল সামর্থের ব্যাপক কিন্তু অন্যের পক্ষে ততটা আয়ত্তাধীন নয়। তিনি ছিলেন সংগীতের সাধক ও তত্ত্বদর্শী। গানের সরণি বেয়ে তাঁর আত্মদর্শনের নানা ধাপ পার-হওয়া, গানের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে এগিয়ে দেয় ঐশ অনুভূতির গহন আনন্দে। 'তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন' অতুলপ্রসাদের এমনতর অনুজ্ঞা তাঁর নিজের জীবনে সত্য হয়নি, হয়েছে তাঁর অনুজকল্প সখা দিলীপের জীবনে। 'স্মৃতিচারণ' বইতে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে দিলীপকুমার লেখেন :

> পিতৃদেব সুগায়ক ছিলেন একথা বলা চলে শুধু এই হিসেবে যে, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ ও মধুর। কিন্তু গানে তাঁর গলা অল্প অল্প খেললেও তিনি 'গাইয়ে' বলতে যা বোঝায়—অর্থাৎ সুরের হাওয়ায় উড়ে চলা যায় স্বধর্ম—তা তিনি ছিলেন না...। পিতৃদেব স্বধর্মে ছিলেন সুরকার—এবং প্রথম শ্রেণির সুরকার।

পুত্রের নির্মোহ বিশ্লেষণে পিতার মূল্যনিরূপণ একেবারে নিখুঁত কিন্তু এমনতর মন্তব্য থেকে আমরা একটা অন্য নিগূঢ় ইঙ্গিত খুঁজে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত সুরের হাওয়ায় উড়ে চলার পন্থী ছিলেন না, অতটা সময়ই বা তাঁর জীবনে ছিল কই? আর অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনে গান লিখেছেন তো মোটে দুশো আটটি, সেটাও কি আজীবন গান-গেয়ে যাওয়ার আত্মসংকল্পের সঙ্গে মানায়? বাকি থাকলেন দিলীপকুমারের সমসাময়িক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৯৬), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩), তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৭) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন পুরোপুরি শৌখিন শিল্পী কিংবা বিনোদনমুখী। নজরুলই এঁদের মধ্যে একমাত্র আদ্যন্ত গানের মানুষ, গান-পাগল এবং স্বভাবে উদাসী। গানের হাওয়ায় উড়ে চলা হয়তো নজরুলেরও স্বভাবধর্ম ছিল, তবে তাঁর স্বভাবধর্ম তো ছিল সব-কিছুরই হাওয়ায় উড়ে চলা। তাঁর গানের ভ্রমর সৃষ্টির শতদলে বুঁদ হয়ে বসেছিল কবেই বা! তাই তাঁর গান আছে অজস্র, কিন্তু গানের কোনো পরিণতি নেই, তত্ত্ব নেই। সুরের অজস্রতা ও বৈচিত্র্য তাঁর গানে অভাবনীয় কিন্তু নিজস্ব বন্দিশ তাঁর কোন্ গানে—এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। আসলে প্রমত্ত সদাচঞ্চল জীবনযাত্রা আর নানাস্থানী জীবিকার টানে নজরুলের গানের সাধনা কোনো ভরকেন্দ্র পায়নি। বিশেষ করে নাট্যসংগীত নিয়ে তাঁর কোনো আলাদা ভাবনা ছিল না। তাঁর গান সমসাময়িক বাঙালিকে মাতিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাতে সৃজন চিন্তার তেমন গভীরতা আমার দেখি না। তাঁর গান সমকালে ও পরে, অন্যের কণ্ঠকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিরিশের দশকে কলকাতার শ্রোতাদের কাছে নজরুলের গান প্রথম জনপ্রিয় হয়েছিল দিলীপকুমারের গায়নসৌজন্যে।

দিলীপকুমার সারাজীবন ধরে নানাধরনের গান গেয়ে গেছেন। ভজন কীর্তনের পাশাপাশি মৌলিক বাংলা গানের বিচিত্রচারী তাঁর সুর করা সুর আমাদের অভিভূত করে। 'রূপে বর্ণে ছন্দে' বা 'প্রিয় তোমার কাছে যে-হার মানি'—বর্গের আধুনিক গান তাঁর সৃষ্টিস্বভাবের নৈপুণ্য প্রমাণ করে। প্রধানত তিনি বহুরকম গানের গায়ক এবং গানের ভাবুক। এককালে নজরুল ও হিমাংশু দত্তের গান তিনি নিজে গেয়ে প্রচার করেছেন। কলকাতায় অতুলপ্রসাদের গান তাঁরও সাহানা দেবীর গায়নে প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি পেয়েছে। অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের স্বরলিপিও তাঁর কৃতি। পণ্ডিচেরিতে পরবর্তী সাধক-জীবনে দিলীপকুমারের প্রেরণাতেই নিশিকান্ত হয়েছিলেন গীতিকার। তাঁর বাণীতে দৈলীপি সুর এক অসামান্য ফসল। জীবনের প্রৌঢ়ি-পর্বে ইন্দিরা দেবীর লেখা ভজনে দিলীপকুমার সুর দিয়ে গেয়ে প্রাণসঞ্চার করেছেন। ফলে, সর্বত্র এবং সর্বদা গায়ক দিলীপকুমার সামনের সারিতে এসে যান। কিন্তু বাংলাগানের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে দিলীপকুমার শুধু কি একজন গায়ক? এ-প্রশ্নের জবাবে দিলীপকুমারের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেব। লিখছেন :

> আমাদের বাংলাদেশে তিনশ্রেণীর গায়ক বহুদিন থেকেই সমাদৃত : কীর্তনীয়া, বাউল ও বৈঠকী গায়ক ওরফে ওস্তাদ কালোয়াৎ। আগে কীর্তন বাউল সচরাচর অবজ্ঞাত হত, সম্মান পেতেন ওস্তাদ কালোয়াৎ—ধ্রুপদী ও সঙ্গীতজ্ঞ মহলে খেয়ালী।...বাংলায় হিন্দি ঠুংরি গান অল্প-স্বল্প চালু হয় তখন প্রথমদিকে আমি ভেবেছিলাম যে এর নাম নবসৃষ্টি। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথই আমাকে বুঝিয়ে বলেন—কেন হিন্দি ঠুংরি গায়ককে সুরকার উপাধি দেওয়া যায় না। তিনিই আমাকে নানা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, গানে সুরকার হতে

> হলে সে-গানের মধ্যে সব থেকে আগে থাকা চাই একটি বিশিষ্ট সুরস্বাতন্ত্র্য। আমি প্রথম প্রথম এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করলেও সত্যনিষ্ঠ ছিলাম বলে পরে ভুল স্বীকার করি এ-কথা মেনে যে এমনকি আমাদের এ-যুগের কীর্তনীয়ারাও সুরকার পদবী পেতে পারে না—বাউলরা তো নয়ই—যেহেতু তারা পড়ে পাওয়া সুর শিখেই গেয়ে বেড়াত গ্রামে গ্রামে। পাঁচালী কথকতা জাতীয় গানের বেলায়ও ঐ কথা : নব সুরসৃষ্ট কোনো স্বাতন্ত্র্যই সেসব গানে ফুটে উঠত না।...রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারি প্রভৃতি গ্রাম্য গানের সুরও নিজের নিজের চলতি খাতেই বয়ে চলত—গানের জাতিধর্মকেই ফুটিয়ে তুলে—সুরবৈশিষ্ট্যকে নয়।

এই বোধ আর বিচারপ্রবণতা দিলীপকুমারকে বারবার স্বতন্ত্র করে রেখেছে, শুধু গায়কপরিচয়ে আবদ্ধ রাখেনি। গান গাওয়া তাঁর বিনোদন ছিল না, ছিল চৈতন্যের অংশ। সেইজন্য নানাবর্গের গান গাইতে গাইতে আত্মদর্শন, ভক্তিমার্গ, সুরের নিসর্গ ছুঁয়ে দিলীপকুমারের গান বাংলা গানের ইতিহাসে নিজেকে স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা করে। শুধু বাঙালি শ্রোতা নয়, রোমা রলাঁ, মহাত্মা গান্ধি বা য়ুরোপীয় অনেক শ্রোতাদের শুশ্রূষা দিয়েছে তাঁর গান। এর কারণ তাঁর গান গাওয়া কেবল সুরের অনায়াস নৃত্য, তাললয়ের ছন্দ বা কণ্ঠধ্বনির মাধুর্য নয়, অনেকটাই যেন বোধ ও মননের ব্যাপার। গায়কের সংগীতবোধ সেখানে প্রধান ভূমিকা নিত। এর কারণ গান তাঁর কাছে শুধু আউড়ে যাবার বিষয় ছিল না, ছিল তাঁর মানসতার অঙ্গ, যে-মানস বিদ্যার অনুশীলনে ও রসের স্পর্শে উজ্জীবিত এবং নিত্য নিরীক্ষাশীল।

'গানের মধ্যে থাকা চাই সুরস্বাতন্ত্র্য' এমন প্রতীতি যাঁর ছিল তাঁর রচনা সেই সুরস্বাতন্ত্র্যের সন্ধানী হবে এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু দিলীপকুমারের ক্ষেত্রে অনন্য হয়ে উঠেছিল সংগীত সম্পর্কে বংশগত উত্তরাধিকারের সঙ্গে বিদেশি কণ্ঠমার্জনার কৃৎকৌশল। ফলে তাঁর গানের সুররচনা ও গায়কিতে সুরস্বাতন্ত্র্য ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল কলানৈপুণ্য এমন-কি কোথাও কোথাও কণ্ঠকণ্ডূতি। এতে তাঁর গান অভিজাত ও বিশিষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে তাতে জনপ্রিয়তার অনুষঙ্গ কমে গেছে। দিলীপের গান আমাদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সামগ্রী, অনুপাতে পরবর্তীদের কাছে তেমন অনুকরণীয় বা নবসৃষ্টির ইঙ্গিতবাহী নয়। তাঁর গান যেন তাঁর মতোই নিঃসঙ্গ। বাঙালি সেই গানে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন কিন্তু সে-গান তাঁরা গাইলেন না পরম্পরাগতভাবে।

এমন সব সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য তলিয়ে বুঝতে গেলে আগে দিলীপকুমারের জীবনতথ্য বিশেষ করে সংগীতসাধনার বিবরণ জেনে নেওয়া জরুরি। তাঁর অতি শৈশবে মাত্র ছ'বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, ফলে সংগীতজ্ঞ পিতার সান্নিধ্য তথা দ্বিজেন্দ্রগীতি তাঁকে গীতিসচেতনতায় প্রথম থেকে সজাগ রেখেছে। লালচাঁদ বড়ালদের অর্থহীন তানবাজি যে প্রকৃত সংগীত নয় এ কথা তাঁর পিতা তাঁকে ছোটবেলাতেই বুঝিয়ে দেন। পশাপাশি পিতামহ কার্তিকেয়চন্দ্রের হিন্দুস্থানী সুরের ছকে বোনা গানের মহত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করেন। দ্বিজেন্দ্রগীতির লীলাচপল সুরবিহার এবং ওজঃ গুণ, বাণীপ্রাধান্য ও নাট্যরস তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করে। কিন্তু বাংলা গানের চেয়ে তাঁর মন মজে যায় হিন্দুস্থানী নানা রকম গানে এ রাগ-রাগিণীতে। এ সম্পর্কে তাঁর আত্মপক্ষ এই রকম :

> হিন্দুস্থানী গানে আমার প্রথম অনুরাগ হয় যার অপরূপ খেয়াল শুনে তিনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন পিতৃদেবের বিশেষ বন্ধু।...তাঁর বড় সম্পদ ছিল কণ্ঠলাবণ্য। অমন মিষ্টি কণ্ঠ আমি আর শুনিনি ওস্তাদদের মধ্যে।

এই হিন্দুস্থানী খেয়াল দিলীপকুমারের মধ্যে জেঁকে বসে এবং তিনি তানের রসে প্রমত্ত হন। পিতার সতর্কবাণী সত্ত্বেও তানবাজি তাঁকে গ্রস্ত করে। লিখেছেন :

> আমি গানের ও বিশেষ করে আমার তানবাজির প্রতিভার জন্যে বহুলোকের কাছে স্তুতি পেয়ে বেশ একটু অহংকারী হয়ে উঠি।..,তানবাজির দরুন আমার মাথা গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাগানে তানের বেশি অবকাশ না পাওয়ার ফলে হিন্দুস্থানী গানে আমার ভক্তি যতই ঘাড়তে লাগল ততই বাংলাগানে এসে গেল অবজ্ঞা।

শৈশবে মার মৃত্যু হলেও পিতার সান্নিধ্য ও স্নেহ বাৎসল্যে তাঁর কৈশোর ভরে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের উদারপন্থা ও উদারস্বভাব দিলীপকুমারের স্বাধীন মনের যথেচ্ছ বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। নানারকমের বই পড়া, তর্ক করা আর বহুতর গানের সংসর্গ তাঁকে সমৃদ্ধ করে। পড়াশুনাতেও ছিলেন মেধাবী। ইত্যবসরে পিসতুতো দাদা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর প্ররোচনায় বারো-তেরো বছর বয়সে *শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* বইটি তাঁকে অধ্যাত্মপথের সংকেত দেয়, যা পরবর্তী জীবনে হবে তাঁর চিরবন্ধু চিরনির্ভর। পিতৃবন্ধু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কণ্ঠে কীর্তন শুনে তিনি সেই গানের ধারায় ব্রতী হন। এ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণ :

> বাংলা কীর্তনের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবান্ হবার আদি কারণ পিতৃদেবের কীর্তনানুরাগ হলেও আমি ছেলেবেলায় ওস্তাদি সংগীতের এমনি গোঁড়া ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম যে তাঁর মতামত আমার কাছে প্রামাণ্য হওয়া সত্ত্বেও আমার কীর্তনে এত শীঘ্র রুচি হত না যদি সে-সময়ে খগেনকাকার মিষ্টি কণ্ঠের মধুর কীর্তন না শুনতাম।...খগেনকাকার মতন বোদ্ধা আমার কণ্ঠের অনুরাগী ছিলেন—এতে আমার কিশোর আত্মাভিমান বেশ একটু নধরকান্তি হয়ে উঠেছিল বৈকি। তাই বেশ খুশি হয়েই ঝুঁকেছিলাম উচ্চাঙ্গ কীর্তন শিখতে। দেখাই যাক না—কীর্তনে কিছু সুরের পাথেয় মেলে কিনা!

কিন্তু ইতিমধ্যে কেটে গেছে তর্কমুখর বেশ ক'বছর।

> খগেনকাকার সঙ্গে সে-সময়ে আমি তর্ক করতাম বালসুলভ অজ্ঞানতাবশেই যে, সাহিত্যের দিক থেকে কীর্তন পদাবলীর মূল্য থাকলেও সঙ্গীতের দিক দিয়ে হিন্দুস্থানী ওস্তাদি তানালাপের সঙ্গে তুলনাই হয়না।

সতেরো বছর বয়সে দিলীপকুমারের পিতৃবিয়োগ হয়। মাতুলালয়ের স্নেহাশ্রয়ে থেকে তাঁর বিদ্যা ও গানচর্চা স্ফুরিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে প্রথমশ্রেণির সাম্মানিক হয়ে পড়তে যান কেমব্রিজে। কিন্তু এরই ফাঁকে :

> বি. এসসি পাশ করে গণেশ দাস ও রেবতীমোহন সেনের অপূর্ব কীর্তন শুনে অভিভূত হয়ে যখন উচ্চাঙ্গ কীর্তনে তালিম নেব ঠিক করি, তখন খগেনকাকাই আমাকে নিয়ে যান তাঁর গুরু নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়ের কাছে।...তাঁর কাছে উচ্চাঙ্গের কীর্তন শিখতে না শিখতে আমি বুঝতে পারি কীর্তনের মহিমা...আমি দেখতে পাই যে, ওস্তাদি সঙ্গীতের সুরবিলাস আমাদের অন্তরে খানিকটা আবেশ জাগালেও সে-আবেশ স্থায়ী হতে পারে না এই জন্যে যে সে কিছুতেই ভুলতে পারেনা যে সমঝদার শ্রোতার সাড়া তার চাইই চাই। কিন্তু ভজনকীর্তনের বেলায় গুণী রূপান্তরিত হন পরম ভাগবতে।...ফের মনের সেই দোলা সুরু হল : তবে ওস্তাদি গান শেখা কি ছেড়ে দেব?
>
> কিন্তু তাও তো পারি না। শেষে ঠিক করলাম—উপস্থিত সময়কে ভাগাভাগি করে শ্যাম কুল দুইই রাখি—কীর্তনও শিখি, ওস্তাদি গানও শিখি। তারপরে দেখা যাবে।

এমন সংকল্প থেকে তাঁর খেয়াল শেখা শুরু হল বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে. আর টপ্পা চন্দননগরের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

গানের সেই মগ্ন জগৎ থেকে তিনি অবসৃত হলেন ১৯১৯ সালে বিলাতে যেতে হল বলে! এবারে তাঁর সামনে একুশ-বাইশ বছর বয়সে উদ্‌ভাসিত হল গানের এক মহাবিশ্ব—প্রতীচ্য সংগীত। দিলীপকুমার খুব নৈমিত্তিক ভঙ্গিতে লিখেছেন :

> বিলেতে— মানে ইংল্যান্ডে ছিলাম প্রায় দু'বৎসর। এরমধ্যে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়েছি কেমব্রিজে, বাকি সময়টা কখনো লন্ডনে, কখনো নানা রম্যস্থানে, কখনো প্যারিসে সুইজার্লন্ডে. হল্যান্ডে, রাইন উপত্যকায়। তৃতীয় বৎসরে যাই বার্লিনে গান ও জার্মান ভাষা শিখতে। তারপর লুসানো, ভিয়েনা, প্রাগ. বুদাপেস্ত প্রভৃতি নানা শহরে নিমন্ত্রিত হয়ে গান গেয়ে ও গানের সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি ১৯২২-এর শেষে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর য়ুরোপে ভ্রাম্যমাণ হয়ে।

কথাগুলি যত অনায়াসে উচ্চারণ করেছেন দিলীপকুমার কাজটা তত সহজ ছিল না। প্রতীচ্যের শ্রোতাদের সামনে ভারতীয় রাগদারী গান পরিবেশন, এমন-কি বাংলা গান বিশেষত অত তরুণ বয়সে বেশ দুঃসাহসী প্রয়াস। শুধু তো গান শোনানো নয়, বক্তৃতা দিয়ে বিশ্লেষণ করে তার বিশেষ সাংগীতিক ধরন বুঝিয়ে দেওয়া। ভাষাশিক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন ফরাসি ও জার্মান ভাষা। সে ভাষায় বাংলা গান অনুবাদ করে শোনাতেন। মেধাবী যুবক কেমব্রিজে গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপসের প্রথম ভাগ (১৯১৯) এবং পাশ্চাত্যসংগীতে প্রথমভাগ উত্তীর্ণ হন। জার্মানি ও ইতালিতে গিয়ে পাশ্চাত্যপন্থায় স্বরক্ষেপ ও কণ্ঠমার্জনাতেও তাঁর সিদ্ধি আসে। লেখাপড়া শিখতে বিলেত যান, কিন্তু ফিরে আসেন একেবারে গানের মানুষ হয়ে। সুভাষচন্দ্র বসুর মতো রুচিমান ও দেশপ্রেমী সহপাঠীর সান্নিধ্য প্রবাসে তাঁকে আরও পরিশীলিত করে। জাতীয়তাবাদী ও চারণ দ্বিজেন্দ্রলালের সন্তান দেশে ফেরেন স্বদেশের গানের নব জাগৃতির স্বপ্ন নিয়ে। তেইশ বছরের উচ্চাশাসম্পন্ন সাহসী তরুণ গান শুনিয়ে দেন রোমা রলাঁকে তাঁর বাড়ি গিয়ে। কী গান? মালকোষ রাগে 'রাঙা করে রাঙা কমল রাঙা পায়'। গান শুনে রলাঁ মন্তব্য করেন :

> দিলিপকুমার আমাকে সুন্দর দুটি গান শোনালেন—শুনলে অভিভূত হতে হয় বৈকি। গানটির সুরবিহার থেকে ঝরে পড়ছে উন্মাদনা, মিনতি, করুণা—মনকে চমকে দেয়। কখনো কণ্ঠ তারসপ্তক থেকে অবতরণ করে মন্দ্র সপ্তকে, তারপরেই আবার ফিরে আরোহণ করে পুলকোচ্ছ্বাসের স্তরে।

শুধু রলাঁ নয়, বার্ট্রান্ডি রাসেলকে গান শোনান তিনি। পরবর্তীকালে মহাত্মা গাঁধি, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, সকলকেই তাঁর গান নাড়া দেয়। সতেজ গায়কি, আত্মনিবিষ্ট, কলানিপুণ ও সমর্থ সেই রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে চিঠিতে লিখেছিলেন—

> তোমার সুকণ্ঠে হিন্দি, গৌড়ীয় এবং কীর্তন বাউল ধারার ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে—এর প্রভাবের চিন্তা করে আমার মন আনন্দিত।

রলাঁ এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দিলীপকুমারের বেশ-কিছু পত্রবিনিময় ঘটেছিল সংগীতের উদ্দেশ্য আর তত্ত্ব নিয়ে। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবল মতভেদ হয়, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের গায়নে শিল্পীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে। দিলীপকুমার চেয়েছিলাম ভারতীয় গানের প্রচল অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের গানেও তান ও সুরবিহারের স্বচ্ছন্দতা আনতে। রবীন্দ্রনাথ তাতে সায় দেয়নি। তাঁদের দু-জনের পত্রবিতর্ক বেশ স্বাদু ও উপভোগ্য।

দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথের গানের 'সুরে একটা অনড় রূপ বজায় রাখার বিরোধী'। তাঁর দাবি : রবীন্দ্রসংগীতের 'গায়ককে গানের সুরের Variation-করবার স্বাধীনতা দিতে হবে'। তার কারণ 'ভারতীয় গানের ধারার শিল্পী চিরকাল কমবেশি স্বাধীনতা পেয়ে এসেছেন।' তাছাড়া কবিতার মতো গানেরও একটা আবেদন আছে। সেই আবেদন অনুযায়ী গায়ক যদি সুরবিহার করেন তাতে আপত্তি কোথায়? রবীন্দ্রনাথের আত্মপক্ষ :

> তাই বলে কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে?...হিন্দুস্থানী সংগীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যেকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটাভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া-নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ, দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদা-মাটাভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁকি রাখিনি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।

দিলীপকুমার এর জবাবে বলতে চান : রবীন্দ্রসংগীতে তান দেওয়া অসমীচীন কি না তা 'ফলেন পরিচীয়তে'। কেউ যদি রবীন্দ্রসংগীতে তানালাপ দিয়ে গেয়ে দেখিয়ে দেন তার সৌন্দর্য তবে 'সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, হিন্দুস্থানী এ বাংলা গানের মধ্যে যে একটা অনপনেয় গণ্ডি আপনি টানতে চান' তা থাকবে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রয়োগজ্ঞান আবশ্যিক।

আসলে গানের রূপায়ণ বিষয়ে ঐ বিতর্কের সময়ে দিলীপকুমার ছিলেন হিন্দুস্থায়ী গানের পন্থী। তাই তাঁর ধারণা ছিল 'গানের মূল কাঠামোটা বজায় রেখে...ইচ্ছামত স্বরবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে', রবীন্দ্রনাথের গানকে 'একটা নতুন সৌন্দর্যে গরীয়ান' করে তোলা যায়। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি জেনে তিনি লেখেন : 'আপনি এতে করে বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানের caricature নিবারণ করতে পারবেন না।' এবং 'মনে হয় না যে, আপনি শুধু ইচ্ছা করলেই আপনার মৌলিক সুর হুবহু বজায় থেকে যাবে।'

রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের সামঞ্জস্য নিয়েও তাঁর মনে খটকা ছিল। তাই তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন :

> ১. আপনি যেমন সুরের পক্ষে কথাকে ছাড়িয়ে যাওয়াটা অপরাধ বলে মনে করেন, আমিও তেমনি কথার পক্ষে সুরকে দাবিয়ে রাখার দোষ দেখাতে চাই এইমাত্র।
>
> ২. আমার মনে হয় আপনি গানে সুরের যতটা দাবি মানতে রাজি, আমি সুরকে তার চেয়ে বড়ো স্থান দিয়ে থাকি। এটা শুধু আমার তর্কের খাতিরে বলা নয়—এ নিয়ে আমি সত্য সত্যই যাকে বলে একস্‌পেরিমেন্ট করতে করতে নিত্য নূতন আলো পাচ্ছি বলে মনে করি। কাজেই আমার এই অনুভূতিকে কেমন করে অস্বীকার করি?

এ-সব মন্তব্য কেবল সংগীত সমালোচনা নয়, একজন অগ্রজ স্রষ্টার কাজকে আর একজন অনুজ স্রষ্টার বোঝবার প্রয়াস। সে প্রয়াস আসলে নিজেরই পথ কাটার জন্য। রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা গানের ধরন কেমন হবে তা নিয়ে দিলীপকুমারের আবেগ আর আকুতির ক্ষান্তি ছিল না। তাঁর প্রশ্ন ছিল :

> আমি কেবল বলি এই কথা যে, আর-এক শ্রেণীর বাংলা গান কেন সৃষ্টি করা অসম্ভব হবেই হবে যার মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীতের, সম্পূর্ণ না হোক, অনেকখানি সৌন্দর্য আমদানি করা চলবে? আমার সম্প্রতি অতুলপ্রসাদ সেনের কতকগুলি গান শুনে আরও বেশ করে মনে হয়েছে যে, এটা শুধু সম্ভব তাই নয়, এটা হবেই।

অতুলপ্রসাদের প্রসঙ্গে দিলিপকুমারের নাম বাংলা গানের ইতিহাসে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯২২ সালে বিলেত থেকে দেশে ফিরে দিলিপকুমার সারাদেশ ঢুঁড়তে থাকেন ভালো গান আর কলাবন্তদের সন্ধানে। ভ্রাম্যমাণ এই সংগীতপিপাসু সিদ্ধান্ত করেন : 'আমি প্রায় সারা ভারত খুঁজে এত কম ভাল গায়কের গান শুনেছি যে, ভাবলে মনটা বিস্ময়ে ও আক্ষেপে অভিভূত না হয়েই পারে না।' এর থেকে তাঁর অনুসিদ্ধান্ত : 'আমাদের সঙ্গীতের অবস্থা আজ মুমূর্ষ—অশিক্ষিত পেশাদারের হাত সঙ্গীতের সহস্রদল যে প্রস্ফুটিত হতে পার না, এ সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই।' এইরকম এক মানসবেদনার দিনে ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে গিয়ে তিনি পেয়ে গেলেন অতুলপ্রসাদ ও ধূর্জটিপ্রসাদের সংসর্গ ও বন্ধুতা। ধূর্জটি সম্পর্কে দিলীপকুমার সকৃতজ্ঞ মন্তব্য করেছেন :

> ১৯২২ থেকে ১৯২৮ ও আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়।...১৯২৮-এ আমার পণ্ডিচেরি যাওয়ার পর থেকেই ওর সঙ্গে আমার খানিকটা ব্যবধান মতন আসে, প্রধানত আমার ধর্মজীবনের সঙ্গে ওর কোন দরদের যোগ ছিল না ব'লে। কিন্তু ১৯২২ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত আমার সঙ্গীত-জীবনের বিকাশে ধূর্জটির উৎসাহ, সমালোচনা ও দরদী প্রেরণা আমাকে চলার পথে আনন্দ পাথেয় দিয়েছে অঢেল।...আজো মনে পড়ে আমার মুখে নিত্যনতুন খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি ও বাংলা গান শুনে ওর উচ্ছ্বাস, আমার হলক তান, মিড় গমক ও সূক্ষ্ম খোঁচ শুনে ওর মহোৎসাহে মাথা নাড়া।

অতুলপ্রসাদ সেন দিলিপকুমারের চেয়ে ছাব্বিশ বছরের বড় কিন্তু তিনি ছিলেন দিলীপের 'অতুলদা'। পিতৃবন্ধু, তবু মনের সৌকুমার্য এবং স্বভাবের সারল্যে তিনি হয়ে উঠলেন দিলীপের সখা। এবং :

> অতঃপর যা হবার তাই হল—ভবিতব্য—কিনা আমি অতুলদাকে তথা তাঁর গানকে ভালোবেসে ফেললাম, শুরু করে দিলাম তাঁর গানের প্রচার, আমার নান কন্সার্টে গাওয়ানো আরম্ভ করলাম তাঁর নানা সুন্দর সুন্দর গান আমার ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে। অতুলদার গান আমার কাছে ঠিক সময়েই এসেছিল, কেননা, সে সময়ে আমি নানা ওস্তাদের ও বাঈজির কাছে, বিশেষ করে হিন্দি ঠুংরিতেই তালিম নিচ্ছিলাম। তাই বাংলায় ঠুংরির রস পরিবেশন করে আমি নিখর্চায় নাম কিনলাম।
>
> 'নিখর্চায় নাম কিনলাম' বলাটা অবশ্য অত্যুক্তি, কারণ অতুলদার গান প্রচার করতে আমাকে কম খাটতে হয়নি, এমন-কি স্বরলিপিও করতে হয়েছিল তাঁর অনেক গানের।

অতুলপ্রসাদের সূত্রেই লক্ষ্ণৌতে দিলীপকুমার শোনেন অচ্ছনবাইয়ের অপরূপ চালের ঠুংরি এবং তাতে মুগ্ধ হয়ে অবিলম্বে 'তাঁর কাছে দিনের পর দিন গিয়ে' অনেকগুলি ঠুংরি শিখে নেন। অচ্ছনবাইয়ের নানা মর্মস্পর্শী মিড়, কম্পন ও সূক্ষ্ম কারুকাজ তাঁকে বিগলিত করে তোলে। এমনতর অলংকৃত গানের প্রেমিক পরে অনিবার্যভাবে একবার রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লেখেন :

> সব ললিতকলার বিকাশধারাই যে অতিমাত্রায় সরলতার দিকে হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না, কেননা, অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ললিত সৃষ্টি দেখা যায়, যার মধ্যে একটা complex structure, একটা বৃহৎ সুষমা, একটা সমষ্টিগত মনোজ্ঞ সমাবেশ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ জবাবে লেখেন :

> আমি গান রচনা করতে রকতে, সে গান নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার নেই 'প্রভূত' কারুকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়—অতি সূক্ষ্ম অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।

এসব চাপান উতোর থেকে বোঝা যায় সংগীতের অনুভব রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারের স্বতন্ত্র বর্গে ছিল। দু'জনের মতামতই প্রণিধানযোগ্য যেহেতু দুজনেরই সংগীত সৃষ্টি ও ব্যাপক গায়নের অভিজ্ঞতা চিল। তবে দিলীপকুমার গান গেয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরেছেন অনেক বেশি, গেয়েছেন বহু রকমের ভারতীয় ও বাংলা গান। তাঁর প্রত্যয় বা অনুভূত সত্যকে তাই রবীন্দ্রসংগীতের গায়নের ইতিহাসের দিক থেকে উপেক্ষা করা কঠিন। অবশ্য রবীন্দ্র-দিলীপ সংগীত-বিতর্কের ফলে দিলীপকুমার পরবর্তীকালে আর কোনোদিন প্রকাশ্যে রবীন্দ্রসংগীত করেননি, গায়নের স্বাধীনতা পাননি বলে। ফলে তাঁর প্রযত্ন কেন্দ্রীভূত হল অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গানের প্রচারে। হিমাংশু দত্তের বহু গানের তিনিই প্রথম গায়ক। বন্ধু হরেন চট্টোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠের গান তিনিই প্রথম রেকর্ড করান। পণ্ডিচেরির আশ্রমিক জীবনে নিশিকান্তকে দিয়ে নানা রূপে ছন্দে গান লিখিয়ে তাতে সুর দিয়ে তিনি বাংলা গানে একটি অন্যতর স্পন্দ নিয়ে আসেন। আর নিজের গান তো ছিল অজস্র ও বিচিত্র। অপরিমিত ও বিস্ময়কর ছিল তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় গান লিখে বা অনুবাদ করে তিনি গেয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানের বেশিরভাগ স্বরলিপি দিলীপকুমারের করা। বিদেশে তিনিই ছিলেন ভারতীয় গানের, বিশেষত বাংলা গানের, অনন্য ও সুযোগ্য বার্তাবাহী গায়ক। গানের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মসম্পদ তিনি বৃহত্তর বিশ্বে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুদীর্ঘ জীবনে। সাহানা দেবী, উমা বসু ও মঞ্জু গুপ্তের কণ্ঠে তাঁর গান রূপে ছন্দে আনন্দে বর্ণিল হয়েছে। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের গায়নে দিলীপকুমারের গান যথার্থ ঢঙে পরিবেশিত হতে শুনেছি আমরা কিন্তু দিলীপকুমারের সাংগীতিক কৃতির জন্য প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি বঙ্গবাসী সঠিকভাবে যে দিয়েছে এমন মনে হয় না। সংগীতের এই কিন্নর, সুরসাধক, রসবেত্তা ও তাত্ত্বিক কোনো অজ্ঞাত কারণে বরাবর আমাদের স্মরণ ও সৎ বিবেচনার আড়ালেই রয়ে গেছেন যেন।

দিলীপকুমার সম্পর্কে আমাদের বিস্মরণের একটা বড় কারণ হল তাঁর দীর্ঘ পণ্ডিচেরি প্রবাস। ১৯২২ সালে বিলাত থেকে ফিরে তিনি সারাভারত পরিক্রমা করেন সূত্রের সন্ধানে, তারই মনোমুগ্ধকর ইতিহাস *ভ্রাম্যমাণের দিন পঞ্জিকা* (১৯২৪)। তারপর ১৯২৭ সালে আবার ইউরোপে যান। ১৯২৮ সালে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর অধ্যাত্মপথের আচার্য মেনে পণ্ডিচেরি চলে যান। ১৯৫০ পর্যন্ত সেখানে থাকেন। জীবনের প্রান্তপর্বের শেষ তিরিশ বছর (১৯৫০-৮০) তিনি প্রধানত ছিলেন পুণের হরিকৃষ্ণ মন্দির আশ্রমবাসে। তার মাঝে মাঝে ঘুরতেন দেশে দেশে, ঝলকদর্শন ও মূলত ভক্তিসংগীত শোনার সৌভাগ্য জুটত কারো কারো, সংবৃত আসরে বা অভিজাত গৃহে। আমজনতার কাছে, বিশেষত বাংলার সংগীতভুক্ পিপাসু মানুষের কাছে, দিলীপকুমার ছিলেন অপ্রাপণীয় ও সুদূরবর্তী। তাঁর কটি অমূল্য গান রেকর্ড-মাধ্যমে আমরা পেয়ে, শুনে, ধন্য হয়েছি। 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই'. 'তোমার আঁধার নিশা', 'ঘুম যাই মা'—এমনতর অনতিপরিমাণ তাঁর রেকর্ড-ধৃত গান আমাদের একমাত্র সঞ্চয়। তার পাশে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে রেকর্ডে গাওয়া তাঁর কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলালের বেশ-কটি গান। তবে দিলীপকুমারের সর্বভারতীয় শ্রোতাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এম. এস. সুব্বুলক্ষ্মীর গাওয়া দিলীপকুমারের সুরে অনবদ্য মীরার ভজন, যা 'মীরাবাঈ' চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। এ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন দিলীপকুমার। মীরার গান দিলীপকুমারের সুররচনার ও রাগ-রাগিণী-দক্ষতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। 'বসো মোরে নয়নন মে' (হাম্বীর), 'হরি আবন কী আওয়াজ' (পিলু'), 'ঘনশ্যাম আয়া রি' (মিশ্র বাহার), 'ম্যায়নে চাকর রাখো জি' (বেহাগ খাম্বাজ), 'পগ ঘুঙ্গুরু বাঁধ মীরা নাচে রে' (মিশ্র তিলক কামোদ), 'দরশ বিনা দুখন লগে নয়ন' (দেশ), 'মেরে তো গিরিধর গোপাল' (ঝিঁঝিট), 'য়াদ আওয়ে বৃন্দাবনকী মঙ্গল লীলা' (ভৈরবী)—এমত গানগুলি চিরকালের

সম্পদ। ভারতীয় চলচ্চিত্রের গানের ইতিহাসে 'মীরাবাঈ'য়ের গীতিসম্ভার এক আলোকস্তম্ভ এবং এই ছবি আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য 'মিউজিকাল'। অনেক পরে বাংলা 'মাথুর' চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু সেই সব গান রেকর্ডে সংরক্ষিত হয়নি।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত পণ্ডিচেরিতে প্রবাসজীবন যাপন করলেও ১৯৩৭ সালে তিনি কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতির মহলে হঠাৎ চলে আসেন। ১৯২৮ সাল থেকে একাদিক্রমে পণ্ডিচেরির যোগসাধনা গানের জগৎ থেকে দিলীপকে নিষ্ক্রান্ত করেছিল। 'আমার সে-সময়ে বৈরাগ্য প্রবল এবং আশ্রমভক্তি খানিকটা গোঁড়ামির কোঠায় পৌঁচেছিল' লিখছেন তিনি। '১৯৩৭ সালে—পণ্ডিচেরি আশ্রমের সম্বন্ধে একটু একটু করে নিরাশ হতে আরম্ভ করি...গুরুদেবের অমত সত্ত্বেও খানিকটা আবদার ধরেই কলকাতায় চলে আসি... ফেব্রুয়ারিতে।' ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ পাঁচ বছর তাঁর গানের স্বর্ণযুগ এবং তা কলকাতাকে ঘিরে। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখনীতে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঐ পাঁচবছরে দিলীপকুমারের গীতিপ্রয়াসের অনন্যতা, এই বলে যে,

> গান সেদিন শুধু ধনাঢ্যদের বিলাসমাত্র এবং তার পরিবেশক ছিলেন শুধু ওস্তাদ ও বাইজিদের দল। কোনো ভদ্রসন্তানের যদি গায়ক হবার দুর্মতি দেখা দিত তাহলে তিনি সমাজে হেয় ও অপদার্থ বলেই গণ্য হতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা গান-বাজনার প্রতি সমাজের এই প্রতিকূলতা দূর করতে সচেষ্ট হলেও তার তাঁদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের গোষ্ঠী ছাড়িয়ে বেশি দূর ছড়িয়ে যেতে পারেনি। ধনীদের বিলাস-নিকেতন ছাড়া জনজীবনে গানের কোনো স্থানই ছিল না। গানের সঙ্গে জনগণের নাড়ীর যোগ সংস্থাপনে ছিল একজনেরই অনন্য প্রয়াস। দিলীপকুমারই বলতে গেলে মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে, শিক্ষিত সমাজে গানকে ছড়িয়ে দিলেন এবং ওস্তাদি গানের পাশাপাশি বাংলা গানকেও পাংক্তেয় করে তুললেন বা জাতে ওঠালেন। বাংলা গানের এই অভ্যুদয় এক বিস্ময়কর বৈপ্লবিক ঘটনা। অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুভাষচন্দ্র যেমন রাজনৈতিক বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন দিকে দিকে, দিলীপকুমার তেমনি আগুন লাগালেন গানে গানে। 'অগ্নিলীলার সঞ্জীবনী বিলাই সকলখানে' এই যে তাঁর জীবনের ব্রত।

প্রাক্-পণ্ডিচেরি পর্বে তাঁর নিজের গান বড় একটা গাইতেন না দিলীপকুমার। তখন অন্যের গান প্রচার করা ছিল তাঁর নেশা। এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন সাহানা দেবী। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে সাহানা গায়িকা হিসাবে যশস্বী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান আলাদা স্ফূর্তি পেত। দিলীপকুমারের শিক্ষায় সাহানার গান অলংকরণে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল। বাংলা গানের পরিবেশে নতুনতর চিন্তা ও সুরের বনিয়াদ গড়বার জন্য তিনি অর্থব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। বঙ্গজনের সংগীতরুচি উন্নত করবার জন্য তিনি নিজের খরচে বাংলায় নিয়ে এসে গান শোনান—আব্দুল করিম খাঁ ও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরদের। মাসোহারা দিয়ে অনুজ রবীন্দ্রলাল ও হেমেন্দ্রলালকে লক্ষ্ণৌর মরিস কলেজে পাঠান হিন্দুস্থানী গান শিখতে। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় এসে তাঁর দুটি প্রাপ্তি হল। দেখলেন যে কলকাতার সমাজ আগের মতো আর সংগীতছুট নেই। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু দত্ত ও শচীন দেববর্মন তৈরি করে তুলেছেন উন্নত মানের বাংলা গানের আবহ। দিলীপকুমারের কৃষ্ণনাগরিক বন্ধু সুগায়ক হরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে সন্ধান দিলেন উমা বসু নামে তাঁর নিজের এক গুণবতী ছাত্রীর। উমা বসুর কণ্ঠ শুনে দিলীপকুমার উজিয়ে উঠলেন। তৈরি হতে লাগল গানের পর গান। দিলীপকুমারের সুররচনা সামর্থ্য এবং উমা বসুর স্বতঃস্ফূর্ত গায়ন আধুনিক বাংলা গানকে বহুতর সুরের নিরীক্ষায় উত্তরণের পথে যখন স্পষ্টলক্ষ্য করেছে তখন আকস্মিক মৃত্যু শিষ্যাকে ছিনিয়ে

নিল। থমকে গেল গুরুর উচ্ছল অনর্গলিত সুরের ধারা, সৃষ্টির লাবণ্য। ১৯৪২ সালে তাই তিনি পণ্ডিচেরি ফিরে গেলেন আবার।

পণ্ডিচেরি থেকে ১৯৩৭ সালে কলকাতায় এসে দিলীপকুমার গ্রামোফোন রেকর্ডে দুখানি গান গেয়ে সবাইকে আবেগাপ্লুত করে দেন। প্রথম গান টপ্পা অঙ্গের শ্যামা সংগীত : 'রাঙা জবা কে দিল তোর পায়', দ্বিতীয় গান দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্তনভঙ্গিম 'ছিল বসি যে কুসুমকাননে।' কলকাতা তথা বাংলার সংগীতশ্রোতাদের সমাজ এই গান দুটিতে একেবারে সম্মোহিত হয়ে যান। সেই থেকে শুরু হয় বাংলা গানে দৈলীপি ঢঙ এবং দিলীপকুমারের যুগ। এমন হতে পারে যে দিলীপকুমারের প্রথম দুখানি গানের দুরকম রীতি—টপ্পা এবং কীর্তন, তাঁর গীতিস্বভাবের সার্থক দ্যোতনা। দিলীপকুমারের কমকণ্ঠ তার পেলব সৌকুমার্যে ও সূক্ষ্ম অন্তর্মগ্ন অলংকরণে টপ্পা ও কীর্তনের চমকপ্রদ এক যৌগ যেন। নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে কীর্তন শেখা ও খগেন মিত্রের কণ্ঠে কীর্তনের শ্রুতিজাত অভিজ্ঞতা এবারে নতুন রসসম্পদে স্পৃষ্ট হয়ে বাঙালি শ্রোতার কানে অমৃতবর্ষণ করল। প্রথম রেকর্ডের বিপণন সফলতা ও জনাদর থেকে দিলীপকুমার উৎসাহিত হয়ে দ্বিতীয় রেকর্ড করলেন 'এই পৃথিবীর পথের পরে' এবং 'জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে'। প্রথম গানটি কোমল মধুর ও শ্রুতিসুখকর, দ্বিতীয়টি ওজস্বী আবেগে স্পন্দিত। তাঁর তৃতীয় রেকর্ড, যার দু'পিঠে ধরা আছে চিরন্তন গান 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম', বাঙালি শ্রোতাদের পক্ষে যেমন অভিনব তেমনই অতি জনপ্রিয়। এই গানটি শোনেননি বা শুনে আপ্লুত হননি এমন রুচিমান বাঙালি গীতরসিক নেই। এতে এমন একটা প্রত্যয় ও বিশ্বাসের ভূমি আছে, আছে নিঃসন্দিগ্ধ ভক্তিরস এবং কীর্তনের অনিবার্য আকর্ষণ যে, একেবারেই ভক্তচিত্ত নন, এমন শ্রোতাও এ-গানে দুলে ওঠেন সুরমাধুর্যে, আখরের নিপুণ নির্মাণে এবং গানের নাটকীয় ওঠাপড়ায়। দিলীপকুমার সারাজীবন ধরে যত গান রেকর্ড করেছেন (হায়, তার সংখ্যা বড়ো স্বল্প) তার সবকটিতে ছাপিয়ে এই বৃন্দাবনের স্মৃতিকাতর গানখানি এখন সকলের মনে জেগে আছে। গানটি সম্প্রতি 'রিমেক' করেছেন হৈমন্তী শুক্লা। জমেনি।

আজীবন গান গেয়ে যাবার গভীর আত্মসংকল্পে আবদ্ধ দিলীপকুমার একদা ১৯৩৭ সালে যখন কলকাতায় পাবলিক কনসার্ট করেন তখন টিকিট কেটে গান শোনার কোনো পূর্ব ইতিহাস ছিল না বঙ্গদেশে। দিলীপকুমার তার পথপ্রদর্শক এবং অল্পায়াসে তাঁর কনসার্টে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যেত। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তাঁর গানের সঙ্গে রেবা রায়ের নাচও ছিল পরিকল্পনার দিক থেকে সাহসী। 'শনিবারেরর চিঠি' তার কার্টুন ছেপেছিল—বিষয়টি ছিল সেকালের দিনে এতটাই উত্তেজনাকর। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সাহায্যকল্পে দিলীপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কনসার্ট করেছেন এবং বহু টাকা তুলে দিয়েছেন গুরুপ্রণামী। কিন্তু তাঁর গান আমরা তেমন করে উত্তরাধিকার সূত্রে নিই নি কণ্ঠে, প্রচার করিনি, এর কারণ কী? গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতে :

> দিলীপকুমার বাংলা গানে যে নতুন সুরের আমেজ আনলেন, তার মধ্যে বিদেশী গন্ধ তত বেশি ছিল না, যত ছিল হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের সৌরভ, নানা ছোট ছোট অলংকরণের ঝিকিমিকিতে এক তারাভরা আকাশের বিস্ময়। বাংলা গানকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের সমকক্ষ করে তুলতে চেয়েছেন। এনেছেন গমক, মূর্চ্ছনা, আশা, মুড়কি, খরজবদল, তালফের প্রভৃতি নানা চমকপ্রদ বৈচিত্র্য। তাই দৈলীপি ঢঙে গান গাওয়া সহজসাধ্য নয়। তাঁর গান সেইজন্য কোনোদিনই খুব জনপ্রিয় হবে বলে মনে হয় না। বাংলা গানকে জাতে তুলতে গিয়ে সেই অপরাধে তাঁকেই যেন জাতিচ্যুত, একঘরে হতে হয়েছে—এমনই ভাগ্যের বিড়ম্বনা।

আসলে তাঁর গান তেমন যে প্রচার পায়নি তার প্রধান প্রশ্ন প্রচার করবে কে? অর্থাৎ তাঁর গান যথার্থ তানলাপে, স্বরসংস্থানে ও সুরবিহার করে গাইতে সমর্থ ক'জন? আর একটা বড় কারণ তাঁর পণ্ডিচেরিবাস। ১৯৪২ সাল থেকে দিলীপকুমার হয়ে গিয়েছিলেন আশ্রমবাসী, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। গুরুর মৃত্যু তাঁকে আশ্রম থেকে চ্যুত করল। শিষ্যদের সহায়তায় নতুন আশ্রম গড়লেন পুণেতে। ১৯৮০ সালে সেখানেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। ততদিনে তিনি অধ্যাত্ম চর্যায় বহুপথ পেরিয়ে পেয়ে গেছেন ভক্তিগানের দিশাসরণি। সচেতনভাবেই শেষ জীবনের দুই দশক ভক্তিগীতি ছাড়া আর কিছু গাইতেন না। ফলে বাঙালির চিত্তে তাঁর গৈরিকশোভিত বৈরাগীমূর্তি চিরস্থায়ী হয়ে গেল। কীর্তনের চেয়ে ভজনেই তাঁরা আসক্তি গড়ে উঠল। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠল অনিবার্য ভক্তবলয়। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ঈশ্বরে পরানুরক্তি এই সন্ত সাধককে বিচ্ছিন্ন করে দিল আধুনিক বাংলা গানের বিষয়গত সচল কেন্দ্রভূমি থেকে। গায়ক নয়, স্রষ্টা নয়, সবাই তাঁকে ভাবল সাধক।

২

দিলীপকুমারের জীবন ও গানের নির্মোহ মূল্যনির্ধারণ করতে গেলে আমাদের বুঝে নিতে হবে বাংলা গানের এই দিশারী কী দিয়ে গেছেন। প্রথমেই বলতে হয় যে, দিয়ে গেছেন তাঁর মেধা ও নিত্যনব পরিশীলনের ফসল। সে তো কেবল যন্ত্রবদ্ধ রেকর্ডেই ধরা নেই, কেননা রেকর্ড তাঁর কটাই বা! কিন্তু তাঁর অজস্র বিচিত্র সংগীতসম্পর্কিত রচনা ও স্মৃতিচারণ, তাঁর গান শোনার অমূল্য স্মরণীয়তা এবং গন্ধর্বের মতো তাঁর উজ্জ্বল অস্তিত্বের অস্মিতা আর স্বর্ণকণ্ঠ বাঙালি কি কোনোদিন ভুলতে পারবে? এই বস্তুসর্বস্ব সময়ে, বাস্তবের ত্রাসে শঙ্কিত প্রহরে, লঘু চপল পরিকল্পনাহীন গানের ভাবাবহে, দিলীপকুমারের গান যেন অন্য কোনো বিশ্বাসী জগতের উদ্দীপ্ত জাগরণী, যা শুনলে মনে আসে শমতার বোধ ও আত্মসর্জনের স্বস্তি। তাঁর গানে আমাদের সন্তপ্ত ও দ্বিধান্বিত সময়ের জন্য ভরা আছে শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা। কেমন করে সেই দানের গৌরব তিনি অর্জন করলেন তা বোঝার জন্য *স্মৃতিচারণ* বই থেকে উদ্ধৃতি দেব। লিখেছেন :

> ১৯২৮ সালে আমি যোগজীবন বরণ করি। তারপর লক্ষ্য করি যে, ওস্তাদি সংগীতের অজস্র তানকর্তব ও কণ্ঠের কসরতে আমার মন তেমন ভিজে উঠছে না। এমন সময় একদিন আবদুল করিম খাঁ এলেন পণ্ডিচেরি। তিন চার দিন গাইলেন তিনি...। এ কী ব্যাপার? প্রশ্ন করল আমার প্রবীণ মন।...আব্দুল করিমের কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য কালোয়াতি আমার মনে বিস্ময় জাগলেও এমন কোনো রসাবেশ যোগাতে পারেনি যাতে হৃদয় সাড়া দিতে পারে।...এ অন্তর্বিপ্লবের জন্যে অবশ্য সব আগে দায়িত্ব আমার ইষ্ট—যাঁর গুণকীর্তনে আমি ক্রমশঃ গভীর আনন্দ পাবার সঙ্গে দেখি যে, তার সঙ্গে ওস্তাদি সঙ্গীতের আনন্দের তুলনাই হয় না...
>
> এই সময়েই আমি রচনা করি 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি'—অন্তরে তাঁর বাঁশি শুনে, প্রাণে মনে তাঁর স্পর্শ পেয়ে।...এই সময়ে আমি পেলাম আমার একটি মূল জিজ্ঞাসার উত্তর : যে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে গায়ক কৃতার্থ হয় ওঠেন তখনই যখন সে-সঙ্গীত আমাদের প্রাণ-মন অন্তরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাঁর পানে। প্রাণের ও গানের এই পরম প্রিয়তম প্রথমদিকে আমাদের সৌন্দর্যবোধের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করলেও এ-বোধের গভীরায়মান লগ্নে আমাদের কণ্ঠকে গাওয়ান : 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'।

> ওস্তাদি গানের সুখবিলাস আমাদের অন্তরে খানিকটা আবেশ জাগালেও সে-আবেশ স্থায়ী হতে পারে না এই জন্যে যে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে সমঝদার শ্রোতার সাড়া তার চাইই চাই। কিন্তু ভজনকীর্তনের বেলায় গুণী রূপান্তরিত হন পরম ভাগবতে।

দিলীপকুমারের আত্মমূল্যনির্ধারণ একেবারে যথাযথ। গানের সরণি বেয়ে অবশেষে এমন চেতনার কূলে তিনি পৌঁচেছেন। তাঁর গান তাই তেমন করে অনুসরিত বা প্রসারিত হয়নি বলে, আমরা তাঁর গানের যথার্থ সমাদর করিনি বলে, তাঁর অন্তর্লীন চৈত্যপুরুষের (Psychic Being) কোনো ক্ষোভ ছিল না। কারণ তিনি নির্দ্বিধভাবে জানতেন : 'ওরা গানে চায় রাগিণীবিলাস, আমি চাই তার চরণতীর'। তাই বলে দিলীপকুমারের বিগ্রহ বাঙালির কাছে যে হয়ে রইল গেরুয়াধারী বৈরাগ্যপন্থীর সেটাই কি ঠিক?

এই জায়গাটায় এসে অনেকে হিসাবে ভুল করে বসেন। ভাবেন, দিলীপকুমার যদি পণ্ডিচেরির যোগজীবন বা পুণের হরিকৃষ্ণ মন্দিরের সাধকজীবন বরণ না করতেন তবে বাংলা গান অন্য নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ হত। এটা ঠিকই যে রবীন্দ্রোত্তর কালে আধুনিক বাংলা গানের ক্ষেত্রে আর যাঁরা স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছেন যেমন নজরুল, হিমাংশু দত্ত, জ্ঞান গোঁসাই, শচীনদেব বর্মন, সুধীরলাল, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সলিল চৌধুরি, সুধীন দাশগুপ্ত—তাঁদের সকলের চেয়ে সাংগীতিক সামর্থ্যের বিচারে দিলীপকুমার ছিলেন অনেক উঁচু মানের স্রষ্টা। কিন্তু তাঁর গান প্রধানত ভক্তিমার্গকে ঘিরে ধাবিত হয়েছে বলে আমাদের জীবনের দৈনন্দিনে তেমন ব্যবহৃত হয়নি। ভক্তিপথকে নানাকারণে আমরা সাম্প্রতিক জীবনের চলার পথে একটা অত্যাজ্য বা অবশ্যম্ভাবী সূত্র বলে ভাবি না। সেই কারণেও হয়তো দিলীপকুমারের ভজন বা কীর্তন আমাদের প্রণিধানের বিষয় নয়। কিন্তু বোঝা দরকার যে, আশ্রমিক পর্বেও দিলীপকুমার ছিলেন বাংলা গানের অবিরল সাধক ও স্রষ্টা। সুররচনার নিরীক্ষা কখনো তাঁর থামেনি কেবল নতুন নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য দেখা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,

> আমরা ভুলে যাই যে দিলীপকুমার সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে সংগীতের জগৎ থেকে নিজেকে নির্বাসিত করেন নি কোনোদিন। গানই ছিল তাঁর প্রাণ। পণ্ডিচেরী গিয়ে সে গানই হয়ে উঠল বন্দন আরাধন, যোগ সাধনারই অপরিহার্য অঙ্গ, অন্তর্বিকাশের অভ্রান্ত রাজপথ। যোগ সাধনায় দীক্ষা প্রার্থী হয়ে যখন তিনি শ্রীঅরবিন্দের চরণাশ্রয় ভিক্ষা করলেন, গুরু তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'এ-যোগের পথে পা বাড়াতে হলে সব ছাড়তে হবে, তুমি কি তাতে রাজি?' উত্তরে দিলীপকুমারের আকুল জিজ্ঞাসা : 'গানও কি ছাড়তে হবে?' শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'প্রয়োজন হলে তাও ছাড়তে হবে।' দিলীপকুমার দ্বিধায় পড়লেন। অবশ্য শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি। সর্বত্যাগের প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যোগে দীক্ষা নিলেন। কিন্তু গুরু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন তাঁর এই শিষ্যটির সাধনপথের বিকাশ ঘটবে গানের মাধ্যমে, কাব্যের অনুশীলনেই। তাই নিজে হাতে ধরে শেখালেন ইংরেজি নানা ছন্দ, নিরন্তর পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিমার্জন করে দিতে লাগলেন তাঁর নানাবিধ কবিতা রচনার প্রাথমিক প্রয়াসকে। 'সমস্ত জীবনই যোগ' এই উদার মহাবাণীর যিনি উদ্গাতা তাঁর আশ্রয়ে তাই দিলীপকুমারের দ্রুত বিকাশ ও রূপান্তর ঘটতে লাগল সংগীত ও কাব্যের স্বধর্ম অনুসরণ করেই।

পণ্ডিচেরিতে তাঁর গানের মাধ্যমে যোগ সাধনা স্ফূর্তি পেল দুই প্রতিভার সান্নিধ্যে। একজন সাহানা দেবী, আর-একজন কবি নিশিকান্ত। সাহানা আর দিলীপকুমার আশ্রমকে সুরমূর্চ্ছনায় ভরিয়ে দিলেন। তাঁদের দুজনেরই গায়ন প্রতিভা ছিল প্রথমশ্রেণির। আশ্রমিক পর্বের আগে সাহানার ঘটেছিল রবীন্দ্রসংগীতে দীক্ষা

দিনেন্দ্রনাথের প্রয়াসে। রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন সাহানার কণ্ঠে তাঁর গানের রূপায়ণ। এবারে দিলীপকুমারের সান্নিধ্যে তাঁর কণ্ঠে রূপ পেল দৈলীপি গান ও অতুলপ্রসাদের গান। অন্যদিকে কবি নিশিকান্তকে দিলীপকুমার বানালেন গীতিকার। তাঁর লেখনীতে ভক্তিগীতির একটা স্বতন্ত্র স্বাদ আমরা পেলাম। নানারকম গানের ধরন, তালফের ও লঘুগুরু উচ্চারণের ঢঙ দিলীপকুমার নিশিকান্তের সামনে রেখে তাঁকে বলতেন সেইভাবে বাণী রচনা করতে। এই কাজটি নিশিকান্ত আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারতেন। তাঁর্য ছিল রাবীন্দ্রিক এক পরম্পরা, কারণ পণ্ডিচেরিতে আসবার আগে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমে। সেখানে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে স্ফুট হয়েছিল তাঁর কবিতার জগৎ। সে-কবিতা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ সাবলীল ও স্বাবলম্বী। তাঁর গানের বাণী সেই কারণে রবীন্দ্রোত্তর ধরন নিতে পেরেছিল অনায়াসে। দুটি উদাহরণ পেশ করছি :

১. এ দেশের দিগ্‌দিগন্ত নীল অনন্তে
আপন-হারা।
এখানে তৃণের কানে
সমীরণ কোন্ সুদূরের
অমল সুরের মন্ত্র আনে
সবুজের মর্মে ফোটে
শুভ্র সুনীল ফুলের তারা।

২. এ যে কোন্ কর্মনাশা গানের ভ্রমর
মর্মেতে মোর বাঁধল বাসা।
সে যে গো দিনে রাতে সকাল সাঁঝে
গান করে আমায় গাওয়ায়
থামায় না গান থামে না যে
তার সেই সুর শুনে মোর মন লাগে না
এ সংসারের কোনোই কাজে—
বুঝি বা বিফল হবে
এই তোমাদের কাজের ভবে
আমার এ-গান গাইতে আসা।

এ-গানদুটি যাঁর শুনেছেন তাঁরা মনে করতে পারবেন সুরের স্বতঃস্ফূর্ত চলন ও প্রবহমানতা। বাংলা গানের রূপরীতি ভাঙার একটা শক্তি গানদুটির বাণী ও সুরে স্বপ্রকাশ। রবীন্দ্রগীতির প্রধান যে-প্যাটার্ন, অর্থাৎ ধ্রুপদ ধাঁচের স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগের বন্ধন, এখানে তার নির্মল মুক্তি। বাংলা গানের ধরনধারণ নিয়ে যাঁরা ভাবতে চান তাঁদের কাছে দিলীপকুমার ও নিশিকান্ত-র অনেক যুগলবন্দি রচনা চিন্তার খোরাক জোগাবে। এই সূত্রে মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ ইত্যাদির নানারকম গান নিশিকান্তকে দিয়ে দিলীপকুমার তার ধাঁচে নতুন গান তৈরি করিয়ে নিতেন। এমন এক উদাহরণ তাঁর *গীতশ্রী* নামে স্বরলিপির বই থেকে দেখাচ্ছি :

ভৈরবী-ঠুংরি

হে ক্ষণিকের অতিথি
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া!
কোন্ অমরার বিরহিনীরে
চাহ নি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া!
ওগো অকরুণ! কী মায়া জানো
মিলন ছলে বিরহ আনো!
চলেছ পথিক, আলোক-যানে
আঁধার পানে
মন ভুলানোর মোহন তানে
গান গাহিয়া!

এ পরাণের মাধুরী
আজি নিশীথে পড়ে ঝরিয়—
কারে মিলনের সাথী করিয়া!
কোন্ অলকার শরীরে ধরি,
বাজে বাঁশরী!
সুরে সুরে তার এ-বিভাবরী
গেল ভরিয়া!
হে মনোমোহন! আলোক-তালে
কত জনমের ঘুমে জাগালে!
সফল-স্বপন-শিহর আনি'
দিলে গো বাণী
উজল-গানে জীবনখানি
ঝল-মলিয়া!

রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর অনুকরণে নিশিকান্তের রচনাটি কৌতূহলপদ। *গীতশ্রী*-তে এর স্বরলিপি করেছেন সাহানা দেবী। এমনতর বহু গানের নমুনা *গীতশ্রী*-তে আছে, যা নিশিকান্তের গীতিকার হয়ে ওঠার নানা স্তর ধরে রেখেছে, সেইসঙ্গে ফুটে রয়েছে বাংলা গান নিয়ে দিলীপকুমারের নিরন্তর আগ্রহের দ্যোতনা। তিনি নিজেও অনন্য সুরের আভায় বাণী লিখতেন, তাতে প্রয়োজনে ওজগুণের চমৎকার সমন্বয় থাকত। বিদেশিসুরের ঘন রব ও মন্দ্র সপ্তকের গাম্ভীর্য ফুটেছে 'বন্ধন নাশো মন্ত্রবরে' গানটিতে। আর একটি দৈলীপি গানের বাণী :

মন্ত্র জ্বালাও মন্ত্রময়ী! লক্ষ্যহীন নিভন্ত প্রাণে
ক্লান্তে কর দিগ্বিজয়ী তোমার দুঃসাহসের গানে,
অবিশ্বাসের পাষাণ কারা
ধ্বংস কর বিশ্বে সারা
জাগিয়ে তোমার তমোজয়ী জ্যোতির প্লাবন বিজয়তানে—
অন্ধকারে হিরণ্ময়ী বহ্নিমন্ত্র জ্বালাও প্রাণে।

এই গানে বাণী উচ্চারণে একটা আলাদা জোর লাগে, সুর সেই উদাত্ততার সঙ্গে জোড়া। বিদেশি গান গাওয়ার ও স্বরক্ষেপের যে-বিশিষ্ট কৌশল বিদেশে শিক্ষানবিশি-পর্বে দিলীপকুমার আয়ত্ত করেছিলেন 'মন্ত্র জ্বালাও' গানে তার প্রয়োগ বিস্ময়কর। পাশাপাশি ফরাসি জাতীয় সংগীত 'লা মার্সেই'-এর সুরে বোনা তাঁর গান 'ভারত রাত্রি প্রভাতিল যাত্রী' অসামান্য এক সাংগীতিক পরীক্ষা। অথচ এই বীররসের দৃপ্ত গানের পাশে আমরা যখন ' সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম' দিলীপকুমারের গায়নে শুনি তখন চমক লাগে তার কোমল আর্দ্র সুষমায়। তাঁর গান প্রধানত বিশ্বাস আর আত্মনিবেদনের সমর্পণে মধুর ও একান্তী। তাই গানের বাণীতে একধরনের অন্তরঙ্গতা বা লৌকিক বুলির প্রয়োগ ঘটেছে যা বাংলা ভক্তিগীতিতে বেশ নতুন। যেমন বৃন্দাবনের অবিস্মরণীয় রাধাকৃষ্ণলীলা কথার সত্যতা প্রসঙ্গে তাঁর বাচন :

ওরা জানে না তাই মানে না
আমি জানি তাই মানি।
আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি
তাই বঁধু আমি মানি।

এই বাঁশির ধ্বনি দিলীপকুমারের বেশির ভাগ গানের Leit motif। বাঁশির ধ্বনি শুনে 'আসি আসি করে' তাঁর প্রাণ। এমন অলক্ষ বংশীধরের সঙ্গে ভক্তগীতিকারের সম্পর্কটি অন্যোন্য, তাই শুনি :

বঁধু! তোমার পানে কি নিতি আমরাই ধাই পথহারা শ্রান্ত
চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত?
তুমিও কি ভালোবাসো না?
নিতি বিছায়ে স্নিগ্ধ ছায়াখানি তব তুমিও কি কাছে আসো না
যবে আমরা আতপ-ক্লান্ত
মিছে ঘুরি মরি পথভ্রান্ত?

গানের ভাবাবেগ এত বেশি, সুর এত গভীর ও বিচিত্র যে তুলনায় তাঁর গানের বাণী কিছুটা পুরোনোপন্থী ও দুর্বল মনে হয়। তবু তাঁর গানে বাণীরই জোর বেশি সুরের চেয়ে। ব্যাপারটা সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি এইভাবে যে,

> তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যতটা বুঝেছি তাতে মনে হয় তিনি কথাকে আঁকড়ে থাকতে চান। কারণ অনুমান করি ভক্তির সেন্টিমেন্ট। ভক্তির সঙ্গে আমার লড়াই নেই, কারণ ওখানে যুক্তির পাত্তা পাওয়া যায় না। মতের গরমিল থাক, এইটুকু সান্ত্বনা আছে, তিনি সুরকে নতুনভাবে গ্রহণ করেছেন, নতুন রূপে সাজিয়ে তুলেছেন। নব-রস-চেতনার তাগিদ সত্তা প্রতিষ্ঠা করেছে, কথার চাপে ধ্বনি কাবু হয়ে যায়নি। গোঁড়ামির অপদৃষ্টি এড়াতে পারলে আমার বিশ্বাস তাঁর দান সুররসিক অস্বীকার করতে পারেন না।

কথাকে আঁকড়ে থাকার কারণ দিলীপকুমারের ভক্তিবাদ। সবাই জানেন, ভক্তির প্রকাশ কেবল সুরে ধরা পড়ে না তাতে চাই ভক্তের হৃদয়মথিত কথার অভিব্যক্তি। তবে সেই কথা বা বাণী, Symbolic যতটা তার চেয়ে বেশিরকম Emotive। তাই শ্যামল, অমল, প্রেমল, মঞ্জুল এমনতর ধ্বনিময় গীতল শব্দ তাঁর গানে ভক্তের বিশ্বাসে অনেকটাই দ্রব। তাঁর বাণীরচনার প্রগল্‌ভতা ও ধ্বনিবাহুল্য দৈলীপি গানকে একটা আলাদা চারিত্র্যে দিয়েছে। সুরের দিক থিকে তা সুনিশ্চিত, এমন-কি তাঁর গানের বাণীও অভ্রান্তভাবে তার স্রষ্টাকে শনাক্ত করে।

দিলীপকুমার রায়ের সংগীতপ্রতিভা ও প্রয়াসের প্রসঙ্গে এসে পড়ে তার সর্বভারতীয়তারও কথা। বাঙালি গীতিকার-সুরকারদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রচার ও প্রসিদ্ধি ঘটেছে দেশে-বিদেশে। তার কারণ তাঁর গান শুধু বাংলা বাণীতে সীমাবদ্ধ নয়। বিশিষ্ট নানা বাংলা গান, তাঁর নিজের ও অন্যদের, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরিজি, জর্মান ও ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে অথচ মূল সুরকাঠামো বজায় রেখে তিনি পরিবেশন করেছেন বহুবার বহুজনসমক্ষে। প্রধানত তাঁর প্রয়াসে এদেশে প্রচারিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান। তবে দিলীপকুমারের প্রধান সুরকাঠামো নিজের গানে নিশ্চয়ই কীর্তন। কীর্তনকে বাংলার নিজস্ব আঙ্গিক বলে প্রথম শনাক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গানের রূপবন্ধে কীর্তন ও ভাঙা কীর্তনের নানাতর সূক্ষ্ম প্রয়োগকৌশল আমরা পাই। কিন্তু কীর্তন যেন দিলীপকুমারের সবচেয়ে সাবলীল মাধ্যম।

কীর্তন নিয়ে বহুরকম পরীক্ষা, আখরের নানা চমৎকার প্রয়োগ তাঁর গানকে সুষমাময় করে তুলছে। ভক্তিসমর্পিত তাঁর কবিচিত্ত ভক্তিগানের পাশাপাশি সুরান্বিত করে পরিবেশন করে গেছ কতরকমের সংস্কৃত স্তোত্র। তাঁর কণ্ঠে দেবভাষায় গুরুস্তোত্র, শঙ্করাচার্যের ভবানীস্তোত্র, নির্বাণাষ্টক, ভাগবতের গোপীগীত প্রভৃতি চিরায়ত রচনা নতুন রূপ পেয়েছে ভাবানুগ সুর মহিমায়। সেইসঙ্গে নিজেও রচনা করেছেন অনেক সংস্কৃত স্তোত্র এবং গণপতি শর্মার *উমাসহস্রম্* থেকে শ্লোক সংকলিত করে বা শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের রচনায় সুর বসিয়ে তার প্রচার করেছেন। এ-সব গীতসম্ভার বৃহত্তর ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে দিলীপকুমারকে পরিচিত করছে। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতি হল বাংলাদেশে ভজনের সূচনারম্ভ। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে তিনি উত্তরভারতীয় ভজন গানের সংবাদ পেয়ে তার অনুসন্ধান করে, তাতে সুর দিয়ে বাঙালি শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম প্রয়াস মীরাবাঈয়ের 'ম্যায়নে চাকর রাখো জি' এককালে সারাদেশকে উদ্‌বেলিত করে দেয়। পরে ক্রমে ক্রমে নানক, কবির, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরা প্রভৃতি মধ্যযুগের ভক্তিপথের সন্তদের রচনা তাঁকে নতুন ভাবমার্গে টানে। তিনিও সুরে সুরে সে-সব রচনাকে বরণ করে নেন, যার চরমোৎকর্ষ মীরাবাঈ ফিল্মে সুব্বুলক্ষ্মীর কণ্ঠলাবণ্যে চিরন্তন হয়ে আছে। কর্ণাটকী শিল্পীর কণ্ঠে উত্তরভারতীয় ভজনের যে-উৎসার তিনি গ্রথিত করে গেছেন তা ভারতীয় সংগীতের একটি স্বর্ণস্তম্ভ। পরবর্তীকালে নিজের রচিত হিন্দি ভজনের সঙ্গে সুর দিয়ে পরিচিত করে গেছেন মহারাষ্ট্রের তুকড়োদাস বা গুজরাটের রৈহান তায়েবজির রচনা। জীবনের শেষ দু-তিন দশক তো শুধুই সুর দিয়ে গেছেন ইন্দিরা দেবীর রচিত বাণীতে। এখন সারাদেশের ভক্তমণ্ডলী তাঁকে মনে রেখেছে দিলীপকুমার রায় বলে নয়, সাধনার জগতে সিদ্ধ এই গায়কের নাম 'দাদাজি'। কিন্তু বাংলায় তিনি দিলীপকুমার। অনর্গলভাষী, সুরসিক ভক্ত ও অশান্ত গায়ক দিলীপকুমার বিশ্বাস করতেন Art for Divine's sake তত্ত্বে। তাঁর জীবনস্বপ্ন আর গান একটি বিন্দুতে মিলে গেছে।



নজরুল-গীতি

আমাদের ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ড. জে. সি সেনগুপ্ত। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পুরোনো কালের ইংরিজি পড়া ছাত্রী। তাঁদের একমাত্র কন্যা যশোধরা ইংরিজি সাহিত্যের নামকরা ছাত্রী। প্রেসিডেন্সি কলেজ, বিলেতে লেখাপড়া করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি বিভাগ থেকে অবসর নিয়েছেন। যশোধরা আমার বন্ধুপত্নী, সেই সুবাদে তাঁর যোধপুর পার্কের পিত্রালয়ে আমার বহুদিনের যাতায়াত। আজ থেকে বিশ বছর আগে যশোধরার মার সঙ্গে প্রথম যখন আলাপ হয় তখন অবাক হয়েছিলাম এই ইংরেজিনবীশ পরিবারের পুরোপুরি বাঙালিয়ানা দেখে। বাড়িতে তৈরি চিঁড়ে ও মুড়ির মোয়া তিনি আমায় খেতে দিয়েছিলেন। যশোধরা ও তাঁর মা গান গাইতেন আর আমিও যেহেতু একটু আধটু গান গাই কাজেই আমাদের আলাপচারি বেশিরভাগ হচ্ছিল গান নিয়ে। ঐদিন শ্রীমতী সেনগুপ্তকে যখন একটা গান গাইতে অনুরোধ করলাম, তখন তিনি আমাকে আর একবার অবাক করে দিলেন 'কেন কাঁদে পরান'—এই নজরুলের গানটি গেয়ে। তখনকার দক্ষিণ কলকাতার পক্ষে এই ঘটনাটা ছিল অভাবনীয়। আমি স্বভাবত ভেবেছিলাম গড়পড়তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহিলারা যা করেন তিনিও তাই করবেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইবেন। আমার প্রত্যাশার সঙ্গে তাঁর নির্বাচিত গানটি যে মিলল না তার কারণ আমার একটা হিসাবের ভুল। আসলে ষাটের দশক থেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রশতবর্ষের পরপরই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ রবীন্দ্রসংগীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। পাড়ায় পাড়ায় ইতি উতি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার সত্রগুলি দেখতে দেখতে গজিয়ে উঠল— 'গীতবিতান', 'দক্ষিণী', 'রবিতীর্থ', 'ইন্দিরা'র মতো নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলিতে রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে গেল। শান্তিনিকেতনের 'বিশ্বভারতী' ও জোড়াসাঁকোর 'রবীন্দ্রভারতী' থেকে কয়েক দশক ধরে শতশত ছেলেমেয়ে রবীন্দ্রসংগীতে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসছে। রবীন্দ্রসংগীতের এমন অভূতপূর্ব জনস্বীকৃতি, 'স্টেটাস সিম্বল', সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উচ্চস্থান পাওয়ার একতম বাহন হয়ে ওঠা, গত কয়েক দশকের বাঙালি সংস্কৃতির এক অনিবার্য দিক। রবীন্দ্রসংগীতের এই সর্বপ্লাবী আগ্রাসী উদ্ভাসের সামনে এখন অন্যধরনের আর সব বাংলা গান

কেমন যেন ম্লান হয়ে গেছে। পঞ্চাশের দশকের অমন যে বিখ্যাত জনপ্রিয় আধুনিক গান তাও যেন কেমন মিইয়ে গেছে। শ্রীমতী সেনগুপ্ত তাঁর স্ব-নির্বাচনে অনায়াসে একটি নজরুলের গান গেয়ে দিলেন, তার কারণ তিনি পুরোনোকালের মানুষ। তাঁর যৌবনের দিনে রবীন্দ্রসংগীতের গ্রহণীয়তা ও জনাদর এখনকার মতো ছিল না। রবীন্দ্রসংগীত তখন প্রচারিত ছিল ব্রাহ্মসমাজে, ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলে, শান্তিনিকেতনে এবং কিছু কিছু অভিজাত মানুষের বাড়িতে। কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে যে-সব বাংলা গান সমাদৃত হত তার প্রথমেই ছিল কাজীর গান, কিছুটা অতুলপ্রসাদ, বাকিটা সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, ভীষ্মদেব, শচীন দেববর্মন, উমা বসু, শৈল দেবী প্রভৃতি শিল্পীদের রেকর্ডধৃত। দিলীপকুমার রায়ের গান রেকর্ডে শোনা (তখন তিনি পণ্ডিচেরিতে) তখন ছিল বাঙালির একটি ব্যসন। তাঁর প্রিয় শিষ্যা উমা বসুর গান ছিল বিপুল জনপ্রিয়। অবরে সবরে দিলীপকুমার কলকাতায় এলে আসরে গাইতেন নানারকম গান। গীতিকার হিসাবে এই সময়ে বিখ্যাত ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য ও শৈলেন রায়, সুরকার হিসাবে হিমাংশুকুমার দত্ত ও কমল দাশগুপ্তের নাম সবচেয়ে আগে মনে পড়ে। সিনেমার গানে একচেটিয়া প্রভুত্ব ছিল পঙ্কজকুমার মল্লিক, সায়গল ও কাননদেবীর। কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীনদেব বর্মন ও জ্ঞান গোস্বামী নানা বর্গের বাংলা গান গাইতেন। এর পাশে ছিল আঙুরবালা, ইন্দুবালা আর সেইসঙ্গে আব্বাসউদ্দিনের ভাওয়াইয়া। মোটকথা বাঙালি শ্রোতাদের বিবেচনার মধ্যে সমকালের বাংলা গান একটা বড় জায়গা করে নিয়েছিল। রবীন্দ্রসংগীতেরও সেখানে নিশ্চয়ই একটা সম্ভ্রমপূর্ণ স্থান ছিল। কিন্তু মঞ্চে ডি. এল. রায়ের গান ও আসরে নজরুলের গান শ্রোতাদের কাছে অনেক বেশি অগ্রাধিকার পেত।

পরবর্তীকালে নজরুলের গান যে তেমন আর সমাদর ও প্রচার পায় নি তার অনেক কারণ অনুমান করা যায়। একটা বড় কারণ, নজরুলের বাকশক্তি ও বোধের জগৎটি অকালে হারিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর অনুসরণে চল্লিশের দশক থেকে বাংলা আধুনিক গান বিকল্প হিসাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় কারণ, নজরুলের গান সেইসময়ে যাঁরা গাইতেন যেমন আঙুরবালা, ইন্দুবালা, ধীরেন দাস, নিতাই ঘটক, জগৎ ঘটক, চিত্ত রায় বা গিরীন চক্রবর্তী, তাঁদের সামাজিক আভিজাত্য তেমন কিছু উঁচুদরের ছিল না। নজরুলের প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্বের অভাবে নজরুলগীতির পরিবেশনের মান নিম্নগামী হয়ে যাচ্ছিল। ফলে বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি নজরুলের গান রেকর্ড করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ছিলেন। এই ফাঁকে বাংলা সিনেমার গান জনপ্রিয়তায় ভর করে গানের জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তারপরে জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ, শ্যামল মিত্র, সুপ্রভা সরকার, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেনের মতো প্রথম শ্রেণির পারফরমাররা ধারাবাহিকভাবে আধুনিক বাংলা গানকে এমন উঁচু জায়গায় নিয়ে গেলেন যে নজরুলগীতি তার পুরোনো জায়গায় ফিরতে পারল না। এর পাশে আকস্মিকভাবে বিস্ফোরিত হল গণসংগীত। প্রধানত সলিল চৌধুরীর সুরে এবং সেইসঙ্গে বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, পরেশ দেব প্রভৃতি গায়কদের প্রয়াসে গণসংগীত সুনিশ্চিতভাবে একটা নতুন দিকে নিয়ে গেল বাংলা গানকে। আশ্চর্য যে উনিশশো ষাট সাল বরাবর আধুনিক বাংলা গানের সেই অসামান্য সাম্রাজ্যেও ভাঁটার টান লাগল। গণসংগীতও আকস্মিকভাবে তার চলমানতা হারাল, কারণ সলিল চৌধুরি ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র চলে গেলেন দিল্লি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে বিনয় রায় চলে গেলেন মস্কো। ইতিমধ্যে সমাগত হল রবীন্দ্রশতবর্ষের লগ্ন এবং তার পরবর্তী চার দশক ধরে বাংলায় গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের যে অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখন দেখা গিয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ছিল না।

রবীন্দ্রসংগীতের এমন দেশব্যাপী সার্বভৌম মূর্তি নিশ্চয়ই প্রার্থিত কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতসর্বস্বতা বাংলা গানের সামগ্রিক সৃষ্টি ও মুক্তির পক্ষে হানিকর হয়েছে। সবরকম সভা সমিতি, সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে, জন্মদিন, বিদায় সংবর্ধনা, বৃক্ষরোপণ, বিবাহ, রাজনৈতিক সভা, স্মরণোৎসব সর্বত্র রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াই এখন রেওয়াজ। তার ফলে দ্বিজেন্দ্রগীতি, কান্তগীতি, অতুলপ্রসাদের গান, দিলীপকুমার রায়ের গান, নজরুলগীতি, এবং আধুনিক বাংলা গান সমাজে তার যোগ্য স্বীকৃতি পাচ্ছে না। পাশাপাশি ক্যাসেট কোম্পানিগুলি সস্তাদরে হিন্দি সিনেমার গান এত ব্যাপক প্রচার করছে এবং দূরদর্শন দর্শকদের রুচিবিকৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার ফলে বাংলা গানের সম্প্রচার দৃষ্টিভঙ্গির আর একটি সংকট এই যে বাংলা গানের যথাযোগ্য মূল্য তো দেওয়া হচ্ছে না বরং অবমূল্যায়ন ঘটানো হচ্ছে। নজরুলের গান এমনই অবমূল্যায়নের শিকার। স্পষ্টত উচ্চারিত হয় না হয়তো, কিন্তু নানাভাবে নানাজনে এই কথাটা বোঝাতে চান নজরুলের গান রবীন্দ্রনাথের গানের চেয়ে বেশ-কিছুটা নিচু ধাপের জিনিস। তফাতটা শুধু নান্দনিক বা গুণগত নয় বরং শ্রেণিগত।

গত দুই দশক ধরে দুই বঙ্গে নজরুলগীতির পুনরুজ্জীবনের সচেতন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এই গানের প্রচুর ক্যাসেট বেরোচ্ছে। পুরোনো ও নতুন বহু শিল্পী অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি গাইছেন, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নজরুল একাডেমী, তাঁর গান নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গ্রন্থ রচনা চলছে, সংকলন হচ্ছে, গবেষণা করে অনেকে পাচ্ছেন ডিগ্রি কিন্তু নজরুলের গান সম্পর্কে শ্রোতাদের তেমন উচ্চধারণা বা প্রত্যাশা তৈরি হয় নি। তার প্রথম কারণ, নজরুলগীতির কোনো নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি বই নেই। এই গানের কোনো অছি-পরিষদ বা অভিভাবক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নেই, যাদের খবরদারির অধিকার আছে। তৃতীয় কারণ, নজরুলের অনেক গান একাধিক সুর ও গায়নের দিক থেকে সর্বাংশে সংশয়মুক্ত নয়। চতুর্থ এবং সবচেয়ে বড় কারণ হল সাধারণভাবে নজরুল সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষের খুব একটা উঁচু ধারণা নেই। আসলে নজরুলের কাব্য ও গানে প্রজ্ঞা ও মননের অভাব আছে। ইতিহাস চেতনা ও আধুনিক জীবন-বীক্ষণের তেমন গূঢ়চিহ্ন নজরুলের গানে নেই। এই গানের সুর ও গায়নভঙ্গি কিছুটা হাল্কা ও চটুল। আর্টের বিচারে তা সবার কাছে ছাড়পত্র পায় নি। শতবর্ষে তাঁকে নিয়ে খানিকটা উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা ও আনুষ্ঠানিকতা হয়তো দেখা গিয়েছিল তবে লক্ষণ ও আয়োজন দেখে মনে হল তাঁর আর এক সমকালীন জীবনানন্দ দাশের শতবর্ষ যাপনের প্রস্তুতি ও গাম্ভীর্য যেন অনেক ব্যাপক। নজরুল ও জীবনানন্দ একই সালে জন্মেছিলেন অথচ তাঁদের দুজনের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্যমগত তারতম্য লক্ষণীয়। নজরুল তাঁর জীবিতকালেই যে-খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তাঁকে নিয়ে বাঙালি আমজনতার উদ্বাস এতটাই চূড়াস্পর্শী ছিল যার সিকিভাগও জীবনানন্দ জীবিতকালে পান নি। জীবনানন্দ শুধু কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং তাও সামান্য কিছু কবিতাপ্রেমী মানুষের কাছে। তাঁর কবিতার এবং সাহিত্যচর্চার সামগ্রিক উন্মোচন ঘটে চলেছে প্রয়াণের পরে এবং আজও তাঁর নতুন নতুন রচনার, বিশেষত সৃষ্টিশীল গদ্যরচনার হদিশ মিলছে। তাঁর নিত্যনব উন্মোচন ও ধারাবাহিক উদঘাটন বহুতর মানুষের কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছে এবং তাঁর সম্পর্কে নবীন অবলোকনের দিশা খুঁজে পাচ্ছেন মনস্ক গবেষকরা। তুলনায় নজরুল সম্পর্কে আমাদের মনস্বী গবেষকদের তেমন গভীর আসক্তি নেই, তার কারণ তাঁর জীবন ও রচনার অনুদ্‌ঘাটিত কোনো অংশই প্রায় নেই। তিনি যদি শুধু কবি হতেন তা হলে শতবর্ষে তাঁর সম্পর্কে আমরা ততটা মনোযোগ দিতাম না যতটা জীবনানন্দ সম্পর্কে দিচ্ছি। তফাতটা মাত্রাগত এবং বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গির তারতম্যে। নজরুল তাঁর সমসময়ে যতটা প্রাসঙ্গিক ছিলেন কবিতার বিষয়ের দিক থেকে এখন আর সেই প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ও রচনারীতি দুই-ই এখন প্রায় পরিত্যক্ত।

অথচ জীবনানন্দের কবিভাষা ও কাব্যদর্শন আমাদের আধুনিকতম জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের শরিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু নজরুল তো শুধু কবিতা লেখেন নি, তিনি তো গানও লিখেছিলেন এবং সম্ভবত তা তিন হাজারেরও বেশি। গান যেহেতু পারফরমিং আর্ট, সেহেতু তার পুনরুত্থানের জন্য ভাবীকালের অপেক্ষা করতে হয় না। সমকালীন শ্রোতারা হয় তার সমাদর করেন অথবা করেন না। নজরুলের ক্ষেত্রে সেই সমাদর ছিল এবং একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল। সেইজন্যই কি তাঁর গান ধীরে ধীরে অবসিত হয়ে গেল? তাঁর গানে কি চিরকালীনতার উপাদান ছিল না? প্রসঙ্গত এখানে প্রশ্ন ওঠে গান কি সাহিত্যের মতো চিরজীবী হয়? সম্ভবত হয় না, কারণ গানের ক্ষেত্রে শ্রোতাদের রুচিবদল হয় খুব তাড়াতাড়ি। এক যুগের গানের ধরন ও বন্দিশ পরের যুগের শ্রোতাদের তেমন ভালো নাও লাগতে পারে। এদেশের যে-শ্রোতারা নিধুবাবুর টপ্পা বা কালীকীর্তন সমাদরের সঙ্গে শুনতেন সেই শ্রোতৃসমাজ আজ কই? ব্রহ্মসংগীত আর স্বদেশি গান আমাদের ইতিহাসের অংশ হিসাবেই শুধু স্মরণীয় হয়ে আছে। ডি. এল. রায়ের হাসির গান, বাংলা থিয়েটারের বহু জনপ্রিয় গান, সায়গল, কাননদেবী, পঙ্কজকুমার মল্লিকের সিনেমার গান এখনও যে বাঙালি শোনে তার অনেকটাই নস্টালজিয়া বা অতীত রোমন্থনের নেশায়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ওঠে। তার গোড়াতেই আমাদের মনে রাখতে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের সেই গান তেমন জনপ্রিয় ছিল না। উনিশশো ত্রিশ সাল থেকে বাংলায় যখন টকি শুরু হল তখন তাতে রবীন্দ্রসংগীত প্রযুক্ত হয়েছিল। পরপর বেশ-কয়েকটি ছায়াছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান দর্শকদের মনকে আকৃষ্ট করে এবং সারা দেশে মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গান। ফলে সেই রবীন্দ্রসংগীতগুলিই সেকালে জনপ্রিয় হয়েছিল যা ছায়াছবির সংলগ্ন। তার আগে উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের বেশ-কটি স্বদেশি গান প্রচারিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু তা সর্বত্র হয় নি। তার কারণ, সেই উনিশশো পাঁচ সালে বেতার বা গ্রামোফোন রেকর্ড আমাদের দেশে আসে নি। দেশব্যাপী গান সম্প্রচারের একটা সমস্যা ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর জীবিতকালে যে প্রার্থিত প্রচার ও স্বীকৃতি পায় নি তার আর-একটা কারণ সেই গানের গায়নের অবরুদ্ধ ধরন। প্রথম থেকেই তাতে শিল্পীর স্বাধীনতা, সুরবিহারের অধিকার বা তান কর্তবে অলংকৃত করার ব্যাপারে নিষেধ ছিল। বাঙালি শিল্পীরা বরাবর ওই ধরনের স্বাধীনতা নিয়ে গান গেয়ে এসেছেন। কাজেই রবীন্দ্রসমকালীন উচ্চস্তরের বাঙালি পারফরমাররা রবীন্দ্রসংগীতকে পাশ কাটিয়ে যথাসম্ভব অন্য গানকে আশ্রয় করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম মূর্তি ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁকে এমন উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে তিনি ক্রমেই হয়ে উঠেছিলেন শ্রদ্ধেয় ও সুদূর। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবনে তাঁর সম্পর্কে গড়ে তুলছিল নানারকম কল্পিত মিথ। তিনি দেবতার মতো শ্রদ্ধা ও পূজা পেয়েছেন কিন্তু নজরুল পেয়েছেন জনগণের ভালোবাসা। রবীন্দ্রসংগীতের আবিষ্কার অনেক পরের ঘটনা। এই আবিষ্কার বলতে আমরা বুঝব রবীন্দ্রনাথের লেখা দু'হাজারের বেশি গান এবং তার মধ্যে প্রায় সাড়ে আঠারোশো স্বরলিপি—যে দুই-এর আধার যথাক্রমে *গীতবিতান* ও *স্বরবিতান*। তাঁর গান যে পূজা-প্রেম-প্রকৃতি-স্বদেশ-বিচিত্র—এই পাঁচ পর্যায়ে বিন্যস্ত, তাঁর গানের একটা বড় প্রয়োগ ক্ষেত্র যে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য এবং আরো অনেকগুলি নাটক, গান যে তাঁর আত্ম-আবাহনের একটা পথ এবং আত্ম-আবরণ ছিন্ন করার প্রণালী এ-সব আমরা পরে ক্রমে ক্রমে এবং স্তরে স্তরে এখন বুঝছি। তাঁর সব গান কোনো একজন শুনে উঠতে পেরেছেন এমন ভাবা যায় না। দুই বাংলায় সহস্রাধিক রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী, প্রবীণ ও নবীন, নিয়তই গেয়ে চলেছেন তাঁর গান। তবু তাঁর পূর্ণ উদঘাটন সম্পন্ন হয় নি আজও।

নজরুলগীতির ভাগ্যে এমন সৌভাগ্য লাভ ঘটে নি। তাঁর গান প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত এলিটিস্টদের ততটা মনোযোগ পায় নি। সংগীতের যাঁরা সারদর্শী—যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অমিয়নাথ সান্যাল, তাঁদের লেখনী নজরুলের গান বিষয়ে কিছু উচ্চারণ করে নি। নজরুলের গান ভালো করে যাঁরা শিখেছিলেন এবং শিখিয়েছিলেন তাঁরা একে একে প্রয়াত হয়েছেন। কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, চিত্ত রায়, ধীরেন দাস, জগৎ ঘটক, নিতাই ঘটক, আব্বাসউদ্দিন, শচীন দেববর্মন, গিরীন চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আঙুরবালা, ইন্দুবালা সকলেই প্রয়াত। এখনও গাইছেন প্রবীণা ফিরোজা বেগম বা সুপ্রভা সরকার—কিন্তু তারপরে যাঁরা নজরুলের গান রেকর্ড করেছেন শ্রোতৃসমাজ ও সংগীত গবেষকরা তাঁদের সম্পর্কে সংশয়ী। কোনো কোনো গায়ক নানা কাল্পনিক সুরে, আবার কোনো কোনো গায়ক তাঁর নিজের রাগদারী সংগীত পরিবেশনের দক্ষতা নজরুলের গানের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দুই বাংলায় এই মুহূর্তে নজরুলের গানের সমাদর ও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট কিন্তু তাঁর গান নিয়ে নানারকম সমস্যা, সংকট ও প্রশ্ন উঠেছে যা নিরাকরণ করা কঠিন। প্রশ্নাকারে সমস্যাগুলি হল—সত্যিসত্যি নজরুলের গান সংখ্যায় কত? তার সব কি সংকলিত হয়েছে, না ছড়িয়ে আছে ইতস্তত পত্র-পত্রিকায়? তাঁর নামে প্রচলিত সব গানই কি মৌলিক, না অন্যের লেখা গান তাতে মিশে গেছে? মিশ্রিত গানগুলি চিহ্নিত করার উপায় কী? নজরুলগীতির কোনো নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি গ্রন্থ আছে কি? তাঁর গানের যে অজস্র সংখ্যক রেকর্ড একসময়ে বেরিয়েছিল, সেগুলি কি সংগৃহীত হয়েছে? একই নজরুলগীতি একাধিক শিল্পীর কণ্ঠে একাধিক সুরে, এমন কি আলাদা তালে রেকর্ড করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তার কোন্‌টি নতুন শিক্ষার্থীর পক্ষে গ্রহণীয়? রবীন্দ্রনাথের যেমন বিশ্বভারতী, নজরুলের গানের জন্য তেমনই কি একটি একাডেমী খোলা যায় না— যার কর্তৃত্ব সবাই মেনে নেবেন? এই সব-কটি প্রশ্নের, বা সংশয়-সংকটের কোনো ইতিবাচক জবাব আমাদের জানা নেই।

২

নজরুল বাংলা গানের ক্ষেত্রে কী করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর গানের প্রকৃত চারিত্র্য কেমন তা বুঝতে গেলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। তাঁর ঠিক আগে যে চারজন মৌলিক গীতিকার ছিলেন কালানুক্রমিক ভাবে তাঁদের নাম রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ। ১৮৬১-১৮৭১ এই একদশকের মধ্যে চারজন জন্মেছিলেন এবং এঁদের যৌথ সাধনা বাংলা গানকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এবং আধুনিকতায় উত্তীর্ণ করে। বাংলাগানের এক সর্বজনগ্রহণীয় চেহারা সংগীতরসিকদের জন্য এঁরা সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন। এঁদের আগে বাংলা গান আবদ্ধ হয়ে ছিল ওস্তাদী ও কালোয়াতী কসরতের মধ্যে। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে বাংলা গানের তেমন কোনো যোগ ছিল না। সাংগীতিক বৃত্তির সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন সেই গায়ক-বাদকদের সম্পর্কে শিষ্ট সমাজের খুব একটা উঁচু ধারণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুলপ্রসাদ পর্যন্ত উল্লিখিত চারজন গীতিকার ছিলেন সংগীতে দীক্ষিত এবং গায়ক। তাঁদের রচনায় কথা ও সুরের একটা শোভন সমঞ্জস মাত্রা আছে। তাঁদের গানের মূল প্রসঙ্গ পূজা, প্রেম ও স্বদেশ।

রবীন্দ্রসমকালীন কবিরা রবীন্দ্রকাব্যের ভাব ও রূপে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিমজ্জন করাকেই মনে করেছিলেন শ্রেয়। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়ের কবিতা পাঠ করে বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল তাঁদের রচনা 'সমতলরকম সদৃশ'। রবীন্দ্রসমকালীন তিনজন গীতিকার সম্পর্কে এই সদৃশতার অভিযোগ আনা যাবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ছিল পৌরুষ ও

নাটকীয়তা, সেইসঙ্গে হাসির গানের বিদ্রূপ। রজনীকান্তের গানে ছিল প্রশ্নহীন আত্মনিবেদনের প্রশান্তি ও আত্মদীনতার গৌরব। অতুলপ্রসাদের গানে ছিল সংবৃত আত্মবেদনার তাপ। এইসব বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের মিল নেই। এঁদের গানের আঙ্গিক ও গায়নরীতি রবীন্দ্রসংগীত থেকে একেবারে আলাদা। রবীন্দ্রগীতির একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ 'সঞ্চারী'— এই তিনজন গীতিকার প্রায় বর্জন করেছিলেন। তবু এই চারজনের সংগীতের যৌথসাধনা এক স্বয়ম্ভর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। রুচিহীন বাংলা প্রণয় সংগীত, গুরুভার ব্রহ্মসংগীত আর ওস্তাদী হিন্দুস্থানী গানের দাপটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই চারজন গীতিকার বাঙালিকে দান করে গেছেন তাঁর 'নিজের গান', নতুন কালের নবীন পরিবেশে। নিভৃতে বা সমাবেশে, আনন্দে বা শোকে, উল্লাসে ও উদ্বেলতায়— এ-সব গান ব্যবহৃত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে পূজার বেদিতে, দেশাত্মবোধের উদ্‌বোধন থেকে আত্মজাগৃতির সন্ধান বাসনায়, সভায়, মঞ্চে, নাটকে, এমন-কি ব্যক্তিজীবনের আন্তরিক হৃদয়ভাবের বিনিময়ের প্রয়োজনে বাঙালি এঁদের গান গেয়ে চলেছে। এঁরাই এনেছেন বাংলা গানের রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশ ও সুবাতাস ভরা আনন্দ। কিন্তু এঁদের গানের কোনো বিনিময় মূল্য বা পণ্যমূল্য ছিল না। নিজেদের আনন্দের বা বেদনার মোক্ষণই ছিল গান। এ-সব গানের ব্যাপক সম্প্রচার বা বৃহত্তর জনসমাজে প্রসার প্রতিপত্তি ঘটে নি সেকালে। কারণ জনমাধ্যমগুলি তখনও চালু হয় নি। এঁদের গান ছিল সংবৃত এক শিল্পী-শ্রোতার বৃত্তে আবদ্ধ। সর্বসাধারণের রসগ্রহণের জন্য তা অর্গলমুক্ত হয় নি। এই পরিবেশে এসে যান নজরুল ১৮৯৯ সালে। তিনি বেঁচে ছিলেন ১৯৭৬ পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর জীবনে নীরবতা নেমে আসে চল্লিশের দশকেই। এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তাঁর অপরিমিত সংগীতসামর্থ্য, প্রগল্‌ভ বাণী আর বিচিত্র সুরের কাঠামো বাংলা গানে এক অভূতপূর্ব গতি ও প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছিল। মনে রাখা দরকার যে আধুনিককালে বাংলা গানে নজরুলই প্রথম রবীন্দ্রোত্তীর্ণ অনুষঙ্গ নিয়ে আসেন। নিয়ে আসেন গজল গানের মৌতাত, ইসলামী বাতাবরণ ও আরবি ফারসি উর্দু শব্দের ঝংকার। অবশ্য পাশাপাশি এমনও মনে হয় যে কবিতার মতো তাঁর গানও প্রতিভার অমিতব্যয়িতায় ভরা, কিছুটা অসতর্ক বাণীবিন্যাসবহুল এবং উচ্ছ্বসিত। হয়তো খানিকটা প্রসাধনহীনও। তবু তা ছিল আবেগে তপ্ত, আন্তরিক এবং জনপ্রিয়তায় সিদ্ধ। সেদিক থেকে তাঁর কবিতার চেয়ে তাঁর গানের সিদ্ধি অনেক বেশি। কারণ সৎ কবিতার ক্ষেত্রে অনর্গল উচ্ছ্বাস ও লাগামহীন ব্যাপ্তি দোষাবহ। গানের ক্ষেত্রে এই উচ্ছ্বাস ও ব্যাপ্তিকে নজরুল রাশ ধরে টানতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ গানের একটি সুনির্দিষ্ট ও সংগত আঙ্গিক বজায় রাখতেই হয়। তার ধুয়ো আস্থায়ী ও অন্তরার পরিকাঠামো একেবারে অগ্রাহ্য করলে গানের রস ক্ষুণ্ণ হয়। চিরকালের বেহিসেবি ও উদাসীন নজরুল জীবনে বা আর্টে কোনো শৃঙ্খলাই তো মেনে চলেন নি, কিন্তু গানের ক্ষেত্রে তা বাধ্যত মানতে হয়েছিল।

নজরুলই প্রথম বাংলা গানকে পেশাদারী জৌলুসে ভরে দেন। যদিও ব্যক্তিগত প্রেরণার চেয়ে অর্থকরী আহ্বান বা ছোটখাট অনেক আবদার মেটাবার জন্য তাঁকে অনেক গান লিখতে হয়েছে, তবু তার একটা মান তিনি বরাবর রক্ষা করে গেছেন। বাংলা লোকসংগীত, উর্দু গজল, রাগসংগীত ও লোকসংগীত প্রধানত এই চার জায়গা থেকে তিনি সুর গ্রহণ করেছেন, তবু একটা মৌলিকতার ছাপ তাঁর সৃজনীতে আছে। অনায়াসে গান লিখে গেছেন এবং তা শিমুল তুলোর মতো সানন্দে ঝরিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বিপুল সংখ্যক গান, অথচ সেগুলির প্রতি তাঁর কোনো মমতা ছিল না। আলাপচারি ঢঙে নজরুল নিজেকে বলতেন 'মাছের মা'। এ কথার অর্থ হল মাছ যেমন জলের উজানে ডিম ভাসিয়ে

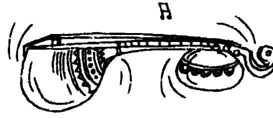
দিয়ে চলে যায়, তার মধ্যে কতগুলি মাছে পরিণত হল সে সম্পর্কে কৌতূহল বা উদ্‌বেগ থাকে না, নজরুলও তেমনি তাঁর রচিত গানের পরিণাম নিয়ে কোনোদিন ভাবেন নি। তাঁর গানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনো প্রযত্ন তাঁর ছিল না। গানগুলি সঠিকভাবে গাওয়া হল কি না, তা নিয়ে তাঁর কোনো সতর্কতা বা অনুজ্ঞা ছিল না। অতিপ্রজ জননীর মতো সব সন্তানের প্রতি মনোযোগী হতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত গান সম্পর্কে, সেই গানের গায়ন বিষয়ে, তার সুরের যাথার্থ্য রাখার ব্যাপারে বরাবর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। গান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল 'রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই... যার যেটি কীর্তি তার সম্পূর্ণ ফলভোগ তার একলারই।' নজরুলের ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য নয়। কারণ প্রথমত তাঁর রচিত পদার্থের দায়িত্ব তিনি নেন নি এবং দ্বিতীয়ত তাঁর কীর্তির সম্পূর্ণ ফলভোগ তাঁকে করতে হয় নি। জীবন্মৃত নজরুল তাঁর মূক ও নিশ্চল জীবনে জানতে পারেননি বাঙালি সুরকার ও গায়করা তাঁর গান নিয়ে কী প্রলয় নাচন নেচেছেন।

পরিণাম যাই হোক রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে নজরুল সম্পূর্ণ অন্যরকমের গান লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান তিনি ভালো জানতেন এবং গাইতেও পারতেন। কিন্তু সেই গানের কোনো প্রভাব তাঁর উপর পড়ে নি এটা যেমন আশ্চর্য একটা ঘটনা, তেমনি এটাই নজরুলগীতির সবচেয়ে বড় শক্তি। মঞ্চ- রেকর্ড - রেডিও-চলচ্চিত্রের ত্রিমুখী তাৎক্ষণিক চাহিদা তিনি দুহাতে মিটিয়ে গিয়েছেন। প্রয়োজনে দেশপ্রেমের গান লিখেছেন, ছাত্রদলের গান লিখেছেন, এমন-কি রাজনৈতিক নির্বাচনে প্রচারের জন্যেও গান লিখেছেন। এই প্রচারকে প্রাণবন্ত করাব জন্য গলায় হারমোনিয়ম বেঁধে, গানের দল গড়ে, রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। মানুষ হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন রঙ্গপ্রিয়, প্রাণোচ্ছল ও লঘুচপল এবং সকলের কাছে সুপ্রাপ্য তাঁর গানও তেমনি অনর্গলিত ছিল সকলের জন্যে। গানকে তিনি কখনো ভাবের দিক থেকে ভারী করতে চান নি। বস্তুত তাঁর গান জনপ্রিয় হয়েছিল তিনটি কারণে— বিষয়গত লঘুতায়, সুরের বৈচিত্র্যে ও খোশমেজাজি চালে। যে মানুষ অস্থির চঞ্চল ও বিতর্কিত জীবন যাপন করেন, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আবার ছায়াছবির পর্দায় যাকে চাক্ষুষ গান গাইতে দেখা যায় তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে কি?

বাংলা গানে যে স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্য নজরুলের আগে পর্যন্ত ছিল —নজরুল তাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিলেন। তার আগে গান ছিল খানিকটা গভীর এবং গম্ভীর। তাঁর আগে অতুলপ্রসাদ একটি গানে লিখেছিলেন 'যখন তুমি গাওয়াও গান তখন আমি গাই', আর-একটি গানে বলেছিলেন, 'দুঃখ-সুখের সাথী সঙ্গী দিনরাতি সংগীত মোর'— এই কথাগুলি নজরুলের গানের ক্ষেত্রে একেবারে প্রযোজ্য হতে পারে না। কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁকে দিয়ে গান লেখায়নি। তাঁর দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনে গান কখনো সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে নি। অর্থাৎ গান তাঁর সান্ত্বনা নয়, যেমন রজনীকান্তের। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো গানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি দেখার ভূয়োদৃষ্টি তিনি অর্জন করতে পারেন নি। গানকে বরং তিনি ব্যবহারিক করে তুলেছিলেন। নিজের এবং অন্যের রুটি-রুজির প্রয়োজনে গানকে তিনি নির্মাণ করেছিলেন। সে গান যাতে মানুষের ভালো লাগে, সেই গানের রেকর্ড যাতে মানুষ বেশি করে কেনে, তেমন জনচিত্তজয়ী উপাদানের দিকে তাঁকে সর্বদা খেয়াল রাখতে হত। সেইসঙ্গে রাগ-রাগিণীতে তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দচারী—আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দ ছিল তাঁর আজ্ঞাধীন ভৃত্যের মতো, চঞ্চল স্বভাবটি ছিল বহির্মুখী—তাঁর গানে এগুলির ছাপ আছে। তাঁর আর-একটি গুণ ছিল নিজের জীবনের দুঃখকে আড়াল করে সর্বদাই 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' নিজেকে তরতাজা রাখতে পারতেন। সেইজন্য বাংলা গানের

ধারাবাহিকতায় নজরুলের গান বিশেষ উষ্ণ এবং যৌবনধর্মী। কিন্তু তিনি কখনোই সারাজীবনে অসচ্ছলতার হাত থেকে মুক্তি পান নি। দারিদ্র্য তাঁকে 'মহান' করলেও তাঁর জীবনকে স্বচ্ছন্দ করে নি। পদে পদে প্রতিহত নজরুল প্রতিভা কখনো উত্তরণের পথ খুঁজে পায় নি। সেইজন্যে তাঁর গানের কোনো ক্রমবিকাশ নেই। হয়তো সুস্থ শরীর মন পেলে গানকে তিনি আর একটু সুস্থিত জায়গায় নিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর সংগীতবোধ ছিল উন্নতধরনের, সংগীত রচনার কৌশল ছিল প্রথম শ্রেণির, কিন্তু সংগীত-চিন্তা বিষয়ে কোনো প্রাথমিক ধারণা ছিল না তাঁর। তাই বিপুল বিচিত্র অজস্রধারায় প্রবাহিত অসংখ্য নজরুলগীতির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা একালের শ্রোতারা বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ি, কিন্তু কিছুতেই তাঁর গান রচনার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট অভিপ্রায়, স্থির প্রত্যয় এবং মননক্রিয়ার চিহ্ন খুঁজে পাই না।

৬



সত্যজিৎ রায়ের সংগীত-বীক্ষা

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যাপারে আলাদাভাবে যে-অভিজ্ঞতা ঘটে, তা মিশ্র ধরনের। তাঁর ছবিতে খাঁটি ভারতীয় রাগরাগিণী আছে। পাশ্চাত্য সুরকারদের প্রসিদ্ধ কিছু রচনার মনোজ্ঞ প্রয়োগ আছে আবার পুরোনো ধাঁচের খাঁটি বাংলা গান ও বিশেষভাবে নির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীতের চাতুর্যপূর্ণ নিগূঢ় প্রয়োগ আছে। এর বাইরে ছবির লোকেশন অনুযায়ী স্থানীয় লোকসংগীতের, যেমন রাজস্থানি বা নেপালি, টুকরো ব্যবহার লক্ষ করা যায়। খানদানি রাগদারী কিছু কিছু বিখ্যাত খেয়াল-ঠুংরির অনুষঙ্গ এবং এমনকি সময়োচিত ধ্রুপদ বা কালের মর্জি বোঝাতে টপ্পা তাঁর ছবিতে ভাবাবহ নির্মাণের ব্যাপারে কাজে লাগিয়েছেন। তা ছাড়া, যেমন 'ঘরে বাইরে' ছবিতে বিমলার বিলিতি গান শেখার সুবাদে ইংরেজি গানের একটি ভিক্টোরিয়ান ধরন তিনি অনায়াসে আমাদের উপহার দেন। ছুটকো কলের গানে বাজানো গানের ছেড়ছাড় বা সময় বিশেষে রেডিয়োতে ভেসে-আসা গানের অমোঘ কলি তাঁর ছবিতে পারস্পেক্টিভের দিক থেকে খুবই অর্থবহ ও শিল্পময়। এমনকি চলতি কথায় যাকে বলে বাথরুম সং, তাকেও সত্যজিৎ ব্যক্তি চরিত্র ফোটানোর কাজে কী অত্যাশ্চর্যভাবে যে ব্যবহার করেন! দীক্ষিত শ্রোতা অবশ্য এতটাও লক্ষ করেন যে 'শাখাপ্রশাখা' ছবিতে প্রশান্তর অন্তর্মনের পরিশুদ্ধ চেতনাকে বোঝাতে গিয়ে সত্যজিৎ রায়, 'গ্রেগোরিয়ান চ্যান্ট'-এর মতো দুর্লভ সুরবিন্যাসকে অসামান্য সামর্থ্যে বুনে দেন। ছবির প্রয়োজনে বাখ, মোজার্ট ইত্যাদির সুরাংশ দিব্যি বুনে দেন তিনি। এতসব কিছুর পরেও সত্যজিৎ রায়ের সাংগীতিক সৃজনী ও সৃষ্টির মেধা নতুন নতুন পথ খোঁজে। 'তিন কন্যা' থেকে 'আগন্তুক' পর্যন্ত তাঁর নানা চলচ্চিত্রের নিরীক্ষায় বিভিন্ন মুড, বিভিন্ন অ্যাকশন ও বিভিন্ন সিচ্যুয়েশন বোঝাবার জন্য তিনি তৈরি করেন ছোট ছোট মিউজিক্যাল পিস্। যেমন 'তিনকন্যা'র অন্তর্গত 'মণিহারা'য় The Fateful Night, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় The Mist 'চারুলতা'য় Bhupati's Grief, সোনার কেল্লা'য় The Camel Ride, পিকুতে Grandpa's Death 'ঘরে বাইরে'র Nikhilesh-Theme। এইসব সাংগীতিক অনুষঙ্গের টুকরো দেশি-বিদেশি যন্ত্রানুষঙ্গ মিশিয়ে সত্যজিৎ রায় ছবির চিত্রনাট্যের

সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি করে নিয়েছেন। সেইদিক থেকে বিচার করলে সংগীত সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে একটি অবিভাজ্য অংশ অত্যাজ্য উপাদান।

শিল্পের মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রকে আধুনিককালে আমাদের এক মিশ্র মাধ্যম বলেই মনে হয়। এতে দৃশ্য ও শ্রব্যগুণ ছাড়াও নাট্য এবং অন্য নানা শিল্প বিভঙ্গ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আধুনিক চিত্র-ভাষায় সর্বাঙ্গীণ পারদর্শিতার খুব নিপুণ পরিচয় আছে। তার কারণ ছবি তুলতে তুলতে একটার পর একটার অভিজ্ঞতায় জারিত হতে হতে তিনি চলচ্চিত্রের প্রতিটি উপাদান সম্পর্কে সচেতনতায় উত্তরণ করতে থাকেন। তিনিই ভারতীয় ছবিতে সর্বপ্রথম প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন এই সত্য যে সিনেমা মূলত হল 'অ্যারেঞ্জমেন্ট অব শটস্' প্রাথমিকভাবে তাঁর ছবিগুলিতে চিত্রনাট্যের পারিপাট্য, দৃশ্যরচনার চিত্রকল্প এবং ডিটেল্সের ব্যবহার আমাদের চমকে দেয়। তাঁর পরিচালিত প্রথম ৬টি সিনেমা অর্থাৎ অপু-ত্রয়ী, দেবী, জলসাঘর ও পরশপাথর ছবিগুলির অন্তর্নিহিত দেশীয়তা ও সাহিত্যগুণ আমাদের যতটা আকৃষ্ট করে সেই অনুপাতে সাংগীতিক প্রয়োগ কিছুটা আরোপিত মনে হয়। তার কারণ রবিশঙ্কর , আলী আকবর বা বিলায়েৎ খাঁর মতো অভিজ্ঞ শিল্পী ও স্রষ্টা যতই সাংগীতিক উৎকর্ষ দেখান তবুও তা সত্যজিতের প্রথম কটি ছবির সঙ্গে অবিভাজ্যভাবে মিশে যেতে পারেনি। তবুও যে সত্যজিৎ তাঁর প্রথম দিকের ছবি ক'টিতে অন্য সুরকারদের ওপর নির্ভর করেছিলেন তার কারণ চলচ্চিত্রের সংগীত ব্যবহার সম্পর্কে যে সময় পর্যন্ত তাঁর সরেজমিন অনভিজ্ঞতা বা সংশয়। ১৯৬১ সাল বরাবর 'তিন কন্যা' করবার সময় তিনি সংগীত পরিচালনার কাজটি নিজেই করতে শুরু করেন। কারণ চলচ্চিত্রের সংগীত প্রয়োগের ও সাংগীতিক অনুষঙ্গ রচনার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগবিধি ততদিনে তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের নির্মাণ ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে বোঝা যায়, তিনি চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত সবকিছুকেই নিষ্ঠা ও প্রয়াসের সঙ্গে আত্তীকরণ করে নিতে পারতেন। পাশ্চাত্য স্টাফ নোটেশন রচনার কৌশল আয়ত্ত করে তাঁর ঘরের পিয়ানোয় প্রয়োজনীয় মিউজিক্যাল পিস, আবহসংগীত এমনকি স্বরচিত গানের সুর তৈরি করে নিতেন। তাঁর গ্রহিষ্ণু মন বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীতে সুরের বিন্যাসকে সহজেই ধরতে পেরেছিল। সেইজন্যই 'অপুর সংসার'-য়ে বাংলা লোকগীত, 'সোনার কেল্লা'য় রাজস্থানি লোকায়ত গান, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় পাহাড়ি গানের সুর আবার 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এ বেনারসী ঘরানার গান তিনি সুন্দরভাবে গ্রথিত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতের নানা পর্যায় তাঁর চলচ্চিত্রে খুব সংযতভাবে ও শিল্পীজনোচিত গভীরতায় ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয় যে তাঁর ছবিতে, এমনকি শ্যামাসংগীত, ফিকিরচাঁদী, বাংলা টপ্পা, রামমোহনের ব্রহ্মসংগীত, নজরুলগীতি ও অতুলপ্রসাদের গান প্রযুক্ত হয়েছে কিন্তু দ্বিজেন্দ্রগীতি ও কান্তগীতি তিনি একেবারেই ব্যবহার করেননি।

চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের সংগীতভাবনা যে বিশেষভাবেই সফল এবং আলোচনাযোগ্য তার কারণ সংগীত তাঁর ছবিতে কোনো অবকাশ বিনোদন বা ফাঁক ভরানোর কাজে আসেনি। সংগীত তাঁর সামগ্রিক চিত্রভাষার একটি অপরিত্যাজ্য উপাদান। তাঁর সামগ্রিক চলচ্চিত্র ভাবনার যে সুনির্দিষ্ট ছক অবলম্বনে তাঁর ছবিগুলি গড়ে ওঠে, তার মর্মমূলে সাংগীতিক ভাবনাও গৃহীত। চিত্রনাট্য রচনার স্তর থেকেই তাঁর সংগীত ভাবনার সূচনা ঘটত। একদিক থেকে ভাবতে গেলে চলচ্চিত্র ও সংগীতের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম মিল আছে। সত্যজিৎ রায় একটি সাক্ষাৎকারে একবার বলেছিলেন :

> মূলত একটি ভীষণ মিল আছে চলচ্চিত্র ও সংগীতে।...ফিল্মে একটা অন্ধকার ঘরে যখন আপনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল তখন ওই দেড় ঘণ্টা ধরে পুরোটা চলার পরে ওই একবারের

মধ্যেই আপনাকে পুরো জিনিসটা বুঝে ফেলতে হচ্ছে। সেরকম সংগীতও একটা রেকর্ডের ওপর আপনি যখন নিডলটা রাখলেন যতক্ষণ না রেকর্ডটা শেষ হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট সময়, সেই সময়ের মধ্যে তার বিস্তৃতি, তার ফর্ম। এই ফর্মটাই হচ্ছে একটা সময়ের মধ্যে বিস্তৃত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিস্তৃত যেটার এদিক-ওদিক, করবার উপায় নেই। সংগীত যেরকম, চলচ্চিত্রও সেরকম। একটা ভীষণ মিল রয়েছে। কাজেই সংগীতে যেমন ছন্দের প্রয়োজন, চলচ্চিত্রেরও তেমনি ছন্দের প্রয়োজন।

'তিনকন্যা' থেকে 'আগন্তুক' পর্যন্ত তিরিশ বছরব্যাপী সত্যজিৎ রায় তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সংগীত যোজনা করেছেন। সচরাচর বাংলা চলচ্চিত্রের সংগীত যেমন একটা চাপিয়ে দেওয়া বিষয় বলে মনে হয়, যেমন তবক-দেওয়া সন্দেশ, সত্যজিতের চলচ্চিত্র ও সংগীত তেমন মনে হয় না, কেন-না তা মূল নির্মিতিরই অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন:

I get my ideas fairly quickly–sometimes as early as in the scenario stage.I got them down as they come. Usually they come clothed in a certain orchestral colour, and I make a note of that too. But the actual work of scoring has to wait until I am through with everything else, including final cutting. Of all the stages of Film making. I find it is the orchestration of the music that needs my greatest concentration.

সংগীত রচনার দক্ষতা এবং তার প্রয়োগের সিদ্ধতা—এই দুই ব্যাপারেই সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে যে অভিনবত্ব ও সাফল্যের চিহ্ন রেখেছেন তার কয়েকটি নির্দিষ্ট সূত্র আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথমত, নানাধরণের দেশি-বিদেশি সংগীত শোনার ও বোঝার পরম্পরা তাঁর পক্ষে ছিল স্বচ্ছ। দ্বিতীয়ত, পিতৃপিতামহ এবং মাতামহ ও মাতৃধারা থেকে তিনি একটি বলিষ্ঠ ও সুযোগ্য গানের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, যেহেতু আমাদের দেশ, বিশেষত বঙ্গদেশ হল গানেরই পরিবেশে সমৃদ্ধ, তাই গান রচনা বাঙালি স্রষ্টাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ কাজ। তাঁর পিতা সুকুমার রায়ও গান লিখেছেন। এইখানে একটি কথা স্পষ্ট করে বুঝে নিলে ভালো হয়। কথাটা এই যে, সংগীত ও গান কথা দুটির তাৎপর্য এক নয়। কেন-না সংগীত বলতে বোঝায় Music এবং গান বলতে বোঝায় Song। এই দুইয়ের মধ্যে ব্যাপকতার দিক থেকে গানের ক্ষমতা সীমায়িত কেন-না তা শব্দ বা বাণীতে আবদ্ধ। সেইজন্য একদেশের উৎকৃষ্ট গানের রস আরেক দেশের শ্রোতা উপলব্ধি করতে পারে না। একই কারণে রবার্ট বার্নসের স্কচ গানে যেমন বাঙালি পুরো আনন্দ পায় না, তেমনই রামপ্রসাদী গানে সাহেবদের আনন্দ পাবার কারণ নেই। যদিও এই দুরকম গানই নিজের নিজেরা দেশে খুব জনপ্রিয় ও রসোত্তীর্ণ। মিউজিকে এই বাণীর বাধা বা দেশীয়তার বেড়া নেই। তা প্রধানত যন্ত্রেই রূপায়িত হয় বহুতর যন্ত্রে ও বিন্যাসে বিচিত্র ধ্বনি সমন্বয় সুষমায়, স্বরে ও বিস্বরে। যেখানে মেলোডির চেয়ে হারমনির প্রাধান্য। যে সুর ও স্বর মানুষের কণ্ঠ দিয়ে উদ্গীত হতে পারে না তাকেই ধরতে চায় মিউজিক বা যন্ত্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, 'অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে', সংগীতের কারবার সুরের এই অংশ নিয়ে যা স্বপ্নিত, কল্পিত, অসম-সুষম বিন্যাসে যার বিপুল প্রেক্ষাপট স্রষ্টার ও শ্রোতার শুধু অন্তর্জগতে ধরা দেয়। তাকে ধরবার জন্যই পিয়ানো কিংবা অরগ্যানের সৃষ্টি ও বিস্তার এবং সেই যন্ত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ সংগীতের প্রাণভোমরাটিকে আবিষ্কার করবার জন্যই পাশ্চাত্যে জন্মেছিলেন বাখ্ (১৬৮৫-১৭৫০), হ্যান্ডেল (১৬৯৫-১৭৫৯), মোজার্ট (১৭১৯-১৭৮৭), বেটোফেন (১৭৭০-১৮২৭), শুবার্ট (১৭৯৭-১৮২৮), শুমান (১৮১৯-১৮৯৬) ও হুগো উল্ফের (১৮৬০-১৯০৩) মতো আত্মবেদনাভরা

শিল্পী। তাঁদের আনন্দ আর আর্তি, নৈরাশ্য আর বিষাদ আবার উচ্ছলতা বা স্বপ্নাতুর রহস্য মিউজিককে নানা মাত্রা দিয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর একজন ভায়োলোনিস্ট ছিলেন—এই তথ্যের সঙ্গে বাড়তি যেটুকু আমরা জানি তা হল কৈশোর থেকে সত্যজিতের পাশ্চাত্য মিউজিক সম্পর্কে অনুরাগ ও নানা রেকর্ড শোনার অভিজ্ঞতা। বিশেষভাবে তাঁর পছন্দ ছিল বাখ্ মোজার্ট ও বেটোফোনের বাজনা। তাঁর নিজের ছবির জন্য পরবর্তীকালে এইসব বিখ্যাত সংগীতকারের নানা সুরের টুকরো যেমন তিনি ছবিতে ছিটিয়ে দিয়েছেন তেমনি এঁদের ভাবনার সাংগীতিক মেধা দিয়ে তৈরি করছেন নানা মিউজিক্যাল পিস। তার ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের বহুদিনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রচনার পারম্পর্য ভেঙে তাঁর ছবিতে সংগীতের একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভর রূপ গড়ে উঠেছে অথচ তা চলচ্চিত্রেরই একঅবিভাজ্য বিষয়। এই বিশেষ সংগীত নির্মাণের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানারকম যন্ত্রকে তিনি সুদক্ষ সংগতি ও মিশ্রণে ব্যবহার করেছেন। সেতারের পাশে বেহালা, সরোদের পাশে চেলো, পিয়ানোর পাশে বাঁশি, তিনি চটকদারি নৈপুণ্যে ভরিয়ে দিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে পারকাশন যন্ত্র তাঁর সংগীত নির্মাণে কিছুটা কম ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' গানে মেঘের অনুষঙ্গে পাখোয়াজের ব্যবহার অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 'চারুলতা' ও 'ঘরে বাইরে' ছবিতে যথাক্রমে 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' ও 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ' গানদুটির সুরের বিন্যাসে অভ্যস্ত লয়ের ধাঁচকে ভেঙে অর্কেস্ট্রায় রূপান্তরিত হয়ে শ্রোতার কাছে আনন্দদায়ক এক নতুন অভিভব সৃষ্টি করে। রবীন্দ্র-সংগীতের সুরের চলনটি রক্ষা করা অথচ তার লয়ের মাধুর্যে তিনি এসব জায়গায় এক ধরনের নবসৃজনের আবহ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই সৃষ্টির ইঙ্গিত যদি আমরা বুঝতে পারি তবে ভবিষ্যতে বাংলা চলচ্চিত্রে নেপথ্য সংগীত হিসাবে যত্রতত্র রবীন্দ্র-সংগীতের সুর বাজানোর ছেলেখেলা বন্ধ হতে পারে।

সংগীত রচনায় দেশি-বিদেশি সুরের মিশ্রণ ঘটানোর ক্ষেত্রে এবং গান রচনার সাবলীলতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের সাংগীতিক বোধবুদ্ধি ও নৈপুণ্যের যে পরিচয় ফুটে ওঠে, তা অবশ্য খুব বিস্ময়কর মনে হয় না কারণ তিনি বাংলা গানের পারম্পরাগত ঐতিহ্য খুব ভালো জানতেন এবং তাঁর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এই কাজ পারদর্শিতার সঙ্গে করে গেছেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক কিছু নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। তাঁর চিত্রনাট্য রচনার নিজস্ব পদ্ধতি, ডিটেলের ব্যবহার,ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, দৃশ্যসজ্জার বাস্তবময়তা এবং কুশীলবের কস্ট্যুম সবই তাঁকে পুরোনো পথ ভেঙে নতুন ধরনের আধুনিক নিও-রিয়ালিজমের পথে করতে হয়েছিল। কিন্তু গান বাঁধার একটা সোজা সড়ক তাঁর সামনে তৈরি করা ছিল। তার একটা গড়পড়তা কাঁচা রাস্তা ছিল যাত্রা ও থিয়েটারের পরম্পরায়। আর একটি পাকা রাস্তা ছিল রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত নির্মাণের মেধাবী ইঙ্গিতে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই দু'জন বাঙালি সংগীতকার বাংলা গানের ভবিষ্যৎ বনিয়াদ গড়ে দিয়েছিলেন। এঁদের প্রয়াস একই সঙ্গে মঞ্চও লিরিককে আশ্রয় করেছিল। দু'জনেরই প্রচুর পরিমাণে বিলিতি নাটক ও অপেরা দেখার অভিজ্ঞতা ছিল এবং তার সুরসার তাঁরা বাংলাগানে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ভরে দিয়েছিলেন। তাঁদের গানে একটি সূক্ষ্ম নাটকীয় চলন এবং সুরের গঠনে দেশি-বিদেশি উপাদান মিশ্রণের কৃতিত্ব তারিফ করবার মতো। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনায়াস কৃতিত্ব লক্ষ করা যায় 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে যে, সত্যজিৎ রায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র একাধিক গানের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন নাটকীয়তা ও দৃশ্যমানতার যুগ্ম কৌশলে। ভবিষ্যতে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নিয়ে আরও কিছু কাজ করবেন এমন ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছিলেন। আমাদের রামপ্রসাদ-রামনিধি গুপ্ত-রামমোহনের ঐতিহ্যে ভরা ভাবগাম্ভীর্যময় গানের অন্তর্ময়তায় রবীন্দ্রনাথই প্রথম অপেরাটিক দৃষ্টিভঙ্গি আনেন। সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রে এই অপেরাটিক

দৃষ্টিভঙ্গির নানা পরিচয় রেখেছেন। সবচেয়ে সফল পরিচয় তাঁর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরক রাজার দেশে' এবং 'গুপি বাঘা ফিরে এলো' ছবিতে। তিনটি ছবিতেই অপেরার নানা বাঁক ও স্ফুরণ একটু খেয়াল করলেই চোখে পড়ে। কিন্তু সবাই কি লক্ষ করেছেন যে গুপীর গানের সঙ্গে বাঘাও মাঝে মাঝে গলা মেলায়? অথচ তার তো শুধু বাজাবারই কথা। সবাই বুঝেছেন কি এই প্রয়োগের তাৎপর্য যে গুপী-বাঘা তাদের গানের প্রতি পঙ্ক্তি কেন দুবার করে গায়? এই দৃষ্টিভঙ্গিই তো অপেরাটিক। অন্তর্ময় লিরিকের ধার দিয়েও তারা যায় না।

কিন্তু বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে বড় যে দান তা হল গানকে রাগ-বশ্যতার হাত থেকে উদ্ধার করা। এঁদের আগে বাংলাগামের যে-নির্মিতি তা অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, একটি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ রাগের (যেমন ইমন, খাম্বাজ বা ভৈরবী) ঠাটের ওপর বাণী বসিয়ে দেওয়া হত বা গানের বাণীতে বসানো হত রাগের ঠাট। বিশেষভাবে প্রযুক্ত কোনো শব্দের বা গীতবাণীর যে আলাদা কোনো জ্ঞাপকতা আছে সে কথা এই রাগ বিন্যাসে কোনো মূল্য পায়নি। রাগ বিন্যাসের যে কাঠামোগত উচ্চবচতা, তা রাগের নিয়মকেই মেনে চলেছে, বাণীর স্বাতন্ত্র্যকে মূল্য দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকাংশে গানের ক্ষেত্রে বাণীর স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেন স্বর ও সুরের নতুন বিন্যাসের উদ্ভাবনে। তার ফলে শ্রোতাদের পক্ষে নতুন এই অভিজ্ঞতা হয় যে, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' শুনলে মনে হয় একটা নতুন গান শোনা গেল। তার ঠাট যে ইমন, তা মনে রইল না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গানে আমাদের যে আস্বাদনগত আনন্দ ও অনুভব তা কোন রাগের শনাক্তকরণের উপর নির্ভর করে নেই।

শব্দের এই নতুন সুরময় দ্যোতনাকে আবিষ্কার করাই কম্পোজারের কাজ। কম্পোজার বলতে এখানে নিছক গীতিকার বা সুরকারকে বোঝায় না, তার চেয়েও অন্য মাত্রার ও অন্য মহিমার স্রষ্টাকে বোঝায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কম্পোজার সত্তার বহুমাত্রিক নিরীক্ষা রেখে গেছেন তাঁর নানা গানে। যেমন 'ও যে মানে না মানা' গানটির দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে 'না-না-না' তিনবার তিন সুরে উচ্চারিত হয়। তাতে ভাবের যে অভিনব দোলাচল ফোটে তা রবীন্দ্রনাথের আগে আমরা বাংলা গানে কখনো শুনিনি। কিংবা ধরা যাক, 'আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে' এই গানে আলোর যে প্রস্ফুটতা ও বিস্ময় তাকে রবীন্দ্রনাথ বোঝাবার জন্যে বিন্যাস করেন এক নতুন সুরের ছক, যা বাংলাগানে অভিনব।*

এই অভিনবত্ব ভাবে এবং সুরে সম্মিলিত। গানের ভাব-রেখাকে অনুসরণ করলে বোঝা যায়, বিশেষ এক আলোর 'অমল কমলখানি' ফোটাই এখানে শেষ কথা নয়। তার গায়ে গায়ে উঠে এসেছে এই বিস্ময় যে সেই কমলখানি কে ফোটাল! কম্পোজারের সাংগীতিক মেধা কোনো প্রচলিত রাগের সুনিশ্চিত গঠনকে অনুসরণ না করে ধরতে চেয়েছে ভাবের রহস্যকে। তার প্রথম রহস্য হচ্ছে এক অত্যাশ্চর্য আলো এবং তার অঙ্গাঙ্গী রহস্য হল তা কে ফোটাল। সুরের গতিরেখা 'আলো' এবং 'কে' এই দুই শব্দকে আশ্রয় করে অত্যাশ্চর্য বিচ্ছুরণে গানকে ভরে দেয়।

এমন গান, এমন অনেক গান যে-দেশে আছে, সেই দেশে যদি সত্যজিৎ রায়ের মতো সংগীতমনস্ক সৃষ্টিশীল ও ইঙ্গিতগ্রাহী শিল্পী জন্মান এবং কাজে লাগাতে পারেন সাংগীতিক সৃজনসত্তাকে তবে তাঁর সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তিনি তাঁর তিরিশ বছরের সংগীত পরিচালকের জীবনে কম্পোজারের বহুরকম নিরীক্ষা ও উত্তরণের চিহ্ন আমাদের কাছে রেখে গেছেন।' 'দেবী' ছবিতে 'এবার তোরে চিনেছি মা' সংগীত রচনায় তাঁর যে প্রথাবদ্ধতা, 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে আড়ি ছন্দে 'ভালোবাসার তুমি কী জানো' গানে বাংলা থিয়েটারি ঢঙের অনুরণনকে অতিক্রম করে তিনি পৌঁছে যান সাবলীল গুপী গাইনের গানে। তাঁর সংগীতবোধের এক-

একটা উত্তরণ চিহ্ন এসব ছবিতে ধরা আছে। 'পথের পাঁচালি'তে ইন্দির ঠাকরুণের গলায় ফিকিরচাঁদী গান 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে,' 'পোস্ট মাস্টার' ছবিতে গ্রাম্য বৃদ্ধের বয়সধরা কণ্ঠে সুর আটকে শুধুই হাত নেড়ে তান-বাতলানো কিংবা 'ঘরে বাইরে' ছবিতে বিমলা ও তার গভর্নেসের কণ্ঠে 'Long long ago' গান এক-একটি অসামান্য period piece। এইসবকে পেরিয়ে সত্যজিতের নতুন একটি ছবিতে গুপী যখন গেয়ে ওঠে 'দেখো রে নয়ন মেলে, জগতের বাহার' তখন ভৈরবীর ধাঁচে শুধু নয়ন মেলে আশ্চর্য বিস্ময়ে নয়, শ্রবণ পেতে শুনি এক অসামান্য সংগীতকারের আগমন-সংবাদ।

সংগীতকাররূপে সত্যজিৎ রায়ের সাফল্য খুব আকস্মিক নয়। এর জন্য যেমন তাঁর পূর্ব প্রস্তুতি ছিল তেমনিই দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা ছিল। 'চারুলতা' ছবি সম্পর্কে সত্যজিৎ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর সংগীত প্রয়োগ বিষয়েও। 'তিনকন্যা'-তে প্রথম স্বাধীন সংগীত পরিচালনার পর 'চারুলতা'র সমসময়ে যে তাঁর সন্তুষ্টি এল তার কারণ অভিজ্ঞতা। নিজেই বলেছেন:

> আজ অবধি যে কটা ছবিতে আমি নিজে সংগীত রচনার দায়িত্ব নিয়েছি তার মধ্যে চারুলতার সংগীত আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সাবলীল ও সুপ্রযুক্তি বলে মনে হয়েছে। এর কারণ অবিশ্যি অভিজ্ঞতা। আবহসংগীতের কাজে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। ছবির মেজাজ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকলেও কোন্ দৃশ্যে বা কোন্-কোন্ যন্ত্রে কোন্ সুর কোন্ লয়ে কোন্ তালে বাজালে এই মেজাজের সঙ্গে মিলবে, এ জ্ঞান সহজলভ্য নয়।

এর পিঠোপিঠি তাঁর মন্তব্য খুব প্রণিধানযোগ্য। বলেছেন,

> তাই সংগীতের কাজে এখনো অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যায়। শেখারও আছে এখনো অনেক কিছুই। বিশেষত বাংলাদেশে—যেখানে জাতীয় জীবনে মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, বাড়িঘরদোরে চেহারার কোনো স্পষ্ট চরিত্র নেই—সবই যেখানে পাঁচমিশেলি খিচুড়ি, সেদেশের পটভূমিকায় আধুনিক ছবির আবহসংগীত রচনা এক দুরূহ ব্যাপার। অথচ এ চ্যালেঞ্জ এড়ানো চলে না।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রের এই ব্যাপারটি লক্ষণীয়। তিনি এড়াতে চান না, পেরোতে চান। সেই পেরোনার পথে নতুন নতুন উপলব্ধি হয় সংগীত রচনার ক্ষেত্রে, হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে। দেশি-বিদেশি সুর-স্বরের তফাত বোঝেন সংলগ্ন যন্ত্রবাদ্যগুলির নিজস্বতা লক্ষ করে। তখন তাঁর মনে এই কথা জাগে যে,

> পাশ্চাত্য সংগীতের সুনির্দিষ্ট কোনো গড়ন নেই—সহজে তা প্রয়োজন মেটাতে পারে স্বরগ্রামের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, সুর সংগতি ও সুরবৈচিত্র্য মিলিয়ে। এ দেশে একটি রাগ থেকে অন্য রাগে রূপান্তরের সম্ভাবনাটা নাটকীয়।

তাঁর ছবিতে সংগীতের ব্যবহারে এই নাটকীয়তা আলাদা করে বুঝে নিতে হবে। 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে 'রিমঝিম ঘন ঘন রে' গান তিনি ব্যবহার করেছিলেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ রাগাশ্রিত সুরে বিদেশি চলন।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে আর একটা ভাবনা আছে। নায়ক বা নায়িকার কথা বলার যে স্কেল তার সঙ্গে সংগতি রেখে তিনি গায়ক-গায়িকা নির্বাচন করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো দ্বিধা ও চক্ষুলজ্জা ছিল না। তাই কিশোরকুমারের (যিনি আদপেই রবীন্দ্রসংগীতের মানুষই নন) গান করার সাবলীল কণ্ঠ কাজে লাগাতে পিছ-পা হননি। দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে পারফরমেন্সটাই প্রধান বিবেচ্য তাঁর কাছে, শিল্পী যিনিই হোন না কেন। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে সঠিক অনুষঙ্গ ফোটানোর জন্য লাবণ্যের কণ্ঠে অমিয়া ঠাকুরকে দিয়ে

রবীন্দ্রসংগীত (‘এ পরবাসে’) প্লেব্যাক করিয়েছিলেন। অমিয়া ঠাকুর কখনো বাংলা ছবিতে প্লেব্যাক করেছেন বলে আমরা জানি না। প্রসঙ্গক্রমে হিন্দি চলচ্চিত্রের গায়ন প্রসঙ্গে তাঁর মনে হয়েছে:

> Another strange practice that the public blandly accepts is that whoever breaks into song in a film does so in the voice of one of a half-a-dozen popular singers who seem to have cornered the playback market. Once in a long while, through sheer accident, the singing voice may match with the speaking one, but it is never excepted to. To one not familiar with the practice, the change of timbre usually comes as a jolt. But, for the audience, here the jolt would probably come if, they did not recognise one of their six favourites in the playback.

ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই হালকা চালাকি, এই ঝাঁকি মারার ব্যাপারটা তাঁর অরুচিকর লেগেছে। কণ্ঠধ্বনি timbre তাঁর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Singing voice আর speaking voice -কে এক করে ভেবে তিনি চলচ্চিত্রে একটা নতুন বাঁক নিয়েছেন। গানের সঠিক জাত ও গায়কী ফোটানোর জন্য তিনি জয়কৃষ্ণ সান্যাল ও শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে গাইয়েছেন ‘চারুলতা’-য়। অমল আর সন্দীপের কণ্ঠে কিশোরকুমার ব্যবহৃত হয়েছেন ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৪ সালের দীর্ঘ কুড়ি বছরের ব্যবধানে , তার কারণ দুই চরিত্রেই ছিলেন সৌমিত্র। অথচ গুপীর গান গাইবার জন্য অনুপ ঘোষালকে বেছে নেন সত্যজিৎ, যেহেতু অনুপের গলা সবদিকে খেলে। এই কণ্ঠবাদনের অনবদ্য কৃৎকৌশল গায়কের আছে জেনেই তিনি ‘গু গা বা বা’র গানের সুর রচনায় মার্গ গান, লোকগান, বিলিতি স্বরক্ষেপণ এবং কর্নাটকী ধরন সবই ব্যবহার করেছেন। তাঁর দৃষ্টি এ ব্যাপারে নাটকীয়। কেন-না ভূতের রাজার বরে অন্‌সুরের গুপী কেমন করে সুরদক্ষতায় তা পেশ করতে পারে গানের বৈচিত্র্য বিশেষত সুরে ও কণ্ঠের সাবলীল বিচরণে তা বোঝাতে হবে। অনুপের কণ্ঠ ঐশ্বর্যবহুল, সুরেলা ও গতিময়। অথচ সন্দীপের চরিত্রের যে গাম্ভীর্য ও Restraint তা ফোটাতে কিশোরকুমারকেই ব্যবহার করেন পরিচালক। একই ব্যাপারে দেখা যায় ‘কাঞ্চনজঙঘা’য় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ঠাকুরবাড়ির গায়কী ব্যবহারে বা ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’তে পাহাড়ি সান্যালের কণ্ঠে লখনউ ঘরানার ঢঙে অতুলপ্রসাদের গান। ‘শাখাপ্রশাখা’ ও ‘আগন্তুক’ ছবিতে মমতাশঙ্করের কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে সংগতি রেখে শ্রমণা গুহঠাকুরতাকে দিয়ে গাইয়েছেন। ‘জয়বাবা ফেলুনাথ’-এর মতো রহস্য ও রোমাঞ্চবহুল ছবিতে বেনারসের ভজন সঠিক পরিবেশন ফোটানোর জন্য রেবা মুহুরীর কণ্ঠ ব্যবহার করেছেন। রেবা মুহুরীর সন্ধান মিলেছিল কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। সংগীত সত্যজিতের চলচ্চিত্রের উপাদান বা অঙ্গ নয়, সংগীত তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয়গত। সেই জন্য বহুসময় সুর রচনা তিনি আগে করেছেন, ছবির শুটিং তখনও হয়তো শুরুই হয়নি।

আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গিতে সত্যজিৎ একবার বলেছিলেন, ‘I am shaped in equal measure by the east and the west ’। কথাটা সাধারণভাবে সত্য হলেও সংগীতের রূপবন্ধের বিচারে তাঁর প্রবণতাগত আসক্তি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য সংগীতে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে বেশ স্বচ্ছন্দ এবং আপন। ভারতীয় সংগীত বা বাংলা গান তাঁর কাছে পরম্পরাগত, স্বাভাবিক,—কিন্তু প্রতীচীর সংগীতের রস ও মর্ম তাঁর নিজের আবিষ্কার। তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন:

> আমার মিউজিকাল মেমরি খুব ফেনোমেনাল ছিল। একটা পুরো সিম্‌ফনি আমার তিনবার শুনলে মুখস্থ হয়ে যেত এবং যে-কোনো জানা ওয়ার্কের একটা সেকেন্ডেও রেডিয়োতে শুনলে আমি বলে দিতে পারতাম ওটা কোন্ ওয়ার্ক।

পরবর্তীকালে তিনি ফিলম্ করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সংগীত মানে কেবল আদ্যিকালের আবহ নির্মাণ নয়, সংগীতের ব্যবহার শব্দের ব্যবহারেরই একটি রূপ। গান ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আবহনির্মিতির একটা নতুন ধরণ লক্ষ না করে উপায় নেই। যেমন 'অপুর সংসার' ছবিতে যে-রাতে অপু-অপর্ণার ফুলশয্যা হল সেই নৈশ নীরবতায় খোলা জানালার পরিসর দিয়ে দেখা যায় নদীতে সঞ্চরণশীল একটা নৌকা। সেখান থেকে ভেসে আসে ভাটিয়ালি গান: 'ও বন্ধু রে ঘরবাড়ি ছাড়িলাম রে'। গাঢ় বেদনার সন্তপ্ত উদাসী এমন গান প্রথম দাম্পত্য রাতে যে-বিধুরতা আনে তা যেন 'অপুর সংসার'-এর মূল সুর, যা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের। বহু পরে, অপর্ণার মৃত্যু ঘটে যাবারও বেশ কবছর পরে, অপু যখন কাজলকে নিতে শ্বশুরবাড়ি আসে, সেই রাতে আবার একই ভাটিয়ালির প্রয়োগ যেন সেই প্রথম রাতেরই পুনরাবর্তন। এখানে গানের ব্যবহার শুধু আবহনির্মিতি নয়, তাকে ছাপিয়ে একটা জীবনসত্যকে যেন বোঝানো।

গানের সংযত ও গূঢ়লক্ষ্য ব্যবহার যেমন তাঁর প্রতিভার একটা দিক, বিশেষ কয়েক মুহূর্তের সেকেন্ডের হিসেব কষে সুর রচনা তেমনিই তাঁর চিত্রনাট্যগত এক অংশ। অন্যেব সংগীত পরিচালনায় তাঁর অভিপ্রেত ধ্বনির ব্যবহার নানা সময় অসুবিধে সৃষ্টি করছিল। তিনি বলেছেন:

> আমি বুঝতে পারছিলাম যে রকম করে আমি চাই সেরকম তাঁদের করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন জলসাঘরে তিন মিনিট সাত সেকেন্ডের একটি দৃশ্য ছিল। তিন মিনিট সাত সেকেন্ডের নির্দিষ্ট সময়ে বাজানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিরুপায় হয়ে ৪.৫ মিনিট সময় দিলাম।

'জলসাঘর' ছবির সুরকার এমত সংকট কাটাতে তাঁকে খানিকটা আপস করতে হয়েছে। পরে এ-সংক্রান্ত কাজে তাঁর স্বাভাবিক সৃজনশীলতা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং দক্ষতা কতটা স্বায়ত্ব ছিল তার নমুনা দেখি অভিনেতা দীপঙ্কর দে-র বলা একটি ঘটনায়:

> প্রায় সকলেই জানেন মানিকদার একটি খেরোর খাতা থাকত। যাতে গোটা ছবির শট-ডিভিশন এক-একটি ফ্রেম ধরে ধরে মানিকদা এঁকে রাখতেন। সঙ্গে-সঙ্গে বাঁদিকের পৃষ্ঠায় স্বরলিপিও লেখা হয়ে যেত। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলাম 'শাখা-প্রশাখা' শুটিং-এর সময় সৌমিত্রদাকে যখন একটি বিশেষ দৃশ্য বোঝাচ্ছিলেন। মোমবাতির স্বল্প আলোয় সৌমিত্রদাকে দেখা যাচ্ছে, আপন মনে Gregorian chant নাকি Bachকরে যাচ্ছেন। ...কিন্তু বিস্ময়ের কারণ হল যখন দেখলাম 'Slow trolley forward'-এর সঙ্গে সঙ্গে মানিকদা সেই সুরটি গাইছেন এবং সুরও শেষ হচ্ছে,Trolley ও শেষ হচ্ছে। অর্থাৎ উনি সঠিকভাবে জানতেন ওই শটের মাপ কত, সময় কত, এবং কতটুকু সংগীত শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হবে। এটা সত্যজিৎ রায়ের পক্ষেই সম্ভব।

[সানন্দা। ১৫ মে ১৯৯২, পৃ১৯]

চলচ্চিত্র-শিল্পকে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতীক প্রতিমা দিয়ে বোঝা এবং বোঝানো সত্যজিতের আরেক মৌলিকতা। Symphony ও Sonata-র সাংগীতিক গঠন তাঁর চলচ্চিত্রের গঠনে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে একথা তিনি নিজেই কবুল করেছেন। প্রতিতুলনায় বলা যায় আঙ্গিকের দিক থেকে ভারতীয় সংগীতের রূপ তাঁকে টানেনি, কারণ এই সংগীতের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ বা রূপায়ণের সময় ধার্য থাকে না। গায়ক বা বাদক ভেদে হেরফের ঘটে যায় সময়ের। একটা ভারতীয় রাগ পনেরো মিনিট থেকে দু'ঘণ্টা পর্যন্ত গাওয়া বা বাজানো যায়। পাশ্চাত্য সংগীতে কিন্তু একটা সোনাটা বা সিমফনির রূপায়ণের সময়কাল সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট। চলচ্চিত্রেও সময়সীমার এমন ধরাবাঁধা সুনির্দিষ্ট। এইসব বিচার করে বলা যায়

সত্যজিতের চলচ্চিত্র বিস্তারধর্মী অত্বরগতির ভারতীয় সংগীতের পথ না নিয়ে গতিশীল মুভমেন্টবহুল সোনাটার ধরন পেয়েছে। আদি গজদার স্মৃতিচারণ করে (The Statesman Miscellany, Oct 11, 1992) সত্যজিতের একটা চমৎকার পর্যবেক্ষণের কথা বলেছেন এইভাবে,

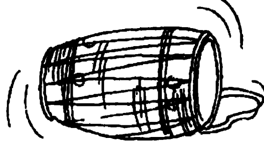
> Musically he referred to Charulata (and very aptly) as his string quintert (2 violins, 2 violas, and a cello), with Charu as first violin. Amal as second violin, and Bhupati as cello : that is three dominant characters, and Umapada and Mandakini tho two violas, who though not dominant but still essential characters for the quintet. It is a beautiful musical simile.

সাহিত্যের কাহিনিকে এমন যে সংগীতের প্রতীক প্রতিমায় রূপবন্ধের বিন্যাসে ভাবা তা যেমন মৌলিক তেমনিই অভিনব। সত্যজিতের সংগীত জীবনের গড়ে ওঠার কাহিনি ভালো করে অনুধাবন করলে বোঝা যায় সংগীত-পরিচালক হওয়া ছিল যেন তাঁর ভবিতব্য। স্কুলজীবন থেকে তাঁর চলচ্চিত্রে বিশেষত বিদেশি চলচ্চিত্রে অনুরাগ জাগে। নিজেই লিখেছেন, ভিয়েনা ডাবিন তাঁর প্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। বলেছেন :

> তাঁর চেহারা কিংবা অভিনয়-নৈপুণ্যই তার একমাত্র কারণ নয়, তার-সপ্তকেও(সোপ্রানো) তাঁর গলার কাজ ছিল চমৎকার। ফ্রেড অ্যাস্ট্রেয়ার আর জিঞ্জার রজার্সও ছিলেন আমার প্রিয় অভিনেতা। এঁদের প্রতিটি ছবিই যে আমি বারবার দেখেছি সে শুধু এইজন্য যে, আর্ভিং বার্লিন আর জেরোম কার্নের দেওয়া সুরের রহস্যকে আমি তখন আমার অন্তর দিয়ে বুঝে নিতে চাইছিলুম।

('অপুর পাঁচালি,' দেশ শারদীয় ১৪০০, পৃ:১০৩)।

সুরের সন্ধানে তাঁর সমকালীন সুরকারদের কাজ খতিয়ে দেখা এক ধরনের সৃজনশীল প্রবণতা। অন্যত্র জর্জ গের্সউইনের কথাও বলেছেন। এঁদের জীবন ও গান সত্যজিৎকে মুগ্ধ করেছে। জেরোম কার্ন (১৮৮৫-১৯৪৫), আর্ভিং বার্লিন (১৮৮৮ জন্ম), ও গের্সউইন (১৮৯৮-১৯৩৭) তখনও বেঁচে ছিলেন যখন সত্যজিৎ তাঁদের তারিফ করছেন। বিখ্যাত সংগীত পরিচালকদের মধ্যে ম্যাক্স স্টিনার, এরিক কর্নগোল্ড ও রোস্জার প্রশংসা করেছেন। শোপাঁ, শ্যুবার্ট, শ্যুমান ও ব্রাহ্‌মস্-য়ের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুরকারদের নিয়ে জীবনীচিত্র তিনি দেখেছিলেন। বিটোফেনের জীবনীচিত্রে সংগীত রচনার ক্রম ভঙ্গ করা সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য করেছেন। সংগীতের এমন আশ্চর্য বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটি কিন্তু কখনো যন্ত্রবাদনে আসক্ত বোধ করেননি। কিন্তু সংগীত পরিচালনার দায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পিয়ানোতে সুর কম্পোজ করতে শিখে নিলেন। স্টাফ নোটেশনের পাশাপাশি দক্ষতা অর্জন নিলেন আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে। সংগীত ছিল তাঁর নিশ্বাসের মতো। হিন্দুস্থান টাইমসের সাংবাদিক সুধীর দরকে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ১৯৮৯ সালের জানুয়ারিতে : 'I took to composing music as I couldn't find a film composer in India'। ভাগ্যিস তিনি কাউকে পাননি!



সত্যজিৎ ও গানের প্রয়োগ

সত্যজিৎ রায় অনুমান করেছেন :

থিয়েটারের পথ ধরেই বাংলা ছবিতে গানের প্রবেশ। বাংলা ছবির পরিণতির পথে যে যত্রতত্র গানের ব্যবহার একটা প্রধান প্রতিবন্ধকের কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতিতে গানের ব্যবহার হয়তো ততটা অসংগত নয়, কিন্তু যে-কোনো পরিচালকের যে-কোনো ছবিতেই যদি গান এসে পড়ে, তাহলে সেটাকে একটা জাতীয় বাতিকের পর্যায়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই বাতিকই কুন্দনলাল সায়গলকে তার আড়ষ্ট বাংলা সত্ত্বেও নায়কের আসনে বসিয়েছিল এবং নিউ থিয়েটার্সের একাধিক ছবির আর্থিক সাফল্যের পথ সহজ করে দিয়েছিল। আসলে বাঙালি দর্শক ছবিতে গান ভালোবাসে এবং মনের মতো গান পেলে পরিচালকের সাতখুন মাপ করে।

এর পাশাপাশি মনে পড়তে পারে ঋত্বিক ঘটকের সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য, যা ঝাঁঝালো ও জোরালো। তিনি মনে করেন :

আমার বন্ধুবান্ধব যাঁরা নতুন ধরনের ছবি করেন তাঁরা ছবিতে গানের ব্যবহারটা খুব নফরতকরেন, গানটান ব্যবহার করেন না। আমি করি এবং গান দিয়ে যদি আমার বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তো ব্যবহার করব।

সত্যজিতের মন্তব্য কি খুব উন্নাসিকতাগ্রস্ত? ঋত্বিক তাঁর মন্তব্যে বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করেছেন, যাঁরা ছবিতে সত্যজিতের গানের ব্যবহারকে তাচ্ছিল্য করেন, তাঁরা কারা? এই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অন্তত সত্যজিৎ রায় নিশ্চয়ই নেই, কেন না সত্যজিতের ফিল্মে গানের ব্যবহার ও ভূমিকা বেশ বড় রকমের। যদিও তা সংখ্যাগত নয়, গুণগত। তথ্য হিসাবে ধরা যায় যে, 'পথের পাঁচালি' থেকে 'দেবী' পর্যন্ত তাঁর পরিচালিত প্রথম ছখানি ছবিতে ব্যক্তিগতভাবে গানের ব্যাপারে সত্যজিতের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, কারণ ছবিগুলির সংগীত পরিচালক ছিলেন অন্যতর সংগীত-ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তা ভুল। রবিশংকর, বিলায়েত

খাঁ ও আলি আকবর খাঁ-র মতো কৃতী ও প্রসিদ্ধ খানদানি ঘরানার সংগীত পুরুষের আবহসংগীত বিষয়ে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও সত্যজিৎ তাঁর গানের ভাবনাকে অস্খলিত রাখতে পেরেছিলেন। গান তখনও পর্যন্ত তাঁর ছবির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠেনি ঠিকই, কিন্তু গান ব্যবহারে তাঁর বিশেষ চিন্তা বা ঝোঁক প্রথম থেকেই ছিল। চিন্তাটা এই রকম যে 'যত্রতত্র' গানের ব্যবহার ঘটবে না, কিন্তু প্রয়োজনে ঘটবে। এই ভাবনাটাই বিশেষভাবে বাঙালির স্বভাবগত। আইজেনস্টাইন বা ফেলিনি বা ডি সিকা এমন ভাবতে পারতেন না। কারণ গান জিনিসটা প্রতীচ্যের জীবনে ততটা অনিবার্য নয়। তাঁদের চেতনা অনেক বেশি ক্রিয়াপর হয়ে ওঠে যন্ত্রবাদ্যে বা আবহসংগীতে। গান বা Song জিনিসটা সমাদর পায় খোদ বিলাতে ও জার্মানিতে। জার্মানিতে গানকে বলে Leid। কিন্তু ভারতীয়, বিশেষত বাঙালিরা গানের ভক্ত। বাংলা ফিল্‌মে যদি গান এসে থাকে থিয়েটারের পথে, তবে থিয়েটারে এসেছে যাত্রা থেকে। যাত্রা আবার গীতময় হয়ে উঠেছে, স্মৃতিতে ধরে রেখেছে কথকতা, পাঁচালি ও পালা কীর্তনকে। এইসবই পরম্পরাগত সজীবতা। এক-একটা জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটা নিজস্ব মাধ্যম বা রূপবন্ধ থাকে, বাঙালির সেই নিজস্ব রূপবন্ধ হল গান।

সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালি' তৈরির প্রায় সূচনাতেই, কাস্টিংয়ের সময়ে গানের কথা ভেবেছিলেন। হতে পারে সেটা কাকতালীয়, কিন্তু ব্যাপারটা তাঁর বর্ণনানুসারে এইরকম :

চুনিবালা দেবীকে যেদিন প্রথম তাঁর পাইকপাড়ার বাড়িতে দেখতে যাই, সেদিনকার মনের অবস্থা ভোলবার নয়। ছবির কাজ শুরু হয়ে গেছে। অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়ার ভূমিকা নির্বাচন হয়ে গেছে।... বাকি আছে কেবল ইন্দির ঠাকরুন। চুনিবালা আমাদের হতাশ করলেন না। 'পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে'... বর্ণনার সঙ্গে অমিল হল না।

জিজ্ঞেস করলাম— আপনি ছড়া জানেন কোনো? আবৃত্তি করতে পারেন? 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' ছড়ার দশ বারো লাইনের বেশি আমি কখনো শুনিনি। চুনিবালার মুখে এর পরিসর বৃদ্ধি হল আশ্চর্যভাবে।...শ্রদ্ধা হল প্রবীণার স্মরণশক্তি দেখে।

চুনিবালার অনেক গুণের মধ্যে তাঁর গানের গলাটি আবিষ্কার হয় বেশ পরের দিকে। একদিন স্যুটিং-এর শেষে হরিহরের দাওয়ায় বসে বৈকালিক চা-পানের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি গান জানেন? উপন্যাসে বা চিত্রনাট্যে ইন্দিরের গানের উল্লেখ ছিল না, তবে কদিন থেকেই মনে হচ্ছিল, ইন্দিরের কোনো অলস মুহূর্তে তার সাদা গলায় গাওয়া একটি গান দিতে পারলে মন্দ হয় না।

এইখানে প্রশ্ন জাগে, সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিশ্চয়ই সত্যজিতের হাতে ছিল না, কিন্তু তবু কেন তিনি ইন্দির ঠাকরুনের গলায় গান দেবার কথা ভাবলেন? এই প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়, প্রথম থেকে ছবিতে গানের ভাবনা সত্যজিতের ছিল। 'দেবী' ছবির প্রয়োজনে তিনি তো গোটা একটা শ্যামাসংগীত রচনা করে ফেলেছিলেন। সম্ভবত সেটাই তাঁর প্রথম গান রচনা। যাইহোক, ইন্দির ঠাকরুনের গানের প্রসঙ্গে আবার উৎকলন দেওয়া যাক :

চুনিবালা বললেন : ধর্ম্মমূলক চলবে কি?

বললাম, চলবে।

ইন্দির গাইলেন—

মন আমার হরি হরি বল।
হরি হরি হরি ব'লে

ভবসিন্ধু পার চল।

গানটি রেকর্ড করা হোল।

এর কিছুদিন পরেই অর্থাভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রায় একবছর পরে যখন স্টুডিয়োতে নৈশ দৃশ্য তোলা হচ্ছে, তখন ইন্দিরের গান গাইবার দৃশ্যটি তোলার ফুরসত হয়। চাঁদনিরাতে দাওয়ার পশ্চিম দিকটায় পা ছড়িয়ে বসে হাতে তাল রেখে ইন্দির গান গাইছে।

শট নেওয়ার কিছুক্ষণ আগে চুনিবালা বললেন, 'আরেকটা গান মনে পড়ছে আমার। এটা আরও ভালো। শুনবেন?

হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হোল
পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা
ডাকি হে তোমারে।'

এমন আকস্মিকভাবে প্রথম বাংলা নিও-রিয়ালিস্টিক ফিল্‌মে অমোঘ একখানা গান চিরকালের মতো সংযোজিত হয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে গান যোজনার এক নব-ইতিহাস রচনা করল। ফিকিরচাঁদী পর্যায়ের চমকপ্রদ গানখানি চুনিবালা দেবীর স্মৃতির সরণি বেয়ে অবিনশ্বর হয়ে গেল বিশ্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রে।

'অতীতের বাংলা ছবি' বলে সত্যজিৎ রায় তাঁর ১৯৭৮ সালে লেখা নিবন্ধে যে সময়টা ধরতে চেয়েছেন তা ততটা অতীত নয়, মাত্রই ত্রিশ ও চল্লিশের দশক, যখন তিনি বড় হয়ে গেছেন। সে সময়ের বাংলা ছবিতে 'যত্রতত্র' গানের ব্যবহার, তাঁর মনে হয়েছে 'প্রধান প্রতিবন্ধকের কাজ করেছে'। এই প্রতিবন্ধ কীসের? নিশ্চয়ই চলচ্চিত্রের স্বভাবধর্মের বিকাশের এবং গতিশীলতার। কাজেই ছবি করতে এসে তাঁকে প্রথম থেকে খেয়াল রাখতে হয়েছিল অন্তত তাঁর কাজে যেন গান প্রতিবন্ধ না হয়। তার যত্রতত্র প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে সুষম ব্যবহার করলে রস ফুটতে পারে একথা তিনি ক্রমশ বুঝতে পারেন ছবি করতে করতে। যেমন 'পথের পাঁচালি'-র শুটিং চলাকালীন তাঁর প্রথম মনে হয় যে ইন্দির ঠাকরুনের কণ্ঠে 'কোন অলস মুহূর্তে তার সাদা গলায়' একটা গান গাওয়ার দৃশ্য দিতে পারলে মন্দ হয় না। এমন যে তাঁর মনে হল তার কারণ জন্মার্জিত গানের সংস্কার ও বাঙালিয়ানা— একে অতিক্রম করা মুশকিল। বাঙালি জীবনে গান সংস্কারের মতো ছায়াময়, প্রায় অদৃশ্য কিন্তু রক্তগত। মনে না হয়ে পারে না যে, অশীতিপর এক স্মৃতিসর্বস্ব বৃদ্ধা তার রিক্ত জীবনের নির্জনে বসে একা একা স্বতই গান করতে পারে নিজেরই জন্য। তাতে সুরসারের চমৎকারিত্ব না থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে কোনো শ্রোতা, কিন্তু এ তার নিজের-ভেতর-থেকে উঠে-আসা গান, জীর্ণ জীবনকে পেরিয়ে। এ-গানে বাদ্যযন্ত্রের সংযোগ নিষ্প্রয়োজন, সত্যজিৎ তাই 'সাদা গলা'-র কথাই ভেবেছিলেন। 'পথের পাঁচালি' ছবি প্রথম যাঁরা দেখেন, ইন্দির ঠাকরুনের করুণ বিলাপের মতো গান তাঁদের আমূল নাড়িয়ে দিয়ে যায়। তার কারণ শুধু সুরের আর্ত কারুণ্য নয়, দৃশ্যপটে ক্যামেরার কৌশলে ইন্দিরকে ছায়াময়ীরূপে দেখানো এবং গানের বাণী 'আমি দীনভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে'-র মর্মান্তিক দ্যোতনা।

একদিক থেকে এ তো বাঙালি জীবনের সবচেয়ে সত্য গান। রিক্ততার, নির্জনের, ধূসরতার গান। অথচ সেই নিঃসম্বল অনিশ্চিত দীনভিখারি জীবনের আকণ্ঠ জীবনপিপাসাই 'পথের পাঁচালি'-র মূল থিম। তাই 'যারা পরে এলো তারা আগে গেল/আমি রইলাম পড়ে' এই নির্বেদ ও সন্তাপ যে-বৃদ্ধার, প্রাণের সন্ধ্যাকে যে পার হতে চায়, তার চোখ কিন্তু উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে আহার্য সামনে পেলে। তার কাঁথাকানি-ছেঁড়া

মাদুর ঘটি-আগলানো জীবনেও ফোকলা দাঁতের হাসি ফোটে অপু-দুর্গার সান্নিধ্যে। তাই 'পার কর আমারে'-র আকুতি আর পার হতে না-চাওয়ার জীবনস্বপ্ন ইন্দির চরিত্রকে দ্বন্দ্বের বিন্যাসে চমকপ্রদ করে তুলেছে। এমন চরিত্র যদি আদ্যন্ত একখানা বাংলা গান না গায় তবে চরিত্রটি সম্পূর্ণ ফোটে না। সত্যজিতের সংগীত-বোধে এই কথাটা তাঁর প্রথম চিত্র পরিচালনার সময়েই জাগরূক হয়েছিল। তখনও আমরা জানতে পারিনি ভবিষ্যতে বাংলা ছবির গানে তাঁকে কত বড় অগ্রণীর ভূমিকা নিতে হবে।

'পথের-পাঁচালি'-র এই গানের অভিমান সত্যজিতের জীবনে অত্যন্ত স্মরণীয় থেকে গিয়েছিল। গান একটা দিতে হবে এমন চিন্তা তাঁর মনে ছিল কিন্তু কোন্ গান তা ঠিক করা ছিল না। চুনিবালা প্রথম যে-গান বেছে নেন এবং যা রেকর্ডও করা হয়, পরে চুনিবালার স্মৃতির মঞ্জুষা থেকে সমর্থতর অন্য যে-গানটা বেরিয়ে আসে, সেটাই কালজয়ী হয়; তার কারণ সবচেয়ে স্বাভাবিক জায়গায় সবচেয়ে স্বাভাবিক গানের সংযোজন। এ ঘটনা ও অভিজ্ঞতা থেকে সত্যজিৎ যে-কোনো শিক্ষা নেননি তা নয়। নিয়েছিলেন যে তার প্রমাণ তাঁর সারাজীবনের তৈরি চলচ্চিত্রের নানা পর্যায়ে ধরা আছে। এমনও মনে হতে পারে যে তাঁর চলচ্চিত্রের গান মনের ভিত্তি তৈরি করে ভিতরের হাহাকারকে ও অব্যক্তকে ব্যক্ত করে। নিজের স্বাধীন সংগীত পরিচালনায় 'মণিহারা'-য় 'বাজে করুণ সুরে' এমনই এক ভিতরের হাহাকার ও অব্যক্তকে জাগিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথের গান তখন আর তত রাবীন্দ্রিক থাকে না, প্রয়োগের গুণে হয়ে ওঠে সিনেমার গান অর্থাৎ সিনেমার নিজস্ব ওঠাপড়া ও নিঃশ্বাসের সমলগ্ন। দৃশ্যের ভিতরে থেকে আবার দৃশ্যের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সেই গান মণিমালিকার মানসিক সকালসন্ধ্যাকে উন্মোচন করে দেয়, ছুঁয়ে যায় তার ব্যর্থ যাপনের দৈনন্দিনকে।

'চারুলতা' সত্যজিতের সবচেয়ে মনস্ক ও পরিণত সংগীত বুদ্ধির ছাপ ধরে রেখেছে। কিন্তু ১৯৬৪ সালের এই নান্দনিক সৌকর্যের ছবিটি বেরোবার আগে তাঁর দিক থেকে ছিল সংগীতের হাতে-কলমে প্রস্তুতিপর্ব। 'কাঞ্চনজঙঘা' (১৯৬২), 'অভিযান' (১৯৬২), ও 'মহানগর' (১৯৬৩) চারুলতার সদ্য পূর্ববর্তী। এ সময় সত্যজিতের চলচ্চিত্রের পূর্ণ যৌবন। সবদিক থেকে মানুষটি ঝকমক করছিলেন। নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে ছবি করে যাচ্ছিলেন এবং তা দর্শকদের, অর্থাৎ প্রকৃত সিনেমা দর্শকদের মন ভরিয়ে দিচ্ছিল। এর মধ্যে 'অভিযান' ও 'মহানগর'-এ গানের ভূমিকা স্বভাবতই ক্ষীণ, কিন্তু 'কাঞ্চনজঙঘা' নিঃসন্দেহে সাংগীতিক, অবশ্য গানের সংখ্যা বিচারে নয়। গান তো গোনাগুনতি এ ছবিতে একটাই আর দার্জিলিঙের পাহাড়ি লোকজীবনের টুকরোটাকরা নেপালি গান আবহকে গড়ে তোলে। কিন্তু এই প্রথম সত্যজিৎ একটি সূচয়িত রবীন্দ্রগানে একজন সংবেদনসম্পন্ন আধুনিক নারীর অ্যালিয়েশনকে গেঁথে দিলেন 'এ পরবাসে রবে কে' উচ্চারণে। একদিক থেকে নিজেদেরই গড়ে তোলা এই বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন আধুনিক সত্তার মর্মযাতনা, যা শুধু অদৃশ্য কারণে মর্মন্তুদ হয়ে থাকে, তাকে বোঝাতে ওই গানটি বেছে নেওয়া এবং অমিয়া ঠাকুরের বয়সোচিত গায়নে তাকে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত করে দেওয়া যেন রিক্ততার একটা সমাধানহীন ধূসরতাকে টেনে আনে।

'কাঞ্চনজঙঘা' সত্যজিতের নিজের তৈরি চিত্রকাহিনি। যার মূল কেন্দ্রে আছেন অভিজাত ও দর্পী ইন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি (ছবি বিশ্বাস), সত্যজিতের ভাষায় 'domineering British title-holding' প্রবীণ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর মর্যাদাময়ী চেহারার স্ত্রী লাবণ্য (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়), সত্যজিতের ভাষায় 'resigned once-talented'। গল্পটা এঁদের এবং পুত্রকন্যাদের। দার্জিলিঙে ভ্রমণরত এই রায়চৌধুরি পরিবারের সঙ্গে এসেছেন ইন্দ্রনাথের বড় শ্যালক লাবণ্যের দাদা জগদীশ (পাহাড়ী সান্যাল)। পক্ষীজীবন সম্পর্কে সমুৎসুক এই মানুষটি নানা ধরনের পাখি দেখার আনন্দে মশগুল তাঁর দূরবীক্ষণে। কিন্তু আত্মভোলা এমনতর মানুষটির

অন্তর্বীক্ষণে ধরা পড়েনি, রায়চৌধুরি পরিবারের নীড়ে কতখানি ভাঙন ধরে গেছে। ইন্দ্রনাথ-লাবণ্যের দাম্পত্য জীবনে প্রেমের চেয়ে প্রতাপ বড় হয়ে উঠেছে কখন অন্তঃশীলভাবে। লাবণ্য তার দলিত জীবনে ভারী নিঃসঙ্গ ভাবেন নিজেকে, তাঁর স্বামী-পুত্রকন্যার এবং অর্থ কীর্তি সচ্ছলতায় ভরা সংসারের মাঝখানে বসবাস করেন। এ নিঃসঙ্গতা হল স্বামীর কর্তৃত্ব ও প্রতাপের কাছে সংবেদী নারীসত্তার অস্বীকৃতি ও উপেক্ষার। আপন ঘর তাই লাবণ্যের কাছে হয়ে ওঠে পরবাস। দার্জিলিং ভ্রমণের আত্মবীক্ষার অবসরে লাবণ্য তাই একা একাই খুঁজে নেন নিসর্গ নীরবতার প্রান্তর। হঠাৎ যেন জাতিস্মরের মতো তাঁর ক্ষুভিত অন্তরাত্মা ভেদ করে বার হয়ে আসে একখানি গান : 'এ পরবাসে রবে কে হায়'। এ তাঁর আত্ম আবিষ্কারের গান, আত্ম আবরণ ছিন্ন করে দেবার আয়োজনে। গানই তা সম্ভব করে। তা অন্তঃরুদ্ধ সত্তাকে, অভিজাত জীবনের ছদ্ম বর্ণময়তাকে দীর্ণ করে ঝোরার মতো উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে। লাবণ্য-র আত্মসংকট, তার অস্তিত্ব ও শঙ্কাতুর মন বুঝতে পারে দুখভয়সংকটে তাকে ধরে রাখবে, আশ্রয় ও শুশ্রূষা দেবে তেমন আপন কেউ নেই চারপাশে। এইখানে গান এসে তাঁর পাশে দাঁড়ায়, ঘটে যায় ঈপ্সিত মোক্ষণ।

কে জানত তেইশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের লেখা এই চার পঙ্ক্তির টপ্পা অঙ্গের গান এতখানি মহিমা পাবে, ধরবে এত বড় নিঃসঙ্গ আধুনিকতাকে? প্রয়োগশিল্প তো একেই বলে। যার মেধাবী ব্যবহারে শিল্পের ঘটে জায়মানতা। সত্যজিৎ এইভাবেই টেনে আনেন গানের বেদনাকে, জীবনের রিক্ত প্রান্তরে। কিন্তু শুধু গানটাই থাকলে এত কথা উঠত না। গানের শেষে দর্শক দেখেন দাদা জগদীশ বহুদিন পরে তাঁর স্নেহাস্পদা বোনের গলায় গানের অন্তর্নিহিত সন্তাপকে শনাক্ত করে এসে গেছেন সেখানে। গানের শেষে এককালের কুমারী বয়সে নির্ভরযোগ্য জগদীশকে দেখে লাবণ্য শুধু অস্ফুট উচ্চারণ করতে পারে 'দাদা'। সস্মিত দাদা মনে করিয়ে দেন : 'কত কাল পরে তুই গান করলি'।

এতক্ষণে সত্যজিৎ কথিত 'once-talented' বিশেষণটি মর্মগ্রাহী হয়ে ওঠে। লাবণ্য তাহলে শুধু বিগতজীবনকে ফেলে আসেননি, শুকিয়ে গেছে তাঁর গানেরও সম্পন্নতা। অভিজাত ঐশ্বর্যময় পরিবারে এসে তাঁর গানের ঐশ্বর্য রিক্ত হয়ে গেছে। লাবণ্য এখন চারিদিকের কাজের জীবনে, সফলতার পরিবেশে হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর সংবেদন, তাঁর গান। যে-গানের গায়িকা ছিলেন তিনি, শ্রোতা সমঝদার ছিলেন দাদা। কোথায় গেল সে জীবন? কণ্ঠ থেকে কে গান ভুলিয়ে দিল? কেন এসে গেল গানহীনতার প্রতিকারহীন নির্বাস? গান ও গানহীনতার এই ছক সত্যজিৎ তাঁর পরবর্তী কয়েকটি ছবিতে আবার অন্যভাবে আনবেন কিন্তু সে আলোচনার আগে এখন আসবে অগ্রাধিকারের দাবিতে, 'চারুলতা'।

'চারুলতা' সত্যজিতের সবচেয়ে পছন্দের ছবি তাঁর নিজের বিচারে। এর চিত্রনাট্য যে সবচেয়ে সুগ্রথিত তাতে বিতর্ক নেই। সৌমিত্র-মাধবী-শৈলেনের অনবদ্য অভিনয়, উনিশ শতকের নানা খুঁটিনাটি ডিটেল্স্‌য়ের কাজ, পোশাক-আশাক, রবীন্দ্রকাহিনির নিজস্ব ব্যাপ্তি ও গভীরতা এ ছবির সবচেয়ে জনচিত্তজয়ের কারণ। 'চারুলতা' কিন্তু সত্যজিতের বিশিষ্ট নিরীক্ষাময় সাংগীতিক ছবি। এতে নানাভাবে তিনি তাঁর সংগীতের বোধ ও বিবেচনা, সময়ের ছাপ ও দেশীয়তা এনেছেন। উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত এক শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে গানের ভূমিকা কেমন ছিল তার ইতিহাসরূপেও 'চারুলতা' আলাদা ডকুমেনটেশনের মর্যাদা পাবে।

পরিবারের কর্তা ভূপতি (শৈলেন মুখোপাধ্যায়) সংগীতছুট, কাজের মানুষ। মানুষটি বেশ সংবেদনশীল কিন্তু কাজপাগল। এই নিরন্তর কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরিবারে চুঁইয়ে পড়ছে স্বতোচ্ছল গানের প্রমোদ। সন্তানহীনা লাবণ্যময়ী এ কাহিনির নায়িকা চারু (মাধবী) স্বামীসঙ্গ পায় না কিন্তু সাহিত্য আর সংগীতে তার মনকে ভরিয়ে রাখে। সম্পর্কিত দেবর অমল (সৌমিত্র) এ পরিবারে তার সমুদ্ভাসিত তাপময় অস্তিত্ব নিয়ে

আসে, ভরিয়ে দেয় সাহিত্য ও গানের যুগলতরি, ভেসে যায় নিজে, কিন্তু পরিবারে এনে দেয় একটা গাঢ় ছায়া, যা বুঝি ঘোচার নয়। সভ্য শালীন পারিবারিকতার ফাঁকে এসে পড়ে চারুর দাদা উমাপদ ও তার বউ মন্দা, তারা মূল গল্পে একটা বিশ্বাসঘাতকতার স্পর্শ রাখে। কিন্তু আমাদের লক্ষ সেদিকে নয়। শুধু গানের চোখ দিয়ে 'চারুলতা'-র একটা অন্যরকম মূল্য নির্ধারণ করতে পারি আমরা এবং সেই সঙ্গে সত্যজিতের সংগীতবোধের গভীরতার দিকে ইঙ্গিত দিতে পারি।

ছবি শুরু হয় নিঃসঙ্গ এক মধ্যদিনে। চারু একা একা রুমালে কারুকাজ করে। তার নির্জন সময় আর কাটে না অলস দুপুরে। একবার ভৃত্যকে ডাকে, নির্দেশ দেয়। কাক তাড়ায়। এমব্রয়ডারির কাজ বিছানায় ফেলে একটা বাংলা বই তুলে নেয়, আবার সেটা রেখে দেয়। তার নিঃসঙ্গ জীবনের অস্থিরতা এভাবেই ফুটে ওঠে। এবারে অন্দরমহল পেরিয়ে বারান্দা দিয়ে ড্রইংরুমে এসে আলমারি খুলে পুরোনো একখানা বই রাখে এবং নতুন একখানা বাছে। এইবার তার কণ্ঠে গুনগুন ওঠে : 'বংকিম বংকিম...বংকিম বংকিম'। সুরটা সরল প সা র্গ র্স া/প র্স া র্গ র্স া, কিন্তু সুরের এই গুনগুনানি, যা ছন্দোময়, আমাদের বুঝিয়ে দেয় চারু গাইতে ভালোবাসে। হয়তো নিজে নিজেই গায়।

আসলে এই প্রথম সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে একটা অপেরাটিক দৃষ্টিকোণ মেলে ধরেন। যার ধরনটা হল সংলাপের বদলে সুরে কথা বলা। সেটা ক্রমে ফুটে ওঠে। যার প্রথম উন্মেষ 'বংকিম বংকিম' সুর করে উচ্চারণে।

ইতিমধ্যে চারুর নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে ভূপতি এনে দেন চারুর দাদা-বউদিকে। বউদি মন্দা চারুকে সঙ্গ দেয়। দুপুরে দুজনে তাস খেলে, কুলপি কিনে খায়। তাস খেলার দৃশ্যে মন্দাকিনী বলে, চিত্রনাট্যে যেমন দেখি :

মন্দা ইস্.....কাপন—আয় চিঁড়ে ভাজা.....এস বাবা হরুঠাকুর...... ও মা, ওমা আর মাত্র তিনটে তাস।

চিড়েতন বলতে চিঁড়েভাজা যে মন্দার গলায় এসে যায় সে তার ঘরোয়া খাদ্যবিলাসের ঝোঁকে, কিন্তু হরতন বলতে হরুঠাকুর একেবারে অভিনব। কিন্তু সত্যিই কি অভিনব? উনিশ শতকের গানবাজনার গাঙ্গেয় বাংলা কবিগানের স্মৃতি কি সহজে ভুলতে পারে? হরুঠাকুর-অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি-ভোলা ময়রার কবিগান সেকালের অন্দরমহলেও ঢেউ তুলেছিল। সত্যজিৎ চকিতে সেই কালকে ছুঁয়ে দেন সংলাপের দ্যুতিতে।

এরপরেই আসন্ন ঝড়ের দৃশ্য। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিস্রস্ত বেশবাস সামলে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে!—বউঠান!' হাঁক দিয়ে অমল প্রবেশ করে 'চারুলতা' ছবিতে। পরে, অমল তার ঘরে সদ্যস্নাত আনন্দে গুনগুন করে : 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়'। গানটা চারুর সঙ্গে কথার ফাঁকে ফাঁকে এক এক কলি বেরিয়ে আসে কিন্তু পুরো গানটা শেষ হবার আগে মন্দা বউঠান গরম সিঙারা আনে। রাতে ভূপতির ঘরে কর্মরত ভূপতির কাছে অমল গুনগুন করতে করতে ঢোকে : 'যব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী...আদম গুজরি—সদ্‌মা গুজরি...'। এই যে কেবলই গানের আয়োজন তা কি এটা বোঝাতে নয় যে অমল গীতরসিক যুবা? গান তার গলায় স্বতই এসে যায়। একটা চরিত্রের মিউজিকাল আসপেক্ট আলাদাভাবে দেখানো, চরিত্রটিকে গানের মানুষ বলে আগে থেকে প্রতিষ্ঠা করা এই ব্যাপারটা বাংলা ছবিতে আগে দেখা যায়নি। সেখানে আমরা দেখতে অভ্যস্ত নায়িকার জন্মদিনে পিয়ানো বাজিয়ে হঠাৎ গান। পরে সারা ছবিতে নায়িকা হয়তো আর গানই গায় না, এমনকি গুনগুনও নয়। এমনতর ঘটনা দেখতে আমরা অভ্যস্ত। সত্যজিৎ একটা লজিক তৈরি করেন এখানে। অমল গান গায়, চারুও গায়। দুজনের এই দিক থেকেও সখ্য। অবসরে অমল পিয়ানোতে হাত পাকায়। কী সেই সুর? চিত্রনাট্য অনুযায়ী :

অমল পিয়ানোর সামনে বসে। তার আঙুল 'গড সেভ দ্য কুইন' সুরটা নিয়ে খেলা করছে।

ভূপতি হঠাৎ গম্ভীর ও থমথমে হয়ে যায়।

ভূপতির সংলাপের সঙ্গে সুরটা চলতে থাকে।

ভূপতি অমল, politics is different··········

অমল পিয়ানোর সুরটা তুলে যাচ্ছে

এখানে সাধারণ দর্শকদের পক্ষে তো অমলের বাজানো সুরটা শনাক্ত করা সম্ভব নয়, কারণ, 'গড সেভ দ্য কুইন' গড়পড়তা মানুষ শুনল কবে? বিশেষত এখনকার দর্শক? বৃটিশরাজের অধীনস্থ বঙ্গবাসী অবশ্য এ সুর চিনতেন। চারুলতার কালপর্ব (ভিক্টোরিয়া যুগ) সেটাই। কাজেই এই সুর বাজানো কেবল অমলের সাংগীতিক কসরত নয়, সেইসঙ্গে তার স্যোশাল ক্লাসকে বোঝানো এবং ছবির কালকে জানানো। কিন্তু সুরটা যে 'গড সেভ দ্য কুইন' তা বোঝাবার কৌশল সত্যজিৎ নিয়েছেন বাজনা শুনে ভূপতির কথায়। চিত্রনাট্য :

ভূপতি : কুইন তো সেভড্ হবেন, কিন্তু বাঙালি জাতিটা কী করে সেভ্ড্ হবে সেটা ভেবে দেখেছ কি?

এই হল সত্যজিতের চলচ্চিত্র মেধা। শুধু একটি সংলাপে দর্শক জানতে পারেন পিয়ানোর সুরও এখানে সংলাপ। যে অপেরাটিক দৃষ্টিকোণের কথা আগে উঠেছিল তার চমৎকার প্রতিসরণ এবারে চারুর বেডরুমে। দুপুর। চারু একমনে একটা কাঠের ফ্রেমে এক টুকরো কাপড়ের উপর তার এমব্রয়ডারির সেলাই চালিয়ে যাচ্ছে। তার মুগ্ধ দর্শিকা মন্দা। চিত্রনাট্য এরপরে :

অমল বারান্দার দিক থেকে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে প্রবেশ করে, তার মাথায় শামলা।

মন্দা : একী বেশ বাবা!

অমল : 'ও মন, ভাবলে বল আর কি হবে! যা আছে কপালে তা ঘটবে কালে কালে'— মন্দা বউঠান একটা পান সাজ তো দেখি!

মন্দা : না, সাজব না!

এখানে অপেরাটিক ধরন এইটাই যে গানের পরে 'মন্দা বউঠান একটা পান সাজ তো দেখি' সংলাপটুকু অমল সুরে বলে। মন্দার উত্তর 'না, সাজব না' টুকুও সেই একই সুরে। চিত্রনাট্যে এরপর :

অমল চারুর হাতে ফ্রেমে আঁটা নক্‌শাটা দেখে।

অমল : ওটা কী হচ্ছে কী

মন্দা ঘর থেকে বেরোবার আগে উত্তরটা দিয়ে যায়।

মন্দা : কর্তাবাবুর চটি।

চারু গুনগুন ক'রে গান গাইছে।

অমল : (সুর ক'রে) দাদার কী সৌভাগ্য!

চারু : (সুর ক'রে) তোমারও হবে।

অমল : কী, চটি?

চারু : উঁহু। বউ।

এখানে লক্ষ করবার বিষয় যে 'দাদার কী সৌভাগ্য' এবং 'তোমারও হবে' কথা দুটো অমল ও চারু সংলাপে না বলে সুরে বলে, যা অপেরাটিক। সুরটাও খুব মামুলি নয়। দেশরাগে নিবদ্ধ তার চলন এইরকম :

মা পা না -া -া না ধনা -া র্সা
দা দার্ কী ০ ০ সৌ ভা গ্ গ

র্সা র্সা র্সা র্সর্সর্সনর্সরা র্সা র্সা
তো মা রো ০০০০০০০ হ বে

অমলের সাজানো ঈর্ষা আর চারুর সরস জবাব, হতেই পারত স্বাভাবিক সংলাপের ধরণে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের সংগীত বিবেচনা সংলাপে সুর বসিয়ে দেয় এটাই বোঝাতে যে গানে সুর করে কথা বলা এদের কাছে জলভাত। এভাবেই তিনি তৈরি করেন মিউজিকাল পার্সোনালিটি, যারা কেবল জন্মদিনে পিয়ানো বাজিয়ে সারা ছবিতে একবারই গায় না। গায় বারে বারে, নানা উচ্ছ্বাসে, নানা ছলে। সেটাই তাদের যৌবন, তাদের পারস্পরিক সাড়া, যা আসছে প্রাণের ভিতর থেকে। গানহীনতার একটা বেদনা 'কাঞ্চনজঙঘা'-য় একবার আমরা ছুঁয়ে গেছি, এবারে পেলাম গানময়তার উচ্ছল উদ্বেল ঊর্মি। এরপরে ভূপতির রম্য উদ্যানে দোলনায় দোল খেতে খেতে চারু যদি 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' গানটার সম্পূর্ণ অংশ গায় তাতে তার অন্তরের পরিপূর্ণ ব্যক্ততা প্রকাশ পায়। অন্যান্য চলচ্চিত্রের গানের মতো দর্শকদের তখন আর শ্রোতার নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হয় না, গান তাদের গ্রাস করে। চারু যৌবন নিকুঞ্জের পাখির মতো গেয়ে ওঠে যার মধ্যে 'কী জানি কিসের লাগি' একটু হাহাকারও কি মেশে না?

ছবির পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় আরেকদিন অমল উদ্যানে বসে লিখে চলেছে আর চারু দোলনায় বসে অপেরা গ্লাস চোখে দিয়ে অমলের লেখাটা পড়ছে। হঠাৎ চারু বলে : 'রেফ্ দিলে না?' অভিভূত অমল বলে : 'থ্যাংক ইউ'। খুশি ছড়িয়ে পড়ে চারুর মনে। থ্যাংক ইউ শব্দ দিয়ে সে গান বানায়। গুনগুন করে : 'থ্যাংক ইউ...থ্যাংক ইউ...থ্যাংক ইউ...থ্যাংক ইউ'। সেই ফিরে আসা আগের চেনা সুর পা র্সা র্গা সা। সেই 'বংকিম বংকিম'। দর্শক বোঝে চারু-অমলের সম্পর্ক এখন সেইখানে যেখানে সব কথাই গান। সবই সুরময়, মদির। তারই আরেক উন্মাদনা ফুটে ওঠে চিত্রনাট্যের পঞ্চম পর্বে— দুপুরে ড্রইংরুমে অমল পিয়ানো বাজিয়ে গায় : 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'। ছন্দবহুল এই নাটকে অমল একবার পিয়ানো থেকে উঠে চারুর হাত ধরে নাচাতে চাইবে এবং গানের শেষ হবে 'ও বউঠাকুরানী' সংযোজনে। কিন্তু তারপরেই তাদের সম্পর্কের মধ্যে এসে যাবে নানা উচ্চাবচ জটিলতা। মনঃস্তত্ত্বের নানা বিভঙ্গ এসে গ্রাস করবে মূল কাহিনির ভূমি। এরপরে তাদের জীবনকে আর দেখা যাবে না গীতময় সহজতায়।

কিন্তু 'চারুলতা'-র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের গানের নেপথ্যবিধানের কাজ এখানেই শেষ হয়ে যায় না। উনিশ শতকের গানের অন্দরমহল উদ্ঘাটন করবার জন্য ভূপতির ড্রইংরুমে এক রাত্রিকালীন আসর পরিকল্পনা করেন তিনি। উপলক্ষ : বিলেতের নির্বাচনে গ্ল্যাডস্টোনের জয়। লিবারালদের জয়ে ভূপতি ও তার বন্ধুদের সমাবেশ। সেখানে সমকালীন গানের আয়োজন করে পরিচালক সময়টা ধরতে চান। কোনো গড়পড়তা পরিচালক এ-কাজ করতেন কিনা সন্দেহ কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের সংগীত-মনস্কতার কাছে এমনটাই তো আমাদের প্রত্যাশা। চিত্রনাট্যে আসরের বর্ণনা :

ফরাসের উপর জয়দেব তানপুরা বাঁধছে, পাখোয়াজ বাদক পাখোয়াজ বাঁধছে এবং এসরাজ বাদক এসরাজে সুর লাগাচ্ছে।

মতিলাল : অর্ডার! অর্ডার! ভাই ভূপতি— পাখোয়াজ তৈরি, গাইয়ে রেডি, আর বাক্যব্যয় করে লাভ আছে কি?

ভূপতি : গান হবে অবশ্যই।.....আমাদের এই উৎসব, আমাদের পোলিটিক্যাল কনশাস্‌নেস, আমাদের

'সেন্টিনেল' কাগজ—এ সবের মূলে রয়েছেন ওই এক ব্যক্তি, রাজা রামমোহন রায়। আজকের দিনে যিনি সর্বপ্রথম লিবারাল তাঁকেই আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য।

সকলে সমস্বরে 'হিয়ার-হিয়ার' ইত্যাদি সহ হাততালি দেয়।

ভূপতি : জয়দেব এখন তাঁর রচিত একখানা গান গেয়ে তোমাদের শোনাবে।

নিশিকান্ত : আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। কিন্তু প্রথম গানটি গাওয়ার পর, ধরো যদি আমরা আর একটু লিবারাল হয়ে নিধুবাবুর একটি টপ্পা শশাঙ্ককে দিয়ে গাওয়ানো যায়—

এ প্রস্তাবও সকলে সমর্থন করে।

এই সব আয়োজন ও বাগ্‌বিস্তারের পরে জয়কৃষ্ণ সান্যালের কণ্ঠে রামমোহনের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংগীত 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর' গানটি বলিষ্ঠ খানদানে সংযোজন করেন সত্যজিৎ। ধ্রুপদ গানের চারতুকের বিস্তার যতক্ষণ চলে, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় ভূপতির বাড়ির কক্ষে কক্ষে, ততক্ষণে দর্শক ক্যামেরায় দেখেন উমাপদ সিন্দুক খুলে ভূপতির ক্যাশবাক্স থেকে নোটের বান্ডিল চুরি করে। সংগীতময় মানুষগুলি, বিশেষত ব্রহ্মসংগীতে লীন ভূপতি কিছু টের পান না। অন্য এক ঘরে অমল আর চারুর নিভৃতালাপের মাঝখানে গানের আসরে পালাবদল ঘটে। এবার ধ্রুপদ শেষ হয়ে নিধুর টপ্পা সংযোজন করেন সত্যজিৎ শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। সবই আসলে period piece।

'চারুলতা'র গানের পালা এখানেই শেষ। শুধু মনে থাকে বিলেত যাবার প্রস্তাবে অমল একদিন ভূপতিকে বলেছিল : 'মেডিটেরানিয়ান! কী অদ্ভুত নাম দাদা! মেডিটেরানিয়ান...ঠিক যেন তানপুরার ঝংকার'। ছবির শেষে কৌশলে সত্যজিৎ আরেকবার নিয়ে আসেন কথাটা মাদ্রাজ থেকে পাঠানো অমলের চিঠিতে আমরা পড়ি : 'ভালোই আছি, তবে ক'দিন থেকে যেন তানপুরার ঝংকারটা কানে বেশি বাজছে'। অনবদ্য টাচ।

এইভাবে স্তরে স্তরে বোনা থাকে চারুলতার অদৃশ্য গানের বিন্যাস। শ্রুতিকে তৃপ্ত করাই কেবল যার কাজ নয়। ছবির নানা সূক্ষ্ম কাজে, চরিত্রকে ফোটাতে, কালপর্বের ইঙ্গিত দেবার জন্য, মনের আনন্দ উচ্ছ্বাসের শিহর বোঝাতে, মানুষগুলির শ্রেণিচরিত্র উন্মোচন করতে এবং নিছক জীবনের যাপনগত সুখ জানাতে সত্যজিৎ গানে গানে ভরে দেন 'চারুলতা'। অপেরার মতো গানকে করেন অনর্গল ও অনায়াস। আর সব কিছু ছাপিয়ে লাবণ্যময় ধ্বনিতে বারে বারে বাজে, বেজেই যায় নেপথ্যের থিম গান : 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে'। অবশ্য যন্ত্র বাজে, কিন্তু সেই বাজা বড় বাণীময়।

তবু 'চারুলতা'-কে কোনো অর্থেই বলা যায় না মিউজিকাল। যদিও গানের এমন সংযত ও পরিকল্পিত ব্যবহার সত্যজিতের কোনো ছবিতেই নেই। শেষপর্যন্ত 'চারুলতা' হয়ে ওঠে ভূপতি-চারুর অপ্রেমের কাহিনি কিন্তু তাতে কেমন যেন গানের অন্তর্জগৎ উঁকি মারে।

'চারুলতা'-র পিঠোপিঠি ছবি 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' (১৯৬৫) একেবারে ভিন্ন রসের ছবি। 'মহাপুরুষ'-এ গানের প্রশ্নই ওঠে না। 'কাপুরুষ' ছবির গান যোজনার চকিত কৌশল আগে বলা হয়েছে। কেবল বলা হয়নি সংগীতছুট চা-বাগানের ম্যানেজার বিমল গুপ্ত-র সম্পর্কে সত্যজিতের ছোট একটা ট্রিটমেন্ট। বিমল মানুষটা আত্মসর্বস্ব, মদ্যপায়ী ও আত্মতুষ্ট। টাকা রোজগারই তার একমাত্র লক্ষ্য। সেইসঙ্গে ক্ষমতা ও উন্নাসিকতা। ম্যাথু আর্নল্ড যাকে Philistine বলেছেন বিমল একেবারে সঠিক সেইরকম। লেখক অমিতাভ চিত্রকাহিনি লেখার জন্য আঞ্চলিকতার সন্ধানে এসেছিল চা-বাগান অঞ্চলে। বিমল গুপ্ত-র পরিবারে ঘটনাচক্রে সে ছিল ক্ষণিকের অতিথি। সে চিত্রকাহিনি লেখে এ কথা জেনে বিমল গুপ্ত উন্নাসিকভাবে বলে : 'boy meets girl, boy gets girl, boy loses girl'। জীবন কি এতটাই সরল ছকের? অন্তত বিমল গুপ্ত-র

মতো দাম্ভিক ফিলিস্টাইনের চোখে এতটাই সহজ। কৌশলে অবশ্য সত্যজিৎ 'কাপুরুষ' কাহিনির সারাৎসার এভাবেই বলে দিয়েছেন।

বিমল গুপ্ত মানুষটি কিন্তু বুদ্ধিমান। এককালের অর্থনীতির ছাত্র আপাতত চা-বাগিচার কর্তাব্যক্তি। ইংরাজ প্ল্যান্টারদের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার চা-বাগানের নির্জন পরিবেশকে অন্য এক কৃত্রিমতায় ও শ্রেণিস্বাতন্ত্র্যবোধে ভরিয়ে দিয়েছে! বিবেক সেখানে মদের পেগে নিমজ্জিত। জীবনের সফলতার একমাত্র মাপকাঠি অর্থ রোজগার। বিমল এখানকার বিচিত্র পরিবেশে থেকে থেকেই ক্রমে ফিলিস্টাইন বনে গেছে। রবীন্দ্রসংগীতপ্রিয় তার সংবেদী স্ত্রী করুণা নিঃসঙ্গ। ব্যর্থ প্রেম তাকে নিদ্রাহীনতা উপহার দিয়েছে। অমিতাভ-র মধ্যবিত্ত ভীরুতা এককালে তাদের বিবাহ ঘটাতে দেয়নি। করুণা নিজেকে দারুণ আত্মকরুণায় সরিয়ে নিয়েছে লোকালয়হীন চা-বাগানে এক অসম দাম্পত্যে। গান শুনে তার দিন কাটে, বড়জোর বেরিয়ে আসে দু'এক কলি, এই পর্যন্ত। এবারে সত্যজিতের ট্রিটমেন্টের বিশেষত্ব ও চাতুর্যের প্রসঙ্গটা স্পষ্ট হবে। অমিতাভ-করুণাকে চায়ের টেবিলে বসিয়ে রেখে বিমল স্নান করতে বাথরুমে যাবার জন্য ওঠে। হঠাৎ গানছুট মানুষটা গেয়ে ওঠে : 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে', বাথরুমে ঢুকে যায়। কী অত্যাশ্চর্য গান নির্বাচন সত্যজিতের। একটা মানুষকে আগাগোড়া বোঝার পক্ষে এমন একখানা গানই যথেষ্ট। 'কাপুরুষ' প্রশংসিত ছবি হয়নি কিন্তু গানহীনতার একটা ছক এতে আছে।

১৯৬৫ সালে 'কাপুরুষ' আর ১৯৭০ সালে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। মাঝখানে 'নায়ক' (১৯৬৬), 'চিড়িয়াখানা' (১৯৬৭) ও 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৯)। গু গা বা বা বেশ কতকাংশে মিউজিকাল ছবির লক্ষণাক্রান্ত, তাই 'হীরক রাজার দেশে'-সঙ্গে মিলিয়ে তার সম্পর্কে আলাদা বিশ্লেষণ করতে হবে। 'নায়ক' ও 'চিড়িয়াখানা' গানের দিক থেকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেমন নয় পরবর্তীকালের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১), 'অশনি সংকেত' (১৯৭৩) ও 'জনঅরণ্য' নাগরিক মধ্যবিত্তের কলকাতাকেন্দ্রিক কাহিনি। সমাজের টানাপোড়েন, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ও বহুবিচিত্র নগর-নাটকের এসব টানটান কাহিনিতে ও চরিত্রের সাজানো গোছানো চাকচিক্যের ঔজ্জ্বল্যে গানের স্নিগ্ধ বা গূঢ় কোনো অবকাশই নেই। বড়জোর একটু আধটু অনুষঙ্গ ও যন্ত্রবাদনে গানের উঁকিঝুঁকি। 'নায়ক'-এর পুরো কাহিনি-উন্মোচন ফ্ল্যাসব্যাক পদ্ধতির সাহায্যে ও ইন্টারভিউয়ে। পটভূমি এক লম্বা ট্রেনভ্রমণে সর্বদা গতিশীল। গান সেখানে বেমানান হত। 'চিড়িয়াখানা' সত্যজিতের পুরো উদ্যমের প্রয়াস নয় কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে এতে একটা পুরোনো নাট্যদৃশ্য ফোটাতে সংগীত পরিচালক সত্যজিৎ আড়ি ছন্দে ভারী একটা নতুন গান নিজে লিখে সুর দিয়েছিলেন। 'ভালোবাসার তুমি কী জানো' নমিতা ঘোষালের কণ্ঠে এই গানটা বেশ নাড়া দিয়েছিল দর্শকদের। 'দেবী' ছবির পর এই দ্বিতীয়বার তাঁকে ছবির প্রয়োজনে গান লিখতে হয়েছে। এরই পিঠোপিঠি মাত্র এক বছরের মধ্যে তাঁকে যে 'গু গা বা বা' ছবির জন্য অনেক গান লিখতে হবে তখন তিনি কি তা জানতেন?

গানের একটা যথাযথ ব্যবহারের নমুনা ও পরিবেশ পরিস্থিতি বোঝানোর নিগূঢ়তা টের পাওয়া যায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে। এমনিতে খুব সাদামাটা গল্প। চার বন্ধু গেছে বেড়াতে। উঠেছে বুদ্ধির কৌশলে কিন্তু বেআইনিভাবে এক-ডাকবাংলোয়। চার বন্ধু চাররকম স্বভাব ও জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তবে সকলেই মধ্যবিত্ত। কেউ চাকুরে কেউ বেকার। অরণ্যে এসে তারা কদিনের জন্য সভ্যসমাজের মুখোস খুলে প্রাকৃত জীবনযাপন করতে চেয়েছিল। এমনকি দাড়িও নাকি কামাবে না কদিন। কিন্তু সেই শহুরে প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল ত্রিপাঠি পরিবারের সঙ্গে আকস্মিক আলাপ হবার ফলে। সদাশিব ত্রিপাঠির (পাহাড়ী সান্যাল), কন্যা

অপর্ণা (শর্মিলা) ও বিধবা পুত্রবধূ জয়া (কাবেরী) অরণ্যের শ্যামলিমায় এনে দিল নানা বর্ণের দ্যুতি। অরণ্যের নৈঃশব্দে অন্য এক জীবনবেদনার মুখরতা বা যৌবন প্রত্যাশার উত্তাপ ছড়িয়ে গেল। ছায়াছবিতে যাকে বলে exposition বা উন্মোচন তা সত্যজিৎ এ-ছবিতে খুব নিপুণভাবে করেছেন। কতরকম অন্তঃসম্পর্কের টানাপোড়েন ও ইঙ্গিতধর্মী অন্তর্মুখিতা যে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে আছে!

'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র চারযুবা অসীম, সঞ্জয়, শেখর ও হরি প্রায় সমবয়সি বন্ধু। চিত্রনাট্যের বয়ান অনুসারে অসীম 'উন্নতিশীল অবস্থাপন্ন', সঞ্জয় 'জুটমিলের লেবার অফিসার', শেখর 'জুয়াভক্ত বেকার' এবং হরি 'চৌকশ খেলোয়াড়'। চারজনের মধ্যে হরির একটা ব্যর্থ প্রেমের প্রত্যাখ্যান তার মধে মরীয়াভাবে এনে দিয়েছে, মদ্যপান তাকে আদিবাসী রমণীর প্রতি উপগত করে। শেখর হ্যাপি-গো-লাকি-টাইপের আমুদে কিন্তু পরজীবী। কাহিনিতে অসীম কিছুটা ঝোঁকে অপর্ণার দিকে, সঞ্জয়ের সঙ্গে অনতিব্যক্ত মনস্তাত্ত্বিক জটিল সম্পর্ক দানা বাঁধে বিধবা জয়ার। কিন্তু এদের এক্সপোজিশন হয় একেবারে ছবির শেষের দিকে যখন জানা যায়, চিত্রনাট্য অনুযায়ী :

নদীর ধারে।

অপর্ণা অস্তগামী সূর্যের দিকে চায়। মাদলের শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে।

অপর্ণা : তিনবছর আগে আমার দাদা suicide করেন।...দাদা আমার খুব বন্ধু ছিলেন।

অসীম স্তব্ধ। খবরটা তার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

অপর্ণা : আর আমার যখন বারো বছর বয়স, তখন আমার মা আগুনে পুড়ে মারা যান। আমি ছাড়া তখন বাড়িতে কেউ ছিল না।

পরে অপর্ণা অসীমকে বলে, 'আপনি বোধহয় জীবনে কোনো বড়ো দুঃখ পাননি, তাই না?' কথাটা সত্যিই। ত্রিপাঠি পরিবারের এক্সপোজিশন আলাদা আলাদাভাবে ঘটে। নদীর তীরে অপর্ণা জানায় অসীমকে। সম্পূর্ণ অন্য পটভূমিকায় জয়া বলে সঞ্জয়কে। চিত্রনাট্যে আছে

জয়া : আমার স্বামী suicide করেছিল, জানেন?

সঞ্জয় : অবাক।

সঞ্জয় : সে কী?— কেন?

জয়া : সে কী করে জানব? এখানে তো নয়, —বিলেতে।...আর কেউ ছিল বোধ হয়।

এই দুটো উদ্‌ঘাটন যেমন অসীম ও সঞ্জয়কে বিস্ময়-বিমূঢ় ও হতচকিত করে তেমনই করে দর্শকদের। অরণ্যের নৈঃশব্দে আরেক অশ্রুত শব্দহীন বেদনা সংযোজিত হয়। প্রমোদ ভ্রমণ তখন আর তত বিলাস বিহ্বল থাকে না এবং এই প্রথম সদাশিবের অনেক আগে গাওয়া একটা অতুলপ্রসাদের গান আমাদের কাছে তাৎপর্য ও দ্যোতনাময় হয়ে ওঠে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে ওই একটাই তো গান।

অরণ্যবাসের তৃতীয় দিন সকালে চার বন্ধুর ঘুম ভাঙে বেশ দেরিতে, আগের রাতের মদ্যপান তার কারণ। সকালে ত্রিপাঠি পরিবারে তাদের ডিম দিয়ে প্রাতঃরাশ করার কথা ছিল। সলজ্জে তারা দেখতে পায় বাংলোয় বারান্দায় একটা হট ক্যারিয়ারে রেখে যাওয়া ব্রেকফাস্ট ও জয়ার চিঠি। খেয়ে দেয়ে তারা ত্রিপাঠি বাড়ি যায়। এ সময় সেখানে তারা অপ্রত্যাশিত। ত্রিপাঠি-কটেজের বারান্দায় অপর্ণা বই পড়ছে, জয়া উল বুনছে, জয়ার ছেলে টুবলু 'স্লেটে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং' লিখছে। কিন্তু মন্থর স্তব্ধ এই সকালে সদাশিব আপন মনে চোখ বুঁজে গেয়ে চলেছেন অতুলপ্রসাদের গান : 'শুন সে ডাকে আমারে'। গানে সদাশিবের

এতটাই মগ্নতা যে চার বন্ধুর বাড়ি ঢোকা, বারান্দায় এসে তাঁর পিছনে দাঁড়ানো, এসব কিছুই তিনি টের পান না। গানটা সত্যজিৎ পাহাড়ি সান্যালকে দিয়ে সরাসরি গাইয়েছেন তার প্রধান কারণ পাহাড়ি গাইতে জানতেন (যেমন চুনিবালা)। অতুলপ্রসাদের গান কেন? সত্যজিৎ তাঁর অন্য কোনো ছবিতে অতুলপ্রসাদের গান ব্যবহার করেননি। এ ছবিতে যে করলেন তার কারণ পাহাড়ি অতুলপ্রসাদী গানের লখ্নউ ঘরানার খাঁটি চালটা গাইতে সমর্থ ছিলেন। তাঁর গানের শিক্ষা খোদ অতুলপ্রসাদের কাছে। গানটাও বিখ্যাত এক রাগদারী গানের ('ভবানী দয়ানী') সুর নিয়ে গড়া। ঠিক গানের ঠিক genre ফোটাতে সত্যজিৎ খুব সতর্ক ছিলেন, তাই পাহাড়ির গায়ন। এই দৃশ্যে অতুলপ্রসাদী গান সন্নিবেশের আরেক যুক্তি হল, ত্রিপাঠি পরিবার ব্রাহ্ম। অতুলপ্রসাদের গান ব্রাহ্মসমাজে বরাবর সমাদৃত।

অতুলপ্রসাদের গানে বিষণ্ণতা ও আত্মনিবেদনের নিজস্ব একটা ধরন আছে বাণী ও সুরের সারল্যে। সদাশিবের স্ত্রী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন, একমাত্র পুত্র বিদেশে আত্মঘাতী। বাড়িতে অনূঢ়া মেয়ে ও বিধবা পুত্রবধূ, নাতি। দৈবপ্রহৃত বৃদ্ধ তাঁর এই আত্মজীবনে ঈশ্বর ছাড়া কাকেই বা অবলম্বন করবেন? তাই ওই গান। গান শেষ হলে অপর্ণা বাবার সামনে এসে ঘোষণা করে :

অপর্ণা : বাবা আজ কিন্তু অনেকে তোমার গান শুনেছেন।

সদাশিব থতমত খেয়ে পিছনে ফিরে যুবকদের দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

সদাশিব : আরে—এরকম ত কথা ছিল না—কোথায় তোমরা এসে ডিম খাবে, না সাত সকালে বুড়ো মানুষের গলায় ভগবানের নাম?

অসীম : ন সত্যি—

সঞ্জয় : আপনি এত ভালো গান—হেঁ হেঁ—

সদাশিব : আরে দূর—আমার আবার গান! দম পাই না, কথা মনে থাকে না—আমার মেয়ের মেমারির উপর নির্ভর করে আর কত গান গাওয়া যায়!

বয়োপ্রবীণ পাহাড়ি সান্যালকে দিয়ে তাঁর অপটু কণ্ঠে গান করানোর লজিক সত্যজিৎ বড় সুন্দরভাবে সদাশিবের সংলাপে বুনে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেই সত্যজিৎ কোনো দক্ষ গায়ককে দিয়ে গানটা প্লেব্যাক করতে পারতেন কিন্তু করান নি। সেটা তাঁর গানের সমঝদারি। হোন বৃদ্ধ বা দমছুট কণ্ঠ তবু পাহাড়িকে দিয়েই গাইয়েছেন। একই যুক্তিতে 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ রেবা মুহুরী এবং 'সোনার কেল্লা'য় রাজস্থানি গায়িকা সোহিনীবাইকে ব্যবহার করেছিলেন। গানের জাত সম্পর্কে তাঁর এতটাই সম্ভ্রম ছিল। সদাশিবকে অপর্ণা যখন বলে, 'বাবা আজ কিন্তু অনেকে তোমার গান শুনেছেন' তখন সত্যজিৎ ব্যঞ্জনায় বুঝিয়েছেন সকালে সদাশিবের ভক্তিগীতি গাওয়া আকস্মিক কিছু নয়। রোজই তিনি গান করেন। তাঁর সন্তপ্ত মনের মোক্ষণের গান। পরিবারের মানুষগুলিই তা কেবল শোনেন অন্যদিন। কিংবা শ্রোতানিরপেক্ষ সদাশিবের গান তাঁর নিত্যকৃত্য। গানই তাঁর জীবনবন্ধু।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৯), 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' (১৯৭৭) এবং 'হীরক রাজার দেশে' (১৯৮০) তিনখানি সংগীতবহুল ছবি পেরিয়ে সত্যজিৎ তাঁর পরিণত বয়সে ১৯৮৪ সালে 'ঘরে বাইরে' করেন। এ তাঁর সেই বহুস্বপ্নিত ছবি যার বিন্যাস ও চিত্রনাট্য তিনি বার বার বদলেছেন। শেষ চিত্রনাট্য তাঁর পরিণত সংগীত-কর্তৃত্বের ছাপ বহন করছে। ১৯৬৪ সালে অমলের গান গাইবার জন্য তিনি কিশোরকুমারকে

বেছেছিলেন সৌমিত্রের গলার সঙ্গে timbre মিলিয়ে। ১৯৮৪ সালে ঠিক কুড়ি বছর পরে সেই কিশোরকুমারকে আবার ব্যবহার করলেন সন্দীপ-রূপী সৌমিত্র-র কণ্ঠে। এক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করে কিশোর-কণ্ঠ, যা কুড়ি বছরের ব্যবধানে সমান সতেজ ও ওজস্বী ছিল।* বহুদিন পরে, 'ঘরে বাইরে', গানের বৈচিত্র্যে মধুর ও উদাহরণীয় হয়ে উঠেছে।

ঘরের মানুষ বিমলাকে বাইরের জগতে আনতে চেয়েছিল নিখিলেশ, তাকে সহায়তা করে সন্দীপের আগ্নেয় উপস্থিতি ও দেশপ্রেমের জোয়ার। সত্যজিৎ তাঁর পরিণত চিন্তা থেকে সন্দীপের কণ্ঠে তিনরকমের গান সন্নিবেশ করেছেন। উনিশ শতকের 'পিরিয়ড পিস্'রূপে তাঁর গান নির্বাচন সঠিক, যেমন সঠিক ছিল 'চারুলতা'-র গান যোজনার বিচিত্রতা। রবীন্দ্রসংগীত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান এবং অক্ষয় বড়ালের গান 'ঘরে-বাইরে'-তে একটা খোলামেলা গানের বিশ্ব গড়ে তোলে।

ছবির প্রকৃত সূচনা বলতে গেলে নিখিলেশের অন্দরমহলের দৃশ্যে। বিমলার ইংরেজ গভর্নেস মিস গিল্‌বি তাকে মৌখিক ইংরাজি, সাহেবি আদবকায়দা এবং বিলিতি গান সবই শেখান। শুরুতেই যেমন দেখি ও শুনি গান শেখানোর দৃশ্য। চিত্রনাট্যে আছে :

মিস গিল্‌বি পিয়ানো বাজিয়ে গান করছেন, বিমলা তাঁর পাশে হাতে বই নিয়ে দাঁড়িয়ে গান শিখছে। মিস গিলবি দু'লাইন গান করেন, বিমলা সেটা সুর করে পুনরাবৃত্তি করে।

গিল্‌বি Tell me the tales that to me were so dear—

বিমলা Tell me the tales that to me were so dear—

গিল্‌বি Long, long ago—long, long ago—

বিমলা Long, long ago—long, long ago—

গানটা এভাবে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি এগিয়ে চলে। একটা ভিক্টোরিয়া বিলিতি ব্যালাড-গানের স্মৃতি-ভারাতুর টানা সুরের চলন মন্থর গতিতে এগোয়। শিক্ষার্থী বিমলা ও তৎপর গিল্‌বি স্থানকাল ভুলে গেয়েই চলেন। কখন যে নিঃশব্দে নিখিলেশ এসে দাঁড়িয়েছে কেউ জানে না। গানের শেষে হাততালির শব্দে গিল্‌বি ও বিমলা সচকিত হয়ে নিখিলেশকে দেখতে পায়। তাবা কিছুটা অপ্রতিভ।

পরে বিমলার নিখিলেশকে গান না-শোনানোর ছদ্ম অনুযোগে খানিকটা দাম্পত্যরস ফুটে ওঠে। নিখিলেশ বলে, 'I've asked her several times, but she's never sung for me'। এ সবই সাজানো ঝগড়া দর্শক বোঝেন।

'ঘরে বাইরে' ছবির গোড়াতেই যে গানের সমাবেশ, বিলিতি গান শেখানোর প্রত্যক্ষ আয়োজন গভর্নেসের কাছে, তার পেছনে সত্যজিতের সচেতন চিন্তার ছাপ আছে। গান এ ছবির বহির্ভূত কোনো বিনোদন নয়, অন্তর্বিষয়। নিখিলেশ-বিমলার জীবন কাহিনিতে সময়ের যে-ধরতাই সেটা এ গানে স্পষ্ট, সেইসঙ্গে বিমলাদের উচ্চবিত্ততা ও বৃটিশ সভ্যতার প্রতি অনুরাগ। এমন অভিজাত ও সমৃদ্ধ ঘরের অন্দর থেকেই সন্দীপের টানে তার বাইরে আসা আর তারই সূত্রে যাপনগত তোলপাড় 'ঘরে বাইরে'-র মূল সুর। 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' গানটির সুর সেতারে বারবার নানা লয়ে ঝংকৃত হয়ে সারাক্ষণ এই চিত্রকাহিনিতে দামি ফ্রেমের মতো চকচক করে। তবু কিন্তু 'ঘরে বাইরে' মুখ্যত গানের ছবি নয়, যেমন 'চারুলতা'। যদিও এ গল্পে বিমলা গান শেখে ও গায়, বিত্তশালী উন্নত পরিবারের পক্ষে সংগত গানই শেখে কিন্তু তার আয়োজন পরিবেশন

* এখানে একটা অন্য কথা উঠবে। ১৯৬৯ সালে 'গু গা বা বা' এবং ১৯৮০ সালে 'হীরক রাজাব দেশে' ছবি দুটিতে গুপীর গান অনুপ ঘোষাল যে-দক্ষতায় ও কণ্ঠ সামর্থ্যে গেয়েছিলেন ১৯৯২ সালে 'গুপী বাঘা ফিরে এলো' ছবিতে সেই কণ্ঠবাদন ম্লান হয়ে গেছে। গানগুলি এজন্যই হয়তো জনপ্রিয় হয়নি।

সত্যজিতের দিক থেকে আসলে ডিটেলেরই অন্যতর এক কারুকাজ। গানের আনন্দ ও বেদনা কোনোভাবেই মূল সিনেমার ছককে ছোঁয় না।

কিন্তু সারা ছবিতে আয়োজন থেকেই যায় এবং নানাভাবে ব্যবহৃত হয় ধনী পরিবারের প্রতীকী পিয়ানো। প্রসঙ্গত 'ঘরে বাইরে'-তে পিয়ানো বাজনাঘটিত একা টুকরো সংঘটন এবং সে সম্পর্কে সরস মন্তব্যের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন সত্যজিতের সংগীতজ্ঞ বন্ধু আদি গজদার। মিস গিল্‌বির কণ্ঠে প্লেব্যাক করেছিলেন এঁরই স্ত্রী রোশন গজদার। আদি গজদার লিখেছেন :

> It was during the shooting of *Ghare Baire*, Satyajit Ray had asked me to play the piano for the old Victorian balled 'Long, long ago'. Arriving on the set, I discovered to my surprise that it was going to be the first take of the film...
> Ray directing Jennifer kapoor and Swatilekha Sengupta on the piano in the frame and myself tapping away at the keys of the one outside it.
> But my piano was slightly out of tune.What could I do? Ray was unruffled : It didn't matter, he said, most–if not all–zamindar's piano were always a bit out of tune!

'চারুলতা'-র পরে 'ঘরে বাইরে'-তে পিয়ানোর ব্যবহার দৃশ্যত বহুলাংশে রয়েছে। উগ্র স্বদেশিয়ানার মত্ততায় মিস গিল্‌বির একদিন মাথায় লাগে ইঁটের টুকরো। তিনি শহর ছেড়ে চলে যান, ফলে ছেদ পড়ে যায় বিমলার সংগীত শিক্ষায়। কিন্তু গিল্‌বির শেখানো গানের স্মৃতি বিমলা ভোলে না। মাঝে মাঝেই ছবিতে গুনগুনিয়ে ওঠে 'Long long ago' গানের সুর ও বাণী। ছবির প্রথম দিকেই বিমলা বিলিতি সেন্টের গন্ধ প্রসঙ্গে গুনগুন করে 'Won't you buy my pretty flowers' গানের কলি। তাতে নিখিলেশও গলা মেলায়। নিখিলেশকে গানের সামিল করে সত্যজিৎ বোঝান বিলিতি গানে তার রুচি আছে। সন্দীপের স্বদেশি বক্তৃতা শোনার পরবর্তী কালে বিমলা যখন রাতে শোবার ঘরে 'Tell me the tales' গাইতে থাকে তখন বিলিতি গানের ভক্ত নিখিলেশ রসিকতা করে বলে, 'এমন বক্তৃতার পরও তুমি বিলিতি সুর ভাঁজছ?' বিমলা জানতে চায় তবে কী সুর সে ভাঁজবে? নিখিলেশ বলে, 'কীর্তন—শ্যামা সংগীত— নিধুবাবুর টপ্পা'। সত্যজিতের অভ্রান্ত ইতিহাসবোধ এই সংলাপে রয়ে গেছে। উনিশ শতকের উচ্চ সমাজের অন্দরমহলে গানের ব্যবহার ঠিক তাইই ছিল। অনুমান করা যায় বিমলা মিস গিল্‌বির ছাত্রী হবার আগে এসব গানই দুয়েকটা জানত। তাই সে এবারে গাইতে থাকে কীর্তন 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি'। নিখিলেশ বলে, 'That's better'।

বিশেষভাবে গানের নির্বাচনে আলাদাভাবে লক্ষ করা দরকার, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' খুব মামুলি বা গতানুগতিক কীর্তন নয়। সাধারণভাবে মহাজন পদাবলিতে যাকে বলে 'রূপানুরাগ' পর্যায়, গানটা তার অন্তর্গত। পদাবলি গানে কৃষ্ণের জবানিতে রাধার রূপ বর্ণনার পদ প্রচুর পাওয়া যায় কিন্তু রাধার চোখে কৃষ্ণের রূপোচ্ছ্বাসের পদ খুব বিরল। তেমনই একটা বিরল পদ খুঁজে এখানে সত্যজিৎ বিমলার গলায় দিয়েছেন। দেওয়ার পিছনে যে বিশেষ উদ্দেশ্য তা বোঝা যাবে চিত্রনাট্য দেখলে। সন্দীপকে চাক্ষুসভাবে বিমলা ওইদিন জীবনে প্রথম দেখেছে। সেই প্রসঙ্গে গানের ফাঁকে সংলাপ :

বিমলা : ভদ্রলোক কিন্তু বলেন ভালোই। ভাষার উপর বেশ দখল আছে।

নিখিল : কলেজে ডিবেট করত—

বিমলা : 'ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে'— বেশ লাগছিল দেখতে গেরুয়া পরা ছেলেগুলোকে।

নিখিল : হুঁ—

বিমলা হাতে শাল নিয়ে এবার চেস্ট অব ড্রয়ার্সের উপর রাখা সন্দীপের ছবির দিকে এগিয়ে যায়। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে গান গেয়ে চলে।

বিমলা : 'মদন মুরুছা পায়'

বিমলা সন্দীপের ছবিটা তুলে নিয়ে সেটা দেখে

বিমলা : কদিন থাকবেন ?

কৃষ্ণের রূপোন্মাদ রাধার গান বিমলার মুখে দেওয়া অসামান্য প্রয়োগ পরিকল্পনা। সন্দীপের হাসির 'তরঙ্গ হিল্লোলে'-র স্মৃতি কি বিমলার মনে? গেরুয়া পরা ছেলেগুলোকেই কি শুধু 'বেশ ভালো লাগছিল' বিমলার? তাদের নেতাকে নয়? কেন তার গান থামে না? 'মদন মুরুছা পায়' গাইতে গাইতে কেন সে সন্দীপের ছবি তুলে নিয়ে দেখে? গানের ব্যবহার এখানে বড় বাঙ্ময়।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত বিমলা ও সন্দীপের পরিচয় ঘটেনি। পরিচয় ঘটল পরদিন সকালে নিখিলেশের বৈঠকখানায়। বিমলাকে দেখে সন্দীপ অভিভূত বাক্যহারা হয়ে গেল। ক্রমশ কথায় কথায় জেগে উঠল তার পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব, তার বাচনের ক্ষিপ্রতা ও চরিত্রের সপ্রতিভ লক্ষণ। সন্দীপ বোঝালো, 'কাজটাই আসল নিখিল। কাজটা আসবে উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে, উদ্দীপনা আসবে মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। ফরাসি বিপ্লবে মার্সেইয়েজ গানের ভূমিকা তুমি জানো না?...আমাদের দেশের কবিরা স্বদেশি গান লিখছেন তুমি জানো? সে গান তো লোককে মাতিয়ে তোলার জন্যেই।'

কীর্তন, শ্যামাসংগীত, নিধুর টপ্পা আর বিলিতি গানের জগতে এভাবেই বাংলায় এসেছিল নতুন স্বদেশি গান। সেটাই ইতিহাস। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে এদেশে জেগে উঠেছিল স্বদেশি গানের উন্মাদনা। তার কিঞ্চিৎ আগে হিন্দুমেলা ঘটিয়েছিল স্বদেশি গানের সূচনা। সন্দীপ স্বদেশি গানের শক্তি, তার জনজাগরণের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন তাই ফরাসী বিপ্লবকে কীভাবে 'লা মার্সেইয়েজ' গান তরঙ্গিত করে তুলেছিল তার কথা জানিয়ে দেয়। আসলে এ তো সত্যজিতেরই সংগীত জ্ঞান এবং সঠিক প্রাসঙ্গিকতায়।

স্বদেশি গান সম্পর্কে সন্দীপ যে ক্ষিপ্র বাচন শোনায় নিখিলেশকে তার আসল লক্ষ্য কি বিমলা? সম্ভবত তাই, কেননা বক্তব্যের শেষে বিমলাকে সন্দীপ বলে : 'আপনি শুনেছেন এ গান?' বলেই গান ধরে : 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'। কিশোরকুমারের দৃপ্ত গায়নে সত্যজিৎ পুরো গানটাই একটানা গাওয়ান। 'ঘরে বাইরে'-র কাহিনিকালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই গান সংলগ্ন। সন্দীপের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে-এ গানের বাণীর সাম্য লক্ষণীয়। সন্দীপের স্বদেশি আন্দোলনে গানের সংযোগ মানুষটার চিত্তবৃত্তিকে স্পষ্ট করে দেয়। সে যেমন জীবনরসিক, ধূমপায়ী ও নারী সচেতন, তার পক্ষে কেঠো বিপ্লবীয়ানা সাজে না। সে গানেরও মানুষ, এবং তা যে শুধু স্বদেশি গানই নয় তার পরিচয় মেলে বিমলাকে যখন সে পরিহাসদ্রব গান 'বুঝতে নারি নারী কি চায়/কী চায় গো' শুনিয়ে দেয় কথার পিঠোপিঠি।

বিমলার রূপ ও কমনীয় নারীত্ব সম্পর্কে সন্দীপের আসক্ত আচরণ কোথাও গোপন থাকে না। বিমলা সম্পর্কে তার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়াতে সত্যজিৎ একটি দৃশ্য পরিকল্পনা করেছেন বৈঠকখানায়। সন্দীপের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিমলা পিয়ানোর দিকে এগিয়ে যায়। পিয়ানোর ডালা খুলে, সত্যজিতের বর্ণনা অনুযায়ী 'বেটোফেনের একটি মিনুয়েট বাজাতে শুরু করে', বাজনা বন্ধ করে, আবার পিয়ানোতে হাত দেয় কথার ফাঁকে ফাঁকে। চিত্রনাট্য :

সন্দীপ তার বাজনা শুনে অবাক। বিমলা বাজানো শেষ করে।

সন্দীপ : আপনি পিয়ানোও বাজাতে পারেন?

পিয়ানোর ডালাটা বন্ধ করে বিমলা উঠে পড়ে।

বিমলা : শিখছিলাম। পিয়ানো, গান—

সন্দীপ : ইংরিজি গান?

বিমলা গুন্‌গুন্ করে গান ধরে।

বিমলা : 'Tell me the tales that to me were so dear–
long, long ago, long, long ago–'

সন্দীপ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বিমলা গাইতে গাইতে টেবিলের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকায়।

'Sing me the song I delighted to hear–
long, long ago–long ago'

বিমলা চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক।

বিমলার গানের ঢঙে একটা সহজ সাবলীলতা থাকে। গান তার আয়ত্তে, তাই পিয়ানো ছাড়াই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজে গায়। তার দক্ষতা প্রমাণ করবার জন্যই সত্যজিৎ এতটা ভেবেছেন এবং পিয়ানোয় মিনুয়েট বাজিয়েছেন।* পাশাপাশি সন্দীপের সাংগীতিক সামর্থ্য সম্পর্কেও তিনি লক্ষ রেখেছেন। তাই পরে আরেকদিন সকালে নিখিলেশের বৈঠকখানায় সন্দীপকে দেখা যায় পিযানো বাজিয়ে গাইতে। গানটি হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশিবিদেশি সুরে বোনা নতুন বর্গের গান : 'চল্‌রে চল্ সবে মানব সন্তান/মাতৃভূমি করে আহ্বান'। বিমলা দরজায় এসে দাঁড়ালে সন্দীপ গান বন্ধ করে তার দিকে তাকায়। হেসে বিমলা বলে, 'আপনি স্বদেশি ছেড়ে গান ধরুন।'

গানের এতরকম বিস্তারিত আয়োজন ও প্রযত্ন বুঝিয়ে দেয় সত্যজিৎ রায় কত গভীরভাবে গানের প্রয়োগ সম্বন্ধে ভাবতে চাইতেন। কত সতর্ক ও ইতিহাসচেতন ছিল তাঁর সংগীত-বীক্ষা। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সাংগীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সফল নয় 'ঘরে-বাইরে'। সেই সফলতা ও পরিপূর্ণ সাংগীতিকতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও ছ'বছর। ১৯৯০ সালে আসে সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে পরিণত সাংগীতিক ছবি 'শাখাপ্রশাখা'। মূল কাহিনিতে শাখাপ্রশাখার মতো ব্যাপ্ত হয়ে গেছে সুরের অস্তিত্ব। কিন্তু এ ছবিতে কাজের মানুষ ও অকাজের মানুষের মধ্যে যেমন একটা ভেদ রেখা টানেন পরিচালক, তেমনই বিভাজন ঘটে গান এবং গানহীনতার মধ্যে। সেটা ক্রমে বোঝা যাবে।

কৃতী মানুষ আনন্দমোহনের চার ছেলের মধ্যে মেজ ছেলে প্রশান্ত বিদেশে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। বাইরে কাজের জগতে সে মূল্যহীন যদিও আনন্দমোহনের সন্তানদের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে মেধাবী ও সম্ভাবনাপূর্ণ। দুর্ঘটনা তার জীবনে প্রতিবন্ধ এনেছে কিন্তু খুলে দিয়েছে তার অন্তর্জগৎ। সে জগৎ সংগীতময়। প্রশান্ত ঘরে বসেই সংগীতের বিশ্বনাগরিক। এ ঠিক গানের জগৎ নয়, ব্যক্তিগত সুরের জগৎ। তাতে সকলের প্রবেশাধিকার নেই।

* মিনুয়েট (Minuet) খুব সহজ বাজনা নয়। মূলত এটা নাচের বাজনা যার সূচনা সপ্তদশ শতকে। অষ্টাদশ শতকে মিনুয়েটকে উন্নত করেন বাখ্ ও হ্যান্ডেল। হেড্‌ন্ মিনুয়েটকে গরিমা দেন তাঁর সিম্‌ফনি ও কোয়ার্ট্রেটে যুক্ত করে। মোজার্ট একে রম্য ও মার্জিত করেন। বিটোফেন এই মিনুয়েটকে চরম পর্যায়ের শিল্পরূপে পরিণত করেন।

দুর্ঘটনা প্রশান্ত-র দিনযাপনের বাস্তবতায় একটা বিস্মরণের ধূসরতা এনে দিয়েছে কিন্তু সব সুর নিঁখুতভাবে তার মনে থাকে। সে বলে, 'গানের সুর—ঝাঁকে ঝাঁকে সুর—মনে বাসা বাঁধে।' চিত্রকল্পে সুর আর পাখি যেন এক হয়ে যায়। সুরের জগতে সে নির্জন কিন্তু রসগ্রাহী। সে একাই তার ভোক্তা। এই নিভৃত নির্জন জগতে যে কেউ ইচ্ছে হলেই শরিক হতে পারে না, কাজের মানুষরা তো একেবারেই নয়। প্রশান্ত যখন সুর গুনগুন করে, তখন—

আনন্দ ওটা কী সুর রে? কার সুর?
প্রশান্ত নিরুত্তর।
আনন্দ (একটু হেসে) আমি বুঝব না বোধ হয়?
প্রশান্ত (মিচকে হাসি) No Sir, No Sir !

আনন্দমোহন হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের গোলমালে অসুস্থ হয়ে পড়লে কলকাতা থেকে বড় ছেলে প্রবোধ ও সেজ ছেলে প্রবীর সস্ত্রীক এবং অবিবাহিত ছোট ছেলে প্রতাপ চলে আসে। আচ্ছন্ন রুগির এখন-তখন অবস্থা, বাড়ির আবহাওয়া আশঙ্কাময়, থমথমে। তার মধ্যে অনেক রাতে দেখা যায় প্রশান্ত রেকর্ড প্লেয়ারে তন্ময় হয়ে বাখ্ শুনছে। সেই সুর ঘরে ঘরে চলে বেড়াচ্ছে। তাই শুনে বড় ভাই প্রবোধের মন্তব্য : 'আশা করেছিলাম এবারে প্রশান্তর একটু improvement দেখব···bad enough ! এই কি বাজনা শোনবার সময়?'

সেজভাই প্রবীরের ঘরে ভেসে আসে বাখ্! তা শুনে তার মন্তব্য : 'বাবার এই অবস্থা আর আমার Priceless মেজদাটির কাণ্ড দেখেছ?···কী যে ছাই ভস্ম শোনে ও-ই জানে'। বস্তু সঞ্চয়ের নেশা, টাকার সোনার হরিণ আর দুর্নীতিগ্রস্ততা প্রবীরকে Philistine বানিয়ে তুলেছে। বাখের মহান সুরসৃষ্টি তাই তার চোখে ছাইভস্ম। তার স্ত্রী তপতী-র কিন্তু কুমারী কালে একটা গানের জীবন ছিল তাই সুরটাকে শনাক্ত করে সে বলে :

তপতী	এটা Bach।
প্রবীর	কী?
তপতী	Johann Sebastian Bach। নাম শোনোনি বোধহয়।
প্রবীর	শুধু নাম শুনেছি নয়—ভদ্রলোক যে পাঁচ গণ্ডা সন্তানের জনক ছিলেন সে খবরও জানি।
তপতী	বাবা! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।
প্রবীর	Reader's Digest, Madam! আপনার স্বামীকে অত অবজ্ঞা করবেন না! কিন্তু আপনি ধাঁ করে Bach বলে দিলেন কী করে সেটা জানতে পারি?
তপতী	দাদাও বিলেত থেকে ওই একই শখ নিয়ে ফিরেছিলেন। পনেরো বছর বয়স থেকে বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত ঐ সব Music-ই বাড়িতে শুনেছি।
প্রবীর	ভালো লাগত?
তপতী	ভীষণ—

সংগীতের শুদ্ধতা বিষয়ে সত্যজিতের মনে কতখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম ছিল, তার প্রকৃত শ্রোতা কীভাবে বুঝে নেওয়া যায় এ সবই ধরা আছে ওপরের সংলাপ মালায়। ছবির কয়েকটা না-জানা খবর এর মধ্যে ভরা আছে। যেমন—প্রশান্ত তার আমগ্ন পাশ্চাত্য সংগীত প্রীতির নেশা বয়ে এনেছে বিলেত থেকে, যেমন তপতীর দাদাও। আনন্দমোহনের পরিবার সংগীতছুট। অবশ্য প্রবীর বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী, তাই 'রিডার্স ডাইজেস্ট'-পড়া অল্প বিদ্যায় পাশ্চাত্য সংগীতের মতো বিষয়েও (যা শুনে শুনে আয়ত্ত করতে হয়) দু-চার কথা লাগসই বলতে পারে। কিন্তু আসলে সে ফিলিস্টাইন, সেইজন্য বাখের নামের সঙ্গে তাঁর পাঁচ গণ্ডা

সন্তানের কথা মনে রাখে, তাঁর অসামান্য কম্পোজিশনগুলির খবর রাখে না। এই সুগ্রথিত সংলাপের মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ হয়তো তাঁর কোনো কোনো চেনাজানা চালিয়াতের ইঙ্গিত দিয়েছেন পশ্চিমি সংগীত সম্পর্কে যাঁদের সম্বল রিডার্স ডাইজেস্টের পরিবেশিত হাল্‌কা ধারণা এবং যাঁদের উৎসাহ সুরে নয়, স্ক্যান্ডালে।

কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণের পক্ষে কাজে লাগে তপতীর উক্তি ('পনের বছর বয়স থেকে বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত ওইসব music-ই বাড়িতে শুনেছি'), কেন-না বিয়ের আগে পর্যন্ত সে ছিল গানের মানুষ। পাশ্চাত্য সংগীত তার 'ভীষণ' ভালো লাগত।' তারপরে সংগীতছুট কিন্তু সম্পদশালী, পার্থিব উন্নতিকামী পরিবারে বিয়ে হয়ে এসে সে হারিয়েছে গানের জীবন। সে জীবন কি আর ফেরে না? ফেরে, কেন-না সুরের সংস্কার ও স্মৃতি তো মরে না। অনুকূল অবকাশে ফিরে আসে স্মৃতি, জেগে উঠে সাড়া দেয় সংবেদন। যেমন মধ্যরাতে প্রশান্ত-র ঘর থেকে ভেসে আসা সুরকে তপতী বাখ্-এর রচনা বলে নির্ভুল ভাবে শনাক্ত করতে পারে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। গান আর গানহীনতার জগৎকে সঠিক ভাবাবেগে চেনাবার জন্য পরিচালক 'শাখাপ্রশাখা'-য় একটা আউটডোর শুটিংয়ে, মজুমদার পরিবারের সকলকে মুঙ্গারির নিসর্গে নিয়ে গেছেন। সেখানে ফিল্‌মের পক্ষে জরুরি নানা স্মৃতিচারণ ও এক্সপোজিশন আছে কিন্তু প্রবলভাবে আছে তপতীর গলায় এককলি গান।

মুঙ্গারিতে বনের মধ্যে পিকনিক করতে এসে বনময় শ্যামলিমা ও বয়ে-যাওয়া এক পাহাড়ি নদীর পরিবেশে তপতী নিজেকে হারিয়ে ফেলে হঠাৎ গেয়ে ওঠে : 'মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'। এই এক কলি গাইতেই তার সংবিত, তার অভিমান ফিরে আসে। সে আর গায় না। কেন গাইবে সে? সে তো এখন আর গানের মানুষ নয়! তার কণ্ঠ থেকে গান কেউ ভুলিয়ে নিয়েছে বোধহয়। এখন শুধু ক্লান্তি আর শুধু বয়স বেড়ে যাওয়া আর টাকা...প্রতিষ্ঠা...প্রতিযোগিতা। কেবল হঠাৎ এই অরণ্যচ্ছায়ায় ভুলে যাওয়া কবেকার বাঁশির ডাকের মতো তার গীতমুখরিত অতীত জীবনই কি তাকে ডাকে? গান গাইতে পেরে তার খুশিতে মন ভরে যায়, আকাশের দিকে তাকায়। বলে :

তপতী আমার বিশ বছর বয়েস কমে গেছে!

উমা একটু গা না, বাবা! কতদিন তোর গান শুনিনি—এত সুন্দর গলা তোর!

তপতী গান ছেড়ে দিয়েছি দিদিভাই, অনেকদিন, ডিঙ্গো হবার আগে—এখানে এসে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল।

গান ছেড়ে দেবার এমন বেদনা গানহীনতার নিশ্ছিদ্র বস্তুজগৎ শাখাপ্রশাখায় দম বন্ধ করা অনুভূতি জাগায়। এই জায়গাটায় 'কাঞ্চনজঙঘা'-র লাবণ্য, 'কাপুরুষ'-এর করুণা আর 'শাখাপ্রশাখা'-র তপতী এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান করে নেয়।

কিন্তু 'শাখাপ্রশাখা'র মূল থিমে গানহীনতা নেই। বয়ে যাওয়া স্বতঃস্রোতের মতো ছবিটার মধ্যে সর্বক্ষণ গানের ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। ব্যাধির প্রকোপ, চিকিৎসকের উপস্থিতি, ভাবী মৃত্যুর আশঙ্কা, অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতার প্রতিবেদন ও কলহের উপল আঘাতেও সুর থামে না। প্রশান্তর স্থির শান্ত সংগীতের জগৎ টলে না। সে বাখ্ শোনে, বিটোফেন এবং সবশেষে গ্রেগোরিয়ান চান্ট। তার সঙ্গে মধ্যরাতে একদিন ছোটভাই প্রতাপের কথাবার্তা হয়। পরিচালক ছবির মধ্যে নানাভাবে তার অর্থগৃধ্নু মূল্যবোধহীন দুই ভাই প্রবোধ ও প্রবীরকে প্রশান্তর কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছেন। সুরের শুদ্ধতায় যে নিত্য শুচি, তার কাছে কাজের মানুষ এক ধরনের বিকর্ষণ তৈরি করে। কিন্তু ছোটো ভাই প্রতাপ তার কাছে কিছুটা গ্রহণীয় তার কারণ প্রতাপ বাস্তববাদী মজুমদার পরিবারে একটু ভাববাদী, আদর্শনিষ্ঠ, সংক্ষেপে অন্যরকম। মধ্যরাতে প্রশান্তর ঘরে গ্রেগোরিয়ান চান্ট শোনায় মগ্ন মেজদাদার সান্নিধ্যে প্রতাপ আসে। প্রশান্ত বলে, 'আয় (রেকর্ড প্লেয়ারের দিকে ইঙ্গিত

করে) ওটা কমিয়ে দে'। তার সঙ্গে প্রশান্তর যে কথা হয় তার মধ্যে সাংগীতিক অংশটুকু উদ্ধারযোগ্য।

প্রতাপ একেক সময় ভাবি—তুমি নীচের ঘরে চুপচাপ বসে থাকো, গুনগুন করে গান করো। এখন তো না হয় আমরা আছি...এমনিতে তোমার সময় কাটে কী করে? বাইরে বেরোও?

প্রশান্ত Grass is green...Sky is blue...Rose is red...

প্রতাপ বাগানে যাও?

প্রশান্ত সাতরঙে রামধনু...সাতসুরে সংগীত...Do Re Mi etcetera...

প্রতাপ Music-টা তুমি সত্যিই ভালোবাসো, তাই না মেজদা?

প্রশান্ত আমার বাঁচার কারণ...অন্ধকারে আলো। যত সহজ তত ভালো...

প্রশান্ত বেটোফেনের 'ওড টু জয়' থেকে গুনগুন করে ওঠে। তারপর থেমে—

প্রশান্ত Brothers! Brothers! Brothers!

বস্তুভারময় কপট কাজের মানুষের পৃথিবীতে প্রশান্ত এক সজীব ব্যতিক্রমী চরিত্র। সুরের বর্ণালি তাকে বাঁচাতে প্ররোচিত করে। সেই মহাসংগীতের আরোহী-উচ্চতা থেকে প্রশান্ত যেন গ্রিক নাটকের ওরাকেলের মতো করুণাঘন আহ্বানে সতর্ক করে, 'Brothers! Brothers! Brothers!' সত্যজিৎ রায় দীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনে যে কটি সংগীতময় চরিত্র ভেবেছেন তার পরম ও পরিণত উদাহরণ 'শাখাপ্রশাখা'র প্রশান্ত। পরিচালকের সাংগীতিক দর্শন ও তার থেকে পাওয়া তাঁর আত্মজৈবনিক সত্যকে প্রশান্ত ব্যক্ত করে। অন্ত্যবয়সের শেষ তিনটি ছবিতে (গণশত্রু, শাখাপ্রশাখা, আগন্তুক) সত্যজিৎ চলচ্চিত্র-মাধ্যমে আত্মবিবৃতির সুযোগ নিয়েছিলেন। 'আগন্তুক'-এর মনোমোহন তাঁর একটা সত্তাকে প্রকাশ করে। 'শাখাপ্রশাখা'-র প্রশান্ত আরেক সত্তা।

'শাখাপ্রশাখা' ছবিতে সত্যজিৎ Gregorian Chant ব্যবহার করেছেন বলে অনেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। চিদানন্দ দাশগুপ্ত লিখেছেন :

> ঠিক যে সময়ে চরিত্রগুলির অন্তরের কালিমা ফুটে উঠেছে তখন দেয়ালজোড়া পুরোনো ঘড়ি ঢং ঢং-এ কালের অমোঘ ইঙ্গিত ও তার পরেই 'কিরিয়ে এলেইসন' (অর্থাৎ Lord, have the mercy on us) প্রার্থনার সুর রাত্রির অন্ধকারে আমাদের মনকে প্লাবিত করে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে, অর্ধোন্মাদ পুত্রের ঘর থেকে।

গাস্তঁ রবের্জ তাঁর খ্রিষ্টিয় জীবনের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে Gregorian Chant ব্যবহারের একটা অন্য বিশ্লেষণ করেছেন :

> In a corrupt world, one way of maintaining one's integrity is to take refuge in music and still live in this terbulent world. Such a solution would only lead to complete detachment and therefore, to a form of madness...
> Often during the film Proshanto is seen listening to music of Bach. We are told. At one point. when Pratap and Dr. De discuss the case of Proshanto. the latter is listening to the Gregorian Chant of 'Kyrie Elesion' (Lord have mercy). I am thankful to Ray for having refrained from making of his film a 'musical'. We have just enough music to sense the atmosphere of joy and peace in which Proshanto take fefuge. At the end of the film. The Bach music lingeres in our minds until. perhaps. it fade into the 'Kyrie Eleison'. For. indeed. who will save us? Who will heal our wounded humanity?

(মুভি মনতাজ, জুলাই, ১৯৯২, পৃ ২৪)

গ্রেগোরিয়ান চ্যান্ট-এর অন্তর্বাণীর (সম্পূর্ণ বাণী হল : 'Kyrie elesion; Christe eleison; Kyrie eleison') থিমেটিক প্রয়োগ সত্যজিতের সচেতন সংগীত-মনস্কতার নিপুণ পরিচয়। সুর রচনায় হ্বাগনার বা স্ট্রসের ছন্দোময়তা ও নাটকীয়তা তিনি বরাবর এড়িয়ে গেছেন। কারণ বাখ্, মোজার্ট ও বিটোফেনের অন্তর্ময় সুরের শুশ্রূষা সত্যজিতের খুব প্রিয় ছিল। তাঁর আরেক সত্তা প্রশান্ত তাই বাখ এবং বিটোফেনে মগ্ন থাকে। কিন্তু আলাদাভাবে গ্রেগ্রোরিয়ান সুরের একক গায়নরীতির সকল কলুষতামসহর। তাই দুর্নীতিগ্রস্ত তামসিক অসুস্থ বাড়ির মধ্যে এই সুর স্নিগ্ধ ধূপের গন্ধের মতো ঘরে ঘরে পরিকীর্ণ হয়ে একটা প্রতিরোধ ও শমতা প্রার্থনা করছে যেন। চাইছে দয়া ও ত্রাণ।

গ্রেগোরিয়ান চান্ট বস্তুত একরকম চান্ট মিউজিক যাকে বলা হয়েছে,

> Simple chants, primarily designed to emphasise the words, developed in this way. After a time, however, the music became important for its own sake and variations and harmonies were introduced...Church singing of this kind is known as plainsong or the Gregorian Chant or mode, after Pope Gregory the Great. খ্রিষ্ট জন্মের ৮০০ বছর পরে এর উদ্ভব। পোপ গ্রেগরি দ্য গ্রেটের নামাঙ্কিত হলেও এর কোনো অংশই তাঁর মৌলিক রচনা নয়। জানা যায় :
>
> Gregory did not compose any of the music, for most of the chants were in use before his time, but he supervised their collection in a large book, the *Antiphonarium;* which was chained to the alter of St. Peter's in Rome.*

'শাখাপ্রশাখা' একটি বাংলা চলচ্চিত্র হয়েও আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে, বিশেষত প্রতীচীর বহু রসিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে তার সংগীতধর্মে।

১৯৯১ সালে বেরোয় সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক'। 'শাখাপ্রশাখা'-র মতো সংগীতের এত বহুলও তেমন উচ্চকিত ভূমিকা না থাকলেও গানের প্রয়োগে অভিনবত্ব আছে। 'আগন্তুক' ও 'শাখাপ্রশাখা' সত্যজিতের নিজের লেখা কাহিনি এবং বহুলাংশে আত্মজৈবনিক ভাবনা বিশ্বাসের বিকীর্ণতা। দুটো ছবিই জীবনের এমন অন্ত্যপর্বে তৈরি যখন সত্যজিৎ অসুস্থ। মৃত্যুর পদচ্ছায়া সে সময়ে তাঁর দৈনন্দিনকে স্পর্শ করতে চাইছে। তাই এ সময়ে স্পষ্টোচ্চারণে জীবনের অনুভূত সত্যকে বলতে তাঁর সপ্রতিভতায় বাধেনি। 'আগন্তুক'-এ সত্যজিতের জীবনের ও ঘটনার নানা সমাপতন অনেকেউল্লেখ করেছেন, সে সব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দুটো কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, মনোমোহনের চরিত্রাভিনেতা উৎপল দত্তকে সত্যজিৎ বলেছিলেন : 'তুমি কিন্তু আমার স্পোকস্ম্যান' এবং দ্বিতীয়ত বেমানান হলেও উৎপলের কণ্ঠে কয়েকটি গানের কলি নিজের গলায় গেয়েছিলেন, অন্য কাউকে দিয়ে প্লেব্যাক করাননি। প্রসঙ্গত তাঁর এক সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

> আগন্তুক আমি আজ থেকে ৩৫ বছর আগে, সেই 'পথের পাঁচালী'-র সময়ে করতে পারতাম না। গত তিনটে-চারটে ছবিতে আমি নিজের বক্তব্য, নিজের বিশ্বাস, নিজের দর্শন, যাই বলুন না কেন তা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

* এখানে উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণনগর রোমান ক্যাথলিক চার্চের ফাদার লুচাগ্নো কলোসি-র সঙ্গে আলাপচারিতায় আমি জেনেছি, গ্রেগ্রোরিয়ান চান্ট একস্বরে অন্তত তিনজনে গেয়ে থাকেন ক্যাথিড্রালে। এগানে কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজানো উচিত নয়। খালিগলায় গাওয়া সংগত। এটি থিমেটিক গান। চরিত্রে পলিফনি নয়।

যেমন এবার 'আগন্তুক'-এ আমি উৎপলকে বলে দিয়েছিলেন যে, উৎপল, তুমি কিন্তু আমার স্পোকসম্যান এটা মনে রেখো।

এই দিক থেকে বলা যায় 'শাখাপ্রশাখা'-য় যেমন তিনি রাসকেলদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে ন্যায়নীতির একক অবস্থান ও বিজয় দেখাতে চেয়েছেন, তেমনই 'আগন্তুক'-এ তিনি ফিরতে চান উৎসের দিকে ছিন্ন শিকড়ের সন্ধানে। গান তার একটা সূত্র। কথাটা পরিস্ফুট হয় 'আগন্তুক' ছবির বলতে গেলে প্রথম খসড়া 'অতিথি' গল্পের (দ্র. *আরো বারো* গল্প সংকলন) সঙ্গে তুলনা করলে। সে গল্পে গানের কোনো প্রসঙ্গই নেই। তবে চিত্ররূপে গান এল কেন? সে কথা বুঝতে গেলে কাহিনির দিকে চাইতে হবে।

১৯৫৫ সালে বি. এ. পাশ করে মনোমোহন মিত্র (উৎপল দত্ত) দেশত্যাগ করেছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর প্রতীচ্যে কাটিয়ে তিনি হঠাৎ ভাগনি অনিলার (মমতাশঙ্কর) কাছে আসেন। সংশয় দেখা দেয় তাঁর আখবনের উদ্দেশ্যের সততা বিষয়ে এবং মানুষটা সত্যিই মনোমোহন কিনা এই প্রশ্নে। কারণ কেউ তো তাঁকে কখনও দেখেনি। নানা ঘটনাচক্র ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় মানুষটা সৎ, হৃদয়বান ও জ্ঞানী—কিন্তু তিনি থাকলেন না। চলে যাবার আগে অনিলার ছেলে সাত্যকিকে বললেন কূপমণ্ডুক না হতে। নিজেও তো তিনি নির্বাস বিশ্বভ্রামণিক। কাহিনির সূচনার রহস্যের দানা বাঁধে মনোমোহনের আইডেনটিটি নিয়ে। অনিমার স্বামী সুধীন্দ্র (দীপংকর দে) সহৃদয়, বুদ্ধিমান কিন্তু বিচারশীল। মনোমোহনকে সে নিঃসংশয়ে মানতে চায়নি। আর অনুপস্থিতিতে (তখন সে অফিসে) মনোমোহন আসেন। অনিলা ও সাত্যকি তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। আলাপচারির সূচনায় কথা প্রসঙ্গে মনোমোহন নাতিকে জিগ্যেস করেন: 'শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জানো...সাত্যকি বাবু? একশো আটটা নাম? জানো? সাত্যকির নঞর্থক জবাব শুনে মনোমোহন গেয়ে ওঠেন:

হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ

চিত্রনাট্যে আছে:

অনিলা বেশ অবাক হয় মনোমোহনের গান শুনে; ভদ্রলোকের গলায় রীতিমতো সুর।

মনোমোহন: গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন

আমার দিদিমা গাইতেন, তোমায় শিখিয়ে দেব—কেমন?

অনিলা অবাক হয় মনোমোহনের কণ্ঠে সুর আছে দেখে। আমাদের অবশ্য অবাক লাগে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বিদেশে ভিন্ন পরিবেশে বাস করেও কেমন করে মানুষটা মনে রেখেছেন দিদিমার কাছে শেখা শৈশবের পদাবলি। সে উত্তর পরে মিলে যায় যখন দেখি মনোমোহন এসেছেন মায়াচ্ছন্ন জীবনের মূল শিকড়ের সন্ধানে এবং তিনি অসামান্য মেধাবী। 'শিকড় তুলে শিকল ছিঁড়ে' একদা তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন আদি সভ্যতার সন্ধানে, এতদিন পরে ফিরে এসেছেন একমাত্র ভাগনির কাছে সেই ছিন্ন শিকলের মায়া-বেড়ির টানেই কি? শিকড়ের লোভ তাঁর ছিল বলেই বোধহয় দিদিমার কাছে শেখা শ্লোক মনোমোহন দান করে যেতে চান নিজের নাতিকে। একেই কি বলা যায় পরম্পরার টান? শিকড় থেকে শাখাপ্রশাখার বিস্তার? যাকে মনে হচ্ছে আগন্তুক আসলে তিনি তো ধারোষ্ণ সনাতন।

মানুস কি সত্যিই ভোলে তার পুরোনো কথা? উৎসের স্মৃতিই কি মানুষকে চালায় না? কিন্তু মনোমোহনের চিঠি পড়ে সুধীন্দ্র বিস্মিত জিজ্ঞাসা তোলে: 'যে লোকটা এতদিন দেশের বাইরে রয়েছে সে এত ভালো বাংলা লেখে কী করে?' খাবার টেবিলে অনিলা তাঁকে প্রশ্ন করে: 'বাংলা ভাষাটা তো ভোলেননি—দিব্যি

বলেন. দিব্যি লেখেন!' জবাবে মনোমোহন বলেন : 'ব্যাপারটা কী জানো মা? মায়ের ভাষা ভুলতে না চাইলে কেউ ভোলে না। আর যারা ভুলতে চায় তারা তিন মাসের মধ্যে ভোলে। তারজন্যে বিদেশে যাবারও কোনো দরকার হয় না।'

এই কথাটা গড়পড়তা মানুষ জানে না বোঝে না তাতেই যত সংকট। মনোমোহন যখন সাত্যকিকে অষ্টোত্তর শতনাম গেয়ে শোনান তখন সেই গান উঠে আসে মায়ের ভাষার মতো জীবনের অতল অবিস্মরণীয় গভীরতা থেকে। সেই অবিকল্প অমল ভাষা তিনি রেখে যেতে চান সাত্যকির প্রজন্মে। এইভাবে ঘটে সংস্কৃতির প্রসার ও শাখায়িত ব্যাপ্তি।

গানের প্রসঙ্গে এত কথা উঠল। এদিকে সুধীন্দ্র অফিস থেকে উদ্‌বেগ নিয়ে টেলিফোন করে জানতে চায় অনিলার কাছে—

সুধীন্দ্র তোমার মার চেহারার সঙ্গে মিল আছে?

অনিলা তা নেই, তবে একটা ব্যাপারে মিল আছে?

সুধীন্দ্র কী?

অনিলা গলায় সুর আছে—

সত্যজিৎ এখানে একটা বড় সত্যকে তুলে ধরেছেন। অনেকসময় আকৃতি নয়, প্রবণতা থেকে চেনা যায় পরম্পরা। তাঁর নিজের পরিবার সম্পর্কে এই অহংকার ছিল তাঁর—মা, মাসি, পিসির গানের গলা সুরের দীক্ষা সম্পর্কে বারবার বলেছেন সত্যজিৎ।

'আগন্তুক' ছবিতে এই বৃক্ষ-শিকড় বা পরম্পরার প্রতীক আসে। কলকাতায় পৌঁছে প্রথম অপরাহ্ণেই মনোমোহনকে দেখা যায় একটা বড় গাছের তলায় বসে সাত্যকি আর তার বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছেন। গাছের দ্যোতনাটুকু চমৎকার।

ছবিতে গানের প্রসঙ্গ আবার ওঠে পরদিন রাতে সুধীন্দ্র-র বসার ঘরে। সুধীন্দ্র. অনিলা ও সুধীন্দ্র-র বন্ধু পৃথ্বীশ উপস্থিত। ডিভানের উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো কাপড়ে ঢাকা একটা বাদ্যযন্ত্র। সেটা মনোমোহনের চোখে পড়ে।

মনোমোহন ওই যন্ত্রটা কালকে দেখেছিলাম। ওটা কি সেতার. না তানপুরা?

অনিলা তানপুরা—

মনোমোহন তুমি গান গাও বুঝি?

অনিলা ওই আর কি—

পৃথ্বীশ উনি শুধু গান করেন না, নাচেনও—

মনোমোহন নাচটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে—তবে গানটা মন্দ হত না, গাইবে নাকি মা? সেই দেশ ছাড়ার পর বাংলা গান শুনিনি।

এই আলাপচারির ভূমিকা সেরে সত্যজিৎ একটি পুরো রবীন্দ্রসংগীত শোনান অনিলার কণ্ঠে। প্রশ্ন ওঠে রবীন্দ্রসংগীত কেন? অনিলার যা সোশ্যাল ক্লাস তাতে তার পক্ষে আসরে গাইবার জন্য রবীন্দ্রসংগীতই তো সে বাছবে। গানটির ('বাজিল কাহার বীণা') প্রয়োগ অবশ্য পরিচালকের পক্ষ থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ, কেন-না এ-গানের পরেই মনেমোহনের সঙ্গে পৃথ্বীশের ঘটবে অপ্রীতিকর কথান্তর। যার থেকে কাহিনি বাঁক নেবে অন্যপথে, দ্রুত। তবু ওই বীণা বেজে ওঠার অনুষঙ্গ, যা থেকে গানটা বেছেছেন সত্যজিৎ, তা মনোমোহনের পক্ষে খুব প্রাসঙ্গিক।

কিন্তু আমাদের পক্ষে লক্ষ করার বিষয় ওই গান নয়, গানের গায়নও নয়- —মনোমোহনের একটি সংলাপ। অনিলা যতক্ষণ গান করে মনোমোহন শোনেন তদ্‌গত চিত্তে। গান শেষ হলে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা কাটিয়ে মনোমোহন বলে ওঠেন : 'আঃ, অপূর্ব!—দিদির কথা মনে পড়ে যায়।' একথা বলার তাৎপর্য কী? মনোমোহন কি তবে অনিলার মধ্যে দিদিকে, দিদির পরম্পরা খোঁজেন? তাহলে কি গানের ছলে এ তাঁর আত্মবীক্ষা? আত্ম আবিষ্কারের আনন্দ? এরকমই বোধহয় ঘটে। শিকড় তুলে শিকল ছিঁড়ে যিনি বেরিয়ে পড়েন, অলক্ষ টান তাঁকেই টেনে আনে আত্মজনের কাছে দিদিমা > মনোমোহন > দিদি > অনিলা> সাত্যকি সবই পর পর গানের সুতোয় গাঁথা। আগন্তুক তাই আগন্তুক নন।

ছবির মধ্যে মনোমোহনের কণ্ঠে সত্যজিৎ আরও দুবার নিজের গলায় গান করেন। পৃথ্বীশ তাঁকে যখন জিগ্যেস করে তিনি ঈশ্বর মানেন কিনা, তখন মনোমোহন গেয়ে ওঠেন :

অন্ধজনে দেহ আলো
মৃতজনে দেহ প্রান

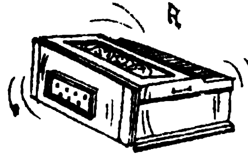
গানের শেষে প্রশ্ন করেন, 'কে দেবে আলো? কে দেবে প্রাণ?'

আরেকবার তার্কিক প্রশ্নাতুর পৃথ্বীশকে খানিকটা অধৈর্য করবার জন্য দুষ্টুমি করে মনোমোহন আঙুলে তুড়ি মেরে পাকা গায়কের গলায় গেয়ে ওঠেন : 'রাই ধৈর্যং রঁহু ধৈর্যং'। বুঝতে বাধা নেই এই কীর্তনাংশও তাঁর স্মৃতিজীবিত।

'আগন্তুক'-এ গানের ব্যবহার বা অনুষঙ্গ ছবির বাকি অংশে আর নেই কিন্তু নাচ আছে। সেই যে পৃথ্বীশ গানের আগে বলেছিল অনিলার বিষয়ে, 'উনি শুধু গান করেন না, নাচেনও', সে কথাটার সত্যতা দেখাতে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনে সাঁওতাল পল্লিতে মনোমোহনকে নিয়ে যান। তাঁর সন্ধানে সুধীন্দ্র-অনিলা-সাত্যকি কলকাতা থেকে আসে। সাঁওতালদের একটা উদ্দীপক ও মদির সম্মেলক নাচ দেখতে দেখতে নৃত্যকুশলী অনিলার শরীর নাচের তালে সাড়া তোলে। যেন জন্মান্তরের কোনো আদি ছন্দ তার মধ্যে সে আবিষ্কার করে। সুধীন্দ্র অনিলার সমস্ত দেহে নাচের ছন্দ লক্ষ করে উৎসাহ দিয়ে বলে : 'দেখছ কি? Go and join them—যাও যাও'। এই নাচটির কথা ভেবেই সত্যজিৎ অনিলার চরিত্রে মমতাশঙ্করকে নিয়েছিলেন। স্বামীর উৎসাহবচনে অনিলা নাচের ছন্দে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। একক মিশে যায় সম্মেলকে। শিক্ষিত অভিজাত নারী নিজেকে সংলগ্ন করে যেন বহুজীবনের ধারাময় আরণ্য লোকায়তে। সেও আর সেই পরিবেশে আগন্তুক থাকে না। নাচ দেখে সুধীন্দ্র বলে মনোমোহনকে : 'দেখছেন আপনার ভাগনির কাণ্ড?' মনোমোহন তৃপ্ত হয়ে বলেন, 'ও আমার ভাগনি কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল—এখন আর নেই।' এ কথাতেই একটা বৃত্ত পূর্ণ হয়ে গেল। গলায় সুর আছে দেখে ভাগনি চিনল মামাকে, ভাগনির গান শুনে মামার মনে পড়ল দিদির কথা, তার নাচ দেখে প্রতীতি হল নিজের ভাগনি বলে। শিল্প করল জীবনরহস্যের ও পরম্পরার আবরণ উন্মোচন। সভ্যতার মুখোশ খুলে মানুষের মূল সুর আর দেহের আদি ছন্দ নিজেকে সবচেয়ে উপরে প্রতিষ্ঠা করল। বিশ্ব ভ্রামণিক এসে ছোট্ট গণ্ডিবদ্ধ পরিকল্পিত যাপনে এনে দিল সৃষ্টির ছন্দ, গণ্ডি ভাঙার অঙ্গীকার। বিদায় বেলায় সাত্যকি বলল তার দাদুকে : 'আর কোনোদিনও আসবে না?' দাদু বললেন : 'এবার তুমি আসবে আমার কাছে'।

'আগন্তুক' সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি এই অর্থে যে পরবর্তী ছবি (যার চিত্রনাট্য এবং কাস্টিং হয়ে গিয়েছিল) করার আগেই মৃত্যুর আকস্মিক আহ্বান তাঁকে টেনে নিল। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রাঙ্গণ শূন্য হয়ে গেল। চলচ্চিত্র-সংগীতের সবচেয়ে সমর্থ ও নবীন ভাবনার ঋজু স্বপ্নের মানুষটি চলে গেলেন এমনও তো আমরা ভাবতে পারি।

৭



গানের চেহারা

দেখি, তার চোখের কোণে যেন সুরের ধ্যান দেখা দিয়েছে। গাইয়ে লোকের চোখের মধ্যে সুরের একটা অগ্নিকোণ আছে। সেখানে তাপ দেখা দিলে কিছু না কিছু আশা করা যায়। তবে ঝড়-গর্জন হবে, কিংবা স্নিগ্ধ বর্ষণ হবে, আগে থেকে বলা কঠিন।

অকস্মাৎ মুহূর্তের ভ্রমরগুঞ্জন আমাদের কানে এল।...তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'রকীব্‌সে যে উয়ো' চরণটি। শেষের শব্দ যখন পঞ্চম স্বরে এসে স্থির মাধুর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন মনে হল যেন সুরের আলো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারে জোনাকির চিকিমিকি নয়, এ যেন মেঘনির্মুক্ত চন্দ্রপ্রভা।... শব্দের পর শব্দের পরাগ সঞ্চয় করে নিয়ে সুরের পর সুরে তিনি এগিয়ে চলেন অনায়াসে। ধৈবত ও কোমল নিষাদের চকিত নক্‌শা সেরে নিয়ে ফিরে এসে সমাহিত হলেন পঞ্চমে,'করতে হ্যাঁয়' ধ্বনির মধ্যে। মনে হল যেন বসন্ত তিলকের রহস্য সঙ্গে করে ফুলের এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে এসে ভ্রমর বসল ফুলেরই ওপর।

.... মনে হয়, এক-একটা গোটা গান যেন এক-একটি ফুল। পদগুলি যেন পাপড়ির এক-একটি ঘের। শব্দগুলি যেন এক-একটি দল। কথায় সুরে ছন্দে এরা ফুটে ওঠে, নিজেদের সার্থকতা দিয়ে ফুলকেই সার্থক করবে বলে।

— *স্মৃতির অতলে*, অমিয়নাথ সান্যাল পৃ. ৪০-৪২।

'মম মন উপবনে'....গানটিকে কেন যেন নাচের গান মনে করা হয়। বাঙালি সমাজে সাধারণত বালিকারাই নাচে, ফলে এই গানটির সঙ্গে বাড়ির বাগানের ফুলে সাজা একটি বাচ্চা মেয়ের মায়ের শাড়ি-পরা চেহারাটা সেঁটে গেছে।..... শাড়ির ওজনে তার অভিসারের পদক্ষেপ যে তেমন জুতসই হয় না— এতেও বেশ আমোদ আসে। সেই আমোদে গানটির অর্থ নষ্ট হয়ে যায়। নৃত্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রুত লয়ে গানটি গাওয়া হয় বলে প্রায় কখনোই কানে আসে না উপবনটা কবির মনে। তাই এমন ভয়ংকর চরণ 'রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনিরিনি'— ঠিক অর্থে কখনো শোনা হল না। গানটা বরাবর এমন শুনতে হয়, যেন নূপুর পায়েই বাজছে। অথচ শুনতে চাই মন যার, রক্তটাও তারই, সেখানে আর এক ছন্দের আক্রমণ ঘটেছে।

— রবীন্দ্রনাথের গানের কবিতা, দেবেশ রায় *কুরুক্ষেত্র*, এপ্রিল-মে ১৯৮৪।

উপরের দুটি উদ্ধৃতি একেবারে দুই বর্গের। প্রথমটি ১৯৫২ সালে লেখা অমিয়নাথের স্মৃতিকথা ফৈয়াজ খাঁ-র গায়নপ্রসঙ্গে। দ্বিতীয়টি দেবেশ রায়ের রচনাংশ রবীন্দ্রসংগীতের একজন বোদ্ধা শ্রোতাহিসেবে। দুজনের বর্ণনা আর বোধ ফুটিয়ে তুলেছে গানের দু'রকম চেহারা। একটা মুগ্ধতা ও আবেশের, অন্যটা খেদের ও অতৃপ্তির। পড়তে গিয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, গানের কি কোনো চেহারা আছে? না কি তা শুধু শ্রুতি ও স্মৃতির বিষয়—উপভোগ আর চর্চার! সত্যিই, গান তো আমরা কতই শুনি, কতভাবে। জলসায়, আসরে, কনসার্টে, প্রেক্ষাগৃহে কিংবা একেবারে একা একা কারোর কণ্ঠে কিংবা নিভৃত প্রকোষ্ঠের নিঃসঙ্গ পরিবেশে রেকর্ডে বা ক্যাসেটে। বাইরের সামাজিক মানুষটা শ্রোতাহিসাবে তখন একেবারে ব্যক্তিক উন্মোচনে বা আত্মআবিষ্কারে মশগুল হয়ে পড়ি। গান আমাদের মুক্তি দেয়। কীভাবে দেয়? সম্ভবত বাণীসুরগায়কি ভেদ করে জেগে ওঠে গানের একটা অন্য চেহারা। তবে সকলের মনে নয়—রসিকের মনে। আবার সব গান নয়, বিশেষ কোনো গান, সেইসঙ্গে বিশেষ কোনো শিল্পীর গায়ন—যেমন ফৈয়াজ খাঁ-র কণ্ঠে পঞ্চমের সৃষ্টিময়তা এবং তাব বিশিষ্ট রূপটি শনাক্ত করার জন্য অমিয়নাথের মতো শ্রোতার সহযোগ। গানের চেহারা তাই ব্যক্তও হতে পারে, অব্যক্তও থেকে যেতে পারে।

এর আবার একটা অন্য দিকও আছে—যেমন ধরা পড়েছে দেবেশ রায়ের অভিজ্ঞতায়। 'মম মন-উপবনে চলে অভিসারে' গানটি দিয়ে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যে মনের চেহারাটা ফোটাতে চান, গানের পরিবেশনে তার উল্‌টোটাই ঘটে। মায়ের ভারী শাড়ি পরা অপটু পদবিক্ষেপের কিশোরী এ-গানের এক অনভিপ্রেত রূপ জাগিয়ে তোলে শ্রোতার মনে। গানের শরীরী রূপ আর বাঞ্ছিত রসাবেদনের মধ্যে থেকে যায় একটা মস্ত ফাঁক। গানের চেহারা নিয়ে আরেকরকম বিভ্রাটও হতে পারে, কারণ 'একাকী গায়কের নহে তো গান'। শিল্পী গাইছেন, তাঁর সম্বল বলতে কণ্ঠমাধুর্য আর পরিবেশনকুশলতা— অন্যদিকে রয়েছেন শ্রোতা। এবারে অন্তর্ঘাত আসতে পারে গানের কোনো শব্দের অনুষঙ্গে, যেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর। 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার' গানটা তিনি কৈশোরকালে কেন যেন শুনেছিলেন 'ভীষ্ম যখন নিদ্রামগন'; নিশ্চয়ই তাঁরই শোনার ত্রুটি ছিল, গায়কের কোনো স্খলন ঘটেনি। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণ মনে ভারী চমৎকার একটা গানের চেহারা গড়ে উঠেছিল। শরশয্যায় একা শুয়ে আছেন ভীষ্ম, নিদ্রামগ্ন— গগন অন্ধকার। গান নয়, ভীষ্মের নিদ্রামগ্ন রূপটিই ছিল উপভোগ্য। পরে, বহুদিন পরে, কলকাতায় এসে যখন শুনলেন কথাটা ভীষ্ম নয়, বিশ্ব, তখন গানের চেহারাটাই শুধু ধ্বস্ত হল না, মনে বেশ আঘাত পেলেন। তাহলে বোঝা গেল নিছক একটা-দুটো শব্দ থেকে শ্রোতার মনে গানের একটা চেহারা তৈরি হয় অনেক সময়, সুর সেখানে গৌণ, গায়নও। এ ব্যাপারে জয় গোস্বামীর অভিজ্ঞতাটুকু চমৎকার। বলছেন,

> ছোটোবেলায় রেডিয়োতে শুনেছি— মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে— হ্যাঁ গানের সময় উচ্চারণ কালো-ই হয়। ভাবতাম— মহাকাল আর মহাকালো। মানে প্রচণ্ড কালো। মহা অন্ধকার। যেখানে আমি একা। পরে, পড়তে গিয়ে দেখি— কাল মানে সময়। মহাসময়। সময় কী অসম্ভব কালো। এক নিমেষে সময় আর স্পেস এক হয়ে গেল যেন। একাকার। মনে হয় মাথার উপর যেন হাজার হাজার ফুট জল। আমি আরও তলিয়ে যাচ্ছি আরও।

এখানে শুধু একটা শব্দ, কিংবা বলা উচিত শব্দটির উচ্চারণ গানটির যে চেহাবা তৈরি করে, তার পাঠ্যরূপ সেই চেহারাকে বদলে দেয়। বলা বাহুল্য সুরে এ কাজটা অনেক বেশি করে ঘটে। ফৈয়াজ খাঁ 'করতে হ্যাঁয়' শব্দটির অর্থগত চেহারা একেবারে অন্যরকম করে দেন পঞ্চমে স্থিত হয়ে। আন্য কোনো শিল্পী অথচ এই গানের চেহারার ঐ রূপান্তর কর্মটি পারেন না।

গানের স্রষ্টা, তার শিল্পী আর তার শ্রোতা— এই ত্রিধাবিভক্ত বিন্যাসে আসলে গানের প্রকৃত চেহারা ফোটা সম্ভব। এর কোনো একটার খামতি থাকলে চেহারাটা ঠিক ফুটবে না। পাঠক ভাবছেন, আমি এত 'চেহারা' 'চেহারা' করছি কেন? গানের 'ভাব' কথাটাই তো মানানসই। জবাবে বলতে পারি, রূপের সঠিক উজ্জীবন ভাবেরই দ্যোতক। তফাতটা বোঝা যায় কোনো গান রেকর্ডে বা রেডিয়োতে নৈর্ব্যক্তিকভাবে শুনলে কিংবা অন্যপক্ষে সরাসরি শিল্পীর সামনে বসে সেই গানই শুনলে। তাতে গানের একটা বাড়তি মাত্রা আসতে বাধ্য। দেবব্রত বিশ্বাসের রেকর্ড শোনা আর তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে শোনার অভিজ্ঞতা ছিল একেবারে আমূল আলাদা। এর আরও চমকপ্রদ উদাহরণ দিলীপকুমার রায়ের 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম' রেকর্ডে শোনা আর সামনে বসে তাঁর ভক্তিপ্লাবিত আত্মহারা কণ্ঠে ওই গান শোনা। যেন বাণী আর সুরকে টপকে জেগে ওঠে বিশ্বাস ও আস্তিক্যের অদৃশ্য আভা। কৃষ্ণকাহিনি তখন আর কল্পনা-কবিকথনে সীমায়ত থাকে না। তার চেহারা ছড়িয়ে পড়ে অবিশ্বাসী নাস্তিকেরও মনে।

আর শুধু গায়নের কৌশলে ও শিল্পিতায় গানের চেহারা কেমন ফোটে তার অমোঘ বর্ণনা তো হাতের কাছেই রয়েছে— অমিয়নাথ সান্যালের রূপময় লেখনী জানাচ্ছে :

> ফৈয়াজ যখন রাগের লহর তুলতে আরম্ভ করেছে,তখন সুরের জাদুও শুরু হয়ে গিয়েছে। ....ধার আর ভার একসঙ্গে থাকলে খেলোয়াড়ের হাতে তলোয়ারের চোট কী রকম হয়, আন্দাজ করতে পারেন।

রাগের লহর আর সুরের জাদু এ দুইয়ের উপমা হল তলোয়ারের ধার আর ভার। এরপরে দক্ষ খেলোয়াড় ও কুশলী ওস্তাদে আর তফাত কোথায়? কিন্তু ফৈয়াজের কেরামতিতে মিয়াঁকি-মল্লারের চেহারা কী দাঁড়াল সেটাও তো শোনার মতো :

> থেকে থেকে সুরের চমক আর গমকের গম্ভীর গর্জন! মনে হচ্ছিল, যেন সুরের আকাশ ভেঙে পড়ছে মাইফেলের উপর। মাত্র দুটি সারেঙ্গি আর তম্বুরার আওয়াজে কি সেই হাঁক-ডাকের সংগত হয়? এর পরে যখন কয়েকটি আর্খেরি, চম্‌কিলী তানের বাহার দিয়ে ফৈয়াজ আলাপ শেষ করে নিয়ে আসতে লাগল, তখন মনে হল, সত্য সত্যই মেঘের জাল গুটিয়ে মল্লার চলে যাচ্ছে দূরের আশ্‌মানে;আর দিগন্ত থেকে দেখিয়ে যাচ্ছে কিছু রোশ্‌নি আর বিজুলির খেল! রাগের গর্জন সব থেমে গেছে ; তার জায়গায় হাওয়াই বোল্‌ ঘুরে ফিরে যাচ্ছে যেন সুম্‌ সননন ঝংকার দিয়ে আর মাঝে মাঝে কানে আসছে তম্বুরার রুমঝুম্‌! বরখা যেতে না যেতেই যেন ঝিঙ্গরের বোল।
>
> আর্ট তো একটা 'এফেক্ট', আর সেই এফেক্ট, বজায় থাকে পরিবেশনের কায়দায়। সত্য কথা মুখে মিয়াঁকি-মল্লার রাগের এমন আলাপ আর শুনিনি।

শেষ মন্তব্যটি স্মরণীয়। কণ্ঠে মিয়াঁকি-মল্লারের এমন রূপায়ণ ভাবা যায় না, তার মানে যন্ত্রেই কেবল রাগরাগিণী এতটা সুরের রূপবিন্যাসে সবিস্তারে ফুটতে পারে। এর থেকে আমরা কী বুঝব? গানের চেহারা তখনই যথাযথ চেকনাই দিয়ে ঝলকে ওঠে যখন তা ফৈয়াজের মতো শিল্পীর কণ্ঠে আশ্রয় পায় অন্যথায় নয়।

এখানে আসল কথা বলে নেওয়া দরকার। কথাটা এই যে, গানের নির্মিতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে তার অস্ফুট রূপের কাঠামো। সেই প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ্য করাই যথার্থ শিল্পীর কাজ, কিন্তু সে কাজ শিল্পীর একার নয়। শোনা যায়, ভালো গানের অন্তরেও নাকি থাকে 'অরমান্‌' বা আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ সে-ও চায় মরমি গায়কগায়িকার কণ্ঠাগত হয়ে নিজেকে ষোলোকলায় বিকশিত করতে। মিয়াঁকি-মল্লার যে ফৈয়াজ খাঁ-র কণ্ঠাশ্রয়ে অতটা ধারাসম্পাত করে গেল তার প্রথম কারণ সবাই বলবেন ফৈয়াজের কণ্ঠকৌশল, রূপায়ণদক্ষতা

ও তাঁর মাত্রাজ্ঞান। এই তিনের অভাবে অন্যের কণ্ঠে মল্লারের প্রার্থিত রূপ হয়তো ফোটে না। কিন্তু আরেকটা কারণও বিচার্য— ওই গানের কাঠামো আর অন্তঃসারের মধ্যেই প্রস্ফুটনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, শিল্পী তাকেই বাইরে এনে দেখালেন। গানের এই চেহারা যেন গোপন অভিলাষের মতো অন্তঃরুদ্ধ। শিল্পীর প্রেম ও বাসনা তাকে শরীরী করে। এই শরীরী বিভঙ্গ স্বচক্ষে দেখতে গেলে, বুঝতে গেলে নিষ্প্রাণ রেকর্ড বা রেডিয়ো-তরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর শিল্পীর তাৎক্ষণিক পারফরমেন্স। সেই অভিকরণে সামনে চাই দরদি শ্রোতাদের প্রত্যাশী চোখ।

কিন্তু চরম সংগীতের গভীরতার দায় শ্রোতাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়, কারণ শ্রোতাদের বেশিরভাগ গান শোনায় বা সুরের ছকের বিশ্লেষণে তত অভ্যস্ত নন। তার জন্য মনের পরিশীলন এবং নিত্য শোনার অনুশীলন চাই—যেমন ছিল অমিয়নাথের বা ধূর্জটিপ্রসাদের। আসলে সাংগীতিক ব্যুৎপত্তি একরকম সূক্ষ্ম মননক্রিয়া। গানের প্রার্থিত চেহারা তুলনামূলকতা দিয়ে বুঝতে হয়, অর্থাৎ একটা গানের সঙ্গে আরেকটা গানের নির্মিতির তফাত কিংবা একই গান দুজন শিল্পীর কণ্ঠে দুভাবে শোনার অভিজ্ঞতা। আরেকরকম হতে পারে, বিশেষজ্ঞের হাত ধরে পর্বে-পর্বে স্তরে-স্তরে গানের অন্তঃপুরকে বুঝে নেওয়া, তবেই সুষমা আর রচনার চেহারা ধরা পড়ে। কিন্তু ভারতীয় সংগীতে টোভে-র লেখা *মিউজিকাল অ্যানালিসিস*-এর মতো বই কই? সত্যজিৎ রায় লিখেছেন তাঁর পাশ্চাত্য সংগীতে আত্মদীক্ষার দিনগুলিতে সম্বল ছিল কয়েকটি কেনা রেকর্ড। বাখ্-বেতোফেন-মোজার্ট অনবরত শুনতেন এবং তার অন্তর্গত চেহারা ও রসস্বরূপ বুঝে নিতেন টোভে-র বই পড়ে। আমাদের সেই অনুশীলন আর আত্মদীক্ষা কই? বিকল্পে কই-বা দেশব্যাপী ঘুরে ঘুরে ওস্তাদদের গান শোনার প্রক্রিয়া— যেমন শুনতেন দিলীপকুমার রায় তাঁর যৌবনে? (এ ব্যাপারে দ্রষ্টব্য তাঁর *ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা*)।

অথচ অমিয়নাথ, দিলীপকুমার বা ধূর্জটিপ্রসাদের কালের মতো প্রচারমাধ্যম আজ অত কৃপণ নয়। বহুতর বৈদ্যুতিন কৃৎকৌশলে (সহজপ্রাপ্য ক্যাসেট ও কমপ্যাক্ট ডিস্কে) বিশ্বসংগীত আমাদের করায়ত্ত। অথচ দীক্ষিত শ্রোতা নেই। গান নিয়ে আজ যে নির্লজ্জ দেখনদারি, হইচই, হট্টগোল, কিম্ভুত পোশাক-আশাক, নগ্নতা, নানা টিভি চ্যানেলের হুজ্জত, পপ-র‍্যাপ-ব্রেথলেসের উপচার তার কারণ আমাদের সদাতপ্ত উত্তেজিত সমাজ। শ্রোতৃসমাজও তারই অন্তর্গত। তাদের চাই ক্ষণ-উত্তেজনা, চটুল নৃত্যরঙ্গ, মাদক আর আধোপ্রকাশ্য শরীর। গানের চেহারা তাই তাদের কাছে অন্যরকম এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল— তা চল্‌তি হাওয়ার পন্থী— 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো'-র অন্তর্ঘাতে মরণশীল। শান্ত হয়ে বসে দু'দণ্ড অন্তর্মগ্ন ধ্যানে গান শোনা, ফৈয়াজের কণ্ঠে পঞ্চমের চেহারা বোঝা, তার সময় কম।

শিল্পীদের কথাও ভাবা দরকার। কলাবিদ্‌দের পরিপোষণ করবার মতো সামন্তসমাজ নেই, আছে ভোগ্যপণ্যের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের জগৎ। গান এখন বিনিময়মূল্যে ক্রয়যোগ্য পদার্থ, তাই তার নিত্যনতুন তক্‌মা লাগে, লাগে স্পনসর ও প্রচার। টিভি চ্যানেলের জন্য তার এক দৃষ্টিগ্রাহ্য চেহারা তৈরি করে প্রচার করতে হয় গানের ভিস্যুয়াল। মনে হতেই পারে এ এক অন্য ভিস্যুয়ালের জগৎ। তাতে গহরজানের কটাক্ষ বা মাল্‌কাজানের ভ্রূবিলাস অনুপস্থিত। গান গাইছেন একজন আর সেই গানের চেহারা ফোটাচ্ছেন দু'জন ভাড়া করা মডেল—যাদের সঙ্গে গানের ভুবনের কোনো যোগ নেই। ভাবা যায়? এসব ক্ষেত্রে গানের চেহারা, আমরা যারা একটু আধটু গান জানি, অবসরে গুনগুন করতেও পারি, তারা নিজেদের কাছেই ফোটাতে পারি। যাকে বলে গানের আত্ম-আস্বাদন। রবীন্দ্রনাথের রচনা 'আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে' গীতবিতান-এর পাতায় চোখ রেখে পড়লে তার চেহারা ফোটে না, আবৃত্তিতেও রূপ ধরা পড়ে না। অগত্যা নিজেই গেয়ে গানের অপরূপ সুরবিন্যাসের চেহারাটা বোঝা যায়। বোঝা যায় স্রষ্টার কাছে 'আলো' শব্দটির কী মহিমা, কত তার আয়োজন, আর সেই আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে সেই

বিস্ময়ই বা কত প্রগাঢ়। গানের মুখে সুরের বিন্যাস এইরকম :

মা -া -পা I I -গা -মা -দা I (দ)পা -ণা (ণ)দা I পা -া -া I

আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ র্

এর পরে 'কে ফুটালে' এই বিস্ময় প্রকাশ করে আবার 'আলোর' শব্দটি যখন ফিরে আসে তখন সুরের আরেকটু অনুপুঙ্খ তারিফ করার মতো এবারের ছক এইরকম :

I সা -ঋা -গা I -মা -পা -দা I মা পা দা I -না -র্সা -র্ঋা I

কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I (র্ঋা)র্সা -া র্জ্ঞা I (র্জ্ঞ)র্ঋা র্সা -া I ণা -া -দা I দা -পা -মা I

০ ০ ০ ফু টা ০ লে ০ ০ আ ০ ০

I -গা -মা -দা I (দ)পা ণা (ণ)দা I পা -া -া I -া -া -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ ০ ০ ০ র্

রেকর্ড শুনে বা শিল্পীর স্বকণ্ঠে শুনলেও অনেকসময় এ গানের চেহারার প্রতীতি আসে না— নিজে গেয়ে পরতে-পরতে উন্মোচন করতে হয় গানের চেহারা এবং বড় বিস্ময় লাগে।

২

গানের যে একটা বাইরের চেহারা আছে তা আমি প্রথম বুঝি ছোটবেলায় বিলিতি অর্কেস্ট্রার একটা ফটো ভালো করে দেখতে গিয়ে। দেখি, কন্ডাকটার হাতে একটা ছড়ি নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তার চুল এলোমেলো, চোখের দৃষ্টি একাগ্র, সারামুখে ঘাম। তার নির্দেশে নানা বর্গের যন্ত্রীরা কী এক মন্ত্রবলে যেন ছড় টেনে যাচ্ছে, সামনে তাদের উদ্যত স্বরলিপি। এই বাজনার শ্রোতারা,(ছবিটা কনসার্ট হলের) বেশ কল্পনা করতে পারছিলাম, যেন ঝড়ের গর্জন কান পেতে শুনছিলেন, নাকি সেই সমুদ্রের মৌন? কেন-না মাঝে মাঝে অর্কেস্ট্রা একেবারে স্তব্ধ থাকছিল। আমি তো সেই কম্পোজিশ্যনের কিছুই শুনতে পাইনি, কিন্তু শুধু তার আলোকচিত্ররূপ দেখে সংগীতের চেহারাটা টের পাচ্ছিলাম। তার থেকে যেন অস্পষ্টভাবে হলেও সুরের চেহারাটাও ধরতে পারছিলাম। আসলে সংগীতের জগৎকে অনেকে মনে করেন শুধু শ্রাব্য— তা কিন্তু সর্বাংশে সঠিক নয়। প্রকৃত সংগীত থাকে মানুষের কল্পনার ও অনুভূতিলোকের অনেক গভীরে। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন 'অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে', সে কথাটা খুব অলীক হয়তো নয়। এর একটা চমৎকার উদাহরণ আমাদের সামনে আছে—বেতোফেন। ইংরেজ কবি কিটস্ যে বলেছিলেন শোনা সুরের চেয়ে মধুরতর হল অশ্রুত সুর, তার প্রমাণ এই বেতোফেনের বেশ কিছু রচনা। শেষ বয়সে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ বধির, তবু সুর রচনায় ক্ষান্তি ঘটেনি। কিন্তু যেসব সংগীত ওই বধির অবস্থায় কম্পোজ করতেন তা অর্কেস্ট্রায় রূপায়ণের সময় নিজেই শুনতে পেতেন না। তাহলে কীভাবে কম্পোজ করতেন? সম্ভবত, সংগীতের একটা স্থায়ী চেহারার ধারণা ও ধরন তাঁর মনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে রচনা করতে করতে। কানে শুনতে পাচ্ছেন না অথচ অন্তরের অন্তস্তলের নানা অস্থিরতা ও সূক্ষ্ম ভাবনা চেহারা নিচ্ছে সুরের ছকে।

এর একটা অন্যরকম রূপ আর গড়ন দেখতে পাই ভারতীয় মার্গসংগীতের শিল্পীদের গান করার সময়ে। আমাদের রাগসংগীতে এত সুরবিহার থাকে যে মূল গান অনবরত পুনর্জন্ম পায়। মূলসুরের ছকটা মোটামুটি

বজায় রেখে শিল্পী তাতে নানা অত্যাশ্চর্য ফুলকারি কাজ করেন, যেন কাশ্মীরি ছুঁচের কাজ। তাই গান রূপায়ণের সময় শিল্পীর মনের অস্থিরতা আর নবসৃষ্টির আবেগ শরীরে ফুটে ওঠে। সেই গানের সুর না শুনে আমরা যদি শিল্পীর ভঙ্গি আর শরীরবিক্ষেপটুকু দেখি কেবল, তবে মনে হতেও পারে মানুষটি বোধহয় উন্মাদ। কিন্তু গান রূপায়ণের আকৃতির সঙ্গে শিল্পীর শারীরিক বিক্ষেপটুকু মিলিয়ে নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। সেইজন্য রেডিয়ো শুনে বা রেকর্ড শুনে ভারতীয় মার্গসংগীতের বা পাশ্চাত্য সংগীতের মূল চেহারা বা ঢঙ আমরা পুরোপুরি পাই না। তার জন্য কনসার্ট হলে যায় প্রতীচ্যের মানুষ— আমরা সম্ভব হলে চলে যাই সংগীত সম্মেলনে।

রাগসংগীতের বা মার্গসংগীতের মধ্যে নানা রকমফের আছে। ধ্রুপদিয়া আর ঠুংরি শিল্পীর গানে রূপায়ণে চেহারা বা ভঙ্গির কতই ফারাক। ধ্রুপদ পরিবেশন বেশ শান্ত ও ত্বরাহীন গম্ভীর বিন্যাসে অচঞ্চল, কিন্তু ঠুংরি গানের চালে স্বভাবত থাকে একরকম হালকা চপলতা। গায়ক বিশেষত গায়িকাদেরও থাকে কিছু লাস্য ও চটক। গানের ধরনধারণে থাকে প্রেমপ্রণয়ের অনুক্ত বিভ্রম। আসলে ঠুংরির আদত চেহারা আদিরসে সিক্ত এবং প্রথম থেকে গানের সমাজে এ জাতীয় গান গাইতেন যেসব বণিতা, ঠিক লজ্জাশীলা গৃহবধূ বলা যায় না। প্রধানত বাইজি সম্প্রদায় চমৎকার ঠুংরি গাইতেন, বেশিরভাগ নৃত্যসহযোগে। সামনে শ্রোতা থাকতেন বিলাসকলাকুতূহলী রসিক ধনী আর তার মোসাহেবরা। তাই এ গানের পরিবেশনে বেশ ভালোরকমের প্রফেশ্যনালিজমের চেহারা, মুজ্‌রো পাবার চেষ্টাকৃত অঙ্গভঙ্গি থাকত — চোখে থাকত বিনতি ও কামনা। বাইজিদের বিলাসব্যসনের জীবন, তাদের আপাতসমৃদ্ধি অথচ অন্তর্বেদনা, নিরন্তর কৌমার্যের বাধ্যতা কিন্তু অন্যের উপভোগ্যা হবার নিয়তি ভারতীয় ঠুংরির চেহারায় একটু কান পাতলেই শোনা যায়। কেবল থিমে নয়, সুরের কারুণ্যেও। 'হে প্রিয় আমাকে ছেড়ে যেও না'— এমন এক করুণ মিনতিমাখা ঠুংরির বাণী গায়িকারা যখন সুরের তালে মিড়-মুড়কিতে মিশিয়ে ব্যক্তিজীবনের আর্তিতে গাইতেন তখন গানের শরীর ভেদ করে জেগে উঠত কত স্মৃতি কত ছলনা। কোনো প্রিয় কোনো প্রেমিকই যে তাঁদের জীবনে স্থায়ী আসন পাতেনি সেই মর্মন্তুদ সত্য ও বঞ্চনা গানে ঝরে পড়ত। সে চেহারা কি রেকর্ডে মেলে? সেইজন্য আমার মনে হয় আখতারিবাইয়ের গায়নে 'কোয়েলিয়া মৎ কর পুকার' যেমন বেদনাসিক্ত অশ্রুময়তায় নিবেদিত হয়েছে— কোনো শিষ্ট, স্বাভাবিক ও সুখী গায়িকার কণ্ঠে তেমন করে গানটি রূপ পেতে পারে না।

শুধু বেদনা আর আর্তি কেন, বাইজিদের গানের চেহারায় বেশিটাই থাকত লাস্য ও জওয়ানি, তার জন্য বহুদিনের প্রস্তুতি লাগত। তাঁদের লক্ষ্য থাকত সামন্তপুরুষের নেকনজর, হিরা জহরত আর সমঝদারির দিকে। মনে রাখতে হবে সেইসব ধনাঢ্য কলাবিলাসীরাও বড়ো একটা গানের ব্যাপারে আনাড়ি ছিলেন না— তাই মেকি জিনিসে কার্যদ্ধার হত না। লাগত অস্‌লি চিজ। গানে নাচে মালকাজানকে টেক্কা মারতে গহরজান কেমন কৌশলী ছিল এখানে তার একটু বর্ণনা শোনা যেতে পারে। যেন আজও চোখে দেখা যায় সেই মহফিলের চেহারা আর গানের অন্তঃপুর! তন্নুলালজি বললেন,

> গহর প্রথমেই একটি বাণ মারলেন— দাঁড়িয়ে উঠে, নেচে, একখানি দরবারি তেরানা গেয়ে। আর তারই মধ্যে সপাট্‌ দুনী আর ছুটতানের ফুলঝুরি উড়িয়ে ... ওই এক তেরানায় গহর যেন মাইফেলের চোখ আর কান নূতন করে শানিয়ে দিল। আর তার সঙ্গে মনে করুন, সেই চমক, সেই বিজ্‌লির খেল, যা থাকলে মরা গানও জিন্দা তাজা হয়ে দেখা দেয়।
>
> ...তারপর, আসরের মনটি কেড়ে নিতে যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু গহর এক থাবা দিয়ে নিল ভাইয়া সাহেবের ঘরের ঠুংরি গেয়ে, আর বে-নজির ভাঁও (চোখ মুখের ভাব) বাতিয়ে!

এখনকার গহরের 'ভাঁও বতান' দেখেছেন তো? বুঝে দেখুন ওর জওয়ানির আলম্ (কালোচিত রূপলাবণ্য)! বুঝতে পারবেন কিনা জানিনা; কল্পনা করতে পারবেন। শিকারি চিতা দেখেছেন কি? দেখেননি। তাহলে আর কী বলব বলুন। বাস্তবিক চিতার বল তেজ আর চতুরাই দিয়ে ভগবান গড়েছিলেন গহরকে।

বর্ণনার কুশলতা আর সত্যতা এতটাই যেন বিশ শতকের গোড়ার দশকের উত্তর ভারতীয় ঠুংরি-গজল-দাদরার প্রমত্ত দিনগুলি ফিরে আসে। সামন্ততন্ত্র আর জমিদার নবাব-বাদশাদের যুগের শেষ অন্তরাগের সমাজচিত্র যেন। কামনামদির সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত, আতর গোলাপজলের সুগন্ধি, পানজর্দা কিমামের আবেশ, সুবর্ণমদিরার ভৃঙ্গার, দাসীবাঁদী নিয়ে তওয়াফদের অঙ্গবিভঙ্গ আর কটাক্ষবাণ— গানের চেহারার মধ্যে লীন হয়ে আছে কত প্রণয়-বেদনা-মানঅভিমানের দ্যোতনা। আর গায়িকার কী উপমা? বলশালী চিতার তেজ আর চাতুর্যভরা গানের শক্তি— থাবা দিয়ে গহরজান অন্য ঘরানার ঠুংরি কণ্ঠায়ত্ত করে নিচ্ছে। গানের চেহারার মধ্যে শিকারের অনুষঙ্গ, সুর দিয়ে আসরকে পর্যুদস্ত করার বিবরণ যেমন আশ্চর্য তেমনই অপরূপ।

গানের চেহারার সঙ্গে শিকারের এমন অনুষঙ্গ কেন যে আসে তা ভাবলে সমাজের আরেকটা ছবি মনে ভেসে ওঠে। ভোগবাদের পরিবেশে সকলেই তো সকলের কোনো না কোনোরকম শিকার। মালিক সামন্তপ্রভু বাঁধা রেখেছেন সুন্দরী লাস্যময়ী তওয়াফওয়ালিকে আবার যৌবনবতী তওয়াফ তার গানে নাচে বিভ্রমে শিকার করেছে ধনবান প্রভুকে। এর মধ্যে থেকে উঠে আসছে আশ্চর্য গানের মাদকতা। ভাবলে বিষণ্ণ লাগে কারণ সেই যুগ তো নেই। বাঘ আর কামড়ের কথা গানের প্রসঙ্গে আরেক জায়গায় পেয়েছি। ধূর্জটিপ্রসাদ গায়নের বিচিত্র চেহারা এঁকে বলছেন :

তানকারির সময় আমির খাঁ মাথা চুলকোতেন এবং মাথায় ও গালে থুতু মাখতেন। কিন্তু সত্যি গুণী, বাঘের মতো রাগকে কামড়ে ধরতেন।

চমকপ্রদ বর্ণনা সন্দেহ কী! তবে এ সবই প্রত্যক্ষভাবে দেখা গায়ক আর গায়কির চেহারা। আমরা যারা রেকর্ডেই শুধু শীর্ণভাবে আমির খাঁর কয়েকটা গান শুনেছি তারা এই সামনে-বসে-দেখা আত্মবিস্মৃত তানকারির লীলা কিংবা রাগের উপর বাঘের কামড়ের উপমা ভেবেই পাব না।

ভালো শ্রোতার সঙ্গে বসে ভালো গান শোনার আসরের দিন তেমন করে আর কি ফিরবে? ফিরবে কি সেই গানের কাছে আত্মনিবেদিত আত্মভোলা শ্রোতার একান্ত উন্মীল সন্ধ্যা? লখনউতে বিশ শতকের ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। শুনেছেন কত আসরের প্রাণখোলা গান। রতনজনকর ছিলেন তাঁর বন্ধু বয়স্য আর অতুলপ্রসাদ ছিলেন গানের আসরে রসিক সঙ্গী। গানের আসর প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ স্মৃতিচারণ করে অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে লিখেছেন :

আমি তাঁর কর্মান্তের, বিরামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের পরিচয় সংগীতের দৌত্যে, সংগীতের আসরে। কৈশরবাগে তখন তিনি থাকতেন। অনেকরাত পর্যন্ত গানবাজনা হত। তারপর কত আসরে বসে তাঁর গানবাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই! ভালো গানবাজনা শুনলে তিনি বালকের মতো অধীর হয়ে উঠতেন, অস্ফুট চিৎকার করতেন, মুখ দিয়ে উর্দু জবান বেরুত, একস্থানে বসে থাকতে পারতেন না, আবার তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হতেন। কতবার বলেছেন, দেখো, একটু ব্যাকুল বা বেসামাল হয়ে পড়লে আমার জামা ধরে টেনো। তোমাকেই বা কে সামলায় তার ঠিক নেই।

এ হল ভারতীয় গানের আরেক চেহারা— সমজদারি আর কদরদানি।

এখনকার গানের চেহারা যেমন বদলে গেছে তেমনই বদলে গেছে আসরের চেহারা। কোথায় সেসব খানদানি আসর আর বর্ণিল সাজপোশাকে সজ্জিত গুণী শিল্পীদের সমাগম? আগে নাকি রেওয়াজ ছিল গানের আসরে যাঁরা আসতেন তাঁদের অভ্যর্থনা হত আতর-এলাইচ ও গোলাপজল্লের ছড়া দিয়ে এবং সোনারুপোর তবকমোড়া পান দিয়ে। বাদাম পেস্তা দিয়ে সিদ্ধি পান করা ছিল স্বাভাবিক। অমিয়নাথ সান্যালের সাক্ষ্যে জানা যায় সেকালের ধনীরা ব্যসনী হলেও রুচিমান ছিলেন। রেকর্ড সংগ্রহ ছিল তাঁদের নেশা। অজস্র উৎকৃষ্ট রেকর্ড প্রত্যেকটি আলাদা করে তুলার সেলাই করা খাপের মধ্যে পুরে, রাখতেন সুন্দর ক্যাবিনেটে। এখন তো রেকর্ডই বেরোয় না আর! বেরোয় প্রধানত কিছু ক্যাসেট, যা ক্ষণস্থায়ী। ফিলমি গানা আর পপ গান রাগরাগিণীর জগৎকে দাবিয়ে দিয়েছে। রাগসংগীতের ক্ষেত্রে সেতার-সরোদ-সন্তুর বাজানো যন্ত্রশিল্পীদের এখন জয়জয়কার— কণ্ঠশিল্পীরা দ্বিতীয় স্থানে। তাই তেমন গানের আসরও বসে না— বাইজিদের যুগও অস্তগত। অথচ বহুদিন পর্যন্ত গানের চেহারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়েছিল বাইজিবিলাস। বাইজিরা যখন মহ্ফিলে বসতেন তখন পরিস্ফুট দেহকে সূক্ষ্ম মূল্যবান পোশাকের মধ্যে দিয়ে আবেদনময় করে তুলতে জানতেন। অর্ধাবগুণ্ঠিত বাইজিদের আদবকায়দা, হাতের আঙুলে বিচ্ছুরিত আঙটির রত্ন শোভা, করতলের মেহেন্দির বর্ণলেপন জাগিয়ে তুলত যেন সুন্দরের অভিবন্দনা। শরীরের নানা অংশে প্রচ্ছন্ন নানা অলংকারগুলি গানের অলংকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আভাময় হয়ে উঠত। সামন্ততন্ত্রের পতনের পর ভারতীয় মার্গসংগীত হারিয়েছে তার অন্তর্মুখিনতা আর নিভৃতি। তার চেহারা হয়ে পড়েছে স্পষ্ট, প্রকাশ্য ও বাণিজ্যমুখী।

এখানে মনে পড়ল একজন কলাবন্ত সমজদার তাঁর দেখা এক রূপময় গানের আসরের বর্ণনা দিয়েছিলেন। সেবার হোলির বসন্তসন্ধ্যায় তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল বড়বাজারের এক সম্ভ্রান্ত শেঠ পরিবারে। বেনারস ঘরানার জনৈক বাইজি সেখানে হোরি ঠুংরি আর কাজরী শোনাবেন। সঙ্গে অনিবার্য নাচ। সেটা বাড়তি আকর্ষণ। ফিসফাস শোনা গেল বাইজি খুবই সুন্দরী ও সুগঠনা।

শেঠ পরিবারের অভ্যর্থনায় ত্রুটি ছিল না, পরিবেশও চমৎকার। দক্ষিণের বারান্দায় দিনাবসানে বয়ে যাচ্ছিল বাসন্তীবাতাস। আকাশে উঠেছিল মানানসই পূর্ণিমার চাঁদ। সারাদিনের বর্ণময় হোলিখেলার পর সকলেই একটু শ্রান্ত কিন্তু পরিবেশিত মূল্যবান শীধুপানে সকলেই মনের দিক থেকে ফুরফুরে। তখনও আবির গুলালের সম্মোহ কাটেনি। ম্লান হয়নি কুসুমিত সুগন্ধ। শ্রোতারা আগ্রহী, সারেঙ্গি ও তবলাবাদক তৈরি, অতিথি দুয়েকজন বিশেষ ব্যগ্র। সামনে ঝুলছে একটি পর্দা। শুধু বাইজি নেই।

ক্ষণবিরতির পর প্রথমে ঘুঙুরের আওয়াজে সবাই সচকিত হলেন। পর্দা উঠলে দেখা গেল অনতিদূরের এক কাচের চৌবাচ্চা থেকে উঠে এলেন নর্তকী। তাঁর মুখ বাদে সর্বাঙ্গ লালরঙে নিষিক্ত। যেন মূর্তিমতী হোলি। বাইজির সমস্ত শরীর সিক্ত আর উত্তুঙ্গ। টপ টপ করে সুগন্ধ রঙিন জল ঝরে পড়ছে পাথরের সাদা মেঝেয়। লালপায়ের ছাপ ফেলে তিনি অবতীর্ণ হলেন। শ্রোতাদের দুধসাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে লাগল সুগন্ধি রঙের ছিটে। তাঁরা বলিহারি দিয়ে উঠলেন বাইজি আর শেঠকে— এমন অপূর্বকল্পিত আয়োজনের জন্য। তারপরে শুধু গান নাচ কটাক্ষ আর বিভ্রম। মনে হল যেন একটি সম্পূর্ণ হোরি ঠুংরি অবয়বী হয়ে সহসা *দেখিয়ে দিল গানের রঙিন চেহারা।*

৩

গানের পরিবর্তমান চেহারা নিয়ে আলাপচারি আর সমাজ-ইতিহাসের নানা ছেড়-ছাড়ের প্রসঙ্গে কেবল তো গায়িকা, বাইজিদের কথাই এতক্ষণ হল। এবার পুরুষ গায়কদের কথাও উঠবে। তার আগে মুখপাত হিসাবে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৫৮-৬০ সালের ঘটনা। আমি তখন কলকাতার এক কলেজে নবীন অধ্যাপক, বয়স ২২ থেকে ২৩ বছর। তখনও অধ্যাপকীয় গাম্ভীর্য আর সবজান্তার মুখোশ চেপে বসেনি। সে সময় বইপাড়ার শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে দত্ত বাদার্স নামে এক 'অভিজাত টেলারিং শপ' ছিল। প্রশস্ত দোকান, বড়ো বড়ো বেলজিয়ান কাচের আয়না চার দেয়ালে, বনেদি হাবভাব মালিক দত্তবাবুর। উত্তর কলকাতার মানুষ, শৌখিন, চুনোট-করা ফিনলে-র ধুতি, গিলে-করা শাহজাদা আদ্দির পাঞ্জাবি পরনে, হাতের আঙুলে বেশ কটা আংটি। উনি নিজে হাতে পাঞ্জাবির মাপ নিতেন, নিজে হাতে সেটি ডেলিভারি দিতেন। ওঁর বাড়িতে ছিল ওস্তাগরদের আস্তানা। সেখানেই শার্ট প্যান্ট স্যুট পাঞ্জাবি তৈরি হত, তাই দোকানটা ছিল খোলামেলা ছিমছাম। খদ্দেরদের সঙ্গে দত্তবাবু বেশ সময় নিয়ে আলাপসালাপ করতেন। নানা মন্তব্য করতেন। আমি কলেজে পড়াই বলে একটু বাড়তি খাতির ছিল বরাদ্দ। তখন আমার যাকে বলে উঠতি বয়স। লক্ষ করতাম কারো কারো পাঞ্জাবির গলায় আর বোতামঘরের দুপাশে নকশার কাজ থাকত। বয়সোচিত চাপল্যে পাঞ্জাবির মাপ দিতে দিতে একবার দত্তবাবুকে সলজ্জে বলে ফেললাম সুপ্ত অভিলাষটুকু — সাদা সুতো দিয়ে একটু আধটু নকশা করলে কেমন হয়। দত্তবাবু খুব নিবিষ্টভাবে আমার হাতার মুহুরি মাপছিলেন। আমার ইচ্ছেটা শুনেই চমকে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বেদনার্ত গলায় বললেন, 'ছি ছি, ওসব পাঞ্জাবির নকশাটকশা, ওসব তবলচি ক্লাসরা করে। আপনার রুচি অমন হবে কেন?'

এই 'তবলচি ক্লাস' কথাটা তখন আমার কানে ঝাপটার মতো লেগেছিল এবং মনে মনে বেশ আঘাত পেয়েছিলাম। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সংগীতবিদ্যা আর সংগীতচর্চাকারীকে কী চোখে দেখে থাকে তার একটা ইঙ্গিত যেন 'তবলচি ক্লাস' লব্জে ধরা ছিল। গানের আসরে যন্ত্রশিল্পীদের সম্পর্কে এমনতর উপেক্ষা আজ ভাবা যায় না। মনে রাখতে হবে তখনও রবিশঙ্কর বা আলি আকবররা ভারতীয় সেতার-সরোদকে বিদেশে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। শ্যামল বসু, আল্লারাখা, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও জাকির হোসেনদের সচ্ছলতা বা সামাজিক স্বীকৃতি ঘটেনি। তখন তবলচি ক্লাস বলতে বোধহয় বোঝাত বখে-যাওয়া একটি যুবা, লেখাপড়া তেমনি শেখেনি বড়জোর 'যাত্রাদলে পাঁচটাকা পায়।' প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস এ দেশের যখন লেখা হবে তখন সংগীতশিল্পীদের (গায়ক ও বাদক দুপক্ষেরই) সামাজিক সম্মান, অর্থনৈতিক উত্থান ও কৌলীন্যর কথা আসবে। গত শতকের ষাট থেকে নব্বই দশকে সেটা ঘটেছে। গানের চেহারা আর যন্ত্রীদের দাপট এখন এতটাই যে গানবাজনা না বলে বলা হচ্ছে বাজনাগান।

আশ্চর্য যে, দত্তবাবুদের নাকসিঁটকানো তবলচি ক্লাসের সমাদৃত পাঞ্জাবির নক্‌শাদারি দু'দশকের মধ্যে সবশ্রেণির ভদ্রসমাজে উঠে এসেছে। গায়ক বাদক ছাড়াও অভিনেতা, সাংবাদিক, অধ্যাপক, বিবাহার্থী বর, বরকর্তা, ছাত্র, রাজনীতিবিদ্ সকলেই এখন নক্‌শাদার পাঞ্জাবি পরেন এবং সগর্বে পরেন। তাতে নানা বৈচিত্র্য, নানা রংচং এবং কাঁথাফোড়ের সেলাই ও জরির বুননের কত কী অঙ্গরাগ। এর ফলে গানের চেহারাও যে কত পালটে গেছে সেটা আমরা ভেবে দেখেছি কি? সদরে হোক মফস্‌সলে হোক, আজকাল কোনো মঞ্চেযখন পর্দা সরে যায় আমি উত্তেজনায় টানটান হয়ে কোনো অসাধারণ গান শোনার কথা না ভেবে চেয়ে থাকি গায়ক বা গায়িকা কীরকম পোশাক পরেছেন, গায়িকার কেশবিন্যাসে কতটা বিউটিপার্লারের স্পর্শ, যন্ত্রীরা কতরকম রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন তাই দেখতে। এর পর আমি আর গান শুনতে পাই না, গান

দেখি। *এর চরম এক নমুনা সেদিন ঘটল এক বন্ধুর বাড়ি।* দূরদর্শনে রবীন্দ্রসংগীত গাইছিলেন এক সুবেশা ভদ্রমহিলা। তাঁর গানের মুখড়াটুকু শোনার আগেই বন্ধুপত্নী তাঁর কন্যাকে বললেন, 'ওই দ্যাখ বোম্‌কাই পরেছে—তোকে ঠিক ওইরকম একটা কিনে দেব।' বলাবহুল্য, আর গান শোনা হল না মন দিয়ে, বোম্‌কাই পরিহিতাকে দেখে গেলাম শুধু। এই সাজপোশাক সংক্রান্ত সচেতনতা গায়ক বা গায়িকাদের পক্ষে নতুন কিছু নয়। *স্মৃতির অতলে* বইতে দেখেছি, প্রথমে মৌজুদ্দিনের বর্ণনা :

> এঁর মাথায় ছিল একটা সবুজ রঙের পাগড়ি এবং পরিধানে আদ্দির ঢিলা পাঞ্জাবি এবং যোধপুরি ঢঙের পায়জামা।

ফৈয়াজ খাঁ-র বর্ণনা :

> পরিধানে ফিকে সবুজ রঙের পাতলা সার্জের লংকোট; বুকের একটি বোতাম থেকে প্রতিপদের চাঁদের মতো ঘড়ির চেন চলে গিয়েছে বুক পকেটের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে। সেই পকেটের উপর দেখা দিয়েছিল হল্‌দে রঙের রুমালের কুসুমোচ্ছ্বাস।

পরিহাস সহকারে কালে খাঁ-র বর্ণনা :

> বুকের বুটিদার বোতামগুলি টাইট হয়েছে বলেই নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ির একটু উন্নত আভাস ছিল;তবে বেমানান হয়নি, কারণ মাথায় বৃহদাকার মুরেঠার সুষ্ঠু কুণ্ডলীবন্ধ দিয়ে উপর-নীচে পাষাণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে।... দেখি, সেই রেশমি তারা-কাটা জামার বাহার নষ্ট করে দিয়েছে গলায় ঝুলানো একটি লাল ফিতার ঘের, আর তার শেষে একখানি সবুজ পাথরের চাক্‌তি, যার উপরে সোনার জলে খোদাই করা আরবি হরফে কী সব লেখা রয়েছে।

এসব বর্ণনার সঙ্গে সাথ্‌-সংগত করে সেকালের গায়িকাদের অঙ্গবস্ত্র, প্রসাধন, চোখের মদিরাদৃষ্টি এসব নমুনা অনেকই উদ্ধৃত করা যায়, কিন্তু তা বাহুল্য হবে। আমাদের বলার কথাটা অন্য।

উনিশশতক আর বিশশতকের সন্ধিলগ্নের যেসব রাগসংগীত গায়কগায়িকাদের প্রসঙ্গ আমরা করে থাকি তাঁরা এখনকার মতো জলসা বা ক্যাসেট-সিডি বিপণনের সাহায্যে জীবননির্বাহ করতেন না। গানের বাণিজ্যায়ণ তখনও সেভাবে হয়নি এবং বিদেশে ভারতীয় গানবাজনার সমাদর ও ডলার-অর্জন ছিল অকল্পনীয়। রাজাবাদশা বা খানদানি জমিদার ও সামন্তপ্রভুরা বেতন ও ভাতা দিয়ে রাখতেন শিল্পীদের কিংবা দের অন্যভাবে আর্থিক অনুদান দিতেন। ফলে শিল্পীদের অনেকে সচ্ছল ছিলেন আবার বদান্যতা না পে অনেকের ছিল শ্রীহীন দশা। কালে খাঁ-র মতো শিল্পী মাত্র পঞ্চাশ টাকায় গাইতেন একটা পুরো আসর—ত্রিশের দশকে। তুলনায় বাইজিদের অবস্থা ছিল অনেক স্বচ্ছন্দ ও সমারোহপূর্ণ। তাঁদের গানে সমজদাররা মোটা টাকার মুজ্‌রো দিতেন, তা ছাড়াও অনেক বাইজি ছিলেন ধনীর রক্ষিতা। কাজেই সাজসজ্জা, অঙ্গরাগ, ভ্রূবিলাস, রঙিন টিপ, চোখে সুরমা টানা, কেশবিন্যাস, আতরগোলাপের খুশবু, পানজর্দার ব্যবস্থা—এসবই ছিল সামন্তপ্রভুর মনোরঞ্জনের অঙ্গ। পুরুষ গায়করাও দৃষ্টিনন্দন পোশাক ও খানদানি সহবতের চর্চা করতেন। মৌজুদ্দিনের মতো কারো কারো ছিল বাইজিদের সঙ্গে প্রেম-বিরহ-ছলনা ও দেহকামনার বিলাস। কত অচরিতার্থ কামনা, কত দীর্ঘশ্বাস কত অব্যক্ত ভালোবাসার সূক্ষ্ম অনুভূতি এঁদের জীবনে মূর্ত হয়েছে—এঁদের গানের চেহারায় সেটা টের পাওয়া যায়। সামন্ততন্ত্রের অবসানে এঁদের জীবনযাপনের চেহারা আর গানের চেহারা একই সঙ্গে শ্রীছাঁদ হারিয়ে ফেলেছে।

গানের চেহারা প্রসঙ্গে শিল্পীর জীবনাদর্শ আর বাহ্য পোশাক-পরিচ্ছদের কথা টেনে আনছি নিতান্ত প্রয়োজনে। কথাটা পরিষ্কার হবে ভারতীয় গানের পরিবেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীত-পরিবেশের তুলনা

করলে। অবশ্য প্রথমেই মনে রাখতে হবে প্রতীচ্য সংগীতের প্রধান অংশই হল যন্ত্রসংগীত—যুদ্ধোত্তরকালে অবশ্য জাজ্ ও রক্ গান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গদের আছে ক্যালিপ্সো গান। অধুনাতন কালে পপ-র‍্যাপ ও ব্রেথলেসের তীব্র দাপট সে দেশের যুবকযুবতীদের মধ্যে ব্যাপক। টেলিভিশনের 'ভি' চ্যানেল খুললে ওইসব গানের যে-খোলামেলা চেহারা আর শরীরী উচ্ছৃঙ্খলতা চোখে পড়ে, যে ড্রাগ-সেবিত যৌনতা প্রকাশ্য হয়ে ওঠে তাতে হালফিল গান আর তার পরিবেশনরীতি দুটি বিষয়েই ভাবনা জাগে। সে যাই হোক আপাতত আমরা এই নাগালছাড়া গণতন্ত্রের যুগের অনেক আগেকার কথা বলতে চাইছি।

সবাই জানেন পাশ্চাত্য সংগীতের সত্যিকারের সূচনা ঘটেছিল চার্চের সূত্রে। ধর্মোপাসনার অনুষঙ্গে রচিত হত নানা কম্পোজিশন। অবশ্য 'মাস', 'মোটেট', 'ক্যানটাটা' ও 'ম্যাড্রিগাল'নামের বহুতর ধর্মসংগীত প্রচলিত ছিল, কিন্তু প্রধান রচনাগুলি প্রধানত যন্ত্রবদ্ধ ছিল— অর্গান, হার্পসিকর্ড এবং পরবর্তীকালে পিয়ানো চার্চসংগীতের প্রধান অনুষঙ্গ ছিল। প্রথম যুগের চার্চসংগীত (৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পরে) ছিল :

> Simple chants, primarily designed to emphasise the words, developed in this way. After a time, however, the music became important for its own sake and variations and harmonies were introduced.

প্লেন সং থেকে মেলোডি, তারপরে হারমনি ও পলিফনি এইভাবে প্রতীচ্যের গান এগিয়ে গেছে। একদিকে চার্চ আর তার পরিপোষক রাজতন্ত্র বিদেশি সংগীতকে নিয়ন্ত্রণ করেছে — অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রও তাকে প্রেরণা দিয়েছে। এর ফলে বিদেশি সংগীতে কোনো অস্থিরতা, যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য বা ব্যক্তিপ্রাধান্য ঘটেনি বহুদিন। গানের চেহারা ছিল শুদ্ধ, শান্ত ও সাবলীল। তাতে ভাবে কিংবা সুরে কোনো বিরুদ্ধ সুর বা discord লাগেনি। সেই প্রথমদিকের সংগীতস্রষ্টাদের চেহারার দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? দেখি সকলেরই প্রায় একরকম পোশাক, সকলেরই মুখশ্রী অচঞ্চল, শমতাসম্পন্ন— সকলেরই বেশবাস নিয়ন্ত্রিত এবং মাথায় উইগ বা পরচুলা। এ সময়ের গানের চেহারা তাই সুষম, সুবিন্যস্ত, ব্যক্তির চাঞ্চল্যহীন। বাখ্, হেড্ন, হ্যানডেল, মোজার্ট পেরিয়ে বেতোফেনে এলেই এই অচঞ্চল সাংগীতিক চেহারাটা ভেঙে যায়— এসে যায় ধর্ম ও সামন্তপ্রথার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। ব্যক্তির যন্ত্রণা, আত্মদহন, স্ববিরোধ ও আর্তি ফুটে ওঠে বেতোফেনে। ছবিতে তার চেহারাটাও যদি দেখি তবে লক্ষ না করে উপায় নেই যে বেতোফেন উইগ পরেননি। অশাসিত অবিন্যস্ত কেশরাশি আর তির্যক সংশয়ী দুখানি চোখ বেতোফেন ও তার রোমান্টিক সংগীতকে চিহ্নিত করে। এর পরেই বদলে যায় প্রতীচীর গানের চেহারা, শুমান, ব্রাহ্ম্স্, শুবার্ট, ওয়াগনার, শপাঁ— তাঁদেরও পরে হুগো উল্ফ্ আর স্ট্রস্ গানকে অতলান্ত বিষাদ কিংবা উচ্ছল আনন্দে ভরিয়ে দেন। চেইকোভ্স্কি এবং আরও পরে স্ত্রাভিন্স্কি বিদেশের সংগীতের চেহারা অত্যাশ্চর্যরকম আত্মমগ্ন, ব্যক্তিক ও জটিল দর্শনে ভরে দেন। সেইজন্য পাশ্চাত্য সংগীতের ইতিহাস অনুধাবন করলে ধর্ম, সামন্ততন্ত্র ও ব্যক্তিমুক্তির চেহারা স্তরে স্তরে চমৎকার বোঝা যায়। সেই চেহারাটা ভারতীয় সংগীতে তত স্পষ্ট নয়।

কিন্তু আশ্চর্য যে পাশ্চাত্য সংগীতের পরিবেশনরীতির চেহারা বরাবর একরকম — এর কারণ তাদের অত্যাজ্য স্বরলিপি-নির্ভরতা। অথচ ভারতীয় সংগীতের পরম্পরা বরাবর গুরুকেন্দ্রিক এবং ঘরানাশাসিত। তার ফলে গানের চেহারা এক এক ঘরানায় নানা সূক্ষ্ম বিভাজনে বিভক্ত এবং তার মধ্যে কোনো সমন্বয় সম্ভব নয়। তা ছাড়া উত্তর ভারতীয় ও কর্নাটকী এই দুই সংগীতরীতির অসেতুসম্ভব সম্পর্ক ভারতীয় সংগীতের চেহারা ও চরিত্রকে প্রথম থেকে দ্বিমুখী করে রেখেছে। ঔপনিবেশিক নানা সু-প্রভাব এ দেশের জীবনে ও আচরণে পড়লেও বিদেশের স্বরলিপিনিষ্ঠা বিষয়ে ভারতীয়দের অনীহা বিশেষ শোচনীয়। এদেশের

সংগীত— সুরবিহার ও শিল্পীর স্বাধীনতার দিকে বেশি আগ্রহী— তাই গানের চেহারা কেবলই বদলে যায়। গুরু তাঁর শিষ্যকে কতটা দেবেন আর কতটা দেবেন না তার উপর নির্ভর করে শিষ্যের ভবিতব্য তথা সাফল্য। এই বাঁধি রেওয়াজের একমাত্র প্রতিবাদী চেহারা ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। তিনি স্বরলিপিমনস্ক ছিলেন, নিজের গানের যথাযথ গায়কি সম্পর্কে ছিলেন সতর্ক এবং শিল্পীর স্বাধীনতা মানেননি। তার ফলে একটা অনভিপ্রেত ঘটনাও ঘটেছে। সহজে তাঁর গান বহুদিন তেমন প্রসারিত হয়নি। গুণী কণ্ঠসংগীতশিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত গাইতে সংকোচ ও অস্বস্তি বোধ করেন— রাগসংগীতের শিল্পীরা এ-গান এড়িয়ে চলেন। এখনকার নামি সংগীতশিল্পী পণ্ডিত নিবৃত্তিবুয়া সারনায়েক এমনতর মন্তব্য করেন যে,

> What is sung in the name of Rabindrasangeet is vapid and lifeless. There is no rhythm, no beat, no vigour....it is astonishing and not a little regretable that music has come to such a pass in a state so progressive, so culturally rich as Bengal.

হয়তো অনেকটাই অত্যুক্তি হবে তবে এ তো সত্যি যে রবীন্দ্রসংগীত আজ বহুতর অনুশাসন ও কর্তৃপক্ষের খবরদারিতে গায়নের দিক থেকে অনেকটাই গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার গায়নসমাজ সীমায়ত হয়ে রয়েছে মধ্যবিত্ত এলিটদের মধ্যে এবং তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তাঁর দু'হাজারের কাছাকাছি সংখ্যক গানের মধ্যে বড়োজোর একশো-দুশো গান প্রচারিত বা সচরাচর শোনা যায়। এসব তথ্য ও সত্য মিলিয়েই বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের যে-চেহারা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন আমরা তা চাইনি। আমরা তাকে যান্ত্রিক ও একঘেয়ে করে ফেলেছি।

পাশ্চাত্যের ব্যাপারটি একেবারে অন্যরকম। সেখানে সংগীতের মূল চেহারায় ব্যক্তির হস্তক্ষেপের কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ নেই। সেই সংগীতের ঐতিহ্য চার্চ ও ফিউডাল সমাজ পেরিয়ে এখন জনগণতান্ত্রিক, কিন্তু তাতে ঠিক অপেশাদারি চলন বা এলোমেলো পরিবেশনরীতি চলে না। এ ব্যাপারে পরিপোষণ থাকে সে দেশের বড় বড় মিউজিক হল ও কনসার্টের উপযোগী প্রেক্ষাগৃহের। ওইসব সংগীতসত্রে পেশাদার সংগীতকাররা নিয়মিত অনুষ্ঠান করেন এবং দর্শকরা মোটা দামের টিকিট কেটে তা নিয়মিত শুনতে যান। কোনো কোনো হলে তিনমাস আগে টিকিট কাটতে হয়, এত তার জনাদর ও চাহিদা। ফলে, বোঝা যাচ্ছে, পাশ্চাত্যে সংগীতকার ও তার পারফরমারদের কখনো অসচ্ছলতা ঘটে না। চরম পেশাদার বলে তাঁদের সংগীত পরিবেশনে পান থেকে চুন খসে না, বরাবর একটা উচ্চমান রক্ষা করতেই হয়, নইলে শ্রোতারা আসবেন কেন? এর ফলে ওদেশে সংগীতের একটা অনড় ও অপরিবর্তমান চেহারাও জেঁকে বসেছে। বাখ, মোজার্ট, বেঠোফেন বা ওয়াগনার প্রভৃতি মহান স্রষ্টারা বহুকাল আগে যেসব সংগীত রচনা করে গেছেন, দশকের পর দশক, এমনকি শতাব্দী পেরিয়েও, তা একইভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। এর কারণ, স্বরলিপিবদ্ধতা। স্বরলিপির উপর পারফরমারদের কোনো খোদকারি চলে না। ফলে একজন পারফরমারের সঙ্গে আরেকজনের সামান্যই তফাত ঘটে পরিবেশনে। তবে ব্যক্তিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য মানতেই হয়। আর পাঁচজন বেহালাবাদকের সঙ্গে ইহুদি মেনুইনের কি তফাত নেই? সে কথা মনে রেখেও বলা যায়, পাশ্চাত্য সংগীতের কাজ হল শ্রোতাদের সামনে চিরন্তন সংগীতের উদাহরণগুলি সম্পূর্ণ মূলানুগ আদর্শে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে পরিবেশন করা। এই কাজ সম্পন্ন করতে কনসার্টে অর্কেস্ট্রাগঠন করা হয় উন্নততম মানের পেশাদার গুণীদের সমন্বয়ে। তাদের সংখ্যা অন্তত কুড়ি থেকে পঞ্চাশজন। বড় অর্কেস্ট্রায় দশজন বেহালাবাদক, দশজন চেলোবাদক, জনাচারেক বাসবেহালাবাদক, অন্তত দুজন পিয়ানোশিল্পী বেশ কজন পারকাশনবাদক থাকে। এককথায় পশ্চিমি কনসার্ট মানে একটা বড়মাপের সামূহিক আয়োজন, বড় সংগঠন, বড় লগ্নি—

শ্রেষ্ঠ কারিগরি ব্যবস্থায় উচ্চস্তরের ধ্বনিপ্রক্ষেপণ ব্যবস্থা, সুনিয়ন্ত্রণ আরামবহুল সুষ্ঠু অ্যাকাউস্টিক্‌স্ সম্পন্ন অডিটোরিয়াম এবং দীক্ষিত সচ্ছল শ্রোতৃমণ্ডলী। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে সে সব ধনী দেশের সংগীতায়োজনে শিল্পী ও শ্রোতার এই অন্যোন্য সম্পর্ক এবং সমজদারি কিছুমাত্র কমেনি। পপ-র‍্যাপ-রক জাতীয় গানের উদ্দাম চিৎকৃত যৌবশ্রোতাদের মত্ততা সে দেশে চরম, তবু তার পাশে সংগীতরসিকদের উৎসাহে চিরায়ত সংগীত বেঁচে আছে সগৌরবে এবং যথাযথ মর্যাদায়।

তুলনায় আমাদের গানের চেহারা কেমন? ভারতের কোনো বড় শহরেই আলাদাভাবে কোনো মিউজিক হল নেই। সাধারণভাবে বড় ও ধ্বনিব্যবস্থার ত্রুটিযুক্ত প্রেক্ষাগৃহেই সংগীতের তাৎক্ষণিক মরশুমি আয়োজন হয়, বছরব্যাপী আয়োজন এদেশে অকল্পনীয়। বড় অর্কেস্ট্রা এদেশে গড়ে ওঠে না, কারণ শিল্পীর অভাব, শ্রোতার অভাব এবং অর্থের অভাব। বিদেশ এদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমেরিকায় মাইকেল জ্যাকসন ও ম্যাডোনার বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেখানকার মিউজিক হলে পাশ্চাত্য সংগীতের শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি নিয়মিত চর্চা হচ্ছে—শুধু পুরানো রচনার পুনরাবৃত্তি নয়, নতুন সৃষ্টিও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে, পাশ্চাত্যে যখন প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয় তখন সিনেমার আদিপুরুষ গ্রিফিথ প্রেক্ষাপটের পিছনে যন্ত্রীদল বসিয়ে বাখ্-মোজার্ট-হ্যান্ডেল প্রভৃতির নানা কম্পোজিশন সিচুয়েশনের সঙ্গে মিলিয়ে পরিবেশন করতেন। পরবর্তীকালে সবাক ছবি আসার আগেও এ পদ্ধতি চালু ছিল, কেবল প্রসিদ্ধ কম্পোজিশনের বদলে নতুন রচনা পেশ করত যন্ত্রীদল। এ ধরনের ঘটনাগুলি উল্লেখ করে আমাদের বলবার কথা হল, বিদেশি সংগীতের রচনারীতি ও সুরস্বরের বিন্যাসে নানা মাত্রার আধুনিকতা ও রোমান্টিকতা থাকলেও তার চেহারায় একটি ক্লাসিক প্রচ্ছদ আছে, যা স্থির ও সুনির্দিষ্ট। তার জাঁকজমক ও দৃষ্টিনন্দন চেহারাও আলাদাভাবে চোখে পড়ে। পাশাপাশি ভারতীয় সংগীতের পোশাকি আয়োজনও খুব দীন, শ্রীহীন। ভীমসেন যোশী ও কিশোরী আমনকরের মতো গায়ক কিংবা রবিশঙ্কর বা আমজাদ আলির মতো যন্ত্রীর আসরে খুব বেশি জলুস বা নয়নরম্যতার ব্যবস্থা থাকে কি? তাদের অনুষঙ্গী বাদকদলও সর্বমোট চার-পাঁচজন থাকেন—তাঁদের একেক জনের একেক পোশাক! ফলে সমগ্র ব্যাপারটি বড়ো বিসদৃশ ভিস্যুয়ালের সৃষ্টি করে—চিন্তা ও উপস্থাপনার দারিদ্র্য অনেককে কষ্ট দেয়। সমঝদার শ্রোতার এবং উদ্যোগী প্রযোজকের অভাবে এদেশের বড় বড় শহরে সংগীতের আসর বসে খুব কম।

অথচ ভারতীয় সংগীত, বিশেষত রাগদারি গান ও বাজনা বরাবর ছিল দরবারি ধরনের— তার কারণ এ ধরনের সংগীতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন রাজদরবারকে ঘিরে। রাজসভার শোভাবর্ধন করতেন যেমন সভাপণ্ডিত, সভাকবি, বিদূষক, ভাট ও চারণদল তেমনই থাকতেন সভাগায়ক। নিয়োগকারী রাজন্যের আভিজাত্য, কৌলীন্য আর রাজকীয় জৌলুসকে বিজ্ঞাপিত ও প্রচার করবার জন্য এঁদের সকলকে উজ্জ্বল, মূল্যবান ও দেখনদার সজ্জা বা পোশাক পরতে হত। রাজকোশ থেকেই তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও বৃত্তি দেওয়া হত। কেউ কেউ পেতেন জায়গির। সংগীতচর্চা করতে করতে তাঁদের কেউ কেউ ক্রমে বনে যেতেন সম্পন্ন ভূস্বামী। সংগীতের এই রাজকীয় বনেদি চেহারাটা ধ্বংস হয়ে গেছে রাজতন্ত্রের বিলোপে। কিন্তু বাইজি প্রথা বা ধনী গৃহে মুজ্‌রো প্রথা বহুদিন ছিল এবং তা টিকিয়ে রাখার ফলে ভারতীয় সংগীতের ঘরোয়া আসরে বা বাইজিদের পল্লিতে শিল্পীদের প্রদর্শকামিতা, আদবকায়দার কৌশল ও সুর্মা-আতরবিলাস ঠিক লোপ পায়নি। এর মূল কারণ সংগীত পরিবেশন নামান্তরে একরকম পণ্য এবং তার খরিদ্দারদের আকর্ষণ ও পরিতুষ্ট করার বহুবিধ সযত্ন প্রয়াস থাকেই। বহুদিন পর্যন্ত আমাদের গীতিশিল্পীদের, অন্তত নারীদের, দর্শনধারী হতেই হত—সেই কারণেই উজ্জ্বল ঝলক লাগানো বেশবাস, সল্‌মা-চুমকি সাজানো অঙ্গবস্ত্র ও ওড়না, সাটিনের পেশোয়াজ,উগ্র প্রসাধন, দামি খুশবু ও মদিরেক্ষণ কটাক্ষ, সবই গানের চেহারাকে

খোলতাই করেছে। এই সঙ্গে স্মরণীয়. শিল্পীদের মধ্যে বারোআনাই ছিলেন মুসলিম. তাই পোশাকে বিলাসে নবাবি প্রভাব ও ভোগবাদের ছাপ গানের চেহারায় স্বতঃস্ফুট ছিল। অবশ্য পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের মতো হিন্দুগায়ক বা কর্নাটকী গানের গুণীরা এ ধরণের দর্শনধারী ছিলেন না। তাঁদের গানের তাই আরেক চেহারা। আমাদের দেশে গানের জন্য আলাদা প্রেক্ষাগৃহ এবং টিকিট কাটা নিয়মিত শ্রোতার অভাবে ভারতীয় সংগীতের ঠিক মধ্যবিত্ত চেহারাটা ফুটে ওঠেনি। ভারতীয় সংগীতের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় গড়ে উঠেছিল সামন্তসমাজের বদান্যতায়। পরবর্তীকালে তাতে ক্রমপতনের সব লক্ষণই ফুটে ওঠে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *কথা ও সুর* বইতে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সমসময়ের ভারতীয় সংগীত ও তার শিল্পীদের শোচনীয় অস্তরাগের বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন :

> সর্বত্র খানদানি কিংবা সত্যকারের পুরানো ঘরোয়ানা চাল লুপ্তপ্রায়।... তাঁরা নির্বংশ, নচেত তাঁরা শহরবাসী। সেনীয়া-বংশের গায়ক-গোষ্ঠীর কুলপতি গিধৌড়ের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ আলি খাঁ এবং বীণকার গোষ্ঠীর প্রধান অধিনায়ক উজির খাঁ আজ জীবিত নেই। সরোদের পীঠস্থান রোহিলখণ্ডে, বিশেষত রামপুরে। সেখানে বিখ্যাত সরোদিয়া ফিদা হোসেনের এবং মহীশূরের বিখ্যাত বীণকার শেষান্না ও রামপুরের বীণকার উজির খাঁর মৃত্যু প্রায় সমসাময়িক। পীঠাপুরমের সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কয়েক বৎসর পূর্বে নিজের বীণার পাশে দেহরক্ষা করেছেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা বাজিয়ে নাইডু ভিজিয়ানাগ্রামে থাকেন। তিনি অন্ধ হয়ে আসছেন, দেওয়াসের রাজাব আলির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ইন্দোরের বিখ্যাত বীণকার মুরাদ আলি অল্পদিন হল মারা গেছেন, গোয়ালিয়রের অদ্বিতীয়া ধ্রুপদীয়া ওমরাও খাঁ, টিকমগড়ের মৃদঙ্গী হরচরণ লাল অশীতিপর বৃদ্ধ। গোয়ালিয়রের রাজাভেইয়া, বরোদার ফৈয়াজ খাঁ, মৈহারের আলাউদ্দিন এখনো জীবিত — কিন্তু তাঁদের স্থান অধিকার করবার যোগ্য ব্যক্তি নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদের দেওয়া বৃত্তান্ত থেকে দুটি কথা স্পষ্ট। প্রথমত, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বে ভারত চূড়ান্ত মন্দা ও স্থবিরতায় গ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দেশীয় রাজা ও নবাবদের সামর্থ্য কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ রাজ্যের সংগীত ঘরানায় ক্লান্তি ও পৌনপুনিকতা ও ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দিচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, শিল্পীরা বড়ো বড়ো শহরে চলে যাচ্ছিলেন অন্য জীবিকার খোঁজে বা অন্যতর শ্রোতার দিশায়। গানের চেহারায় তার অনিবার্য ছাপ পড়বেই।

সেই চিহ্ন হল পরিবেশনের সময় অতিরিক্ত চটকদারি, উৎকট তানবাজি এবং নবসৃষ্টির শোচনীয়রকম অভাব। ধূর্জটিপ্রসাদের বিবরণের এক দশক আগেই ১৯২৬ সালে দিলীপকুমার রায় সারা ভারতের নানা সংগীতসত্র পরিক্রমা করে *ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা*-য় একটা সোজাসাপটা মন্তব্য করে বলেছিলেন :

> আমি প্রায় সারা ভারত খুঁজে এত কম ভালো গায়কের গান শুনেছি যে,— ভাবলে মনটা বিস্ময়ে ও আক্ষেপে অভিভূত না হয়েই পারে না।... আমাদের সংগীতের অবস্থা আজ মুমূর্ষু— অশিক্ষিত পেশাদারের হাতে সংগীতের সহস্রদল যে প্রস্ফুটিত হতে পারে না, এ সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সংগীতের মুক্তি নেই।

দিলীপকুমার নিজে সংগীতস্রষ্টা ও গায়ক বলেই সারা দেশের সংগীতে ভাটার টানের লক্ষণ ধরতে পেরেছিলেন। সেই গানের চেহারায় যে চাকচিক্যসার নিষ্প্রাণভাব এসে যাচ্ছিল তা বুঝতে তাঁর সময় লাগেনি। নটীদের ঊর্ধ্বাঙ্গের অঙ্গবস্ত্র আর ওড়না ছিন্ন হয়ে আসছিল, তবলাবাদকের উদরে অন্ন ছিল না কিন্তু পায়ে ছেঁড়া নাগরা জুতো আর মাথার হেলানো টুপির সজ্জার বদল ঘটেনি, অকিঞ্চিৎকর তম্বুরাটির

সুর যে-নারী ছাড়তেন তাঁর নাকেও ঝলক দিত নকল হীরার দীর্ঘশ্বাস। এই অবস্থাকে মেনে নিয়ে কোনোক্রমে চলছিল সংগীতের ক্লান্ত পসরা। তখন সবে রেকর্ড কোম্পানি কাজ শুরু করেছে। ধ্বনি ব্যবস্থা সুচারু হয়নি। বেতার ও সবাক ছবি তখনও উঁকি দেয়নি।

এই সময়েই দিলীপকুমার সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি ভারতীয় সংগীতের চেহারায় এবারে হাওয়াবদল দরকার। তার সঙ্গে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি ও প্রতিভার সংযোগ জরুরি। চলমান দেশকালের সঙ্গে আমাদের স্থবির সংগীতবিগ্রহ ঠিক মিলছে না। তাঁর বিশ্বাস,

> আমাদের হিন্দুস্থানি সংগীতের বিকাশধারার একটা মূলগত পরিবর্তনের সময় এসেছে, যে জন্য আমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নির্ভীক আলোচনাও সশ্রদ্ধ মনোযোগ অতি আবশ্যক। তাই এখন সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই কর্তব্য আমাদের সঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা পাওয়া। কেন না একথা আমরা না বুঝলে আমাদের সংগীতের মুক্তি নেই যে, আমাদের ললিতকলাটি আজ যে সম্প্রদায়ের একচেটে হয়ে পড়েছে তাঁদের দ্বারা আর যে ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভব হোক না কেন, শব্দব্রহ্মের উপাসনা যে সুসাধ্য নয় এটা ধ্রুব।...
>
> যদি আমরা একটু নির্ভীকভাবে সে-যুগের মহাকালের ভুক্তাবশিষ্ট দু-একজন কালোয়াতের গান শুনতে যাই—যেমন ধরুন সংগীতরত্নাকর বৈরম-কুলতিলক মহাধনুর্ধর আল্লাবন্দে খাঁর খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের হুহুংকার আলাপ। ইনি অনেকটা আইডিয়া দিতে পারেন, সে যুগে কাদের ওস্তাদ বলে লোকে দূরের থেকে নমস্কার করেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত।

দিলীপকুমার উচ্চারিত 'সংগীতের মুক্তি' কথাটির দ্যোতনা বহুদূরবিস্তৃত এবং মনে পড়বেই যে এই শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের এক যুগান্তকারী প্রবন্ধ আমাদের চিন্তা-জগৎকে আমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল। স্রষ্টা ও সংগীততাত্ত্বিকের যুগ্ম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা-গানে নতুন জোয়ার আনতে তখন সচেষ্ট। রুচিমান শ্রোতা তৈরি করা, রঙ্গমঞ্চকে অচ্ছুৎ করে না-রাখা, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নারী-পুরুষের দৈনন্দিন যাপনে ও উৎসবে-আনন্দে-শোকে গানের সহযোগ এনে তিনি গানের চেহারাই পালটে দিলেন— সে প্রসঙ্গ এখনকার আলোচ্য নয়।

৪

মোঘল-পাঠান আমল পার হয়ে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত ভারতীয় সংগীত রাজারাজড়া নবাব বাদশাদের প্রত্যক্ষ পরিপোষণে ও সমজদারিতে চলেছে। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে কলাবন্ত যাঁরা তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দু'দল সাধকই ছিলেন। তবে ধ্রুপদের চর্চা বহুলাংশে হিন্দুদের সাধ্য ছিল। ভজন গানেও তাঁদের একাধিপত্য ছিল। কিন্তু খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল প্রভৃতি আঙ্গিকের চর্চা কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব ছিল না। খেয়াল বাদে অন্যান্য লঘু শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে নৃত্যকলার একটা যোগ ছিল— নারীরা গানে নাচে দক্ষ ছিলেন অনেকে। এঁদের প্রসঙ্গ সবিস্তারে বলা হয়েছে। আসর, মজলিশ, মুজ্‌রো, মহফিলের বাইরে পাবলিক স্টেজে নাচগান অনেক পরের ব্যাপার। সব সম্পন্ন শহরেই নাচগানের আলাদা পাড়া ছিল। নানা বিধিনিষেধ, নিয়মকানুন, সহবত মেনে বাইজিদেরও ঘরোয়া আস্তানা ছিল— তাঁদের নজরানা দিয়ে নিয়ে যাওয়াও যেত ধনীর বিলাসকক্ষে বা জলসাঘরে। এমনতর ত্বরাহীন ভোগবাদী ও বিলাসীযাপন ক্রমে ক্রমে বিপন্ন আর আশঙ্কিত হয়ে পড়ছিল বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে আবির্ভূত তিনটি প্রচার মাধ্যমের জনাদরে ও প্রসারে। গানের সমাজে ও চেহারায় খুব দ্রুত পালাবদলের দিন সূচিত হল।

সর্বাধুনিক এই তিনটি প্রচার মাধ্যম হল—এক, কলের গান বা রেকর্ড সংগীত, দুই, রেডিয়ো সম্প্রচার বা বেতার তরঙ্গ, তিন সবাক চলচ্চিত্র। ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার আমদানি করা তিনটি প্রযুক্তি আমাদের আবহমান গানের চেহারা একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিল। এতে স্বয়ং গায়ক বাদকরা তাদের চেহারা আর সাজসজ্জাসমেত অদৃশ্য হয়ে গেল। গ্রামোফোন রেকর্ডের কতকগুলি গোল কালো চাকতি আর রেডিয়ো-র কাঠের বাক্সের অন্তরালে ঢেকে গেল খানদানি গানের রূপময় চেহারা— অথচ বাড়িতে বসে রসিকরা সামান্য খরচে সুখশ্রাব্য সংগীত শুনতে শুরু করলেন নিজের রুচিমাফিক। রেকর্ডের বাজার গানের বিনিময়-মূল্যের সূচনা করল, গান হল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভোগ্যপণ্য। শ্রোতা বা ক্রেতার ইচ্ছা অনুযায়ী এবারে গানওয়ালারা এগিয়ে এলেন। রাগসংগীতের বাঁধাধরা নিয়মনিষেধের বেড়া ভেঙে, ঘরোয়ানাকে পরোয়া না করে, শুরু হল নতুন ধরনের গান রচনা, নতুন ভাবে সুরমিশ্রণের রসায়ন, নতুন ভাবে কণ্ঠ প্রক্ষেপণের জাদু আর যন্ত্রকৌশলে ধ্বনিব্যবহারের চমক। গানের সুরে যেমন দেশি-বিদেশি সুরের স্পন্দ মিশে গেল, গানের নেপথ্যে তেমনই সংযোজিত হল দেশি-বিদেশি যন্ত্রানুষঙ্গ। গড়ে উঠল নতুন যন্ত্রীদল। গানবাজনা হয়ে উঠল নির্ভরযোগ্য জীবিকা এবং তার জন্য রাজপুরুষদের বদান্যতা বা খামখেয়ালের দরকার থাকল না।

কোথায় গেল সাজসজ্জার সেই দেখনদারি. কোথায় গেল গায়িকার ভ্রূবিলাস, গায়কেব সুর্মাচর্চা, উবে গেল আতর জর্দা আগরবাতির খুশবু, নিবে গেল জলসাঘরের চিরাগরোশনি, স্তব্ধ হল ঘুঙুরের বোল। গানের সে চেহারাই রইল না আর। অদৃশ্য গুণীর কণ্ঠে নেপথ্য থেকে তৈরি হল ধ্বনিমায়া। এবারে আর গানের রূপ নয়, গানের ভাব ও বাণীর দিকে অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল শ্রোতার। তাঁদের স্মৃতির সঞ্চয়ে চিরকালের মতো গেঁথে গেল বেশ কয়েকটি গান ও গায়নের স্মৃতি আর ক'জন গায়ক-গায়িকার নাম। সেই নাম শুনেই মন নেচে ওঠে ভালো গানের সম্ভাবনায়— অথচ তাঁদের চর্ম চোখে দেখার উপায় নেই। ক্রমে গ্রামাফোন কোম্পানিগুলি রেকর্ড কভারে ছাপতে লাগলেন আবছা মুদ্রণে শিল্পীদের অবয়ব। গান শুনতে শুনতে শ্রোতাদের সামনে আবার জাগতে লাগল শিল্পীদের আবক্ষ আলেখ্য—তাঁদের চেহারার বিশেষত্বগুলি মার্কা-মারা হয়ে গেল। 'রেকর্ডসংগীত' নামের ছাপা বইয়ে পাওয়া যেতে লাগল নতুন গানের বাণী, তাদের গীতিকার সুরকারের নাম এবং শিল্পীর স্পষ্ট আলোকচিত্র।

রেকর্ড আর রেডিয়ো, গানের পরিবহণে বড় ভূমিকা নিল। দূরকে করল নিকট। রেডিয়োর চাবি টিপলেই কলকাতা কেন্দ্রের সম্প্রসারিত গান পৌঁছে যেত দূর মফস্‌সলে। সুদূর পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম কি নোয়াখালির মানুষ দম-ঘোরানো কলের গানে কলকাতা-থেকে-কিনে-আনা রেকর্ড চাপিয়ে সদ্যপ্রকাশিত গানখানি শুনে নিত। মানুষের ব্যাপক ও বিচিত্র সংগীতরুচির জোগান দিতে গজিয়ে উঠল অনেক রেকর্ড কোম্পানি— তাদের চাহিদা পূরণ করতে তৈরি হয়ে গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসা গীতিকার-সুরকার-শিল্পী-যন্ত্রী। গানের চেহারায় এতদিনে লাগল শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মনের স্পর্শ। এই সময়কার রেকর্ডসংগীত ও শিল্পীসম্প্রদায় সম্পর্কে শোভন সোমের কিছু মত-মন্তব্য* বেশ অনুধাবনযোগ্য ও সমাজস্পর্শী চিন্তায় সমৃদ্ধ। তাঁর মতে, ডিসক্‌ মিউজিক আসলে পপুলার কালচারের রকমফের। ফলে,

> যে গান থিয়েটারে না-গেলে বাইজি বাড়িতে মেহফিলে না বসলে শোনা যেত না, সেই গান কালো চাকতি বাহিত হয়ে আমাদের অন্দরে সটান ঢুকে গেল।....গানকে দেখা হল বিনোদনের ভোগ্যপণ্য হিসেবে।... যে গান অন্দরে প্রবেশ করল সে গান শ্রাব্য গান।

* দ্রষ্টব্য *ধ্রুবপদ*, প্রসঙ্গ : বাংলা গান। বার্ষিক সংকলন ১৯৯১।

ডিসক্ রেকর্ডিং-এ গওহরজানের 'হরি বলে ডাক রসনা' শুনে রক্ষণশীল রক্ষণশালীরা ভক্তি অশ্রুতে প্লাবিত হতেন।

গানের শিল্পীর চেহারা বা পরিচয় না জানায় শ্রোতাদের সঙ্গে গানের একটা আড়াল তৈরি হল সেকথাটাও মনে রাখা দরকার। তার ফলে বাইজির কণ্ঠে ভক্তিগীতি বেশ চলে গেল—সামনাসামনি রক্ষণশীলরা তাদের ছায়াও মাড়াতেন না। অন্য একটা মজাও ঘটেছিল। করিম মল্লিক নামে মুসলমান গুণীকে দিয়ে রেকর্ড কোম্পানি শ্যামাসংগীত রেকর্ড করে বাজারে ছেড়ে দিল, শুধু শিল্পীর নামটা ছোট হয়ে দাঁড়াল 'কে. মল্লিক'। তাঁর শ্যামাসংগীতের রেকর্ড বহুদিন ভালো ব্যাবসা করেছে। আড়ালের এই রহস্য ভারী উপভোগ্য। ডিসক্ রেকর্ডের প্রথম কয়েক বছরে শিল্পী-তালিকা পেশ করে শোভন সোম বেশ কটি দ্যোতক সিদ্ধান্ত করেছেন।* যেমন :

বাংলা গানের ডিস্কে প্রথম দশকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গওহরজান, লালচাঁদ বড়াল, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচি এবং কয়েকজন 'মিস্' যাঁদের মধ্যে ছিলেন বিনোদিনী, কুমুদিনী, ভুবনেশ্বরী ও অনেকে। দ্বিতীয় দশকে নতুন এলেন কয়েকজন দাসী যেমন বেদানা, নরীসুন্দরী, পূর্ণসুন্দরী, জ্ঞানদাসুন্দরী....। তৃতীয় দশকে এলেন কয়েকজন বালা— আঙুর, ইন্দু, নীহার, এলেন হরিমতী, কানা কেষ্ট, ধীরেন দাস, বিমল গুপ্ত এবং প্রতিভা সোম, হ্যাঁ, লেখিকা প্রতিভা বসু। পারফর্মিং আর্টসে এঁরা তখন সেলিব্রিটি। মনে রাখতে হবে তখন সিনেমার স্টার সিস্টেম পাকা হয়নি, কিন্তু ডিসক্ সংগীতে স্টার সিস্টেম হয়ে গেছে এবং তখনো রেডিয়ো ব্যাপক ছিল না, বিনোদনের অন্য মাধ্যম ছিল না, ডিসক্ সংগীতের ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী রমরমা। চতুর্থ দশককে আধুনিক গানের যুগ বলা হচ্ছে। তখনই প্রথম তিন দশকের মিস্ দাসী আর বালাদের কাল ফুরোচ্ছে আর আসছেন ভদ্রলোক গেরস্ত ঘরের কন্যারা।... এলেন যূথিকা, গীতা, উমা, সুপ্রভা, শৈল, উত্তরা, পারুল, নমিতা, দীপালী, অমিয়া।.... পঞ্চমে এলেন সুচিত্রা, কণিকা, উৎপলা, নীতা, সুপ্রীতি, বেলা, তুষারকণা, ইলা...।

এই পর্যন্ত লিখে শোভন সোম শেষে একটা মোক্ষম কথা বলেছেন। এদেশের ডিসক্ রেকর্ডে রয়ে গেছে 'সংস্কৃতির হস্তান্তরের ইতিহাস'। আজকের ক্যাসেট ও সিডি একেবারে শিক্ষিতদের সামগ্রী।

গানের আরেক বিচিত্র চেহারা ফুটে উঠল চলচ্চিত্রে। ১৯৩০ সাল বরাবর সবাক চলচ্চিত্র তৈরি হতে লাগল এবং তাতে সঙ্গে সঙ্গে গান সংযোজন শুরু হল— কারণ ততদিনে মধ্যবিত্ত দর্শক ও শিক্ষিত সমাজ রেডিয়ো আর রেকর্ডে গান শুনে ভেতর ভেতর গান-পাগল হয়ে উঠেছে। ১৯৩১ সালের ২৭ জুন রিলিজ করে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাংলা ছবি 'জোরবরাত', প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'ঋষির প্রেম' রিলিজ করে ১৯৩১ সালের ৩ অক্টোবর। দুটি ছবির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন গায়ক ও সংগীত পরিচালক হীরেন বসু। 'জোরবরাত'-এর নায়ক জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় গান জানতেন না, অথচ নায়িকা কাননবালাকে গান শোনাবেন—তাই প্লেব্যাক করলেন হীরেন বসু। শুরু হল গানের চেহারায় এক নতুন কৌশল। পর্দায় একজনকে গান গাইতে দেখা যাচ্ছে অথচ গানটা গাইছেন আরেকজন—তিনি দৃশ্যের বাইরে। কখনো-কখনো অবশ্য যিনি গাইছেন তাঁকে দেখাও যেত, যেমন—কাননবালা, পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, উমাশশী—তাঁদের জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। এইভাবে এবারে একটা নতুন ক্যাটিগরির গান সমাজে ঢুকে গেল—সিনেমার গান। বাড়িতে রেডিয়ো কেনা কিংবা কলের গান বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। নিত্যনতুন রেকর্ড কেনা সেও তো খরচের ব্যাপার। তার চেয়ে এটা ঢের সস্তা আর সহজ। দু-চার পয়সা জোগাড় করে সোজা হলে ঢুকে গান শোনা আর গানটা গলায় তুলে

নেওয়া। এতে গরিব বড়লোকের ভেদ নেই, অভিজাত-অনভিজাত সকলেরই সমান অধিকার। যার সুখী গৃহকোণ ছিল না, ছিল না গ্রামাফোনের শোভা ঘরে সাজানো, তারও দিব্যি নেশা ধরে গেল গানে। একথা আজ পর্যন্ত সত্যি যে, সমাজের মধ্য ও নিম্নস্তরের সবচেয়ে প্রচলিত ও জনপ্রিয় হল সিনেমার গান। আগে সিনেমা বেরোলে গান শোনা যেত, পরে বেরোত তার রেকর্ড। আজকাল ক্যাসেটের যুগ এসে সিনেমা রিলিজের অনেক আগে ক্যাসেটে গান বার করে প্রযোজক সেই গান বাজারে হিট করিয়ে দেন বিজ্ঞাপনের কৌশলে। অনেক সময় তাই এমনও হয়, হিট গান শুনতেই অনেকে ফিলম্‌টা দেখে। এ জাতীয় গান মানুষের মনে অন্য একটা মাদকতাও আনে। প্রিয় নায়ক বা নায়িকা ফিল্‌মে বিশেষ দৃশ্যে বিশেষ ভঙ্গিতে গানটা গেয়েছে বলেই অনেকে গানটা বারবার শুনতে চায়— যেন ওই দৃশ্যেরই রোমন্থন আসলে। এমন্য হয় যে, কোনো হিট গান কে গেয়েছে তা না জানলেও আসে যায় না— কিন্তু ফিল্‌মে কার লিপে গানটি আছে সেটা খুব জরুরি। এ কারণেই হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বহু গান হিট হয়েছে— তা উত্তম-সুচিত্রার 'লিপে' ছিল বলে। এমন এক জনপ্রিয় ভিস্যুয়াল 'সপ্তপদী'-র গানের দৃশ্যে মোটর-সাইকেলে চেপে উত্তম-সুচিত্রার লিপে 'এই পথ যদি না শেষ হয়'।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা তথ্য মনে রাখতে হবে। খানদানি মার্গসংগীতের গুণী কলাবত, নিষ্ঠাবান প্রাদেশিক গায়ক-গায়িকা, লোকসংগীতশিল্পী, পপ-র‍্যাপ গায়ক, বেতার শিল্পী কিংবা রেকর্ড-ক্যাসেটের গোল্ডেন ডিস্ক পাওয়া সবচেয়ে বাণিজ্যসফল গায়ক-গায়িকার চেয়ে সিনেমার গান অনেক বেশি জনপ্রিয়, অনেক বেশি প্রচারিত ও প্রসারিত। লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি, কিশোরকুমার, উদিত নারায়ণ, অলকা, কবিতা, শ্রেয়া ও কুমার শানু-র গানের প্রচার আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এবং তা সম্ভব হয়েছে কয়েকটি কারণে। এক, হিট ছবির সমাদর, দুই, সারাদেশে বহু সিনেমা হলের অবস্থিতি, তিন, রেডিয়ো ও নানা টিভি চ্যানেলে গানগুলির অনবরত প্রচার— বিশেষত টিভিতে শরীরী দৃশ্যের বারবার প্রদর্শন, চার, সস্তায় ক্যাসেট বিক্রির সর্বভারতীয় নেটওয়ার্ক। সবচেয়ে আশ্চর্য, যে ফিলম্‌ হয়তো একজন দেখেনি সে-ও কিন্তু গানটা শুনেছে বা সেই গানে মজেছে। সেই গানের ক্যাসেট কিনে অহর্নিশ বাজাচ্ছে। বিশেষ ভিস্যুয়াল বা অদ্ভুত শব্দপ্রয়োগে ফিলমের গান যে কতদূর জনাদর পেতে পারে তার চরম নমুনা মাধুরী দীক্ষিতের নাচের সঙ্গে ইলা অরুণের কণ্ঠে গান : 'চোলি কে পিছে ক্যা হ্যায়'। একই রকম আশ্চর্য দেশ কাঁপানো গান ছিল রাজকাপুরের বোহেমিয়ান পোশাকে অভিনয়ে আর মুকেশের গায়নে 'আওয়ারা হুঁ'।

আসলে গানের চেহারায় সব ঐতিহ্য, হিসেবনিকেশ গোলমাল করে দিয়েছে সস্তার ক্যাসেট-সাম্রাজ্য ও সুলভ দূরদর্শনের পর্দা। সেদিন দূরদর্শনে হঠাৎ চোখে পড়ল একজন আধুনিক কালের শিল্পী শ্যামাসংগীত গাইছেন বলে একটা বিশেষ পাঞ্জাবি পড়েছেন। রক্তিম সেই পাঞ্জাবিতে কালো প্রিন্টে পুরো দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের উদ্‌ভাষণ। শ্যামাসংগীতের এহেন চিত্রিত ভাষ্য আগে দেখিনি। অথচ গত শতাব্দীর গোড়ায় রেডিয়ো-রেকর্ড-ফিলম এসে গানের শিল্পীর শরীরকেই অদৃশ্য করে দিয়েছিল। দূরদর্শন সেই গানকে, গানের বর্ণময় শরীরী উপস্থাপনকে আরও বড় আকারে টেনে এনে ভিস্যুয়াল করে দিল। টেলিভিশনের 'V' চ্যানেল ,B4U ও অন্য নানা চ্যানেলে গান শোনানোর নামে যে অঙ্গবিকৃতি, নগ্নতা আর যৌন ইশারা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে আজকাল তার ফলে গান আর শোনার বস্তু হয়ে থাকছে না— হয়ে উঠছে দেখবার এমনকি শিহরিত ও উত্তেজিত হবার বিষয়। গানের শ্রাব্য চেহারা ধ্বস্ত হয়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে গানের শরীরী ব্যস্তবতা— তার সঙ্গে নানা আলোছায়ার মায়া, উৎকট তালবাদ্যের শব্দদূষণ। ফৈয়াজ খাঁ-র কণ্ঠে সেই অনবদ্য পঞ্চমের স্থিতি ও সৌন্দর্য শান্তভাবে উপভোগ আজ যেন অলীক উপকথা।

৫

গায়ক বা গায়িকার প্রদর্শনকামিতা অনেকটা হালফিল ব্যাপার— অর্থাৎ গানের চেহারা ফোটাতে গিয়ে নিজের চেহারা, বিশেষ পোশাক বা অঙ্গভঙ্গির চেহারা দেখানো। এটা আগে ছিল না। হেমন্ত বা ধনঞ্জয় বরাবর সাদা সার্ট হাত গুটিয়ে পরতেন, সঙ্গে ধুতি। এখন অনেক শিল্পীর পরনে অনায়াসে দেখা যাবে জিন্‌স্ ও রংবেরঙের উর্ধ্ববেশ। তাতে আপত্তির কিছু নেই। যুগের হাওয়ায় পোশাক পালটাতেই পারে। কিন্তু এখনকার জনপ্রিয় গায়ক প্রতিবাদী বাণীর গান গাইতে মঞ্চে উঠে চটের আলখাল্লা পরলে কিংবা লোমশ অঙ্গ দেখাতে কালো স্যান্ডো গেঞ্জি পরলে চেষ্টাকৃত একটা কৃত্রিমতা বা দেখনদারি বলে মনে হতেই পারে কারোর কারোর। একটু প্রচ্ছন্ন যৌনতাও নয় কি? ঊষা উত্থুপ মঞ্চে উঠেই প্রথমেই বলেন, 'কী, শাড়িটা কেমন লাগছে? ভালো? থ্যাঙ্কু'। তাঁর কপালে শোভমান 'ক' অক্ষর লেখা টিপ বিশেষ দ্রষ্টব্য। কিংবা ধরা যাক, সুবিনয় রায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তাঁর অন্ত্য বয়সে গানের আসরে দেখা দিচ্ছিলেন সিল্কের পাঞ্জাবিতে নকশা ফুটিয়ে যার প্রয়োজন তেমন নেই। কারণ তাঁর গায়নে রবীন্দ্রসংগীতের বেশ কিছু দুরূহ গানের এত সস্মিত ও সাবলীল ভাব ও রূপ ফুটেছে যার কোনো পোশাকি উদ্‌ঘাটন দরকার নেই। অন্যপক্ষে পীযূষকান্তি সরকার রবীন্দ্রনাথের গান সঠিকভাবে পরিবেশন করার স্বেচ্ছাকৃত দায় নিয়েছিলেন হাতের মুদ্রার পরিকল্পিত বিক্ষেপে। দীর্ঘদেহী সমুন্নত এই গায়ক লম্বা ঝুলের রঙিন পাঞ্জাবি আর একই রঙের পাজামা পরে গানের চেহারায় এমন ব্র্যান্ড তৈরি করেছিলেন যা অনন্যভাবে শুধু তাঁকেই শনাক্ত করে। ফলে তাঁর গান শোনা যেন আসলে গায়ককে তাঁর ভঙ্গিসমেত দেখা—'চোখ বন্ধ করলে গানটা ভালো লাগে'— এমন মন্তব্য কানে গেছে। রবীন্দ্রগানের ভিস্যুয়াল রূপারোপের যে-দর্শন তিনি প্রবর্তন করেছেন তা নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধিতা হয়েছে কিন্তু শিল্পী তাঁর মত ও পথ বদলান নি। গানবাজনার লাইনে কোনো শিল্পীর চেহারা বা হাবভাব অনেক সময়েই ব্র্যান্ড হয়ে যায় অভিনেতাদের মতো। যেমন আমজাদের কেশবিন্যাস, জাকির হোসেনের কুন্তলচূর্ণ, বাবা সায়গলের হেয়ারকাট, লতা মঙ্গেশকরের শুভ্র বসন, কিশোরকুমারের লম্ফঝম্ফ কিংবা হালফিলের বাবুল-সুপ্রিয়র দুদিনের না কামানো দাড়ি —এ সবই ভেবেচিন্তে সংগঠিত। কিন্তু এ-প্রবণতা আগেও কি দেখা যায়নি? দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর গায়নের শেষ পর্বে কিছুটা অভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে লিখে ফেলেছিলেন *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত*। তাঁর অভিযোগ ও দুঃখ অবশ্য অনেকটাই ছিল স্বরচিত। সবচেয়ে যেটা আমাদের চমকে দিয়েছিল তা তাঁর নতুন পরিবেশনরীতি। তাঁর মঞ্চাবির্ভাবের আগে পর্দা পড়ে যেত। তারপরে ঘোষিত হত 'এবারে মঞ্চে আসছেন রবীন্দ্রসংগীতের একজন বিতর্কিত শিল্পী'। পর্দা উঠলে দেখা যেত, মঞ্চে হারমোনিয়াম নিয়ে দেবব্রত বিশ্বাস। গেরুয়া পাঞ্জাবি, গেরুয়া লুঙ্গি, একমুখ দাড়ি। এ কি রবীন্দ্রসংগীতের শিষ্ট মার্জিত চেহারার বিরুদ্ধে বাউল পোষাক পরে রবীন্দ্রগানের একটা প্রতিবাদী চেহারা ফোটানো?

বাউল পোশাক ও গেরুয়া রঙের প্রসঙ্গে মনে পড়ল বাংলার বাউলদের কথা। অনেকে বোধহয় ভেবে দেখেননি যে এখনকার বাউলদের গেরুয়াবাসটি স্ববিরোধী। বাউল তো বৈরাগ্যপন্থা নয়— তা জীবন, যৌবন-স্পর্শী ও প্রজননবিরোধী কায়াসাধনায় রহস্যময়— তাঁরা কেন গেরুয়া পরবেন? বস্তুত সারা পূর্ববঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে (অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশে) কোনো বাউল কখনো গেরুয়া পরেন না। পরনে সাদা আলখাল্লা আর সাদা তহ্‌বন্দ্। এ হল তাঁদের দর্শন 'জ্যান্তে-মরা'-র পোশাকি চেহারা— 'জিন্দা দেহে মরার বসন'। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাউলমাত্রই গেরুয়া পরেন এবং একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে তাঁদের গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া কোমরবন্ধ, গেরুয়া লুঙ্গি ও গেরুয়া পাগড়ি অবিকল স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো

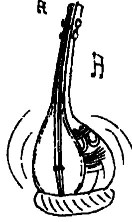
বক্তৃতার ছাঁদে পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত। শোনা যায় পাঁচের দশকে আমেরিকাবাসী জনৈক বঙ্গসন্তান আমেরিকার আলোঝলকিত বর্ণময় মঞ্চে সর্বপ্রথম বাংলার বাউলদের রপ্তানি করেন। তাঁর নাকি মনে হয়েছিল ওই উজ্জ্বল মঞ্চে ম্যাড়মেড়ে সাদা পোশাকে বাউলদের চেহারার ভিস্যুয়াল মার খেয়ে যাবে। তাই তাঁর মগজে শিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজির ছাঁদে বাউল-সাজানোর ফন্দি মাথায় আসে। সত্যমিথ্যা জানি না তবে গত দু-তিন দশকে পশ্চিম বাংলার বাউলদের চেহারা, হাবভাব ও গানের আসরে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের আভাস দেখছি তা চোখে পড়বার মতো। ব্যাপারটা বোঝানো দরকার।

আমাদের দেশে বাউলগানের আসর সবসময় হয় সমতলে— অর্থাৎ গায়ক আর শ্রোতা একই অবস্থানে থাকেন। কেবল বাউল উঠে দাঁড়িয়ে গান করেন— শ্রোতারা বসেন বৃত্তাকারে। সব বাউলমেলা ও লোকায়ত সমাবেশে এমনটাই হয়ে থাকে। কিন্তু কিছুকাল আগে থেকে ভদ্রজন তথা শহুরে মানুষদের মনে হয়েছে বাউলরা সাজে পোশাকে ও নাচে বেশ প্রদর্শনীয় বস্তু। তাই শ্রোতাদের সমতল থেকে তুলে বাউলকে আনা হল পাদপ্রদীপের সামনে, উচ্চমঞ্চে। তৈরি হল বেশ একটা নাট্যরঙ্গ আর মঞ্চমায়া। ফলে বাউলগানের চেহারাটাই কিন্তু গেল পালটে।

এক-একবার মনে হয়, শ্রোতাদের সমতল থেকে বাউলদের এই উচ্চমঞ্চে উঠে যাওয়া, এটা যেন অনেকটা প্রতীকী। অর্থাৎ এই সময় থেকে বাউলগান মঞ্চাশ্রয়ী একরকম নতুন চেহারা পেয়ে গেল। আমার মতো গ্রামে গ্রামে ঘুরে সরেজমিন তথ্যসংগ্রহকারীর চোখে আজকাল বাউলগানের দুটো আলাদা চেহারা ফুটে ওঠে। এক হল সমতলের আবহমান গানের আসর, আরেক হল মঞ্চাশ্রয়ী গানের রঙ্গবিনোদন। সমতলের আসর এখনো পর্যন্ত গ্রামে আখড়া বা মেলায় প্রচুর দেখা যায়। তার বর্ণনা এই রকম— আখড়ার মাঝখানে একটা ধুনি জ্বলছে, চারপাশে উঠছে রসিকদের কল্‌কে থেকে ছড়িয়ে পড়া গাঁজার ধোঁয়া। তার মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় বাউল নেচে নেচে গান গাইছে একেবারে আত্মহারা হয়ে, প্রবল আকুতি নিয়ে। সঙ্গে বাজছে দোতারা কিংবা গুপিযন্ত্র—সেটা শিল্পীই বাজাচ্ছেন। সহশিল্পীরা বাজাচ্ছেন হারমোনিয়াম, খমক ও জুরি। এই ধরনের গড়পরতা বাউল ঠিক সাধক নন, বরং গায়ক। আর্থিক অবস্থা অতি দীন— নিম্নবর্গের মানুষ— বড়জোর সাক্ষর। বিদেশবিদেশ যাবার সুযোগ পাননি। কিন্তু দিব্যোন্মাদ এসব গায়ক অনায়াসে তৈরি করে ফেলেন সারা পরিবেশে অপূর্ব উদ্‌বেলতা ও ধ্বনির সৌন্দর্য। সেই আকর্ষণে কোনো কোনো শ্রোতা বা গায়ক হঠাৎ গানের তালের মাদকতায় নিজের জায়গা থেকে উঠে দুহাত তুলে নাচতে থাকেন। এমনতর দৃশ্য মঞ্চাশ্রয়ী আসরে ভাবাই যায় না। সেখানে গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে বেমানান ব্যবধান ও উঁচুনিচু স্তরান্বিত আড়াল। মঞ্চের গীতিরত কিছু বাউলও কিন্তু সচেতন, সুশোভিত ও সুবিন্যস্ত। তাঁদের কারোর কারোর দোতারাতে আঁটা থাকে লালন ফকিরের ছবি। কারোর পরনে নিভাঁজ টেরিকটনের আলখাল্লা, তার বর্ণ গেরুয়া কিংবা উজ্জ্বল হলুদ। তুলনায় সচ্ছল এঁদের পরনে থাকে নানা রঙের টুকরো কাপড়ে বানানো কোলাজের মতো জ্যাকেট—দর্জিদের অর্ডার দিয়ে সতর্ক সীবনে মনোহারি। বাউলের গলার মালাগুলিও রঙিন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। দর্শকদের মজানোর জন্যই বাউলের এই সাজগোজ এবং প্রদর্শনকামিতার সচেষ্ট প্রয়াসে বাউল যখন মঞ্চেএকতারা মাথায় উপরে তুলে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচেন, তখন দর্শকদের দিকে পেছন ফিরলেই মঞ্চের জোরালো স্পট লাইটে দর্শক দেখতে পান শিল্পীর জ্যাকেটের পিঠে লেখা 'জয়গুরু' কিংবা শিল্পীর নাম, যেমন ধরা যাক 'হরেকৃষ্ণদাস বাউল'। বেশিরভাগ বাউল গায়কের হাতে এখন থাকে একটা অপ্রাসঙ্গিক ঘড়ি, সেটাও গ্রামে দেখনদারির টানে। কর্ডলেস মাইক হাতে নিয়ে সিন্‌থেসাইজারের ধ্বনিতে অনায়াসে পটুত্বে কণ্ঠ মিলিয়ে সাবলীলভাবে তাঁরা যখন গোষ্ঠগোপাল বা পূর্ণদাসের গাওয়া হিট গানগুলি একের পর এক গেয়ে যান নাচের ঝোঁক মিশিয়ে আর 'ভোলা মন'-এর জিকির দিয়ে,

তখন পপ-শিল্পীর সঙ্গে তাদের তফাত শুধু থিমেটিক। দুটো গানেরই রূপায়ণের চেহারা একরকম। দর্শকদের তালে তালে হাততালি ও সমুচ্চ নিনাদের প্রতিক্রিয়াও একরকম।

এ ধরনের বাউলদের মঞ্চগানের চেহারার একটা হালফিল পরিবর্তন দেখতে দেখতে আমার সামনে সমাজ পরিবর্তনেরও নানা চেহারা ধরা পড়ে যায়। আজকালকার ভাষায় একে বোধহয় বলে 'ভিস্যুয়াল-ইসথেটিক্স্'। দৃশ্যবহ এই নন্দনের বার্তা, এই চকচকে র-সিল্কের দামি আলখাল্লা, এই সতর্ক নাচের কোরিওগ্রাফি, অর্থাৎ বাউলগানের এবম্বিধ চেহারা দু-দশক আগেও আমরা ভাবিনি। এমন মঞ্চ আসরের অন্যতর আকর্ষণও আছে। যেমন বিদেশভ্রমণে দড় পবনদাসের কেশকলাপ অন্যদের মতো ঝুঁটিবাঁধা নয়, অনেকটা যেন সাঁইবাবা ঢঙে ঘনকুঞ্চিত ও ঝাঁপানো। সেই চুল ঝাঁকিয়ে মাদকাসক্ত চোখে মাঝে মাঝে দর্শকদের দিকে তাকানো— এমন কায়দাও এখন পবনদাসের মতো অনেক বাউল গায়কের অনুকরণের বিষয়। এইভাবে ঘণ্টাখানেক নেচে গেয়ে, আসর মাতিয়ে, মঞ্চ থেকে নেমে, আলখাল্লা-লুঙ্গি খুলে বাউল পরে নেন জিন্সের প্যান্ট ও চেনটানা জাম্পার। তারপরে চামড়ার আবরণে দোতারা ঢুকিয়ে সেটা কাঁধে বন্দুকের মতো ঝুলিয়ে তিনি যখন সঙ্গীর টু-হুইলারের ব্যাকসিটে বসে গ্রাম্য বনানীর ধুলো পথ ধরে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হন তখন বাউলগানের একটা সচ্ছল চেহারাও ফুটে ওঠে। এঁদের শ্রোতাদের চেহারা ও ধরনধারণও স্পষ্ট। প্রকাশ্যেই মাদকাসক্ত তাদের কেউ কেউ, গানের টানে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে। নগরজীবনের ক্লান্তি আর হতাশা থেকে দু'দণ্ডের মুখ বদল করতে দিশাহীন ছেলেমেয়েদের অনেকে গ্রাম্য মেলা বেছে নিয়েছে। লিভ টুগেদারের আরেক চেহারা। সব মিলিয়ে মনে হয়, বাউলগানের মঞ্চগত রূপায়ণ গানের বেদনা ও আকুতিকে ফোটাতে পারে না আর। ফুটিয়ে তোলে বরং দ্বিধাক্লিষ্ট সমাজের পথভ্রান্তির সুনিশ্চিত চেহারা— তার মধ্যেই প্রতিফলিত আমাদের লোকায়ত যাপনের ক্রমনিমজ্জনের আলেখ্য। গানের চিরকালীন আত্মতা ও আত্মমগ্নতা এভাবেই গানের প্রত্যক্ষ চেহারার আড়ালে ঢেকে যাচ্ছে।



গান নিয়ে যা মনে এলো

আমরা যেভাবে বড় হয়েছি প্রথমে সেটাই বলা উচিত। সেটা হচ্ছে, ইংরেজ আমলে একটা পা, স্বাধীন ভারতে একটা পা। ক্লাস সেভেন-এইটে পড়া পর্যন্ত ইংরেজ আমলে ছিলাম। তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমরাও স্বাধীন হয়েছি। স্বাধীনতার চেতনা ভেতরে ছিল। আর পরাধীন দেশের রুগ্‌ণ রূপ খানিকটা দেখা ছিল। রেশন ব্যবস্থা, যুদ্ধ, জাপানি বোমা পড়া, সবগুলোই আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে, যদিও এগুলো সবই ঘটেছে শৈশবে, কৈশোরে। তবুও সেটা কাজ করেছে মনে। তখনকার গ্রাম ছিল অনুন্নত। যুদ্ধে কলকাতায় একটা-দুটো বোমা পড়েছিল বলে পালিয়ে এসে আমরা বাস্তু গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম। দিগনগর গ্রাম। সেখানে দেখতাম, কতগুলো যাত্রা হচ্ছে। গ্রামের সেই যাত্রার মধ্যে ফকির বলে একটা লোক— যাকে ডাকনামে 'ফক্‌রে' বলা হত— সে যাত্রার গান গাইত। সেই গানগুলো আমি বেশ নিজে নিজে গলায় তুলে নিয়েছিলাম। দেখছি এখনো স্মৃতিতে সেই গানগুলো আছে। যদিও আমি গাইতাম না, কিন্তু আমার গানগুলো মনে আছে দেখা যাচ্ছে। সেই তখনকার দিনের যাত্রার গান সম্পর্কে আমার মনে একটা পরিষ্কার কনসেপ্ট আছে। পরে যখন আমি গ্রামে গ্রামে বোলান গান বা আলকাপ গান সংগ্রহ করতে শুরু করি, অনেক পরে, তখন লক্ষ করে দেখি যে, আগেকার গান সাংগীতিক দিক থেকে বেশ ভালো ছিল। সুর, তালের দিক থেকে অনেক বেশি গ্রামীণ, অনেক বেশি মৌলিকতার ছাপ ছিল। এখন বোলান, আলকাপ থেকে যত গান আমি পাই, তাতে সবই সমসাময়িক হিট হিন্দিগানের সুরটাই ওর মধ্যে আঁকাড়া ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ মৌলিক সৃজনের তেমন কোনো ব্যাপার নেই। বোলান গানের একজন শিল্পীকে পেয়েছিলাম ফণী দরবেশ বলে সাহেবনগরে, সে আমাকে প্রাচীন বোলান শুনিয়েছিল। বলেছে, 'এ গান এখন চলে না। তাতে সুর ফাঁকতাল, আদ্ধা এসব তাল ছিল, ঝাঁপতাল। প্রথমে এগুলো আমাদের গুরুর কাছে শিখতে হত, তবে আমরা গাইতে পারতাম। এখন যারা বোলান গান গায় তারা আর যাই হোক গান জানে না। গান নকল করে গায়।' ফলে একধরণের বিকৃতি যদি বলা যায়—এসেছে। কিন্তু ছোটবেলায় আমরা যাত্রায় গান শুনেছি, বিবেকের গান শুনেছি। নাটকে গানের ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। বোঝাবার

কোনো লোক ছিল না। গানটা বিনোদনের বিষয় তাই এটাই আমরা জানতাম যে. কাহিনিবিন্যাসে মনোটান এসে গেছে, একটা গান হোক। এইভাবে যাত্রার গান ছিল। সেই গানগুলো শুনতে বেশ ভালোই লাগত।

কবির গান গণসংগীত

পরবর্তীকালে যখন সিনেমায় দেখলাম, যেমন তারাশঙ্করের 'কবি' যখন সিনেমা হল তখন অনিল বাগচী তাতে সুর দিয়েছিলেন। অনিল বাগচী খুব রাগ, তাল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রাচীন বাংলা গান ও টপ্পা এসব বিষয়েও তাঁর খুব দক্ষতা ছিল। কবিগানের মধ্যে তাই দিয়ে সুর দিয়েছিলেন। সেই বয়সে, তখন আমাদের কলেজজীবনের গোড়ায় মনে হয়—সেই গান শুনে-টুনে খুবই অভিভূত হয়েছিলাম। রবীন মজুমদারের গায়ন ছিল। খুব ভালো হয়েছিল গান। পরে অনুভব করলাম এবং অনিলবাবুর সঙ্গে কথাও বলে দেখলাম যে, যে গানগুলো, যে সুরগুলো করেছেন সেইগুলো আর যাইহোক গ্রামীণ সুর নয়। তাতে আমাদের কলকাতার বৈঠকি সুর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি তার মধ্যে টপ্পার কাজও ছিল। ফলে সেই চেষ্টায় একধরনের গানের তঞ্চকতাই ঘটেছিল। কবিয়ালের গান আর যাই হোক কবিগান নয়। এটা ফর্মের দিক থেকে সমস্যা। তারপর যখন পরবর্তীকালে কলেজে নাটক-টাটক হয়েছে, আমিও নেপথ্যে গান গেয়েছি। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে কোনো অসুবিধা নেই, সে তো তৈরি জিনিস। কিন্তু 'নতুন প্রভাত' বা এই জাতীয় কিছু কিছু প্রগতি চেতনার নাটক সেকালে হত। সেই প্রগতি চেতনার নাটকে আমরা পেছন থেকে গণসংগীত গাইতাম। 'বেজে উঠল কি সময়ের ভেরী'—এইরকম গান। সলিল চৌধুরির গান—'গুরু গুরু দামামা বাজে', এইসব গান আমরা তখন গাইতাম এবং তখন দেখতাম নাটককে প্রগতিশীল করার জন্য তার মধ্যে গণসংগীতের প্রয়োগ, তখনকার গণসংগীত শিল্পীরা ভাবতে শুরু করেছেন। আমরা তো তখন কলেজে পড়ি, তত কিছু বুঝি না। তবে সেই গানগুলো গেয়ে খুব উদ্দীপনা হয়েছিল। নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের গান গাওয়ার চেয়ে সেগুলো গাইতে অনেক বেশি ভালো লেগেছিল। কনটেম্পোরারি হওয়াটাই বোধহয় কারণ। কলেজে পড়ি, দেশ সদ্য স্বাধীন— গণনাট্যের যুগ আর গণসংগীত গাইছি—ভালোই লাগত তখন।

রবিবাবুর গান শম্ভুবাবুর হাতে

তারপর ১৯৫৫ সালে কলকাতায় পড়তে গেলাম। গিয়ে শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী' দেখলাম। দেখে বিস্ময় লাগল যে, রবীন্দ্রনাথের সুন্দর সুন্দর কতগুলো গানকে তিনি বিচ্ছিরিভাবে ছেঁটে দিয়েছেন! একটা গানকে তার স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী পর্যন্ত টানছেন না। অন্তরার পরেই গানটা থামিয়ে দিচ্ছেন অথবা স্থায়ীতেই শুরু করে স্থায়ীতেই শেষ। যেমন হয়তো 'আমার স্বপন তরীর নেয়ে' বলার সঙ্গে সঙ্গে 'এই যে-এ...' বলে ফাগুলাল ঢুকল, ওই সুরটা নিয়ে। গানটাকে এইভাবে কেটে দেওয়াতে আমি খুব ক্ষুব্ধ হই। শম্ভুবাবুর সঙ্গে দেখা করি মঞ্চে শম্ভুবাবুকে আমি বলি, 'এত সুন্দর সুন্দর গানগুলোকে আপনি কেটে দিলেন কেন?' তিনি আমাকে বলেন, 'আপনি শান্ত হয়ে বসুন, চা খান। মাথা নিশ্চিত গরম করেছেন।' আমি বললাম, 'না'। বললেন, 'আপনার মুখটা খুব ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে'। আমি বললাম, 'ক্ষুব্ধ ওই অর্থেই'। উনি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের গান এত উচ্চস্তরের শিল্প যে, তার পাশে থিয়েটার করা যায় না। পৃথিবীতে এমন কোন্ অভিনেতা আছে যে একটা পারফেক্ট পুরো রবীন্দ্রসংগীত হয়ে যাবার পরে তার অভিনয় শুরু করতে পারবে? সে তো মার খেয়ে যাবে, সে তো ডায়ালগ থ্রো করতে পারবে না। ওই গানের যে ভীষণ ইমপ্যাক্ট শ্রোতাদের মনে রয়েছে— "ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার"— যদি পুরো গাই, তারপর ডায়ালগ শুরু করব কী করে? কোন্ অভিনেতা পারবে? কাজেই আমি গানগুলো কেটেছি। কেটেছি শুধু নয়, কাটব। কারণ. রবীন্দ্রনাথের

প্রযোজনার এদিকটা তো কোনোদিন রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি। কারণ, তাঁর অভিনয় করারও ক্ষমতা ছিল, রবীন্দ্রনাথের দলও ছিল। আর আমাকে টিকিট বিক্রি করে অভিনয় করতে হয়। আমি যদি রবীন্দ্রসর্বস্বতার মধ্যে চলে যাই তাহলে দর্শক কেন আমার নাটক দেখবেন? তাহলে আমি এগোলাম কোথায়? কাজেই এখন শুধু কেটেছি নয়, ভবিষ্যতেও কাটব।' নাটকে গানের চেতনা ব্যাপারটা বলতে গেলে শম্ভুবাবুই বুঝিয়ে দিলেন আমাকে, এই কটা কথা বলে। সেখানে গানটাকে পুরো গাইলে অনেকসময় নাটক মার খেয়ে যেতে পারে, অভিনয়কলাটা তাতে মার খেয়ে যায়। এই কথা শুনে আমার খুব ভালো ল' । এবং আমি নাট্যসংগীত সম্পর্কে খানিকটা দিশা পাই।

শেকসপিয়ারের নাট্যগীতি

এরপর আমি ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবর্ষের সময় 'রবীন্দ্র নাটকের গান' নামে একটা লেখা লিখেছিলাম 'গন্ধর্ব' বলে একটা পত্রিকায়। সেটা কোথাও কোথাও পরে রিপ্রিন্ট হয়েছে। তারপর শেকসপিয়ারের যখন চারশো বছর উদ্‌যাপন হল তখন 'শেকসপিয়ারের নাটকের গান' বলে একটা লেখা লিখেছি এবং সেই বিষয়ে যত বইটই আছে, ব্রিটিশ কাউন্সিল— সব টুঁ মেরে শেকসপিয়ারের নাটকে গানের প্রয়োগ নিয়ে আমি ঐ প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল তখন বিলিতি টিম কলকাতায় অভিনয় করতে আসত, তাদের দু'-একটা শেকসপিয়ারের অভিনয় আমি প্রত্যক্ষ মঞ্চেদেখেছি। যেমন, 'দ্য টেম্পেস্ট'-এ এরিয়েলের গান— এরিয়েল তো প্রায় একটা বায়ুভূত সত্তা। কী করে সে গান করবে আমার মনে চিন্তা ছিল। তা দেখলাম, একটা লোককে সোনালি রঙের একটা পোশাক পরিয়ে দিয়েছে, অ্যাক্রোবাটরা যেমন পরে। ঝকঝক করছে সোনালি রং এবং সেই লোকটা এত নমনীয়, ব্যালে আর্টিস্টের মতো মঞ্চের যে-কোনো জায়গায় যেন সে উড়ে চলে যাচ্ছে! মানে একটা আলমারি-টালমারি বা একটা খাট-টাট-এগুলো কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, একটা উঁচু জিনিসে এইরকম উড়ে এসে ওর উপর চড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, দেখানো হচ্ছে যে, এরিয়েল মানে একটা বায়বীয় সত্তা, কিন্তু সে গান করে। প্রযোজনার এই অভিনবত্ব আমাকে আশ্চর্য করে দেয়। কিন্তু আমি ভাবি, এখন বাংলাদেশে বা পশ্চিমবঙ্গে কোনো অভিনেতা নেই, যে গাইতে গাইতে ঐরকম পারবে। ওদের অভিনয় দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, গানের তাহলে একটা অন্যরকম প্রয়োগ আছে। শেকসপিয়ারের নাটক সম্পর্কে আরও অনেক পণ্ডিতের লেখা-টেখা পড়ে একটা পণ্ডিতি লেখাই আমি লিখেছিলাম। তাতে প্রয়োগের দিকটা আমি আর কী করে বলব?

সিনেমায় কী না হয়

তবে কয়েকটা কাণ্ডজ্ঞানের কথা আমার মনে আছে, যেমন— সেইসময় মান্না দে একটা মাতালের গান করেছিলেন কোনো সিনেমায়। বোধহয় গানটা হচ্ছে— 'এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি'— এরকম গোছের গান। তো মাতাল এত নিখুঁত সুর-তাল-লয়ে গান করছিল যে, আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল। কারণ, আমরা যারা একটু একটু গান গাইতে পারি—আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে, হাঁটলে গান করা খুব কঠিন। হাঁটলে একধরণের দ্রুত তালের গান গাওয়া যায়। টানা গান হাঁটতে হাঁটতে গাওয়া যায় না। গলা ট্রেমেলো হয়ে যাবে। আমি কোনো টপ্পা গান হাঁটতে হাঁটতে গাইতে পারব না, অসম্ভব। কিন্তু আমরা বাংলা সিনেমায়, যেমন— 'এই পথ যদি না শেষ হয়'—ঐরকম প্রচণ্ড জোরে মোটরবাইক চালিয়ে সেইসঙ্গে আবার গাওয়া তো সম্ভব নয়! কিন্তু দর্শকের একটা লাইসেন্স আছে। উত্তম-সুচিত্রা গাইছে, এটাই তাদের

কাছে বড়ো কথা। গাওয়া যায় কিনা, নাটকে কিন্তু এই প্রশ্নটা খুবই মৌলিক। দেখা যাচ্ছে যে, মান্না দে-র গলায় একজন মাতাল নিখুঁত গেয়ে গেল একটা গান! তার বাণীতেও ভুল হল না, সুরেও ভুল হল না, তালেও ভুল হল না এবং টেম্পোতেও ভুল হল না, কী আশ্চর্য! আমারই তো খটকা লেগেছিল, কিন্তু সিনেমায় তো দর্শকের লাইসেন্স আছে। শেকসপিয়ারের চারশো বছর আগেকার একটা নাটকে দেখা গেল একটা মাতাল চাঁদনি রাতে গান গাইছে এমন দৃশ্যটা আছে। সে বলল, 'এইরকম চাঁদনি রাত, একটা গান গাই।' বলে গানটা গাইল, গেয়ে বলল, 'বা, গানটা খাসা তো, আর একবার গাই।' আর একবার গাইতে গিয়ে দেখল, তার কিছুই মনে পড়ল না; সে বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ গানের তৃতীয় পংক্তিটা গাইল। চারশো বছর আগেই শেকসপিয়ার নাটক সম্পর্কে এইরকম চেতনা অর্জন করে থাকেন যে, একটা মাতালের মদ্যপানজনিত ক্রিয়ায় তার মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করছে না। তার জন্য সে দ্বিতীয়বার গানটা মনে করতে পারল না, তৃতীয় পংক্তিটা গাইল। এটা আমার খুব অভিনব লেগেছিল। তো যাই হোক, তারপরে নাটকের গান বা নাটকে গান সন্নিবেশ নিয়ে আমাদের অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। ১৯৬১ সালে শঙ্খ ঘোষ আমারই প্ররোচনায় একটা নতুন ধরনের ভালো প্রবন্ধ লেখেন— 'নাটকের গান, রবীন্দ্রনাথের নাটক।' সেটা আমারই সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথের মনন ও শিল্প* বইতে প্রকাশ করা হয়। মানে, আমার প্রয়োজনের জন্যই উনি লেখেন বলা যায়। তারপর দেখি, শঙ্খদাও নাটকের গান বিষয়টা নিয়ে প্রচুর ভাবছেন এবং লিখছেন। আমি আমার নাট্যসংগীত বিষয়ে মতটা আলাদা মনে করি শঙ্খদার থেকে।

শঙ্খ ঘোষ দেখালেন

শঙ্খদার বিশ্লেষণগুলো সাংঘাতিক। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের 'গুরু' মঞ্চস্থ হচ্ছে— তাতে পঞ্চক গান গাইবে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে পঞ্চক করতেন। দিনেন্দ্রনাথকে পাওয়া যেত বলে নাটকে প্রায় চব্বিশ-পঁচিশটা গান আছে। এরপর দেখা যাচ্ছে— দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এবার কলকাতায় স্টেজ হচ্ছে, দিনেন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল না। গানের সংখ্যা অনেক কমে গেল! তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, গানের এখানে নিগূঢ়ভাবে দরকার ছিল না! এই তথ্যটা শঙ্খদা দিয়েছিলেন, অশ্রুকুমার শিকদার আরও নিখুঁত তথ্য দিয়েছেন তাঁর একটা প্রবন্ধে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গান অনেকক্ষেত্রেই একটা চাপিয়ে দেওয়া জিনিস। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভয়ানক কনটেক্সচুয়াল, নাটকের মূল থিমটাই প্রায় গানের মধ্যে আছে এবং এসব শঙ্খদা খুঁড়ে খুঁড়ে দেখান। 'মুক্তধারা'-তে যেমন কোরাস গান ভয়ানক জরুরি। কিংবা 'রক্তকরবী'-তে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়' থিম সং। এই তথ্যও আমরা জানতে পারলাম যে, উনি পাঁচবার ডাকঘর মঞ্চস্থ করবেন বলে পাঁচবার গান তৈরি করেছিলেন পাঁচরকম ভাবে। গানগুলো শেখানো হয়ে গিয়েছিল। যেমন, নীলিমা সেনের আত্মজীবনীতে আছে— আমাকে গুরুদেব বললেন, এই গানটা তোকে গাইতে হবে। পাঁচবার পাঁচটা গান তৈরি করে ডাকঘর নাটকের অভিনয়ের ঠিক প্রাক্ মুহূর্তে বললেন— নাহ্, এই নাটকে গান দেওয়া যাবে না! শঙ্খদা সিদ্ধান্ত করেছেন যে নাটকটাই প্রায় গানের মতো, একটা সংলাপ। এই জাতীয় এক্সপেরিমেন্টেশন বা রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের পর প্রবলভাবে নাটকে গানের ব্যাপারটা আধুনিককালে আমরা পরে আবার মিউজিকালগুলোতে পাই, যেমন— 'তিন পয়সার পালা' ইত্যাদি, যেমন অজিতেশ তৈরি করেছিলেন ব্রেখটিয়ান স্টাইলে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সময় নাটকে আরেক ধরনের গান ছিল, বিনোদনের মতো প্রায়। কনটেক্সচুয়াল নয়, থিমেটিক নয়। ওই গানের মধ্যে দিয়ে বিশেষভাবে কোনো নাটকের মূল কথা উঠে আসে না। 'আলিবাবা'-তে 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' বেশ মজার গান, লোকে ভালোবাসছে। 'আয় বিবি তুই গোলাম হবি'— এই সমস্ত গানই এসেছে রিলিফ হিসেবে। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে আছে, সেইরকম। যেমন, কালকে যুদ্ধ হবে আজকে খুব টেনশন, হঠাৎ ডাকা হল—'এই সিরাজি নিয়ে এস'— মানে মদ। 'এই, সব বাইজিদের ডাকো, এই তোমরা একটা গান করো।' আসন্ন একটা যুদ্ধের আগে মানসিক টেনশন এড়াবার জন্য সখিদের একটা গান হয়তো হল। সভাসদরা সবাই এসে শুনছেন, দর্শকরাও আসরে শুনছেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নবাব তাঁর টেনশনটাকে সহজ করছেন— এইটা ভাবা যায়। তারপরে তো দেবাশিস দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে আমাদের যে আধুনিক নাটক, এখনকার যে গ্রুপ থিয়েটার, তাতে তো গান প্রয়োগের নানারকম নাট্যিক ব্যাপার রয়েছে।

অন্য থিয়েটার— গানের নাটক

বছর কয়েক আগে আমাকে বিভাস চক্রবর্তী হঠাৎ বললেন যে, 'নাট্য স্বপ্নকল্পতে আপনাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে।' প্রথমবার বলেছিলেন সেলিম আলদিন, তারপর বলেছেন কুমার রায় আর তৃতীয়বার বলা হচ্ছে আমাকে। আমি একজন সত্যিকারের নাট্যব্যক্তিত্ব সেই অর্থে নই। কিন্তু আমাকে বিভাস যখন বলেছেন, তখন তাঁর মাথায় নিশ্চয়ই একটা চিন্তা ছিল। আমি ঠিক করলাম যে, একটা নতুন বিষয়ে বলা যাক। তখনই আমার মাথায় এটা হল যে, 'নাটকের গান নয়, গানের নাটক'। প্রকৃতপক্ষে আমার মাঝে মাঝেই মনে হত গানের মধ্যে তার সুরের বিন্যাস-চলনে অনেকসময়ই একটা ড্রামাটিক ব্যাপার থাকে। যেটা আমরা হয়তো অনেক সময়ই লক্ষ করি না। সেইটা আমার মাথায় কিছুদিন ধরে ঘুরছিল। তখন ভাবলাম যে, একটা ভালো অডিয়েন্স পেলে এটা বলা যায়। ওখানে তো অডিয়েন্স নিয়ে কিছু বলার নেই, সমস্ত নাট্যব্যক্তিত্বই এসেছিলেন। আমি একটু সাহস পেয়ে ব্যাপারটা ঐখানেই প্রথম বললাম। দেখা গেল, সকলের বেশ পছন্দ হল। তখন আমার ভেতরে একটা চিন্তা জাগল যে, আমি তো তাহলে এই কাজটা বেশ ভালো করতে পারি। ফলে আমি অনেক গানই গেয়ে গেয়ে তার ভেতরকার নাট্যসম্ভাবনাগুলো ধরতে থাকলাম। সম্পূর্ণ যে পেরেছি তা নয়। তার কারণ, সময় পাই না— এত কাজের চাপ, লেখার চাপ। কিন্তু যদি একটা দল মিলে এটা করা যায়, ভালো একটা মিউজিক ডিরেক্টর যদি এতে মাথা দেন, তাহলে আমাদের গানের ভেতরে যে নাট্যসম্ভাবনাগুলো রয়ে গেছে—অথচ যা লিরিক—সেগুলোর প্রকাশ ঘটানো যেতে পারে। আবার এরকমও হতে পারে— যেটাকে লিরিক বলছি সেটা এতটাই লিরিক যে, তার মধ্যে কোনো ড্রামাই নেই। এটাও কিন্তু আমি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিতে পারি। 'আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে'— এই গানটা ষোলো আনা লিরিক, এর মধ্যে কোনো নাটকই নেই। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের অন্য গানের মধ্যে, যেমন—'আঁধার রাতে একলা পাগল'— এতে সুরের গঠনের মধ্যেই নাটক আছে। 'বুঝিয়ে দে বুঝিয়ে দে'—যেটা উচ্চগ্রামে করছে, সুরে বলা সংলাপ। সুতরাং নাটকের গান যে লিখছেন তার মনের মধ্যে দুটো সম্ভাবনা থাকতে পারে, একটা হচ্ছে গানটাকেই নাটকের মতো করে করা, আর একটা হচ্ছে নাটকের মধ্যে গানটাকে দিয়ে থিমটাকে বার করে নিয়ে আসা। রবীন্দ্রনাথ দু'রকমই করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের নাটকগুলো আমরা এখনো অনুধাবন করিনি। যদি করতাম...।

সংলাপ যখন গান

'বাল্মীকি প্রতিভা' তো পুরোপুরি গীতিনাট্য— ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতান* খুলে সাধারণত যেসব গান আমরা পাই, যেমন ধরা যাক — 'ও যে মানে না মানা/আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না, না, না,'।' এই তিনটে 'না, না, না,'— তিনরকম ডায়ালগের মতো করে থ্রো করা আছে। 'পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে/.... ডাকে আয় আয় আয়/বলে তারা যায় যায় যায়'— এগুলো সব আলাদা আলাদা টোনে। ঠিক করেছিলেন, ঠিক সংলাপের মতো করে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে এইরকম প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের লিরিকের মধ্যে প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট আছে। 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটার মধ্যে পুরো নাটকটাই আছে। সলিল চৌধুরির গানের মধ্যে প্রচুর নাটক আছে। একটা মাঝি নৌকা বাইছে—সেটা কিন্তু গানের সুরের মধ্যেই আছে। এইরকম দিলীপকুমার রায়ের গানে প্রচুর আছে। প্রচুর, মানে, কল্পনা করা যায় না—এত আছে। এই দিকটা আমি এক্সপ্লোর করেছিলাম বা করতে চাইছিলাম। কিন্তু এটা করতে গেলে দুটো সমস্যা আছে। একটা হচ্ছে লোককে প্রথমে বোঝাতে হবে। অর্থাৎ, আমি কী বলতে চাইছি। যাদের বলতে চাইছি তারা এটা কখনো শোনেনি। এবার কোনো বড় সমাবেশ—সেখানে যাদের আমজনতা বলে, যারা থিয়েটার দেখতে এসেছে, তাদের মধ্যে একটা মিশ্র দর্শক সমাজ থাকে, তাদের কাছে কিন্তু এটা বোঝানো খুব কঠিন।

আদর্শ গীতিনাট্য

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে আদর্শ গীতিনাট্য হয়নি, কিন্তু সিনেমায় একটা হয়েছে। সেটা হচ্ছে, 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। সেটা পিওর গীতিনাট্যের ধাঁচেই সত্যজিৎ করেছেন। ওঁর খুব ইচ্ছেও ছিল যে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য নামাবেন—'বাল্মীকি প্রতিভা'। ওটা উনি সিনেমা করবেন ঠিক করেছিলেন। তার জন্য ভেবেছিলেন, কিন্তু পরে তার জন্য টাকা জোগাড় করতে পারেননি এবং কতদূর কী হবে এ নিয়ে ওঁর নিজের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। আদর্শ গীতিনাট্য রবীন্দ্রনাথের পরেই শেষ হয়ে গেছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেটার সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছিলেন। আদর্শ গীতিনাট্য সেটাকেই বলব, যেটাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন—সুরে নাটিকা। অর্থাৎ, সারাক্ষণই সুর ডমিনেট করবে অভিনয়ের ওপরে। তাদের প্রত্যেকটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে গায়ক-গায়িকা হতে হবে। তাতে নাটক কখনো পড়ে যায় না। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় কখনো পড়তে দেখিনি, বরঞ্চ উঠেছে, নানা জায়গায় উঠেছে এবং কায়িক অভিনয়ের অনেক সুযোগ আছে, কারণ নৃত্যছন্দটা রয়েছে তো। ফলে শারীরিকভাবে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, কতটা সৌন্দর্য প্রকাশ পেতে পারে। গীতিনাট্যে বলাই বাহুল্য যে, অ্যাকশন কম থাকে। মারামারি-কাটাকাটি বা ওই ফিজিক্যাল কো-অ্যাকশন কম থাকে। যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ভাবের একটা দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যের মধ্যে অনেক লিরিক গান ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, বিশেষ করে 'মায়ার খেলা'য়। কাজেই দেখা যায় যে, 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' যতটা ড্রামাটিক, সেই তুলনায় 'মায়ার খেলা' অনেক বেশি লিরিকাল। কারণ, এখানে অমর, প্রমদা তাদের নিজের কথা— 'আমার পরান যাহা চায়'— এসব গাইতে আরম্ভ করেছে। তার মানে, এবার স্লো-টেম্পো এসে গেছে। ডাকাতদল-টাকাতদল এইসব তো আর তখন নেই, তখন তো ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপার, প্রেমের ব্যাপার এসে গেছে। 'কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে'— এসব থিম এসে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এই অবধি এসেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, গীতিনাট্যের আয়ু আমার ফুরলো।

তাঁর ভাঁড়ারেও টান

কারণ, রসদও তো ফুরিয়েছে, বিলিতি সুর তো আর নেই। বিলিতি সুর যে ক'টা তৈরি করেছেন— আইরিশ, স্কচ, ইংলিশ—সেইগুলো সব নিঃশেষ হয়ে গেছে দুটো নাটকে— 'কালমৃগয়া' আর 'বাল্মীকি প্রতিভা'য়। 'মায়ার খেলা'তে মৌলিক গান নিজে তৈরি করে দিয়েছেন। এইবার গীতিনাট্য হিসাবে 'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'র পর 'মায়ার খেলা'টা পড়লে বা শুনলেই দেখা যাবে টেম্পো পড়ে গেছে, স্লো হয়ে গেছে। এরপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের নাটকে চলে গেছেন। আর যে ফেরেননি তার প্রধান কারণ, ঐ ধরনের সুরের সম্পদ তাঁর মধ্যে আর ছিল না। কিন্তু শেষ জীবনে আবার নৃত্যনাট্যে এসেছিলেন এইজন্য যে, তাঁর নর্তক পেয়ে গেছেন। প্রতিমাদেবী, শান্তিদেব ঘোষ এঁদের জাভা, বলিদ্বীপে পাঠিয়ে নাচ শিখিয়ে এনেছেন। এর ইতিহাস আছে। বই খুললে দেখা যায় যে, একটা গান উনি গেয়েছেন— প্রতিমাদেবী বলতেন, 'এই গানটার ছন্দ হবে ৩-২, ৩-২, আপনি ২-৩, ২-৩ করে ভেঙেছেন।' শুনে—'তাই নাকি' বলে রবীন্দ্রনাথ এটাকে আবার ভেঙে দিয়েছেন। তখন দেখা যাচ্ছে, নাচ প্রাধান্য পাচ্ছে গানের ওপর, নাটকের ওপর। ওইজন্য নাম দেওয়া হয়েছে নৃত্যনাট্য। 'তাসের দেশ', 'শাপমোচন', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা'— এইগুলো নৃত্যনাট্য। তার মধ্যে উনি কোথাও কখনো কত্থক ব্যবহার করেননি, কিন্তু নাচের মধ্যে মণিপুরি আছে, আর মধ্যে মধ্যে কথাকলি আছে। কারণ, কথাকলি রূপটার জন্য দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী তখন শান্তিনিকেতনে এসে গেছে। ফলে ওই কথাকলি দিয়ে একটা কোটালের নাচ করিয়ে দেওয়া হয়েছে খুব কায়দায়। এইসব কারণে মনে হয়— রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার জিনিসটা নির্ভর করছে রসদ কী আছে তার উপর। দলে যদি একটিমাত্র অভিনেত্রী থাকে তবে আমাকে সেইরকম নাটক করতে হবে, আমার যদি পাঁচটা থাকে তাহলে আমি নাটকটা অন্যরকম, খোলামেলা করতে পারি।

তাঁর গ্রামদর্শন

রবীন্দ্রনাথ তো তেমন করে গ্রামে গ্রামে ঘোরেননি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর লোকজ সুরের যোগাযোগ হল কোথায়? জীবনের একটা পর্বে, ১৩০০ বঙ্গাব্দের আশেপাশে উনি শিলাইদহ অঞ্চলে কিছুকাল জমিদারি পরিচালনা করেছিলেন। সেইসময় কিছু বাউল, কিছু ভাঙা কীর্তন ও ঢপ কীর্তন জাতীয় গান তিনি অনেক শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি তো লোকায়ত আঙ্গিকের সঙ্গে সেইভাবে পরিচিত হননি। তখনকার দিনে লোকনাট্য কথাটা ছিল কিনা তাও জানি না—আমরা যে অর্থে এখন গম্ভীরা বলি, যে অর্থে ঝুমুর বলি তা কি ছিল? রবীন্দ্রনাথের আঞ্চলিক গ্রাম পরিভ্রমণের কোনো ইতিহাস নেই। ওঁর জীবনের ভূগোলটা হচ্ছে— উনি বিদেশ গেছেন অনেকবার, আর এখানে জোড়াসাঁকো, শিলাইদহ বা ঐ পরিমণ্ডল, আবার ফেরা বজরায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় গেছেন, কিন্তু বাংলার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার যে ব্যাপারটা, যেমন ধরা যাক— বাঁকুড়া অঞ্চলে গিয়ে ঝুমুর শুনলেন, মানভূম-পুরুলিয়ায় গিয়ে টুসু শুনলেন— এইরকম জীবন তো তাঁর ছিল না। মুরশিদাবাদের গ্রামে আলকাপ শুনলেন কিংবা পুরুলিয়ায় ছৌ দেখলেন, এবং তাঁর শিষ্যরাও এমন কেউ ছিল না যে, এগুলো এসে তাঁর কাছে খবর দেবে। সেইজন্যই আমার মনে হয় যে, এই গ্রামবদ্ধ লোক আঙ্গিক সম্পর্কে উনি সম্ভবত অচেতনই ছিলেন।

দেশি বা বিলিতি— সন্ধানের অভাব আজও

এখন একটু একটু অনেকে চেষ্টা করছে, কিন্তু যতটা নিবিষ্ট হয়ে এদের ফোক ফর্মগুলোকে দেখা উচিত ছিল, জানা উচিত ছিল, তা আর আসছে মনে হয় না। আমাদের কলকাতাতে যারা থিয়েটার করেন— গ্রুপ থিয়েটার করেন, তাদের সংগীত পরিচালকরা কতটা গ্রামে যান? বরঞ্চক্যাসেট বা টি.ভি-তে অনেক বেশি বিলিতি সুর শোনায় আমরা অভ্যস্ত, তাই নয় কি? সেইজন্য এইখানটায় গোলমাল হয়ে গেছে। একটা সময় গণসংগীত যখন চলছিল, তখন কিছু ফোকফর্ম গণসংগীতের মধ্যে এসেছে। নিবারণ পণ্ডিত বা সুরেশবাবু ওরা এনেছিলেন। হেমাঙ্গবাবু বিশ্বাস করতেন যে, ফোক ফর্মটাই গণসংগীতের ফর্ম। আর এই কারণেই সলিলবাবুর সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়। সলিলবাবু চেয়েছিলেন বিলিতি সুরও আনা হোক গণসংগীতে, উনি এনেও ছিলেন। যেমন, 'ক্লান্তি নামে গো'— থেকে আরম্ভ করে রাশিয়ান পোলকা অর্থাৎ— 'শ্যামল বরণী ওগো কন্যা'— ওসব তো বিদেশি সুর। হেমাঙ্গবাবু বলেছিলেন যে, গণসংগীতের ভিত্তি হবে দেশজ সুর। এবং সেইজন্য উনি অনেকসময় ভাটিয়ালি নিয়েছেন এবং অনেক দেশজ সুর বা পূর্ববঙ্গীর গান ভেঙে ভেঙে অনেক গান তৈরি করেছিলেন। সেইগুলো তার মতো করে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু সলিল চৌধুরির গান অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর দেবব্রত বিশ্বাসের গায়নের জন্য। এত দৃপ্ত গায়ন, যার জন্য সলিল চৌধুরি এগিয়ে চলে গেলেন। ওইটাই প্রাধান্য পেয়ে হয়ে গেল গণসংগীতের ক্ষেত্রে। পরে গণসংগীতে যাঁরা এসেছিলেন বা এখন যাঁরা আছেন তাদের সাংগীতিক সামর্থ্য কম, ঐ পর্যায়ের নয়। অতটা ক্রিয়েটিভ নয়। যার জন্য আমাদের গণসংগীতটা ঝপ করে উঠে ঝপ করে পড়ে গেল! তারপরে এখন তো সভা শুরুর আগে একটা গান গাওয়া হয়, সভা শুরু হওয়ার পরে একটা গাওয়া হয়। কিন্তু, আমরা সেইগুলো আর গাই না। সেই গানগুলো আর গণসংগীত নেই। সেটা এক ধরনের গান বিষয়টা হচ্ছে গণ— এই পর্যন্তই!

সেই ট্র্যাডিশন— ঋত্বিক, গৌতম, অপর্ণা, ঋতুপর্ণ, সন্দীপ

আমার তো মনে হয়, খুব ভালো নাটকের প্রধান ভূমিকা নেওয়া উচিত আবহসংগীতের। এবং সত্যি সত্যিই কোনো চরিত্রের মধ্যে গান গাওয়ার ব্যাপারটা বোধহয় ভারতের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহিত হয়ে এসে গেছে। আবশ্যিকভাবে দরকার আছে বলে মনে হয় না। যেটার খুব বড় প্রমাণ হচ্ছে— যে বিখ্যাত সিনেমাগুলো এখন আমাদের বাংলায় হচ্ছে, সে অপর্ণা সেনেরই হোক, ঋতুপর্ণেরই হোক বা গৌতম ঘোষেরই হোক— সেটায় দেখা যাবে যে, গানটা কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত। এইটা একটা বিরাট খামতি যে, কেউ এই বিশেষ সময়কার গানটা তৈরি করে সিনেমায় লাগাতে পারছেন না। এটা তো একটা মস্ত বড়ো ব্যাপার। যেমন ধরা যাক, আমি খুব সোজা কথা বলছি— 'পারমিতার একদিন' ছবিতে সোহিনী হালদার মানসিক প্রতিবন্ধী, তাই তো? মানসিক প্রতিবন্ধী এতটাই যে, সে একটা রেডিয়ো খুলতে পারে না। একটা দৃশ্য আছে না যে, সৌমিত্র এসে বসেছেন— রেডিয়োটা খুলতে পারে না ও। যে রেডিয়ো খুলতে পারে না সে কিন্তু নিখুঁত টপ্পা গাইছে, রবীন্দ্রনাথের! তা কী করে হয়? এবং সিনেমার গানের ক্ষেত্রে এইধরণের জিনিস বারবার আছে। ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'তে অনিল চট্টোপাধ্যায় ক্লাসিকাল গান শিখতে গেলেন, কিন্তু গাইছেন রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রসংগীত শিখলেন কোথায় যে, গাইছেন এখানে? এই লজিকাল প্রশ্নটা আমরা ঋত্বিক ঘটককে করতে পারি, এটা আমরা অন্য কোনো পরিচালককে করতাম না। ঋত্বিকবাবুর সঙ্গে

দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম যে, আপনার এই প্রলোভনটা হল কেন? যারা ক্লাসিকাল শেখে তাদের কি আমরা চিনি না? তারা জীবনেও রবীন্দ্রনাথের গান গাইবে না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গেলে স্বরের যে সংযমটা লাগে, ক্লাসিকাল গানে সেটা নেই। ক্লাসিকাল গানের কাজই হচ্ছে সুরকে অনবরত খেলানো, অলংকরণ করা। আর রবীন্দ্রনাথ অলংকরণ করতে দেনই না তাঁর গানে। উনি বলেছেন, আমি তো কোথাও ফাঁক রাখিনি, তোমরা আবার অলংকরণ করবে কোথায়? আমার গান তো স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটুও এদিক-ওদিক করবে না, আমার যা আছে তাই করতে হবে। তাহলে কেন ঋত্বিক অনিলকে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ালেন? আমার তো এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু মনে হয় না। অথচ এই লোকই 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে সলিল চৌধুরিকে দিয়ে সুর করিয়েছেন এবং বাংলা নতুন গান লিখিয়েছেন। 'আজব শহর কলকাতা'— এই যে গানটা সেখানে আছে— 'আমি অনেক ঘুরিয়া শেষে আইলাম রে কলকাতা, আজব কলকাতা।' তো ঋত্বিক ঘটক করিয়েছেন সলিলকে দিয়ে, কোথাও রণেন রায়চৌধুরিকে দিয়ে গান গাইয়েছেন, কোথাও শিলং থেকে বীণাপাণিকে নিয়ে এসে ফোক ফর্মে গান করিয়েছেন, তাঁর খুব ভালো ফোক বেস ছিল। কিন্তু তিনিও রবীন্দ্রসংগীতে বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন, আমার মতে খুবই অজ্ঞাত কারণে। কারণ, ঋত্বিক অত বেশি রাবীন্দ্রিক লোক ছিলেন না। এখন অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ এরা কোনো ঝুঁকির মধ্যেই যাবেন না। রবীন্দ্রনাথের গান ঢুকিয়ে দিয়েছেন— কারণ, লোকে ওটা সবচেয়ে পছন্দ করবে, ভীষণ একটা আঁতেল ব্যাপার হবে, এলিটদের হাতে রাখা যাবে। যদিও সেটা খুবই অস্বাভাবিক। এখন একথা তো বলা যায় না, কারণ আমাদের ফিলম্-ক্রিটিকরা এসব বিষয়ে কখনো মন্তব্য করেন না। সম্প্রতি সন্দীপ রায়ও তো তাঁর 'নিশিযাপন'-এ 'বন্ধু রহো রহো সাথে' লাগিয়ে দিয়েছেন। তরুণ মজুমদারের 'আলো' তো রবীন্দ্রগানের ছয়লাপ। তাহলে নতুন সিনেমার বাংলা গান হবে কাদের হাত ধরে?

কীসব কাণ্ড

আমার মনে হয়, এখনকার যারা সত্যিকারের সংগীত পরিচালক— যাঁরা নতুন কথা ভাবছেন, নতুন ছেলেমেয়েরা— সিরিয়ালও যাঁরা করছেন— যদি গানের কথা তাদের জরুরি মনে হত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা নতুন গান তৈরি করত। যেমন, 'এক আকাশের নীচে'— তাতে দেবজ্যোতি মিশ্র সুরকার, সলিল চৌধুরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। এবার ঘটনা হচ্ছে যে, একটি চরিত্র আছে—যে ক্যাসেট করে ভীষণ বিখ্যাত হয়ে গেল এবং যার বাজারে খুব ডিম্যান্ড হল। তারপর সে গান গাওয়া ছেড়ে দিল, সেটা পারিবারিক অভিমানে। কিন্তু তার গানের কোয়ালিটি কখনো শুনে মনে হচ্ছে না দুর্ধর্ষ হয়েছে, হিট করে যাওয়ার মতো। আমাদের হিট গান সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। আমরা তো এখনকার ক্যাসেটে হিট গান বলতে কী বোঝায় সেটা জানি। সেই গানের ধারে কাছে যাচ্ছে না তার গান। কারণ, তা যদি হত তাহলে দেবজ্যোতি মিশ্রের গানই তো পৃথিবীর সবাই গাইত এখন। এই জায়গাটায় অনিল বাগচীর সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। কবিগানের সুর দিতে গিয়ে তিনি ভেবেছিলেন, এর সুর এমন দিতে হবে যে লোকে প্রচণ্ড গাইবে। কিংবা 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'তে সুর করতে গিয়ে তার লক্ষ্য ছিল— সুরটা এমন দেব যে, লোকে মজে যাবে। কিন্তু ছবির পক্ষে সেটা সংগত কিনা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ওই গানের ফর্মটা জানে কিনা— সেগুলো ভাবা দরকার।

খাচ্ছে কিনা দেখা

হ্যাঁ, ওইটাই লক্ষ্য। 'আমি যামিনী তুমি শশী হে'— গানটা কম্পোজ করার ক্ষমতা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির নেই। তার কারণ, ওর তো হিন্দুস্থানি গান সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। আর তখন তো ওইরকম ছিল না যে, সুরকার জুগিয়ে দিত সুর। সেই যুগটা তো তেমন ছিল না। কবিগান তারা নিজেরাই সুর দিয়ে গাইত। সেই গানের সঙ্গে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির গানের কী সম্পর্ক আছে? কিছুই নেই, কিন্তু অনিল বাগচী খুব সফল সংগীত পরিচালক। মানে, বাণিজ্যিকভাবে। আর এইগুলো যে হিটগান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'কবি'র গান, 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'র গান আমরা এখনো শুনি। মিউজিক্যাল পিস হিসাবে অসামান্য। কিন্তু এটা তো একটা মৌলিক প্রশ্ন যে, একজন নাট্যকার যদি একটা গানকে অভিনয়ে প্রয়োগ করে আমাদের কাছে আনে— সে কী করবে? সে কি একটা ভালো গান দেবে, না নাটকের চরিত্রের পক্ষে উপযোগী গান দেবে? অবশ্যই চরিত্রের উপযোগী গান দেবে। তাহলে তাকে সম সময়ের মতো গান তৈরি করতে হবে। কারণ, ছেলেটা তো এখনকার ছেলে। সে খামকা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত গাইতে যাবে কেন? আজকের ছেলেমেয়েরা ব্রহ্মসংগীত গায় নাকি ফট্ করে!

ভাবের ঘরে চুরি

বেশিরভাগ লোককে প্রতারণা করা হচ্ছে এই বলে যে, তারা রবীন্দ্রনাথের গান শুনেই মুগ্ধ হচ্ছে। আর বিচার করছে না। এমনকি অপর্ণা সেনকেও বিচার করছে না, ঋতুপর্ণ ঘোষকেও বিচার করছে না, গৌতম ঘোষকেও কেউ বিচার করছে না, কী আশ্চর্য! এই থেকেই মনে হয় যে, বরাবর গানের সঙ্গে আমাদের একটা প্রতারণার সম্পর্ক আছে। আমরা পোশাকে আধুনিক হব, সিনেমা দেখতে যাব নন্দনে, সবচেয়ে আধুনিক ফিলম্ ফেস্টিভ্যালের ছবি দেখব, আমরা ভাস্কর্য দেখব সর্বাধুনিক, পেইন্টিং-এ চলে যাব সর্বাধুনিক পর্যায়ে, অ্যাবস্ট্রাকশনের চূড়ান্ত ছবি দেখে বলছি—খুব সুন্দর; আমরা সাহিত্যকে আনতে চাইছি লাতিন আমেরিকার ম্যাজিক রিয়্যালিজমের মধ্যে, কিংবা তার চেয়েও উন্নত কোনো ভাষ্যে, আমরা কবিতাকে নিয়ে গেছি অনেকটাই সুররিয়ালিস্টিক জায়গায় কিন্তু গানকে আমরা কখনো সেই জায়গায় দেখতে চেয়েছি কি? গানের আধুনিকতার কোনো চর্চা নেই এদেশে। যেটা আছে সেটা কেবল আমদানি, ব্র্যান্ড আমদানি। না হয় রিমেক করে স্বর্ণযুগের গানগুলো বিক্রি করে দেওয়া, কিন্তু ক্রিয়েট করার দিকটা একদম নেই! এবং ক্রিয়েট যাঁরা করতে গিয়েছিলেন, যদি ধরি সুমন এবং তাঁর পরবর্তী— যা-ও চেষ্টা করেছেন, একা। তবু একধরনের চেষ্টা তো তাঁরা করেছেন।

বছরে ছত্রিশটা গান, চারটে হিট

কথার সঙ্গে সঙ্গে সুরের ক্ষেত্রেও প্রথমদিকে চেষ্টা ছিল, তারপরে সংখ্যাগত সমস্যা হয়ে গেল। জনপ্রিয় গায়কের বছরে তিনটে করে অন্তত ক্যাসেট বার করতে হবে তো, তাই তিন বারোং ছত্রিশটা গান বানাতে হবে। ছত্রিশটা ভালো গান কোনো মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয় বের করা। সে তো অরণ্যদেবেরও অসাধ্য! ছত্রিশটা গান করে বছরে চারটে হিট করিয়ে দেওয়া, অসম্ভব। কারণ, আমরা যখন গান হিটের কথা শুনেছি, বছরে একটা-দুটো গান বেরোত তখন। একটা আটাত্তর ঘূর্ণনের রেকর্ড— তার এপিঠে একটা, ওপিঠে একটা— দুটো গান হত সারাবছরের চেষ্টায়। সুপারহিট গান হত— তখনকার মাপে, তাও এখনকার মাপে

নয়। এখনকার শ্রোতা অনেক বেশি। কারণ, ক্যাসেট অনেক বেশি সহজে পাওয়া যায়, অনেক সস্তা এবং খুব সহজে ফেলেও দেওয়া যায়। আগেকার দিনে রেকর্ড যত্ন করে সংরক্ষণ করতে হত, এখন তো কেউ ক্যাসেট সংরক্ষণ করে না। কাজেই ইউজ অ্যান্ড থ্রো-এর তত্ত্বে গানের সাংগীতিক দিক থেকে আমাদের প্রত্যাশাও তো তত বেশি স্থায়ী প্রত্যাশা নয়, সমসাময়িকের প্রত্যাশা— গানটা এখন ভালো লাগছে কিনা বলো। তারপরই চট করে আরেকটা এলে তাকে সরিয়ে দেব। সরিয়ে দেওয়াটাই আধুনিকতার ধর্ম। তা যদি হয়, তাহলে আমরা ভালো গান বলতে কী বুঝব? তাই এখন ক্ল্যাসিক ধ্রুপদী কিছু তো থাকবে না। থাকার কথা নয়।

অভ্যাস বদলায় যদি

অন্তত এখনকার হাবে ভাবে তাই দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমরা যারা গান শুনছি, আমরা কোন্‌টার উপর ভিত্তি করব? নিশ্চয়ই নিজের ঐতিহ্যের দিকে ভিত্তি করতে হবে। মনে মনে ফোক-এর কথা বলছি, কিন্তু ফোক-এর সঙ্গে তেমন গভীর সংসর্গ সম্পর্ক নেই। আমাদের কলকাতার ছেলেরা যদি এই মুহূর্তে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে শুরু করে— ধরা যাক বাঁকুড়ায় পড়ে রইল একমাস, ফেস্টিভ্যালের সময় এবং সেখানে যখন ধান কাটা হল, প্রচুর ঝুমুর হল— একমাস তাদের সঙ্গে থাকল, ঝুমুর গাইল—গাইতে গাইতে প্রাণস্পন্দন এসে যেতে পারে তার মধ্যে। তার থেকে সৃজনচিন্তা তাদের মধ্যে আসতে পারে। তার জন্য জীবনযাপন করা দরকার; যেটা আমি নিজের জীবনে, আমার গবেষণার কাজে করেছি। যাকে এঁরা নাম দিয়েছেন— 'পার্টিসিপেটারি রিসার্চ'। অর্থাৎ, আমি দ্রষ্টা নই। আমি তৃতীয় পক্ষের মতো গিয়ে দেখে এসে কিছু লিখিনি, আমি তাদের সঙ্গে বাস করেছি এবং তাদের কথাটাই আমার ভাষায় লিখে দিয়েছি। ফলে আমাকে কিছু বানাতে হয়নি। আমার সাহিত্যের মূল পটকথা তো তাই। আমি তাদের কথাটা তাদের মতো করে লিখেছি। আমার মতো করে লিখিনি। আমার পণ্ডিতি বাধাটা তার মাঝখানে কোথাও আড়াল করে দাঁড়ায়নি। তাদের নিজস্ব এত জিনিস আছে যে, আমাকে আর কিছু বানাতেই হবে না। সেরকম আমাদের লোকসংগীতের নানান ধাপ নিয়ে আমাদের মধ্যে যদি কেউ সত্যিই কাজ করে, ধরা যাক—সলাবত মাহাতো থাকেন পুরুলিয়াতে, তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে এবং তারপর তাঁকে আস্তে আস্তে টুইয়ে-টুইয়ে নানান কথা বলে, তাঁকে দিয়ে গানগুলো বার করাতে হবে—যেমন বলতে হবে 'আচ্ছা, আপনার সেই খুব ছোটবেলার একটা গান করুন। ছোটবেলার গানের মধ্যে দেখা যাবে, অনেকদিন আগেকার ঝুমুরের একটা রেশ আছে। তালের কায়দাটা একটু অন্যরকম। এখন একটু আধুনিক হয়ে গেছে, একটু বিনোদনকারী হয়ে গেছে এখনকার ঝুমুর। আগেকার ঝুমুর গাইতে বললে তারা ঠিক গাইবে। এইরকম করে খাটলে— আমাদের নাটকের লোক যারা, গানের লোক যারা— তারা যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, তাহলে ফোক ফর্মের মধ্যে কিন্তু বাঁচার একটা দিশা আছে। বিলিতি সুরে কোনো দিশা নেই।

বোলান যাত্রা

বোলান গানটা কী— ওটাকে প্যারাম্বুলেটিং কালচার বলে। অর্থাৎ, এই গ্রামে আমরা দলটা বানালাম, যেমন— মফস্‌সলের কোনো থিয়েটার দল তাদের নাটক তৈরি করে সেখানেই দেখছে বা বড়জোর কলকাতার কোনো একটা জায়গায় তাদের শো-টা হচ্ছে। কিন্তু মজা হচ্ছে— আমরা নদিয়া জেলায় বোলানের দলটা তৈরি করলাম, এবার আমরা পরিক্রমা শুরু করে নদিয়া থেকে মুরশিদাবাদে, বর্ধমানে, বীরভূমে গিয়ে

শেষ করলাম। এই যে ঘুরে ঘুরে শো করার ব্যাপারটা, এটা একটা জার্নি। এবং ওই জার্নিতেই বদল হতে থাকে টেক্সট এবং সুরের। হতেই থাকে। ইম্প্রোভাইজড় হতে থাকে। এবং এক-একরকম সেট-আপের দর্শক আসছে। তার মানে, অডিয়েন্স অনুযায়ী পরিবর্তনটা হচ্ছে। 'অডিয়েন্স পয়েন্ট অফ ভিউ' জিনিসটা ইম্প্রোভাইজ করতে করতে চলতে থাকে। ওইটা হচ্ছে কী—এক-একটা জেলায় গিয়ে এক-একধরনের মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে তারা নিজেদের পরিমাপও করতে পারছে। কলকাতার দর্শক তো জানা দর্শক, কত আর রিসার্চ করা যাবে তাদের নিয়ে? আমি তো কৃষ্ণনগরের দর্শক সম্পর্কে জানি, কলকাতা সম্পর্কে জানি, কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট, গোলপার্কের দর্শক বুঝি। আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির রিফ্রেশার্স কোর্সে পড়িয়ে এলাম অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের। তরুণ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা— যারা অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ সচ্ছল, অনেকের মোটরগাড়ি আছে, তারা বাধ্য হয়ে রিফ্রেশার্স কোর্স করতে এসেছে—তাদের পড়াচ্ছি। এদের সমাজ শ্রেণিটা আমি জানি, জানি এরা কারা। আবার যখন কোনো কলেজে গিয়ে পড়াচ্ছি— মফস্সলের কলেজ, সেখানেও বুঝতে পারছি এরা কারা। সেই অনুযায়ী তো আমার স্কেলটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে— ভাবনার স্কেল, বলার স্কেল, বদল হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে একটার পর একটা জনপদের মধ্যে দিয়ে ঘুরলে কিন্তু পার্থক্য অনুযায়ী নিজেকে পালটে নেবার কাজটা অনেক কঠিন হয়ে যায়, আমি যেটা ঘুরেছি! যেমন বীরভূম আর বর্ধমান—বীরভূমের সঙ্গে বর্ধমানের আকাশ-পাতাল তফাৎ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া—একদম ভাবা যায় না এরা কী পরিমাণ শোষিত! একটা উদাহরণ দিই—আমি বাঁকুড়ার একটা গ্রামে গিয়েছি—ছান্দার, সেখানে ছিলাম উৎপল চক্রবর্তীর ওখানে। তো সেখানে সকালবেলা উঠে একটা বাস ধরব। আমি লোককে এসে জিজ্ঞেস করছি, 'এখানে বাস পাওয়া যাবে বর্ধমান যাবার?' বলল, 'একটা স্টেট বাস তো আসে, তবে অর্ধেক দিন দাঁড়ায় না।' লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, যদি দাঁড়ায় তবে উঠবে। যেহেতু আমি এইদিককার লোক, আমি বাসটাকে হাত দেখালাম, দাঁড়াবে না। অতএব, রাস্তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সবাই মিলে দাঁড়িয়ে পড়লাম, বাসটাও দাঁড়িয়ে গেল, উঠে পড়লাম আমরা। তা কন্ডাক্টর বলছে 'ব্যাপার কী?' আমি বললাম, 'ব্যাপার হচ্ছে আপনারা এখানে বাসটা দাঁড় করান না শুনেছি।' তা ঐ লোকগুলোর একটা অধিকারবোধও নেই যে, এটা একটা স্টপেজ, এখানে দাঁড়ানোই হচ্ছে এদের কাজ। কিন্তু বাসটা দাঁড়ায় না, চলে যায়। এই পরিমাণ বঞ্চিত মানুষ তো এরা, আর তার সঙ্গে তৃষ্ণার্ত। কারণ, সত্যিকারেরই জল নেই তো কোথাও। মানে, বালি সরিয়ে বাটি পেতে রেখে দেবে, তাতে এক-একফোঁটা করে জল পড়বে—তবে এক বাটি জল হবে! সেটাই তো খাওয়ার জল। এই জায়গাটা তো আমরা এখানে বসে বুঝতে পারি না। কিন্তু, এই লোকগুলোর জীবনে যে জলের আর্তি, সেটা তো গানের মধ্যে আছে। ঝুমুরের মধ্যে জলকষ্ট একটা বিষয় হিসেবে উঠে আসছে। এটা কলকাতার লোক তাদের বিলাসিতার মধ্যে থেকে কোনোদিন বুঝতেই পারবে না যে, জল একটা বিষয় হয়ে উঠতে পারে। জল বুঝতে গেলে আপনাকে আসানসোল যেতে হবে। বাঁকুড়ায়ও তাই। আমার এক বন্ধু— উদয়ন ঘোষ, গল্প লিখত, সে আসানসোলে থাকত। তার কাছে গিয়ে আমি আসানসোলের জলের গল্প শুনে এসেছি। তা শুনলে রোমাঞ্চ হবে, এত আশ্চর্য গল্প! একটা মিছিল নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে যাচ্ছে ওরা। জলের দাবিতে শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছে। সেইসময় একটা হাউসিং এস্টেটের ছাদের ওপর থেকে ট্যাংক ফুটো হয়ে জল পড়তে আরম্ভ করেছে। শ্রমিকেরা বলল, 'অনেকদিন চান করিনি।' বলে সবাই চান করে বলল, 'আর মিছিল করব না।' আর একটা ঘটনা—একটা বড়োলোকের বাড়িতে শাওয়ার খুলে দিয়ে মহিলা কেউ

একজন স্নান করছেন। তাদের রাস্তার দিক দিয়ে পাইপ বেয়ে জল হুড়হুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই বাড়িতে কলিং বেল টিপে লোক বলছে, 'আপনার বাড়িতে জল পড়ে যাচ্ছে।' শেষ গল্প— উদয়ন চারতলার ছাদ থেকে দেখছে—ইউনাইটেড ব্যাংক জি.টি. রোডের ওপরে, একজন শ্রমিক বাড়িতে এসেছে কাজ সেরে। তার বউ বলেছে, 'দু'বলতি জল এনে দাও।' বেশ বড়সড় ছেলে, হাফপ্যান্ট পরা, গেঞ্জি পরা— দেখলাম, দুটো বালতি নিয়ে চলে গেল জি. টি. রোড পার হয়ে। টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে এবার পার হয়ে বাড়িতে দেবে। উদয়ন বলল— যখন আসছে, আমার চোখের সামনে দেখলাম— একটা লরি তাকে ধাক্কা দিল! ছিটকে পড়ে গেল, মরে গেল! সমস্ত লোক ছুটে এল, আমিও চারতলা থেকে নেমে এলাম। গিয়ে দেখলাম, ছেলেটা স্ম্যাশড্ হয়ে গেছে, ছত্রাকার অবস্থা। একটা লোক মন্তব্য করল, 'ইস্ দু'বালতি জল নষ্ট হয়ে গেল'। এই নাটক কে লিখবে? কোনো মানুষ মরে যায় যাক, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা দু'বালতি জল নষ্ট হয়ে গেছে! জলের চেতনা কাকে বলে, এতেই বোঝায়। এর জন্য ঘুরতে হবে। আমি জীবনে যেটুকু দর্শন অর্জন করেছি, সেটা শুধু ঘুরে। বলাবাহুল্য, আমি এলিটিস্টদের কাছে বিশেষ কিছুই শিখিনি। আমি যা কিছু শেখার এদের কাছেই শিখেছি। এখানে গিয়ে আমার অনেক বেশি দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছি— কাকে বলে ধর্ম আর কাকে বলে জাতি। এই যে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে এতসব দুশ্চিন্তা খবরের কাগজে— সব বানানো। দারিদ্র্য ব্যতীত কিছুই নেই গ্রামের কোথাও। কোথায় জাতিভেদ? ধুৎ! হরবখ্‌ত আমি মুসলমানের বাড়িতে খেয়েছি, আমি হিন্দু-মুসলমানদের বাড়িতে একসঙ্গে খেতে দেখেছি, লেনদেন করতে দেখেছি। বন্যার সময় মসজিদের মাথায় গোটা গ্রাম বসে আছে—দেখে এসেছি। এসব না দেখলে কিছু বোঝা যায় না। সেইজন্য আমি সবাইকেই বলি, আমার কথা এইটাই যে, গ্রামে ফিরিয়া না গেলেও গ্রামে যাও। নিজেদের জন্যই যাও, তাদের দয়া করতে হবে না। তারা সমৃদ্ধ। কিন্তু, তাদের নষ্ট করে দিও না। আমরা তো তাই করছি ভোটসর্বস্ব রাজনীতি করে।

শহর ছেড়ে

আসলে শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়বার অভ্যেসটা ভীষণভাবে দরকার। পার্থ নামে আমার চেনা একটি ছেলে— সে সাঁওতালদের একটা গ্রামে গিয়ে একমাস ছিল। সাঁওতালদের যা কাহিনি আমাকে এনে লিখে দিয়েছে, শুনলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। একজন লিখেছেন— সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদিবাসীদের গ্রামে একটা ছেলেকে বলছেন, 'গাছ আঁকো।' সে একটা গাছ এঁকেছে। গাছের গুঁড়ি, পাতা, ফুল, ফল একটা পাখি বসে আছে— সব এঁকেছে, তলায় একটা শেকড় এঁকেছে। সন্দীপ বলছেন, 'শেকড় এঁকেছ কেন?' বলল, 'শেকড় ছাড়া আবার গাছ হয় নাকি?' এই একটা গল্প, একটা অভিজ্ঞতাই আমাকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে এক লহমায় যে, শেকড় ছাড়া গাছ হয় নাকি? এর মধ্যে কী ভীষণ প্যারাডক্স আছে যে, আমরা আবার শেকড়ের সন্ধানই করি। ওদের আমরা বলি শেকড় এবং ওদেরই আমরা সন্ধান করি। ওরা যখন আঁকে, তখন আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। এই অভিজ্ঞতাকে আমরা কী বলব? সন্দীপ ওখানে গেলেন বলেই তো জানতে পারলেন। এইবার ফুটপাতের একজন পড়ুয়া ওঁকে জিজ্ঞেস করেছে, 'আচ্ছা, সন্দীপদা, ইংরেজি অক্ষর— একটা বড়ো হাতের, একটা ছোটো হাতের— করেছ কী করতে? এই দুটোর দরকার কী?' এই কথা কি আমরা কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছি? সন্দীপ বলেছেন, 'আমিও কোনোদিন জিজ্ঞেস করিনি, আমার বাবাও কোনোদিন জিজ্ঞেস করেনি, কোনো শিক্ষিত লোকই জিজ্ঞেস করেনি— কেন দুটো হয়?' তারপর আমি খোঁজ করে জানলাম— পৃথিবীতে এরকম তিনটে মাত্র ভাষা, যার এরকম দুটো হরফ

আছে, আর কোনোটায় নেই। তারপর বলছেন যে, ফুটপাথে যারা থাকে তাদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'মাঝে-মাঝে পুলিশ-টুলিশ এলে কী করিস্?' বলল, 'ওই চাটি-বাটি নিয়ে আমরা পালাই, গলির মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। তারপর পুলিশ চলে গেলে আবার এসে আমরা বসি।' জিজ্ঞেস করেছেন যে, 'এতে তোদের খারাপ লাগে না?' ছেলেটা উত্তর দিয়েছে, 'পুলিশ তো কিছু ভুল করে না, আমাদের থাকাটা তো ঠিক না, কাজটা তো ঠিক না। আমরা অন্যায় কাজ করি।' তাদের নীতিবোধ কী রকম পর্যায়ের! অথচ আমাদের কাজ হচ্ছে এনক্রোচ করা। কিছু লোক তাদের বাড়িটাকে এক ইঞ্চিকরে বাড়িয়ে নিচ্ছে, পাঁচ ইঞ্চিকরে বাড়িয়ে নিচ্ছে। আমাদের সভ্যসমাজের গল্পই হচ্ছে জবরদখলের গল্প। আর ওরা নিজেরাই বলছে, 'আমরা তো জানি আমরা অন্যায় করছি। সেজন্য আমরা পালিয়ে যাই, কিন্তু আবার চলে আসি। কোথায় যাব বলুন? কিন্তু কাজটা আমরা ভালো করি না। ওরা ঠিক করে। পুলিশ তো তাড়াবেই। ফুটপাথ কি মানুষের থাকার জায়গা নাকি?' ওরা এই কথা বলেছে। সন্দীপ যে অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন— অত্যাশ্চর্য! লোকশিল্পীদের আমি চিহ্নিত করি আমার ঘোরার মধ্যে। আমি তো শান্তিনিকেতনে সাজাহানকে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আবিষ্কার করেছি। তাকে তো আমি রং-তুলি কিনে দিয়ে আসতাম, কাগজ কিনে দিয়ে আসতাম। ওর ছবি কিনেছি কত! লোককে দিয়েছি। আমি যখন আমেরিকায় গিয়েছিলাম, সাজাহানের পুরো একটা ইসলামিক স্ক্রোল কিনে উপহার দিয়ে এসেছি যে, তোমরা টাঙিয়ে রাখো। আমার বাড়িতে অত বড়ো জায়গা নেই। বিরাট, দেওয়াল ভরতি হয়ে যাবে! অনেকদিন আগে কিনে নিয়েছি ওর কাছ থেকে। ওটা ডিসার্টেশন পেপারে জমা দিয়ে ফার্স্ট হয়েছিল ফাইনালে। ভালো ছবি আঁকে। কেউ তার কথা তখন জানান না। তার একটা হাত অথর্ব, হাতটা পোলিও হয়ে গেছে ছোটবেলায়। শেখ সাজাহান আমার খুব পছন্দসই শিল্পী। সত্যি কথা বলছি, স্বার্থ বলতে— আমি নিজে একটু শিক্ষিত হতে চাই।

'জীবনমুখী' শব্দটা কেমন

'জীবনমুখী' শব্দটা একটা বানিয়ে তোলা ব্যাপার— বিপণনের কথা ভেবে। শ্রোতারা এ-শব্দ তৈরি করেননি, 'আধুনিক গান'-ও শ্রোতাদের তৈরি শব্দ নয়। জীবনমুখী শব্দটা আমার ভালো লাগে না, তবে তা নিয়ে কিছু বলতেও ইচ্ছে করে না। এখন চলছে, হয়তো চলবে কিছুদিন, শেষ পর্যন্ত চলবে না বলেই মনে হয়। তবে হ্যাঁ, শব্দটা খানিকটা ক্ষতি করেছে। কারণ কিছু সাবেকি মনের মানুষ এমনকি গানের জগতের লোকও কথাটা শুনলেই 'রে রে' করে উঠছেন : 'তবে কি এতদিন আমরা মরণমুখী গান করেছি?' এই বিশ্বাসের শ্রোতারা নতুন গানে খানিকটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন—তবে ঐ খানিকটা। এই ধরনের গান থিমেটিকালি তো নতুনই—গাওয়ার ধরন ও যন্ত্রবাদ্যও নতুন রকমের (যেমন গিটারের প্রাধান্য), শিল্পীর স্টেজ অ্যাপিয়ারেন্সও অন্যরকম (কারোর কারোর পোশাকও), গানের সঙ্গে কথকতা (বাচালতাও) করে কনসার্ট জমানো, এও বেশ নতুন। সাবেকি আধুনিক গান আর এখনকার গান ও তার গায়নকে মেলানো কঠিন।

কতটা দেশি গান, কতটা বিদেশি

গানের আবার দেশি, বিদেশি কি? বিশেষত বাংলা গানে? ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যে লালিত এই দেশে উপন্যাস, কবিতা, নাট্য, প্রহসন, মহাকাব্য প্রভৃতি কোন্ আর্ট ফর্মটা বিদেশিয়ানার ছোঁয়া পায়নি? তেমনই

গান। সেই হিন্দুমেলা থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল- দিলীপকুমার হয়ে সলিল চৌধুরি পর্যন্ত দেশি-বিদেশি ছক ও সুরের ব্লেন্ডিং কতই আছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' কেমন গান? কাজেই হালফিলের গানে বিদেশিয়ানা আছে এবং থাকবে। শ্রোতারাও সেটা চাইছেন। সিডি, ক্যাসেট ও টিভি অবিরাম শোনাচ্ছে বিদেশি পপ, র‍্যাপ, ব্রেথলেস— গানের বিশ্বায়ন ঘটে গেছে। বাংলা গান কি বিশ্বের বাইরে?

গানের কন্‌টেন্ট

গানের কন্‌টেন্ট ভীষণই পালটে গেছে। ন্যাকা ন্যাকা উচ্চারণ আর শুধু প্রণয়ে বা বিরহে কি চিরকাল চলতে পারে? গণসংগীত বা প্রতুলের গান (কিছুটা মেঘনাদ, অনুশ্রী-বিপুল, কচিৎ গৌতম) নিতান্ত ব্যতিক্রমী ব্যাপার ছিল। জনপ্রিয় ছিল না। ব্যাপ্তিও ছিল না। হঠাৎ যে সুমন-নচিকেতারা হলভরতি শ্রোতা পেয়ে গেলেন (বিশেষত ছাত্রছাত্রী ও তরুণ-তরুণী, এমনকি বুদ্ধিজীবীরাও) তার কারণ গড়পড়তা গান আর কারোর ভালো লাগছিল না। শুধু রবীন্দ্রসংগীতে কি দ্রুত পরিবর্তমান যুগের দাবি মেটে? অথচ গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বা শ্যামল গুপ্তদের গানের বিষয় ও ভাব বড্ড সেকেলে কিংবা অবান্তর হয়ে পড়েছিল। থিমেটিক চেঞ্জ ছিল অনিবার্য। সেটা এসে গেল।

গানের সামাজিক প্রেক্ষিত

সামাজিক প্রেক্ষিত তৈরি না থাকলে গানই সেই প্রেক্ষিত তৈরি করে নেয়। আমার চোখের সামনে দেখেছি রবীন্দ্রসংগীতের হতদশা ও অনাদর। ষাটের দশকের পর সেই রবীন্দ্রসংগীত উঠে বসল রাজাসনে। কে বসাল? রুচিমান শিক্ষিত দর্শক। তাদের রুচি গড়ে দিল রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধ গায়ন ও সম্মিলিত শ্রোতৃরুচি। আশির দশকের শেষে সেই রবীন্দ্রসংগীতই আবার একঘেয়ে হয়ে উঠল। তরুণ-তরুণীরা সে গানে সাড়া দিচ্ছিল না। তাদের তৃষ্ণা মিটছিল বিলিতি গান ও সিনেমার হিন্দি গানে। বাংলা গান সম্পর্কে আততি বা প্রত্যাশা কমে আসছিল। শিষ্ট সমাজে গানের নান্দনিক চাহিদা রবীন্দ্র বা নজরুলের গানের গোঁজামিল দিয়ে চলছিল, অথচ সমাজের ভেতরে এসে গিয়েছিল ব্যাপক দিনবদলের পালা। এদিকে তখনকার বিদ্যমান গানের সমাজে আধুনিক বলে যেসব গান চলছিল তা পৌনপুনিক ও মানহীন। সেসব গানের কোনো সেরিব্রাল ভ্যালু ছিল না, সুর ও তালেও এসে গিয়েছিল ক্লান্তি। একেই বলে অবক্ষয়। কিন্তু ডেকাডেন্ট পরিবেশেরও একটা চাপ থাকে— তা তৈরি করতে পারে একরকম নতুন জেদ। নতুন গান এই অবক্ষয়োত্তর সমাজের ফসল।

এই গানের দার্শনিক প্রস্থান

যে-কোনো গানেরই পক্ষে 'দার্শনিক প্রস্থান' খুব ভারী শব্দ। গান কি অত ভার বইতে পারে? কিন্তু কথাটা উঠল কেন? সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের গানে সুস্পষ্ট দার্শনিক প্রস্থান কিছু একটা ছিল। তাই বলে সব গানে তা থাকবে কেন? দ্বিজু রায়ের হাসির গানে বা দিলীপ রায়ের ভক্তিগীতিতে যা লভ্য তা কি গণসংগীতের ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়? এখনকার গানে রয়েছে এখনকার ছড়ানো-ছিটোনো জীবনের অবলোকন। যেমন ধরা যাক, কাজি কামাল নাসেরের একটা গানের বিষয় হল 'রবিবার'। এই রবিবার, তার অবকাশ ও ভোগবাদ নিয়ে, কাদের পক্ষে প্রসঙ্গিক? অবশ্যই মধ্যবিত্ত চাকুরেদের পক্ষে। শ্রমিকদের পক্ষেও রবিবার কোনো উপভোগের বিষয় কি? চাষিদের আবার রবিবার কোথায়? শিক্ষার্থীদের পক্ষেও কি রবিবার

খুব ভোগ্য? তারা তো দেখি রবিবারে যায় দূরের টিউটরদের কাছে পড়তে। তাহলে? সেই জন্যই এখনকার গানে বিনোদনই প্রধান, দর্শন গৌণ। 'সুসংহত, নির্দিষ্ট কোনো দার্শনিক, তত্ত্বগত অভিপ্রায়' তাতে কম। তবে হ্যাঁ, এতে খানিকটা সমাজ অর্থনীতির আঁচ লেগেছে। ফুল খেলবার দর্শন অন্তত নেই। আছে শিশুশ্রমিক, পথের পাগল কিংবা বৃদ্ধাশ্রমের মর্মান্তিক কাতরতা। গানে এসব প্রসঙ্গ একেবারে অভিনব। কিন্তু আমাদের গানে এখনো ট্রেড ইউনিয়ন চেতনা আসেনি। নার্সের নিজের কথা, শিক্ষকের, রেলকর্মীর, মজুরের নিজস্ব আত্মসংবিত কই গানে? গান কি কেবল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের কথাই বলবে? এখনো? মৌসুমী ব্যতীত মেয়েদের নিজস্ব কথা আর তো দেখছি না অন্য কোনো গানে। খাঁটি মেয়েলি অনুভবের গান চাই— এখনকার কবিতায় সেটা এসে গেছে। মন্দাক্রান্তা, মল্লিকা, চৈতালি, যশোধরাদের কবিতার আমি মুগ্ধ পাঠক। আমাদের গানে কিন্তু মেয়েরা শুধুই প্রেমিকা— সে শুধু অপেক্ষা করে।

এখনকার বাংলা গানের ভালো দিকগুলো বাংলা গানের ধারাবাহিকতায় চিন্তা ও অনুভবের নতুনত্ব এনেছে। একটু মোড় ঘুরিয়েছে নিশ্চয়ই। নেতানো, লতানো গান, হালকা বাণী, দুর্বল অন্ত্যমিল (মিতালি গীতালি মার্কা) এখন আর চলছে না। তবে নতুন গানেরও এখন আর তেমন উত্তরণ ঘটছে না। তার কারণ গীতিকারদের মান একরকম নয়। তা ছাড়া গায়ককেই গান লিখতে হবে সর্বদা এমন না হওয়াই সংগত। নচিকেতা যেমন বুঝতে বা লিখতে পারেন, শিলাজিৎ তা পারেন না। কামাল নাসের আবার ভালো লেখেন কিন্তু তার গায়ন দুর্বল। বরং লোপামুদ্রার চেষ্টাটা ভালো। ভালো টেকস্‌টে অন্যের সুরে নিজের গায়ন। তার গায়নভঙ্গিটি অবশ্য কিছুটা একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে কণ্ঠ তেজালো। স্বাগতালক্ষ্মী গান ভালো, গান না লিখলেই পারতেন। মৌসুমী প্রত্যাশা জাগিয়ে বিদেশে চলে গেল। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানকে তেমন করে সবাই নিল না কেন কে জানে? তাঁর সুরে বয়নের চমৎকারিত্ব আছে কিন্তু গানের স্টাইল খুবই পার্সোনাল। সুমনও তো তাই। তার গান গাওয়া বেশ কঠিন। অঞ্জন দত্ত এক ধরনের গান লেখেন ও বিলিতি ধাঁচে গান করেন— তার কোনো অনুসরণ হয় বলে মনে হয় না। নচিকেতার গানে হুল্লোড় বেশি, কণ্ঠকণ্ডূতি প্রবল। এদের দিয়ে অন্যরকম কোনো গান গাওয়ালে বেশ হয়। প্রতীক চৌধুরি খুবই সম্ভবনাময় এবং সবরকম গান গাইতে সক্ষম। সাড়া ফেলেছে রূপঙ্কর আর শুভমিতা।

'রিমেক'-এর জনপ্রিয়তা ও সমাদর

'দেশ' পত্রিকায় 'বাংলা গানের দিগদর্শনী' প্রবন্ধে আমি বেশ ক'বছর আগে যা বলেছিলাম এখন সেই বক্তব্য থেকে পিছিয়ে যাইনি। বস্তুত 'রিমেক' গান কোনো দেশের গীতধারার সজীব ও সক্রিয় নমুনা হতে পারে না। এটা একটা সাময়িক প্রবণতা, গ্রামোফোন কোম্পানিগুলোর এক রকম ব্যবসায়িক চাল। তা কিছুকাল বাজিমাত করতে পারে বড়জোর। আসলে জাতি হিসাবে বাঙালি স্মৃতিকাতর, স্মৃতিজীবী। বর্তমানের লড়াইকে তার বড্ড ভয়। আহা কী সুন্দর ছিল সেসব দিন, কী সব মানুষ— বলতে বলতে কত লোকের চোখে জল এসে যায়। বাংলা গান সম্পর্কে একই নস্টালজিয়া। ফলে বাংলা গানের জগৎ যেন স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। কিন্তু যতই 'রিমেক' গান গাই তাতে কি কোনো সৃষ্টিশীলতা আছে? সে গান কি আজকের কথা বলে? এই বিশেষ বিপন্ন সময়ের? 'রানার'-এর মতো সফল গানও যে লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে 'রিমেক' হয়ে জমলো না তার কারণ ওই গানের কোনো থিমেটিক আবেদন নেই—

একেবারে জোলো ব্যাপার। গানের ব্যালাডধর্মিতাও তেমন ঢেউ তোলে না। রানার বলেই যে এখন আর কিছু নেই। গাঁয়ের বধূ তো আরও অলীক! হ্যাঁ, তবু এ প্রশ্ন ওঠে, উঠবেই, যে 'রিমেক' কেন জনাদর আর সমাদর পেল। পেল কি? অন্তত এক দশক কি সেই জনাদর টিকল? শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন : 'এক দশকে সংঘ ভেঙে যায়।' 'রিমেক' তো সেই এক দশক তার ঘোর ধরে রাখতে পারল না। হই হই করে এসে গেল ব্যান্ড। কিন্তু তাই বা কদিন শুনবে অস্থির যুবসমাজ? কাজেই ফিরতে হবে, হবেই, বেসিক আধুনিক গানের কাছে। তার মোড়ক 'জীবনমুখী' হোক বা অন্য কিছু হোক। 'রিমেক' গান কিছুকালও যে ঢেউ তুলেছিল তার কারণ ওই সব গানে বাণী যত অকিঞ্চিৎকর হোক, মেলডি ছিল প্রবল, পারফরমাররা চমৎকার গেয়েছিলেন। নির্মাণের কুশলতা ছিল, সংগতে অতিকৃতি ছিল না। এখনকার মতো 'বাজনা গান' ছিল না। এখনকার গানে কেবল ক্ষণকালের ছন্দ— উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাবার নেশা। কেউ কি বিশ্বাস করবে যে শিলাজিৎ বা অঞ্জনের কোনো গান তিন দশক পরে 'রিমেক' হবে? অসম্ভব। এসব গানে কোনো ঐতিহ্য নেই, শাশ্বত আবেদনও নেই। তাই নতুন গানই চাই—নতুনতর।

কেবলমাত্র অ্যাড্রেস করে, এক্সপ্লোর করতে পারে না

সামাজিক সমস্যা বা অন্য সমস্যাগুলোকে এক্সপ্লোর করা কি গানের কাজ? কোন্ দেশে কোন্ গান সেই কাজ করেছে? রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা এমনকি নজরুলও কি তাঁর গানে কোনো সমস্যার চর্চা করেছেন? আচ্ছা বেশ, এবারে না হয় তর্কের খাতিরে তিন সময়ের তিনটে অসামান্য গানের কথা তুলি, যা কালের বিচারেও চিরন্তন। রামপ্রসাদের 'মন তুমি কৃষিকাজ জানো না', পীতাম্বর দাসের 'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি' এবং মোহিনী চৌধুরীর 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে'— এসব গানে কি কোনো সমস্যার কথা আছে? এ তো বিশুদ্ধ ভাবাবেগের গান— সম্ভবত সেই জন্যেই এ গান সব যুগের বাঙালি গেয়েছে। 'ধনধান্য পুষ্পভরা'-ও তাই। 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' ভালো লাগে কেন? জাতি বর্ণ অতিক্রমকারী ভাবাবেগ আর মানবমহিমার কথা আছে বলে। হিসেব করে দেখলে 'তোমাকে চাই' কিংবা 'এই বেশ ভালো আছি' শেষপর্যন্ত একটা স্টেটমেন্ট কিন্তু আধুনিকতার অঞ্জন মাখানো, একটুও বা অভিমান নয় কি? প্রতুলের গাওয়া 'আমি বাংলায় গান গাই' গান আর জীবনানন্দের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতা একই সময়ের বাঙালির চিত্তক্ষেত্রে ঘা দিয়েছে— এটা লক্ষণীয়। এটাই গানের কাজ। অ্যাড্রেস করাও গানের কাজ। 'ওরা আমাদের গাইতে দেয় না' বা 'উই আর ইন দ্য সেম বোট ব্রাদার' তো অ্যাড্রেসই করে। এক্সপ্লোরও করে হয়তো, কি এসে যায়?

গানের নগরকেন্দ্রিকতা

নগরকেন্দ্রিকতা এবং মেট্রোপলিটন মন এখনকার বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির সারকথা। নগরকেন্দ্রিক শব্দটিও বিশদার্থে নয়, বলা চলে কলকাতাকেন্দ্রিক। সেই কলকাতার আবার হালফিল নানারকম মুখ দেখা যাচ্ছে। পঞ্চাশ দশকের পর কলকাতাও ভাঙছে, বহরে বাড়ছে আড়েদীঘে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে—সাউথ-নর্থে ভাগাভাগি হচ্ছে। তার মধ্যে জেগে উঠছে দমদম মার্কা সন্ত্রাস, বেহালা মার্কা মস্তানি। অন্যদিকে নিপাট বহুতল গাড়িবাড়ির সল্টলেক কালচার। উত্তর কলকাতার সাবেক বনেদিয়ানা টাল খেয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার উন্নাসিকতা বাড়ছে। জাগছে নিউ টাউন, রাজারহাট, পাটুলি। বাংলা গান এদের মধ্যে কাদের কথা বলবে? সকলেই তো ইংরেজ হবার ইঁদুর দৌড়ে সামিল, টাইসমেত ইংরিজি বুকনির খই—এরা কেউ বাংলা গান

গাইবে এমনকি শুনবে তো? 'অস্তিত্বের গহন অন্ধকার', 'সূক্ষ্মতম টানাপোড়েন' কাদের? কয়েক কোটি অসহায় মফস্‌সল ও গ্রামবাসীদের? লোডশেডিং, ভয়াবহ বেকারি, নোটপড়া নির্বোধ বিদ্যার্থীদের ঢল— এই তো সারাদেশের পরিচয়। স্বাধীনতার পরে ষাট বছরে যে কলকাতা ছাড়া একটা নগরও গড়ে উঠল না, বরং পুরোনো বনেদি নগরগুলো ভেঙে গেল—তার দায় কে নেবে? কলকাতাও কি তেমন করে আর নাগরিক? তার তো শুধু এক্‌সপ্যানশন দেখছি এলাকার— ওপরদিকে উঠছে হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট শপিংমল— প্রকৃত অর্থে গ্রোথ কই? না, এই নগরে গানের ভবিষ্যৎ, অন্তত শ্রোতার দিক থেকে নৈরাশ্যজনক। এখনকার গান বরং মফস্‌সলে বেশি বিপণন করছে বলে জানি।

সুরের ক্ষেত্রে

সুরের ক্ষেত্রে এখনকার গানে কী কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে তা আমি বলবার অধিকারী নই, কারণ বহু গানই আমি শুনিনি, মানে শোনার সময় ও সুযোগ পাইনি। তবে এটা বলতে পারি, বাংলা গানে এখনকার প্রধান ঝোঁক হল ভাবের উত্তরণ এবং বিচিত্র প্রকাশের দিকে। এ গানের আবেদন প্রধানত সেরিব্রাল।

'দিনবদল'-এর কথা

সামাজিক দায়বদ্ধতার চাপেই তো এই বর্গের গান উঠে এসেছে। বাংলা গানে যে আমাদের যাপনের কথা নেই, নেই পরিবেশ-পরিস্থিতির বাস্তবতা, আমাদের কমিটমেন্ট, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন প্রথমে সুমন, তারপরে আরও কেউ কেউ, তবে সকলে নয়। 'বৃদ্ধাশ্রম' শুনে কে না তারিফ করেছে? 'তিনি বৃদ্ধ হলেন' গানটা কি আগে ভাবা গেছে? 'দশফুট বাই দশফুট', গানের বিষয়, ভাবা যায়? 'গেরস্থের খোকা হোক, খুকুও হোক'— কি অসামান্য উচ্চারণ। না, দিনবদল গান দিয়ে হয় না। কিন্তু দিনবদলের চারণ গান তো করতেই হবে গায়কদের। দিনবদল করতে গেলে লাগে অনেকের সমবায়— রাষ্ট্র, সমাজ, জনশক্তি, অর্থনীতি ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা— এখন তাতে আবার যুক্ত করতে হবে বৈদ্যুতিন প্রয়োগ এবং অস্ত্র প্রযুক্তি। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে হবে যে! সীমান্তের ওপারে ঘোষিত শত্রু। স্বদেশের অভ্যন্তরে অজানা শত্রু, অদৃশ্য আততায়ী। গান মরবে না— এ বিশ্বাস আমারও। শুধু আধুনিক গানই নয়, যে-কোনো সৎ অনুভূতির গানই বাঁচবে— বাঁচবে তার স্রষ্টা ও শিল্পীরা। কেবল ধরনটা পালটে যাবে—পালটে যাবে শ্রোতাদের চাহিদার চেহারা। অব্যবস্থিত এই সময়ের অস্থিরতা কতদিন আর থাকবে? নতুন ভোর আর নতুন গানের ভোরের প্রতীক্ষা আমি একই সঙ্গে করে থাকব।

গান কি কম পড়িয়াছে?

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মফস্‌সলে থাকি বলে এবং অবসরপ্রাপ্ত বলে, এমনকি গড়পড়তা মানুষের মতো দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই বলে, আমি দুপুরে টিভি দেখি। কোনো নির্দিষ্ট চ্যানেল নয়, অস্থির চঞ্চল হয়ে সার্ফিং করতে করতে, কোথাও একটু স্থির হতে চাই। শেষমেশ গানের চ্যানেলে মন বসে। তার কারণ, এখনকার গানবাজনা বা বাজনাগান কেমন হচ্ছে, কীভাবে চলছে গানঅলাদের জীবন, সেসব বিস্তারিত জানার একটা সামাজিক কৌতূহল আমার আছে। অধিকন্তু জানতে চাই, যেসব ছেলেমেয়ে এখনকার 'শুধু

গানে শুধু সংগীতে' মেতে আছে তাদের সামাজিক শ্রেণি, অর্থনৈতিক বনিয়াদ, লেখাপড়ার দৌড় এবং অর্থলাভের বাস্তব কতটা সঠিক, কতটা- বা ভেজাল। পর্দায় এদের উপস্থিতি থেকে কিছু বোঝা অবশ্য কঠিন, কারণ পেশাগতভাবে বাধ্যত এদের বহুরূপী বলা যায়। অনবরত পোশাক পালটে যায়। কারুর কারুর লম্বমান কেশদৌরাত্ম্যে এবং সেই চুলের উথালিপাথালিতে মুখটাই দেখা যায় না। যেটুকুও-বা দেখা যায় তাতে বাধা পড়ে মস্ত এক কালো চশমার মুখোশে। আসলে এখন বাংলা গানের একটা বড় অংশ, অন্তত ভিডিয়ো সেশনে, নিজের মুখশ্রী ঢেকে রাখে। পোশাকে, নাচে, ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে, দেহের আশ্লেষে এবং হাতের মুদ্রায় চেপে বসে এক প্রচ্ছন্ন মুখোশ। ফলে গান এখন যতটা শোনার, তার বেশি দেখার। দেখতে হয় শুধু গায়ক-গায়িকা বা দলবদ্ধ গায়ক-গায়িকাদের নয়, সেই সঙ্গে দর্শনীয় সহযোগী যন্ত্রবাদ্যকরদের কারদানিও। কোনো কোনো বাদকদল আবার একই রঙের পাঞ্জাবির সঙ্গে গলায় জড়ায় একটি উত্তরীয়। কোনো কোনো দলে আবার গায়করাই মাঝে মাঝে ড্রাম পেটায় বা বাঁশি বাজায়— ফাঁকে ফাঁকে গায় বা গলাযোগ করে। কোনো কোনো ভিডিয়ো প্রোমোতে দেখি পুরোনো বাড়ি কিংবা পুকুর পাড় কিংবা সেতু কিংবা গোরুর গাড়িতে চিত হয়ে কিংবা মোটর বাইকে চেপে শিল্পী গান গায়। বলা বাহুল্য গানটা নিশ্চয়ই তখন গায় না— আগেই রেকর্ডেড হয়ে থাকে স্টুডিয়োতে। দৃশ্যত তারা গানের অভিনয় করে আমাদের দেখাতে।

মুশকিল হচ্ছে অনেকের এইটা যে, তাদের বহুদিন ধরে অভ্যাস হয়ে গেছে আত্মমগ্ন শিল্পীদের কণ্ঠে আত্মস্থ হয়ে বা আত্মহারা হয়ে গান শোনার। কোনো চাপল্য, চাঞ্চল্য বা দেখনদারি তো বাংলা গানে ছিল না। শিল্পী এসে বসতেন— ধুতি পাঞ্জাবি বা ধুতি শার্ট পরনে, মহিলা শিল্পী মানেই হালকা রঙের একটি তাঁত বা সিল্কের শাড়ি। হারমোনিয়াম নিয়ে গান ধরতেন, সংগত মানে বাঁয়া-তবলা একজোড়া, ক্বচিৎ তানপুরা বা রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে এসরাজ। আয়োজনের এই অনাড়ম্বরতার কারণ হল সেইসব গানের বাণী তত আধুনিক না হলেও সুরকাররা ছিলেন কুশলী ও উদ্‌ভাবন নিপুণ, শিল্পীরা ছিলেন অনুশীলিত সুকণ্ঠসম্পন্ন মার্জিত রুচির— স্বর ছিল মেলডিবহুল। গানের ফাঁকে ফাঁকে, স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগের অন্তর্গত থাকত প্রেল্যুডে ইন্টারল্যুডে সুপরিকল্পিত আবহ, যা গানকেই সমৃদ্ধ করত, বাড়াত তার গুণগত বৈভব। প্রসঙ্গত মনে না পড়ে পারে না যে, রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'আমাদের নির্জন এককের গান— ইউরোপের সজন লোকালয়ের গান।' তার মানে প্রতীচীর গানে থাকে বহির্জগতের কলতানমুখরিত ঝংকার, বাদ্যযন্ত্রের দাপট, বহুজনের মিলিত কণ্ঠ বা বিস্বর (Harmony)। কবি অমিয় চক্রবর্তী মার্কিনি জাজ, রক শুনে পঞ্চাশের দশকে বলেছিলেন, 'এ যেন চিৎকৃত সংগীতহীনতা'। তার ঢেউ এদেশেও তাহলে এসে গেল?

আমাদের গানের ইতিহাসে ঝঞ্ঝাটি ঝামেলা বরাবরই আছে অথবা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'চিত্ত পিপাসিত রে/গীতসুধার তরে'। তার মানে তাঁর শৈশব কৈশোরে প্রকৃত গীতসুধা, যাকে বলে বাণী ও সুরের সম্মেলন, তা তিনি পাননি। কী করে পাবেন? ছোটোবেলায় শোনা একটা গানের স্মৃতি তিনি পেশ করেছিলেন—

এক যে ছিল কুকুরচাটা শেয়ালকাঁটার বন
কেটে করল সিংহাসন।

এ গান কি ভদ্রসমাজে গাওয়া যায়? লালচাঁদ বড়ালের গাওয়া 'তুমি কাদের কুলের বউ' গানের অশিষ্ট ইঙ্গিত আর আড়িছন্দের খেমটা চাল রুচিমান মানুষের উপভোগ্য হতে পারে কি? গানের ভাব বা বিষয় সেকালে ঠিক কী হওয়া উচিত সম্ভবত বোঝা যায়নি। তাই একটি জনাদৃত গানের বিষয় ছিল কলাইয়ের ডাল। কী রকম?

সব ডালের মধ্যে শালা
কলাইয়ের ডাল সেরা।

প্রমথ চৌধুরি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন— বাংলা গানের বাণী ও সুর তাঁর কানে ঝাঁটা মারত। সে গানের এমন এক নমুনা তিনি পেশ করেছেন:

ভেটকি মাছের আহা তিনখানা কাঁটা।

ঔদরিক বাঙালির প্রিয় এই গান গাওয়া হত, 'ইটালিয়ান ঝিঁঝিটে', তানবাজি ফলিয়ে। এ সব দেখেশুনে বলতে হয়, 'অহো, কী দুর্ভাগ্যই ছিল এ দেশের শ্রোতাদের!'

রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা গানের মরা গাঙে বান এনেছিলেন তাতে সন্দেহ কী? ভদ্রজনের, শিষ্টজনের পক্ষে কী গান গাওয়া উচিত এবং কেমন করে, তা তিনি একাই বুঝিয়ে দিয়েছেন। শোকে দুঃখে আনন্দে উৎসবে নিঃসঙ্গতায় উদ্দীপনায় ও সমাবেশে তাঁর গান আমরা গাই— শান্তি মমতা শুশ্রূষা পাই। শিল্পী নিজেও সে গান গেয়ে পান প্রশান্তি ও সন্তোষ। তাঁর আত্মবিভোরতায়, উন্মোচনে, স্বরক্ষেপণে সেই প্রাপ্তি ও আনন্দ ফুটে ওঠে। তার জন্য লাগে অনুভব, আবেগ, সঠিক গান নির্বাচন ও আত্মদীক্ষা— কিন্তু তার জন্য উদ্ভট পোশাক, বিচিত্র কেশকলাপ, বা নর্তনশীলতা লাগে না—প্রধানত লাগে আত্মস্থতা ও শমিত ভাবাবেগ, সুরের ওপর দখলদারি। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন? তাঁর পরের যাঁরা, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার রায়, নজরুল ইসলাম— তাঁদের গানে সুরে গায়নে অনুশীলনে তো বরাবরই আমরা পেয়েছি কাণ্ডজ্ঞান, সংগীতের বোধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহস, দেশকালের ভাবনা। আমাদের স্বদেশি গানে, লোকায়ত গানে, ভাঙা কীর্তনে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী গানে, গণসংগীতে এমনকি আধুনিক গানে ও সিনেমা থিয়েটারের গানে কি বিনোদন মূল্য কম ছিল? অথচ সুরের তালের ঘাটতি হয়নি, বাণীর বিশৃঙ্খলা ঘটেনি, বাজনাগানের দাপট লাগেনি, শিল্পীর প্রদর্শকামিতারও প্রয়োজন পড়েনি। শ্রোতাদের দীক্ষাও ছিল, রসবোধ ও সমজদারি ছিল। এ ধরনের কাজে বা গান বাঁধায় কতটাই গুরুত্ব ও উন্নত চিন্তা ছিল তার একটা ফলিত প্রমাণ প্রতিবছর মহালয়ার ভোরে টের পাই আকাশবাণীর 'মহিষাসুরমর্দিনী' গীতিনাট্যে ও ভাষ্যে। রচনা : বাণীকুমার, সুর : পঙ্কজ মল্লিক, পাঠ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কী অমলিন রচনা। কি আবেগ ও উৎসাহ! প্রভাতের বিমল আনন্দে জেগে শ্রোতাদেরই বা কত প্রত্যাশা প্রাপ্তি। বাণীকুমার- পঙ্কজ-বীরেন্দ্র তিনজনেই প্রয়াত। মূল গীতশিল্পীদেরও অনেকে বেঁচে নেই। কিন্তু বিকল্পহীন এই সৃষ্টি আজও বাজে— সবাই কান পেতে শোনে। যার কোনো পুনরায়োজন বা রিমেক হয় না। গানের শুধু দু-একজন শিল্পীবদল ঘটে বড়জোর। শ্রোতাদের প্রত্যাশা বেড়েই চলেছে— প্রজন্মের পর প্রজন্ম। অনুষ্ঠানটির ক্যাসেট বেরিয়ে গেছে— মাঝে মাঝেই এখান ওখান

থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে 'বাজল বাজল আলোর বেণু মাতল রে ভুবন'। তবু মহালয়ার নিশিভোরে শরৎ শিশিরে ভেজা হিমেল হাওয়ায় ওই সব গান স্তোত্রপাঠ ভাষ্য শুনতেই হবে। কেন? কারণটা ঠিক ধর্মীয় নয়, পরিবেশগত ও নান্দনিক। এই ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগীতানুষ্ঠান যুগের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

সেই আকাশবাণী আছে, মাইনে করা শিল্পী ও যন্ত্রীদল আছে, সম্প্রচারকৌশল অনেক সমুন্নত মানের, সকল স্তরের কর্মীদের বেতন কাঠামোও বীরেন্দ্রকৃষ্ণদের চেয়ে অনেক উঁচুমাপের। তবু কেন নতুন গানের জন্ম হয় না? দূরদর্শনই বা কী করছে? অতএব অপ্রীতিকর প্রশ্ন আজ আর না তোলাই ভালো। বরং চেতনাহীন ভাঙা মনে টিভিতে দেখে যাই মিউজিক চ্যানেল। বিচিত্র গান, উদ্ভট পোশাক, যন্ত্রের প্রদর্শনী, গায়ক-গায়িকার পাশে জন আট-দশ ছেলেমেয়ের দেহভঙ্গিভরা যৌনাবেদনের নাচ—কানফাটা গিটারের আর্তনাদ, কি-বোর্ডের আস্ফালন, অকটোপ্যাডের কারদানি আর পারকাশনের দৌরাত্ম্য। গান কই?

মেলডিবহুল মায়াময় কণ্ঠে অভিনব সুরসামর্থ্যের মগ্ন শিল্পী কই? জীবনকে মথিত করে দেবে এমন গানের বাণী কই? সেদিন দেখলাম টিভিতে একটি গান। ব্যান্ডের নাম 'কায়া'। নানা রকমারি পোশাক পরা আট-দশটি ছেলে একটি চায়ের দোকানের সামনে জমায়েত হয়ে গাইছে :

নন্দদা তিনটে চা
পাঁচটা করে দাও না।

নন্দদা মানে চাঅলা, ওই গানঅলাদের চা দেওয়ার ফাঁকে তাদের সঙ্গে নাচতে নাচতে নিজের গেঞ্জি ওপরে তুলে ভুঁড়িতে তাল দিতে থাকে। কে কাকে চা দেবে?

হঠাৎ অবাধ্য মন খুলে ধরে স্মৃতির ঝাঁপি। গলগল করে বেরিয়ে আসে নামের পর নাম— হেমন্ত, ধনঞ্জয়, শচীনকর্তা, আব্বাসউদ্দীন, দিলীপকুমার রায়, ভীষ্মদেব, জ্ঞান গোঁসাই, আঙুরবালা, রাধারানি, সলিল চৌধুরি, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, আরতি, হৈমন্তী, নির্মলা, প্রতিমা, শ্যামল, জটিলেশ্বর, সুমন.......নাম শুধু নাম। বিশ্বাস করুন এঁরা সবাই বাঙালি ছিলেন, গাইতেন বাংলা গান— সবাই শুনতেন।

অসহায় ট্রাপিজের খেলা

Too many highways
Too many byways
Nobody's walking behind.

হালফিল বাংলা গান সম্পর্কে উপরে উদ্ধৃত বিলিতি গানের কথাগুলি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এখনকার সব গায়ক-গায়িকার সামনে দুস্তর উপলভূমি, শতেক বাধা, মিডিয়ার কৃপালাভের জন্য যথাস্থানে তেলদান। প্রচুর byways বলতে বুঝব প্রচুর টিভি চ্যানেল, প্রচুর কনসার্ট, সিরিয়ালের থিম সং— নাচগান কস্টিউম, ঘন ঘন পোশাক বদল, মফস্‌সলের খেপ মারা— কত যে ধান্দা এবং রাজনীতির দাদাদের ধরা; তবে তো গান। এবং হ্যাঁ, এতসব করেও কিন্তু কোনো শিল্পীর কোনো অনুসরণকারী নেই—nobody's walking behind। শিল্পী বড় একা, বড় অসহায়, বড়ই পরমুখাপেক্ষী। যদি কোনো গীতিকার ভালো একটা দুটো চারটে গান লিখে দেয় , যদি তাকে সমাদৃত হাতেগোনা জন তিনেক সুরকার সুরটা করে দেয়,

যদি অ্যারেঞ্জার দয়া করে, তারও পরে যদি কোনো বদান্য ক্যাসেট কোম্পানি মার্কেটিং করতে রাজি হয়, তবে ক্যাসেট রিলিজ হবে। তাতেও হ্যাঁপা কম নয়, কোনো একটা জায়গা ভাড়া নিয়ে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, দু-চারজন গুণীজনকে ডেকে তবে আনুষ্ঠানিক ক্যাসেট রিলিজ। তার জন্য খবরের কাগজ আর টিভিঅলাদের কাছে গিয়ে হাত কচলানো— যদি অনুষ্ঠানটার সম্প্রচার হয়! তাদের ভাগে প্যাকেট (লোকবিশেষে আসব দান) ও নজরানার ব্যবস্থা। গুণীজনদের ট্যাক্সি করে আনা বা নগদ টাকা গুনে দেওয়া— হেঁ হেঁ করা— প্রচারের স্বার্থে অন্তত গোটা ত্রিশেক সিডি বিতরণ। নিজে এই উপলক্ষে একটা র- সিল্কের নতুন নকশাদার লম্বাঝুল পাঞ্জাবি বা পাটভাঙা বোমকাই শাড়ি পরিধান। তারপরে হবে মার্কেটিং। তারজন্যে ভিডিয়ো ক্যাসেট, প্রোমো; মডেল ছেলেমেয়ে পয়সা গুনে জোগাড় করা, ক্যামেরা ভাড়া, আলো লোকেশন— সেই সঙ্গে নিজেরও খানিকটা নাচন-কোঁদন, ফাঁকা ব্রিজে, ঝোপে, জঙ্গলে, নৌকায় বসে। ক্ষণে ক্ষণে তার জন্যে পোশাক পালটাতে হবে। এত সব করে হয়তো ফলং অষ্টরম্ভা—ক্যাসেট চলল না, অথচ গ্যাঁটগচ্চা বিপুল।

ব্যাপারটা এতটা জবরজং হয়ে গেল কেন? প্রতিভার অভাব, না পরিবর্তিত পটভূমি? আমরা তো শচীনকর্তা, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়দের কত গান শুনেছি, কত জলসায়। সামনে উন্মুখ শ্রোতা— নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী একটি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে যাচ্ছেন একাগ্র হয়ে, সঙ্গে শুধু তবলা সংগত। গানের খাতা দেখা নেই, বুক্‌নি নেই, দেখনদারি পোশাক নেই। তদ্‌গত হয়ে তন্ময় শিল্পী করে যাচ্ছেন একের পর এক গান। স্বর্ণকণ্ঠ, প্রখর স্মৃতি, চমৎকার শ্রুতি এবং তুখোড় সুরের দীক্ষা। দীর্ঘ অনুশীলনে দরাজ কণ্ঠ, পরিশীলিত রুচিবোধ। এ যেন গাভাসকরের ব্যাটিং মাইকেল হোল্ডিংয়ের বলের বিরুদ্ধে। হেলমেট নেই, হ্যান্ডপ্যাড নেই— কেবল আছে ক্রিকেটীয় শ্যেন চক্ষু, প্রখর অনুমানশক্তি এবং অপরিমিত সাহস— সবচেয়ে বেশি আছে দক্ষতা ও কুশলতা।

না, ক্রিকেটে এখন যেমন গাভাসকর বিশ্বনাথদের ক্রিয়াপরতা ও দক্ষতা নেই, তেমনই আজ বাংলা গানে নেই স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী। যাঁরা আছেন তাঁরা কেউই তেমন নন যদিও, কিন্তু সর্বদা তাঁদের মন রাখতে হয় নিজের ঠাটবাটের দিকে, নজর রাখতে হয় পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনে আর ফটো সেশ্যনে একটু আধটু কোমর দোলানোর কাজে। মহিলা শিল্পীদের সচেতনভাবে কেশবিন্যাস করতে হয়, যাতে গানের ফাঁকে ফাঁকে উড়ে আসা কুন্তলভার মাঝেমাঝেই হাত দিয়ে ঠিক করতে হয়। সেই চূর্ণ কেশ আর শিল্পীর মুখের একপাশে তীব্র স্পট লাইট ফেলে স্পেশাল এফেক্ট আনবেন নিয়োজিত ক্যামেরাম্যান। কিছু না করা গেল তো মঞ্চে তৈরি করা হল বেশ খানিকটা ধোঁয়ার কৃৎকৌশল। তরুণ-তরুণীদের অনেক ছোট বয়েস থেকেই ওসব রপ্ত করতে হয়। গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে শ্রোতাদের বলতে হয় 'হাততালি দিন' 'নাচুন'। ব্যস, শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ।

একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে— রবীন্দ্রনাথ এই পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ শিল্পী ও শ্রোতা। এখন ভাবতে হবে মঞ্চব্যবস্থা, সাজপোশাক, বিজ্ঞাপন, শ্রোতাদের বিচিত্র সাইকোলজি ও চাহিদার ধরন, যে গানটা হিট সেটা শেষে গাইবার প্ল্যান, মুখে অবিচল হাসি এবং কেবলই কথা বলা গানের ফাঁকে ফাঁকে। নজর রাখতে হবে বাদ্যযন্ত্রে সহায়তাকারী সহশিল্পীদের মেজাজমর্জির দিকে। আগে

একজোড়া বাঁয়া তবলাতেই সংগতের কাজ হয়ে যেত। এখন লাগবে দু'জোড়া। তা ছাড়া নানা কিসিমের পারকাশ্যন যন্ত্রব্যবস্থা। চাই কী-বোর্ড, অক্টোপ্যাড, গিটার, ড্রাম, বঙ্গো, বাস— এতসব সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারপরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। যুদ্ধ তো বটেই, জীবনযুদ্ধ, লড়ে টিকে থাকবার লড়াই, টপে ওঠার মই বাগাতে পারা। সব তাতেই এখন টলার স্ট্রঙ্গার হলেই চলবে না, হতে হবে টপার। তারপরে রাজ্যজয়, এবং রাজত্বে টিকে থাকা। আজ কিশোরকুমার, কাল অভিজিৎ ভার্সাস কুমার শানু, তারপরে বাবুল সুপ্রিয় আর শান। বঙ্গসন্তানদের সাবেক নাম পর্যন্ত পালটে যাচ্ছে। এখন আবার শুনছি এসব নামজাদা টপারুদের কবজা করে, রক্ত হিম করে উঠে আসছে হিমেশ রেশমিয়া তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর নিয়ে। এখনকার ভাষায় যাকে বলে ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলা।

একটু হালকা কথা বলি। গান গাওয়া কি খুব সোজা হয়ে গেছে? কিছুকাল আগে দেখলাম একজন দ্বিতীয় শ্রেণির বাঙালি অভিনেত্রী হঠাৎ একটা ক্যাসেট বার করলেন। ক্যাসেটের ইন-লে কার্ডে নানা সুবচন। কভারে নায়িকার মোহময়ী রঙিন ছবি। গান যেমনই হোক, কোম্পানির বিজ্ঞাপন আর বিপণনের গুণে ক্যাসেটটা মার্কেট নিয়ে নিল। অভিনেত্রীর গান বলে কথা। না, তার কোনো মানে নেই— সুচিত্রা সেনের মতো ওইরকম সমাদৃতা নায়িকার একটি রেকর্ডের দুটি গান একেবারে চলেনি সে কালে। এ কালে অবশ্য বেশ চলত, চালানো হত। গেঞ্জির বদলে আরাম ফ্রি যেমন, তেমনই গানের বদলে বাজনা ফ্রি করে দিয়ে। কিংবা হয়তো বলা হত এই গানদুটি কিনলে সঙ্গে পাওয়া যাবে একটি সুগন্ধি স্প্রে।

যাইহোক বলছিলাম এখনকার এক অভিনেত্রীর কথা— যাঁর গান কী করে কোন্ ফাঁকতালে নাকি হিট করে না গেলেও বাজারে খেয়েছে। খবরের কাগজ আর টিভি চ্যানেল তাঁর কাছে 'বাইট' চাইছে। প্রশ্ন করা হল, 'আপনার প্রথম ক্যাসেটটা তো বেশ বাজার পেয়ে গেল। এবার কী করবেন ভাবছেন?'

সবাইকে হতবাক করে অভিনেত্রী গায়িকা বলে বসলেন, 'ভাবছি এবারে গানটা মন দিয়ে শিখব।'

— সে কী? আপনি গান জানেন না?

— না তো! কয়েকটা গান তুলে নিয়ে গেয়ে দিয়েছি। গানের চর্চা সে অর্থে কোনোদিনই আমি সিরিয়াসলি করিনি। তবে এবারে করতেই হবে। কিন্তু সময় পাব কি?

সাংবাদিকরা তো মানে মানে 'আমাদের শুভেচ্ছা রইল' বলে দে ছুট। সুখের বিষয় সেই অভিনেত্রীর গানের বাই আর চাগেনি। আমরাও বেঁচেছি।

কিন্তু এসব ঘটনা নিয়ে তলিয়ে ভাবলে বিবেকী মানুষের মনে প্রশ্ন উঠবে কে বা কারা আসকারা দিয়ে ওই অভিনেত্রীকে গানের লাইনে টেনেছিলেন? উত্তরটা পাঠকরা ভাবুন কিংবা এস.এম.এস করুন...

ততক্ষণে আমার গান নিয়ে দুটো মজার গল্প মনে পড়ে গেল। কে বা কারা তোল্লাই দিয়ে নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের গানের আসরে টেনে আনে আমরা কি জানি? গল্পটা বলি। পাড়ার সরস্বতী পুজো প্যান্ডেলে ফাংশান হচ্ছে। পাঁচমিশেলি হরেকরকম্বা অনুষ্ঠান। নাচ, গান, আবৃত্তি (যাকে বলে 'আব্রিতি'), শ্রুতিনাটক পাঠ, বৃন্দগান, আর সবশেষে ম্যাজিক। পাড়া ভেঙে মা মাসি দাদা বউদিদের ভিড়। ভিন্ পাড়া থেকেও আর্টিস্ট আনা হয়েছে। সেই রকম এক আর্টিস্ট, মানে দামি জরদৌসি-কাজ করা সালোয়ার পরা এক তরুণী গান গাইছে পরপর। গলায় সুর সার কিছুই নেই। নিতান্ত শিক্ষানবিশ। তৃতীয় গান গাইতে গাইতে মেয়েটি

সভয়ে দেখল উদ্যোক্তাদের একজন একটা লাঠি নিয়ে চোখ পাকিয়ে স্টেজের সামনে ফাঁকা জায়গায় পায়চারি করছে এদিক থেকে ওদিক।

মেয়েটির তো ধাত ছেড়ে যাবার জোগাড়। ভাবছে, সর্বনাশ গান গাইতে এসে লাঠির বাড়ি খাব নাকি? একে তার কণ্ঠ বেসুরো তাতে ভয় পেয়ে কাঁপুনি ধরেছে। লোকটি বলল, 'ভয় নেই— আপনি গান করে যান। আমি খুঁজছি তাকে, যে ব্যাটা আপনাকে স্টেজে তুলেছে। কোথায় সে?'

এর পিঠোপিঠি গল্পটাও বেশ মজার। কলেজের ক্যান্টিনে একজন ছাত্র বেসুরে গান গাইছে আর সহপাঠিরা টেবিল বাজাচ্ছে। গানের গুঁতোয় অতিষ্ঠ হয়ে এক মিচকে ছোকরা তাকে বলল, 'এত সুন্দর গান করো তুমি। রেডিয়োতে গাও না কেন? অডিশনের ব্যবস্থা করব? সোর্স আছে আমার।'

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ, কী যে বলো, আমি কি তত ভালো গাই নাকি? আমাকে নেবে কেন?'

ছেলেটি বলল, 'নিলে আমাদের লাভ হত।'

— কী লাভ? তোমার চেনা একটা ছেলে রেডিয়োতে গাইছে এই তো?

— না। রেডিয়ো পট্ করে বন্ধ করে দেওয়া যায় তো। সেইটা লাভ। অন্তত এই সব ঘ্যানর ঘ্যানর গান শুনতে হবে না।

পাঠক ভাবতে পারেন গানের মতো শুদ্ধ গভীর ব্যাপার নিয়ে (শাস্ত্রে বলছে 'গানাৎ পরতরং নেহি') এত সব ঠাট্টা মসকরা সমাজে কেন চালু হল। তার কারণ পণ্যায়ন ও বিশ্বায়ন। নির্জন একক কণ্ঠে মগ্ন প্রার্থনার মতো গান গাওয়া আর অধিকারী মন নিয়ে তা তদ্গত হয়ে শোনা— দুটোই এখন দুর্লভ। গানবিদ্যা এক দুরূহ আত্মগত অর্জন, তার চর্চা করলে শুধু হয় না, চর্যা অর্থাৎ সাধনা করতে হয়, তাকে আত্মস্থ করতে হয়—তারপরে তাকে কণ্ঠে রূপায়িত করে শোনাতে হয় মরমি শ্রোতাদের সমক্ষে। শ্রোতা আবার যে সে হতে পারবেন না—তাঁকে হতে হবে রসবোধসম্পন্ন এবং গানবিদ্যায় অধিকারী অর্থাৎ গানের তাল মান লয়, তার শ্রুতি ও স্বরস্থান বিষয়ে থাকতে হবে সজাগ ও সচেতন। রাগদারি ওস্তাদি গান যথাযথভাবে শোনার এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা যেমন চাই, শোনা চাই বড় মাপের শিল্পীর কণ্ঠে, বড় বড় আসরে, তেমনই লোকসংগীতের রস পেতে জানতে হয়, অর্জন করতে হয়, তার সুরের নিজস্ব ধাঁচ ও চলন, তার নানা বিচিত্র আঙ্গিক। ঝুমুর, গম্ভীরা, তুষু, ভাদু, মারফতি, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, বাউল, ঝুমুর, ভাটিয়ালি, খনগান কিংবা সাধ্‌লে গান সম্পর্কে জানতে গেলে শ্রোতাকে ঘুরতে হবে বহুতর বাংলা গ্রামিক জনপদে, মেলা মহোৎসবে, ব্রত মান্‌সার নিম্নবর্গীয় জীবনে। বিশ্বায়নের দাপটে আর বৈদ্যুতিন সহযোগিতায় এ ধরনের গান তার পরিবেশ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কিংবা উৎক্ষিপ্ত হয়ে চলে আসছে শহরের ক্যাসেট-সাম্রাজ্যে, সিডি ভিউ-সিডি হয়ে চলে যাচ্ছে নানা মুলুকে। তার ফলে নিউইয়র্কে বসে প্রবাসী বাঙালি শুনছেন কুষ্টিয়ার ফরিদা পরভিনের কণ্ঠে লালনগীতি। তাতে ক্যাসিয়ো যন্ত্রে কৌশলে বাজানো হচ্ছে তীব্র দোতারা— দুধের স্বাদ ঘোলে। কিন্তু সেই তঞ্চকতা শ্রোতা বুঝবেন কী করে? গানও কি তবে হাইব্রিড প্রোডাক্ট হয়ে গেল?

হাইব্রিড হয়তো না, কিন্তু এখনকার গান একটা প্রোডাক্ট তো বটেই এবং তার ফলে তার শব্দগত পরিচয়ও পালটে গেছে। যেমন আগে বলা হত শিল্পী ও শ্রোতা— এখন বলা হচ্ছে পারফরমার ও কাস্টমার।

গান এখন এক বিক্রয়যোগ্য পণ্য, যার বিনিময় মূল্য আছে এবং এ জাতীয় গান যাতে বাজারে ক্রেতা টানতে পারে তারজন্য ক্যাসেট কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার থাকেন। একটি দুটি ছেলেমেয়ে বা গ্রুপ যখন ক্যাসেটে আত্মপ্রকাশ করে তখন কলকাতার কোনো হল ভাড়া নিয়ে তারা একটা গানের অনুষ্ঠান করে— সেই অনুষ্ঠানের স্পনসর কোম্পানি সারা হলে তাদের প্রোডাক্টের রংচঙে ব্যানার চারিদিকে টাঙিয়ে দেয়। ফলে শ্রোতাদের নিট লাভ হল এই যে, অনেক গান শোনা গেল এবং জানা গেল কোনো এক গুঁড়োমশলা বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে কতটা সুফল পাওয়া যাবে। রথ দেখা ও কলা বেচা বলে একটা প্রবচন আছে— এ হল গান শোনা আর কাপড় কাচার যুগলবন্দি।

এখনকার বেশিরভাগ উদীয়মান গায়ন সমাজের তরুণ-তরুণীদের প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে প্রথমে উদ্ধৃত সেই ইংরিজি গানের অন্য তিনটি পঙ্ক্তি দিয়ে লেখা শেষ করি।

No one beside you
No one to guide you
Nobody knows who you are.

গানের ছলে চুপি চুপি তাহলে বলে দিই : এই গানের মোক্ষম কথাগুলি বোধহয় বাংলার সমাজ সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

পুনশ্চ - এ লেখাটির আঙ্গিক নিবন্ধের নয়, আলাপচারির।